উৎপল দত্ত

গদ্য সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

নাট্যচিন্তা

সম্পাদনা
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচিতি
সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮
কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২।

টাইপসেটিং : অভিনব মুদ্রণ
৭২ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০০৬৫৫।

মুদ্রক : কমার্সিয়াল প্রেস সার্ভিস
৪৫ মলাঙ্গা লেন, কলকাতা-৭০০০১২।

সূচিপত্র

চায়ের ধোঁয়া

জপেনদা জপেন যা

ভূমিকা

উৎপল দত্তের গদ্য সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় 'সংযোজন' অংশে সন্নিবিষ্ট 'নাট্য-আন্দোলনের বিষয়বস্তু'। 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার যে-সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তার পরের সংখ্যাতেই একটি অস্বাক্ষরিত প্রতিবেদনের নাম 'অঙ্গারের দ্বিশত রজনী'। 'কুমারগুপ্ত' ছদ্মনামে লেখক লিখেছেন : 'ভালো নাটক, ভালো সাহিত্য, ভালো শিল্প যে জনপ্রিয়ও হতে পারে একথা মানতে চান না অনেকে। ভালো এবং জনপ্রিয় কথা দুটি যেন বিপরীতধর্মী। জনপ্রিয় জিনিস ভালো হতে পারে না আর যা কিছু ভালো তাকে জনপ্রিয় হবার আশা বিসর্জন দিতে হবে—আমাদের দেশের একদল উন্নাসিক এই রকম একটা বক্তব্য উপস্থিত করে থাকেন! এঁদের সঙ্গে তর্ক করা চলতে পারে। কিন্তু তর্ক করবাব প্রয়োজন কী যখন প্রমাণ কাছেই রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা 'অঙ্গার'-এর কথা বলছি। আমরা দাবি করছি 'অঙ্গার'কে একটি উৎকৃষ্ট নাটক বলে, আর সেই উৎকৃষ্ট নাটকটি জনপ্রিয়ও বটে। 'অঙ্গার' দুশো রজনী পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পার হয়ে গেল এমন একটি হলে যেখানে কিছুদিন আগেও মানুষ যেত না। ভালো জিনিস জনপ্রিয় হতে পারে এবং জনপ্রিয়তা মানে লঘু কিছু নয় 'অঙ্গার' তার একটি সার্থক প্রমাণ। 'অঙ্গার' ও সেই সঙ্গে লিট্‌ল্ থিয়েটার ও উৎপল দত্তকে আমরা অভিনন্দিত করছি। বাংলা নাটক যখন মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না—এঁরা পথ দেখালেন। শুধু আঙ্গিক নয়, প্রাণবান বিষয়বস্তু চাই, তারই বলিষ্ঠ ঘোষণা 'অঙ্গার'। বাংলা দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক ও কৃষক হলেও শ্রমিক-কৃষক জীবনের উল্লেখযোগ্য ছাপ বাংলা সাহিত্যে পড়েনি—শ্রমিক-জীবন তারও মধ্যে গৌণ স্থান পেয়েছে। বাংলা নাটক সম্পর্কে একথা আরো সত্যি। 'অঙ্গার' তার ব্যতিক্রম। বিভ্রান্ত বহুরূপীর মতো শুধু আঙ্গিকের জাদু দেখানো বা শুধু শক্তিমান এক বা একাধিক নটের সাহায্যে কেল্লা ফতে করার চেষ্টা নয়, টীমওয়ার্ক নাটককে কতখানি সাহায্য করতে পারে 'অঙ্গার' তারও প্রমাণ। লিট্‌ল্ থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চের কাছে একটা চ্যালেন্‌জ্। 'শ্যামলী', 'উল্কা', 'এক মুঠো আকাশ', 'এক পেয়ালা কফি' বা 'ডাকবাংলো'র মতো নাটক যখন মঞ্চ জাঁকিয়ে বসে আছে, তারই পাশাপাশি এরকম একটা নাটক সাফল্যলাভ করতে পারে এ যেন ভাবাই যায় না। ভালো জিনিস পেলে বাংলা দেশের জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে রাজি আছেন, এটা তার প্রমাণ।' ['বিংশ শতাব্দী', কার্তিক ১৮৮২ শক, পঞ্চম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা]

১৯৫৯ সালের ৩ জুলাই লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভা থিয়েটার হাতে পায়। সেইদিনই ওই মঞ্চে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মঞ্চস্থ হয়। মিনার্ভা পর্বে এল টি জি শুরুতে 'ছায়ানট', 'ওথেলো' ও 'নীচের মহল', কোনোটিতেই জনসমাদর বা বিক্রিপাটা পাননি। ব্যবসায়িক থিয়েটারের চৌহদ্দির মধ্যে বামপন্থী ধারার থিয়েটার পরিবেশণ করা আদৌ সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে স্বভাবতই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংশয় দেখা দিতে থাকে। উনিশ শতকের শেষপাদে

কলকাতায় যে পেশাদার থিয়েটারের পত্তন হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল কলকাতার বাবু সমাজ। সেই বাবু সমাজ—অর্থাৎ যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রসাদপুষ্ট, তাবই সুযোগসুবিধায় লালিত, তারই দায়পালনে নিয়োজিত, তারই মদতদার—ধীরে ধীরে পালটেছে,কিন্তু তার আদি অবস্থানের কোনো মৌলিক পরিবর্তন অন্তত গিরিশ-অর্ধেন্দু-অমৃতলালের যুগে ঘটেনি। প্রথম মহাযুদ্ধেব পব এই সমাজকে আর সেভাবে চেনা যায় না। গৈরিশ ধাবাতেও ছেদ পড়ে। বিশেব দশকে থিয়েটারের রূপান্তর এক অর্থে একটা নতুন দর্শকসম্প্রদায়ের সন্ধানও বটে। শিশিরকুমারের একেবারে প্রথম পর্বের পরীক্ষানিরীক্ষা বাবু শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের বাইবে বৃহত্তর পরিবর্তনমুখী. প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী এক দর্শকসম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেছিল। আধুনিক চিন্তায় প্রাণিত, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার নির্মাণে নিয়োজিত তরুণ বুদ্ধিজীবীরা সেদিন শিশিরবাবুর থিয়েটারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই ভরসায় ও বিশ্বাসে যে এক আধুনিক থিয়েটার সাংস্কৃতিক মূল স্রোতে এসে যুক্ত হতে চলেছে।

অভিনেতাদের স্বরাট প্রাধান্য থেকে থিযেটাবকে মুক্ত করে নির্দেশককে প্রতিষ্ঠিত কবে শিশিরকুমার বাংলা থিয়েটারকে আধুনিকতার পথে চালিত কবেছিলেন। 'চায়ের ধোঁয়াব' একটি সংলাপে দার্শনিক জিজ্ঞাসা কবেন : 'আধুনিক বাংলা বঙ্গমঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?' পরিচালক জবাব দেন : 'প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিচালকের অভ্যুত্থান। পরিচালকের ক্রমবর্ধমান একনায়কত্ব। আঙ্গিককে সংহত করে [এখানে আঙ্গিক বলতে সমভাবেই 'চারটি উপাদান. . . —অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোক ও সংগীত'] সুসমঞ্জস করে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন এঁরা। এককালে—এই সেদিন—অর্থাৎ শিশিববাবুব আগে পর্যন্ত পবিচালক বলে কেউ ছিলেনই না ; ছিলেন মোশন-মাস্টার, যিনি কোনোমতে কথাগুলো 'বলিযে' নিতেন। আলোকসম্পাত বা মঞ্চসজ্জা বা অভিনেতাদেব গ্রুপিং প্রভৃতি সম্পর্কে এঁদেব কোনো ধাবণা বা দায়িত্বই ছিল না। আজ পরিচালকবা, অন্তত কয়েকজন পরিচালক—সমগ্র আঙ্গিকের ওপর প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বিস্তার করে নাটকের ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপ দিচ্ছেন।'

১৯৬৫ সালে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাৎকারেব বিববণী প্রকাশের আগে তাঁকে দেখতে দিলে তিনি আমাব পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেন। তাঁর সেই সংযোজনেব মধ্যে অন্যতম অনুরূপ এক বিবৃতি : 'স্টান্ট বাংলা মঞ্চে অনেক হযেছে, কিন্তু গৌরব করতে হলে আমরা শিশিববাবুব এই সমস্ত নাট্যপ্রযোজনাব কথাই স্মবণ করি। তিনিই বোধ হয় আমাদেব নাটমঞ্চের প্রথম সার্থক নির্দেশক যিনি টোটাল থিযেটারের কথা চিন্তা কবেছিলেন। তিনি না থাকলে আমাদেব কাজের শুরুই হত না। আমবা যে থিয়েটারকে আরো গভীবতর উপলব্ধিব ক্ষেত্রে অনুভব কবার প্রয়াস পাচ্ছি সেটা বাংলা দেশে শিশিরবাবু টোটাল থিয়েটাব সৃষ্টি কবে গিয়েছেন বলেই সম্ভব হচ্ছে। নইলে হত না।' ['পরিচয়', বিশেষ শিল্প সংখ্যা, ১৯৬৫]।

শম্ভু মিত্র পরিচালিত বহুরূপীর 'রক্তকরবী'তে উৎপলবাবু লক্ষ করেছিলেন শম্ভুবাবু 'বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটি ধরেছেন। এই ঐতিহ্যে আছে দুটি ধারার মিলন—প্রথম. দেশজ যাত্রার, দ্বিতীয় ইয়োরোপিয় বাক্সবন্দী মঞ্চ।' এই 'মিলনের' সার্থকতায় শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী যে নতুন উপমান সৃষ্টি করেছিলেন. তা যে উৎপলবাবুর প্রেরণাস্থল হয়েছিল, তা বোঝা যায় তাঁর

ঐতিহাসিক 'রক্তকরবী' সমালোচনায় ('পাদপ্রদীপ', প্রথম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ)।

ব্রেখ্ট্-এর 'মেসিংকাউফ্ ডায়ালগ্স্' বা 'মেসিংকাউফ সংলাপগুচ্ছের' আদিভাষ্য ১৯৩৯-৪২ সালে রচিত হলেও সংস্কার, সংশোধন, বিস্তার ইত্যাদির দীর্ঘ প্রক্রিয়া পেরিয়ে তাব প্রথম সুসম্পাদিত প্রকাশ ব্রেখ্ট্-এর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর—১৯৬৪ সালে। প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় পবের বছরই। কিন্তু এই সংলাপগুচ্ছের নানা অংশ তার আগেই বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় দেখা গেছে। মেসিংকাউফ সংলাপগুচ্ছের চাব রাত্রের চার অধিবেশনের কুশীলব বলতে পাঁচজন—দার্শনিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, ড্রামাটুর্গ, ও ইলেকট্রিশিয়ান। ব্রেখ্ট্ চরিত্রলিপিতে এঁদের পরিচয দিয়েছেন :

> দার্শনিক তাঁর নিজের লক্ষ্যসাধনে থিয়েটারকে নির্মমভাবে কাজে লাগাতে চান। তাঁর দাবি, মানুষেব সঙ্গে মানুষেব ক্রিয়াপ্রতিক্রিযার মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে, থিয়েটারকে তারই নিখুঁত ছবি এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে দর্শক কোনো এক অবস্থান গ্রহণ কবার সুযোগ পান।
>
> অভিনেতা নিজেকে প্রকাশ কবতে চান। তিনি চান, লোকে তাঁকে তারিফ করুক। কাহিনী ও চরিত্র তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের উপকরণ।
>
> অভিনেত্রী চান, থিযেটার সামাজিক শিক্ষার বাহন হোক। তিনি রাজনীতিতে আগ্রহী।
>
> ড্রামাটুর্গ নিজেকে দার্শনিকেব লক্ষ্যসাধনে তাঁরই অভিভাবকত্বে নিজেকে সম্পূর্ণ নিযোজিত করেছেন। থিয়েটারকে দার্শনিকের অভীষ্ট থিয়েটারে রূপান্তবিত কবাব কাজে তাঁব জ্ঞান ও সাধ্য নিয়োগ কবতে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আশা রাখেন, থিযেটাব এক নবজীবন লাভ করবে।
>
> ইলেকট্রিশিযান নতুন দর্শকমণ্ডলীব প্রতিনিধিস্বরূপ। তিনি একজন শ্রমিক, এবং পৃথিবীর অবস্থায তিনি অসন্তোষে ক্ষুব্ধ।

এই সূত্রে বোধ হয এই তথ্যটিও কাজে লাগবে যে, জর্মন নাট্য বা রঙ্গমঞ্চেব ইতিহাসে নাট্যকাব ও পবিচালকেব অন্তর্বর্তী ওই ড্রামাটুর্গ-এর ভূমিকাটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ড্রামাটুর্গ প্রযোজনার জন্য নির্ধাবিত নাটকের ব্যাখ্যায়, ওই ব্যাখ্যায পবিপূরক বা সহায়ক নথি-তথ্য-চিন্তা ইত্যাদি সংগ্রহে, এমনকী ওই নাট্য সম্প্রদাযেব মতাদর্শ ও লক্ষ্য নির্দেশ ও প্রতিষ্ঠায়ও আত্মনিয়োগ করেন। থিয়েটারেব গোষ্ঠীব মধ্যে তিনি মূর্তিমান মস্তিষ্কস্বরূপ। ১৯২৪-২৬ ব্রেখ্ট্ ছিলেন বের্লিন-এব ডয়েট্শেস্ টেয়াটেব-এ সহকাবী ড্রামাটুর্গ। এই জর্মন পবম্পরাবই আদলে স্তানিসলাভস্কি মস্কো আর্ট থিয়েটারে নেমিবোভিচ্-দানচেংকোব ভূমিকা নির্দিষ্ট কবে দেন, ১৯৬৪ সালে ব্রিটেনে প্রথম জাতীয রঙ্গালয়ের পত্তনকালে তাব প্রথম নির্দেশকের পদে মনোনীত লরেন্স্ অলিভিয়ের 'লিটাবারি ডিরেকটব'-এর একটি বাডতি পদেব প্রস্তাব করেন এবং সেই পদে কেনেথ টাইনান-এর নিযোগেব প্রস্তাব করেন।

'চায়ের ধোঁয়ার' সংলাপগুচ্ছে কুশীলব—দার্শনিক, নাট্যকাব, পরিচালক, ভাষাবিদ, এবং 'আমবা', যার মধ্যে এক একদিন কালীকান্তবাবুর মতো কোনো চরিত্রেবও আবির্ভাব ঘটে যায়।

'মেসিংকাউফ সংলাপগুচ্ছে' যেমন, এই সংলাপগুচ্ছেও তেমনই নির্দেশক-লেখক যেন নিজেকেই একাধিক বিশিষ্ট সত্তায় কিংবা নিজেরই মধ্যে প্রোথিত বিভিন্ন সংস্কার-পরম্পরার চারিত্রিক মূর্তায়নে বহুধাবিশ্লিষ্ট করে কথোপকথন তথা বিতর্কের মুখোমুখি দ্বন্দ্বে এক শিক্ষাত্মক নাটক বা পেডাগজিক্ প্রয়াসে নেমেছেন। মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের নাট্যকর্মের প্রাথমিক জনপ্রিয়তা ও সাফল্য এবং এমনকী নাট্যগোষ্ঠীর সংঘসংহতিও যখন বিপন্ন ও ব্যাহত হতে শুরু হয়েছে, তখনই ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর (শোভা সেন সমভিব্যহারে, দ্র. শোভা সেন, *'স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লাল দুর্গ'*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৫১-৬৮) সোভিয়েত ও জর্মন থিয়েটারের প্রাণবন্ত নাট্যধারার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎপরিচয়, এই দুটি ব্যাপারই বোধ হয় তাঁকে এই শিক্ষা-প্রকল্পে প্রণোদিত করেছিল। প্রগতিমুখী থিয়েটার ও তথাকথিত 'জনপ্রিয়' থিয়েটারের মধ্যে যে-বিরোধ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে সাধারণ দর্শক ও বোদ্ধা-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বীকৃত, এল টি জি-কে মিনার্ভা থিয়েটারে স্থাপন করে উৎপলবাবু ওই বিবোধের মধ্যে বা ওই বিরোধকে আত্মস্থ করে থিয়েটারকে অন্য একটা অবস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা শুরু কবেছিলেন। উৎপলবাবু মানতে চাননি, থিয়েটারে চিবকালই ওই বিভাজন থেকে যাবে—একদিকে শিল্প-থিয়েটার, অন্যদিকে পণ্য-থিযেটার। 'অঙ্গার'-এর অভাবনীয় সাফল্যে শুধু উৎপলবাবুই নন, অনেকেই ভেবে ফেলেছিলেন, ওই বিভাজনের অবসানের পথই বুঝি খুঁজে পাওয়া গেছে। তারপর মিনার্ভায় এল টি জি-ব সংকট তথা জটিলতায ধরা পড়ল, সেরকম কোনো চূড়ান্ত সমাধান আবিষ্কৃত হয়নি। তখনই দরকার পড়ে 'চায়ের ধোঁযার' আড্ডার। চটজলদি সুঠাম কোনো সমাধানের হদিশ এখানে নেই। তাই দার্শনিক, নাট্যকার, পরিচালক ও ভাষাবিদের মধ্যে মাঝেমাঝেই তর্ক বেধে গেলেও তাঁরা কেউই সুনির্দিষ্ট অটল মতাবস্থানেব এমন কোনো ভূমিতে দাঁড়িয়ে নেই যাতে তাঁদের তর্ক অহেতুক মতান্ধতার চোরাবালিতে তাঁদের পরস্পরেব বিরুদ্ধে চালিত করে মারবে। আবার তাই বলে তাঁদের মধ্যে কেউ একজনও কখনোই সর্বজ্ঞানী সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়ে ওঠেন না ; প্রচ্ছন্ন লেখক কাউকেই তাঁব ঠাট্টা-কৌতুকের খোঁচা থেকে ছাড়ান দেন না। ফলে এই শৈলীর মধ্যেই, এই ক্রমাগত পরিহাসের সামান্য অবমূল্যায়নের, সামান্য টেনে নামানোর মজায় পাঠক পেযে যান সংশয়ী, বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি—যে-দৃষ্টিভঙ্গি কাউকেই দ্বিধাহীন অপ্রশ্ন সম্মতি দেবে না। অথচ আলোচনা অব্যাহত থাকবে বুদ্ধি ও বিচারের এক বায়ুমণ্ডলে। যেখানে নাটক বিশেষের বিশ্লেষণ ও শিল্পের সামাজিক ইতিহাস থেকে উঠে আসবে সাক্ষ্যপ্রমাণ—আর অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতায় ('বোগশয্যায়', 'আবোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা') বিচ্ছুরিত শিল্পচেতনা, তাঁর জীবনভর অভিজ্ঞতার নিষ্কাশিত সাবাৎসার, তাঁর আবিষ্কারের অমোঘ বিধান।

থিয়েটারে খুনজখমের অপরিহার্যতার সপক্ষে নাট্যকারের জেদি ঘোষণা থেকে তর্ক শুরু হলেও, আড্ডাব পবিমণ্ডলে তাঁর প্রাধান্য ক্রমে ক্রমেই কমে আসে, পরিচালকই মুখ্য হয়ে ওঠেন। নাট্যকাব ও পরিচালককে কেন্দ্র করেই মূল প্রশ্নগুলি আবর্তিত হয় : মূল নাটককে পরিচালক কেন এবং কত দূর পর্যন্ত বদলাতে পাবেন? বক্স-অফিসের দাবি বড়, না পরীক্ষানিরীক্ষার দায়? মঞ্চোপযোগিতা অর্থ কী? ভালো নাটকমাত্রেই কি সাহিত্য ও মঞ্চচেতনার যুগপৎ অবস্থান

থাকে? মঞ্চকৌশলকে আধিপত্য বিস্তার করতে দিলে নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কি? আঙ্গিক কী? অভিনয়ে আবেগের স্থান কতটা? জীবনকে যথাযথ তুলে ধরাই কি আর্ট? ইত্যাদি ইত্যাদি।

'কলকাতায় একটি আস্ত পেশাদার থিয়েটার চালাচ্ছেন' এই পরিচয়ে এই পরিচালক চরিত্রটিকে প্রথমে পরিচিত করা হলেও তাঁর মধ্যে ক্রমশই মিনার্ভা থিয়েটার চালনায় নিয়োজিত উৎপলবাবুকেই যেন চেনা যায়। ১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে (দ্র. 'ইন্যাক্ট' পত্রিকা, সংখ্যা ৬৮-৬৯, অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭২) আমি উৎপলবাবুকে প্রশ্ন করি : 'আপনার মিনার্ভা থিয়েটার পর্বে ব্যবসায়িক থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বে আপনাকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি, আপোশ-রফা করতে হয়নি?' উৎপলবাবু উত্তর দেন : 'অবশ্যই। আমরা ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' নাটকের উমানাথ ভট্টাচার্য কৃত রূপান্তর 'নীচের মহল'-এ কলকাতার পেশাদার থিয়েটারের ইতিহাসে ন্যূনতম টিকিট বিক্রির রেকর্ডে আমাদের স্থান দ্বিতীয়—শিশিরকুমারের 'সধবার একাদশী'র একটি অনুষ্ঠানে সাঁইত্রিশ টাকার টিকিট বিক্রির চেয়ে মাত্র কুড়ি টাকা বেশি! আমরা উপলব্ধি করি যে এইভাবে ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করে যাওয়া আমাদের পোষাবে না। আমরা বুঝতে পাবি যে, থিয়েটারের দৃশ্যবৈভবকে এমন একটা তুঙ্গে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে যেখানে থিয়েটারই তাব মায়ায় দর্শকদের অভিভূত করবে—আর সেই মায়ার আবেশের মধ্যেই আমাদের যা-কিছু বলবাব আছে তা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব।' আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করি : 'এই বিবেচনাতেই কি 'অঙ্গার'-এর আদি পরিকল্পনার আবো শান্ত, আরো সংবেদনগভীর পরিসমাপ্তি বদলে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্য আমদানি করা হয়? এই বিবেচনাতেই কি 'অঙ্গার'-এর গঠনচারিত্র্যই নির্ধারিত হয়ে যায়?' উৎপলবাবু উত্তরে বলেন, 'সম্পূর্ণত। সচেতনভাবে। ঠাণ্ডা মাথায়। তাছাড়াও আমাদের মনে আরেকটা বিবেচনা ছিল। এখানে একটা বিষয়ে যেন একটা মতৈক্য আছে যে জোরদার একটা পরিসমাপ্তি না ঘটলে যেন একটা নাটক যথেষ্ট প্রগতিশীল হয়ে ওঠে না, যদিও এংগেল্‌স্ থেকে স্তালিন ও মাও ৎসে-তুং পর্যন্ত তাবৎ মার্কসবাদী চিন্তকই বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে একরাশ পোস্টার ও স্লোগানের সমাবেশ ঘটালেই ভালো নাটক হয় না ; কারণ এই আধা-উপনিবেশবাদী সমাজব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় জনসাধাবণের এখনও যে আস্থা আছে তা চুরমার করে ভেঙে দেওয়াই নাট্যকারের দায়িত্ব। নাট্যকারকে দেখাতে হবে যে এই ব্যবস্থা সর্বৈব অন্যায়, তার অনিবার্য বিনাশের সম্ভাবনাও তাঁকে তুলে ধরতে হবে।' এই সাক্ষাৎকারে উৎপলবাবু স্বীকার করেন যে 'তবুও ওই জোরদার পরিসমাপ্তির ধারণাটাই বোধ হয় আমাদের মনে সর্বদাই কাজ করে চলেছিল। . . . ওই একই বিবেচনায় 'ফেরারি ফৌজ' ও 'কল্লোল'-এর পরিসমাপ্তিও আমাদের পালটাতে হয়।'

পেশাদারি থিয়েটারে নাটক 'জমাতে' হবে, আবার থিয়েটারের প্রগতিশীল আদর্শও অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই দ্বৈত তাড়নার দায়ই মিনার্ভা থিয়েটারের চালনায় নিয়োজিত উৎপল দত্ত ও 'চায়ের ধোঁয়ার' পরিচালকের মুখ্য দায়। তাই 'চায়ের ধোঁয়ার' পরিচালক বলেন : 'নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় এনে ফেলা আমার থিয়েটারে অসম্ভব। অথচ নাটকটাকে এমন বাঁধুনি, এমন চমক দিতে হবে যেন দর্শকের ভালো লাগে ; তারা যেন আমার

থিয়েটারকে বয়কট না করে। বিষয়বস্তু ব্যাপারে কোনো রকম আপোশ আমি করি না ; নাট্যকারের প্রগতিশীল বক্তব্যকে পুরোপুরি বজায় রাখা আমার স্বভাব ; কারণ আমি নিজে প্রগতিশীল মানুষ। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু যেন এমন রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে আসে, এমন আঙ্গিক নিয়ে মঞ্চে ওঠে যাতে দর্শক বুঝতে পারে ও খুশি হয়। অন্যথায় কী হবে? এই হবে, যে প্রচণ্ড রকমের বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়েও নাটক এমন দুর্বোধ্য রূপরীতিতে আত্মপ্রকাশ করবে যে কেউ বুঝতেই পারল না। বক্তব্যটা মাঠে মারা গেল। ফর্ম-এর পরীক্ষা কখনো দর্শককে বাদ দিয়ে হতে পারে না। দর্শকের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিস্মৃত হয়ে পরীক্ষা চালালে শুধু নিজের বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাবে, দর্শককে সঙ্গে নিয়ে এগুবার পথ রুদ্ধ হয়েই থাকবে। আমি কেমন বুদ্ধিমান তা দেখাবার জন্যে তো আর থিয়েটার খুলিনি মশাই। খুলেছি দর্শককে উন্নততর নাট্যরূপের সন্ধান দিতে। সেটা ক্রমে ক্রমে হয়।'

ওই 'ক্রমে ক্রমে' দর্শক তৈবি করে নেওয়ার সম্ভাবনায় ভরসা ও আস্থা মিনার্ভা থিয়েটার পর্বে এল টি জি গোষ্ঠীব ভাবাদর্শগত আধাবশিলা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পরিচালক বলেন : 'আমি যা করে থাকি, আগেই বলেছি, নির্লজ্জভাবেই বলেছি, সেটা বক্স অফিসেব মুখ চেয়ে। যা কবা উচিত, সেটা বৃহত্তর বিশ্বনাট্যেব পবিপ্রেক্ষিতে বাংলার জাতীয় থিয়েটারেব প্রশ্ন। আমি যা করি, সেটা থেকে সব সময়ে সমগ্র আমাকে খুঁজে পাবেন না। পেশাদার থিয়েটাবের সীমায় আমার সমস্ত চিন্তাজগৎকে কী করে পাবেন?'

একদিকে 'বৃহত্তর বিশ্বনাট্য', অন্যদিকে তাৎক্ষণিক দর্শকরুচির মান, একই সঙ্গে এই দুয়েরই প্রতি দায় পালন আদপেই সম্ভব কি? এই প্রশ্নেব উত্তর আজও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেব রূপ পরিগ্রহ করেনি। কিন্তু উৎপলবাবু যেভাবে এই প্রশ্নটিকে এক বিতর্কের কেন্দ্রে এনে দাঁড করান, তাতেই ধরা পডে তাঁর আজীবন প্রবন্ধচর্চার প্রস্থানবিন্দু। তাঁর থিয়েটারকর্মে তিনি যে পরীক্ষা করে গেছেন, প্রতি পদক্ষেপেই তিনি তা চিন্তার স্তরে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছেন—তাঁর থিয়েটারের মতোই তাঁব থিয়েটাব চিন্তাকেও তিনি 'দর্শককে বাদ দিয়ে' 'নিজের বৈদগ্ধ্য প্রকাশেব' জন্য ব্যবহার করতে চাননি। যে আধা-পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তিনি থিয়েটারে কাজ কবেছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংস্কৃতির যে স্থান ধার্য, তাতে থিয়েটারের মতো গণগামী ও প্রত্যক্ষ একটি শিল্পরূপ তাব যথার্থ ভূমিকা লাভ করতে পারে কেবলমাত্র পেশাদার থিয়েটাবেব মধ্যেই, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব যুক্তিপরম্পরাবই স্বতঃসিদ্ধান্ত। 'চায়ের ধোঁয়া' এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এক বৈপ্লবিক বা বিপ্লবমুখী থিয়েটারের সম্ভাবনার সন্ধান কবেছে।

বৃহত্তর বিশ্বনাট্যে নতুন যুগ ও বাংলা থিয়েটারের পুরোনো যুগের মধ্যে যে মৌল প্রভেদ, 'দৃশ্যসজ্জা' প্রবন্ধে তা চিহ্নিত করেছেন উৎপলবাবু : 'আমাদের আগের যুগে . . . ছিল একক অভিনয়ের গৌরবময় অধ্যায়। . . এই সেদিন পর্যন্ত অভিনেতাই ছিলেন থিয়েটারের মূল গায়েন। তাঁকে তুলে ধরাই ছিল দৃশ্যসজ্জার কাজ ; তাঁকে সুযোগ করে দিতেই নিয়োজিত ছিল আলোক ; তাঁর সঙ্গে সংগত করতেই ডাকা হত সংগতকারদের। অভিনেতার দৌরাত্ম্যে অন্য তিনটি আঙ্গিক বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিনেতার স্বেচ্ছাচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে

বাংলা নাট্যসজ্জার ক্রমবিবর্তনকে।'

'দৃশ্যসজ্জা' প্রবন্ধে মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে উৎপলবাবু বাংলা থিয়েটারে দৃশ্যবিন্যাসের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছেন, তারই মধ্যে 'আঁকা-সীন' ও 'ঘূর্ণায়মান মঞ্চের' সীমাবদ্ধতা ও শৈল্পিক অসার্থকতা ভেঙে আধুনিক দৃশ্যসজ্জার উন্মেষের কথা বলতে গিয়ে তিনি যেমন বহুরূপী ও লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ-এর 'পথিকৃৎ' ভূমিকাব কথা বলেন, তেমনই আবার 'নবান্ন' প্রযোজনার চটের পর্দা ব্যবহারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ('ওই নোংরা সীনের জগতের তুলনায় এ যে ঢের বেশি শিল্পসম্মত তাতে আব সন্দেহ কী?') স্বীকার কবেও দৃশ্যসজ্জা বিষয়ে ওই পর্বের গণনাট্য সংঘের চিন্তার সমালোচনা করেছেন : 'মঞ্চসজ্জা অনাদৃত ছিল, এখন একেবারেই পরিত্যক্ত হল। আগে অভিনেতা সর্বপ্রধান ছিলেন, এখন অভিনেতা একমাত্র গায়েন হয়ে উঠলেন। . . আমি বলব মহান গণনাট্য সংঘ এ ব্যাপাবে ভুল কবেছেন। পুরোনো রঙ্গমঞ্চকে মুক্ত করতে গিয়ে সে-মঞ্চের শিকলে নিজেরাই বাঁধা পড়েছেন। না, এ পথে বাংলাব নাট্যশালা সংস্কার হবে না। দৃশ্যসজ্জাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পাবে না। বরং তাকে উন্নত, শক্তিশালী করে অভিনেতার সমান পর্যায়ে তুলে আনতে হবে। মঞ্চেব ঠাট বজায় রেখেই মঞ্চকে এগিয়ে নিতে হবে, মঞ্চকে অস্বীকার করে নয়।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন'-র দৃশ্যসজ্জা ভেবেছিলেন একটা কচ্ছপের খোলের আদলে অর্ধচন্দ্রাকার—তারই মধ্যে ছোটো ছোটো খুপবি। 'নবান্ন'-র সেই আদি প্রযোজনায় এমন কেউ ছিলেন না যিনি সেই কল্পনার মাহাত্ম্য যথার্থই উপলব্ধি করে তাকে দৃশ্যবিন্যাসে রূপায়িত করতে পাবেন। দৃশ্যবিন্যাসে মঞ্চের পবিসর ও ফ্রেম-এর চতুঃসীমাকে পট রূপে গ্রহণ করে তার মধ্যে ছবির ব্যঞ্জনা নিযে এসে অভিনয়ের যথার্থ ভূমি, তথা প্রস্থানবিন্দু বচনার যে কারিগরি আধুনিক মঞ্চসজ্জার অপরিহার্য শর্ত তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ বাংলা থিয়েটাবে প্রথম ঘটে খালেদ চৌধুরির মঞ্চপরিকল্পনায় (ও তাবই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত অঙ্গসজ্জা বা পোশাক পরিকল্পনায়)—বহুরূপীব 'রক্তকরবী' প্রযোজনায়। 'নবান্ন' প্রযোজনাকালে বা গণনাট্য সংঘেব সেই সুবর্ণযুগে মঞ্চসজ্জার আধুনিক বোধেব প্রকাশ ঘটেনি—তাব জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে খালেদ চৌধুরির আবির্ভাব পর্যন্ত।

আলোকসম্পাতেও তাপস সেনেব অনুরূপ ভূমিকা স্বীকার করেও উৎপলবাবু (নাট্যকারের জবানিতে) প্রশ্ন তোলেন : 'কিন্তু তাপসবাবু পুরোনো আলোকসম্পাতকে ভেঙে কী গড়ছেন? নিছক বাস্তবতা! যেমন 'অঙ্গার'-এর জল বা 'ফেরারি ফৌজ'-এর আগুন! বাস্তবতা কি শিল্প? বাস্তবানুকরণই কি থিয়েটারের উদ্দেশ্য?' পরিচালকের জবানিতে উৎপলবাবু নিজেই উত্তর দেন: 'নিশ্চয়ই না। সত্যিকারের থিয়েটারে বাস্তবতার স্থান নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই বাস্তবতাই প্রয়োজন। . . বাস্তবোত্তর শিল্পে নিয়ে যেতে হলে আগে নিছক বাস্তবতাই কিছুদিন গড়তে হবে। যে শিশু দাঁড়াতে শেখেনি তাকে গোড়াতেই একশো মিটাব দৌড়ে নাম লেখাতে দেওয়া কি উচিত? তাপসবাবুরা বাংলা নাট্যশালার আঙ্গিককে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতের রেকর্ডভাঙা দৌড়ের গোড়াপত্তন করছেন।'

উৎপলবাবু যা বলেননি, অথচ ইঙ্গিত করেছেন তা হল এই যে, 'বক্তকরবী'-তে রবীন্দ্রনাথ

ও শম্ভু মিত্রের দ্বৈত প্রেরণায় খালেদ চৌধুরি মঞ্চবিন্যাসে বাস্তবোত্তর ব্যঞ্জনার যে মাত্রা অবলীলায় আয়ত্ত করেছিলেন, তাপসবাবুর আলোকসম্পাতে তা আয়ত্ত হয়নি। উৎপলবাবুর এই রচনার ত্রিশ বছর পরেও বলতে হবে, আলোকসম্পাত বাংলা থিয়েটারে এখনও একশো মিটার দৌড়েও ছুটতে শুরু করেনি। তার চেয়ে বড়ো পাল্লার দৌড়ের কথা তো দূরস্থান! থিয়েটারের বাইরে বরং কিছু কিছু কাজে দেখেছি (তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রঘুনাথ গোস্বামীর অসামান্য দৃশ্যপরিকল্পনায় বাটার জুতোর একটি ফ্যাশন শো ও ব্ল্যাক লাইটিং সহযোগে 'এ সাইকেডেলিক এক্‌স্‌পীরিয়ন্‌স্‌') তাপসবাবুর বাস্তবমুক্ত শুদ্ধ ডিজাইন-বিলাস, কিন্তু থিয়েটারে তাঁর কাজ বাস্তববাদের চৌহদ্দি পেরিয়ে গেছে, এমনটি একবারও আমি অন্তত দেখিনি। আসলে থিয়েটারে সেই ভাবনা বা দাবিও বোধ হয় তেমনভাবে ওঠেনি।

তবে তাপসবাবুর কৃতিত্বের তাৎপর্য উৎপলবাবুর চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ তুলে ধরেননি : 'তাপসবাবুর আলো বাস্তবে নিতান্তই দৃশ্যমান করে তোলার বাহনের চেয়ে অনেক বড়ো কিছু। মঞ্চে যা-কিছু বর্তমান তার রূপকে এই আলো এমনভাবেই প্রভাবিত করে যাতে তা মঞ্চে সৃষ্ট চিত্রের বিন্যাসে এক নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।' মঞ্চবিন্যাস ও আলোর মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক তারই উপর কোনো নাট্যপ্রযোজনায় দুয়েরই চরিত্র নির্ভর করে। 'আধুনিক থিয়েটারের আলো সর্বসময়ে নাটকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা কয়। এ-ধরনের আলোর জন্যে স্বভাবতই পুরোনো আঁকা সীন একেবারে অনুপযুক্ত। এখন দরকার ত্রিমাত্রিক সজ্জা, আস্ত ত্রিমাত্রিক জিনিস যার উপরে আলো খেলতে পারে, বা যা আলো নিতে পারে। দরকার আস্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বিশিষ্ট সলিড বেদী, সিঁড়ি ; দরকার কালো বা ধূসর পশ্চাৎপট যা উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করবে না, অর্থাৎ আলোক-পরিকল্পনাকে বিচ্ছুরিত আলোয় ছত্রভঙ্গ করবে না।'

ওই সময়ে তাপসবাবুব আলোক-পরিকল্পনার আরেকটি যে-সম্পদ, প্রতিদিনের 'ফেলে-দেওয়া জিনিসের' সমাহারে প্রবল উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তির গুণে এক একটা নাট্যমুহূর্তকে আলোকিত করার যে সৃষ্টিধর্মী কারিগরি, তার প্রতিও উৎপলবাবু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : তিনি 'একটি ভাঙা মোড়া দিয়ে 'নীচের মহল'-এ মোটরগাড়ি চালিয়েছিলেন। কতকগুলো বিয়েবাড়ির রানিং লাইট, কয়েকটা পুরোনো বিস্কিটের টিন, কিছু ছেঁড়া কার্ডবোর্ড—এইসব হচ্ছে তাঁর আসল উপকরণ। এসব মিলিয়ে যা হয় তা দেখে আমার বিশ্বাস হয়—ইনি বা এঁর উত্তরসূরীরা নিয়ে যাবেন থিয়েটারকে সেই বাস্তবোত্তর স্বপ্নজগতে যেখানে গড়ে উঠবে থিয়েটারের ভাষা।'

'অঙ্গার'-এ এই উদ্‌ভাবনী কল্পনার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তাপসবাবু নিজেই লিখেছেন : 'অন্ধকারকে দেখাতে হবে, অথচ আলো দিয়েই দেখাতে হবে। অন্ধকারের এই রূপ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এমন আলোর উপকরণের প্রয়োজন হল যা কোনো-একটি দলের পক্ষে সেই সময়ে পাওয়া অসম্ভব। . . . একটা নিষ্ফল আক্রোশে হতাশায় যখন এই দৃশ্যের মঞ্চরূপায়ণ আলো ও সেট-এ অসম্ভব বলে ধরে নিতে প্রায় বাধ্য হয়েছি, তখন শেষ চেষ্টা হিশেবে মানসিক যুদ্ধক্ষেত্রে চ্যালেন্‌জ্‌ জানালাম আমার দেবতাকে, আমার শত্রুকে, আমার অনুপ্রেরণাকে। চ্যালেন্‌জ্‌ জানালাম আলোকেই। প্রশ্ন করলাম : আলো কী? কী তার বৈশিষ্ট্য? ইমপোর্টেড স্টাফ্‌ দিয়ে কী হয়? এবং সেই উপকরণ হাতে না থাকলে কি শেষ পর্যন্ত দেশের থিয়েটারের সাংগঠনিক

দুর্বলতা, সরকারি ঔদাসীন্য, অর্থনৈতিক অসহায়তা ও শিল্পীর অক্ষমতাকে দায়ী করে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার আয়োজনই করতে হবে? শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। যা হয়েছে আপনারা দেখেছেন। এবং পাঁচ-ছ হাজার টাকার জায়গায় খরচ হয়েছিল উনত্রিশ টাকা আট আনা। . . . জীবনে না-থাকা না-পাওয়ার প্রতিবন্ধকতায় প্রতিকূলতায় যেমন মানুষকে ভাবায়, শেখায়, থিয়েটারও তেমনই ভাবায়, শেখায়, নিত্য নতুনতর পথ দেখায়—'অঙ্গার'-এর উদ্‌বোধনের তিন দিন আগে যেমন দেখিয়েছিল আমাদের। কতকগুলো লজেন্‌সের বিস্কুটের ভাঙা পুরোনো টিন এবং সাবেক মিনার্ভা থিয়েটারের মরচে-ধরা এগ্‌জিট নির্দেশক টিনের খোলের সাহায্যে অসংখ্য মিরর-স্পট, ফ্লোট-স্পট এবং অপটিকাল প্রোজেকটরের কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কীরকম কাজ চলেছিল, তার প্রমাণ শেষ দৃশ্যের জলোচ্ছ্বাসে টিনের কৌটোয় পেরেকের ফুটো দিয়ে প্রতিফলিত আলো অ্যালকাথীনের চাদরে জলোচ্ছ্বাসে বাংলা তথা ভারতীয় 'সৎ' থিয়েটার-শিল্পের সম্ভাবনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ থেকেই বোঝা যায়।' ['থিয়েটারে নতুন আলো', 'পরিচয়', পৌষ ১৩৭২/জানুয়ারি ১৯৬৬]।

'সংগীত ও অভিনয়' প্রবন্ধে উৎপলবাবু 'নাট্যশালার আবহ সংগীতের' চারিত্র্য নির্দেশ করতে গিয়ে 'পাশ্চাত্য হার্মোনির থিয়োরির' 'নির্দেশ' মানেন : 'কারণ হার্মোনির ব্যবহারে শব্দসমষ্টির নানা বৈচিত্র্য আনা যায় ; মিঠে-মধুরের মায়া কাটানো যায় ; প্রয়োজনমতো সংগীতকে নানা পর্দায় নানা কম্বিনেশনে দৌড় করানো যায়। আসল কথা হচ্ছে, রাগসংগীতের কঠোর নিয়ম আমরা গানের আসরে মানব, থিয়েটারে নয়।' 'নাট্যশালার আবহসংগীতের' দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন রবিশঙ্করের পরিকল্পনায় 'ফেরারি ফৌজ'-এর আবহসংগীতে যোগ-নায়কি কানাড়ার ব্যবহার, 'অথচ বারবার সব নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউন্টারপয়েন্ট গর্জন করে উঠেছে, যোগ রাগ হঠাৎ মালকোষের দিকে ছুট দিয়েছে, নানা যন্ত্রে নির্ঘোষ হঠাৎ মূল সুরটিকে বেছে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে, 'ফেরারি ফৌজ'-এর উদ্দাম বিপ্লবীদের জীবন এইরকমই হয়। সেই বাঁধনছেড়া জীবনকে প্রকৃত রূপই দিয়েছেন রবিশঙ্কর। 'অঙ্গার'-এ জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্যে পুরো অর্কেস্ট্রার স্থান দখল করেছে একটি সেতারের ঝালা—সেটিকে তখন যথার্থ জলের তোড় মনে হয়েছে বলেই তা সার্থক। আবার প্রথম দৃশ্যের শেষে সনাতনের 'জান বাঁচাও' চিৎকার থেকে ধরে নিয়ে যে সংগীতাংশটি, তা খাঁটি ইয়োরোপীয় রীতিতে সৃষ্ট ; কিন্তু নাটকে ওই মুহূর্তটিকে অকস্মাৎ বিরাট বৃহৎ করে তুলেছে বলে ওটিও সার্থক।'

বিলিতি অভিনেতা-মালিকদের পরম্পরা আশ্রয় করে বাংলায় যে পেশাদারি থিয়েটারের পত্তন হয়েছিল, যে-থিয়েটার প্রায় একশো বছর বাংলায় থিয়েটারের একমাত্র উপমান হয়ে থেকেছে, তাতে থিয়েটারের চারটি আঙ্গিকের মধ্যে অভিনয়ই—বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, একক অভিনেতার (ও কখনও কখনও তাঁর পাশে একটু পিছিয়ে বা এক ধাপ নিচে কোনো অভিনেত্রীরও) অভিনয়—স্বরাট হয়ে উঠেছিল। তার জায়গায় নবনাট্য আন্দোলনের 'নূতন অভিনয়, দলগত অভিনয়'—'ঠাণ্ডা মাথায় নিরুত্তাপ চিত্তে' মঞ্চে নেমে 'প্রতি মুহূর্তে সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে আদানপ্রদানের' মধ্য দিয়ে 'যেখানে বৃহত্তর কম্‌পোজিশনে নিজের স্থান নেওয়ার প্রশ্ন সেখানে ওই আবেগই হচ্ছে এনিমি নাম্বার ওয়ান। নবনাট্য আন্দোলনে তাই

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত অভিনেতা বাহাদুবেব ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে ; পরিচালকই এখানে সম্রাট। তাঁর প্রজা হচ্ছে অভিনেতা। অভিনয় চারটি আঙ্গিকের একটি মাত্র।'

'চায়ের ধোঁয়ার' শেষে উৎপলবাবু নবনাট্যের দুটি লক্ষ্য নির্দেশ করেন ; একটি এখনই অনুসরণ করার : 'এমনভাবে অভিনেতাদের নড়াচড়া সম্ভব যা হয়ে উঠবে কথারই চিত্ররূপ ; এমনভাবে দৃশ্যসজ্জা ও আলো সাজানো সম্ভব যা কথা আর সংগীতকেই প্রতিফলিত কববে চোখের উপর। আবার কথা আব সংগীতকেও এমনভাবে সাজানো যায় যা ধ্বনিত কববে দৃশ্যপটের সুরটাকে।' এই 'মিলনের' লক্ষ্যসাধনে 'অর্ধশিক্ষিত স্ফীতমস্তিষ্ক অভিনেতার' দম্ভের দমন ও 'সামগ্রিক প্রযোজনার সামনে সম্পূর্ণ নতিস্বীকারেব' দায়গ্রহণই নবনাট্যের প্রথম ও আশু লক্ষ্য। দ্বিতীয়টি তথাকথিত বাস্তবতা পেরিয়ে বাস্তবোত্তরে পৌঁছোবার লক্ষ্য। তবে সেই লক্ষ্যটিকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে পরিচালকের জবানিতে উৎপলবাবু বলেন . 'ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন আমার দর্শকও বাস্তবোত্তরকে চাইবে। সেই দিনই আমি বাস্তবোত্তরের দিকে পা বাড়াব। তার এক মুহূর্ত আগে নয়।'

১৯৭১-এ উৎপলবাবুর প্রবন্ধের পবিমণ্ডলে যখন জপেনদা নামক চরিত্রটির আবির্ভাব ঘটে, ততদিনে মিনার্ভা থিয়েটারে 'জনপ্রিয়' বা জনসমাদৃত পেশাদারি থিয়েটারের দর্শকদেরই ক্রমে ক্রমে আধুনিক থিয়েটারের অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত ও সংবেদী করে তোলার প্রয়াস নানা চাপে ধ্বসে পড়েছে। এল টি জি পর্ব অবসিত, এবার পীপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল্ থিয়েটাবের পালা। বাঁধা থিয়েটারের বাইরে আরেক বকম অনিশ্চয়তায় পি এল্ টি-র বাঁচবার লড়াই। 'চাযের ধোঁয়ার' পরিচালকের অটল আত্মবিশ্বাস তাঁর প্রকল্পটিব ব্যর্থতায যে ধাক্কা খেয়েছে, তাতে আর তাঁর পক্ষে এসে নবনাট্যের সপক্ষে সওয়াল জবাবের সুযোগ নেই। এই ব্যর্থতার তিক্ততাই এই খেপাটে জপেনদাকে সৃষ্টি করে। জপেনদার বা জপেনদাকে অবলম্বন করে উৎপলবাবুর এই নতুন নাট্যবীক্ষা থিয়েটারের নিজস্ব পরম্পরা বা ইতিহাস থেকে খানিকটা সরে এসেই ঔপনিবেশিক ভারতের শেষ পর্বের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষপাদ থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নকশালবাদী আন্দোলনের অভিঘাত ও সি পি এম-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারেব শাসনের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটারের দায় বা ভূমিকা নির্ধারণে প্রয়াসী হয়। রাজনীতি এবার উৎপলবাবুব নাট্যচিন্তার কেন্দ্রে এসে পড়েছে।

মনে রাখতে হবে, নকশালবাদী আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও অতি অল্পকালের মধ্যেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার উৎপলবাবুকে যে-অবস্থানে তখন এনে দাঁড় করিয়েছে তাতে স্বপরিচয়ে সরাসরি কোনো-কিছু বলতে গেলেই নানা দিক থেকেই ইট-পাটকেল এসে পড়তে পারে। জপেনদাই কেবল অনেক-কিছু বলে পার পেয়ে যেতে পারেন। তবে যা-কিছু জপেনদা বলেন, তিনি বলেন এমন একটা রাগত জঙ্গি আক্রমণাত্মক স্বরে যে প্রতিবাদী কণ্ঠকে তা অবলীলায় স্তব্ধ করে দেয়। জপেনদার আক্রমণের লক্ষ্যগুলির মধ্যে অন্যতম . (১) বামপন্থী ভাবধারা ও আবেগে পুষ্ট নাটকে বিপ্লবী চেতনাব উপস্থাপনায় মানবিক বোধ বা দৌর্বল্যের অনুপস্থিতি, ফলে স্বভাবতই তার মিথ্যা ও অবিশ্বাস্য রূপারোপ ; (২) নকশালবাদী আন্দোলনের রবীন্দ্রবিরোধিতা তথা ঐতিহ্যবিরোধিতা ; (৩) তথাকথিত

বামপন্থী নাটকে 'সমষ্টির' গুরুত্বের নামে 'বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তিত্বহীন অবয়বহীন একপাল লোকের' দাপট। জপেনদার মধ্যে এমনই একটা বাড়াবাড়ির মাত্রা আছে, যুক্তিকে এমন একটা চরমে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে যে তাঁকে উৎপলবাবুর কণ্ঠস্বর বলে ধরে নেওয়া যায় না। আবার জপেনদার জবানিতে উৎপলবাবু শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তরুণ নকশালবাদী বিপ্লবীদের : 'রাজনীতির বিচারে ওই ছেলেগুলো ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু গণনাট্যের বিচারে ওরাই নায়ক। দেখ, পার্লামেন্টের সদস্যকে নিয়ে নাটক হয না, বা জনসভায় যাঁরা যুক্তিগ্রাহ্য বক্তিমে করেন তাঁদের নিয়ে গান বাঁধা যায় না। নাটক সৃষ্টি হয় সশস্ত্র বিদ্রোহীর প্রতি পদক্ষেপে। এটা আমি মানি, তোদের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিই সঠিক। কিন্তু সে রাজনীতি যদি সত্যই প্রচার করতে চাস তবে ওই ভ্রান্ত বেপরোয়া ছেলেগুলোর জবানিতে কর, সূর্য সেনের আব সুভাষ বোসের জবানিতে কর—লোকে শুনবে।'

বাস্তব ও বাস্তবোত্তরেব প্রশ্নই এখানে ফিরে এসেছে অন্য মাত্রা নিয়ে। একটা বিশেষ বাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে নাটক একটি মুহূর্তের সঠিক রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সিদ্ধান্তটি বাঙ্ময় করে তুলে খুব একটা কিছু কাজের কাজ করতে পারে না। বরং কল্পনায় তাকে খানিকটা পেরিয়ে গিয়ে, এমনকী বিকৃত করেও, বা অতীত ইতিহাসের মানক দৃষ্টান্তও পালটিয়ে নিয়ে নাট্যকাব তাঁর রাজনৈতিক ও শৈল্পিক লক্ষ্য সাধন করতে পারেন। যে বিশেষ বৈপ্লবিক আবেগ তিনি সৃষ্টি করতে চান তা যদি কোনো যুক্তিসিদ্ধ রাজনৈতিক মূল্যায়ন বা নির্ভেজাল ঐতিহাসিক সত্যেব উপস্থাপন মাত্রে সৃষ্টি না হয়, তবে নাট্যকার বা নির্দেশক নিশ্চয়ই অন্য পথ গ্রহণ করতে পারেন · 'বাস্তবের লড়াইটাকে দেখালেই নাটক হল না। বাস্তব প্লাস আরো অনেক কিছু তবে ইকোয়াল টু নাটক। লেনিন পিসারেভকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, বিপ্লবীরা স্বপ্ন দেখতে শেখো। বাস্তবেব সঙ্গে সেই স্বপ্নের হরগৌরী মিলন ব্যতীত নাটক হয় না, হয় প্যামফ্লেট। গোর্কির বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এর তত্ত্বটা পড়েছিস? যাহা বাস্তবে ঘটে কেবল তাহাই নাটকের বিষয় নহে, যাহা ঘটিবে, ঘটা উচিত তাহাও বাস্তব, সুতরাং তাহাও নাটকের বিষয়। সম্প্রসারণ—গোর্কি এরে বলেন বাস্তবের সম্প্রসারণ। এই সম্প্রসারিত বাস্তবই বিপ্লবী সাহিত্যের ভিত্তি।'

উৎপলবাবুর বিচারে গোর্কির বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌ যদি বাস্তবোত্তরের এক রূপ হয়, তবে তাবই আরেক রূপ রবীন্দ্রনাথের নাটকে 'বিপ্লবের কবিতা'—'কাব্যময় নাটকে বহু অভিজ্ঞতা ঘন হযে জমাট বেঁধে আসে। কাব্যেব বৈশিষ্ট্যই তাই। নানা ধ্বনি, ছন্দ, উপমা, অলংকারে কবিতা জীবনের সারাংশকে স্বল্প পরিসরে বাঁধে। বলার ক্ষুদ্র পরিসরে জেগে ওঠে না-বলার বৃহৎ জগৎ।'

'বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদের' বিরুদ্ধে গোর্কির বিপ্লবী রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্রেখ্‌ট্‌-এর এপিক থিয়েটারের আদর্শকে তুলে ধরে উৎপলবাবুর দাবি : 'বাংলা রাজনৈতিক নাটকও বেঁটেখাটো চরিত্র, খাটো-খাটো কেরানির নিস্তরঙ্গ জীবনকে যথাযথ প্রতিফলিত করতে অস্বীকার করেছে।' তাঁর দৃষ্টান্ত 'কল্লোল' : 'বিপ্লবী বাস্তবতাবাদ জীবনের ফোটোগ্রাফ উপস্থিত করে না, জীবনকে অনুকরণ করে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক। সে জীবনকে ধরে তার গতির মধ্যে, তার অনিবার্য ভবিষ্যৎ-সহ! 'কল্লোল' নাটকে খাইবার জাহাজের নাবিকরা কেন আত্মসমর্পণ করে না [বাস্তবে নাকি করেছিল], এ প্রশ্ন তখন তুলেছিলেন কেউ কেউ। তখন

তাঁদের এই উত্তর দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম—কারণ আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে পোটেমকিনের নাবিকরা আত্মসমর্পণ করে না [যদিও বাস্তবে করেছিল]।'

বাস্তব ও বাস্তবোত্তরের মধ্যে একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্র রয়ে গেছে বাস্তবের মধ্যে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিরোধের উদ্‌ঘাটনে। বাস্তবের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তারই টানাপোড়েনে, অবশ্যম্ভাবী সংঘাতে বাস্তবোত্তর সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করে। তাই 'গণনাট্য সংঘস্য নবনাটকম্'কে ব্যঙ্গ করে তিনি দাবি করেন বিপ্লবীর মানবিকতা, 'ত্রিশঙ্কুর দোদুল্যমানতা' 'নীতিগত সংশয়' ইত্যাদির প্রকাশে নাটকের চরিত্রেরা হোক 'দর্শকদের আত্মোপলব্ধির দর্পণ।' 'সর্বহারা নায়ক হবে আজকের হ্যামলেট। সে একাধারে জটিল ও সরল। বহু ব্যক্তিগত দুর্বলতায় সে জটিল, আর শ্রেণীশত্রুর প্রতি আপোশহীন ঘৃণায় সে সরল, ঋজু, নিঃসংশয়। . তীব্র ঘৃণা আর বিশাল ভালোবাসা একই সঙ্গে কী করে বিপ্লবী চেতনায় বাস কবে আব পবস্পরের ওপর প্রভাব ছড়ায়, এটা বুঝতে হবে। তবে সৃষ্টি হবে সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ পাশের ঘরের সেই লোকটি যে হঠাৎ হয়ে ওঠে মহাবীর যোদ্ধা, শহিদ, নবযুগের দৌবাবিক।' ওই মানবিক, 'বাস্তব' পরিচয় ছাডা কোনো নায়ক বা বিপ্লবী চরিত্র অগম্যই থেকে যান, দর্শক তাঁর জীবন বা কর্ম থেকে কোনো তাৎপর্য আবিষ্কার করেন না।

নকশালবাদী তরুণদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, আবার তাঁদের রবীন্দ্রবিরোধিতার কঠোর সমালোচনা, 'ব্যাপকতম সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট'-এর পক্ষাবলম্বন ('এখন জাতির আত্মবিকাশেব লড়াই, এ লড়াইয়ে শম্ভু-বিজন থাকবেন না তো কি বাক্যবীরেবা থাকবেন?'), আবার পার্টির প্রতি আনুগত্যের দাবি ('বাজনৈতিক নাটককে এরকম নেতিবাদ থেকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হচ্ছে মার্কসবাদে দীক্ষা, পার্টির নিকটে থাকা, প্রতি মুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান স্তর ও শক্তিবিন্যাস অধ্যয়ন করা, কোন রাজনীতিটা এই মুহূর্তে জনগণের মধ্যে ছডিয়ে দেওয়া প্রয়োজন সেটা বোঝা। সেটা কোনো নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, এলিয়েনেটেড নাট্যকারের পক্ষে সম্ভবই না, যদি না সে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়।'), শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্যাবলম্বন আবার ধর্মকে আক্রমণ করার প্রশ্নে সতর্কতা, এই বিভিন্ন অবস্থানগুলির মধ্যে অনেক সময়ই যুক্তি ও তথ্যের ভিত পোক্ত হতে পারে না, অসংগতি ও অন্তর্বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে, জপেনদার বাক্যবীর্যই প্রবল হয়ে ওঠে। তবে একটা সময় যখন বাদল সরকার ও তাঁর অনুপ্রেরণায় ও নেতৃত্বে চালিত অঙ্গন ও মাঠের থিয়েটারের আন্দোলনকে শেখনার ও জুলিয়ান বেক-জুডিথ মালিনার থিয়েটারের সঙ্গে একেবারেই অভিন্ন কল্পনা করে নিয়ে জপেনদা তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু স্থির করে নেন বা শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ম্যাক্সম্যুলার ভবনে টানক্রেড ডর্স্ট বা ফ্রান্ৎস্ ৎসাভের ক্রোয়েট্স্-এর নাটকের প্রযোজনাকে আক্রমণ করেন, তখন শোনা কথার উপর রঙ চড়িয়ে ছায়ার সঙ্গে লড়াই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর যাবতীয় উদ্‌গার। প্রাতিষ্ঠানিক বামশক্তি বিকল্প বামপন্থী চিন্তা ও সমাবেশের যাবতীয় সম্ভাবনাকে বিনাশ করতে খেপে উঠে বা স্বপক্ষীয়দের দোষত্রুটিদুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যুক্ত ফ্রন্ট-এর আদর্শকে বারবারই ক্ষুণ্ণ করেছে, বিপর্যস্ত করেছে ; এই পরিস্থিতিতে অসত্যই তার অস্ত্র হয়েছে, মতাদর্শ বা বিচার লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। সত্তরের দশকে তৃতীয় থিয়েটার প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক থিয়েটারের বিকল্প এক রাজনৈতিক থিয়েটারের যে সম্ভাবনা তুলে ধরে (ও আজও

প্রচারবাহন, বাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও ধরে রেখেছে), তাকে প্রতিপক্ষ ধরে উৎপলবাবুর তীব্র আক্রমণে একটা প্রগতিশীল ধারা থেকে উৎপলবাবু যেন নিজেরই এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা ও অজ্ঞানতা স্পষ্ট করেন। যত দূর জানি, বাদলবাবু, শতাব্দী ও তাঁদের সহযোগী গোষ্ঠীগুলির কোনো প্রযোজনাই উৎপলবাবু দেখেননি। তাই স্বভাবতই সুদূর মার্কিন দেশে কী ঘটছে (তাও যথেষ্ট রঙচড়ানো রগরগে সেই বিবরণ), বাদলবাবু নিশ্চয়ই তা-ই হুবহু অনুকরণ করছেন ধরে নিয়ে জপেনদার বিষোদ্গার ও কুৎসা। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে 'খাটমাটক্রিং' পর্যন্ত বাদল সরকার তাঁর নাটকে ও সত্তরের দশক থেকে তাঁর অঙ্গন মঞ্চ ও 'তৃতীয় থিয়েটার' পরিক্রমায় থিয়েটারে যে সমাজবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, তার নিষ্ঠা ও গভীরতায় আমি এমনই শ্রদ্ধাবান যে জপেনদার আক্রমণ অনেক সময়ই রুচিহীন লাগে। 'ভাষা ও কৃষ্টির শিকড়টা দৃঢ় করার' জপেনি নির্দেশ তারপর কেমন যেন অসার লাগে। বাজেনের মতো বলতে ইচ্ছে হয়, 'মস্তানদের ভাষা মকশো করছিস কেন? শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বল।'

জপেনদার পলেমিক্স্ বা চরমপন্থী বাগ্‌বিস্তারের বাইরেই সমকালীন বাংলা থিয়েটারে চিন্তা ও শিক্ষার একটা শক্ত ভিত তৈরি করার দায়বোধেই 'স্তানিসলাভ্স্কি থেকে ব্রেখ্ট্' ও 'শেক্স্পিয়ার ও ব্রেখ্ট্'-এর প্রকল্পনা। 'স্তানিস্লাভ্স্কির পথ' প্রবন্ধে কলকাতার অভিনেতাদের দোষের মধ্যে যেটি উৎপলবাবু বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন, 'যেটি পর্বত প্রমাণ হয়ে অনেক সময়ে শিল্পকর্মের পথ রোধ করে দাঁড়ায় সেটা হল পাতিবুর্জোয়ার দম্ভ। . . বহু দলের ভাঙনের জন্য দায়ী দম্ভজনিত অসূয়া ও বিদ্বেষ।' 'জপেন দা জপেন যা'-র রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চালচিত্রের প্রেক্ষিতেই তাঁর সিদ্ধান্ত, 'জীবন আজ যেরকম জটিল, শ্রেণীসংগ্রাম আজ যেমন ব্যাপক ও দুর্বোধ্য, তাতে মাত্র নাটক পড়ে বা বিশুদ্ধ অভিনয়শিক্ষার মাধ্যমে কোনো অভিনেতাই চরিত্র-বিশ্লেষণ করে উঠতে পারেন না।' অভিনেতার যে দম্ভ ('দাম্ভিক মানুষ অভিনেতাই হতে পারে না। অভিনেতার প্রাকশর্ত হচ্ছে নিজ সত্তা বিলোপ। নিজেকে ভুলে নাটকের চরিত্র হতে হবে। দাম্ভিক মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে না। যত রিহার্সালই দিক না কেন, নিজের অজান্তে সে নিজেকে চরিত্রটির ওপর আরোপ করবে, নিজের ওপর চরিত্র আরোপ করবে না।') বাংলা থিয়েটারে অভিনয়কে (মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে) বড়োই সেকেলে করে রেখেছে, তাকেই দমিত করে অভিনয়ে বুদ্ধি, মনন, বিচার, যথার্থ প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরি করতেই উৎপলবাবু স্তানিস্লাভ্স্কি, ব্রেখ্ট্ ও শেক্স্পিয়রকে জড়িয়ে নিয়ে এক প্রাথমিক পাঠক্রম তৈরি করে নেন—এই পাঠক্রমে 'ব্রেখ্ট্ স্তানিস্লাভ্স্কির বিরুদ্ধবাদী নন, তাঁর পরিপূরক মাত্র।' স্বভাবতই এই পাঠক্রমের পাঠশালা বাংলা সমকালীন অপেশাদার থিয়েটারের মহলাঘর বা মঞ্চেই—যেখানে থাকে 'নেপথ্যের গণ্ডগোল এবং সাজঘরের বাকবিতণ্ডা, থাকে মঞ্চসজ্জা পরিবর্তনে বিশৃঙ্খলা, শোনা যায় লোহার ব্রেস পড়ে যাওয়ার মেঘমন্দ্র শব্দ।' আর তারই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'স্তানিস্লাভ্স্কির পথে' 'মনোযোগ-বৃত্ত' সৃষ্টি করার পদ্ধতি। 'সমাজ-পরিবর্তনের নিয়মগুলি বোঝাতে . . . ব্রেখ্টের কৌশলের' সর্বশ্রেষ্ঠতা মেনেও উৎপলবাবু 'উত্তেজিত' করা, 'শ্রেণীঘৃণা জাগানো' ও 'দর্শকের অবচেতনে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে

অনাস্থা ঢুকিয়ে দেওয়ার' কাজে 'বাস্তববাদী পদ্ধতিকে' ব্রেখ্টের মতো 'নাকচ' করে দিতে প্রস্তুত নন। দেশীয় বা স্থানীয় দায়ের এই পরিপ্রেক্ষিত, থিয়েটারের অন্তর্গত ও থিয়েটারেব পারিপার্শ্বিকগত দায়বোধেই এই পাঠক্রমের প্রতিষ্ঠা বলেই ব্রেখ্টের এপিক পদ্ধতির সঙ্গে মহাভারত ('মহাভারতের সবটাই এপিক, ঘটনাবলি প্রত্যক্ষত উপস্থাপিত নয়, কারুর মুখে বর্ণিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা সঞ্জয় উবাচ'), বাংলাব লোককবিদের ভণিতা বা নিজ নাম উচ্চারণ ('সেটা এলিয়েনেশন, কাব্যমধ্যে ইচ্ছাকৃত সুর কেটে দেওয়া, শ্রোতাকে সম্বিত ফিরিয়ে দেওয়া'), বা পাঁচালিকার-কীর্তনিয়াদের মধ্যে 'এলিয়েনেশনের মূল কথা'-র যোগসূত্রগুলি ধরিয়ে দিয়ে উৎপলবাবু যে-কোনো শিক্ষণপ্রকল্পের অপরিহার্য কাছ-থেকে-দূরে যাওযার প্রণালীই অনুসরণ করেন মাত্র। অথচ 'কোনো তর্কাতীত বেদবাক্য' উচ্চারণে তাঁর অনীহা থিয়েটারে সৃষ্টিশীলতা ও স্বাধীন সচেতন চিন্তার ধাবাকে অনবরুদ্ধ রাখে।

'শেক্স্‌পিয়ার ও ব্রেখ্ট্' বিতর্কনাট্যেও এই শিক্ষণরীতিরই আরেক দৃষ্টান্ত। আবার 'চায়েব ধোঁয়ার' সংলাপের কাঠামোয ফিরে এসেছেন উৎপলবাবু—জপেনদার প্রায়-ফ্যাশিস্ত ধমক-খবরদারির দাপট থেকে সূক্ষ্ম বিচারের সেই ক্ষেত্রে যেখানে ব্রেখ্ট্ তাঁর প্রথম জীবনের শেক্স্‌পিযার-বিচারের সীমাবদ্ধতা ও ঔদ্ধত্যের জন্য লজ্জা বোধ করতে পারেন, কত সহজে বুঝিয়ে দিতে পারেন : 'মিস্টার শেক্স্‌পিয়ার বুর্জোয়াকে দেখেছিলেন তার অভ্যুত্থানের সময়ে, তাই এডমন্ড ও ইয়াগো সৃষ্টি হল। আমি বুর্জোয়াকে দেখেছি তার মৃত্যুশয্যায়, তাই আমার আর্টুরো উই জন্ম নিল।' ব্রেখ্ট্-ই এই বিতর্কনাট্যের শেষে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোগ করে শেক্স্‌পিয়ার থেকে ব্রেখ্ট্ পর্যন্ত বিস্তৃত সেই পরম্পবার তাৎপর্য নির্দেশ করেন · 'তুমি যে বললে অপরাধের জন্ম সমাজব্যবস্থায়, মানুষের মনকে বিকৃত ও অপরাধপ্রবণ করে তোলে সমাজব্যবস্থার প্রভাব—-এটা কিন্তু পুবোপুরি মার্কসবাদ-সম্মত হল না। . এ হচ্ছে যান্ত্রিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে মন এবং পারিপার্শ্বিক পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল, পরস্পরের ওপবে প্রভাবশীল। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুই-ই ঘটতে থাকে। সুতরাং শেক্স্‌পিয়ারেরা যে মানুষের মনকে সব ঘটনার স্রষ্টা কবেছিলেন সেটাকে মিথ্যা আখ্যা দেওয়া যেতে পাবে না কিছুতেই। বলা যায় সেটা আংশিক সত্য; খণ্ডিত সত্য। সে সত্য রেনেসাঁসেব চাহিদা মিটিয়েছিল, কিন্তু আজকে সর্বহারার যুগের থিয়েটারে সেই দর্শনের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে যায়।' তবুও ব্রেখ্ট্-ই দেখান 'করিওলান'-এ কেমন কবে আধুনিক নাট্যকার-পরিচালকের হস্তক্ষেপে শেক্স্‌পিযারের খণ্ডসত্য অখণ্ড হয়ে ওঠে, যে-পদ্ধতির আরেক দৃষ্টান্ত গ্রিগরি কোজিন্‌ৎসেভ-এর 'রাজা লিয়ার' চলচ্চিত্রায়নে।

থিয়েটারে মনন ও চিন্তার এক সজীব ক্ষেত্র, শিক্ষা ও ইতিহাসবোধের এক পরিমণ্ডল রচনার প্রচেষ্টায় উৎপল দত্তের প্রবন্ধচর্চা বাংলা থিয়েটারের সাবেকি মনোহীনতাকে খুব একটা ধাক্কা দিতে পারেনি। এই প্রবন্ধসংগ্রহের প্রকাশ কি সেই সদম্ভ প্রাচীরে চিড় ধরাতে পারবে? জানি না। তবু উৎপলবাবুই শিখিয়েছিলেন লেগে থাকতে।

এই প্রবন্ধসংগ্রহের সম্পাদনায় শ্রী সৌমেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সৌভিক রায়চৌধুরীর যে-সাহায্য

পেয়েছি, তা না পেলে কিছুই পারতাম না। বইয়ের শেষে 'গ্রন্থপরিচিতি'র কৃতিত্ব সৌমেনবাবুর। অন্তত একটি দুষ্প্রাপ্য লেখা সংগ্রহ করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে রয়েছেন ড. বিষ্ণু বসু। শ্রী ত্রিদিব দত্ত পঞ্চাশ-ষাটের দশকের একাধিক পত্রপত্রিকার বাঁধানো সংগ্রহ আমার হাতে তুলে দিয়ে আরো অনেকগুলি রচনা 'সংযোজন' অংশে অন্তর্গত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর তন্নিষ্ঠ সহজ নাট্যপ্রেমেরই এ আরেক পরিচয়। শ্রীমতী সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিকা রচনায় যথার্থ পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী শোভা সেন ও পরম স্নেহের বিষ্ণুপ্রিয়া এই প্রকল্পে এমনভাবেই জড়িয়ে আছেন যে তাঁদেব ভূমিকা স্বীকার করতে আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎপল দত্তের গদ্যসংগ্রহ ১
নাট্যচিন্তা

চায়ের ধোঁয়া

১৯৬৪

উৎসর্গ

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক-নাট্যকার
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু—

ভূমিকার পরিবর্তে

যে ভাবে লেখার ইচ্ছে ছিল সেভাবে লিখতে পারিনি। অভিনেতারা বিচিত্র জীব, আবেগের ব্যবসায়ী। আবেগবশে অনেক কটুকথা বলেছি, অতিশয়োক্তিও করেছি। আবার এও ঠিক নাট্যযুদ্ধে যারা কাটা সৈনিক তাদের পক্ষে আবেগহীন হওয়াই বা কী করে সম্ভব? সাহিত্যসম্রাট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রন্থের 'আলমগীর' বিষয়ক প্রবন্ধটা 'অমৃত'পত্রিকায় পড়ে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সেই জোরেই আজ প্রবন্ধগুলো ছাপতে সাহসী হলাম। দুর্বিনয় ক্ষমা করবেন।

উৎপল দত্ত

সূচিপত্র

খুন-জখম

আড্ডার এলোমেলো কথায় কানের পোকা বেবিয়ে যায়। কী আর করা যাবে, শুনতে হয় বাধ্য হয়ে।

নাট্যকার চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন—হ্যাঁ, খুনোখুনি রক্তপাত আমার ভালো লাগে। ছেলেবেলা থেকে ভালো লেগে এসেছে। শুনতে খারাপ শোনাচ্ছে? সত্যি কথা অনেক সময়ে অমনি শোনায়। ন বছর বয়সে যখেব ধন, পনেরো বছরে অদৃশ্য মানুষ, কুড়িতে উইলকি কলিন্‌স, তিরিশে মিকি স্পিলেন। গোটা কয়েক মৃতদেহ না থাকলে বই পড়তে তেমন ভালো লাগে না।

দার্শনিক হাসলেন—ওটা যৌবনেব চোঁয়া ঢেকুর। চেপে বসে থাকো, সেরে যাবে। নাট্যকার মুখিয়ে উঠলেন—আজ্ঞে না, আমি যা বললাম ভেবে দেখবেন। পৃথিবীর অধিকাংশ নাটকের মূল কথাটা আমি বলেছি। নাটকীয় সংঘাত বলতেই বোঝায় দৈহিক সংঘাত। ধপাধপ কয়েকটা দেহ পড়ে যায় মঞ্চে। চিরকাল পড়ে এসেছে। নাট্যরস মানেই একটু উত্তেজনা, একটু খুনখারাপির ঝোঁক। এই বলে নাট্যকার চুরুটে আগুন দিতে লাগলেন।

সেই সুযোগে ভাষাবিদ বললেন—ওটা যা বলছ সে একটা সাময়িক বিকার। গত মহাযুদ্ধের ফলে যে আশাগুলো ডাস্টবিনে পচেছে তাব দুর্গন্ধ। র‍্যাঁবো ভবিষ্যদ্‌বাণী কবেছিলেন—আসছে খুনিদেব জমানা—ভোয়াসি ল্য তঁ দেস আসাস্যাঁ। তারপর দ্রুত দেঁতো ফরাসিতে বললেন

ও! তু লে ভিস্, কলের, লুক্‌সুর—
মায়নিফীক্, লা লুক্‌সুব
সুর্‌তু মসোঁজ এ পারেস্।

আমরা কিছু বুঝলাম না। না বোঝার জন্যেই তো বললেন, তাই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে ভাষাবিদ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

নাট্যকার আগ্রহাতিশয্যে চুরুটটা ধবার আগেই কথা বলে ফেলতে দেশলাইটা নিভে গেল।

সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—কাব্যগুণে ভূষিত না হলে কোনো জিনিসই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। মহাভারতে—নাকি রামায়ণে বশিষ্ঠ মুনি—নাকি বিশ্বামিত্র বায়ু উদগার করলেন; সেটাকেও সুষমায় মণ্ডিত করে কাব্যেব অন্তর্গত করা হয়েছে। মিকি স্পিলেন যদি আদর্শ হয় তবে কিন্তু আপনার নাটক নিছক দেহজ কামনার প্রকাশ হয়ে থাকবে। তাঁব ছটি বইয়ে আটচল্লিশটা খুন সংঘটিত হয়েছে।

নাট্যকাব চুরুটটা ফেলেই দিলেন। বললেন—স্পিলেন আদর্শ এ কথা কখন বললাম? স্পিলেন পড়তে ভালো লাগে বলেছি। আর কাব্যগুণ অবশ্যই। স্পিলেনের ছটা বইয়ে আটচল্লিশটা খুন। শেক্‌স্‌পিয়ারের ছটা ট্র্যাজেডিতে একান্নটা। কাব্যগুণে শেক্‌স্‌পিয়াব আমাদের মুকুটমণি। নোংরা বলে স্পিলেন অ-সাহিত্যিক বা কু-সাহিত্যিক। স্পিলেন আমেরিকাব অবধূত।

দার্শনিক বললেন—তাহলে বিবাদটা কোথায়?

ভাষাবিদ বলে উঠলেন—খুন-জখম মানুষের মনের পাশবিক দিকের প্রকাশ। তাকে এক-একটা সময়ে হয়তো সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মানবসাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ—অন্য দিকটার প্রকাশ। সুস্থ আবেগ, সুস্থ সবল মন, সাধারণ মানুষ।

নাট্যকার বললেন—আমরা নাটকের কথা বলছি। টুনা মাছ ধরতে গিয়ে হেমিংওয়ে-র বুড়ো জেলের যে সুস্থ সবল সংগ্রাম তা নাট্যগুণভূষিত নয়। তা গল্প বা উপন্যাস বা কাব্য। নাটকে খুন-জখম চিরকাল থেকেছে, থাকবে। শেক্স্পিয়ার থেকে ব্রেখ্‌ট্‌ পর্যন্ত। সুস্থ সবল অ্যাভারেজ মানুষকে ঘিরে আজ পর্যন্ত কেউ সার্থক সৃষ্টি করতে পারেননি। নায়ক মানেই জীবনের ব্যতিক্রম। বা মানুষের অসুস্থ দিকের প্রকাশ। কোনো না-কোনো দিক থেকে এটা সত্য।

ভাষাবিদ বললেন—জাঁ ক্রিস্তফ?

নাট্যকাব ধমকে উঠলেন—আঃ, এ তো মহাজ্বালায় পডলাম! নাটকের কথা বলছি, উপন্যাস টানছেন কেন?

ভাষাবিদ বললেন—কেন? উপন্যাসেও নাটকীয় উপাদান থাকতে পারে, উপন্যাসও নাটকীয় হতে পারে।

নাট্যকার বললেন—এক্‌জ্যাক্‌টলি। 'জাঁ ক্রিস্তফ' অ-নাটকীয উপন্যাস। 'ওয়র অ্যান্ড পীস'-ও। অথচ 'রেজারেকশন' নাটকীয়। 'টু হ্যাভ অ্যান্ড হ্যাভ নট' নাটকীয়। কেন এদের নাটকীয় বলছেন ভাবুন তো?

ভাষাবিদ একটু ভেবে বললেন—এদের ঘটনায় গতিটা প্রখর।

নাট্যকাব বললেন—তার চেয়ে বলুন এদেব মূল ঘটনাটা খুন-জখম-নারীহবণ জাতীয়।

ভাষাবিদ ভাবিত হলেন। বুঝলাম নাট্যকাব জিতছেন।

নাট্যকার তোডে বলে চলেছেন—হ্যামলেট পাগল, ওথেলো খুনি, ম্যাকবেথ ম্যাস্‌ মার্ডারার, অ্যান্টনি ব্যাটা মদ্যপ এবং একটা অতীব নির্লজ্জ ধরনের মেয়েমানুষের জন্য নিজের দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করল। লিয়ার নিজের মেয়েকে মারল। হুগো যে অত বড় কবি—

ভাষাবিদ বললেন—উচ্চারণটা উগো।

নাট্যকার বললেন—আরে রাখুন ভাষাব কচকচি। হুগো পর্যন্ত নাটকের বেলায় পুলিসের ডায়েরিব মতন লেখেন। গ্যেটেও তাই।

ভাষাবিদ 'গ্যেটে' উচ্চারণটা ঠিক করে দিতে গিয়ে থেমে গেলেন।

নাট্যকার আরো একগাদা উদাহরণ দিয়ে চললেন—টলস্টয় অমন সাত্ত্বিক লোক, নাটকের বেলায় খুনোখুনি ছাড়া কথা নেই। আরো আগে যান—সফোক্লিস, ইউরিপিডিস—কী দেখছেন? রাজবিদ্রোহ, মাকে বিবাহ, নিজের চোখ উৎপাটন, আত্মহত্যা, বিদ্রোহীকে গুহায় পাথর চাপা দিয়ে হত্যা। কাব্যগুণ অবশ্যই। কিন্তু মূল ঘটনাগুলো লক্ষ করুন।

দার্শনিক এই সময়ে তর্কে প্রবেশ করে বললেন—কিন্তু ইবসেন, শ, চেকভ? এঁদের নাটকীয়তা কোথায়? কটা খুন-জখম এঁদের নাটকে? আধুনিক নাটকে আপনার থিওরি প্রযোজ্য কি? আধুনিক নাট্যকার স্বাভাবিকত্বের চৌহদ্দি ছাড়াতে চাইছেন না, তাই বলে কি তাঁরা নাট্যকার নন?

নাট্যকার হেসে উঠলেন। বললেন—ইবসেন স্বাভাবিকত্বের চৌহদ্দি ছাড়াতেন না কে বলেছে

আপনাকে? ইবসেন নিয়ে না-হয় আরেক দিন বসা যাবে। শুধু ঐ শ আর চেকভ—ওই দুজন একটা বিশেষ যুগকে প্রতিফলিত করেছিলেন। তখন পূর্বেকার রোম্যান্টিসিজম্ ভেঙে একটা নূতন লজ্জা-লজ্জা ভাব পয়দা হয়েছিল। যাকে বলে ভিক্টোরিয়ান প্রুডারি। ছুঁৎমার্গ। অশ্লীল জিনিস বাদ দাও, রক্তারক্তি বাদ দাও, সূক্ষ্ম ভদ্রতায় আচ্ছন্ন কর চিত্তকে। কটু কথা বললে মনে লাগে, এই-গোরু-সবো-না ধরনেব মনন। তার জন্যেই এঁদেব নাটক অন্য পথে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ওটা সাময়িক মুহ্যমানতা, অচিরেই সে-সব উড়িয়ে আধুনিক নাট্যকাররা চিরন্তন নাট্যাদর্শকে ফিবিয়ে এনেছেন।

দার্শনিক হতবাক হলেন। এই সময়ে চা এসে পড়েছিল, তাতে চুমুক দিলেন সশব্দে ; তাতে আবাব ভাষাবিদ ওই ভিক্টোরিয়ান ধ্বনেই একটু চমকে উঠলেন। দার্শনিক বললেন—আপনি বলেন কী? আধুনিক নাটকে খুন-জখম! সোমাবসেট মম্—

নাট্যকাব বত্রিশ পাটি বার কবে হাসলেন, বললেন—নাম করলে মম্-এর। যিনি জাত ঔপন্যাসিক, গল্পবাজ। তাঁব নাটক ওই গল্পের পর্যায়েই রয়ে গেছে, নাট্যপদবাচ্য হয়নি। এবার দেখুন সত্যি যাঁবা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁদের নাটকে কীভাবে এসেছে খুন-জখম। প্রিস্টলি দেখুন। দেখুন মার্কিন নাট্যকারদের—টেনেসি উইলিয়ম্‌স্‌কে অবশ্য আপনাবা স্পিলেন-এর জাতভাই বলবেন , কিন্তু লিলিয়ান হেলম্যান পড়েছেন? পড়েছেন আর্থার মিলার? পড়েছেন শেরউড অ্যান্ডারসন? ট্রক্ এস্টেলা নামক খুনি গুণ্ডাব জীবনেতিহাস পড়েছেন অ্যান্ডারসনের নাটকে? হেলম্যানেব 'লিটল্ ফক্‌সেস্' পড়েছেন? আনুপূর্বিক খুনেব কাহিনীটা লক্ষ করেছেন? কিংস্‌লি পডেছেন? দেখেছেন 'ডেড্ এন্ড' নাটকে খুন-জখমের আধিপত্য আব অশ্লীল ভাষার তীব্রতা?

দার্শনিক বললেন—আমেরিকানদের কথা বাদ দাও। হিংস্র রঙিন কমিক পড়ে পড়ে তারা মানুষ হয়।

নাট্যকার বিজয়গর্বে হাসেন। তাবপর বলেন—তবে জর্মনিতে যাই চল। চিন্তার রাজ্য জর্মনি। টলাব পড়েছ? ভিন্‌কেল্‌মান্ নপুংসক হয়ে গেছে ; তার মর্মবেদনা টলারের উপজীব্য। 'ব্লাইন্ড গডেস্'-এ খুনটা লক্ষ করেছ? 'ম্যাসেস অ্যান্ড ম্যান'-এর গোলাগুলিটা লক্ষ করেছ? ব্রেখ্‌টকে ধব। গ্যালিলিও-র বিচার আর উৎপীড়ন ; লুকুলুস-এর মৃত্যুদণ্ড, স্পেনীশ বিপ্লবী কারার-এর হত্যা, মৃত্যুব্যবসায়ী মাদার কারেজ—এ সবই তাঁর সাবজেক্ট। আর ব্রেখ্‌ট্-এর পুরোনো নাটকগুলোর তো আব-কোনো বাছবিচাব নেই—উইলেট বলেছেন—ক্রাইম, ড্রিংক্, রেপ, মার্ডার ; প্রস্‌টিটিউশন, মব ভায়োলেন্‌স্—নাথিং ইজ স্পেয়ার্ড। আধুনিক নাট্যকারদের আদর্শ, নাট্যগুরু বের্টোল্‌ট্ ব্রেখ্‌ট্—তাঁর এই কীর্তি। ফ্রান্‌সে যান—জিরাদু-র 'শাইয়ো-র পাগলিনী' পড়েছেন? পাগল আর খুন। সার্ত্র পড়েছেন? লা ক্রীম পাসিওনেল। কামোন্মত্ত হত্যা।

ভাষাবিদ বললেন—এটা মশাই যুদ্ধজনিত ব্যর্থ চিন্তার জাল। ওই যে একটা চক্র গড়ে উঠেছিল ইয়োরোপে—খেলাধূলা যাদের নেশা ; জ্যাজ্-সংগীত যাদের ব্রহ্ম-সংগীত, উগ্র ধর্মভাব বা ধর্মবিদ্বেষ যাদের মজ্জাগত—সেই যে লোরকা, কক্‌তো, মায়াকভ্‌স্কি গোষ্ঠী—এসব তাঁদের উদ্ভট চিন্তারই রূপান্তর। নাট্যকার বললেন—সেই লোরকা-কক্‌তো গোষ্ঠী আবার হুগো-দুমা

চক্রের উত্তরসূরী। হুগোরা আবার শেক্‌স্‌পিয়ার মার্লোর শিষ্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। এটাই চিরন্তন মহৎ নাটকের বিষয়—খুন। যুদ্ধের ব্যর্থতা ফ্যর্থতা সব বাজে কথা। নাটকের ইতিহাসই খুন-জখমের খতিয়ান।

একটু নীরবতা থমথম করছিল। হঠাৎ দার্শনিক বললেন—কালিদাসে খুন-জখম নেই।

নাট্যকার তৎক্ষণাৎ বললেন—বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, কালিদাস পড়তে ভালো লাগে?

দার্শনিক বলেন—নিশ্চয়ই। অমন কাব্য।

উল্লাসে নাট্যকার চেঁচিয়ে উঠলেন—এক্‌জ্যাক্টলি! কাব্য! ওগুলো নাটক নয়! অনুষ্টুভ ত্রিষ্টুভের বন্ধনে বেপরোয়া নাটক খোলে না। কালিদাসে নাট্যরস ক্ষীণ, ফিকে হয়ে গেছে। কারণ? কারণ খুন-জখমের ওপর ভরতবাবুর জাতক্রোধ।

দার্শনিক বললেন—শোপেনহাউয়ের বলেন সব সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল মানবজাতির বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়া। খুন, হত্যা প্রভৃতিতে কি বংশবৃদ্ধি হয়, না বংশ লোপ পায়?

ভাষাবিদ বললেন—বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে বলেছেন ; বংশবৃদ্ধি দেখাতে হবে এমন কথা বলেননি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করলে তো সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে, না কি? ওথেলোর উদাহরণ দিয়েছেন শোপেনহাউয়ের—ওথেলো ডেসডেমোনাকে হত্যা করে বংশবৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করল, তাই আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করল। দর্শকরাও তৃপ্ত হয়ে বাড়ি গেল।

নাট্যকার শোপেনহাউয়ের পড়েননি। তাই ধূমপান করতে লাগলেন।

একটু পরে দার্শনিক বললেন—রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা মানেন তো?

রবীন্দ্রনাথের নামোচ্চারণেই ঘাবড়েছিলেন নাট্যকার, ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

ভাষাবিদ বললেন—আর মেটেরলিংক? তারপর এলিযট?

নাট্যকার শেষোক্ত নামটায় লাফিয়ে উঠেছিলেন ; কিন্তু ভাষাবিদ নিজেই শুধরে নিলেন—না, এলিয়টের নাটকে খুন-জখম-নারীসম্ভোগের অভাব নেই।

দার্শনিক বললেন—কই জবাব দিচ্ছেন না যে? রবীন্দ্রনাথ আর মেটেরলিংককে আপনার থিওরিতে ফেলতে পারবেন? নাট্যকার চটে জবাব দিলেন—দুজনেই মূলত কবি। পৃথিবীর এত নাট্যকার থাকতে কবিগুরুকে নিয়ে পড়েছেন কেন? কোনো থিওরিতেই তাঁকে ধরা যায় না। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথ। তা বলে থিওরি ভুল প্রমাণ হল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যই বা কোন থিওরিতে পড়ে? তা বলে কাব্যের থিওরি নেই?

এবার একটু নীরবতা নামল। একটু পরে নাট্যকার বলতে লাগলেন—আমি নাটকে লোক, নাটকই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। অন্য বইতেও আমি নাটকীয়কে খুঁজি। অ-নাটকীয় আর নাটকীয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায় হল গল্প-উপন্যাস-কবিতা-ছবি-গানে নাটকীয়কে খোঁজা। ভূতের গল্প ধরুন।

ভাষাবিদ হেসে উঠেছিলেন, নাট্যকার তাঁকে খ্যাপাটে চোখে দগ্ধ করে বলে উঠলেন—ভূতের গল্প যে আর্ট এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। ভূতের মধ্যে নাটকীয় হল থিওডোর ড্রাইজার-এর ভূতেরা। অ-নাটকীয়, কাব্যপ্রধান হল ওয়ালটার ডি-লা-মেয়ার-এর ভূত। অসম্ভব নাটকীয় গুণে

ভূষিত থাকে এম. আর. জেম্‌স্‌-এর প্রাচীন ভূতেরা, অথবা অ্যালজারনন ব্ল্যাক্‌উডের ভূতেরা। ততোধিক কবি-কবি ভূত হল এইচ. জি ওয়েল্‌স্‌-এররা। বলা বাহুল্য ড্রাইজার, জেম্‌স্‌ এবং ব্ল্যাকউডকে আমার ভালো লাগে। ডি-লা-মেয়ার এবং ওয়েল্‌স্‌-এর ভূতদের আমার পছন্দ নয়। জিনিসটা পরিষ্কার হল?

দার্শনিক বললেন—কতকটা। এডগার অ্যালান পো সম্বন্ধে কী মত?

নাট্যকার বললেন—পো-এর রোমাঞ্চকর গল্পগুলো কখনো নাটকীয়, কখনো আবার একদম চিন্তাপ্রধান। 'কালো বেড়াল', 'গোল্ড বাগ', 'পিট্‌ অ্যান্ড পেন্ডুলাম্‌'—এ সব নাটকীয়। 'লাইজীয়া' বা 'ওভাল পোর্ট্রেট' কাব্যপ্রধান। পো-এর গল্প 'আমনতিলাদো' বোধ হয় জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বুঝতে পারছেন কী বলছি?

ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার হয়েছে।

দার্শনিক বললেন—তাই বুঝি বাংলা নাটকে আজকাল খুন-জখমের আধিপত্য বাড়ছে?

নাট্যকার বললেন—আধিপত্য চিবকালই ছিল। আমাদেব ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে মুহুর্মুহু খুন-জখম। আগেব সামাজিক নাটকেও তাই। মাঝে একটু তথাকথিত স্বাভাবিকত্ব অনুপ্রবেশ করেছিল , স্বাভাবিকত্ব আমি তাকে বলি না। বলি সামান্যতা, ক্ষুদ্রতা। পুতুপুতু করে বেঁচে থাকা কেরানির জীবন। পটলের দর আব ছেলের আমাশা। ঘরে চাল নেই আর অফিসেব বডবাবুর নেকনজর। এখন আবার এ সব থেকে নাটক মুক্ত হতে চাইছে। ঘটনাকে চাইছে, দৈনন্দিনকে নয়। তরুণ রায় চেষ্টা কবেছিলেন বংমহলে। জোছন ঘোষ-দস্তিদার করেছিলেন 'দুই মহলে'।

ভাষাবিদ বললেন—কেন, তার আগে 'উল্কা'?

নাট্যকাব সবোষে বললেন—আমরা সিরিয়াস নাটক নিয়ে আলোচনা করছি। বাংলার মিকি স্পিলেনদের বমন নিয়ে নয়।

দার্শনিক বললেন—তাহলে তো সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে নাটক লিখতে হয়।

নাট্যকার ছাডবার পাত্র নন , বলেন—কেন, সাধারণ মানুষ কি খুন করে না, আত্মহত্যা করে না? অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের শকুন্তলা রায় কি খুব অসাধারণ এক মেয়ে? 'অঙ্গার' নাটকে যারা মবল তারা কি সব রাজা-বাদশা? 'ফেরারি ফৌজ'-এও তো মরল কত ; আমাদের ঘরের ছেলেই তো সব, আসলে সাধারণ মানুষ বলতেই আপনারা ভাবেন ক্লীব, নির্জীব মানুষ। না, তাদের নিয়ে নাটক সৃষ্টি করা যায় না। সাধারণ মানুষ মানে, যে শ্রেণী-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছে। জীবন-মৃত্যু যাব পায়ের ভৃত্য। পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে বজায় বেখেই নূতনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষ নাটকে আসবে নয়া-ট্র্যাজিডির নায়ক হয়ে।

দার্শনিক গাঁইগুঁই কবেন—কিন্তু আজকের দিনে আর বাবার ভূত এসে বলে যায় কী করে যে কাকা অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করেছে, তাকে কোতল কর? খুনোখুনি কমে গেছে।

নাট্যকার হাসলেন—আপনারা আবার শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলেন!!! আজকের খুন আরো ব্যাপক, আরো মারাত্মক। পুলিসের গুলি, মালিকের গুণ্ডার ছুরি, পেটোয়া ইউনিয়নের গুপ্তহত্যা, কারখানায় দুর্ঘটনা। ক্লান্ত শ্রমিকের ক্লান্তির মাশুল, দুর্ঘটনা। আর কত চান? এ সবই হবে নূতন

নাটকের বিষয়বস্তু। আগের নাটকে যেটা ছিল ব্যক্তিবিশেষের খুন হওয়া, এখন সেটা হয়ে দাঁড়াবে শ্রেণী-সংগ্রামেব ব্যাপক খুন। আজকের সমাজের ধুতি-পাঞ্জাবিতে ভুলবেন না মশাই, তলায় রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। ধুতি-পাঞ্জাবিতে ভুলে নাটককে নোলক আর ঘোমটা পরিয়ে খাটো করে ক্ষুদ্র করে বাবুর অঙ্কশায়িনী করে দিয়ে আসবেন না। সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র। নয়া যোদ্ধৃবৃন্দকে তুলে ধরুন ; আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।

ভাষাবিদ বললেন—অনেক কথা হয়েছে, এখন এস, দাবা খেলা যাক। বটভিনিক টাল্‌কে চতুর্দশ খেলায় যেভাবে মাৎ করেছিলেন, দেখেছ?

শেক্‌স্‌পিয়ার ও ইবসেন

সেদিন আড্ডায় এসেছিলেন কালীকান্তবাবু। এবং এসেই যা করলেন তাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছে হাত থেকে ইঁট ছাড়া। বললেন—শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটক অবজেক্‌টিভ্, ইবসেন-এর নাটক সাবজেক্‌টিভ্।

বোমার মতন ফেটে পড়ল ঘরখানা—নাট্যকার এবং দার্শনিক হাসতে হাসতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। ভাষাবিদ খ্যা-খ্যা-রকমের একটা বিশ্রী শব্দ করে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন।

কালীকান্ত চটে উঠলেন—এত হাসবার কী আছে? ছাপার অক্ষরে পড়েছি কথাটা।

তাতে নাট্যকার বললেন—যাঃ সত্যি, কেন ধাপ্পা দিচ্ছেন? অমন কেউ লিখতে পারে?

দার্শনিক বললেন—নাটক কি হোসিয়ারি দোকানের গেঞ্জি নাকি? নানা রকম 'গণেশ, সরস্বতী, সামারকুল' জাতীয় লেবেল মারতে হবে?

ভাষাবিদ বললেন—তা ছাড়া ওই কথাগুলোর অর্থ কী? লেখক গাঁজা-টাজা খান নাকি?

কালীকান্ত পকেট থেকে একখানা বাংলা সাপ্তাহিক উদ্ধার করে পড়ে শোনালেন। হ্যাঁ, সত্যি। এক সমালোচক লিখেছেন—শেক্‌স্‌পিয়ার অব্‌জেক্‌টিভ্, গিরিশ ঘোষও ; এঁদের নাটকে নাকি ঘটনা আগে ঘটে, তারই ফলে পরে চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আর ইবসেন নাকি প্রবর্তন করেছিলেন এক নূতন ধারা, সাবজেক্‌টিভ্। এখানে নাকি চরিত্র ঘটনার দাসত্ব করে না ; বরং উল্টে চরিত্রই ঘটনার সৃষ্টি করে।

কালীকান্ত থামলেন না, বলে চললেন—উদাহরণও দিয়েছেন সমালোচক। আধুনিক জীবনে বিরোধ-সংঘর্ষ এত বেশি যে ইবসেনধর্মী নাট্যকারেরা দোকানে সামান্য জুতো-কেনাকে কেন্দ্র করেই বিরাট ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই যে লিখেছে : মনে কর একটি মেয়ে একজোড়া জুতো কিনবে—

নাট্যকার বললেন—ঠাহর করে দেখুন তো দাদা একটা ইটালিয়ান নাম কোথাও স্বীকার-টীকার করা হয়েছে কিনা?

কালীকান্ত খেপে গিয়ে বললেন—অর্থাৎ?

নাট্যকার বললেন—না, বলছিলাম ওই জুতো-কেনা কাহিনীটা সেজারে ৎসাভাতিনি নামক জগদ্বিখ্যাত ইটালিয়ান চিত্রনাট্যকারের কল্পনা। ওটা আধুনিক ইটালিয়ান চলচ্চিত্রে নয়া-বাস্তববাদ, নেওরিয়ালিজ্‌ম্-এর উদাহরণ হিশেবে ব্যবহার করেছিলেন ৎসাভাতিনি। তাকে আধুনিক নাটক, তথা ইবসেনীয় নাট্যকল্পের উপমা হিশেবে ব্যবহার করে সমালোচক নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

দার্শনিক বললেন—অজ্ঞতা নয়, এর মধ্যে সুপরিকল্পিত কোনো অপচেষ্টা আছে। কালীকান্ত যা পড়লেন তার ছত্রে ছত্রে এত ভুল যে আমার মনে হয় লেখক ইচ্ছে করে সত্য গোপন করতে

প্রয়াস পাচ্ছেন।

ভাষাবিদ হেসে উঠে বললেন—না হে, সব লেখককে তুমি চেনো না। সত্যি তাঁবা জানেন না। অথচ জানেন না যে, এটা জানাতে চান না।

আরেক বাব তিন জনে ছাদ-ফাটানো হাসি হেসে দাবা খেলতে বসলেন। অর্থাৎ ভাষাবিদ ও দার্শনিক বসলেন, নাট্যকার দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়ে অযাচিত মাতব্বরি করতে উদ্যত হলেন।

কালীকান্ত অপমান বোধ করলেন, কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলেন না, কারণ একটু পবে চা-স্যান্ডুইচ্ আসবে। তাই ঝগডায় মাতবেন স্থির করে চেঁচিয়ে বললেন—কোথায় ভুল? এ লেখাব কোথায় ভুল দেখান দিকি?

কেউ গা করে না দেখে, কালীকান্ত হেঁকে উঠলেন—বিদ্যার অহংকার করা ভালো নয়!

নাট্যকার বললেন—অবিদ্যার অহংকারের চেয়ে শতগুণ ভালো। দিচ্ছি আপনার প্রশ্নেব জবাব, আগে চা আসুক।

আমরা ছুটোছুটি করে চা-টা নিয়ে এলাম। খেতে খেতে দার্শনিক দাবা ছেড়ে দিয়ে বললেন—প্রথমত, ওই সাবজেক্‌টিভ্-অবজেক্‌টিভ্—ও সব কাতুকুতু-দেওযা কথা আব ব্যবহার করবেন না, কথা দিন—তারপব বলব।

নাট্যকার বললেন—হ্যাঁ, দাদা, আগে কথার মোহ কাটান। কথার লোভে বুদ্ধি বিসর্জন কোনো কাজের কথা নয। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর চরিত্র ডগ্‌বেবি (অবজেক্‌টিভ না সাবজেক্‌টিভ্ জানি না) কথার ঝকমারি কবে কী বিপদে পড়ত জানেন? কথাব ঝংকার মানায় সুকুমার বায়কে বা লিউইস ক্যারল-এর জ্যাবাবওযাকিকে।

ভাষাবিদ তৎক্ষণাৎ বললেন—অথবা র‍্যাঁবোকে। যিনি প্রতিটি স্বরবর্ণের মধ্যে রঙ দেখতে পান। মনে আছে সেই বিবক্তিকর কচকচি—'আ নোয়া, এ ব্লাঁ, ই রুজ, উ ভের্, ও ব্ল্যো ভইয়েল্!'

ফরাসি-টরাসি শুনলেই নাট্যকার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান ; তাই হলেন। ধোঁয়া ছেড়ে ভাব দেখালেন ও কবিতাটা তাঁর পেটেই ছিল, মুখে আসেনি দুর্ভাগাক্রমে।

সেই সুযোগে দার্শনিক বললেন—মূল কথাটা দেখা যাক। শেক্‌স্‌পিযার বা গিরিশ ঘোষ-এর নাটকে নাকি ঘটনা প্রধান, ঘটনা আগে ঘটে। সেই ঘটনাচক্রে খাবি খেতে খেতে চরিত্র বিকশিত বা প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ একটু উল্টে বললে দাঁড়ায়—চরিত্র ঘটনাকে প্রভাবান্বিত করে না, ঘটনাই চরিত্রকে প্রভাবান্বিত কবে। লেখক সব গুলিযেছেন! চবম গোলা গুলিয়েছেন। গ্রীক নাটকের আদর্শকে শেক্‌স্‌পিয়াব-এব ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কে যে উদো কে যে বুদো বুঝতে পারেননি।

নাট্যকার বললেন—উড়ো উড়ো কথা শুনেছেন, ডেউস এক্‌স্ মাকিনার কথা। ভাগ্যচক্রে মানুষের লাঞ্ছিত হওয়ার কথা। সেটাই চাপিয়েছেন শেক্‌স্‌পিয়ার-এর দুর্বল স্কন্ধে। অমোঘ ঘটনাচক্রে অসহায় মানুষ—এ ইস্কাইলাস সফোক্লিস-এর যুগের কথা। এন্টিগোনে প্রোমিথিয়ুস-এর যুগের কথা। শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটক ঘটনার দাস—এ তথ্য বাইরে বলবেন না, লোকে ইঁট মারবে!

কালীকান্তের মুখ স্যান্ডুইচে ভরা। তবু দ্রুত তাকে অচর্বিত অবস্থায়ই গলাধঃকরণ করে, হঠাৎ

বিষম খেয়ে বললেন—কেন? শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকে ঘটনা নেই?

নাট্যকার গর্জন কবে বললেন—আরে দুত্তোর মশাই, কথাটা বুঝতে চেষ্টা করেন না কেন? ঘটনা তো থাকবেই ; ঘটনা ছাড়া নাটক হয় নাকি? চমকপ্রদ ঘটনা মুহুর্মুহু ঘটনা। প্রশ্নটা ঘটনা থাকে কি থাকে না নয়। নায়ক ঘটনার দাস, না ঘটনা নায়কের দাস—এটাই আলোচনা হচ্ছিল। শেক্‌স্‌পিযার-এর নায়ক কি প্রাচীন গ্রীক নাযকেব মতন নিয়তির বিধানে ঘটনাস্রোতে ভেসে যায়? না, নিজের চরিত্রের দৌর্বল্যজনিত মহাপ্রমাদ সংঘটিত করে ঘটনাব সৃষ্টি করে, ঘটনার মোড ফেরায়, ঘটনাকে ট্র্যাজিডির পথে টেনে নেয়—আমার ধারণা, যে-কোনো কলেজের ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারটা জানেন, বোঝেন। ওই সাপ্তাহিকেব সমালোচক তাঁদের কাউকে পাকড়ে তত্ত্বটা বুঝে নিলেই তো পারেন।

কালীকান্ত দেখলাম আমাব মতনই একগুঁয়ে , বলে উঠলেন—বুঝলাম না। শেক্‌স্‌পিয়ার-এব নাযকরা ঘটনা সৃষ্টি করেন কি? ম্যাকবেথ তো ডাকিনীদের হাতে ক্রীড়নক।

আবার হাসির হুল্লোড উঠল। হাসতে হাসতে চোখেব জল মুছে দার্শনিক বললেন—দাদা, এগারো বছবেব কোর্স চালু হয়ে গেছে ইস্কুলে ; ইংবিজিকে প্রথম পেপাব নিলে শেক্‌স্‌পিয়ার পডতে হয ; আপনি বরং কোনো ইস্কুলেব ছাত্রকে জিগ্যেস করে নেবেন।

নাট্যকাব কিন্তু হাসতে হাসতে খেপে গেলেন। বললেন—এত বই লেখা হয়েছে, আপনাবা কি তাব কিছুই পড়েন না? আর পড়েন না যদি, তবে ছাপার অক্ষবে শেক্‌স্‌পিযার সম্বন্ধে লিখতে সাহস পান কী করে। চেম্বার্স বা রবার্টসন্‌-এব বই না-হয আপনাদেব বোধগম্য নয ; কিন্তু ব্র্যাড্‌লিটাও কি পড়ে রাখতে পারেননি?

কালীকান্তেব তখন বোধ হয় গোঁ চেপেছে , বললেন—ডাকিনীরা ম্যাকবেথকে প্রবোচিত করে নি?

এবাব ভাষাবিদও খেপে উঠলেন, বললেন—না, নিজেব অন্তবে রাজা হওয়ার সুপ্ত বাসনা না থাকলে ম্যাকবেথ প্ররোচিত হতেন না। ডাকিনীর ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে ম্যাকবেথ চমকে উঠলেন কেন? রাজাকে হত্যা করতে তো ডাকিনীরা বলেনি, হত্যা কবলেন কেন? ব্যাংকোকে হত্যা করতে কে মাথার দিব্যি দিযেছিল তাঁকে? দুর মশাই, শেক্‌স্‌পিযাব অমন বালখিল্য চরিত্র আঁকেন না।

এই সময বোমা পড়ল ঘবে, নাট্যকাব বললেন—এ দিকে রবার্টসন সাহেব প্রায প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে ডাকিনীর দৃশ্যগুলো শেক্‌স্‌পিযাব-এর লেখাই নয।

কালীকান্ত ঘর্মাক্ত , বললেন—সে কি!

—হ্যাঁ খুব সম্ভব মিড্‌লটন নামে এক নিকৃষ্ট নাট্যকারকে ডাকা হয়েছিল শেক্‌স্‌পিয়ার-এর নাটকটা সংশোধন করতে। তিনি—

কালীকান্ত বললেন—কি ধৃষ্টতা!

—এই মিড্‌লটন সাহেবেব একটা পুরোনো নাটক ছিল, তার নাম 'উইচ' বা ডাকিনী। সে নাটকের বিস্ময়কর সাফল্য দেখে গ্লোব থিযেটারেব মালিকরা ওই ডাকিনী-জাতীয় কিছু 'ম্যাকবেথে' জুড়ে দিতে ওই জনপ্রিয় অথচ নিরেট নাট্যকারকে আহ্বান করেন, তিনি তখন

নির্মমভাবে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর ওপর কলম চালিয়ে ডাকিনী দৃশ্যগুলো জোড়েন। বড়ো বড়ো দৃশ্য— যার ফলে 'ম্যাকবেথ' এখন খণ্ডিত ; অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ত।

কালীকান্তের বিস্ময়ে বিহ্বল অবস্থা। বললেন—এ রকম প্রক্ষিপ্ত অংশের ফলে নাটকের সূত্র ছিঁড়ে গেল না কেন? যা ইচ্ছে জোর করে জুড়লে নাটকের ঘটনাপরম্পরা, ঘটনাসংহতি, চরিত্রবিকাশ, এ সব বাধা পেল না?

—কে বললে পায়নি? কিছু পড়াশুনা থাকলে জানতে পারতেন 'ম্যাকবেথ' নাটকে প্রচুর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, যার কিনারা করতে পণ্ডিতরা হিমসিম খাচ্ছেন। ডাকিনী-দৃশ্যের পর ম্যাকবেথ-এর ওপর তাদের প্রভাব একবত্তিও না থাকার সমস্যা, হেকেট্‌ সমস্যা, লেডি ম্যাকবেথের পুত্র থাকার সমস্যা, ম্যাকডাফ-ম্যালকম দৃশ্যের সমস্যা, তৃতীয় হত্যাকারীর সমস্যা, দ্বাররক্ষক দৃশ্যের সমস্যা, বাদ-দেওয়া অংশের সমস্যা। পুরো নাটকটি তালগোল পাকিয়ে গেছে। একটু ঠাহর কবে নাটকটা পড়ুন, জানতে পারবেন।

কালীকান্ত একটু চুপ করে ভাবলেন, আরো একখানা স্যান্ডুইচ খেলেন। তারপব মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে বলছেন শেক্‌স্‌পিয়র-এর নাযকবা ঘটনার দাস নয়?

এতক্ষণে ধরেছেন দেখছি, বলেন দার্শনিক। —ম্যাকবেথই যখন দাস নয়, তবে আর কে দাস? ম্যাকবেথ-এরই কিছু সম্ভাবনা ছিল ঘটনাচক্রে পড়ার। কারণ ডাকিনীরা তাকে নাকি উসকেছে। সে ম্যাকবেথই দেখলাম নিজের উচ্চাশা ছাড়া কারুরই দাস নয ; উচ্চাশা আব কল্পনাপ্রবণ মনের দাস। অন্য নায়করা তো স্বহস্তে নিজের গলা কেটেছেন। নিজেদের দোষের জালে নিজেরা জড়িয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়েছেন—হ্যামলেট-এব চিন্তাশীলতা আব কর্মবিমুখতা, ওথেলোর অতিরিক্ত ভালোবাসা, অ্যান্টনির বিকৃত উগ্র প্রেম, বাজা লিয়ার-এর বিশ্বাসপ্রবণতা আর বাৎসল্য, করিওলেনাস-এর দম্ভ, ব্রুটাস-এর রাজনৈতিক আদর্শ ও বাস্তবেব সংঘাত। প্রত্যেকে এঁবা নিজেদেব চরিত্র-প্রভাবে ঘটনা সৃষ্টি করেছেন ; ঘটনার আবর্তে এঁদের চরিত্র হযতো আবো দুর্বলতায় ফেটে পড়েছে ; কিন্তু ঘটনার মূলে হল চরিত্র, চরিত্রের মূলে ঘটনা নয়।

এই সময়ে ভাষাবিদ টিপ্পনী কাটলেন—যাঁরা নাটকগুলোর উপর উপর চোখ বোলান বা চার্লস ল্যাম্ব-এর সংক্ষিপ্তসার পডেন, তাঁরা হয়তো শুধু ঘটনাই দেখেন। সামান্যতম নাট্যরসিকও কিন্তু ঘটনার মূলে মানবচরিত্রে অনায়াসে প্রবেশ করেন।

নাট্যকাব মুহূর্ত শুনছিলেন, সুযোগ পেতেই বললেন—আর যেমন ভদ্রলোকের শেক্‌স্‌পিয়ার-বোধ, তেমনি তাঁর গিরিশ-বোধ! তাঁর মতন সমালোচকেব পক্ষে যোগেশের ট্র্যাজিডি-র মূলে ব্যাংক-ফেল হওয়া ছাড়া আর কী চোখে পড়বে? ব্যাংক-ফেল হওয়াটাকেই বা এত তুচ্ছ করছেন কেন? ওটা তো সে সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার পতনেব প্রতীকও হতে পারে। যাক কথা হচ্ছে, ব্যাংক ফেল না পড়লেই রমেশ কি দাদাকে ছেড়ে দিত? ব্যাংক ফেল পড়েও তো যোগেশ পথে বসেনি, সেই ব্যাংক তো আবার টাকা দিতে শুরু করল। সে টাকার ফল যোগেশ পেলেন না, কারণ রমেশ বাধা দিল। রমেশের চরিত্রটা বুঝতে চেষ্টা করেছেন কি লেখক? 'প্রফুল্ল' নাটকেব ঘটনাচক্রের মূলে রমেশ-চরিত্রের কুলিশকঠিন গৃধ্নুতা এবং যোগেশের সিনিসিজ্‌ম্‌। এই সিনিসিজ্‌মই তো পুরো ট্র্যাজিডির জন্যে দায়ী। যে জানছে, বুঝতে পাবছে যে মা রত্নগর্ভা,

এক ছেলে মাতাল, এক ছেলে চোব, এক ছেলে উকিল ; যে উপলব্ধি করছে তাকে দিয়ে সর্বনাশা দলিল সই করানো হচ্ছে—সব জেনেও সে কিছুই করছে না ; তার কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসেছে। লেখক এ সব কিছুই বোঝেননি। যাক, কলেজের ছাত্রের কাছে দু-চার দিন ক্লাস করুন সব খোলসা হবে।

কালীকান্ত উঠতে চেষ্টা করলেন ; ঘাড়ে মৃদু রদ্দা মেরে তাকে বসিয়ে দিয়ে নাট্যকার বলে চললেন—লোমহর্ষক ঘটনাপ্রবাহ প্রায় সব নাট্যকারই এঁকে থাকেন , কিন্তু ঘটনা যদি আকস্মিক হয়, বা দৈব ইচ্ছায় ঘটে, তবে মহৎ ট্র্যাজিডি সৃষ্টি অসম্ভব। ট্র্যাজিডিব মূল কথাই হল মানবচরিত্রের জটিলতা ; ঘটনাটা উপলক্ষ মাত্র। মানুষের ইচ্ছায়, মানুষ মানুষে সংঘর্ষে ট্র্যাজিডি সৃষ্টি হয়।

দার্শনিক বললেন—একমাত্র গ্রীক নাটক ছাড়া। সেখানে দৈব ইচ্ছাব প্রাধান্য সত্ত্বেও ট্র্যাজিডি সৃষ্টি হয়েছে। তার নানা সামাজিক কাবণ আছে ; দৈব ইচ্ছা যে এলিউসিযান এবং অরফিক্ তন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের কাছে কতটা বাস্তব, কতটা সত্য ছিল, তা এই ইলেকট্রিক ফ্যান্-এর তলায় বসে আমরা সম্যক বুঝতে পারব না। ওদের কাছে দৈব প্রায় দৈনন্দিন ঘটনার মতনই প্রত্যক্ষ।

নাট্যকাব গলা তুলে বললেন—তারপব থেকে কোনো মহৎ নাটকে নায়ক ঘটনার দাসত্ব কবেনি। গিরিশের নাম করেছেন লেখক! কিন্তু পড়েননি বলে আমার ধারণা। ক্ষীরোদপ্রসাদ পড়েছেন উনি? পুবো 'ভীষ্ম' নাটকে হয়তো ভীষ্ম-চরিত্র বাদ দিয়ে কেবল কুরুক্ষেত্রের মাবামারিটাই তাঁর চোখে পড়বে। 'নব-নারায়ণ' সম্বন্ধে লিখতে গেলে আমি হলপ করে বলতে পারি কর্ণ-চরিত্র খাবিজ করে উনি আবাব কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে মনোনিবেশ করবেন!!!

দার্শনিকও এবার উত্তেজিত হয়েছেন ; বললেন—ব্যাংক ফেল না হলে 'প্রফুল্ল' ঘটত না!! কী কথা! তবে পাশা না খেললে মহাভারত ঘটত না। অতএব মহাভারত ঘটনাসমষ্টি মাত্র, চরিত্রবা গৌণ!

নাট্যকাব ফোড়ন কাটলেন—অতবড় অবজেক্টিভ্ অথর।

একপশলা হাসি হল আবার!

কালীকান্ত বললেন—এবার তাহলে উঠি।

কেউ কর্ণপাত করেন না ; কিন্তু আর-এক রাউন্ড চা এসে পড়াতে কালীকান্তর যাওয়া হল না।

এদিকে নাট্যকার বলছেন—আসলে কী জানেন। প্রত্যেকে নিজের ক্ষুদ্রতার চৌহদ্দিতে দেখে শেক্স্পিযারকে, গিরিশকে। এলিয়টই তো লিখেছেন—স্ট্রেচিব চোখে শেক্স্পিয়ার এক অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অফিসার ; মারির চোখে শেক্স্পিয়ার নূতন যৌগিক ধর্মের পুরোহিত ; উইন্ডহাম লিউইস-এর চোখে তিনি বিপ্লবী। আমাদের এই বাঙালি ছা-পোষা সমালোচকের চোখে শেক্স্পিয়ার অবশ্যই ছা-পোষা যাত্রাওয়ালা। মুহুর্মুহু ঘটনা ছাড়া আর-কিছু তাঁর চোখে পড়ার কথা নয়।

দার্শনিক জুড়ে দিলেন—ঠিক তেমনি মধ্যবিত্তসুলভ তাঁর ইবসেন-আলোচনা। শেক্স্পিযারেই যিনি হোঁচট খান তিনি ইবসেনকে আব বোঝেন কী কবে? দেখি কাগজটা?

ইবসেনকে কী কী বিশেষণে উনি ভূষিত করেছেন সেটা স্বচক্ষে দর্শন করি।

সাপ্তাহিকটা একরকম কেড়ে নিয়ে দার্শনিক লেখাটার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে বলেন—এই যে! সাবজেক্‌টিভ্ ট্রিটমেন্ট। ভাবতান্ত্রিক রীতি! এঁর নাটকে ঘটনার ভিড় নেই, নাটকীয় চরিত্র ঘটনার দাসত্ব করে না। তারপর ৎসাভাতিনি থেকে উদ্ধৃত-করা (বিনা স্বীকৃতিতে) জুতোর গল্প। ভাববস্তুপ্রধান। ইবসেন-প্রবর্তিত সাবজেক্‌টিভ্ ট্রিটমেন্ট।

ভাষাবিদ শূন্য কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন—আমার ধারণা উনি মডার্ন লাইব্রেরি-প্রকাশিত এগারোটি ইবসেন নাটকের বাইরে কিছু পড়েননি। সেই এগারোটারই আবার সবকটা পড়েছেন কিনা সন্দেহ। নইলে ইবসেন-এর নাটকে ঘটনার ভিড় নেই—এ হেন একখানা উক্তি করলেন কোন্ আক্কেলে? আর ওই সাবজেক্‌টিভ্ যে কী বস্তু কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না!

কালীকান্ত এবার প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন—না, না, উনি বলতে চান ইবসেন-এর নাটকে ঘটনা কম, অপেক্ষাকৃত কম। চরিত্রদের আবেগ এবং ভাবই ওঁর নাটকের সম্পদ।

ভাষাবিদ ধমকে ওঠেন—অর্থাৎ ইবসেন কেরানি। ইবসেন দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে নাটককে আবদ্ধ রাখেন। জুতো-কেনার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তাঁর চরিত্ররা প্রকাশিত হয়! নিজের মধ্যবিত্ততায় ইবসেনকে ধরতে চাইছেন ভদ্রলোক।

কালীকান্ত বললেন—কেন? ইবসেনও কি চমকপ্রদ ঘটনায় গা ভাসাতেন? 'ডল্‌স্ হাউস' তো—

নাট্যকার চেঁচিয়ে উঠলেন—তাই তো বলছি আমরা। 'ডল্‌স্ হাউস' আর 'গোস্ট্‌স্' ছাড়া ইবসেন-এর কোনো নাটকই প্রায় পড়া হয় না। মডার্ন লাইব্রেরি-র সংকলনের বাইরে আমরা যাই না। তাই উইলিয়ম আর্চার-এর আড়ষ্ট ভিক্টোরিয়ান ইংরিজিতে অনূদিত কয়েকটি সামাজিক নাটক থেকে ইবসেনকে বুঝতে চেষ্টা করি। বিসমিল্লায় গলদ!

দার্শনিক এবার বলে উঠলেন—'লেডি ইংগের অফ অস্ট্রাট' পড়েছেন? ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা। চিরাচরিত যে ঘটনাবহুল ষড়যন্ত্র-খুন-খারাপির নাট্যরীতি তা-ই অনুসরণ করে লেখা। শেষ দৃশ্যটা জানেন? দু জন সামন্তরাজকে নিমন্ত্রণ করে লেডি ইংগের মদের পাত্র হাতে তুলে দিলেন। দুজনে মদ খেয়ে ফেলতেই মহিলা বলে উঠলেন, একটায় বিষ আছে। দুজনই মৃত্যুভয়ে ছট্‌ফট্ করছেন। এ তো খাঁটি শেক্‌স্‌পিয়ার ধারা—ফরাসি নাট্যকার স্ক্রীব-এর মারফত এসে পৌঁছেছে ইবসেন-এর কলমে।

ভাষাবিদ বললেন—ইবসেন-এর আর-একটি নাটক 'ভাইকিংস্ অ্যাট হেল্‌গেলান্ড্'। সামুদ্রিক ঝড়ের মতনই এর বিপুল প্রচণ্ড ঘটনার তোড়। পড়েছেন?

কালীকান্ত বললেন—নামও শুনিনি।

ভাষাবিদ বললেন—কাহিনীটা শুনতে ইচ্ছা করেন? ভাইকিং বীর গুনার-এর পুত্র এগিল নিখোঁজ। গুনার ভাবলেন প্রতিদ্বন্দ্বী বীর ওরনুল্‌ফ্ এগিলকে হত্যা করেছেন। তাই গুনার খুন করলেন ওরনুল্‌ফ্-পুত্র থোরাল্‌ফ্-কে। এমন সময় এলেন ওরনুল্‌ফ্, সঙ্গে এগিল ; এগিলকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে ওরনুল্‌ফ্-এর ছ জন পুত্র প্রাণ দিয়েছে। এখন এসে শুনতে হল বংশের শেষ বাতিটিও নিভে গেছে ভুল-বোঝাবুঝির ফলে। কোথায় জুতো-কেনার ক্ষুদ্রতা বলুন দেখি

কালীকান্তবাবু! এ নাটকের আর-একটা জিনিস লক্ষণীয়। এখানে ঘটনা প্রায় চরিত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে। চরিত্র ঘটনার দাসত্ব প্রায় স্বীকার করে বসেছে। কারণ ওই ভুল-বোঝাবুঝিটা প্রায় গায়ের জোরে ঘটানো হয়েছে। থোরোল্ফ্কে যখন সদলবলে গুনার হত্যা করতে এলেন থোরোল্ফ্ জানত তার পিতা নির্দোষ, তিনি এগিলকে রক্ষা করতে গেছেন, খুন করতে নয়। তবু সে কথাটি কইল না; মুখ বুজে মৃত্যু বরণ করল। এ ধরনের ভুল-বোঝাবুঝি ইবসেন ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন ঘটনার চমৎকারিত্বের স্বার্থে। দেখছেন কালীকান্তবাবু—ঘটনাপ্রাধান্য শেক্স্পিয়ার-এর নাটকে নেই, আছে ইবসেন-এই (ক্ষেত্রবিশেষে)। অথচ ইবসেনকে বেমক্কা 'সাবজেক্টিভ্' আখ্যা দিয়ে বসেছেন আপনার সমালোচক।

এবার নাট্যকার যুদ্ধে প্রবেশ করলেন—ইবসেন-এর 'প্রিটেন্ডার্স' পড়েছেন? হাঁ-মুখ দেখেই বুঝেছি পড়েননি। ঐতিহাসিক নাটকের কাঠামোয় হাকন এবং স্কুলে নামক দুই রাজত্বলোলুপ সামন্তের দ্বন্দ্ব।

দার্শনিক ঘৃতাহুতি দিলেন—অন্তত 'এম্পেরর অ্যান্ড গ্যালিলিয়ান'-খানা পড়েছেন তো? তাও না? বেশ আছেন মশাই। সম্রাট জুলিয়ান খ্রিস্ট ধর্মকে উৎখাত করে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর—আগাথন-এর বল্লমের খোঁচায় প্রাণ হারিয়ে—তিনি খ্রিস্টের কাছে হার মানলেন। শ্রীমতী ব্র্যাড্‌ব্রুক এই নাটককে 'ম্যাকবেথ'-এর সঙ্গে তুলনা করে সমগোত্রীয় প্রমাণ করে ছেড়েছেন। শুধু সমগোত্রীয় নয়, সমরীতিতে পরিকল্পিত। শেক্স্পিয়ার আর ইবসেন-এ খুব বেশি অমিল তো চোখে পড়ছে না! মিলের দিকটাই তো বেশি।

ভাষাবিদ বললেন—পুরাপুরি মিল। শেক্স্পিয়ার উনিশ শতকে জন্মালে ইবসেন হতেন এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইবসেন-এর নাট্যরীতি শেক্স্পিয়ারেরই উত্তরসূরী। এতক্ষণ ট্র্যাজিডি আলোচনা করেছি, এবার কমেডি দেখুন।

কালীকান্ত আকাশ থেকে পড়েন—ইবসেন কমেডি লিখেছেন?

ভাষাবিদ বললেন—কেন 'লাভ্স্ কমেডি'র নাম শোনেননি? 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট্' পড়েছেন বলে মনে হয়। ফাল্ক্ আর সোয়ান্হিল্ডে—রোজালিন্ড এবং ওরলান্ডোর প্রতিচ্ছবি। তার ওপর সেই হাস্যরসের ঝরনা, সেই আনন্দ, মাঝে মাঝে অপেরার মতন গান, নাচ, ছন্দ।

নাট্যকার বললেন—আর শেষ বয়সের রচনা অমর কাব্যসুষমাময় নাটকগুলি 'হোয়েন উই ডেড এওয়েকেন', 'মাস্টার-বিল্ডার', 'ব্রান্ড', 'পিয়ার গিন্ট'—ও-সবের মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনা আর জুতো-কেনা খুঁজতে যাওয়া যে নেহাৎ আহাম্মুকি তা কি বলে দিতে হবে? জীবনের অর্থ খোঁজবার কাব্যময় প্রয়াস ওইগুলো, দার্শনিক তত্ত্বে ঠাসা। ঘটনায়ও। সব মানুষই এ জগতে আসে একটা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতে; ইবসেন তাকে বলেন 'ভোকেশন' বা 'কল'। সেই 'ভোকেশন' খুঁজে মরছে শেষ নাটকগুলোর নায়করা। এগুলোর একটাকেও অভিনয়োপযোগী বলে স্বীকার করা হয় না। ওগুলো নাটকই নয়, ওগুলো কাব্য এবং দর্শন।

ভাষাবিদ এবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—হায়রে কপাল! 'ডল্স হাউস', 'গোস্ট্স্', আর 'এনিমি অফ্ দ্য পীপ্ল' পড়েই ইবসেনকে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রবক্তা বলে ভেবে বসে

আছেন সমালোচক!

দার্শনিক বললেন—এর জন্যে দায়ী বার্নার্ড শ, আর্চার-প্রমুখ ইবসেনবাদীরা। নিজেদের সুবিধেমতো এঁরা ইবসেনকে বিকৃত করে পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন। দৈনন্দিন সমস্যামূলক নাটকের রচয়িতাকে তাঁদের ভালো লাগে, তাঁদের দরকার। তাই ইবসেন-এর সারা জীবনের সৃষ্টিকে চেপে দিয়ে দুটি কি তিনটি নাটক নিয়ে জয়ঢাক পিটিয়েছেন। পর্বতকে লুকিয়ে মূষিককে নিয়ে প্রদর্শনী খুলেছেন!

ভাষাবিদ বললেন—আরে রাখো না হে! বার্নার্ড শ-এর গ্রন্থখানাই কি পড়েছেন সমালোচক? তাহলে অন্তত সাবজেক্‌টিভ্-অবজেক্‌টিভ্ প্রভৃতি অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দুর হাট বসাতেন না। যুক্তি একটা খাড়া করতেন। তাহলে দেখছেন কালীকান্তবাবু ইবসেন ভাবতন্ত্র-ফন্ত্র কিছুই প্রবর্তন করেন নি। এক কথায় শেক্‌স্‌পিয়ার আর ইবসেন একই জাতের নাট্যকার!

কালীকান্ত বললেন—বাড়ি যাই, বড়ির ঝোল খেয়ে শুতে হবে।

জনপ্রিয়তা ও আলমগীর

নাট্যপরিচালক যে-দিন আসরে এলেন আমরা চমকে উঠেছিলাম। জবুথবু হাবাগোবা ফোকলা মানুষ ; অথচ ইনি নাকি কলকাতায় একটি আস্ত পেশাদার থিয়েটাব চালাচ্ছেন। আগে থাকতে জানান দিয়েই এসেছিলেন তাই চা-খাবার সে দিন গোড়া থেকেই তৈরি ছিল। ভাষাবিদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বিয়্য ভেনু! কমেঁ। ভু পর্তে ভু?

পবিচালক ফরাসি ব্যাপারে দেখলাম আমাদেরই মতন বিজ্ঞ। তিনি বললেন—নো মসিয়ে, ইংলিশ ইজ্ দি ওনলি পার্লে দ্যাট আই ভু।

ভাষাবিদ ও দার্শনিক দুজনেই কথাটায় একটা সূক্ষ্ম রসের পরিচয় পেযে পুলকিত হলেন। বুঝলাম আজকের আড্ডাটা জমবে।

খানিক খেযে (পরিচালক দেখলাম বুভুক্ষু, খেতেও পারেন মন্দ নয়) পরিচালক বললেন—আজ পর্যন্ত দাদা কলিব কলিকাতাকে বুঝতে পারলাম না। এ দর্শক যে কী চায় জানি না। আর না জানলে থিয়েটার উঠে যাবে। শ-খানেক শো চলে যায় বুঝতে কোন্ পথে নাটকটাকে নেওয়া উচিত।

নাট্যকাব বললেন—অর্থাৎ? নাটক আবাব কোন্ পথে নেবেন কী? নাটক তো আগে থাকতেই লেখা হযে আছে ; আপনারা তো তার অভিনয় কবছেন শুধু।

পবিচালক ক্রমান্বযে তিন মিনিট ধরে কেক খেলেন (কেষ্ট এনেছিল ভালো কেক সাহেবপাড়া থেকে) ; তারপর বললেন—আগে থাকতে যা লেখা হয়ে আছে আর আমবা যেটা অভিনয় কবছি দুটোব মধ্যে ক্রমশই একটা পার্থক্য গজিযে উঠতে থাকে। নাট্যকাবের নাটক অনেক সময়েই যথাযথ রাখা সম্ভব হয় না।

নাট্যকারের হাত থেকে কাপটা ঠং করে পড়ে গেল—তাব মানে? আপনি তাব ওপব কলম চালান?

পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। সেইজন্যেই আমি পরিচালক।

দার্শনিক বললেন—মিডলটন যেমন চালিয়েছিলেন 'ম্যাকবেথ'-এব ওপব।

সবাই একটু চাপা হাসি হাসলেন। পরিচালক জবাবে আরো একটু কেক খেয়ে বলেন—না, 'ম্যাকবেথের' মতন নাটক পেলে কলম চালাবার দবকার হত না বোধ হয়। উপমাটা ঠিক হল কি? আমি হয়তো মিডলটন ; শেক্স্পিয়ারকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না কলকাতায়!

নাট্যকার একটু অবজ্ঞাব হাসি হাসলেন ; মুখে একটা নীরব উক্তি প্রকট হল—নিশ্চয়ই এই স্থূলোদর নাট্যবিশারদ আমার সাতখানা প্রকাশিত নাটকের একটিও পড়েনি ; নইলে শেক্স্পিয়ার নেই বলে? মনে মনে এই বলতে বলতে তিনি পোড়া চুরুটের আধখানা ধবাতে শুরু করলেন।

দার্শনিক বললেন—তা কলমটা যে চালান, কী নীতির ভিত্তিতে?

পরিচালক তৎক্ষণাৎ বললেন—কেন, বক্স-অফিস। জনপ্রিয়তা।

ক্রোধে দার্শনিক ও নাট্যকারের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তাই ভাষাবিদই কথা কইবার ভার নিলেন—লোকে কী চায় তার জন্যে নাটক বদলান?

পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। লোকে যদি নাটক দেখতেই না এল তবে অভিনয়টা করার সার্থকতা কী? নিভৃতে সাহিত্য বা চিত্রসাধনা হতে পাবে, নিভৃত নাট্যসাধনা সোনার পাথুরে বাটির মতোই উদ্ভট।

ভাষাবিদ বললেন—খাওয়াটা একটু কমিয়ে আমার কথাটা শুনুন দিকি। জনপ্রিয়তার আলেয়ার পেছনে কতদূব পর্যন্ত গিয়ে থাকেন সাধারণত?

পবিচালক খাওয়া থামালেন না, কিন্তু বললেন—যা যা দরকার সবই করি। নায়ক বাঁচবে, না মববে। শেষে মিলন হবে, না বিচ্ছেদ। আগুনের খেলা দেখাব, না বৃষ্টির। কেউ ভালো কবছে, তাব পার্টটা বাড়ানো হোক। কেউ খাবাপ কবছে, তার যতটা না থাকলেই নয় ততটা থাক।

একটা বিকট হাস্যরোল উঠল ঘবেব মধ্যে। হাসতে হাসতে নাট্যকার বললেন—তাহলে নতুন পবীক্ষা-নিরীক্ষার পথ আপনাব থিযেটারে রুদ্ধ?

পরিচালক বললেন—সে পরীক্ষা-নিবীক্ষা যদি দর্শকেব বোধগম্য না হয তবে রুদ্ধ।

নাট্যকার জলন্ত চুরুটখানা পরিচালকেব নাকেব চার ইঞ্চির মধ্যে সবেগে নেড়ে দিযে বললেন—দর্শককে ভগবানেব বা কাজির আসনে বসিয়ে শাশ্বত সৃষ্টি সম্ভব? ভিইয়োঁ, শেলি, কীটস, র‍্যাঁবো, ভেবলেন, অস্কাব ওযাইল্ড থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রকাব আইজেনস্টাইন বা ফ্ল্যাহার্টি বা ইঙ্গমাব বের্গমান—এই সব মনীষীরা যদি জনপ্রিয়তাব যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াতেন, তবে আব সার্থক শিল্পসৃষ্টি করা হযে উঠত না।

ভাষাবিদ বললেন—এমনকী বিদ্রোহই এঁদেব শিল্পপ্রেবণাব মূল। জনপ্রিয়তাকে অস্বীকাব করেছেন বলেই এঁবা শিল্পী।

পবিচালক বললেন—আপনি তো নিজেকে নাট্যকার বলেন! অথচ যাঁদের নাম করলেন তাঁদের একজন ছাড়া কেউ নাট্যকার নন। তার ওপর শেলিব দেশত্যাগেব কারণ তাঁব সাহিত্য কি? না ব্যক্তিগত ব্যাপাব। ফ্রাসোঁয়া ভিইযোঁ কী জীবন যাপন কবতেন জানেন নিশ্চয়ই; কবি হিশেবে তিনি মহান হতে পাবেন, কিন্তু সামাজিক জীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। র‍্যাঁবো ও ভেবলেন বিকৃত যৌন জীবন যাপন কবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, কাব্যের জন্য নয়। অস্কাব ওয়াইল্ড নাট্যকার হিশেবে রীতিমতো সফল তথা জনপ্রিয় হযেছিলেন এটা আপনার জানাব কথা। চটকদার কথা আব হাস্যবস প্রচুব পবিমাণে ইনজেক্ট করে তাঁর সামাজিক নাটকগুলোকে হিট কবিয়েছিলেন ভদ্রলোক; নাট্যকার হিশেবে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন; লাঞ্ছিত হয়েছিলেন যৌনবিকাবের ফলে। একমাত্র কীটসকে ছেড়ে দিচ্ছি; বেচারা সত্যি গালি খেয়েছিলেন; কিন্তু তাও মুষ্টিমেয় গণ্ডমূর্খ স্ফীতমস্তিষ্ক কয়েকটা সমালোচকের হাতে। দেখুন দাদা, এই নাম কটা অনেকেই কবে থাকেন অ-জনপ্রিয়তার উদাহরণ হিশেবে। বিশেষ করে আজকাল র‍্যাঁবো-ভেরলেন নিযে পড়েছেন একাধিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী; এঁরা বোধ হয় আমাদের বোকা বোঝান; এঁবা ভাবেন ফবাসি এ দেশে কেউ জানে না।

এই বলে পরিচালক আবার বীরবিক্রমে আহার করতে থাকলেন। আমবা যারা ছোটো

আমাদের মনে হল নাট্যকাব জীবনে কখনো এমন অপদস্থ হননি ; অন্তত আমাদের সামনে হন নি। মুখখানা হাঁড়িপানা করে তিনি একটু দম নিলেন ; তারপর যেই বলেছেন—কেন ওঁবা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—অমনি পরিচালক আবার শুরু করলেন—

—আর, ওই আইজেনস্টাইন! ওঁর সব ছবি জনতা নাকচ করেছিল এ কথা সত্যি নয়। 'নেভস্কি' ও 'পোটেমকিন' যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল।

নাট্যকার ধমকে উঠলেন—আর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ইভান' শুধু নাকচ হয়নি ; এক রকম নিষিদ্ধ হয়ে গেল!

পরিচালক ছাড়েন না—শ্রেষ্ঠ কিনা বিবেচ্য ; অনেকে বলেন, 'পোটেমকিন' শ্রেষ্ঠ।

নাট্যকার আরো জোরে ধমকে উঠলেন—কথা হচ্ছে আইজেনস্টাইন জীবনে কখনো জনপ্রিয় হবার জন্যে ছবি করেননি। জনপ্রিযতা তাঁর উদ্দেশ্য হয়নি কোনো দিন। কোনো ছবি যদি জনপ্রিয় হযে থাকে তা হলে আকস্মিকভাবেই হয়েছে।

পরিচালক খুব সরলকণ্ঠে বললেন—তা হলে ছবি করতে গেলেন কেন? ষোলো মিলিমিটারে শুধু নিজের জন্য মনের সুখে ছবি তুলে শোয়ার ঘরে বসে দেখলেই পারতেন।

নাট্যকার বললেন—একটা নতুন আর্ট সৃষ্টি করার জন্যে ছবি করেছেন আইজেনস্টাইন। ফ্রেম থেকে ফ্রেমে যাওয়াব নতুন একটা গতি ; একটা সঙ্ঘর্ষ,একটা শিল্প সৃষ্টি করার জন্যে করেছেন ছবি।

পরিচালক বললেন—অন্তত কিছু লোক যদি তা না বোঝে তবে কার জন্যে এটা সৃষ্টি করেছেন?

নাট্যকার বললেন—নিজের জন্য।

দার্শনিক বললেন—নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে। সেটাই শিল্পের উদ্দেশ্য। নিজেকে মেলে ধরা সব মানুষেব অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। সেটারই উন্নত রূপকে আমরা বলি শিল্পকর্ম। অবশ্যই সেটা আপনার উপর প্রযোজ্য নয় ; আপনি এই রকবাজদেব শহরে বক্স-অফিসের ওপর চোখ বেখে নাটক করেন।

পবিচালক বাদে সকলে হাসলেন। তিনি শুধু বললেন—মেলে ধরার মানেই হচ্ছে কারুর চোখে নিজেকে মেলে ধরা। কার চোখে? নিশ্চয়ই দর্শকের। পক্ষিবিশেষজ্ঞরা বলেন ময়ূর বা মোরগ যখন পেখম মেলে বা ডানা মেলে তখন তা মাদি পাখির মন ভোলাবাব জন্যে। আইজেনস্টাইনের মেলে ধরাটা হয়তো অনেকের ভালো লাগছে না, বা বোধগম্য হচ্ছে না , কিন্তু অন্তত অল্প সংখ্যক কিছু লোককে মনে রেখেই তিনি ছবি করেছেন। চ্যাপলিন বা পুডোভকিন যেখানে লক্ষ মানুষের জন্যে ছবি করেন আইজেনস্টাইন করেছেন কয়েক শত লোকের জন্যে। তফাতটা সংখ্যাগত, পরিমাণগত ; গুণগত নয়। বের্গমান সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলা যায়, অনেক কটূক্তিও করা যায় ; সেটা আরেক দিন হবেখন। আজকে জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কথা বলা যাক। চলচ্চিত্রের মহারথী তিন জনের নাম করেছেন যাঁদের ঠিক জনপ্রিয়তা জোটেনি ; অন্যপক্ষে কয়েক কুড়ি মহারথীর নাম করতে পারি যাঁরা শুধু দিগদর্শক নন জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান-অধিকারীও বটেন। যথা চ্যাপলিন, পুডোভকিন, ডভশেংকো, ডনস্কয়, ইউৎকেভিচ, বন্দারচুক, পাবস্ট, লাং, জাক তাতি, কিং ভিডব, রেনে ক্লেয়ার, আঁরি ক্লুজো, কার্নে, অ্যাসকুইথ, লেসলি হাওয়ার্ড, থরল্ড ডিকিনসন,

ওয়াইদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিপুল জনপ্রিয় বাহিনীর সামনে আপনার উদাহরণ অকিঞ্চিৎকর। যাক, কথা হচ্ছিল কলকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে। জনপ্রিয়তার মুখে তুড়ি মারা সকলের পক্ষে সম্ভব, এক নাট্যকার ছাড়া। কবি, চিত্রকব, ঔপন্যাসিক—সকলে বলতে পারেন ভবিষ্যৎ আমাকে বুঝবে, তাই বর্তমানকে কাঁচকলা! আধুনিক দুর্বোধ্য কবিদের মধ্যে কেউ কেউ যে মহাশক্তিধর এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কানওয়াল কিসন বা রামকিংকর-এর শিল্প বর্তমানে বিপুল জনতা কর্তৃক উপেক্ষিত হতে পারে; ভবিষ্যতের জনতা এঁদের মাথায় তুলে নেবেই। 'স্থাবর'-স্রষ্টা বনফুলের বই অধিকাংশ টিম টিম করে এক সংস্করণ চলে ; কিন্তু সে দিন বেশি দূরে নেই যখন 'অদ্ভুত' অধ্যুষিত গোয়াল পরিষ্কার করে লোকে বনফুলের জয়স্তম্ভ তৈরি করবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন নাট্যকারের নাম করতে পারেন কি যিনি জীবিতাবস্থায় স্বীকৃতি পাননি কিন্তু মৃত্যুর বহু বৎসর পরে পেয়েছেন?

নাট্যকার বললেন—পাবেন, শীঘ্রই পাবেন। রবীন্দ্রনাথ, পিকাসো।

পবিচালক ততোধিক শান্তস্বরে জবাব দিলেন—রবীন্দ্রনাথ জীবিত অবস্থায়ই জনপ্রিয় নাট্যকার হিশেবে জনতাব প্রণাম কুড়িয়ে গেছেন। জোড়াসাঁকো বা শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত অভিনয়গুলি ছেড়ে দিলাম। পেশাদার মঞ্চে পর্যন্ত তাঁর নাটক সমাদৃত হয়েছে। আর পিকাসো-ব নাটক লোকে বোঝেনি , তাই পিকাসো কোনো জন্মে নাট্যকাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবেন না।

ভাষাবিদ বললেন—এর্নস্ট টলার জনপ্রিয় হয়েছিলেন কি? অথচ নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য।

পরিচালকের প্রয়োজন হল না, দার্শনিকই বাধা দিলেন—না, টলার জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন বইকি। পিসকাটর প্রমুখ এক্সপ্রেশনিস্ট পরিচালকরা যেমন ভেরফেলকে তেমনি টলারকে জনপ্রিয় করে গেছেন!

নাট্যকার সোৎসাহে বললেন—আর চেকভকে করলেন স্টানিসলাভস্কি।

পরিচালক বললেন—দেখছেন? সবচেয়ে জটিল নাটক-রচয়িতারাও জীবিত অবস্থাতেই হিট করে তবে গেছেন। সদ্যোমৃত ব্রেখ্‌ট্‌কে দেখুন না। আর শেক্‌স্‌পীয়ার-মলিয়েব তো ছেড়ে দিলাম। তাঁরা বাড়িগাড়ি সাজিয়ে রাজার সঙ্গে করমর্দন করে তবে গেছেন। এ দেশেও তাই। নাট্যকার প্রত্যেকে জনপ্রিয় হয়েছেন, মানে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁরাই নাট্যকার হিশেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন : দীনবন্ধু, মাইকেল, গিরিশ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ, রবীন্দ্রনাথ, যোগেশ চৌধুরী। তারপর আধুনিকরা। আর দেখুন সঞ্জয় ভট্টাচার্য কী সুন্দর দু-চারটে নাটক লিখেছেন, যা কাব্য হিশেবে আমার পড়তে খুব ভালো লাগে ; কিন্তু তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। আর পারেননি বলেই পারলেন না।

দার্শনিক বেশ ভেবে বললেন—এর কারণ নাটক আর নাটকাভিনয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নাটককে শুদ্ধ অভিনয় হিসাবে দেখা যেমন আহাম্মুকি, নাটককে শুধু সাহিত্য হিশেবে দেখা ঠিক তেমনি একদেশদর্শিতা। এ যেন একই দেহের মুণ্ড আর ধড়কে আলাদা করে বিচার করা। কিছু লোক আছে যারা হয় এটা নয় ওটা নিয়ে প্রচণ্ড তিড়িং-বিড়িং করে। তারাই বোধ হয় 'ভোট দিন' ধরনের চিৎকারে সমালোচকদের কর্ণ বধির করে বিপথে চালিত করে। আসলে

নাটক একাধারে সাহিত্য ও অভিনয়লিপি। তাই বর্তমানকে অস্বীকার করা নাটকের পক্ষে অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে দর্শকের প্রত্যক্ষ বিচারে সে যাচাই হয়। অভিনয়ের সময়টাও নাটকের অংশ। সেই সময়টা যদি দর্শকবিচারে সময়-নষ্ট হিশেবে প্রমাণিত হয় তবে নাটকের দফা গয়া, নাট্যকারেরও আশায় জলাঞ্জলি। শুদ্ধ সাহিত্যিক হিশেবে প্রতিষ্ঠার আশা নাট্যকার করতে পাবেন না।

নাট্যকার খেপে চুরুটটা নামিয়ে রেখে বললেন—আবাব শুধু অভিনযও নাট্যকারের সাধনা হতে পারে না। ইনি যা বলেছেন তাতে তো মনে হচ্ছে নাট্যকারকে কোনো সাহিত্যিক মর্যাদা দিতেই এঁরা নারাজ। যথেচ্ছ কলম চালিয়ে সাহিত্যকে মঞ্চোপযোগী করাই এঁদের কাজ।

পরিচালক এবার আহার শেষ করলেন, শেষ গ্রাসটি চিবোতে চিবোতে বললেন—না, সত্যিকারের সাহিত্য হলে আর মঞ্চোপযোগী করার দবকাব হয় না। নাটক যখন সাহিত্যপদবাচ্য হয় তখন তা মঞ্চোপযোগীও হয়। এটাই আমার অভিজ্ঞতা।

নাট্যকার ক্রূর হাস্য কবে বললেন—তাহলে আপনাদের হাতে বাজে নাটকই বেশি আসে বুঝি?

পবিচালক অম্লানবদনে বললেন—হ্যাঁ। তবে এক-আধ জন অজ্ঞ পণ্ডিত বলে থাকেন, বাংলায় উপন্যাস, কবিতা যত ভালো, নাটক তত ভালো বেরুচ্ছে না। উপন্যাস-কবিতা বনফুল, প্রেমেন্দ্র এইবকম দু-চার জন ছাড়া কোথায় ভালো বেরুচ্ছে আমার জানা নেই। নাটকও তাব চেয়ে খারাপ কিছু বেরুচ্ছে না। এক ছোটগল্প ছাড়া বাংলায় প্রথম শ্রেণীর কিছুই বেরুচ্ছে না। সব তৃতীয় শ্রেণীব মধ্যে নাটকও তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে।

ভাষাবিদ তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন—এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

নাট্যকার হঠাৎ গর্জন করে বলে উঠলেন—মঞ্চোপযোগী অর্থ কী? বর্তমান কলকাতার বর্তমান মঞ্চের উপযোগী?

নাট্যকার শ্লেষ ঢেলে বললেন—তার মানে অত্যন্ত নীচু মানের দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্যে আপনারা অকাতবে নাটক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন?

পরিচালক বললেন—হ্যাঁ।

নাট্যকার বলে চললেন দম-দেওয়া ঘড়ির মতন—অর্থাৎ টিকিট বিক্রির দিকেই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার জন্যে যাকিছু শস্তা, যাকিছু প্রতিক্রিয়াশীল সব আমদানি করতে আপনি প্রস্তুত?

পরিচালক ঢেঁকুর তুলে বললেন—আজ্ঞে না। তা কেন? শস্তা বা প্রতিক্রিয়াশীল জিনিস আমদানি করব কেন? মঞ্চোপযোগী মানে যে শস্তা জিনিস এই অমূল্য সংবাদটি আপনাকে কে দিলে?

নাট্যকারের রোষদৃষ্টির সামনে পরিচালকের নির্লিপ্ত ভাব দেখে ভাষাবিদ ও দার্শনিক যুগপৎ হেসে উঠলেন। ফলে নাট্যকার অসহ্য ক্রোধে পদচারণ শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতেই বললেন—তবে মঞ্চোপযোগী মানে কী?

পরিচালক দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন—অন্য থিয়েটারের কথা জানি না; সেখানে হয়তো দর্শকের দোহাই দিয়ে শস্তা জিনিস দেখানো হয়; বোম্বের চিত্র-প্রযোজকরা যেমন দেখান। কিন্তু আমার নিজের ওপর আস্থা আছে। নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় এনে ফেলা আমার থিয়েটারে অসম্ভব। অথচ নাটকটাকে এমন বাঁধুনি,

এমন গতি, এমন চমক দিতে হবে যেন দর্শকের ভালো লাগে , তারা যেন আমার থিয়েটারকে বয়কট না করে। বিষয়বস্তু ব্যাপারে কোনো রকম আপোস আমি করি না ; নাট্যকারের প্রগতিশীল বক্তব্যকে পুরোপুরি বজায় রাখা আমার স্বভাব ; কারণ আমি নিজে প্রগতিশীল মানুষ। কিন্তু সেই বিষয়বস্তু যেন এমন রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে আসে, এমন আঙ্গিক নিয়ে মঞ্চে ওঠে যাতে দর্শক বুঝতে পারে ও খুশি হয়। অন্যথায় কী হবে? এই হবে, যে প্রচণ্ড রকমের বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়েও নাটক এমন দুর্বোধ্য রূপরীতিতে আত্মপ্রকাশ করবে যে কেউ বুঝতেই পারল না। বক্তব্যটা মাঠে মারা গেল। ফর্ম-এর পরীক্ষা কখনো দর্শককে বাদ দিয়ে হতে পারে না। দর্শকের জ্ঞানবুদ্ধিকে বিস্মৃত হয়ে পরীক্ষা চালালে শুধু নিজের বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাবে, দর্শককে সঙ্গে নিয়ে এগুবার পথ রুদ্ধ হয়েই থাকবে। আমি কেমন বুদ্ধিমান তা দেখাবার জন্যে তো আর থিয়েটার খুলিনি মশাই। খুলেছি দর্শককে উন্নততর নাট্যরূপের সন্ধান দিতে। সেটা ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমেই এক যুগান্তকাবী পবীক্ষার অবতারণা করলে দর্শক আর আসবেই না; তখন শূন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রাণায়ামে বসতে হবে। এতে নাট্যজগতের কী উপকার কী উন্নতিটা হবে কিছুতেই মাথায় ঢোকে না আমার।

একটু থেমে পবিচালক আবার বলতে লাগলেন—সর্বোপরি আপনারা যাদেব রকবাজ বলে ঠাট্টা করলেন তাদেব ওপরে আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি কলকাতার দর্শক ও কলকাতার অভিনেতা ধাপে ধাপে এগিয়ে দুর্জয়তম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারে উপনীত হতে পারবেন কযেক বৎসরের মধ্যে। তখন যে কোনো-নাটকের যে-কোনো আঙ্গিকের রসগ্রহণ করতে দর্শক সক্ষম হবেন, আমার কাজ কমবে।

নাট্যকার পায়চারি থামিয়ে বললেন—নিজের ওপর আস্থা তো খুব। আপনার কি ধারণা নাট্যকাররা আপনার চাইতে থিয়েটারকে ও দর্শককে কম বোঝেন?

পরিচালক আকাশ থেকে পড়লেন , বললেন—নিশ্চয়ই। অধিকাংশ নাট্যকারই কম বোঝেন। অভিনয এবং পরিচালনা আমাব পেশা মশাই। ওঁদের চাইতে আমি বেশি বুঝব না? কী ধরনের নাটক আমার হাতে বেশি আসে জানেন? যেখানে নাট্যকার পবিশ্রমী, আন্তরিক এবং মোটামুটি প্রগতিবাদী ; কিন্তু আঙ্গিকেব ব্যাপাবে নূতন পরীক্ষা তো দূরেব কথা, প্রচলিত রীতিনীতিও এঁদের অজানা। আজ শত বৎসর যাবৎ বাংলা নাট্যশালায় যে কায়দাগুলো ব্যবহার হয়ে হয়ে পাকাপোক্ত হয়েছে, সেগুলোও এঁরা জানেন না। ফলে দুর্বল রূপরীতির জন্যে এঁদের বক্তব্যগুলো জোলো, ফিকে অথবা স্থূল, সোচ্চার হয়ে রয়েছে।

নাট্যকার আবার প্রাণপণ শ্লেষ মিশিয়ে বললেন—শত বৎসরের কায়দাগুলো কী? ছেঁড়া ঝোলানো সীন, বাঁশি বাজিয়ে পর্দা ফেলা ও তোলা, দেরিতে আরম্ভ করা এবং কয়েক জন দাম্ভিক আত্মকেন্দ্রিক অভিনেতার আস্ফালন।

পরিচালক এবার চা ঢেলে নিলেন এক কাপ ; বললেন—ওগুলো হল কায়দার অপব্যবহার, তার জন্যে কায়দা দায়ী নয়। ঠিক যেমন বিজ্ঞান দায়ী নয় আণবিক বোমার জন্যে। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ওগুলো অপকৌশল। তাছাড়া কথা হচ্ছিল নাট্যরচনার কায়দা নিয়ে। হঠাৎ মঞ্চপ্রয়োগের কায়দায় গেলেন কেন? ও বিষয়ে না-হয় আরেক দিন কথা কওয়া যাবে।

নাট্যকার বললেন—নাট্যরচনার কায়দাই বা কী সৃষ্ট হয়েছে?

পরিচালক বললেন (চায়ে আয়েসি চুমুক দিয়ে)—ওই যে বলেছিলাম ভালো নাটক মাত্রেই একাধারে মঞ্চ-সচেতন এবং সাহিত্য। সেই মঞ্চসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ; মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী'তে ওর শুরু ; ক্ষীরোদপ্রসাদে ওর পুষ্টি ; রবীন্দ্রনাথে ওর চরম বিকাশ। এখানে নাটক যেমনি অভিনেয়, তেমনি কাব্য-সুষমাময়। সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিলেই হবে।

নাট্যকার বোধ হয় একটু নরম হলেন , বললেন—দেখুন দাদা, আপনার এই কথাটা বিবেচনাসাপেক্ষ। সাহিত্য আর মঞ্চচেতনা দুটো একই সঙ্গে ভালো নাটকে থাকে, এ কথাটা বিনা প্রমাণে মেনে নেওয়া অসম্ভব।

পরিচালক বললেন—প্রমাণ দিচ্ছি সংক্ষেপে, কারণ আমার সময় অল্প : করে খেতে হয় যে! রিহার্সাল আছে একটা। একটি অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক নিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা কবব কীভাবে কাব্যচ্ছন্দ তার মধ্যে খেলা করছে। আরো দেখবেন যেখানেই মঞ্চ-প্রয়োজনে নাটকের বিশেষ আবেগপূর্ণ দৃশ্য আসছে সেখানেই কাব্যও স্পন্দিত হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য অধীরতায়। অর্থাৎ জনপ্রিয় নাট্যরচনার সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতি মেনে গেছেন নাট্যকার : দর্শককে ভালো লাগাবার যত পেশাদারি বাণ আছে, সব ছুঁড়েছেন নাট্যকার। সেই জনপ্রিয়তার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই কাব্যসৃষ্টি করেছেন ; জনপ্রিয়তার কায়দাকানুন কাব্যকে সীমিত করেনি, কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি ; বরং সাহায্য করেছে, পরিপূরণ করেছে। ভালো নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয় নাট্যকার।

নাট্যকার বললেন—এক মিনিট। তার মানে কি জনপ্রিয় নাট্যকার মাত্রেই ভালো নাট্যকার?

পরিচালক বললেন—তা নিশ্চয়ই না। ভালো নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয় ; কিন্তু জনপ্রিয় মাত্রেই ভালো নাও হতে পারে। সব মানুষই জীব ; কিন্তু সব জীবই মানুষ নয়। যাক। যে নাটকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' ; ১৯২১ সালে প্রথম অভিনীত। আপনাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চয়ই পড়া বা দেখা বা দুটোই।

সকলে ইতিবাচক মাথা নাড়লেন।

পরিচালক উঠে দাঁড়িয়ে যেন অদৃশ্য রিহার্সালকে উদ্দেশ করেই বক্তৃতা শুরু করলেন—'আলমগীর' আছে এখানে?

ধুলো ঝেড়ে দার্শনিক বার করলেন একটা ছেঁড়া ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলি।

পরিচালক বললেন—এ নাটকের মঞ্চসাফল্য সম্বন্ধে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। চরিত্র-বিশ্লেষণ বা ঘটনাবিন্যাস—ও সব অধ্যাপকের বিভাগ। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে দর্শক এ নাটকের ঘটনার গতিতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকতে বাধ্য। ভীমসিংহ-জয়সিংহ সম্পর্ক ; আওরংজেব-উদিপুরী ; কামবক্স্-রূপকুমারী ; সর্বোপরি মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের পটভূমিকা। সমান্তরালভাবে ছুটে চলেছে এতগুলি রসালো উত্তেজক কাহিনী। প্রত্যেকটিতে আছে আবার একটি করে মধ্যচরিত্র, যে অটল, যে নিরপেক্ষ, যার স্থৈর্য দুই অস্থিরতার মাঝখানে এক প্রচণ্ড ব্যতিক্রমের মতন দাঁড়িয়ে আছে। ভীমসিংহ ও জয়সিংহের মাঝখানে বৃদ্ধ রানা রাজসিংহ ; সম্রাট ও উদিপুরীর মাঝখানে দিলীর খাঁ ; কামবক্স্ উপাখ্যানে বিক্রমসিংহ ; এই মধ্যচরিত্র, অর্থাৎ ল্যাটিনে যাকে বলা হয় পুংক্টুম ইন্‌ডিফেরেন্‌স্, মঞ্চোপযোগী নাটকের এক প্রধান অবলম্বন।

যেমন 'হ্যামলেট'-এ হোরেশিও, 'ম্যাকবেথ'-এ ব্যাংকো, 'তপতী'-তে দেবদত্ত।

আর ঘটনার চমৎকারিত্ব ব্যাপাবে ক্ষীরোদবাবুর মুনশিয়ানা সর্বজনবিদিত। প্রথম দশ লাইনের মধ্যে মোগল অন্তঃপুরের একটি ট্র্যাজিডিকে তুলে ধরা হয়েছে ; রূপকুমারীকে হারেমে আনার চক্রান্ত চলছে ; উদিপুরী সেটা জানতে পেরেছেন। পরের দৃশ্যেই আওরংজেব এবং কয়েক লাইনের একটি স্বগতোক্তি মারফত সম্রাটের চরিত্র খোলা পুঁথির মতন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। তৃতীয় দৃশ্যের শুরুটা মঞ্চে কী রকম হয় একবার আন্দাজ করুন। বাঁশি বাজল (বাঁশিকে অমন অবজ্ঞা করার কী কারণ বুঝলাম না), আলো জ্বলল ; দেখছি—

'জয়সিংহ ও ভীমসিংহ তরবারিহস্তে পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান। মধ্যে রাজসিংহ।'

একটি আশ্চর্য কলহ শুনতে পেলাম ; রাজপুত শিভাল্‌রি-গত কলহ। চতুর্থ দৃশ্যে রাজসিংহ জয়সিংহকে কাটতে উদ্যত ; গঙ্গাদাস ও বীরাবাঈ বাধা দিচ্ছেন ; জয়সিংহ ধীরভাবে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় অঙ্কেও মুহুর্মুহু ঘটনা ঘটছে ; প্রথম দৃশ্যে গরীবদাস ও সুজাতা দেখছে ভীমসিংহ বাজ্যত্যাগ করছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে দিল্লিতে আওরংজেবের চক্রান্ত ; রাজনৈতিক কাহিনীটা দানা বাঁধল। তৃতীয় দৃশ্যটি বিখ্যাত আওরংজেব-উদিপুরীর একটি চমকপ্রদ কলহ। পঞ্চম দৃশ্যে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় ভীমসিংহ ; বীরাবাঈ কর্তৃক স্তন্যদান। তৃতীয় অঙ্কে নাটক দেখুন উদ্দাম গতি নিয়েছে , আওরংজেবের জিজিয়া করের ইস্তাহার উদয়পুরে জারি করা হয়েছে ; জ্যেষ্ঠপুত্রের বাজ্যত্যাগে কাতর রানার উপর এবার মোগল আক্রমণের হুমকি এসেছে। তৃতীয় দৃশ্যে তয়বর খাঁ ও রাজসিংহের একটি মধুর সাক্ষাৎকার। চতুর্থে কামবক্‌স্-রূপকুমারী কাহিনীর আরম্ভ। ষষ্ঠ দৃশ্যে রূপকুমাবীর বিষপানের উদ্যোগ এবং ঠিক সেই মুহূর্তে বীরাবাঈ-র প্রবেশ ও বাধাদান। এটা মঞ্চেব পুরোনো একটি কৌশল। শেক্‌স্‌পিয়ার ('ইট ইজ আই, হ্যামলেট দ্য ডেন'), ইবসেন ('ইওর কিন্‌স্‌ম্যান, গুডমুন্ড্‌'), রবীন্দ্রনাথ (তৃতীয় দৃশ্যে মালিনীর প্রবেশ), প্রত্যেকেই এই ধরনে ঠিক সময়ে ঠিক লোকটিকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসেন। এতে দর্শক চমৎকৃত হন। সপ্তম দৃশ্যে কামবক্‌স্-রূপকুমারীব সাক্ষাৎ ও কামবক্‌স্-এর মহানুভবতা প্রদর্শন। এই মহানুভবতাটা আসছে সম্পূর্ণ অতর্কিতে দর্শকের হৃদয় নিয়ে খেলতে। চতুর্থ অঙ্ক ; আসন্ন রাজনৈতিক ঝড়ে উদ্বিগ্ন রাজসিংহ ও কামবক্‌স্-এর সাক্ষাৎকার ; কামবক্‌স্-এর প্রবেশটিও পূর্বোক্ত রীতি-অনুসারে ; দেখুন—

রাজসিংহ ॥ শাজাদা কামবক্‌স্ শুনেছি বালক।

(কামবক্‌সের প্রবেশ)

কামবক্‌স্ ॥ সে বালক আমি—।

দ্বিতীয় দৃশ্যে হাস্যরস ; শাজাদা আকবরের মোসাহেব-সংসর্গে হল্লা। তৃতীয়ে উদিপুরীর ষড়যন্ত্রে পুষ্ট হয়েছে আওরংজেব-চরিত্রের আশ্চর্য নাটকীয় বিকাশ। পঞ্চমে ও ষষ্ঠে রাজপুত যুদ্ধপ্রস্তুতি, যুদ্ধ ও রূপকুমারী-উদ্ধার। পঞ্চম অঙ্কে আওরংজেবের যুদ্ধপ্রস্তুতি। দ্বিতীয় দৃশ্যে, দিল্লি-প্রাসাদে চরম নাটকীয় দৃশ্য ; মাতাল উদিপুরী ; কুলিশকঠোর আলমগীর ; কামবক্‌স্-

আকবর বিরোধ , ঠিক সময়ে জয়সিংহের প্রবেশ ; ঠিক সময়ে ভীমসিংহের প্রবেশ ; দেখুন—

আওরংজেব (জয়সিংহকে) ॥ এইবার বল তুমি জ্যেষ্ঠ। বল বল তুমি জ্যেষ্ঠ—

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম ॥ না সম্রাট, জ্যেষ্ঠ আমি।

এর পর থেকে নাটকের দৃশ্যগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্র শাণিত হয়ে এসেছে। মোগল-রাজপুত যুদ্ধের চমকপ্রদ ঘটনাবলি, উদিপুরী-কামবক্স্‌ ও শেষ দৃশ্যে আওরংজেব-রাজসিংহের আলিঙ্গন।

ঝোলানো সীনকে ব্যঙ্গ করলেন। কিন্তু যখন শ্রীসতু সেন-এর মঞ্চসংস্কার সত্ত্বেও বাংলা নাট্যশালায় বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তখন ওই ঝোলানো সীন ছাড়া আর কী দিয়ে দ্রুত পট-পরিবর্তন সম্ভব? একটি বা দুটি দৃশ্যের তো ব্যাপার নয় 'আলমগীর'। কখনো উদয়পুর প্রাসাদ, কখনো দিল্লির, কখনো এলাহাবাদ কেল্লা, কখনো মরুপ্রান্তর, আরাবল্লী পর্বত, গুহার অভ্যন্তর ; দৃশ্য থেকে দৃশ্যে ছুটছে নির্ঝরিণীব মতন ; কাবণ তবেই নাটক জনপ্রিয় হয়। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দৃশ্যান্তরে যেতে না পাবলে 'আলমগীর'-এর ঘটনার বন্যা বাধা পাবে, রসভঙ্গ হবে। ভগ্নপ্রায় বাংলা থিয়েটারে ঝোলানো সীন আর কাঠের খাঁজ-এ (গ্রুভ) আঁটা ফ্ল্যাট ছাড়া আর কিছুই ছিল না যা দিয়ে এ গতি বক্ষা করা যায়। আর সে গতি সঞ্চারিত হলেই 'আলমগীর'-এর মঞ্চ-সাফল্য অনেকটা নিশ্চিত এটা মানছেন তো! অর্থাৎ নাটকটা যে-রকম ঘটনা থেকে ঘটনায় প্রসারিত, তাতে মঞ্চকৌশলের সচেতন উপস্থিতি লক্ষ কবছেন?

নাট্যকার বললেন—আর একটু অতি-নাটকীয়, এটাও অস্বীকার কবা যায় না।

দার্শনিক বললেন—আর ঐতিহাসিক তথ্যের প্রচুর বিকৃতি ঘটেছে এটাও অনস্বীকার্য।

এবার খাপ খুললেন ভাষাবিদ ; বললেন—ঐতিহাসিক নাটক এটা নয়। যাঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদকে ঐতিহাসিক নাট্যপ্রণেতা বলেন তাঁরা নিতান্ত নির্বুদ্ধি। এ নাটকে তথ্যের ঐতিহাসিকতা খুঁজতে যাওয়া আব 'জুলিয়াস সীজারে' কেন ঘড়ি বাজলো সেটা অনুসন্ধান করা একই ধরনের বোকামি। আর 'অতি-নাটকীয়' কথাটা অর্থহীন। নাটকমাত্রেই নাটকীয় ; জীবন থেকে অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা। এখানে এত বড় বড় ব্যক্তিত্বের সংঘাত হচ্ছে, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হচ্ছে, এখানে ঘটনা অতি-নাটকীয় কী করে হচ্ছে? আমার তো মনে হয় ঘটনাকে এখানে যতই চটকদার করুন, সবই মানিয়ে যাবে।

নাট্যকার একটু ভেবে বললেন—হ্যাঁ, বোধ হয় ঠিক বলেছেন। 'নাটকীয়' বা 'অতি-নাটকীয়' সবই আপেক্ষিক। একটা ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে অতি-নাটকীয় মনে হতে পারে , কিন্তু নাটকের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ঘটনাটিকে দেখলে তা মনে হবে না। নাটকের অন্তঃস্থিত লজিকে ঘটনাটা সত্য বলে মনে হবে। এলিয়টের মতে নাট্যকৌশলের মজাই এই—

> It may allow characters to behave inconsistently but only with respect to a deeper consistency.

ওই গভীরতর সামঞ্জস্যই হল মঞ্চোপযোগী সব নাটকের মূলশক্তি। প্রচলিত যুক্তিতর্ককে পরাহত করে নাটক তার নিজের উদ্ভট যুক্তি সকলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। নাটক চলাকালীন কোনো প্রশ্ন আর মনে আসে না। ওথেলো কদ্দিন পর ডেসডেমোনাকে মারলেন বা হ্যামলেট কেন প্রতিশোধ নিতে দেরি করছেন, এ আরাম-কেদারার প্রশ্ন ; প্রেক্ষাগৃহের সীট থেকে এ প্রশ্ন

ওঠে না।

দার্শনিক বলে উঠলেন—আধুনিক নাটকে এই জাগতিক যুক্তিকে অস্বীকার করার ঝোঁক আরো প্রবল। ব্রেখ্‌ট্‌ বলেছেন—

> Incorrectness or considerable improbability even was hardly or not at all disturbing, so long as the incorrectness had a certain consistency. . All that matters is the illusion of compelling momentum in the story being told.

সেইজন্যেই ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাটক পড়ে ফয়খ্‌ট্‌ভাংগের চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—

> The plots of his plays are full of the crassest improbabilities.

পরিচালক টেবিলে পেনসিল ঠুকে বললেন—বন্ধুগণ! বৈদগ্ধ্য সংযত করুন। বিষয় থেকে সরে যাবেন না! 'আলমগীর' কেন অনৈতিহাসিক তার কারণ আছে। খুব সংগত কারণ আছে। আপনারা যা বললেন সবই সত্যি। কিন্তু তার ওপরেও আর-একটি জব্বর কারণ আছে। ১৯২১ সালে অভিনীত যে নাটক সে নাটকের দর্শক হিন্দুমুসলিম ঐক্যের বাণী শুনলে পুলকিত হবে ; তাদের ওই বাণী শোনানো দরকার এবং শোনালে নাটক জনপ্রিয় হবে—এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাসকে কিছুটা মঞ্চোপযোগী করে নিয়েছিলেন। এবং নাটকের শেষে স্পষ্ট করেই বলেছেন আওরংজেবের মুখ দিয়ে—

> আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ হিন্দু-মুসলমানের মিলন অভিলাষ মুখর হোক। এসো ভাই, জগতের অলক্ষ্যে (অর্থাৎ জগৎ-লিখিত ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে) . . . এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে হিন্দু-মুসলমানে একবার আলিঙ্গন করি।

গভীরতর সামঞ্জস্যের তত্ত্বটা সত্য বটে ; কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য, আমার মতে, এই হাততালি-জাগানো কথাগুলো। পুরো নাটকটায়, অভিনেতারা যদি একটু ক্ষমতাবান হন, তবে অন্তত সতেরো বার প্রেক্ষাগৃহ করতালিতে ফেটে পড়ার কথা। আমি গুনে দেখেছি। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটককে জনপ্রিয় করতে কোনো ত্রুটিই রাখেননি। অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে এমন বলিষ্ঠতা দিয়েছেন যে নাটকটা প্রায় অতিবিপ্লববাদে গিয়ে ঠেকেছে।

দার্শনিক সচকিত হলেন ; বললেন—যথা? যথা? ওই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-আহ্বান থেকেই আপনার ওই উপপত্তি নাকি?

নাট্যকার বললেন—না, না, উনি আওরংজেব চরিত্রের কথা বলছেন। যে আওরংজেবকে ইংরেজ ঐতিহাসিক আর হিন্দু বর্ণবিদ্বেষীরা মিলে দু শত বৎসর ধরে, কালো, বীভৎস, শয়তান সদৃশ করে এঁকেছে, তাঁকে এই নাটকে নির্ভীকভাবে এক বিরাট পুরুষ হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। মাইকেলের রাবণকে নায়কোচিত করে তোলার চেয়ে এর কৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়।

পরিচালক বলে চললেন—শুধু তাই নয়। হাততালির অজস্র উপকরণের ফাঁকে ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন এক মুষ্ট্যাঘাত হেনেছেন সমাজের মুখে যা নাকি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ পারেননি স্টেজে। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তনে' ধর্মান্ধতার বিভীষিকা দেখিয়েছেন ; 'বিসর্জন'-এ ভয়াল দেবীমূর্তিকে

পদতলে নিক্ষেপ করেছেন। ওই প্রচণ্ড পুরুষটিই পেরেছেন! আর পেরেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ। শুনুন, আওরংজেব বলছেন : রাজসিংহের উদ্দেশে তাঁর এই স্বগতোক্তি—

> তোমাদের যে কোনো দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ করে যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখতে তোমার সাহস থাকে, মন্দির মধ্যে ওই পুতুলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টিশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া-কর স্থাপন করেছি। মূর্তির সম্মুখে, তীর্থযাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে কর সংগ্রহের অত্যাচার—আর সেই জড়মূর্তির পশ্চাতে নরকের অন্ধকারভরা অন্তরালে কুক্ষিগত বীভৎসতা যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ ; সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-বৈরাগীর লীলাকাহিনী কী কুৎসিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ তাহলে এই চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে এই তীর্থমন্দিরগুলোকে অগ্নিসাৎ করতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে।

আওরংজেবকে যদি ধর্মান্ধরূপে চিত্রিত করতেন ক্ষীবোদপ্রসাদ, তাহলে বুঝতাম এ কথাগুলো সেই ধর্মান্ধতারই প্রকাশ। কিন্তু না। 'আলমগীব'-এর আওরংজেব উদারচেতা ; ধর্মবিদ্বেষ তাঁর নেই। আরেক জায়গায় আওবংজেব বলেছেন দিলীর খাঁকে—

> হিন্দুস্থানীর ভাষায় মোসলেমের অর্থ যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তাহলে মুসলমান হওয়াটা মোগল পাঠানেরই একায়ত্ত নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীব ভিতরেও অনেক প্রকৃত মুসলমান আছে—অনেক প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত।

তারপব বলছেন মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে উপহাস করে মাত্র ; তারা মুসলমান নামের অযোগ্য। সেই সঙ্গে বলেছেন—

> তবে হিন্দুবা তাঁকে যত উপহাস করে, মুসলমান আজও পর্যন্ত তত উপহাস করতে শেখেনি। হিন্দুর তীর্থ ভণ্ডে পরিপূর্ণ। মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়।

আওরংজেব-এর এই কথায় ক্ষীরোদপ্রসাদের বলিষ্ঠ গোঁড়ামিহীন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে আর এমন প্রচণ্ড বিপ্লবী কথা তিনি নির্বিবাদে দর্শককে গলাধঃকরণ করালেন কী উপায়ে? দর্শক মেনে নিল কী করে? দাঙ্গা বাধল না কেন? এই সেদিনও তো দেখেছি কর্ণ-কুন্তী-কৃষ্ণা-বিষয়ক নাটক অভিনয়কালে ধর্মের ষাঁড়েরা লিফলেট বিলিয়েছে থিয়েটারের দোরগোড়ায়, কৃষ্ণাকে নাকি অপমান করা হয়েছে এই মিথ্যা লজ্জাকর অজুহাতে। আর ১৯২১ সালে 'তীর্থ-মন্দিরকে অগ্নিসাৎ' আর 'মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়' প্রভৃতি কথা নির্ভয়ে বলে গেলেন কী করে ক্ষীরোদপ্রসাদ? কারণ নাট্যকৌশলে ক্ষীরোদপ্রসাদের অসাধারণ দখল। 'আলমগীর' নাটকের চমকপ্রদতা, ঘটনা-সংঘাত, হাততালির-ঝড়তোলা সংলাপ প্রভৃতি কৌশলে আগুন ছাইচাপা পড়েছে। দর্শক নিজের অজান্তেই ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে ওই কথাগুলো মেনে নিয়েছে। জনপ্রিয়তার মুখে ঝাঁটা মেরে ক্ষীরোদবাবু যদি নির্জলা প্রগতিবাদ উদগার করতেন তবে লোকে উঠে যেত, চেঁচাত, দাঙ্গা করত। ক্ষীরোদবাবু জনপ্রিয়তাকে নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন। তাই অমন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। দেখছেন?

নাটকের জনপ্রিয়তা বক্তব্যকে চেপে তো দেয়ই না, বরং সোচ্চার হতে সাহায্য করে। আজকালকার নাট্যকাররা রবীন্দ্র-ক্ষীরোদের এই কৌশলটা এদ্দিনে শিখতে পারলেন না, এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

আর-এক রাউন্ড চা-কেক নিয়ে এল কেষ্ট ; পরিচালক অমনি আহারে মাতলেন। মিনিট-পাঁচেক আর-কোনো কথা নেই, শুধুই পানাহার। তারপর নাট্যকারের দেওয়া একটা চুরুট নিয়ে বললেন—এবার আসা যাক 'আলমগীরের' সাহিত্যে, তার কাব্যস্ফুরণে। নাটকের সাহিত্যরস নাটকের উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িত এটা স্মরণ রাখতে হবে। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, একটা বিশেষ ঘটনাচক্রে সংলাপগুলোকে ওজন করে দেখতে হবে। নিছক একটি কবিতা কেউ খুঁজে পাবেন না নাটকে। প্রথমেই চোখে পড়বে বাগ্মিতা, রেটরিক। সেটাও অভিনেতার মুখে আবৃত্তির জন্যে লেখা ; তাই কোনো চরিত্রের মুখে কোন অবস্থায় সেটা বসান হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। আধুনিক বাংলা নাটকের অধিকাংশই এই এক কথায় সাহিত্যের আওতা থেকে বাদ পড়বে। কারণ আধুনিক নাট্যকাররা স্বাভাবিকত্বের নাম করে নাটক থেকে বাগ্মিতা কাব্য সব বিসর্জন দিয়েছেন। এমনকী স্বগতোক্তি পর্যন্ত এখন প্রায় নিষিদ্ধ। তাঁবা জীবনকে নাকি যথাযথ প্রতিফলিত করছেন ; আর জীবনে মানুষ নাকি কাব্যি করে কথা বলে না। অতএব মানবমনের না-বলার বৃহৎ জগৎটা এঁদের নাগালের বাইরে। কিন্তু মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এই বাগ্মিতার আশ্রয় নিযে চরিত্রেব মনের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। একটা বিশেষ আবেগে অস্থির হয়ে এঁদের চরিত্ররা হঠাৎ যেন নিজেকে দেখতে পায, আত্মোপলব্ধি করে। সেই আত্মোপলব্ধিই ঝরে পড়ে কাব্যসুষমাময় ভাষায়। সেটা জীবনানুগ কিনা এটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু সেটা যে জনপ্রিয় ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক জীবনানুগ বোবা, তোতলা চরিত্ররা সে জনপ্রিয়তার ধার ঘেঁষেও যেতে পারছে না।

কয়েকটা জনপ্রিয় উদাহরণ আগে দেওয়া যাক। লক্ষ করবেন, এর প্রত্যেকটাই আবেগমুহূর্তে চরিত্রের উচ্ছ্বাস-প্রকাশ।

মাইকেলের কৃষ্ণকুমারীকে এক ছদ্মবেশী দূতী এসে প্রিয়তমের খবর দিয়ে সরে পড়েছে। কৃষ্ণকুমারী বলছেন—

> এ যে কি মায়াবলে আমাকে উতলা ক'বে গেল আমি তা কিছুই বুঝতে পাচ্যি নে। হা রে অবোধ মন, কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস। নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়?

'নীলদর্পণ'এ মহাসর্বনাশে বসুপরিবার ধ্বংস হযে যাচ্ছে। সরলতা বলছেন—

> ·এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত ; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন , বহ্নিবানের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণমাত্রেই কালনিদ্রারূপ নিদ্রায় অভিভূত।

'মালিনী'তে বন্দী ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে বলছেন, মালিনীর মোহে আমিও তো আকৃষ্ট হতে পারতাম, হয়েছিলামও—

অপূর্ব সংগীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মতো—সর্ব সফলতা
জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মুঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে।

'আলমগীর'-এ উদিপুরী মদ্যপান করেছেন আর নিজের মনেই বলছেন—

> আজ কি আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব খাচ্ছি রে? খাচ্ছি—উল্লাসকে কাঁদাতে। নইলে সে এখনি আমাকে মেরে ফেলত। বুকের ভিতবে পশে, তুলেছে সে এমনি পাষাণ-চূর্ণ করা-বিদ্রোহ।

প্রথমটি আত্মবিলাপ, দ্বিতীয়টি চরিত্রদের দুঃখে তাদের ভীষণ দুর্দৈবে প্রকৃতির অংশগ্রহণ—প্যাথেটিক ফ্যালেসি, তৃতীয়টি (কবিত্বে এটি স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ) সবাসরি সংলাপ ; চতুর্থটি আত্মোপলব্ধি। প্রধানত এই চার রকম ক্ষেত্রে বাগ্মিতাপূর্ণ কাব্যময় ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাটকীয়ত্বে চতুর্থই যে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ থাকতে পারে না। নায়ক যখন নিজেকে চিনতে চেষ্টা করে তখন যেমন একটা বিষাদের ভাব স্বভাবতই জেগে ওঠে তেমনি প্রচ্ছন্ন থাকে একটা নৈর্ব্যক্তিক হাসি যেটা সেই বিষাদকে আবো উজিয়ে দেয়। 'তপতী'তে বিক্রম বলছেন—

> তুমি আমাকে চিনতে পারলে না—তোমার হৃদয় নেই, নারী। শঙ্করের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করতে পারো কি? সে তো অপ্সরার নৃত্য নয়। আমার প্রেম, এ প্রকাণ্ড, এ প্রচণ্ড , এতে আছে আমার শৌর্য—আমার রাজপ্রতাপের চেয়ে এ ছোটো নয়।

এ কথার মধ্যে সত্যভাষণ কতটা, দম্ভ কতটা, আব নিজেকে উপহাস কতটা, একবার ভেবে দেখবেন। তেমনি একটা সংলাপের টুকবো দেখুন 'আলমগীব' থেকে—

> উদিপুরী ॥ আমি দেখছি আপনাব ভিতর দুটো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমোয় তখন আসলটা জাগে। আবাব নকলটা যখন জাগে, তখন আসলটা গভীব নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তাব অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।
>
> আওরংজেব ॥ না, কেন? তা হলে নকলটাকে তোমারই সুমুখে শেষ করি? (অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা)
>
> উদিপুরী (অস্ত্র ধরিয়া) ॥ জাঁহাপনা! এইবারে দেখছি, দেবদূত আপনার জাগ্রত চৈতন্য আক্রমণ করলে।
>
> আওরংজেব (শয়ন করিলেন) ॥ যাও, আমার মরা হয়েছে। তুমি আমার জীবিতেশ্বরী।

স্পষ্ট একটা চাপা হাসি শুনতে পাচ্ছেন? নিজেকে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে হাসিপেতে বাধ্য। উচ্চ কান্নার মধ্যেও সে হাসি শোনা যেতে বাধ্য। কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে?তবু এটা সত্যি। নিজেকে দেখার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হলে নিজের দুঃখকে বাঁচবার লড়াইকে হঠাৎ হাস্যকর লম্ফঝম্প মনে হয়। সেই তৃতীয় চক্ষু পেয়েই লিয়ার গভীর দুঃখে বলে ওঠেন—

Is man no more than this? Consider him well Thou owest the worm no silk, the beast no hide, the sheep no wool, the cat no perfume—Ha ! here's three of us are sophisticated.

এই একই আত্মোপলব্ধিতে কবি বলে ওঠেন—

করিয়াছি বীণার সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস
পরিহাস করি!

ভাষাবিদ বললেন—থিওফিল গোতিয়ে বলেছেন একই সুরে : আমাদের দুঃখ দেখে ভগবান হাসেন নাকি?

ক্রাইয়ে-ভূ দঁ কে দিয়্যসা' মুজ আ ভোয়া সুফ্‌রির?

পরিচালকের চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, চুরুট নিভে গিয়েছিল। কিন্তু উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন বলে ওসব গ্রাহ্য না করে বলে চললেন—তেমনি আওরংজেবেরও তীব্র ব্যঙ্গের সুরে নিজেকে কশাঘাত করা—

আওরংজেব ॥ স্মৃতিপথের মাঝে এক একবার ওই মেয়েটা এসে দাঁড়াচ্ছে।
দিলীর ॥ কে মেয়ে?
আওরংজেব ॥ সেটা কে, কোথাকার, কি, কেন—শ্যামসিং চলে গেল?
দিলীর ॥ তাকে ডেকে আনব?
আওরংজেব ॥ না, যখন চলে গেছে, তখন আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে থাকলে বলতুম। তখন স্মরণে এল না। আমিই সে মেয়েটার ঘটকালি করতুম। তার যোগ্য পাত্রের সন্ধান বলে দিতুম। তার পর নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতুম।

আবার শুনুন নির্মম আত্মপরিহাস—

আওরংজেব ॥ আমার রূপও নেই, যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন তক্তৃতাউস, আর তার চারপাশ ঘিরে আসমুদ্র হিন্দুস্থান। এ যার আছে তার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

আবার শুনুন সে হাসি প্রায় উন্মাদের অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে—

আওরংজেব ॥ মক্কা যাবার পূর্বে আমি একবার দেখে যাই, সমস্ত হিন্দুস্থান আমার পদানত হয়েছে। (ঊর্ধ্বদৃষ্টি) যাও—তুমি কাফের—তুমি কাফের—তুমি কাফের। (অপ্রকৃতিস্থ ভাব)
দিলীর (সক্রোধে) ॥ কে? আমি জাঁহাপনা? (তরবারি স্পর্শ)

আওরংজেব (প্রকৃতিস্থভাবে) ॥ না ভাই—তুমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমি আমার অন্তরের সংশয়টাকে গালি দিচ্ছি।

এই হাসি-মেশানো খেদোক্তি জনপ্রিয় নাটকের শক্তিশালী এক অঙ্গ! বোধ হয় নিজেকে বাইরে থেকে দেখার সঙ্গে দর্শকের দেখাটা এক হয়ে যায়। দর্শকের অন্তরস্থিত আবেগটাকেই বোধ হয় ওই ধরনের বাগ্মিতায় প্রতিধ্বনিত করা হয়। কারণ সবচেয়ে করুণ, সবচেয়ে নাটকীয় যে-দৃশ্য তাতেও দর্শকের হাসি ক্রমাগত বেরুবার রাস্তা খুঁজতে থাকে। করুণ দৃশ্যে সামান্যতম বিচ্যুতি যে অভিনেতার ঘটেছে তিনিই এর সাক্ষী ; দর্শক সুযোগ পেয়েই হেসে উঠেছে। সেই হাস্য-সম্ভাবনাটাকেও নাটকের কাজে লাগাবার এই এক উপায় ; উদ্যত হাসিটাকে বিষাদের পথে চালিত করে দেওয়ার উপায় এই আত্মোপলব্ধির করুণ হাসি। নিজের হাসিটাকে মঞ্চের ওপরই এমন অশ্রুসিক্ত হতে দেখে দর্শক আশ্বস্ত হন ; ট্র্যাজিডির দিকে তাঁর মন আরো একাগ্রভাবে নিবদ্ধ হয়। এইখানেই 'হ্যামলেট'-এ দুই করুণ ভাঁড় গ্রেভ্‌ডিগারদের সার্থকতা ; এইখানেই কিং লিয়ার-এর বিখ্যাত ভাঁড়-এর কৃতিত্ব ; এইখানেই 'তপতী'-র শেষ দৃশ্যে থমথমে আবহাওয়ায় দেবদত্তের পরিহাসের তাৎপর্য। এই মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই মঁসিয়্য ভের্দুর সৃষ্টি। হাসিকান্নার সীমারেখাটা অতি ক্ষীণ।

উল্লিখিত চার রকমের বাগ্মিতাই 'আলমগীব'-এ বর্তমান ; কিন্তু নাটকের চরম মুহূর্তগুলিতে আত্মোপলব্ধির হাসিটাই বেশি।

এই পর্যন্ত বলে পরিচালক আর-একবাব দম নিলেন। সেই ফাঁকে নাট্যকার বললেন—পুরো 'আলমগীর'-কে আপনি মঞ্চোপযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করছেন। সাহিত্যের পরিসর আরো বৃহৎ। নাটক হয়েও আরো একটা কিছু হতে হবে 'আলমগীর'-কে ; তবে সে সাহিত্যপদে উঠতে পারে। মঞ্চকে অতিক্রম করে 'হ্যামলেট' চিন্তারাজ্যের বৃহত্তম প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিচিত হয়েছে বলেই না সে সাহিত্য।

পরিচালক বললেন—তবে আরো চা বলুন ; রিহার্সালটা তো গেছেই। আড্ডার এই পরিণাম!

আমরা হাঁকডাক করে চা আনালাম। খানিক চা খেয়ে পরিচালক বললেন—নিশ্চয়ই। 'আলমগীর'ও নাটক হযে আরো কিছু। কী সেটা? অত সহজে সেটাকে নির্দিষ্ট করা যাবে না। তবু চেষ্টা করলে খানিকটা পারতেও পারি। চিন্তা স্বভাবতই একটু উচ্ছৃঙ্খল। স্বপ্নালু। শিল্পের কাজ হল সেটাকে নিয়মে বাঁধা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ—
স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বেব আদিম উপাদান।
তাহারা দমনে রাখে, ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।

নাট্যকারের কাব্যস্বপ্নও যদি শিল্পশৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, তবেই তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নচেৎ ইতস্তত-বিক্ষুব্ধ স্বপ্নালুতায় সে কাব্য ব্যর্থ হবে। নাটকের বৃহৎ পঞ্চাঙ্ক পরিসরে সে ভাবালুতা

ছড়িয়ে পড়ার প্রচুর জায়গা পায়, এবং সুযোগ পেলেই ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে ধ্বংস করে। এ ধরনের ব্যর্থ কাব্যের নিদর্শন বহু নাটকেই পাওয়া যাবে। শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার অভাবে মুহুর্মুহু উপমা-আদি নিজেদের গলা কেটেছে ; স্বভাবকবি যে নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে এ ঘটতে পারেনি। 'কৃষ্ণকুমারী' একটা পদ্মফুলকে ঘিরে রচিত বলে প্রতীত হয় ; সেই পদ্মর মূর্তিকল্প, সে পদ্মের সৌরভ সারা নাটকে নিজেকে ব্যাপ্ত করেছে ; সেই সৌরভই শৃঙ্খলের কাজ করেছে। আরেক দিন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রকৃতি আর ঋতুতে ঘেরা; বর্ষার আমেজ 'অচলায়তন'কে আগাগোড়া সংহত করেছে ; বর্ষার রূপ, বর্ষার উপমা নাটকের কাব্যকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তেমনি 'রক্তকরবী'কে করেছে শীত।

'আলমগীর'-এর কাব্যকে বেঁধেছে কে? আমার মতে, একটা তৃষ্ণা, মরুভূমির একটা জ্বলন্ত রূপ। জলের তৃষ্ণায় ছটফট করছে নাটকের প্রত্যেকটা মানুষ। সে জল, সে রস শুধুই জল নয়। সে মরুপ্রান্তর শুধুই ভৌগোলিক মরুভূমি নয়। না, বাধা দেবেন না ; জানি এটা প্রমাণসাপেক্ষ ; প্রমাণ দিচ্ছি। প্রমাণ করব যে এই মরুতৃষ্ণা নাটকের কাব্যকে ঐক্য দিয়েছে, নাটকের প্রত্যেক চরিত্রকে কাব্যময় করেছে, তাদের নিছক পার্থিবতা ঘুচিয়ে তাদের করেছে কাব্যস্বপ্নের প্রতীক।

ভীমসিংহের অভিমান যে তার জ্যেষ্ঠতা গোপন করে তার দেবতুল্য পিতামাতা তাকে প্রতারিত করেছেন। সেই অভিমানের কী উপমা দিচ্ছে সে?

> সে অভিমান দারুণ বজ্রের প্রহারের মতো ; শিলাবিদ্রাবী আগ্নেয় গিরিগহ্বরের
> উত্তাপের মতো শতসূর্যের প্রখরতায় দীপ্ত।

পিতামাতার রস থেকে বঞ্চিত হয়েছে যে, তার অভিমান উত্তাপের মতন। অতএব স্বেচ্ছায় সে চলে গেল রাজ্য ছেড়ে মরুপ্রান্তরে। অন্তরে যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা তাই এবার প্রত্যক্ষ, দৈনিক তৃষ্ণায় পরিণত হয়ে তাকে পোড়াচ্ছে। রানা রাজসিংহ তার সম্বন্ধে বলছেন—

> গঙ্গাদাস! ..তাকে একবিন্দু জল খাওয়াতে পারো? নিদাঘে চাতক যা পাবার
> জন্যে আকাশপানে চেয়ে আর্তনাদ করে। পিতৃপুরুষ যা পাবার জন্য উন্মত্ত
> ঝঞ্ঝায় হাহারবে ঘুরে বেড়ায়—এক বিন্দু?

স্বেচ্ছায় সে নিজেকে মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করেছে ; তাকে জল খাওয়াতে পারলে তার প্রতিজ্ঞা ভাঙবে। রাজসিংহ বলছেন ·

> দোবারির এপারে অগাধ জল-রাশি। . . . কিন্তু ওপারে? কী শুষ্ক কী কঠোর
> কী উত্তপ্ত শিলাপ্রান্তর!

এ শিলাপ্রান্তর শুধুই রাজস্থানের ভৌগোলিক বর্ণনা নয়, এ ভীমসিংহের উত্তপ্ত অভিমানেরই মূর্ত রূপ। তাই সেখানে সে স্বেচ্ছায় তৃষ্ণায় মরতে চাইছে। বাঁচাল কে? যে-রস থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত মনে করেছিল সেই রস, বীরাবাঈয়ের স্তন্যদুগ্ধ।

> বীরাবাঈ ॥ এই নাও। দোবারির ওপারে নয়, এ পারে। জল নয়, দুগ্ধ . . . এ
> তোমার বিমাতার নির্মল স্নেহরসের প্রতিনিধি।

ভীমসিংহের কাছে পিতামাতা রসের উৎস ; মরুপ্রান্তর তার অভিমান।

ক্ষীরোদপ্রসাদের এই মরুপ্রান্তর যে কোনো ভৌগোলিক প্রান্তর নয় তার প্রমাণ দিল্লির দৃশ্যগুলিতে উদিপুরীর কথা, আওরংজেবের কথা। উদিপুরী বলছেন আওরংজেবকে—

কাশ্মীরের সেই . . . অপূর্ব আধাব হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যে দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এর পরেই নিজেকে পর পর 'জলচারিণী', 'জলকেলিরতা', 'চক্ষুতারকায় সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা' প্রভৃতি বলে বর্ণনা করেছেন। উদিপুরী একদিন ছিলেন মূর্তিমতী সুধাধাবা, জলস্রোত। আওবংজেবও সেটা স্বীকার করছেন পরোক্ষে ; বলছেন—

আলমগীর ভণ্ড-জগতের উপর খড়্গহস্ত—কুটিলতা তার চক্ষুঃশূল। কিন্তু উদার সরলতার সম্মুখে সে তরল জলধারার কাছে বেতস লতার ন্যায় নমনীয়।

কিন্তু আলমগীর প্রচণ্ড ; আলমগীর মূর্তিমান বহ্নি, আলমগীবের প্রতাপে উদিপুরীর জলস্রোত মরুপ্রান্তরে হারিয়ে গেছে। উদিপুরী বলছেন—

উৎসব করতে গিয়ে চোখেব কোণ দিয়ে কতকগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ . . . উঃ! কী বেগেই না তারা ছুটল—আমাব উৎসবের সমস্ত আয়োজন পুড়িয়ে দিলে।

এবং অবশেষে অপমানের মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে জলচারিণী উদিপুরী স্পষ্টই বলছেন তয়বর খাঁকে—নিজেব চোখের দিকে দেখিয়ে—

এ মরুভূমিতে এর পূর্বে আব কখনো কি জল দেখেছিলে?

ক্ষীরোদপ্রসাদের মরুপ্রান্তর উদিপুরীর অপমানের মূর্ত রূপ। পুরো দিল্লিই যেন সেই মরুপ্রান্তরে পবিণত হয়েছে ; রাজসিংহ হঠাৎ বলে উঠেছে—

তপ্ত দিল্লির মাটিতে পা দুটো যে পুড়ে ছাই হবাব জোগাড় হল।

শেষ পর্যন্ত নিজেবই পৌরুষের আগুনে সৃষ্ট মরুপ্রান্তবে আটকা পড়লেন আওরংজেব স্বয়ং। বলে উঠলেন—

পিপাসার্ত আলমগীর! জল জল—আত্মার পিপাসা—চাই জল . . বুঝি আত্মা চেয়েছিল সত্যের ঝরনা থেকে ঝরা জল। কেউ দিতে পারলে না।

আবার সেই তৃষ্ণা! ভীমসিংহেব তৃষ্ণারই এ প্রতিধ্বনি। এবারও রসের তৃষ্ণা। সত্যের তৃষ্ণা। ভণ্ডামিতে-ভরা মরুপ্রান্তরে আওরংজেব-এর আত্মা বন্দী। অনতিবিলম্বে তিনিও ভীমসিংহের মতন দেহের তৃষ্ণায় আক্রান্ত হলেন। ভৌগোলিক মরুপ্রান্তরে আটকা পড়ে আলমগীর বলছেন—

গুহা আমাকে পিপাসা দিয়ে আক্রমণ করেছে। মনে করেছে আমি কাফেরের জল গ্রহণ কবব।

শেষে জল নিলেন সত্যাশ্রয়ী ভীমসিংহেব হাত থেকে ; জলপান করে হেসে বললেন—

দেখছ কি গুহা-রাক্ষসী, আমি কাফেরের জল গ্রহণ করিনি।

এই জলের জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলেন আলমগীর ; এই তো সত্যের ঝরনার জল ; মিলনের জল। এই জল পান করেই তো রাজসিংহকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মুসলমান সম্রাট।

আওরংজেবের তৃষ্ণা এই সত্যরসের জন্য ; মরুপ্রান্তর তাঁর কাছে বিরোধ আর অসত্যের জগৎ।

তৃষ্ণার জল আর মরুর উত্তাপ পুরো নাটকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কামবক্স রূপকুমারীকে যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়ে বললেন—

দেখছি যেন চাঁদিনীমাখা দরিয়ায় উথলে ওঠা তরঙ্গ।

তৃষ্ণার্ত কামবক্স। রূপকুমারী তার জলস্রোত।

বীরাবাঈ এসেছেন, রক্ষা করেছেন রূপকুমারীর প্রাণ ; বলছেন—

> তুর্কীর সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা শুনে এ নগরে জলস্পর্শ করব না সংকল্প করেছিলুম। আমি বড় পিপাসার্ত, আমাকে একটু জল দাও।

কিসের পিপাসা? রূপকুমারীকে রক্ষা করেই তার সতীত্ব রক্ষার কথা ভাবছেন বীরাবাঈ; সংকল্প করেছেন নিজের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেবেন ; বলছেন—

> স্বর্গে গিয়েও যে সতীন উষ্ণ নিঃশ্বাসের জ্বালায় অস্থির করে আমাকে গৃহ ছাড়িয়েছে, পথের মাঝে সেই সতীন কলেবর ধরে আমারই কাঁধে ভর করলে।

উষ্ণ নিঃশ্বাস! সব কিছু ছেড়ে মরুর ক্লেশকে স্বীকার করাতেই বীরাবাঈয়েব আনন্দ। তাই তিনিও প্রত্যক্ষ মরুপ্রান্তরে প্রবেশ করে ভীমসিংহের মা হলেন।

এমনকী ক্ষুদ্র চরিত্র আকবর, সেও মোসাহেবদের সঙ্গে মদ খেতে খেতে ভাবছে, বাঙলায় যাওয়া কেন দরকার। একজন মোসাহেব বলে দিল—

> বাঙলার মাটিতে রস আছে।
>
> আকবর ॥ নদী সেখানে উজান বয়।
>
> তৃতীয় মোসাহেব ॥ এটা আমাদের দেখতে হবে। শুধু দেখতে হবে কেন—হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে হবে।
>
> দ্বিতীয় মোসাহেব ॥ যেহেতু শাজাদার বয়সটাতে কিছু উজান বহাবার প্রয়োজন হয়েছে।

আকবর তৃষ্ণার্ত। তারও উজানের প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নির্মম লেখনীর কাছে নিস্তার নেই। তাকেও রাজ্যলোভে মরুভূমিতে যেতে হল রাজনৈতিক মরুপ্রান্তরে, প্রত্যক্ষ ভৌগোলিক মরুভূমিতে।

একটু থেমে পরিচালক বললেন—দেখতে পাচ্ছেন? একটা মরুতৃষ্ণার জ্বালায় প্রায় প্রতি চরিত্র ছটফট করে মরছে। তারই প্রত্যক্ষ প্রতীক হিশেবে আসছে রাজস্থানের মরুভূমি। এ মরুকল্পনাই পুরো নাটকের কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলিত করে শিল্পে উন্নীত করেছে। প্রতি চরিত্র তাই শুধুই একটা কাহিনীতে, একটা জাগতিক ছকে আবদ্ধ না থেকে, সংকেতে ভরে উঠেছে, বাঙ্ময় হয়েছে, কাব্যকল্পনার প্রতীক হয়েছে। উইলসন নাটক সম্বন্ধে বলেছেন—

> The persons, ultimately, are not human at all but purely symbols of a poetic vision

এ কথা 'আলমগীর' সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দেখেছেন? ভালো নাটক একাধারে জনপ্রিয় এবং কাব্যময় হয় কী করে। 'আলমগীর'-এর মতন নাটক পেলে আমার মতন ক্ষুদ্র জীবের কলম চালাবার প্রয়োজন হয় কি?

হ্যামলেট ও জনপ্রিয়তা

সেদিন পরিচালক এক দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে এনে আমাদের পাঠ করে শোনালেন। বললেন—একটা ফ্যাশান আছে—ফ্যাশান অথবা রাজতোষণ যাই বলুন না কেন—ব্যর্থ নাট্যকারদের ফ্যাশান। মুখে চুরুট বা সিগারেট গুঁজে তাঁরা বলে ওঠেন—ভালো নাটক আর জনপ্রিয় নাটকে আছে বিরাট বিরোধ। এ চীনের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য। সত্যিকারের ভালো নাটক লিখলেই দর্শক সেটাকে বয়কট করেন। আর বাজে নাটক লিখলে তাঁরা আদর করে গ্রহণ করেন। এর দৃষ্টান্ত হিশাবে তাঁরা নিজের নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, মেতেরলিংক প্রভৃতির নাম যুক্ত করে এই সিদ্ধান্তে আসেন—একদিন না একদিন এঁরা তিন জন নাট্যকার হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় সব শিল্পস্রষ্টার মধ্যে একমাত্র নাট্যকারকেই চলতে হয় একান্তভাবে বর্তমানকে স্বীকার করে। এখন আমাকে কেউ না বুঝুক, ভবিষ্যতে বুঝবে—এ কথা নাট্যকারের মুখে অসার দম্ভোক্তির মতন শোনায়। প্রতি মুহূর্তে দর্শকদের প্রত্যক্ষ সমালোচনায় নাটক উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ হয়—অভিনেয় নাটককে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেই হয়। তাই জনপ্রিয়তা আর উৎকর্ষ (নাটকের বেলায়) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্যই জনপ্রিয় হতে গেলে নাটককে কিছু চাহিদা মেটাতেই হয়। কিন্তু তা বলে এই চাহিদা মেটানোর জন্য কি দর্শকের হীনতম প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে যেতে হবে? জনপ্রিয়তার অজুহাতেই তো বোম্বাই-মার্কা ছবির সব উচ্ছৃঙ্খলতার ভিত্তি! নাকি, জনপ্রিয়তার চৌহদ্দির মধ্যেই ভবিষ্যতের দিশারি নাটক সৃষ্টি হয়, চিরকাল হয়েছে? কালকে স্বীকার করেই কালজয়ী ক্ল্যাসিক সৃষ্টি হয়। জনপ্রিয়তাকে উন্নাসিকের মতন অবজ্ঞা করলে শুধু অর্থহীন পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে যার সঙ্গে মানুষের যোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাবে। জনপ্রিয়তাকেই লক্ষ্য করে তোলা যেমন চলে না, তেমনি জনপ্রিয়তাকে বাদ দিলেও চলে না।

আমরা 'হ্যামলেট' নাটক নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করব। 'হ্যামলেট' যে শ্রেষ্ঠ কালজয়ী সৃষ্টি এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই। হ্যামলেট-চরিত্রের গূঢ় তাৎপর্য নিয়ে এখনো পর্যন্ত পণ্ডিত-মহলের গবেষণার শেষ নেই। নাটকের গভীর মানবতাবাদ এখনো আমাদের অভিভূত করে। রেনেসাঁস যুগের মানববন্দনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হ্যামলেট। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠতম ঘোষণা হ্যামলেট। মরণোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের জঘন্যতম ছবি 'হ্যামলেট'। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রতীক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক, আঘাতে পরাঙ্মুখ মানবদরদী চিত্তের প্রতীক হ্যামলেট। রক্তপাতে, যুদ্ধবিগ্রহে বিতৃষ্ণ হ্যামলেট চিরন্তন বুদ্ধিজীবীর প্রতিমূর্তি—আপনার ব্যথায় আপনি মথিত, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন—নিঃসঙ্গ বিদ্রোহী হ্যামলেট। এত জটিল, এত গভীর চরিত্র আজ পর্যন্ত সৃষ্ট হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। মহাপণ্ডিতরাও এখনো সম্যক মেপে উঠতে পারেননি হ্যামলেটের বিভিন্ন দিক। নিত্য নূতন বই বেরুচ্ছে, নিত্য নূতন অভিনয়

হচ্ছে।

কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ার কি তাঁর দর্শককে অস্বীকার করেছিলেন? কত টিকিট বিক্রি হল এটা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল? না, তৎকালীন দর্শক যা চাইত সব দিয়েও 'হ্যামলেট'কে নিয়ে গেলেন সব চাওয়ার উপরে? 'হ্যামলেট'-এর যে বিপুল জনপ্রিয়তা সে যুগে—তার কারণ এ নয় যে, দৈববলে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে এমন দর্শক ছিল যারা 'হ্যামলেট'-এর গভীরতার তাৎপর্য উপলব্ধি করে ফেলেছিল। আসলে এই জনপ্রিয়তার কারণ—সাধারণ দর্শককে খুশি করার সব উপাদান রয়েছে 'হ্যামলেট'-এ। ১৬০২ সালের লন্ডনকে ভালো করে চিনতেন শেক্‌স্‌পিয়ার; দর্শককে টানবার অদ্‌ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর; এবং তারা যা চায় অকাতরে সেসব সন্নিবিষ্ট করতে পিছপা হতেন না শেক্‌স্‌পিয়ার। জনতার ছোঁয়া লেগে 'হ্যামলেট' অশুদ্ধ হবে এ ধরনের দম্ভ ছিল না তাঁর।

সে-যুগের দর্শক

রেনেসাঁসের লন্ডন—এক বিচিত্র স্থান। লেখা পাওয়া যায় প্রচুর; স্পষ্টই প্রতিভাত হয় মানুষগুলির চেহারা। সবচেয়ে দলভারী ও সদর্প শ্রেণী ছিল অ্যাপ্রেনটিসরা—সদ্য গড়ে-ওঠা অসংখ্য ছোট ছোট শিল্পায়তনের মজুবরা। এদের বিরুদ্ধে অভিজাত ও হঠাৎ-বড়লোক শ্রেণীর আক্রোশের শেষ নেই। কথায় কথায় বলছেন তাঁরা—কী দিনকাল পড়েছে! ছোটলোকরা এখন বাবু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গায়ে ঢলে পড়ছে। হ্যামলেট বলছেন .

> By the Lord, Horatio, this three years I have taken note of it, the age is grown so picked, that the toe of the peasant comes so near the heel of our courtier, he galls his kibe

অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিষ্কর্মা যুবকের দল গাড়ি হাঁকিয়ে লন্ডনের রাস্তা সরগরম করে রাখতেন। ফাইন্‌স্‌ মরিসন তাঁর 'ইটিনেরারি' (১৬১৭) গ্রন্থে বলছেন—বড়রাস্তায় হাঁটা দায় হয়েছে, এত জুড়িগাড়ির ভিড়! লন্ডনের বাইরে সড়কের উপর যে ডাকাতির পশরা বসেছিল এই বেকার ধনীরা ছিল তার পাণ্ডা। ফল্‌স্টাফ্‌ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এই রকমই একটি দল। জন আর্ল তাঁর 'মাইক্রোকস্‌মোগ্রাফি' (১৬২৮) গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন—লন্ডনের বাইরে তো বটেই ভেতরেও পল্‌স্‌ ওয়াক প্রভৃতি সড়কে দিনেদুপুরে এই অভিজাতরা দাঙ্গা, ডাকাতি, জুয়া ও মদের আড্ডা বসাতেন। কথায় কথায় দস্তানা খুলে তাই দিয়ে এক চড় কসাতেন আর-একজনের গালে—অর্থ: দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার খুলে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ! রাত্রে ছিল নারী নিয়ে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। শুঁড়িখানাগুলোকে বলা হত ট্যাভার্ন। রাত্রে এখানে বইত মদের স্রোত ও দেহোপজীবিনীদের গান আর হাসি। ডেকার তাঁর 'সেভেন ডেড্‌লি সিন্স অফ লন্ডন' (১৬০৬) গ্রন্থে কাব্যময় ভাষায় বলছেন—রাতই হল এই বড়লোকদের লীলার সময়; অন্ধকারই এদের বন্ধু।

ডেকার-এর বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ। দিনের বেলায় লন্ডনের সড়ক বর্ণনা করছেন—বাড়ির থামগুলো কেন দেওয়া হয়েছে জানো? নইলে ভিড়ের ধাক্কায় বাড়িগুলি ধ্বসে যেত। কামারশালের হাতুড়ির শব্দ আর ধাতুর বাসনের ঝনৎকারে কান পাতা ভার। কুলিরা ছুটে চলেছে—পিঠে

টাকার বোঝা ; পেছনে চলেছে তাদের প্রভুরা—বড়ো বড়ো সব সওদাগররা। দোকানে দোকানে ভিড়। আর সবাইকে এড়িয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে ফিরিওলার দল।

চীপসাইড দরিদ্রতম অ্যাপ্রেন্‌টিস্‌দের আবাসস্থল। তার ভীষণ ছবি এঁকেছেন ডোনাল্ড ল্যাপটন তাঁর 'লন্ডন' (১৬৩২) গ্রন্থে। বলেছেন—এখানে কিছু মেয়ে এখনো সতী আছে। তবে সে শুধু সুযোগের অভাবে। তারপর বিখ্যাত লন্ডন ব্রিজ প্রসঙ্গে অবলীলাক্রমে বলছেন—ওখানে আর যাওয়া যায় না ; ছোটলোকেরা বড়ো জ্বালায়।

স্যর টমাস ওভারবেরি তাঁর 'ক্যারেক্‌টার্স' (১৬৫৪) গ্রন্থে আর-এক সংকটের উল্লেখ করছেন—টেম্‌স্‌ নদীর মাঝিরা। যতক্ষণ নৌকোয় থাকে হাঁকডাকে চারিদিক উদ্বেলিত করে তোলে। ব্যবসায়ে নিশ্চয়ই মন নেই, কারণ, বড়লোক খদ্দের দেখলেই অপমান করে। আর যখন ডাঙায় ওঠে তখন তো কথাই নেই ; সব সময়ে খেপে থাকে—বড়লোক দেখলেই ইতবসুলভ উক্তি করে। একমাত্র থিয়েটারে গিযে এরা ঠাণ্ডা থাকে—মনের মিল খুঁজে পায় বোধ হয। খুব খানিকটা তুষাবপাতে ব্যাটারা জমে মরে না কেন!!!!

একজন বিদেশি—ভুরটেমবের্গ-এর ডিউক ফ্রেডেরিক ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে এসেছিলেন। বলছেন—ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, হামবুর্গ এবং আবো বহু রাজ্য থেকে জাহাজ আসে টেম্‌স্‌ নদী বেয়ে—ব্যবসা ফেঁপে উঠছে লন্ডনের। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা বড়ো গর্বিত, বড়ো দাম্ভিক। বিদেশি দেখলেই পেছনে লাগে। কিছু বলার জো নেই ; তাহলেই মজুরের ভিড় জমে যাবে, মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হচ্ছে তখন ; ফ্রেডেরিকের চোখে অসহ্য ঠেকলেও প্রথমটা অমন জঙ্গি হওয়া অতি-স্বাভাবিক ঐতিহাসিক সত্য।

লন্ডনের অধিবাসীর হাতে তখন কাঁচা পযসা জমেছে জীবনে প্রথম। সর্বোৎকৃষ্ট সরাইখানায়ও মাত্র ছ পেন্স খরচ করলে বিপুল খাদ্যসম্ভার পাওয়া যেত। উদ্বৃত্ত অর্থের একটা বড়ো অংশ খরচ হত তামাক কিনে, থিযেটার দেখে এবং বেয়ার-বেইটিং—ভালুক-নির্যাতন—দেখে।

বড়ো দাঙ্গা হত বেশ ঘন ঘন। অধিকাংশই ঘটত থিয়েটারের সামনে। কারণ এখানে অভিজাত ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে সমাবিষ্ট হত এবং বারুদ ও আগুনের সমাবেশে বিস্ফোরণ হয়ই। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুনের নথিপত্রে দেখা যায়—একটি থিয়েটারের বাইরে ঘাসের উপর ঘুমিয়েছিল এক অ্যাপ্রেন্টিস। চার্লস গ্রোস্টক নামক এক জমিদার-পুত্র তার পেটে লাথি মারেন। ফলে মজুরটি উঠে গালি দেয়। গ্রোস্টক বলে ওঠেন—

Prentices are but the scum of the world.

দেখতে দেখতে এ দিকে পাঁচশো ও দিকে পাঁচশো লোক দাঁড়িয়ে যায়—দাঙ্গা চলে অনেক রাত পর্যন্ত। পুলিশ এসে মজুরদের নেতাদের ধরে নিয়ে যায়। পরদিন এক বিরাট জনতা কারাগার আক্রমণ করতে উদ্যত হয় ; নেহাৎ সৈন্যবাহিনী এসে পড়ায় তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। (কলকাতার মতন গুলি চলে কিনা কেরানি ফ্লিটউড লিখে যাননি!!)

আর-এক বিবরণে দেখি এক বেশ্যা নিয়ে দু জনের ঝগড়া হয় থিয়েটারের অভ্যন্তরে—

একজন দর্জি, অন্যজন 'ভদ্রলোক', জেন্টল্‌ম্যান্। ভদ্রলোক পলায়ন কবে লায়ন্স ইন্-এ আশ্রয় নেন। লায়ন্স ইন্ অভিজাতদেব মিলনকেন্দ্র—অতএব বেনল্ডস্ নামক এক মজুবেব বাচ্চা চিৎকাব কবে তিনশো লোকেব এক জনতা জড়ো কবে এবং বলপূর্বক লায়ন্স ইন্-এ প্রবেশ কবে, জিনিসপত্র তছনছ কবে ও ভদ্রলোকদেব বেদম প্রহাব কবে। পুলিশ এসে বেনল্ডস্ ও তাব সঙ্গীদেব শুধু নয়—থিয়েটাবেব মালিককেও গ্রেপ্তাব কবে নিয়ে যায।

এবকম আবো বহু লেখায স্পষ্ট হযে ওঠে যে, প্রগতিশীল বণিকশ্রেণী ও তাদেব সমর্থক নবজাগ্রত মেহনতি মানুষ তখন সদ্যলব্ধ ক্ষমতা ও অধিকাবে উদ্দীপ্ত। অন্যদিকে ভগ্নমনোবথ, পচনশীল অভিজাতদেব ছিল এদেব প্রতি বিষম ঘৃণা। এই দুই শ্রেণীই ছিল শেক্‌স্‌পিয়াবেব দর্শক। এদেবকে শেক্‌স্‌পিযাব গভীবভাবে চিনতেন—গজদন্তমিনাবে তিনি থাকেননি। টমাস ফুলাব স্বচক্ষে দেখেছিলেন বেন জনসন ও শেক্‌স্‌পিযাবকে মাবমেড ট্যাভার্ন নামক শুঁড়িখানায। এত নিকটভাবে যাদেব সঙ্গে মিশেছিলেন মহাকবি, তাঁদেব খুশি কবতেই 'হ্যামলেট' নাটক বচনা কবেছিলেন।

সে-যুগের থিয়েটার

হাট বসেছে—না থিযেটাব—বোঝা যাচ্ছে না। কাবণ, দর্শকবা সবাই উচ্চৈঃস্ববে কথা বলছেন। উপবোক্ত অ্যাপ্রেন্টিস আব মাঝি আব দোকানদাববাই হচ্ছে আসল দর্শক। দাঁড়িযে দেখতে হচ্ছে নাটক—সেটাই সবচেয়ে শস্তা। আব সেইজন্যেই খুব চিত্তাকর্ষক কিছু না-হলে মনোযোগ দেওযা অসম্ভব। হেন্‌ৎস্‌নেব তাঁব 'ট্র্যাভেল্‌স্ ইন ইংলন্ড' (১৫৯৮) গ্রন্থে বলছেন—সবাই পাইপ থেকে তোবাকাব ধোঁয়া ছাড়ছে। বাদাম, আপেল, প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে। অনেকে কিনছে ও খাচ্ছে। নানা বিষযে আলোচনা হচ্ছে। অভিনেতা যদি একটু কাঁচা হন, বা নাটক যদি খাবাপ লাগে তবে বেড়ালেব ডাক ডেকে অভিনেতাকে কাঁদিযে ছাড়া হচ্ছে। উচ্চৈঃস্ববে আবহ সংগীতেব সমালোচনা কবা হচ্ছে। কেউ কেউ একটু খবচ কবে গ্যালাবিতে বসেছে। সেখানে অন্য গণ্ডগোল , সবাই সুন্দবী মহিলাব পাশে বসতে চায, গাযে গা ঠেকাতে চায, মহিলাব পাখা পড়ে গেলে তুলে দিতে চায, মহিলাব পোশাকেব খুঁট ধবে প্রেমাভিনয কবতে চায। অনেকে থিযেটাবে ঢুকেই গ্যালাবিতে চোখ বুলিযে দেখে নেয কোথায আছে নাবী, তাবপব ছোটে সেই দিকে। ও দিকে ট্র্যাজিডিব অভিনয হচ্ছে আব এ দিকে চলছে মহিলাকে অভিসাবে বাজি কবাবাব প্রযাস। স্টিফেন গসন্ তাঁব 'স্কুল অফ এবিউজ' (১৫৭৯) গ্রন্থে এই বিববণ দিয়েছেন।

সবচেযে বেশি বিবক্ত কবছেন অভিজাতবা। তাঁবা বসবেন মঞ্চেব উপব টুল সাজিয়ে।।। দেবি কবে আসবেন—। সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ বেদনাবিধুব মুহূর্তে হেসে উঠে প্রমাণ কববেন নিজেব বৈদগ্ধ্য। অর্ধেক দেখে উঠে বেবিযে যাবেন। হাসিঠাট্টা কববেন নিজেদেব মধ্যে, পালক দিয়ে বান্ধবীব কানে দেবেন সুড়সুড়ি। হঠাৎ সজোবে জিগ্যেস কববেন—কাব নাটক হে এটা? নাটক ভালো লাগলে মাঝে মাঝে সাধাবণ দর্শক এদেব ওপব খেপে যেতেন—চিৎকাব কবতেন—'বেবিযে যা বোকাব দল।' কিন্তু সেসব গাযে মাখতেন না জমিদাববা।

এ হেন দর্শককে চুপ কবানোই এক সমস্যা ছিল। ভালো লাগানো তো একলব্যেব সাধনা।

হাতে উপাদান কী? শুধু কলম। কাবণ গ্লোব থিয়েটার বা সোয়ানের বা কার্টেনের বা ফরচুনের আর-কিছু ছিল না। অভিনয় ছিল আবৃত্তিমূলক চিৎকার, তার উপব মেয়েদের ভূমিকায় নামত ছেলেরা। ভাবতেই পাবা যায না যে ক্লিওপেট্রা ও লেডি ম্যাকবেথ লেখা হয়েছিল ছেলেদের জন্যে!! অভিনয় হত দিনেব আলোয়। অতএব আলো-আঁধারের কোনো বালাই তো নেই-ই, উপরন্তু বৃষ্টি নামলে অভিনয় স্থগিত—কাবণ, মঞ্চের উপব ছাদ নেই। দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি কবা যাচ্ছে না, কাবণ যবনিকা নেই। তবু সৃষ্টি হল 'হ্যামলেট' যা ওই বিশৃঙ্খল দর্শককে চুপ করিযে, তাদের মন কেড়ে নিয়ে ভাবাক্রান্ত চিত্তে বাড়ি ফিরতে বাধ্য কবত।

'হ্যামলেট'-এব জনপ্রিযতা

এইজন্যই 'হ্যামলেট'-এর কাহিনী এত লোমহর্ষক। যে পুবোনো কাহিনী থেকে এ গৃহীত সে আরো আগের যুগের উপযোগী, আবো বীভৎস। নূতনের প্রয়োজনে তাকে সংযত কবেছেন শেক্‌স্‌পিয়ার। তবু এতে কী নেই? ভূত আছে—ভূতে বিশ্বাস করত তখন অধিকাংশ মানুষ—রেজিনাল্ড স্কট্-এব 'ডিসকভারি অফ উইচ্‌ক্রাফ্‌ট্' (১৫৮৪) দ্রষ্টব্য। বিষপ্রয়োগে গুপ্তহত্যা আছে। উন্মাদের কার্যকলাপ আছে। পর্দার মধ্যে তলোয়াব চালিয়ে হত্যাকাণ্ড আছে। নায়িকার উন্মাদ হযে অশ্লীল গান গাওয়া আছে। বিদ্রোহী জনতার বাজপ্রাসাদ আক্রমণ আছে। নায়িকাব শবাধারের পাশে গোরস্থানে নায়ক ও নায়িকার ভ্রাতাব মল্লযুদ্ধ আছে। তলোয়ার খেলা আছে—যা এলিজাবেথীয় দর্শকেব বড়ো প্রিয় ছিল। তলোয়াবের ডগায বিষপ্রযোগে হত্যা আছে, পানীযে বিষ দান আছে—এককথায় মৃতদেহের ছড়াছড়ি! ফিলিপ সিড্‌নি কবি, তাই খেপে গিয়ে এলিজাবেথীয় নাটককে খুনোখুনির ধারাবিবরণী বলে নিন্দা কবেছেন। নাট্যকাব হলে সিড্‌নি বুঝতেন—ওটা শুধু বাইবের খোলস; ওটা দরকার, নইলে দর্শক নাটক দেখবেই না।

প্রতি মুহূর্তে 'হ্যামলেট'-এ প্রকাশ পেয়েছে একটি দর্শক-সচেতন মন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় কীভাবে তৎকালীন দর্শকের চেনাজানা ঘটনাকে এনে ফেলা হয়েছে নাটকের মধ্যে। একটি লাইনে, একটি ইঙ্গিতে এসে গেছে এমন স্মৃতি যা দর্শকের মনে আছে সজাগ। আমাদের কাছে লাইনগুলির শুধুই নাটকীয় তাৎপর্য। সে-যুগেব দর্শকেব কাছে সেগুলোর ছিল আবো একটা অর্থ—নাটকীয়ের উপবে দৈনন্দিনের আঁচ।

যেমন ফেবরুয়াবি, ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডেব সবচেযে জনপ্রিয় নেতা এসেক্স বিদ্রোহ কবে ধৃত ও নিহত হন। সমগ্র ইংলন্ডে নেমে আসে শোক। শেক্‌স্‌পিয়াবের নাট্যসম্প্রদাযও জড়িযে পড়ে, কারণ বিদ্রোহের সময়ে থিয়েটাবেব উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তারই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি : হ্যামলেট জিগ্যেস করছেন—এই অভিনেতারা ভ্রাম্যমান দল হয়ে গেল কী করে? শুনেছিলাম শহরে এদের খুব নামডাক। রোজেনক্রান্টস্ বলেন—

I think their inhibition comes by the means of the late innovation

এখানে 'inhibition' অর্থে নিষেধাজ্ঞা, 'innovation' অর্থে বিদ্রোহ বা অবাজকতা, দাঙ্গা।

লেআর্টিস-এব বিদ্রোহ ও এসেক্স-এর বিদ্রোহের মধ্যে সামঞ্জস্যও লক্ষণীয। লেআর্টিস-এব

উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লডিয়াস বলছেন—

There's such divinity doth hedge a king
That treason can but peep to what it would
Acts little of his will

আবার রোজেনক্রান্ট্স্-এর ভাষায়—

The single and peculiar life is bound
With all the strength and armour of the mind
To keep itself from noyance .

এগুলো যে বানী এলিজাবেথের সপক্ষে ঘোষণা এটা সহজেই অনুমেয়। স্মরণ রাখতে হবে এলিজাবেথ ছিলেন নূতন সমাজেব পৃষ্ঠপোষক, দাঁড়িয়েছিলেন অভিজাতদের বিরুদ্ধে। জনতা তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত।

অসরিক চবিত্রে যে তীব্র শ্লেষে অভিজাতদের বিদ্ধ করেছিলেন শেক্স্পিয়ার সে যে ঘন ঘন করতালি দ্বারা সমর্থিত হত এটা বোঝাই যায়। তেমনই করতালি দ্বারা অভিনন্দিত হত চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যটি—যেখানে হ্যামলেট ফর্টিনব্রাস-এর দেশপ্রেম ও বীবত্বের স্তব করছেন, কারণ ঠিক অমনি বীবত্ব প্রদর্শন করেছিলেন স্যর ফ্রান্সিস্ ভিয়ার ও তাঁর ইংরেজ ফৌজ ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে অস্টেন্ড-এর যুদ্ধে। লোকের মুখে মুখে ফিবত সে কথা।

তেমনি বিপুল হাসি উঠত দ্বিতীয় দৃশ্যে যেখানে কথাচ্ছলে তীব্র ব্যঙ্গে জর্জরিত করা হচ্ছে সে-যুগেব দুই নাট্যকারের অশোভন ঝগড়াকে—বেন জনসন এবং মার্স্টন-এর ঝগড়া সে যুগে মঞ্চযুদ্ধ হিসেবে পরিচিত ছিল।

তেমনি ব্যঙ্গ আছে সে-যুগের অতি-অভিনয়ের মূর্ত প্রতীক এডওয়ার্ড এলেন-এর প্রতি এবং ভাঁড়ামির রাজা উইল কেম্প-এর প্রতি। এঁরা সে-যুগের দর্শকেব অতি-পরিচিত লোক ছিলেন।

ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতের মধ্যেও লুকিয়ে আছে এমন সমসাময়িকতা যে চমকে উঠে হেসে ফেলতেন সে-যুগের দর্শক। পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে কবর খুঁড়তে খুঁড়তে এক ভাঁড় বলল আরেক জনকে—

Go, get thee to yaughan—

এখন এই 'ইয়হান' কথাটার মানে কী এ নিয়ে কিঞ্চিৎ গবেষণাও হল। অবশেষে পণ্ডিতরা খুঁজে বার করেছেন যে থিয়েটারের কাছে ওই নামে একটি মদের দোকান ছিল।

সবশেষে উদ্ধৃত করা যাক্ মহাকবির আত্মসমালোচনা—নিজের দেশের সমালোচনা—দর্শকের দেশেব প্রতি বিদ্রূপ। মদ্যস্রোতে ইংলন্ড তখন ভেসে যাচ্ছে—হ্যামলেট তীব্র কশাঘাত করছেন একে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ডেনমার্কই বুঝি লক্ষ্য, কিন্তু দর্শক জানতেন কাকে উদ্দেশ করে বলা। আবার সেই গোরস্থানের দৃশ্যে আসা যাক—

CLOWN. It was the very day that young Hamlet was born, he that is mad, and sent into England.
HAMLET. Ay marry, why was he sent into England?
CLOWN. Why, because he was mad, he shall recover his wits there, or if he do not, 'tis no great matter.
HAMLET. Why?
CLOWN. It will not be seen in him there ; there the men are as mad as he.

অনুমান করা যায় হাসিতে ফেটে পড়ত প্রেক্ষাগৃহ।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। মোট কথা 'হ্যামলেট'-এর কাহিনী, ঘটনা-সংস্থাপন প্রভৃতি রোমাঞ্চকর—লাইনে লাইনে ছিল অতি-পরিচিত ঘটনার আভাস। তা বলে এতেই যদি আবদ্ধ থাকত তবে 'হ্যামলেট' কালজয়ী হত না, এও ঠিক।

'হ্যামলেট'-এর দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বই একে উন্নীত করেছে অমরত্বের পর্যায়ে। তা বলে আবার কালোর্ধ্ব দেশোর্ধ্ব এক দার্শনিক নাটক যদি উপস্থিত করতে যেতেন শেক্‌স্‌পিয়ার, তাহলেও তা ধোপে টিকত না। দর্শক কর্তৃক ধিক্‌কৃত হয়ে অন্যান্য দু-একজন উচ্চশিক্ষিত এলিজাবেথীয় নাট্যকারের রচনার মতন সাহিত্যের ইতিহাসের কোণে টিম টিম করত ; কেউ মনেও রাখত না। বর্তমানকে লঙ্ঘন করে চিরন্তনকে ধরা যায় না—অন্তত নাটকে না। বর্তমানের হয়েই সর্বকালের হতে হবে। সহজবোধ্য মোটা-দাগে-আঁকা ঘটনাসম্ভারের জন্যেই 'হ্যামলেট' জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং এই সহজবোধ্য খোলস ছিল বলেই দর্শকদের কেউ কেউ এর গভীরে এর জটিল অন্তঃস্তলে যেতে পেরেছিলেন।

আঙ্গিক

পরিচালক দ্বিতীয় বার যেদিন এলেন সেদিন নাট্যকার কতকগুলো প্রশ্ন শানিয়ে নিয়ে তূণে পুরে প্রস্তুত ছিলেন , আসা মাত্র পর পর জ্যামুক্ত কবতে লাগলেন তাদের। বললেন—সেদিন আপনি বলে গেলেন নাটকে যেখানে বৃষ্টি দবকার সেখানে বৃষ্টি নামান, যেখানে আগুন লাগাবাব দরকার সেখানে আগুন। এ কথাগুলোর অর্থ কী? মঞ্চকৌশলকে কতটা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তাব কবতে দিযে থাকেন? আঙ্গিককে প্রাধান্য দিলে নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হয না কি? বর্তমানে কলকাতার বঙ্গমঞ্চে আঙ্গিক ক্রমশ বিপজ্জনক আকাব ধারণ কবছে এটা স্বীকার করেন কি?

বুঝলাম সেদিনকাব পবাজযে নাট্যকাব কতকটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। পরিচালক কিন্তু নির্বিকারচিত্তে চা-জলখাবার দাবি করলেন। কেষ্ট সব সববরাহ কবল এবং তিনি পানাহারে মত্ত হলেন। একটু পরে খেতে খেতেই বললেন—আপনাব প্রশ্নগুলো দুটো বিভিন্ন মার্গের। আঙ্গিককে প্রাধান্য দেওযা উচিত কিনা, এটা এক প্রশ্ন। আঙ্গিককে প্রাধান্য কতটা দিয়ে থাকি, সেটা আবেকটা প্রশ্ন। আমি যা কবে থাকি, আগেই বলেছি, নির্লজ্জভাবেই বলেছি, সেটা বক্স অফিসেব মুখ চেযে। যা কবা উচিত, সেটা বৃহত্তব বিশ্বনাট্যেব পবিপ্রেক্ষিতে বাংলাব জাতীয় থিয়েটাবেব প্রশ্ন। আমি যা করি, সেটা থেকে সব সময়ে সমগ্র আমাকে খুঁজে পাবেন না। পেশাদার থিযেটারের সীমায আমাব সমস্ত চিন্তাজগৎকে কী কবে পাবেন?

ভাষাবিদ বললেন—অর্থাৎ নিজেকে গোপন রেখে পেশাদাব নাট্যশালার সেবা করতে হয়?

পবিচালক বললেন—অনেক সমযে।

ভাযাবিদ বললেন—ভিক্তর উগোকে যেমন তাঁর উন্মত্ত আবেগপূর্ণ কাব্য থেকে চেনা অসম্ভব। জঁ কক্তো বলছেন—'ভিক্তব উগো, সের্ত্যা ফু কি সে ক্রোইযে ভিক্তব উগো।' অর্থাৎ, উগো আবাব কে? সে একটা পাগল যে নিজেকে উগো বলে মনে করে।

নাট্যকার গম্ভীর আদালতি কাযদায বললেন—তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি আঙ্গিককে প্রশ্রয় দিতে চান না, পেশাদাব নাট্যশালায় দিতে বাধ্য হন?

পবিচালক চায়ে বিষম খেলেন। প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন—সেটা আবার কখন বললাম? বলেছি আমার চিন্তাজগৎকে পুরোপুরি পেশাদার থিয়েটারে খুঁজে পাবেন না। আঙ্গিককে প্রশ্রয় না দেওয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না , উপবন্তু বলতে চাই ব্যক্তিগতভাবে আমি আঙ্গিকের সম্পূর্ণ প্রাধান্যের পক্ষপাতী। পেশাদার থিয়েটারে বরং তাকে খর্ব করে, সীমিত কবে, খেলো কবে রাখতে হয ; বক্স অফিসেব দাস করে বাখতে হয়। আমাব মনের থিয়েটারে আঙ্গিকের একচ্ছত্র স্বৈরতন্ত্র।

এবার নাট্যকাবেব বিষম খাওয়াব পালা। অবশ্য তবল কিছু খাচ্ছিলেন না, টানছিলেন চুরুটের ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াই অতিরিক্ত গিলে ফেলে একটু কাশলেন। সেই সুযোগে দার্শনিক

বললেন— কিন্তু নাটকে কথা প্রধান। কথার চাতুর্যেই কথার ঝংকারেই পুরো দৃশ্যের আবহাওযাটা গড়ে তোলা যায। দুষ্মন্তের জনপথে রথ ছোটানো শুধু কথার মারফত পৌঁছে দেওযা হয়েছে দর্শকের কাছে। 'মৃচ্ছকটিক'-এ বসন্তসেনাব প্রমোদগৃহ বর্ণনার জন্যে দৃশ্যপটের দবকার হয়নি। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় ববীন্দ্রনাথ দৃশ্যপট বা যবনিকার খোকামি সম্বন্ধে যে কঠোর উক্তি করে গেছেন জানেন নিশ্চযই। অত কেন? নাট্যগুরু শেক্‌স্‌পিয়ারের 'পঞ্চম হেনরি'-ব সূত্রধারেব প্রথম সংলাপটা স্মবণ করুন, দৃশ্যপটের ব্যাপারটা দর্শকেব কল্পনার উপর ছেড়ে দিতে কী আবেগময আহ্বানই না জানিযেছেন মহাকবি!

পরিচালক অম্লানবদনে বললেন—তা কালিদাস, ববীন্দ্রনাথ, শেক্‌স্‌পিয়ারের মতন নাট্যকাব দিন আমায়, আঙ্গিককে এক হুকুমে গৌণ করে দেব। ওঁদেব নাটকে কথাব যে জাদু আছে, দিন আমাকে সে জাদু, তারপব কথা বলবেন। কাব্যের ছন্দে সব অপূর্ণতাকে যিনি ভবিযে বাখতে পাবেন তাঁর মুখেই সাজে আঙ্গিকেব সমালোচনা। বার্নার্ড শ পাবেননি, ইবসেন পাবেননি, চেকভ পারেননি, পাবেননি ব্রেখ্‌ট্, টলার, এমনকী ও'নীল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আঙ্গিক নির্দেশ বেখে গেছেন এঁবা সংলাপেব পাশাপাশি। রবীন্দ্রনাথ-শেক্‌স্‌পিযাব আব কটি মশাই? বার্নার্ড শ-রা যেক্ষেত্রে পারলেন না, সেক্ষেত্রে বাংলাব ঢালহীন তলোযাবহীন নিধিরামদের আর আঙ্গিককে আক্রমণ কবে কাজ নেই। আব আপনি বললেন নাটকে কথা প্রধান; এটা আমি স্বীকাব কবি না। দু-তিন জন মহাশক্তিশালী ক্ষণজন্মা স্বভাবকবি ছাডা, কোনো নাট্যকাব জগতে নেই যাঁব কথা প্রধান হবার যোগ্যতা রাখে।

নাট্যকার কিছু-একটা নিশ্চযই বলতেন, কিন্তু পবিচালক বলে চললেন বাঁধভাঙা বন্যাব মতন—এটা আমবা প্রমাণ কবব একটু পবে। প্রথমে আমাদেব একটু ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আঙ্গিক আকাশ থেকে পড়ে না; ভগবানও তাকে ছুঁড়ে দেন না। প্রতি দেশে প্রতি যুগে থিযেটাবের বিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিক-কলা গড়ে উঠছে। নাট্যকাব সে আঙ্গিককে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকাব করে নেন, সে আঙ্গিককে স্বীকার না কবে উপায নেই; সে আঙ্গিক নাট্যকাবেব অবচেতনকে পর্যন্ত অধিকাব করে বসে আছে। 'শকুন্তলায' দৃশ্যপটের নির্দেশ নেই, কারণ, দৃশ্যপটের নামও কেউ শোনেনি তখন পর্যন্ত। শেক্‌স্‌পিয়ারেও সেই একই কারণে কল্পনানির্ভবতার আবেদন, কারণ, শেক্‌স্‌পিযারেব যুগে থিয়েটাবটি কী মাল ছিল জানেন তো? দিনের আলোয় অভিনয হত; বৃষ্টি নামলে অভিনয় স্থগিত; পোশাক-আশাক সব এলিজাবেথীয যুগেরই—মধ্যযুগেব পঞ্চম হেনরি-ব পোশাক জোগাড় করার উপায় নেই; ছেলেবা মেয়েব পার্ট কবছে, দর্শকবৃন্দ অভদ্র, চারটি সৈনিক দেখে বুঝতে হবে হেনরি-র বিবাট ব্যাহিনী যুদ্ধে যাচ্ছে, অভিনেতাবা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন আর হাত-পা ছুঁড়ছেন—এই নাকি অভিনয। এমতাবস্থায় দর্শকেব কল্পনাব উপরে নির্ভর না করে উপায় কী? কিন্তু ধীরে ধীরে মঞ্চ বাক্সবন্দী হল, যবনিকার ব্যবহার এল, উইংস এল, উপরের বর্ডার এল, এল দৃশ্যপট, এল নানাবিধ যন্ত্রপাতি, আলো, ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। নাট্যকাররাও এইসবকে সাদরে গ্রহণ কবলেন। এখন আর কথাব উপরই নির্ভব কবে থাকতে হচ্ছে না; দর্শকের চোখকেও তৃপ্তি দেওয়া যাচ্ছে। নাটক প্রকৃতই দৃশ্যকাব্য হযেছে। এখন সত্যি ঝড বইয়ে দেওয়া যাচ্ছে

মঞ্চে ; অতএব ফলাও করে কোনো চরিত্রের মুখে ঝড় বর্ণনা করার দরকার নেই। এখন আস্ত একটা যুদ্ধকে মঞ্চের উপর হাজির করা যাচ্ছে ; তাই নেপথ্য-যুদ্ধকে বর্ণনা করে পলাশীর আবহাওয়া ফোটাবার দরকার নেই। আমি তো বলব নাট্যকাররা এখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন ; অনেক সময়, অনেক কালি, কাগজ বেঁচে গেল, এখন সরাসরি নাটকের মূল বিষয়ে প্রবেশ করাব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন চরিত্রদের মনস্তত্ত্বেব গভীবে ঢোকার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

নাট্যকার হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—প্রত্যক্ষ একটা ঘটনাকে তুলে ধরা ফিল্‌মের কাজ, নাটক সে ব্যাপারে ফিল্‌মের প্রভাবে স্বকীয়তা হারাচ্ছে। নিজস্ব ব্যাকরণ, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব ভাষা হারিয়ে সে অন্যের চর্বিতকে চর্বণ করছে।

পরিচালক বললেন—এরকম একটা দুর্মর কুসংস্কাব ক্রমেই দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বটে। তবে ওটা অজ্ঞতাপ্রসূত। জমকালো দৃশ্য যে ফিল্‌মের অঙ্গ এটা কে বললে? যিনি বলেছেন তিনি ফিল্‌মের কিছু বোঝেন? আগুন-বৃষ্টি-ঝড়-যুদ্ধ-জাতীয় আঙ্গিক আড়ম্বর চরমে উঠেছিল উনিশ শতকের মঞ্চে, তখনো ফিল্‌মের জন্ম হয়নি। আজ যদি সেই আঙ্গিক-ঐতিহ্য থেকে থিয়েটার শিক্ষা গ্রহণ করে তবে সেটা ফিল্‌মের প্রভাব হয় কী করে? আর থিযেটারের নিজের ভাষা কী বস্তু আমার জানা নেই। কারুরই জানা নেই। এখনো সে ভাষা সৃষ্টিই হয়নি। থিয়েটার এখনো কথা, আঙ্গিক-অভিনয়, বাচিক-অভিনয়, আলোক, মঞ্চসজ্জা ও আবহসংগীত-এর জগাখিচুড়ি। এগুলোর সমন্বয়ে যে ভাষা বেরুবে সে এখনো ভবিষ্যতের জঠরে। ফিল্‌মের অবশ্যই নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, অপূর্ব ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় সে ভাষা ; তবে জমকালো দৃশ্যচ্ছটা নয় এটা যে-কোনো বসিকই জানেন।

দার্শনিক বললেন—আপনি বললেন নাট্যকাররা নিজেদের অজ্ঞাতসাবেই আঙ্গিককে স্বীকার করে নিচ্ছে ; এব অর্থ?

পরিচালক বললেন—যেমন ধরুন সংস্কৃত নাটকে কোথাও কোনো যবনিকার উল্লেখ নেই, কিন্তু যবনিকা অবশেষে আমাদের থিয়েটারে এল এবং তৎক্ষণাৎ নাট্যকাররা ফলাও করে নাটকে যবনিকাপাতেব নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। এখন ওটা কলমের টানেই এসে যায়, ওটাকে কেউ আর বিশেষ লক্ষ করেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, যবনিকাও আঙ্গিকের অংশ। তেমনি সতু সেন ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আমদানি করতেই নাট্যকাররা সোৎসাহে বাইশ-তেইশটি করে বিভিন্ন দৃশ্য এক এক নাটকে এনে ফেললেন। এখন আব-কেউ সেটাকে আঙ্গিকের প্রাধান্য বলে ক্রন্দন করেন না। কিন্তু ভুললে চলবে না, ঘূর্ণায়মান মঞ্চও আঙ্গিকের অংশ। তেমনি এসেছে তাপস সেনের আলোকবিপ্লব ; তেমনি নব্য নাট্যকাররা সেই আলোকশিল্পের সুযোগ নিতে শুরু করেছেন। প্রথমটা গোঁড়াপন্থীদের চোখে লাগছে বটে, কিন্তু অচিরেই যবনিকা বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের মতন এও স্বীকৃতি পাবে। আবার বেচারা তাপসবাবুর ওপর গোঁড়াদের যে একপেশে আক্রোশ, সেটারও কারণ খুঁজে পাই না। আঙ্গিক বলতে শুধু আলোকই বোঝায় না, পরিবেশনার সমস্ত মাধ্যমগুলোকেও বোঝায়—মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, টিমওয়ার্ক, পরিচালকের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ব ; এ সবই আধুনিক আঙ্গিকের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এগুলো হয়তো বুদ্ধিহীন

গোঁড়াদের চোখে পড়ে না ; তাঁরা তাই তাপসবাবুকে নিয়েই পড়েছেন। আসলে পুরো যুগটা বদলে যাচ্ছে , তাপস সেন সেই পরিবর্তনে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

নাট্যকার কিছুতেই এসব মানতে পারছেন না এটা বোঝা গেল। প্রথমত, গলায় ঘোঁৎকার তুলে তিনি প্রতিবাদ জানালেন। তারপর বললেন—কিন্তু আঙ্গিক অলঙ্কারমাত্র। অতিরিক্ত অলঙ্কার চাপিয়ে কি নাট্যসুন্দরীর রূপ খুলবে? না, তাকে জবড়জং জমিদারগিন্নি বানিয়ে ফেলা হবে?

পরিচালক বললেন—আঙ্গিক যে অলঙ্কার এটা আপনার ধারণা মাত্র এবং আমার মতে আপনার ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আমি বলব আঙ্গিক কথাটা এসেছে অঙ্গ থেকে ষ্ণিক-প্রত্যয় করে। পুরো অঙ্গটাই হচ্ছে আঙ্গিক। নাট্যসুন্দরীর পুরো দেহটাই আঙ্গিক ; তার প্রাণটুকু হচ্ছে নাটকটা। দেহ বাদ দিয়ে প্রাণ হয় না। আঙ্গিক অলঙ্কার নয় যে, খুলে রেখে দেওয়া চলে। দেহটাকে খুলে রেখে, বা তলোয়ার দিয়ে দেহের এখান ওখান কেটে ফেলে প্রাণটুকুকে বাঁচাতে পারবেন না। দেহ গেলে প্রাণও গেল। প্রাণকে প্রকাশ পেতে হবে দেহের মাধ্যমে। বলতে পারেন দেহে মেদ জমতে দেওয়া উচিত নয়, বা টাক পড়তে দেওয়া উচিত নয়। দেহটাকে সুন্দর, সুষ্ঠু করে তুলতে হবে। সেটা আমি জানি। আঙ্গিককে শিল্পসম্মত করে রাখতে হবে। কিন্তু আঙ্গিক-বিবোধিতা বা আঙ্গিককে শস্তা অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা—ওসব নেহাত অজ্ঞতার পরিচয়। বনফুলের ভাষায় ওসব থিয়েটারের পদীপিসিদের কথা।

নাট্যকার বললেন—মানে?

ভাষাবিদ হো হো করে হেসে উঠে বললেন—'অগ্নীশ্বর' বইয়ে বনফুল এই পদীপিসি-মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—সে আমার জানা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ওই কথাটির প্রয়োগটা বুঝতে পারলাম না।

পরিচালক কিন্তু হাসেননি। বেশ গম্ভীর তার্কিক ভঙ্গিতে বললেন—মানে বলছিলাম একদল লোক আছেন যাঁরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। নূতনকে গ্রহণ করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব। রেলগাড়ি যখন প্রথম চলল এঁরা বলেছিলেন ওসব শয়তানির অবসান অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যখন আকাশে উড়ল, এঁরা বললেন ওসব নাস্তিকতার পরাজয় ঘটল বলে। তেনজিং যখন এভারেস্টে চড়লেন এঁরা বললেন ওসব বুজরুকি। গাগারিনও এঁদের মতে মিথ্যাবাদী। এখন এঁরা স্বচ্ছন্দে সেই রেলগাড়ি চড়ে কাশীধাম ঘুরে আসছেন, প্লেনেও চড়ছেন অম্লানবদনে, তেনজিং-গাগারিনকেও সবার অজান্তে মেনে নিয়ে বসে আছেন। তেমনি থিয়েটারের পদীপিসিরাও নূতন আঙ্গিকের অভ্যুত্থানে 'ধর্ম গেল' বলে রব তুলেছেন। আবার দেখবেন একদিন এঁরা নির্বিবাদে সকলের অজান্তে তাপস-খালেদদের স্বীকার করে ভবিষ্যতের তাপসদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন।

ভাষাবিদ এবং দার্শনিক দুজনেই হাসলেন উচ্চৈঃস্বরে। নাট্যকার কোনো যুক্তি না দিয়ে শুধু বললেন—আই ডোন্ট এগ্রি। তাপস সেন-খালেদ চৌধুরিরা যদি শিল্পসম্মত আঙ্গিক প্রয়োগ করতে পারতেন তবে তাঁদের নিয়ে এত গণ্ডগোল হত না। বিশেষ করে তাপস সেনের আলোকসম্পাত এত বেশি সচেতন, এত সোচ্চার, এত স্থূল যে নাটকের পরিবেশকে অতিক্রম

কবে সে নাটককে লঙ্ঘন কবে, নাটকেব বক্তব্যকে চেপে দেয়। সে চোখ ধাঁধায়।

পরিচালক বললেন—কোন নাটকে এটা ঘটেছে উদাহরণ দেবেন?

নাট্যকার সদর্পে বললেন—'সেতু', 'অঙ্গার' এবং 'ফেবাবি ফৌজ' সাম্প্রতিক তিনটি নাটকেই আমি তাপসেব ঔদ্ধত্য লক্ষ কবেছি। তিনটিতেই ছেলেটা সংযমেব সীমা অতিক্রম কবেছে—বেলগাড়ি জল আর আগুনের খেলায় মত্ত হয়ে নাটকের বারোটা বাজিয়েছে।

পবিচালক বললেন—বাবোটা বাজিয়েছে কি? গণ্ডগোলই বা ঠিক কোথায় বাধল? লোকে তো তিনটেতেই তাপস সেনেব প্রশংসা কবেছে। যাক, জনপ্রিয়তার ওজব আপনি মানতে বাজি নন, তাই ওসব আপনাকে বলা বৃথা। আপনি বলছেন 'সেতু', 'অঙ্গার' ও 'ফেবারি ফৌজ'-এ তাপস সেনেব কলাকৌশল স্থূল হযেছে, সোচ্চার হযেছে। 'স্থূল' কেন বলছেন বুঝলাম না। স্থূল বলব তাকে যা উৎকট রকমেব বাস্তব। একটা পাঁঠার দোকানেব দৃশ্যে কেউ যদি আস্ত একটা পাঁঠা ঝুলিয়ে বাখতেন, তাকে বলতে পাবতুম স্থূল। 'সেতু'ব রেলগাড়ির দৃশ্যে যদি মডেল রেলগাডি চলত তাহলে তাকে স্থূল বলা যেত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শুধু শব্দ আব আলোর প্রক্ষেপণে ট্রেন-এব ইঙ্গিত দেওযা হযেছে , ট্রেনটিকে তুলে ধরা হয়নি, ট্রেনটুকুবে সাজেস্ট করা হযেছে। সেটা স্থূল হবে কেন? 'অঙ্গার'-এব জলও তেমনি অপূর্ব ইঙ্গিতে বুঝিযে দেওযা হয়েছে। 'ফেবাবি ফৌজ'-এব আগুনও তাই। উপবন্তু 'ফেবাবি ফৌজ'-এর আগুন পুবো নাটকের বক্তব্যকে এক চমকপ্রদ প্রতীকেব সাহায্যে দর্শকেব চক্ষুব সামনে উপস্থিত কবেছে। নাটককে তো চেপে দেযই নি, ববং নাটককে বাঙ্‌ময় হতে সাহায্য কবেছে। 'অঙ্গাব'-এর জল সম্বন্ধেও একই বক্তব্য। অতএব 'স্থূল' কথাটি আপনি প্রত্যাহাব করতে বাধ্য।

নাট্যকার বললেন—আব 'সোচ্চাব'?

পবিচালক বললেন—সোচ্চার কখনো কখনো হওয়া প্রযোজন, নাটকেবই স্বার্থে। অভিনয কি সব সময়ে নীচু পর্দায় বাঁধা থাকে? মাঝে মাঝে নাটকেবই প্রয়োজনে অভিনেতাবা গলা তোলেন না, হাত-পা ছোঁড়েন না? দৃশ্যসজ্জায মাঝে মাঝে নাটকেবই স্বার্থে চড়া বং ব্যবহাব করা হয না কি? পবিচালক মাঝে মাঝে অভিনয়ের গতি বাড়িয়ে দেন না? তেমনি আলোকসম্পাতও মাঝে মাঝে সোচ্চার হতে বাধ্য, তীব্র হতে বাধ্য। আঙ্গিকেব অন্য অংশগুলোব বেলায় আপনাবা আপত্তি কবেন না, কারণ এগুলোতে অভ্যস্ত হযে গেছেন। আলোকসম্পাত নূতন ধারা নিযেছে, নিজের স্থান করে নিচ্ছে , তাই আপনাদের অনভ্যস্ত চোখ টাটাচ্ছে, অন্তরস্থ পদীপিসিবা প্রতিবাদ করে উঠছে। 'ফেরারি ফৌজ'-এর শেষ দৃশ্যে আলো কতকটা সোচ্চার হতে বাধ্য, কারণ পুবো নাটকের ক্লাইম্যাক্স ওই আগুন। ওই আগুন বিপ্লবীদের শেষ বিজয়, অত্যাচাবীর পবাজয়। ওই আগুন আসলে অগ্নিযুগের প্রতীক। তাই ওখানে তাপসবাবু সোচ্চাব না হযে কী করবেন? আব নাটকের বাবোটা বাজাচ্ছেন তাপসবাবু—এই অভিযোগটি উল্লিখিত নাটকগুলিব রচয়িতাদের কাছ থেকেই আসা উচিত ছিল ; কই তাঁরা তো এ কথা বলছেন না? তাঁদেরই নাটককে হত্যা করেছেন তাপসবাবু, আর তাঁরা মনেব আনন্দে তাপসবাবুর হাঁড়িকাঠে গলা বাড়াচ্ছেন? না, সেটা আমার মনে হয, ঠিক নয়। আসলে ওই নাট্যকাবরা আধুনিক নাট্যকার। আধুনিক মঞ্চের সঙ্গে তাঁবা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক

মঞ্চের কলাকৌশলকে তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন . নাটকের মধ্যেই রেখে গেছেন কলাকৌশলের স্থান। তাই তাপসবাবু তাঁদের নাটকের পরিপূরক, হত্যাকারী নন।

দার্শনিক জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা আপনার মতে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

পরিচালক জবাব দিলেন—প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিচালকের অভ্যুত্থান। পরিচালকের ক্রমবর্ধমান একনায়কত্ব। আঙ্গিককে সংহত করে সুসমঞ্জস করে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন এঁরা। এককালে—এই সেদিন—অর্থাৎ শিশিরবাবুর আগে পর্যন্ত পরিচালক বলে কেউ ছিলেনই না, ছিলেন মোশান-মাস্টার, যিনি কোনোমতে কথাগুলো 'বলিয়ে' নিতেন। আলোকসম্পাত বা মঞ্চসজ্জা বা অভিনেতাদের গ্রুপিং প্রভৃতি সম্পর্কে এঁদের কোনো ধারণা বা দায়িত্বই ছিল না। আজ পরিচালকরা, অন্তত কয়েকজন পরিচালক—সমগ্র আঙ্গিকের ওপর প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বিস্তার করে নাটকের ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপ দিচ্ছেন।

নাট্যকার একগুঁয়ের মতন বললেন—এবং সেই সঙ্গে নাটকের সর্বনাশ করছেন। যে থিয়েটারে ছিল নাট্যকারের নিরঙ্কুশ আধিপত্য, সে থিয়েটারকে এঁরা বারো ভূতের আস্তানা করে তুলেছেন।

পরিচালক আরো খাদ্যের আশায় কেষ্ট-র দিকে একটু দৃষ্টি হেসে বললেন—বারো ভূত কী?

নাট্যকার জবাব দেওয়া দরকার মনে করলেন না। তাই পরিচালকই বলে চললেন—নাট্যকাররা চিরকালের দাম্ভিক, পরশ্রীকাতর, স্ফীতমস্তিষ্ক

নাট্যকার একটা অস্ফুট গর্জন করতে পরিচালক থামলেন। তারপর শান্ত হয়ে বললেন—নাট্যকারদের আধিপত্য সত্যিই খর্ব হতে চলেছে। শুধু এ দেশে নয় সারা পৃথিবীতে পরিচালকদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাররা পিছু হটছেন। পরিচালকের জয় অর্থেই আঙ্গিকের জয়, কারণ আঙ্গিকই হল পরিচালকের আত্মপ্রকাশের ভাষা। এত দিন থিয়েটার নাট্যকারদের অধীনে ছিল একথা স্বীকার করি, কারণ এতদিন আঙ্গিক শৈশবাবস্থায় ছিল। এখন এ যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক (এবং নাট্যকার) বের্টোল্ট ব্রেখট্ বলেছেন :

> The theatre is not the servant of the dramatist, but of society

এটাই বর্তমান পরিচালকদের জগৎ-কাঁপানো রণহুঙ্কার।

দার্শনিক বললেন—স্তানিস্লাভ্স্কি থেকে এ বিপ্লবের শুরু, কারণ তিনি খোদ শেক্স্‌পিয়ারের ওপর কলম চালিয়েছেন 'ওথেলো' প্রযোজনার সময়। ওঁর 'ওথেলো' অভিনয়ের পাণ্ডুলিপিটা ছেপে বেরিয়েছে, পড়ে দেখেছি। তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যের শেষে নোট লিখেছেন :

> এমিলিয়ার সঙ্গে ডেসডেমোনার অংশটুকু কেটে দিলে কেমন হয়? তাহলে ওথেলোর প্রস্থানের পর একটু নীরবতা, এবং ডেসডেমোনার হতভম্ব অবস্থা দেখিয়েই পর্দা ফেলে দেওয়া যায়। সেটা আরো নাটকীয় হবে।

এ রকম বহু জায়গায় তিনি শেক্স্‌পিয়ারকে একটু-আধটু রদবদল করার পক্ষপাতী।

নাট্যকার ট্র্যাজিক ভঙ্গিতে বললেন—কিন্তু সেটা কি ভালো?

পরিচালক বললেন—ভালো-খারাপ বিচার করা অসম্ভব, কারণ আমরা স্তানিস্লাভ্স্কি-র ‘ওথেলো’ দেখিনি। প্রশ্নটা অন্যখানে। প্রশ্নটা ঝোঁকের, চিন্তাধারার। শেক্স্পিয়ারের নাটককেও অনাদি-অনন্ত বলে মানতে স্তানিস্লাভ্স্কি রাজি নন। অন্য নাট্যকারদের তো কথাই নেই।

ভাষাবিদ বললেন—মায়ারহোল্ড্ ঠিক এমনি জায়গায় গোগোল-এর ‘ইনস্পেক্টর-জেনারেল’ পরিচালনার সময়ে বারংবার নাটককে অতিক্রম করে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ধরুন—ডাক্তার চরিত্রটি। গোগোল-এর নাটকে এ চরিত্রের কোনো কথাই নেই। মায়ারহোল্ড্ তাকে দিয়ে অনর্গল দুর্বোধ্য জর্মন বলিয়েছিলেন।

দার্শনিক বললেন—আর গর্ডন ক্রেগ তো নাট্যকারকে রীতিমতো একটি জগদ্দল পাথর বলে মনে করতেন। বলেছেন থিয়েটার একটি স্বতন্ত্র শিল্প—আর নাট্যকাররা কথা ধার করেছেন সাহিত্য থেকে ; ধার-কবা জিনিস নিয়ে তাঁরা থিযেটাবের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট কবছেন। শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হল মূকাভিনয়, পুতুলনাচ এবং ফরাসি মাইমদের আনন্দোচ্ছল হাসি। ক্রেগ বলছেন, পরিচালকরা নিজেরাই নাটক লিখতে শুরু না কবলে উপায় নেই। পরিচালকরাই শুধু পারবেন কথাকে আঙ্গিকের দাস করে থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য বক্ষা কবতে। নইলে থিয়েটাব সাহিত্যের দাস হয়ে থাকবে।

ভাষাবিদ বললেন—ফরাসি থিযেটারেব অন্যতম দিকপাল গাস্তঁ বাতি বলতেন, কথা-মহাশয় আমাদের সর্বনাশ করলেন , তাঁর প্রভুত্ব ঘোচাতে না পারলে থিয়েটারের মুক্তি নেই। বলছেন :

> A text cannot say everything It can go only as far as all words can go Beyond them begins another horizon, a zone of mystery, of silence It is that which it is the work of the directors to express

থিয়েটারের জগৎ কথাব পরও যে জগৎ সেই জগৎকে ঘিরে। এবং সেই জগৎকে মূর্ত করে তোলবাব একমাত্র উপায় খাঁটি থিয়েটারি আঙ্গিক। ‘সিব ল্য মো’ বা ‘কথা মহাপ্রভু’র সামনে মাথা নীচু কবে থাকলে জীবনে সে জগতে পৌঁছোনো যাবে না।

পবিচালক এবার উঠে দাঁড়িয়ে বিষম হাঁক ছেড়ে বললেন—নূতন নাট্যশালা আর সাহিত্যের দাসত্ব করতে চাইছে না এটা আজ অবিসংবাদী সত্য। আমাবও যদি উপায় থাকত তবে নূতন নাটককে নূতন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন বাংলা থিয়েটারের জন্ম দিতাম। সে থিয়েটার হত স্বকীয়তায় ভাস্বর : পরেব মুখে ঝাল খেয়ে তার দিন কাটত না। কিন্তু হায়, বক্স-অফিসের জন্যে নিজেকে সংযত করে কথার বেসাতি করে খেতে হচ্ছে। মাইকেল-ক্ষীরোদ-রবীন্দ্রনাথের যুগের থিয়েটার সত্যিই কথার দাস হয়ে ধন্য হয়েছে, কারণ ওঁরা ছিলেন কথার রাজা। বর্তমানের ডাক হচ্ছে কথাকে অতিক্রম কার। কাবণ, আজকের রামা-শ্যামা-যদুর কথা থিয়েটারকে শৃঙ্খলিত করছে, বেড়ি পরাচ্ছে।

নাট্যকার পুনরায় বললেন—আই ডোন্ট এগ্রি।

দৃশ্যসজ্জা

নাট্যকার—তাহলে আঙ্গিক বলতে আপনি কী বোঝেন?

পরিচালক—আঙ্গিক বলতে বুঝি

(১) অভিনয়

(২) দৃশ্যসজ্জা

(৩) আলোকসম্পাত

(৪) আবহসংগীত

এই চারটি ক্ষেত্রেই পুরোনো যুগের সঙ্গে আমাদের যুগের গরমিল। চার ক্ষেত্রেই আমরা সুদূরপ্রসারী বিপ্লব ঘটাতে বদ্ধপরিকর। পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করে যাব।

ভাষাবিদ—এক নম্বর বললেন অভিনয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কী করতে চান আপনারা?

পরিচালক—তার আগে বুঝতে হবে আমাদের আগের যুগে অভিনয়টা কেমন ছিল। সেটা ছিল একক অভিনয়ের গৌরবময় অধ্যায়। বিরাট বিরাট অভিনেতারা মঞ্চ কাঁপিয়ে চলে গেছেন। অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করব সবচেয়ে শেষে, কারণ ওইটিই সবচেয়ে জটিল প্রশ্ন। আজকে দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারটা নিয়ে পড়া যাক। শুধু একটা প্রশ্ন মনে রাখবেন। এই সেদিন পর্যন্ত অভিনেতাই ছিলেন থিয়েটারের মূল গায়েন। তাঁকে তুলে ধরাই ছিল দৃশ্যসজ্জার কাজ ; তাঁকে সুযোগ করে দিতেই নিয়োজিত ছিল আলোক , তাঁর সঙ্গে সংগত করতেই ডাকা হত সংগতকারদের। অভিনেতার দৌরাত্ম্যে অন্য তিনটি আঙ্গিক বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অভিনেতার স্বেচ্ছাচারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে বাংলা নাট্যসজ্জার ক্রমবিবর্তনকে।

দার্শনিক—লেবেডেফ্-এর থিয়েটারে কী রকম দৃশ্যপট ছিল?

পরিচালক—লেবেডেফই বলুন আর ১৮৩৫ সালের প্রসন্ন ঠাকুরের থিয়েটারই বলুন—দৃশ্যসজ্জা বলতে আঁকা সীন ছাড়া আর-কিছু ব্যবহারের প্রমাণ নেই। রোলার-এ জড়িয়ে সীনটাকে সড়াৎ করে ফেলে দেওয়া হত অভিনেতার পেছনে। ১৮৩৫ সালের কাগজে লিখছে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় সম্বন্ধে (ব্রজেনবাবুর বই দ্রষ্টব্য) :

> দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির পারস্পেকটিভ মেঘ জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নাই।

অর্থাৎ একখণ্ড চট বিছিয়ে তার ওপরে মেঘ, জল প্রভৃতি এঁকে এই বিরাট পটখানাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত অভিনেতার পেছনে। গোড়ার দিকে মনে হয় যত দূর সম্ভব চটকদার রং ব্যবহার করে দর্শকদের চোখে ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা হত। এটা যে যাত্রা নয়, থিয়েটার, এই চেতনাই

যেন সদর্পে প্রকাশ পেত। নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্যে বড় বেশি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল থিয়েটার। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযেব আত্মজীবনীতে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের কথা আছে, ১৮৫৭ সালের কথা।

> ছাতুবাবুব নাতি শবৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন স্টেজ-এর উপরে বিশ হাজাব টাকাব অলংকারে মণ্ডিত হইযা শবৎবাবু দীপ্তিমযী শকুন্তলার বানী-বেশ দেখাইযাছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ওই নিরেট ধবনেব আড়ম্বরস্পৃহা—বিশ হাজাব টাকাব গয়নাব মতনই—মঞ্চকে আচ্ছন্ন করেছিল। দর্শককে চমকিত করাই ছিল উদ্দেশ্য। অথবা দর্শক পুবো ব্যাপাবটাকে নূতন মনে করে আপনা থেকেই চমকিত হযে উঠত।

দার্শনিক—এই আঁকা-সীনেব ব্যাপাবটা ওঁরা শিখলেন কোথেকে? বাংলা যাত্রায তো আব দৃশ্যপট নেই।

পরিচালক—না, যাত্রাব সঙ্গে আমাদেব থিযেটাবেব যোগাযোগটা পবোক্ষ এবং মামুলি। এ-থিয়েটার বিদেশ থেকে আমদানি। সীন আঁকাব পদ্ধতিটা কলকাতাব ইংরাজি থিযেটাব থেকে শেখা। ইংলন্ডের থিয়েটারে আঁকা সীন কী কবে এল সেটা আব এক ইতিহাস, যাঁব ইচ্ছা হবে রিচার্ড সার্দান-লিখিত 'চেঞ্জেব্‌ল্ সিনাবি' গ্রন্থখানা পড়ে দেখতে পাবেন। কলকাতাব ফিবিঙ্গি থিযেটাব ওই ঝোলানো আঁকা-সীন-এর প্রবর্তন করে। সেটাই নকল কবে বাংলা থিয়েটাব। এমনকী ফিরিঙ্গি শিল্পীদেব ভাড়া কবে এনে আঁকিযে নেওযাও হয। হলবাইন, গ্যারিক প্রভৃতি নামেব উল্লেখ এই সূত্রে পাওযা যাচ্ছে।

ভাষাবিদ—একমাত্র জ্যোতি ঠাকুবের জোড়াসাঁকো থিয়েটারে এই ঝোলানো সীন ছাড়াও আবো কিছুর চেষ্টা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁরই স্মৃতিকথা থেকে 'নব-নাটক' অভিনয সম্বন্ধে·

> দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোনোও ত্রুটি করা হয় নাই। বন-দৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আঠা দিযা জুড়িয়া অতিসুন্দর এবং সুশোভন কবা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকাবেব বনেব মতোই বোধ হইত।

বাস্তবতা সৃষ্টিব একটা প্রযাস এখানে দেখা যাচ্ছে।

পরিচালক—অথচ একই অভিনয়ে অন্যান্য দৃশ্যে আঁকা পট ব্যবহার করেছেন ওঁরা। এতে যে সুব কেটে যাচ্ছে, প্রচণ্ড একটা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, এটা ওঁরা বোঝেননি।

নাট্যকার—আঁকা-সীন সম্বন্ধে আপনার আপত্তিটা কী?

পরিচালক—আমার আপত্তির প্রযোজন নেই, মঞ্চের প্রথম বিপ্লবী আদল্‌ফ আপিয়া ঝোলানো সীনের হাঁড়ি ফাটিয়ে দিয়েছেন।

ভাষাবিদ—হ্যাঁ, 'কর্মো বেফর্মের নোত্র মিজ-অঁ-সীন' প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, অভিনেতার দেহ একটা আস্ত ত্রিমাত্রিক বস্তু, পেছনে আঁকা সীনটা দ্বিমাত্রিক চিত্রমাত্র, এ দুয়ের বিরোধ মেটাবে কে?

দার্শনিক—আরো বলেছেন, স্টেজের মেঝের সঙ্গে পটে আঁকা মেঝে কিছুতেই মেলে না। অথচ স্টেজের মেঝেটাই হচ্ছে অভিনেতার চলাফেবার জায়গা ; সেটা মঞ্চের একটা প্রধান অংশ। তাব সঙ্গে ঝগডা করা কুমিরের সঙ্গে কলহেব মতনই ভীষণ ব্যাপার। ওর পর ঝোলানো সীন আর জলে বাস করতে পাবে না।

পবিচালক—অথচ আমাদেব নাট্যশালা সেই ১৮৩৫ সালের ফিরিঙ্গি থিয়েটারেব নকলনবিশি থেকে আর বেরুতে পারল না। ফিবিঙ্গি থিযেটাব এগিয়ে গেল ; তৎকালীন ব্রিটিশ থিয়েটারের প্রভাবে কলকাতার সাঁ সুসি প্রভৃতি রঙ্গালয বহুরকম মঞ্চপরীক্ষা করল, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বাংলা থিয়েটারকে আর এগুতে অনিচ্ছুক দেখা গেল। ওই ১৮৩৫-এর আঁকা-সীন-পদ্ধতিই একেবাবে মৌরসিপাট্টা গেডে বসল আমাদেব থিযেটাবে। কেন জানেন? আমার মনে হয় এব কাবণ বিরাট অভিনেতাদেব আবির্ভাব। এর আগের যুগে দেখি থিয়েটারের নতুনত্বে লোক চমৎকৃত। অর্ধেন্দু-গিরিশেব যুগ থেকে কাগজে দেখছি অনববত অভিনয়ের প্রশংসা , পরস্পবেব তুলনা ; একজনের প্রতি আক্রমণ, আবেকজনেব প্রতি অহেতুক চাটুবৃত্তি। অভিনেতারা মঞ্চ দখল করেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জাকে উপেক্ষিত, অবহেলিত, দুয়োরানীর মতন পড়ে থাকতে হত পেছনে। অথচ আঙ্গিকেব বিকাশে কোনো সুযো-ব চেযে দুযোরানীব অধিকাবেব কম হবার কথা নয়। কিন্তু সে-অধিকার স্বীকৃত হয়নি। লোকে তখন এঁর নিমচাঁদ ভালো না ওঁব, এঁব যোগেশ ভালো, না ওঁব—এইসব অবাস্তব আলোচনায মত্ত। মঞ্চসজ্জাও তখন ন্যাকডায়-আঁকা বনপথ আব কক্ষ আর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থেকে ওই অভিনেতাদেব প্রতিভাব আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার, এখনো পর্যন্ত ওই একক অভিনেতার অসংযত আস্ফালন চলছে। তাই এখনো থেকে থেকে নোংবা ঝোলানো সীন ব্যবহার হযেই চলেছে।

নাট্যকার—আঁকা-সীন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কি হযনি আমাদের থিয়েটাবে? তবে ফ্ল্যাটেব ব্যবহাব এল কী কবে?

পবিচালক—বিদ্রোহ হয়েছে, সত্যি কথা। কাঠের-খাঁজে-আঁকা ফ্ল্যাট ঠেলে দেওযা হযেছে মঞ্চের উপব। কাট-আউট ব্যবহাব হযেছে। ঝোলানো সীনেব গায়ে ফুটিযে দেওযা হয়েছে দরজা-জানালা। ছোটোখাটো বেদী ও সিঁড়ির ব্যবহাব হযেছে। অবশেযে সতুবাবুর হস্তক্ষেপে ঘূর্ণায়মান মঞ্চও এসেছে। কিন্তু এর একটিও আঁকা-সীনকে হটাতে পাবে নি মঞ্চ থেকে। এব একটিও সত্যিকারেব শিল্পসম্মত দৃশ্যসজ্জা হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবতে পারেনি। অভিনেতার গগনস্পর্শী দম্ভের পায়ে তাদের চুবমার হতে হয়েছে। অভিনেতাকে মঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে এবা সবাই ভিড় কবেছে পেছনের দিকে, ধুকপুক করে কোনোমতে বাঁচবার জন্যে।

ভাষাবিদ—সেইজন্যেই এই সেদিনও কী সব বীভৎস কুৎসিত সীনই না দেখতাম আমরা। মনে আছে 'বঙ্গে বর্গী'-তে লুণ্ঠিত গ্রাম এঁকে দেওয়া হয়েছিল। জ্বলন্ত আগুন স্থিব হয়ে আছে পেছনে ; অমন অনড়. প্রস্তরীভূত শিখা জীবনে দেখিনি। আব সামনে গাদা গাদা আঁকা মৃতদেহ।

নাট্যকার—একটি হ্রদেব দৃশ্যপটে আকাশে উডন্ত পাখি আঁকা দেখেছি। সে পাখি যে অচল ত্রিশঙ্কু হয়ে আছে শিল্পীর চোখে তা পড়েনি।

পরিচালক—'চিরন্তনী' নামে একটি নাটকে হাসপাতালের দৃশ্যে সারি সারি বিছানা মায় রুগিদের পর্যন্ত এঁকে দেওয়া হয়েছিল। একটা ঘড়ি ছিল দেওয়ালে, তাতে বারোটা বেজে গেছে ; আর বাজবে না। পাখা আছে মাথার উপরে, জীবনে ঘুরবে না। স্টেথিস্‌কোপসুদ্ধ এক ডাক্তারকে যে কেন এঁকে দেওয়া হয়নি বুঝলাম না।

দার্শনিক—আচ্ছা, ওইসব দৃশ্যপটগুলোকে প্রতীক বলে ধরে নিতে আপত্তি কী? বাস্তবতা খুঁজেছেন কেন? বাস্তবের ইঙ্গিতমাত্র বুঝে নিন না।

পরিচালক—আঁকার স্থূল পদ্ধতিটা দেখলেই বুঝবেন শিল্পী মোটেই ইঙ্গিত দেননি, প্রাণপণে বাস্তবটাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ওঁর স্থূল রসবোধে ওর চেয়ে ভালো কিছু খেলে নি। পটুয়াদেব মধ্যে ক জন সত্যিকাবের শিল্পী থিয়েটারে এসেছেন?

ভাষাবিদ—আর ইঙ্গিত ওরকম রুগি-টুগি এঁকে হয় না ; শুধু যদি একটি খাট থাকত তো হাসপাতাল বলে মেনে নিতাম ; শুধু যদি ন্যাড়া গাছ একটা থাকত তো বর্গী-বিধ্বস্ত গ্রামের প্রতীক হিসেবে মেনে নিতে পারতাম। ইঙ্গিত বা প্রতীক কম কথার জিনিস ; এত বেশি বললে আর প্রতীক-ট্রতীক থাকে না ; ও হল স্থূলতম শিল্পবোধের পবিচয়।

পরিচালক—থিয়েটাবের প্রতীক থিয়েটারের নিজস্ব কায়দায় হবে এবং সেটা নব-নাট্য আন্দোলনেব কর্মীরাই করবেন। এখনো তাব লক্ষণ স্পষ্ট হয়নি, তবে হবে।

নাট্যকার—ওই নিজস্ব কায়দাটা বুঝলাম না।

পরিচালক—চিত্রকলার প্রতীকগুলো যেমন চিত্রকলার মাধ্যমেই আসছে ; থিয়েটারের ইঙ্গিতগুলোও তেমনি বলিষ্ঠ থিয়েটারি ঢং-এই হবে। ন্যাড়া গাছকে যুদ্ধের প্রতীক করাটা চিত্রকলার কায়দা ; শকুনের ডানা ঝটপট দেখিয়ে আকালের চেহারা আনাটা চলচ্চিত্রের কায়দা হতে পারে ; একটি গমক তানে 'পবন চলত শননন' গানের মূল কথাটা পরিস্ফুট করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি আঁকা সীন বা ফ্ল্যাট বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দৌরাত্ম্য কাটালে থিয়েটারের দৃশ্যসজ্জাও তেমনি নিজস্ব থিয়েটারি ইঙ্গিতে কথা কইবে।

নাট্যকার—যথা? আপনার হাতে থিয়েটার পেলে কী করবেন?

পরিচালক—থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্‌, বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাব সীন-জাতীয় যত জিনিস। মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব ; এলোমেলো এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করব ক্রেগ-এর আঁকা রেখা-কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেখ্‌ট্‌-বর্ণিত বিদ্যুৎ-আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোশাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শঙ্করের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটিদশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে কলকাতা দেখাব : কার্ডবোর্ডের মনুমেন্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা—। যাক্‌, করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারি ঢং-এই করব। চিত্রপটের

খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। অন্য শিল্প থেকে ধার কবে করব না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। অভিনেতাদের অত্যাচারে মঞ্চের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে, ছেঁড়া ময়লা সীন আর বিবর্ণ হলদে আলো আর কার্বন আর্ক-ল্যাম্পের মূর্খ জগতে যখন অভিনেতারা পরস্পরকে প্যাঁচ মেরে আত্মসন্তুষ্ট, তখন দৃশ্যসজ্জার প্রথম আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করলেন গণনাট্য সঙ্ঘ। তাঁবা এই সীনের খোকামি ছাঁটাই করে স্রেফ একটি চটের পর্দার সামনে অভিনয় শুরু করলেন। ওই নোংরা সীনের জগতের তুলনায় এ যে ঢের বেশি শিল্পসম্মত তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু দৃশ্যসজ্জার দিক থেকে বক্তব্য থেকে যায়। কী জন্যে ওঁবা একরঙা পর্দাকে দৃশ্য হিশেবে ব্যবহার করলেন তার দুটো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় :

(১) ওঁরা জনতার কাছে নাটক পৌঁছে দেওযার ব্রত নিয়েছিলেন। হাতে নাট্যশালা ছিল না, বা থাকলেও তাঁরা নিতেন না। অল্প খরচে অত্যন্ত সচল অভিনয দল গঠনের অঙ্গ হিশেবে হালকা দৃশ্যপট সৃষ্টি কবেছিলেন : একরঙা চটের পর্দা নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া সম্ভব।

(২) তাঁরা সচেতনভাবে মঞ্চের নোংরামি ত্যাগ করার জন্যে সীন-আদি বাদ দিয়ে একবঙা পর্দার প্রচলন করেছিলেন।

গণনাট্য সৃষ্টির ব্যাপারে ওঁদের মহান ভূমিকা স্বীকার করেও বলব এ দুটো ব্যাখ্যার কোনোটাই আমার কাছে সন্তোষজনক নয়। অত্যন্ত অল্প খরচে অত্যন্ত হালকা রেখেও দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করা যায়। একরঙা পর্দার সামনে অভিনয় করলে অভিনয আর আবৃত্তির মধ্যে তফাত রইল কী? মঞ্চের কলাকৌশল জানা থাকলে 'অঙ্গার' নাটক নিযেও অবলীলাক্রমে সারা ভারত সফব করা যায। তার জন্যে মঞ্চের চেহারাটিকে বিকৃত করার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিব তাৎপর্য হল মঞ্চের বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মঞ্চেব বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসা। ঐতিহ্যকে একেবারে নাকচ করলে কিসের উপর দাঁড়াব? আরো লক্ষণীয়—অভিনেতার আধিপত্য কিন্তু পরোক্ষে স্বীকার করেই নেওয়া হল। মঞ্চসজ্জা অনাদৃত ছিল, এখন একেবারেই পরিত্যক্ত হল। আগে অভিনেতা সর্বপ্রধান ছিলেন, এখন আভিনেতা একমাত্র গায়েন হয়ে উঠলেন। সারা মঞ্চে অভিনেতা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি বলব মহান গণনাট্য সঙ্ঘ এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। পুরোনো রঙ্গমঞ্চকে মুক্ত করতে গিয়ে সে-মঞ্চের শিকলে নিজেরাই বাঁধা পড়েছেন। না, এ পথে বাংলার নাট্যশালা সংস্কার হবে না। দৃশ্যসজ্জাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। বরং তাকে উন্নত, শক্তিশালী কবে অভিনেতার সমান পর্যায়ে তুলে আনতে হবে। মঞ্চের ঠাট বজায় রেখেই মঞ্চকে এগিয়ে নিতে হবে, মঞ্চকে অস্বীকার করে নয়।

নাট্যকার—তাহলে বর্তমান নবনাট্য-আন্দোলন দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে কী করছে?

পরিচালক—বর্তমানে তারা সীন আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কব্জা ভাঙছে। সীনের দৌরাত্ম্যের কথা আগেই বলেছি। আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চের কথা বলার প্রয়োজন নেই। আপনারা জানেন দু মিনিটের বেশি একটা দৃশ্য স্থায়ী হচ্ছে না, তার আগেই মঞ্চ ঘুরে যাচ্ছে, আর রঙিন রঙিন সব সীন বেরুচ্ছে। একটা নাটকে বাইশটা দৃশ্য! ভাবতে পারেন? কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার কাছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চটা শিশুর হাতে খেলনার মতন ; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে দেখে

তার অপক্ক আশ আর মেটে না। নবনাট্য-আন্দোলন ওসব ছাঁটাই করে সলিড, আস্ত-সেট্ প্রবর্তন করছে, ঘরবাড়ি, নদীব বাঁধ সব আস্ত ত্রিমাত্রিক রূপে তুলে ধরছে। রূপকার, শিল্পীমন, গন্ধর্ব, এবং দশরূপক সম্প্রদায়গুলির সাম্প্রতিক নাটকগুলি লক্ষ করলেই দেখবেন এদ্দিনে বোধ হয় ঠিক পথে এগুতে শুরু করেছি। এখানে ছেঁড়া সীনও নেই, আবাব একরঙা পর্দাও নেই। সত্যিকাবের দৃশ্যসজ্জাব গোড়াপত্তন হচ্ছে। অবশ্যই বহুরূপী এবং লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ এ ব্যাপাবে পথিকৃৎ। কিন্তু ধারাটা ছড়িযে পড়ছে এটাই সবচেয়ে আশার কথা। কাবণ এ না হলে আধুনিক নাট্যকারদের নাটক অভিনয় হবে কী করে?

নাট্যকার—অর্থাৎ?

পরিচালক—আগেকার নাট্যকাররা অভিনেতা-কেন্দ্রিক মঞ্চের জন্যে লিখে গেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে তাঁদের কোনো নির্দেশ থাকত না। শুধুমাত্র কোথায় ঘটনা ঘটছে তাব একটু ইঙ্গিত দিয়েই সংলাপে চলে যেতেন তাঁরা। যেমন 'নীলদর্পণ'। দৃশ্যেব কী নির্দেশ দিচ্ছেন দীনবন্ধু? 'গোলোকচন্দ্র বসুব গোলাঘরের বোযাক', 'সাধুচরণেব বাড়ি', 'বেগুনবেড়ে কুঠি', 'গোলোক বসুব দরদালান' ইত্যাদি। ওইটুকুই। আব-কিছু নয। কিন্তু ইযোবোপে যে-দিন আর্ভিং-কেম্ব্‌ল্‌দের আধিপত্য ঘুচতে শুরু করল, সেদিন থেকে নাট্যকাররা আশ্চর্য সব নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। ইবসেনের নির্দেশগুলো দেখুন, পাতার পর পাতা লিখে গেছেন। 'গোস্ট্‌স্' নাটকের শেষে সূর্যোদযেব নির্দেশটা মনে আছে? বার্নার্ড শ-র যে-কোনো নাটকেব নির্দেশ দেখুন। 'জানলা দিযে পাহাড়ের তুষার দেখা যাবে' ('আর্মস্ অ্যান্ড দ ম্যান') বা 'ঝমঝম করে গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টি পড়ছে' ('পিগমেলিয়ন'), এসব তো আছেই। মায় আসবাবপত্র কোন নাটকের কী ধাঁচের হবে তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। আর্চার-এব 'গ্রীন গডেস্' নাটকেব গোড়ায একটি ভূপাতিত এরোপ্লেন দেখাবার নির্দেশ আছে; নাটকের শেষে মঞ্চে বোমাবর্ষণের নির্দেশ আছে। গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্'-এ দেওযালে কতটা রং উঠে গেছে তাবও বর্ণনা আছে। আরো পরের যুগে আমেরিকার কিংস্‌লি-র 'ডেড এন্ড' নাটকে একটি বস্তির মাঝখানে একটি ডোবা থাকার নির্দেশ আছে, নাটকের নায়কবা, অর্থাৎ বস্তির ছোকরাবা সেই ডোবায চান কবছে আর সংলাপ বলছে। পেছনে নদী থাকবে; নাটকের মাঝখানে সেই নদী দিযে একটি আলোয আলোকিত জাহাজ চলে যাবে। রুশ নাট্যকার কর্নেইচুক-এর 'ফ্রন্ট' নাটকে ট্যাংক চালাবার কথা আছে। তেমনি দেখুন আধুনিক বাঙালি নাট্যকারবাও বিচিত্র সব নির্দেশ দিচ্ছেন; বিচিত্র সব জায়গায় নিযে যেতে চাইছেন দর্শককে। 'অঙ্গার'-এ শেষ দৃশ্যে খনির তলায় গহ্বরের অভ্যন্তর দেখাবাব নির্দেশ আছে। কোনো আঁকা-সীনে সে পবিবেশ ফুটতে পারে কখনো? কোনো একরঙা পর্দায়ই কি ফুটবে তা? দিগিনবাবুর 'তরঙ্গ' নাটকের একটি নির্দেশ—

> বালুচর। শেষ রাত্রি, ঘন অন্ধকার। দূরে আর-একটা চরেব বাড়িগুলো কালো রেখার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নদীর ধারে কাশবন। কাশবনের মধ্য দিয়ে নদী থেকে পাবে উঠবাব একটা আঁকাবাঁকা পথ। ছায়ার মতো কতকগুলো লোক বসে।

বলুন আমায়—কোনো আঁকা পটে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে? বিজন ভট্টাচার্যের নাটকেও

এই ধরনের নির্দেশের ছড়াছড়ি। নূতন নাট্যকাররা আরো দুর্জয় পরীক্ষা চালাচ্ছেন, আরো কঠিন জিনিস আনতে বলছেন মঞ্চে। দিলীপ রায় 'একটি নায়ক' কাব্যনাট্যে কী নির্দেশ দিচ্ছেন শুনুন—

> একটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল। সারাদিন সে উপেক্ষিত অবস্থায় গবাক্ষ থেকে পালিয়ে-আসা বৃষ্টির ছাট, রৌদ্রের তাপ সহ্য করেও নির্বিকার পড়ে রইল , কিন্তু রাত্রের অন্ধকারের গভীরতায় কেউ কোথাও নেই দেখে সে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

এখানে শুধু পরিবেশ নয়, ওই বৃষ্টির ছাট আর রৌদ্রের তাপের মধ্যে ফুটে উঠবে অবহেলিত মানবতার বেদনা। নাট্যকার নায়কের বেদনাটাকে মূর্ত করতে চাইছেন কতকগুলি দৃশ্যমান জিনিসের সাহায্যে। কোনো কথা বলার আগে দ্রুত দেখাতে হবে একটি ছুটির দিনের হিশাব কয়েক মিনিটের মধ্যে—একটি দিনের বৃষ্টি আর রোদ, একটি দিনের লাঞ্ছনা। তেমনি দেখুন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নচিকেতা'-র একটি নির্দেশ—

> সম্মুখে সমতল প্রান্তর। পিছনে পথ, বক্ররেখাকারে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রাত্রির আকাশ। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের কিছু উপরে শিংশুমার। এগারোটি নক্ষত্রে শিংশুমার মৎস্যাকারে অবস্থিত। প্রথম সারিতে দুইটি, দ্বিতীয়ে তিনটি, চতুর্থে দুইটি, তাহার পর প্রত্যেক সারিতে এক-একটি করিয়া চারটি। দ্বিতীয় সারির মধ্যমটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ইনিই যম।

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, ওই রকমই হবে আধুনিক নাট্যকারদের নির্দেশ। এটা স্টান্ট নয়। 'নচিকেতা' পড়া থাকলে জানতেন ওই নক্ষত্র, বিশেষত যমের সঙ্গে নাটকের কী গভীর সম্পর্ক। আধুনিক দৃশ্যসজ্জা যদি এটাকে ধরতে না পারে, যদি বাদ দিয়ে একরঙা পর্দার আশ্রয় নেয়, তবে আমার মতে তা এ নাটকের ক্ষতি করবে। নতুন দৃশ্যসজ্জা নাট্যকারদের কলম খুলে দেবে। ইচ্ছামতো পরীক্ষা তাঁরা চালাতে পারবেন। স্টেজে দেখাব কী করে?—এ আর্তনাদ বিগত যুগের আর্তনাদ। বর্তমান মঞ্চে অসম্ভব বলে কিছুই থাকবে না।

আলো

[প্রচুব চা-সিঙাড়াব সদ্‌ব্যবহাব করে পবিচালক আবাব বক্তৃতা দিতে উঠলেন।]
পরিচালক—নতুন আলোকসম্পাত কোন পথে যাওযাব চেষ্টা কবছে তা বুঝতে গেলে আবাব সেই পুরোনো কাসুন্দি না ঘেঁটে উপায় নেই অর্থাৎ এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের নাট্যশালায় আলোকসম্পাতের কী হাল হয়েছিল সেটা বুঝতে হবে। দেখুন, বাংলা নাট্যশালা মহাশক্তিশালী নাট্যকাবেব জন্ম দিযেছে। কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতাকেও তুলে ধবেছে, কিন্তু মঞ্চ-কলাকৌশলেব ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যশালা গত একশো বছবে কিস্যু করেনি—একেবারে শূন্য, রিক্ত, দেউলে। এটা স্বীকাব কবতে কষ্ট হয, কিন্তু স্বীকাব কবতে হবে, নইলে আত্মসন্তুষ্টিও কাটবে না, নবনাট্য-আন্দোলনকেও বুঝতে পাবব না, ভবিষ্যতের দিকে পা ফেলতেও পারব না। এবং এই দেউলিযাপনার মূল কারণ আমরা বলেছি দাম্ভিক অসংযত অতি-অভিনেতাদেব দল, যাঁবা নাটকেব মধ্যমণি হয়ে থাকার প্রলোভনে এবং নিজেদের দুর্বলতায় ভীত হযে মঞ্চেব অন্যান্য বিভাগগুলোকে পঙ্গু কবে বেখেছিলেন।

দার্শনিক—সে তো আপনি দৃশ্যসজ্জাব আলোচনায বলেছেন।

পরিচালক—বাববাব বলার প্রযোজন আছে, কাবণ জাত্যভিমানে আমরা বাংলা থিযেটাব সম্বন্ধে গর্বান্ধ হযে অজস্র অত্যুক্তি করে থাকি। আজ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে সঠিকভাবে যাচাই কবার দরকাব আছে। আগেই বলেছি অভিনেতাকে বডো কবতে দৃশ্যসজ্জাকে আঁকা সীনে আবদ্ধ বাখা হয়েছিল। আলোকসম্পাত আবার দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই আঁকা সীন যেখানে প্রধান দৃশ্যপট সেখানে আলোর উন্নতিব পথ চিরতবে রুদ্ধ হযে থাকবে এটা সহজেই বোঝা যায।

নাট্যকার—কেন?

পরিচালক—আঁকা সীন অর্থই হচ্ছে পুবো মঞ্চ জুডে একটা দ্বিমাত্রিক চিত্রপট। আলোর সেখানে একমাত্র কাজ পটটাকে দৃশ্যমান কবে রাখা, আলোকিত করে রাখা। যদি একটা ছায়াব দরকার হয় তবে সীনে ছায়াটা এঁকেই দিতে হবে, আলোকের সাহায্যে ছবির ওপর ছায়া ফেললে তো চলবে না। রাতের দৃশ্য এঁকেই বোঝাতে হবে, রাতের স্বল্প চন্দ্রালোক যদি আলো দিয়ে বোঝাতে যান তো পেছনের সীনটা অদৃশ্য হয়ে যাবে! একটা নাটক দেখেছিলাম —'হাযদ্রাবাদ'। রাত্রেব নগরীর দৃশ্য বোঝাবাব জন্যে পটুয়া চাঁদ এঁকেছেন, নীলাভ বাড়ি এঁকেছেন, বাড়িগুলোর অসংখ্য আলোকিত জানলা এঁকেছেন। সেখানে আলোর কর্তব্য কী? সমান উজ্জ্বল আলোকে পুবো [illegible] উদ্ভাসিত করে রাখা। আলোও যদি স্বধর্মপালনে ব্রতী হয়ে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি কবার চেষ্টা কবত তবে পটুয়ার এত পরিশ্রম বিফল হত, দৃশ্যপটটা দেখাই যেত না। 'ঝিন্দের বন্দী' দেখেছেন? এই সেদিন হযে গেল মিনার্ভায়। উদিতের

বাগানবাড়ির সামনে এক প্রকাণ্ড ছায়া পড়েছে প্রাসাদের , ছায়াটা আঁকা . সে ছায়াসৃষ্টিতে আলোর কোনো অংশ থাকতে পারে না , আলোটাকে উজ্জ্বল রেখে আঁকা ছায়াটাকে দৃশ্যমান করাই আলোকশিল্পীর একমাত্র কাজ এখানে। ঠিক তাই হয়েছিল আমাদের থিয়েটারে , এই সেদিন পর্যন্ত তাই ছিল, এখনো অনেক জায়গায় তাই আছে। এই নিখাদ নির্ভেজাল তাঁবেদার আলোকসম্পাত কী দিয়ে করা হয়ে এসেছে?—পায়ের কাছে একসারি ফুটলাইট , আর মাথার উপরে কয়েক সারি ওপেন-ট্রাও ব্যাটেন, শাদা থিয়েটারি বাংলায় যার নাম ঝরি। এছাড়া কতকগুলো বড়ো ফ্লাড খাড়া করে সাজিয়ে একজোড়া টরমেন্টর ব্যাটেন। তাও বৃহৎ ওলিভেট্ ফ্লাড নামক বস্তুটিও এঁরা কোনো দিন ব্যবহার করার কথা ভাবেননি। এই সমস্ত অসংযত চুনকাম-করা আলোর ফল কী জানেন? পুরো মঞ্চটাকে সমানভাবে আলোকিত করার কী ফল? প্রথমত, দৃশ্যপটটাকে একটা নোংরা ন্যাকড়ার মতন দেখাত। দ্বিতীয়ত, মঞ্চের কোনো-একটা অংশকে গুরুত্ব দেবার প্রশ্নই উঠত না। তৃতীয়ত, আবহাওয়া-সৃষ্টি জিনিসটি একেবারেই অসম্ভব। চতুর্থত, উজ্জ্বল দৃশ্যপটের সামনে অভিনেতাকে আলাদা করে তুলে ধরতে অতিরিক্ত কড়া আর্ক-লাইট দরকার হত। আর ওই আর্ক-ল্যাম্পেরই বা কী ব্যবহার আমরা দেখেছি? অভিনেতা হুজুরের চোখ-পাকানো আর দাঁত কিড়মিড় মুহূর্তে একটা 'ফোকাশ' মেরে মুখখানাকে উজিয়ে দেওয়া ছাড়া স্পটলাইটের ব্যবহার আমরা কোথায় দেখেছি? তাপস সেনের আগে স্পটলাইটের প্রকৃত ব্যবহার দেখিনি—এ কথাটা স্বীকার করতে হবে। স্বীকার করতে কারো কারো বুক ভেঙে যাবে জানি, তবু করতে হবে।

নাট্যকার—কিন্তু আপনার কথাটা বুঝতে পারছি না। পুরোনো দিনের আলোর চেয়ে তাপসবাবুর আলো তো উন্নত হবেই , তাতে কী প্রমাণ হল? 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে নজির দেখিয়ে এখন যদি কেউ প্রমাণ করতে বসেন যে বনফুল অনেক উন্নত তাতে কি 'আলালের ঘরের দুলালের' কৃতিত্ব কমে? তাতে কি নতুন কিছু আমরা জানতে পাচ্ছি?

পরিচালক—আপনার উপমা ঠিক হল না। 'আলালের ঘরের দুলাল' অনেক দিন আগেই সিংহাসনচ্যুত হয়ে গেছে ; বঙ্কিমবাবুরা সে-ধারাকে অনেক পুষ্ট অনেক বেগবতী করে বিশ শতকের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিশ শতকে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তররা সে-ধারাকে যথাযথ বইয়ে নিয়ে গেছেন সামনের দিকে। থিয়েটারে তা হয়নি। 'আলালের ঘরের দুলাল'রা থিয়েটারে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসেছিল এই সেদিন পর্যন্ত, কতক কতক আছে। এবং একদল লোক এখনো চিৎকার করে বলেন, ওই আলালি আলোই আসল থিয়েটার , তাপস সেন যা করছে সব বাজে। সেইজন্যেই থিয়েটারের 'আলাল' নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সাহিত্যে 'আলাল' একটি প্রথম পদক্ষেপ হিশেবে স্বীকৃত ; থিয়েটারের 'আলাল' কিন্তু একটি কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে, থিয়েটারের বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পথরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তাই একে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন।

নাট্যকার—কিন্তু তাপসবাবু পুরোনো আলোকসম্পাতকে ভেঙে কী গড়ছেন? নিছক বাস্তবতা! যেমন 'অঙ্গার'-এর জল বা 'ফেরারি ফৌজ'-এর আগুন। বাস্তবতা কি শিল্প? বাস্তবানুকরণই কি থিয়েটারের উদ্দেশ্য?

পরিচালক—নিশ্চয়ই না! সত্যিকারের থিয়েটারে বাস্তবতার স্থান নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চে ওই বাস্তবতাই প্রয়োজন। এতদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ছিল হরি ঘোষের গোয়াল। তাকে বাস্তবোত্তর শিল্পে নিয়ে যেতে হলে আগে নিছক বাস্তবতাই কিছুদিন গড়তে হবে। যে শিশু দাঁড়াতে শেখেনি তাকে গোড়াতেই একশো মিটার দৌড়ে নাম লেখাতে দেওয়া কি উচিত? তাপসবাবুরা বাংলা নাট্যশালার আঙ্গিককে দাঁড়াতে ও হাঁটতে শেখাচ্ছেন। ভবিষ্যতের রেকর্ডভাঙা দৌড়ের গোড়াপত্তন করছেন। গত একুশ বছর শিশু যে শুধুই মাটিতে পড়ে কেঁদেছে আর আঙুল চুষেছে।

ভাষাবিদ—তাপসবাবুর আলোকসম্পাতের মূল নীতিগুলো কী?

পরিচালক—সেটা অবশ্যই তাপসবাবু ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। তবে তাঁর কাজ দেখে আমরা একটা অনুমান করতে পারি নিশ্চয়ই। কথাটা আমাকে ইংরিজিতে বলতে দেবেন দয়া করে?

ভাষাবিদ—কেন?

পরিচালক—কারণ বাংলা পরিভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

নাট্যকার—বেশ, বলুন।

পরিচালক—তাপসবাবুর আলো is more than a medium of visibility. It affects the appearance of all elements of the stage and by this power becomes a determining element in the composition of a stage picture. শুধুমাত্র মঞ্চটাকে দৃশ্যমান করার মধ্যেই তাপস সেনেব আলো আবদ্ধ নেই। মঞ্চের প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি মানুষকে আলোর স্পর্শে একটা অন্য চেহারা দেন তাপসবাবু। সেই খণ্ড খণ্ড চেহারা থেকে সমগ্র নাটকটার একটা ঐক্যবদ্ধ চেহারা গড়ে ওঠে। আধুনিক থিয়েটারের আলো সর্বসময়ে নাটকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা কয়। এ-ধরনের আলোর জন্যে স্বভাবতই পুরোনো আঁকা সীন একেবারে অনুপযুক্ত। এখন দরকার ত্রিমাত্রিক সজ্জা, আস্ত ত্রিমাত্রিক জিনিস যার উপরে আলো খেলতে পারে, বা যা আলো নিতে পারে। দরকার আস্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা-বিশিষ্ট সলিড বেদী, সিঁড়ি ; দরকার কালো বা ধূসর পশ্চাৎপট যা উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করবে না, অর্থাৎ আলোক-পরিকল্পনাকে বিচ্ছুরিত আলোয় ছত্রভঙ্গ করবে না।

দার্শনিক—সেটা বুঝলাম। একটা আস্ত জিনিসকে আলোকসম্পাতের দ্বারা বিভিন্ন চেহারা দেওয়া যায়—এটা সহজেই বোঝা যায়। একটি কিউবকে সামনে থেকে কড়া আলোয় উদ্ভাসিত করলে সেটাকে কিউব বলেই চেনা যায় না ; কারণ কোণাগুলো, ধারগুলো সম্মুখ আলোয় অদৃশ্য হয়ে যাবে। অথচ পাশ থেকে বা নীচ থেকে এক পাশকে আলোয় উদ্ভাসিত করলে কিউবটার নানা চেহারা বার করে দেওয়া যায়।

ভাষাবিদ—অর্থাৎ এক এক পাশ আলোয়, এক এক পাশ আঁধারে থাকলে তবেই তার কিউবত্ব স্পষ্ট হবে।

পরিচালক—সেইজন্যেই আধুনিক আলোয় আঁধারের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। আগে অভিনেতার অহমিকাকে সেবা করার জন্যে ছায়া বা আঁধারকে মঞ্চ থেকে নির্বাসন দেওয়া

হয়েছিল। আধুনিক নাট্যশালায় অভিনেতাই তো সর্বেসর্বা নন ; নাটকের পরিবেশের খাতিরে এমনও প্রয়োজন হতে পারে যখন মঞ্চসজ্জার একটি অংশ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হবে, অথচ অভিনেতাকে আধা-অন্ধকারে ঢেকে রাখা হবে। যেমন 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্য। বা 'পুতুলখেলা'য ডাক্তারবাবুর বুলুকে প্রেমনিবেদন কবাব ক্রমঘনায়মান আঁধারের দৃশ্যটি। মনে হল মনের কথা বলতে বলতে দুজনের চেতনা থেকে পারিপার্শ্বিকের অস্তিত্বটাই মুছে গেছে, দুজনে কী একটা অন্য জগতে গিয়ে পৌঁছেছেন। উল্লিখিত দুটি দৃশ্যেই দৃশ্যসজ্জার কালো রং, আলো এবং নাটকেব কথা ও অভিনয় এক সুরে গেঁথে গেছে। নির্মল গুহরায় এবং খালেদ চৌধুরির সঙ্গে তাপস সেন, তাপস সেনের সঙ্গে তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায় ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের টিমওযার্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলে গেছে।

নাট্যকার—হ্যাঁ, উল্লিখিত দৃশ্যদুটি আধুনিক আলোকসম্পাতের এক-একটি অপূর্ব নিদর্শন। তেমনি আমার মনে হয় 'বক্তকরবী'-র জাল খুলে বাজার বেবিয়ে আসাটিও আর-একটি চরম দৃষ্টান্ত। এখানে নাটকের স্বার্থেই আলোকসম্পাত ও ধ্বনিপ্রক্ষেপণ হঠাৎ সোচ্চাব হয়ে মুহূর্তটিকে স্মবণীয় করে তোলে। 'অঙ্গার'-এর জলের দৃশ্যও তাই।

ভাষাবিদ—'অঙ্গাব'-এর শ্রেষ্ঠ আলোকসম্পাত হয়েছে শেষ দৃশ্যে নয়, চতুর্থ দৃশ্যে, যখন খনি-দুর্ঘটনাব পরে শ্রমিকদের জীবনরক্ষার চেষ্টা চলছে। এখানে তাপসবাবুর আলো অস্থির ব্যাকুল , রেসকিউ টীমের তৎপরতার সঙ্গে কী অদ্‌ভুতভাবে খাপ খেয়েছে আলোর ছুটোছুটি!

দার্শনিক—আচ্ছা, এই নতুন ধরনের নতুন নাট্যাদর্শের আলোককল্পনাকে কার্যকরী করতে বিগত দিনের যন্ত্রপাতি তো যথেষ্ট নয়। তাপসবাবুর তথা আধুনিক মঞ্চের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কী রকম? পাওয়া যায় সে-সব?

পরিচালক—মোটামুটি কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। সেগুলির প্রবর্তন হচ্ছে। পুরাতন ঝরি আব ফুটলাইটের বেড়া ভেঙে তাপসবাবুরা আধুনিক সরঞ্জাম আনতে শুরু করেছেন। তার তালিকাও কম নয় ; আশ্চর্য ব্যাপার—এতকাল বাংলা থিয়েটার চলছে, কিন্তু এই অতি-সাধারণ যন্ত্রগুলোও এদ্দিন আসে নি। এসেছে কিছু চমক-লাগাবার বাজে জিনিস ; অদৃশ্য হওযার আয়না, আর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আর রঙিন কাগজের চক্র! অথচ এতদিন আমাদের বড়ো বড়ো নাট্যরসিকরা থিয়েটারে চমক লাগাবার অপচেষ্টা দেখেননি। আজ যেই তাপসবাবু মঞ্চের সামান্যতম ঠাট ফিরিয়ে আনতে কিছু যন্ত্র প্রচলন করছেন, অমনি আঙ্গিকের প্রাধান্য নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে।

দার্শনিক—আধুনিক থিয়েটারের আলোর সরঞ্জামের একটু আভাস দেবেন?

পরিচালক—হ্যাঁ, দিচ্ছি। তবে স্বভাবতই আলোর আর বিদ্যুতের প্রবেশের সঙ্গেই থিয়েটারে বিজ্ঞানও প্রবেশ করেছে। কিছু কিছু অঙ্কও আমাদের কষতে হবে। আধুনিক থিয়েটারের প্রধান আলো হল—

(১) প্লেনো কনভেক্‌স্‌ লেন্‌স্‌ স্পট ;

(২) ফ্রেসনেল স্পট ;

(৩) এলিপসয়ডাল-রিফ্লেক্টর স্পট।

সবই স্পট দেখছেন? ফ্লাড্-আদি যা ব্যবহাব হয় মোটামুটি সাইক্লোরামাকে আলোকিত করতে বা অনুরূপ গৌণ স্থানে। আধুনিক মঞ্চে পাশ থেকে, সামনে থেকে, ওপর থেকে এবং নীচ থেকে যত আলো দেওয়া যায় সব স্পট থেকে। কাবণ স্পট-এর আলো-কে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাব জোরালো আলো শিল্পীর হাতেব মুঠোয়। লেন্স্-এর ব্যবহাব আলোর দূরত্ব সত্ত্বেও তাব শক্তি, তাব তীব্রতাকে নিযন্ত্রিত কবতে সাহায্য কবে। ২৫০ ওয়াট, ৫০০ ওয়াট, বা ১০০০ ওয়াট বা ১৫০০ ওয়াট যে ল্যাম্পই ব্যবহার করুন না কেন আলোব ক্যান্ড্ল্-পাওয়াবকে নানা লেংথ-এব লেন্স্ ব্যবহাব কবে নিজের হাতের মুঠোয় আনতে পাবা যায়।

$$F.c.=\frac{c\,p}{d^2}$$

F.c. অর্থে ফুট-ক্যাণ্ডল্ *c.p.* মানে ক্যান্ডল্-পাওয়াব, *d* অর্থে দূবত্ব। তাহলে ধরুন কুড়ি ফুট দূবে একটি মাঝাবি আকারেব স্পট আছে, তাতে একটি ১৫০০ ওযাটেব বাল্ব্ আছে। কত ফুট-ক্যান্ড্ল্ আলো পাব? ফবমুলা প্রযোগ কবে কী পাচ্ছি? ১৫০০ ওয়াট বাল্ব্ থেবে লেন্স্-এব মাধ্যমে পাচ্ছি ১৬, ০০০ ক্যান্ড্ল্-পাওযার। অতএব,

$$F.\ c. = \frac{১৬০০০}{২০^২} = \frac{১৬০০০}{৪০০} = ৪০$$

অর্থাৎ ৪০ ফুট ক্যান্ড্ল্ আলো পাব। ওই ফর্মুলা থেকে জ্ঞাতব্য সব তথ্যই তো পেতে পাবি, কাবণ,

$$c.p. = d^2 \times F.c. \text{ এবং } d = \sqrt{\frac{c\,p}{F\,c}}$$

কী বলছি বুঝতে পাবছেন?

দার্শনিক—হ্যাঁ।

পবিচালক—তাই বলছিলাম ৮", ৬", ৫", ৩" —নানা বকমেব লেন্স্ ব্যবহার করে আধুনিক থিয়েটাব আলোর ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। এব ওপর এসেছে ডিমাব—প্রত্যেক আলোব আলাদা ডিমার , আলোকে ক্রমশ বাড়ানো এবং কমানোব জন্যে। এবই ফলে সম্ভব হয়েছে দর্শকের প্রায় অজান্তে একটি দৃশ্যেব মধ্যেই আলোকে সম্পূর্ণ পবিবর্তন কবা। এবই ফলে সম্ভব হয়েছে 'অঙ্গার'-এর চতুর্থ দৃশ্যেব শেষে প্রচণ্ড হতাশাব ছবি ফুটিয়ে তোলা—সমস্ত আলো ক্রমশ নিভে গিযে একটি আর্তনাদেব মতন লাল আলোকরেখার দ্বারা খনিমুখের বৃহৎ লৌহতোরণকে আঘাত করা। তাবপব আরো একটি জিনিসকে প্রচলন করেছেন তাপসবাবু , কাট-অফ্ বা আলোর মুখোশ। বিদেশের থিযেটাবে কাট-অফ্ ছাড়া আলোর ব্যবহার কেউ ভাবতেই পারে না। কাট-অফ্-এর ব্যবহার কেন? অবাঞ্ছিত জাযগায যাতে আলো না পড়তে পারে ; তাছাড়া আলোরও আকাব নির্ধারণ করাব জন্যে।—ফানেল, শাটার, ম্যাট, আইরিস, নানা রকম মুখোশ পরিযে আলোকে বাঁকানো-চোবানো যায় এটা এদ্দিন অভিনেতাব দাস বাংলা থিয়েটারে কাকুর মাথায খেলেনি। তাপসবাবু এই কাট-অফ্-এর কায়দাকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কীভাবে সচল কাট-অফ্-এর ব্যবহাব শুরু করেছেন তা বোধ হয় পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে

লিখিত হওয়ার যোগ্য।

নাট্যকার—সচল কাট-অফ্ মানে?

পরিচালক—তাপসবাবুর অনুমতি ছাড়া বলতে পাবলাম না এর বেশি। উনি নিজেই বিস্তারিত বলবেন এই আশায় এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলাম। এবপব আসছে রং-এব ব্যবহার। আগে লাল, নীল, সবুজ আলোব অসংযত ফোকাশ-মারা আপনাবা দেখেছেন। এমনকী আর্কল্যাম্পেব সামনে নানা রং-এর জিলেটিন-আঁটা চক্রও ঘুবিযে দিয়ে মঞ্চে ঘন ঘন রং পরিবর্তন করে বালসুলভ কুরুচিব পবিচয দেওয়া হত, এখনো অধিকাংশ বিক্রিযেশন ক্লাবের অভিনয়ে দেওয়া হয়। সদর্পে বলছি, তাপসবাবু প্রথম শিল্পসম্মত রং-এর ব্যবহাব চালু করেছেন। গাঢ় লাল, গাঢ় নীল, গাঢ় সবুজ প্রভৃতিকে সংযত করে শুধু মাত্র চবম কয়েকটা মুহূর্তে ব্যবহাব প্রথম তাপসবাবুই করলেন। এইসব রং-এব মুশকিল কী জানেন? এবা আলোব তেজ কমিয়ে দেয়. গাঢ় লাল শতকবা মাত্র ১০ ভাগ আলো-কে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয। গাঢ় সবুজও তাই, আব গাঢ় নীল মাত্র ৩ ভাগ আলো-কে যেতে দেয। অথচ সমস্ত দূবত্ব ঘনত্ব ছায়াময়তাকে হত্যা করে যে শাদা আলো তাব ব্যবহাবেব রেওয়াজও উঠিযে দিযেছেন তাপসবাবু। হালকা অ্যাম্বার বা গোলাপি ধবনেব একটা ফিকে রংই হচ্ছে তাপসবাবুব সর্বোজ্জ্বল রং। অ্যাম্বার শতকবা ৮০ ভাগ এবং গোলাপি শতকবা ৬৫ ভাগ আলো-কে নির্বিঘ্নে লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয, অথচ মঞ্চেব স্বপ্নময়তাকে ভেঙে তছনছ কবে না। তাপস সেনেব আব একটি প্রবর্তন—মোটিভেটিং লাইট। একটা দৃশ্যেব প্রধান আলোকের উৎসটা ঠিক কবে পুরো দৃশ্যেব আলোটাকে সেই প্রধান আলোব পবিপ্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ কবা—এই জিনিসটাও এদ্দিন আমাদেব থিয়েটারে আসেনি। জানলা দিযে দিনের আলো আসছে—পুরোনো থিযেটাবে জানলাব উপব পেলমেট থেকে কড়া ফ্লাডলাইট মেরেই খালাস: সামনেব আলোগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সামনে থেকে ততোধিক কড়া বশ্মিপাত কবে বিপর্যয ঘটাত। তাপস সেনেব সূর্যেব আলো, বা চাঁদেব আলো দেখেছেন? বা মঞ্চেব উপর জ্বলন্ত হাবিকেন বা বৈদ্যুতিক বাতি থাকলে তাব আলোয় উদ্ভাসিত মুখ বা আসবাব বা দেওযাল দেখেছেন? 'ফেবাবি ফৌজ'-এ হাবিকেন নিযে মা আর অশোকেব দৃশ্যটা দেখেছেন? তাব চাইতেও অপূর্ব মোটিভেটিং আলোব প্রয়োগ দেখেছিলাম 'সাংবাদিক' নাটকেব শেষ দৃশ্যে, যখন একটি বেতাবযন্ত্রের আলোকোদ্ভাসিত ডায়াল-এব আলোয নাযকেব মুখখানা দেখতে পেযেছিলাম। মনে রাখবেন ওই নাটকেব ওই দৃশ্যে বেডিওটি একটি প্রধান চরিত্র। আরো বহু জিনিসেব ব্যবহাব তাপসবাবু চালু করাব চেষ্টা কবছেন—লিনেবাখ্ ল্যানটার্ন, ক্লাউড-মেশিন, অ্যানিমেটেড স্লাইড—। ধোঁযাব ব্যবহারটাই দেখুন না। আগে কেউ ভেবেছিলেন ধোঁযার ওপর আলো খেলিয়ে নানা প্যাটার্ন সৃষ্টি কবা যায?

নাট্যকার—কিন্তু ওগুলো যে নিছক প্রকৃতিকে নকল কবাব যন্ত্র, বাস্তবতাব নামে স্বাভাবিকতাব বিষ।

পরিচালক—আগেই তো বলেছি, সেই বাস্তবতাও এখনো আমাদেব থিযেটাবে আসেনি। তাকে আনা প্রয়োজন। তাব পরে এগুতে পাবব বাস্তবোত্তব শিল্পেব দিকে। তাপসবাবুব অন্তবে যে স্বপ্ন আছে 'শিশুতীর্থ' পবিকল্পনায তাব কতকটা আঁচ আমবা পেযেছি। আজ যে তিনি

নিজেকে সংযত করে, খাটো করে থিয়েটারকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে চলেছেন, তার জন্যে, তাঁর এই সাময়িক আত্মত্যাগের জন্যে তাঁকে আমাদের অভিবাদন জানানো উচিত। তাপস সেন যে শিল্পী তার কী প্রমাণ জানেন? এইসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াও আশ্চর্য সব দৃশ্য তিনি সৃষ্টি করেন, উদ্ভট, ফেলে-দেওয়া জিনিস দিয়ে। একটি ভাঙা মোড়া দিযে 'নীচের মহল'-এ মোটরগাড়ি চালিয়েছিলেন। কতকগুলো বিয়েবাড়ির রানিং লাইট, কয়েকটা পুরোনো বিস্কিটের টিন, কিছু ছেঁড়া কার্ডবোর্ড—এইসব হচ্ছে তাঁর আসল উপকরণ। এসব মিলিয়ে যা হয় তা দেখে আমার বিশ্বাস হয়—ইনি বা এঁব উত্তরসূরীরা নিযে যাবেন থিয়েটারকে সেই বাস্তবোত্তব স্বপ্নজগতে যেখানে গড়ে উঠবে থিয়েটারের ভাষা।

সংগীত ও অভিনয়

পরিচালক—বাংলা নাট্যশালায় সংগীতের ব্যবহারও অভিনেতা মহোদযেব একাধিপত্যে স্বকীযতায় ভাস্বর হয়ে উঠতে পারেনি। অর্থাৎ আবহসংগীত জিনিসটাই সৃষ্টি হয়নি। সংগীত তার নিজস্ব রূপে নাট্যশালায় বিকশিত হতে পারে না, এটা নিশ্চয়ই মানবেন। নাট্যশালার সংগীত ভিন্ন জিনিস। এই নাট্যসংগীত সৃষ্টি হয়নি।

দার্শনিক—নাট্যশালার সংগীত স্বাধীন নয়, এটা মানছি। সংগীত শ্রেষ্ঠ কলা। নিকৃষ্ট কোনো কলাব পরিসরে সে নিজেকে মেলে ধরবে কী করে?

পরিচালক—শুধু শ্রেষ্ঠ কলা বললে ভুল হবে। সংগীত অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কলা , সংগীত বস্তুনিরপেক্ষ, বিমূর্ত। অথচ নাট্যশালার সংগীতকে কোনো বিশেষ পবিবেশ, বা বিশেষ আবেগকে রূপ দিতে হয়। ওরকম সুনির্দিষ্ট কাজে সংগীতকে নিয়োজিত করা অসম্ভব।

ভাষাবিদ—এটা কি ঠিক বলছেন? পাশ্চাত্য সংগীতে যাকে ভিভিড মিউজিক বলে তাতে তো যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবতার ধ্যান দেখতে পাচ্ছি। যেমন ধরুন, চাইকোভ্স্কি-র '১৮১২ ওভার্চার', নেপোলিয়নের মস্কো থেকে পশ্চাদপসরণ অবলম্বনে রচিত। স্পষ্টই এর মধ্যে তুযাবঝড়, সৈন্যদের ক্লান্ত পদক্ষেপ এবং অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শোনা যায়। এক্ষেত্রে সংগীত বস্তুনিরপেক্ষ না হযে একান্তভাবেই বাস্তব-ভিত্তিক।

নাট্যকার—আবার দেখুন রসিনি-র 'বার্বার অফ্ সেভিল্' ওভার্চার , যেখানে একটি অতীব আমুদে চরিত্রের মনোবিকলন করা হয়েছে। ফিগারো-চরিত্র হাসছে, গাইছে আর খাটছে প্রভুর মনোরঞ্জনার্থে। এই ফিগারোর চরিত্র হচ্ছে ওই ওভার্চারটির বিষয়বস্তু। এখানেও সংগীত বিমূর্ত নয়।

পরিচালক—আপনারা যে উদাহরণ দুটি দিলেন, দুটিই ওভার্চার। আর ওভার্চার মানেই অপেরা-র সংগীত। অপেরা তো নাট্যশালার ব্যাপার। অপেরায় গল্প আছে, অভিনয় আছে, ঘটনা আছে, চরিত্রবিশ্লেষণ আছে। অপেরা হল নাটকেরই আবেক রূপ। সেই অপেরার জন্যে লেখা সংগীতকে খাঁটি মার্গসংগীত বলছেন কী করে? উপরন্তু ওই ওভার্চারগুলোর ভিত্তিতেই আধুনিক থিয়েটারের সংগীত রচিত হবে। খাঁটি মার্গসংগীতে বাস্তবের আঁচ যা একটু পেয়েছি তা হচ্ছে বেঠোফেন-এর 'ষষ্ঠ সিম্ফনি'-তে। প্রথম চারটি খণ্ডই প্রাকৃতিক পরিবেশে সংগীতকারের উচ্ছ্বাস নিয়ে রচিত। বিশেষ কবে দ্বিতীয় খণ্ডের শেযে পাখির ডাক এবং চতুর্থ খণ্ডে ঝড়ের গর্জন একেবারেই বাস্তবভিত্তিক। কিন্তু দেখুন শেষ খণ্ডে সমস্ত বাস্তবকে অতিক্রম করে 'মেষপালকদের ব্রহ্মসংগীত'এক বাস্তবোত্তর জগতে পৌঁছে গেছে। বেঠোফেন-এর এই সিম্ফনিটি ছাড়া পাশ্চাত্য মার্গসংগীতে তথাকথিত বাস্তবতা কোথাও আমার কানে বাজেনি। শুবের্ট দেখুন, ব্রাহম্স্ দেখুন, দেখুন বেঠোফেন-এর বিখ্যাত পঞ্চম বা নবম সিম্ফনি।

ভাষাবিদ—আধুনিক সংগীতকারের সংগীতে যে মেশিন-এর ঝংকার শোনা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কী বলবেন? যেমন স্ত্রাভিন্স্কি।

পরিচালক—পাশ্চাত্য সংগীত যুগে যুগে রচিত হয়ে চলেছে। মেশিনের ঝংকার যা শুনেছেন তা সংগীতকারের আধুনিক মনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন। মেশিন-যুগের সংগীতকারের মধ্যে সংগীতের নিটোল মিঠে-সুর যদি না বাজে তাকে কি আপনি বাস্তবভিত্তিক বলবেন? এঁদের সংগীত যদি পুরোনো হার্মনির তত্ত্বকে ভেঙে গুঁড়িয়ে, আরপেজিও আর মেজর-মাইনরের বন্ধন ভেঙে জ্যাজ আর মার্গসংগীতের তফাত ঘুচিয়ে নূতন রুক্ষ, 'অমার্জিত' সুর সৃষ্টি করে, তবে তা যুগের দাবিতেই করছে। তাকে বাস্তবভিত্তিক বলা ভুল। কোনো বিশেষ আবেগ, বা বিশেষ চরিত্র, বা বিশেষ ঘটনাকে তো এঁরা রূপ দিচ্ছেন না। এঁরা নবযুগের সামগ্রিক আবেগকে তুলে ধরেছেন। জর্জ মাহ্‌লের-এর 'সং অফ্ দি আর্থ' শুনুন আমার কথা পরিষ্কার হবে।

ভাষাবিদ—প্রোকোফিয়েফ-এর 'লাভ অফ্ দ্য থ্রি অরেঞ্জেস'?

পরিচালক—সে তো বাস্তবভিত্তিক হবেই, আবার অপেরার কথা তুলছেন? হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ভারতীয় মার্গসংগীতে তো বাস্তবের কোনো রেশই নেই। খাঁটি অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট সংগীত হল ভারতের মার্গসংগীত, আমাদের রাগরাগিণী।

নাট্যকার—বাস্তবের রেশই নেই—একথা মানতে পারলাম না। ঋতুসংগীত দেখুন—বসন্ত বা বাহারে একটি বিশেষ ঋতুর ছায়া আসছে কিনা! মল্‌হারে বর্ষার রূপ ধরা পড়ছে না? আবার দেখুন প্রাতর্গেয় এবং রাত্রিগেয় রাগের পার্থক্য নেই? ভৈরোঁ রাগে ভোরের চেহারা স্পষ্ট। কেদারে চাঁদনি রাতের আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

পরিচালক—দেখুন, যে-কোনো অভিব্যক্তির জন্য সিম্বলিজম্ চাই, একটা আত্মলব্ধ সংকেত চাই। সংগীত-বিশারদ রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ভাষায় 'আত্মার প্রয়োজনে' এই সংকেতের সৃষ্টি, 'আত্মার প্রয়োজনে তার জন্ম, আত্মার একত্বে তার পরিণতি।' ভারতীয় রাগসংগীতের কলাকৌশলের পুরোটাই এই সিম্বলিজ্‌ম্। গানের ঋতু বা সময় এই ধরনের সিম্বলিজ্‌ম্-এর প্রকাশ। একটা ভিত্তি ঠিক করে নিয়ে গায়কের আত্মার প্রকাশের ব্যবস্থা। ওই ভিত্তিটুকুকে প্রধান করার কথাই উঠতে পারে না। ভৈরোঁ-র কোমল রেখার এবং কোমল ধৈবতে ভোরের ছোঁয়া থাকতে পারে। কিন্তু ভৈরোঁ-র দ্রুত তাল যখন শুরু হয় তখনো কি বলতে চান ভোরের আভাস পান? বাহার-এর তান দিতে গেলে বক্রভাবে দিতে হয়, সরল তান দিলে হুড়মুড় করে আড়ানা, বাগেশ্রী প্রভৃতি ঢুকে পড়বে, সেই বক্রতানেও কি বসন্ত ঋতুর চেহারা পান? আর বড়ো ওস্তাদের কাছে প্রাতর্গেয়-রাত্রিগেয় প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে গেছে। বসন্ত রাগের কথা বললেন, বসন্ত শেষরাত্রে গাওয়ার কথা। আমি মাঝরাত্রে বসন্ত শুনেছি ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে: সকালে রোদ ওঠার পর শুনেছি নিসার হোসেন খাঁ সাহেবের কণ্ঠে; দুটোই সংগত মনে হয়েছে, আমার কিস্যু অসুবিধে হয়নি। ভৈরবী গাওয়া হবে কখন? ভর-সন্ধেয় ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গলায় শুনেছি: মনে হয়েছে—হ্যাঁ, এ রাগ সন্ধেকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। সেই ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ভোরবেলায় শুনেছি—বাজু বন্দ

খুলু খুলু যাউ—মনে হয়েছে, হ্যাঁ, এ তো ভোরেরই রাগ। আবার এই সেদিন ওস্তাদ লতাফৎ খাঁ সাহেব ভৈরবী গাইলেন মাঝরাত্রে—মনে হল, এ তো রাত্রেরই রাগ। মল্‌হারে বর্ষার রূপ ফোটে, ঠিক কথা। আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপও ফোটে। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে ধ্রুপদ শুনেছেন—'বরসত ঘন শ্যাম'? বিলায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের খেয়াল শুনেছেন—'মহম্মদ শা রংগীলে'? 'করিম নাম' খেয়ালটিতে তো বর্ষার রূপ নেই, যদিও মিয়া কি মল্‌হার রাগে রচিত। এই রাগে 'বরসন লাগীরে বদরিয়া' গানও যেমন আছে, 'বোলি রে পপৈয়া' গানও লেখা রয়েছে। না, আমার মনে হয় ঋতু বা সময় রাগসংগীতের একটা কাঠামো মাত্র। ভেতরের রক্তমাংসটা একটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট। মল্‌হারের ধমার শুনেছিলাম ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠে, আমার কানে মেঘগর্জন বা বাতাস ধ্বনিত হয়নি , হয়েছিল 'খেলন আয়ে' অতীব চটুল চপল একটি নারীর মূর্তি। আবার সেই খাঁ সাহেবের ছায়ানটে খেয়াল শুনেছি, যেখানে ঝড় বাতাসের নামগন্ধ থাকার কথা নয় , অথচ দমকা ভিজে বাতাসে বারবার মনে দোলা লেগেছিল। কেদারে চাঁদনি রাতের ছায়া আমি কোনো ওস্তাদের কণ্ঠে পাইনি ; ও শুধু বইয়েই পড়েছি। অথচ সংগীত-রসিকশ্রেষ্ঠ অমিয় সান্যাল মহাশয় ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কেদারে ভিন্ন রূপ পেয়েছেন; উনি দেখেছেন—পঞ্চম যেন মহাবীর , বারবার সে পৃথিবী সেঁচে নানা উপঢৌকন এনে লাস্যময়ী মধ্যমার পায়ে নিবেদন করছে ; কিন্তু মানিনীর মান ভাঙছে না। না, মশায়রা, রাগসংগীতে নিছক বাস্তবকে খুঁজতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা।

নাট্যকার—সেইখানেই তো গণ্ডগোল! বাস্তবের সঙ্গে আমাদের রাগসংগীতকে যদি একেবারে জুড়তেই না পারা যায়, তবে তো নাট্যশালায় রাগসংগীতকে ব্যবহার করা অসম্ভব।

পরিচালক—এক্‌জ্যাক্টলি, রাগসংগীতকে নিজস্ব রূপে ব্যবহার করা অসম্ভব। আরো দেখুন, শুধু যে সময়-ঋতু-ঝড়বৃষ্টি-চাঁদ এ সংগীতে নেই তা নয় , আবেগকেও প্রাধান্য দেওয়া এ সংগীতে চলে না। আবেগের বাড়াবাড়িতে ঠুমরি সৃষ্টি হয়, খেয়াল হয় না , ধ্রুপদ ধমার তো নয়ই। আবেগের কাতরতা নিকৃষ্ট কলার অঙ্গ। মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আবেগকে অতিক্রম করে মহৎভাবের সঞ্চার করে। মশাই, চোখে জল আসে 'অরক্ষণীয়া' পড়ে, কিন্তু 'হ্যামলেট' পড়ে চোখ সিক্ত হয় না, বুক ভরে যায়। ভারতীয় রাগসংগীতের বেলায়ও তাই। রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলছেন, 'মনের দিক দিয়েও রাগের গোড়ার কথা প্রশান্তি , আবেগ অথবা উদ্বেগহীনতা . গান করতে বসে সুর যদি নিতান্ত করুণ হয় তাতে আবেগের যাথার্থ্য প্রমাণ হয়, কিন্তু সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় না।' এই সম্রাটোপম প্রশান্ত রাগসংগীতকে থিয়েটারের গোয়ালে আটকাবে কে?

ভাষাবিদ—তবে এতকাল ধরে বাংলা নাট্যশালা কী সংগীত চালিয়েছেন? নবনাট্য আন্দোলনই বা সংগীতকে কী করতে চাইছেন?

পরিচালক—এতকাল বাংলা নাট্যশালা সমস্যাটার সম্মুখীনই হয়নি। সমস্যাটাকে এড়িয়ে গেছে। যাত্রার হার্মোনিয়াম, কর্নেট, বাঁশি, ক্ল্যারিনেট, বেহালার সঙ্গে জুড়েছে অর্গ্যান , এই বিচিত্র অর্কেস্ট্রা দিয়ে যাত্রার সুর বাজিয়েছে। অর্থাৎ দেশ, বাগেশ্রী বা খাম্বাজ রাগকে ভিত্তি করে একটু কনসার্ট বাজিয়েছে। তাও ড্রপ ওঠার আগে বা ড্রপ পড়লে পরে। নাটকের মধ্যে

বেজেছে শুধু একটু যুদ্ধের বাজনা। এ ছাড়া নাটকের মধ্যে রাগ-ভিত্তিক গান দেওয়া হয়েছে পাঁচ-সাতখানা করে ; দু-একটি গান ছাড়া এরা নাটকের বিষয়বস্তু বা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন; সুতরাং এরা নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে। মোট কথা সংগীতকে আমলই দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম গানকে সত্যিকারের ব্যবহার করে দেখালেন কীভাবে গানের কথার সঙ্গে, সুরেব সঙ্গে নাটকের সাযুজ্য ঘটাতে হয়। 'রক্তকরবী'তে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'-টা ভাবুন, বা 'অচলায়তনে' 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন', অথবা 'তপতী'তে 'তোমার আসন শূন্য আজি'। একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে যখন আর কথায় কুলোয় না, তখনই যেন নাটকটি গানের সুরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এ-ও আবহসংগীত নয়। এ-ও গান। আবহসংগীত অন্য জিনিস। সে ভাষাহীন। সে স্বাতন্ত্র্যহীন। সে একান্তভাবেই নাটকের অঙ্গ। ববীন্দ্রনাথ সেদিকে এগোননি।

নাট্যকার—গণনাট্য সঙ্ঘ কিছু করেছেন?

পরিচালক—চেষ্টা কবেছেন, পাবেননি। আগেই বলেছি গণনাট্য সঙ্ঘ পুরোনো নাট্যশালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে সেই নাট্যশালারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন : অভিনেতাকে একেবারে একমাত্র অধিপতি করে তুলেছেন। তাই সংগীতকে তাঁরা যথার্থ মর্যাদা দিতে পারবেন না—এ আর আশ্চর্য কী? না, গণনাট্য আবহসংগীতকে বচনা কবে নিতে পারেননি। তারপর পেশাদার এবং অপেশাদার অভিনয়ে এল আর এক দৌরাত্ম্য : ওই কনসার্টের নূতন রূপ—ইলেক্‌ট্রিক গিটার আর ঝাঁজ। এঁরা কনসার্ট ছাড়াও আবহসংগীতের খোকামি শুরু করলেন। এখনও তাই চালাচ্ছেন। এই আবহসংগীত কী বকম জানেন? ধরুন নায়ক বললেন, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর আমাদের দেখা হবে না। মীরা বললেন, ওগো কেন? সঙ্গে শুনবেন বেড়ালের ডাক। মানে গোড়ায় মনে হবে বেড়ালের ডাক, তারপর বুঝবেন ওটা গিটার আর বাঁশি ; ওঁরা করুণ-বস সৃষ্টি কবছেন। ধরুন খল-নায়ক বললেন, কোথায় যাচ্ছ মীরা? অসীমকে আমাব গুণ্ডারা খুন করেছে! কথাগুলো যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বিষম হট্টগোল করে ঝাঁজটাজ বেজে উঠবে। এগুলো বাঁধা ফর্মুলা। আর অ্যাকর্ডিয়ন, গিটার প্রভৃতি সংযোগে যে কনসার্টটা বাজে সেটাতে রাগের ভিত্তি আর পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশ মার্কিন ফক্‌স্-ট্রটের সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। খুবই দুঃখের বিষয় প্রান্তিক-এর 'বিশে জুন'-এর মতন নাটকে মার্কিন সংগীতের নাম করে 'টার্কিশ পৌলের' মতন জঘন্য শস্তা সংগীত বাজিয়ে নাটকের আবহাওয়ার বারোটা বাজানো হয়েছে। নাটকের সংগীতকার বোধ হয় জানেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ল্যাসিকাল সংগীত আছে!

নাট্যকার—মধু বসু-র ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এর সঙ্গে তিমিরবরণ চেষ্টা করেছিলেন তো সত্যিকারের আবহসংগীত সৃষ্টি করতে।

পরিচালক—করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা ব্যর্থ হল কেন জানেন? তিমিরবরণ বুঝেছিলেন—খাঁটি রাগসংগীতকে থিয়েটারে আনা অসম্ভব। অথচ একটা নাটকের সংঘাত-আবেগ প্রভৃতিকে রূপ দিতে গেলে কনসার্ট বাজালে চলবে না, আবার গিটার-ঝাঁজের গাধামিও চলবে না। উনি বুঝেছিলেন নূতন ধরনের অর্কেস্ট্রা প্রয়োজন। অর্কেস্ট্রাই পারে নানা ধরনের শব্দসমষ্টি সৃষ্টি

করতে। শব্দ ; সংগীত নয় ; শব্দ কখনো এলোমেলো হবে, কখনো ধীরমধুর হবে, কখনো বা আবার গর্জন করে উঠবে। কিন্তু রাগসংগীতের প্রশান্ত গম্ভীর সুর সে রকম বৈচিত্র্য আনতে অক্ষম; সে বৈচিত্র্য আনলে সেটা আর রাগসংগীত থাকত না। অতএব তিমিরবরণ স্বরোদ, সেতারের সঙ্গে আরো বহু যন্ত্র জুড়ে সুরসৃষ্টি কবতে বসলেন। কিন্তু রাগসংগীতের বন্ধন কাটাতে পারলেন না। পিলু বা বাহার রাগের নির্দিষ্ট সরগমকে অতিক্রম করতে পারলেন না। ফলে তাঁর সংগীত এদিকেও গেল না, ওদিকেও গেল না। অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করব, অথচ মেলোডিকে ভাঙতে পারব না— এরকম দ্বিধায় পড়লে সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্কেস্ট্রাকে মানলেই পাশ্চাত্য সংগীতের ডায়াটোনিক স্কেলকে মানতে হবে, থিয়রি অফ হার্মোনিকে মানতে হবে। তিমিরবরণ পারেননি হার্মোনি সৃষ্টি করতে।

ভাষাবিদ—আপনারা কি তাই চাইছেন? আপনারা কি ভারতীয় নাট্যশালায় হার্মোনি চালাবেন? রাগসংগীত বিসর্জন দেবেন?

পরিচালক—রাগসংগীতকে বিসর্জন তো দেবই, কারণ সংগীতকেই যে বিসর্জন দেব। আমরা চাইছি নাট্যশালার আবহসংগীত। কোনো সংগীতকেই সেখানে স্বকীয়তা নিয়ে আসতে দেব না , আবহসংগীত মানেই পরাধীন সংগীত। সমগ্র নাটকের মধ্যে সে লুপ্ত। রাগসংগীত সেখানে বিদ্রোহ করে বসবে। অন্যপক্ষে বেঠোফেনও সেখানে বিদ্রোহ করে বসবেন। নাট্যশালা চাইছে রাগসংগীত-বেঠোফেন সবকিছুকে জড়িয়ে একটা নতুন সংগীত। আর আমার মনে হচ্ছে পাশ্চাত্য হার্মনি-র থিযোরি এ ব্যাপারে একটা নির্দেশ দিচ্ছে। কারণ হার্মনি-র ব্যবহারে শব্দ-সমষ্টির নানা বৈচিত্র্য আনা যায় ; মিঠে-মধুরের মায়া কাটানো যায় ; প্রয়োজনমতো সংগীতকে নানা পর্দায় নানা কম্বিনেশনে দৌড় করানো যায়। আসল কথা হচ্ছে, রাগসংগীতের কঠোর নিয়ম আমরা গানের আসরে মানব, থিয়েটারে নয়। আসরে কোনো ওস্তাদ যদি দরবারি-তে কোমলগান্ধার ঠিকমতো না লাগাতে পাবেন তবে রেগে যাব। কিন্তু থিয়েটারের ওস্তাদ যদি গান্ধার-বর্জিত এক দরবারি বচনা করে বসেন আর সেটা যদি আমার নাটকের রূপকে প্রতিফলিত করে তবে আমি তাকে সাদরে গ্রহণ করব। 'ফেরারি ফৌজ'-এর আবহ সংগীতে যোগ, নায়কি কানাড়া প্রভৃতি ব্যবহার হয়েছে ; অথচ বারবার সব নিয়ম লঙ্ঘন করে কাউন্টারপয়েন্ট গর্জন করে উঠেছে, যোগ রাগ হঠাৎ মালকোষের দিকে ছুট দিয়েছে, নানা যন্ত্রের নির্ঘোষ হঠাৎ মূল সুরটিকে চেপে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে 'ফেরারি ফৌজ'-এর উদ্দাম বিপ্লবীদের জীবন ওই রকমই হয়। সেই বাঁধনছেড়া জীবনকে প্রকৃত রূপই দিয়েছেন রবিশঙ্কর। 'অঙ্গার'-এ জলোচ্ছ্বাসের দৃশ্যে পুরো অর্কেস্ট্রার স্থান দখল করেছে একটি সেতারের ঝালা—সেটিকে তখন যথার্থ জলের তোড় মনে হয়েছে বলেই তা সার্থক। আবার প্রথম দৃশ্যের শেষে সনাতনের 'জান বাঁচাও' চিৎকার থেকে ধরে নিয়ে যে সংগীতাংশটি, তা খাঁটি ইয়োরোপীয় রীতিতে সৃষ্ট ; কিন্তু নাটকে ওই মুহূর্তটিকে অকস্মাৎ বিরাট বৃহৎ করে তুলেছে বলে ও-টিও সার্থক।

নাট্যকার—উঃ থামুন দিকি মশায়। আর এক রাউণ্ড চা হোক!

অভিনয় সম্বন্ধে যেদিন আলোচনা হবাব কথা ছিল, সেদিন নাট্যকার প্রায় এক সংকট উপস্থিত করে ছাড়লেন। তিনি বাংলাব এক জবরদস্ত অভিনেতাকে চা-কেকের লোভ দেখিয়ে আড্ডায় উপস্থিত করলেন। পরিচালক তাঁকে দেখেই আঁৎকে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমরা টেনে বসালাম। বললাম—মশাই, প্রতিপক্ষ জোরদার না হলে কখনো বিতর্ক হয়? সন্ধি হল, রামমোহন-সুব্রামানিয়াম তর্ক শুরু হল, আমরা জমিয়ে বসলাম।

পরিচালক শুরু করলেন—এতকাল বাংলা নাট্যশালা অভিনেতাদের লীলাক্ষেত্র ছিল, অভিনেতাদেব আস্ফালনেব আখড়া ছিল। এই অভিনয় কী ধরনেব ছিল আগে বুঝতে হবে।

অভিনেতা বললেন—আমি বলছি। এতদিন, মানে আপনারা নটচ্যাংড়ারা আসার আগে পর্যন্ত, অভিনেতা আবেগেব গভীরে ডুবতে জানতেন। অভিনয় করতে করতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে জানতেন। অহীনবাবুর 'শাজাহান' দেখেছেন? কয়েকটি দৃশ্যের পর থেকে যে প্রচণ্ড আবেগ অনুভূত হত তাঁর অভিনয়ে, আপনাদেব শম্ভু মিত্রের বাঁধাধরা গলার খেলায় তা কস্মিনকালেও ফোটেনি। ছবিবাবুর নটু দেখেছেন? হলপ করে বলতে পারি ছবিবাবু আশেপাশের সব ভুলে গিয়ে সে পার্টে ডুবে যেতেন। আর তাকেই বলে আর্ট। অভিনয়ের মুকুটমণি ডেভিড গ্যারিক বলতেন, 'the greatest strokes of genius have been unknown to the actor himself, till circumstances, and the warmth of the scene, have sprung the mine as it were, as much to his own surprise as that of the audience'। অন্যের লেখা কথা মুখস্থ করতে করতে, অন্যের সৃষ্ট দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে অভিনেতার নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ এমন আশ্চর্য এক আবহাওয়া গড়ে ওঠে, এমন নতুন রূপে হেসে ওঠে চরিত্রটি যে সেই মুহূর্তে অভিনেতা হয়ে ওঠেন স্রষ্টা। তিনি আর তখন নাট্যকারের দাস থাকেন না, তিনিও সৃষ্টি করেন।

ভাষাবিদ বললেন—গ্যারিকের যে উদ্ধৃতি দিলেন সেটা ফরাসি অভিনেত্রী মাদাম হিপোলাৎ ক্লেরোঁ সম্বন্ধে তাঁর এক রচনা থেকে। ক্লেরোঁ-র কণ্ঠস্বর, অঙ্গসঞ্চালন সবই নিখুঁত ছিল, তবু প্রাণ যেন তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। কারণ তাঁর মধ্যে প্রতিভার 'electrical fire' ছিল না। ওই electrical fire কথা দুটিও গ্যারিকের! সে fire যাঁর আছে তিনি তাঁর পার্টকে অতিক্রম করে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম। সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে উঠে, হোরেস-এর ভাষায় 'পেকাতুস্ ইনানিতের আন্‌জিৎ, ইরিতাৎ, মুলকেৎ, ফালসিস্, তেররিবুস, ইমপ্লেৎ উৎ মাজুসজ' জাদুকরের মতন অভিনেতা অজানা-অচেনা রূপকথার সব ভয়-ভাবনা আর সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তোলেন, আগুন ধরে যায় তাঁর নিজের হৃদয়ে।

পরিচালক নাট্যকারের চুরুটের স্তূপ থেকে বিনা অনুমতিতে একটা তুলে নিয়ে ধরিয়ে ফেললেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে পুরোনো অভিনেতারা আবেগাশ্রয়ী অভিনয় করতে করতে ডুবে যেতেন পার্টে। তাই সেটা আর্ট?

অভিনেতা বললেন—হ্যাঁ। সব আর্টেরই মূল কথা হল আবেগ।

পরিচালক বললেন—ঠিক, সব আর্ট সৃষ্টি করার সময়ে আবেগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে তার আর নড়চড় নেই। একটা ছবি আঁকবার সময়ে শিল্পীর মনে বেশ

খানিকটা উচ্ছ্বাস আসতে বাধ্য। কিন্তু সে উচ্ছ্বাসকে যখন তিনি রং আর ক্যানভাসে বেঁধে ফেললেন তখন সেটা চিরকালের মতন স্থির হয়ে রইল। রোজ সে ছবি বদলে যেতে পারে না। কারণ রং বা ক্যানভাস প্রাণহীন পদার্থ। ঔপন্যাসিক যখন লেখেন তখন তাঁর প্রাণে আবেগের বন্যা বইতে পারে ; কিন্তু সে আবেগের ফলাফল অনড় কাগজ-কালির সীমায় বন্দী হয়ে থাকে। কিন্তু অভিনেতা নিজেই স্রষ্টা, আবার নিজেই সৃষ্টির উপাদান। তিনিই শিল্পী, আবার তিনিই শিল্পের কাগজ-কলম-রং-ক্যানভাস। অথচ তিনি জীবন্ত মানুষ। এবং জীবন্ত বলেই তিনি অনড় নন, সচল। তাঁর হাত-পা, তাঁর কণ্ঠস্বর সচল এবং তিনি মানুষ, মেশিন নন। আর মানুষ বলেই প্রতিদিন তিনি হুবহু একই জিনিস সৃষ্টি করতে পারেন না। কক্ষনো পারেন না। 'মার্জিন অফ হিউম্যান এরর' তাঁকে ছাড়তেই হবে। আর ঠিক সেই কারণে তিনি শিল্পী নন, তাঁর আবেগভিত্তিক অভিনয়ও শিল্প নয়। আবেগের উপর যার ভিত্তি তার বিচিত্র গতি। আবেগ যেদিন সপ্তমে উঠল সেদিন অভিনয় উঁচু পর্দায় বাঁধা , আবেগ যেদিন ঢিমেতালে চলছে, সেদিন অভিনয়ও মন্দ্র সপ্তকে নেমে আসতে বাধ্য। আবেগে যে অভিনেতা কম্পিত তিনি কী সুরে বলবেন, কী ঢং-এ হাঁটবেন কেউ বলে দিতে পারে? তিনি চাইছেন এটা, হচ্ছে ওটা। চাইছেন বসে পড়তে, হচ্ছে ভেঙে পড়া। আবেগ তাঁকে কানে ধরে ঘোড়-দৌড় করাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব। আবেগভিত্তিক শিল্প আকস্মিক জিনিস। একেক দিন হল, একেক দিন হল না। গ্যারিক নিজেই বলছেন, যা স্রষ্টার কাছে অজ্ঞাত, অজানিত, তা শিল্প কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এদিকে গর্ডন ক্রেগ স্পষ্টই বলেছেন, 'Art. . . can admit of no accidents. That then which the actor gives us is not a work of art, it is a series of accidental confessions.' আমাদের প্রবীণ অভিনেতাদের ভাষায় 'মুড না হলে অভিনয় হয় না।' কিন্তু মুড তো আমাদের চাকর নয় ; সে রোজ 'বান্দা হাজির' বলে নাও হাজির হতে পারে।

অভিনেতা বলে উঠলেন—তা মুড চিত্রশিল্পীরও এক-আধদিন না আসতে পারে। সেদিন তাঁর ছবি খারাপ হয়। যেদিন মুড থাকে সেদিন ভালো ছবি আঁকেন।

এবার দার্শনিক বললেন—আপনি প্রশ্নটা অন্যখানে নিয়ে গেলেন। চিন্তার মুড সম্বন্ধে আমরা কথা বলছি না। চিত্রশিল্পী যদি খারাপ আঁকেন, ছবিটা তিনি ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু যা ভাবছেন ঠিক তাই আঁকতে তিনি সক্ষম। তাঁর আঁকার উপকরণের কোনো নিজস্ব মুড নেই যে তারা হঠাৎ ভিন্ন পথে লম্বা দেবে। তিনি যদি একটা সরলরেখা আঁকতে চান, তো তুলি বা রং-এর এমন ক্ষমতা নেই যে, তারা সেটাকে বৃত্তে পরিণত করতে পারে। কিন্তু অভিনেতা স্রষ্টা হিশেবে যা ভাবছেন, সৃষ্টির উপকরণ হিশেবে সেটাকে নাও রূপ দিতে পারেন, কারণ তাঁর হয়তো আজ মুড নেই। অনেক ভেবেচিন্তে অভিনয়ের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, অসংযত আবেগে বা আবেগের অভাবে, অর্থাৎ মুড-এ থাকলে বা মুড-এ না থাকলে তিনি সে পরিকল্পনা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারেন। এবং গিয়েও থাকেন এটা আমরা সবাই জানি। অর্থাৎ যেটাকে সরলরেখার মতন এঁকেছিলেন, সেটা বৃত্ত হয়ে দাঁড়াল। এখানেই আসছে আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের মূলগত বিরোধ। একদিন এক মস্ত অভিনেতাকে দেখেছিলাম বহুদিন

আগে স্টারে ; সেদিন তাঁর মুড এসেছিল নিশ্চয়ই কারণ সহ-অভিনেতাকে হত্যা করার সময় তলোয়ার দিয়ে জখম করেছিলেন। আর মুড না থাকলে যে কী হত তা কয়েক বছর আগেও রবিবার দুপুরের অভিনয় দেখলে বোঝা যেত। 'নন্দকুমার' দেখেছিলাম, মশাই, ওয়ারেন হেস্টিংস এবং নন্দকুমার প্রতি সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে অনুচ্চস্বরে খিস্তি করছিলেন, আঠারো শতকের ভাষায় নয়, খাঁটি বিশ শতকের কলকাতার রকবাজদের ভাষায়।

সবাই একটু ভদ্রতার হাসি হাসলেন। তারপরই অভিনেতা সদর্পে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন বললেন—শিল্পে আকস্মিকতার স্থান নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বেনেদেত্তো ক্রোচে থেকে আঁদ্রে জিদ পর্যন্ত সকলের মতামত দেখলে ক্রমশই প্রতীত হয় সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টিতে আকস্মিকতার স্থান ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতীত। কিন্তু ভারতীয় শিল্পের অন্তত একটি ক্ষেত্রে আকস্মিকতা বিরাট স্থান জুড়ে আছে। সেটাকে ওড়াবেন কোন যুক্তিতে? আমি বলছি রাগসংগীতের কথা বিশেষ করে খেয়ালের কথা। এখানেও গায়ক নিজেই স্রষ্টা, নিজেই উপকরণ। কিন্তু ইয়োরোপের অপেরা-গায়ক অন্যের স্বরলিপি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, প্রতিটি আরিয়া-র প্রতিটি স্বর পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু ভারতীয় গায়ক! রাগের লক্ষণ বা সরগম-আদি ছাড়াও তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এবং এই স্বাধীনতার জন্যেই আকস্মিকভাবে এক একটা প্যাটার্ন সৃষ্টি হতে বাধ্য। গায়ক নিজেই কি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান না নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টিতে? গায়ক মুড-এ না থাকলে এ ধরনের গান গাওয়া কি সম্ভব? পদে পদে নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টি করা সম্ভব? 'মেজাজ' বলে যে কথাটি চালু আছে সংগীতজগতে তার তাৎপর্য ভেবে দেখেছেন আপনারা?

ভাষাবিদ বললেন—শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি আলোচনা করলে আপনার কথা আপেক্ষিক অর্থে সত্য। কিন্তু আপেক্ষিকই, তার বেশি নয়। সব শিল্পেই কিছু আকস্মিকতা অনস্বীকার্য। তার মধ্যে ভারতীয় রাগসংগীতে আকস্মিকের পরিসর অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু সেইজন্যেই সেটাকে লুপ্ত করে আনার কী প্রয়াস গায়কদের! সেইজন্যেই প্রতিটি তানকে হাজারবার রেয়াজ কবার ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছে। সেইজন্যেই ভারতীয় রাগসংগীতের জন্যে যে সাধনা প্রয়োজন তা আর কোনো শিল্পে আছে বলে আমার জানা নেই। এই প্রাণান্ত পরিশ্রমের উদ্দেশ্যই হল আকস্মিককে ক্ষুদ্রতম পরিসরে বন্দী করে রাখা। বলছেন, পদে পদে ওঁরা নতুন প্যাটার্ন সৃষ্টি করেন। বাজে কথা। আপনার তা মনে হয়। আসলে ওসব প্যাটার্ন কয়েক হাজার বার অভ্যেস করে তবে তাঁরা আসরে বসেন, আকস্মিক এখানে কিচ্ছু নেই। তবে কলাকৌশলকে এমন ভাবে তাঁরা আয়ত্ত করেন যে, আপনার মনে হয় সহজ সাবলীলভাবে বুঝি তাঁরা তক্ষুনি সুর-সৃষ্টি করছেন। আর আবেগ তাঁদের যতই থাক, রাগসংগীত আবেগ-ভিত্তিক নয়। অসংখ্য নিয়মে খেয়াল-গান বাঁধা। খেয়াল-এ খামখেয়াল নেই, এটা মনে রাখবেন।

পরিচালক বললেন—তা ছাড়া অভিনেতার চেয়ে গায়ক আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গায়কও শিল্পের উপকরণ বটেন, কিন্তু গায়কের হাতের অস্ত্রটি অসাধারণ। তিনি কথা কন না, গলায় সুর তোলেন ; আর রেয়াজি গলায় সুর একটা বিশেষ ঢং, বিশেষ স্টাইল নিয়ে বসে যায়। গায়কের মানসিক অবস্থা যাই হোক না কেন, তাঁর গলাটা একই থাকে। যাঁর সি-শার্প, তাঁর সি-শার্পেই সা থাকে। আবেগে অস্থির হয়ে স্কেল নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। এদিক থেকে

গায়কের গলাকে একটি সংগীতের যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ এর নিজস্ব কোনো মুড নেই বা গায়কের মুড দ্বারা এ প্রভাবান্বিত নয়। এর প্রায় আলাদা সত্তা দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অভিনেতার গলা, তাঁর মানসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য। কারণ তিনি মঞ্চে কথা বলেন স্বাভাবিক নিজস্ব গলায় এবং ভঙ্গিতে। সেইজন্যেই অভিনেতার গলা ভাঙে, সেইজন্যেই খুব বড়ো অভিনেতাকেও হঠাৎ শুনতে হয় 'লাউডার প্লীজ!' জীবন থেকে সরে গিয়ে নকল একটা জোয়ারি এনে ফেলে গায়ক তাঁর গলাকে স্বাধীন দৃঢ় স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন ; আর জীবনানুগ কথাবার্তা বলতে হয় বলে অভিনেতার গলা আপনার আমার গলার মতনই আবেগের দাস—অভিমানের গলা, দুঃখের গলা, ক্রোধের গলা, স্বাভাবিক গলা প্রভৃতি নানা স্তরে অভিনেতাকে ছুটে বেড়াতে হয়। গায়ক আর অভিনেতাকে এক পর্যায়ে ফেলা ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় সেতার আর অভিনেতাকে এক শ্রেণীতে ফেলা।

অভিনেতা পরাভব স্বীকার করেন না ; বলেন—এইসব না হয় মানলাম। তাতে কী হল? আকস্মিকতাকে একেবারে অস্বীকার তো আপনারা করতে পারছেন না। অভিনয়শিল্পে না হয় আকস্মিকতার স্থান কতকটা বেশি ; অপেক্ষাকৃত বেশি। আবার তাকে আয়ত্তে রাখবার জন্যে অভিনেতার পরিশ্রমই বা কম কিসে? রিহার্সালের উদ্দেশ্যই তো তাই।

পরিচালক বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—ঠিক! রিহার্সালের উদ্দেশ্যই হল অভিনেতার চলাফেরা কথাবার্তাকে সুদৃঢ় ছকের মধ্যে নিয়ে আসা, যাতে আবেগবশবর্তী হয়ে আকস্মিকের উপর তিনি নির্ভর না করেন। কিন্তু এতকাল বাংলা নাট্যশালায় আমরা কী দেখেছি? রিহার্সাল বস্তুটির কী হাল তাঁরা করেছেন?

অভিনেতা চেঁচামেচিতে ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বললেন—কারা?

পরিচালক উন্মত্ত স্বরে বললেন—অভিনেতা মহারাজরা! উচ্ছৃঙ্খলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তাঁরা! কজন ঠিক সময়ে রিহার্সালে এসেছেন? কজন রিহার্সালে আদৌ এসেছেন? রিহার্সাল বলতে এতকাল কী বুঝিয়েছে? জনাকয়েক লোক পরিচালককে ঘিরে বসেছেন ; বসে বসেই বলে নিয়েছেন পার্টটা। উঠে দাঁড়াবারও দরকার হয়নি ; চলাফেরা, বসা-ওঠা, প্রবেশ-প্রস্থান কিছুই মহড়া দিতে হয়নি। সীন এঁকেছেন যিনি ড্রেস-রিহার্সালের পূর্বে তিনি অভিনেতাদের কখনো জানাননি কী রকম পরিকল্পনা তিনি করছেন।

পরিচালক—পরিচালক তাঁকে বলব না, বলব কথা-নির্দেশক . . . কী ধরনের নির্দেশ দিতেন জানেন? অভিনেতাদের কথা ঠিক করে দিতে তাঁর পরিশ্রমের শেষ নেই, কিন্তু দৃশ্যসজ্জা-বিষয়ে তাঁর নির্দেশ কী হত? ওহে, একটা বনপথ লাগবে প্রথম অঙ্কে! দ্বিতীয় অঙ্কে দরবারে দুটো থাম দিও তো হে! আর তৃতীয় দৃশ্যে অন্তঃপুরে একটা তক্তপোশ লাগবে। ব্যস! বাদবাকি সব দৃশ্যসজ্জাকরের স্বাধীন কল্পনা-প্রসূত। অভিনেতা হয়তো দরজা কল্পনা করেছেন ডানদিকে, দরজা এল বাঁদিকে। অভিনেতা ভেবেছেন অমুক সংলাপটা বসে বসে দেব, কার্যক্ষেত্রে দেখলেন ভোঁ ভাঁ, বসার কোনো আসনই দৃশ্যসজ্জায় নেই। অতএব, অভিনেতা বাহাদুরবা যে যেমন দাঁড়িয়ে প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেছেন! রিহার্সাল মানে শৃঙ্খলা!! আমাদের বড়ো বড়ো অভিনেতাদের কাছে রিহার্সাল ছিল চা-সিঙাড়ার আসর আর প্রক্সি দিয়ে কাজ চালাবার মেলা!

তারপব দুই বড়ো অভিনেতা এক দৃশ্যে এলেই আমবা কী দেখেছি? প্যাঁচের লড়াই! হাততালি কুড়োবার পাঁয়তারা। পরস্পরকে দাবিয়ে দেওয়ার আণবিক যুদ্ধ! আর কম্বিনেশন নাইটে এক দঙ্গল বড়ো অভিনেতা জড়ো হওযার ফলে যে গৃহযুদ্ধ ঘটতে দেখেছি তাতে দর্শক হিশেবে আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেছে। নাটক চুলোয় গেল, দৃশ্যের পরিবেশ জাহান্নমে গেল—চলছে শুধু শাজাহান-আওরংজেব-যশোবন্ত-দিলদারের খেয়োখেয়ি। এরকম ব্যভিচার করতে কবতে তাঁরা দর্শকদের পর্যন্ত এত নীচে টেনে নামিয়েছিলেন যে অভিনেতাদের পারস্পরিক তুলনাই হয়ে উঠেছিল দর্শকদের কাজ। এঁর শাজাহান ভালো, না ওঁর! এঁর আওরংজেব ওঁর দিলদারকে কেমন চেপে দিল, ওঁব যোগেশ এঁর রমেশকে কেমন জুতিয়ে দিল, ওইসবই ছিল মূল আলোচনার বিষয়। ছ্যা, ছ্যা। স্বর্গ থেকে যে গিবিশ আর দ্বিজেন্দ্রলাল চোখের জলে বান ডাকাচ্ছিলেন একথা এইসব অভিনেতাদের স্ফীত মস্তিষ্কে ঢোকেনি! আর বলিহাবি সেইসব পক্ককেশ পণ্ডিতদেব যাঁরা এতকাল এই কুৎসিত নির্লজ্জ মারামারিব মধ্যে নাট্যশালার সর্বনাশ দেখেননি, দেখেছেন আজকে যখন নবনাট্য আন্দোলন অভিনেতার স্বেচ্ছাচার বন্ধ করে সামগ্রিকভাবে মঞ্চটাকে ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপ হিশেবে গড়বার চেষ্টা করছে!

দার্শনিক বললেন—আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়েব মূল বিরোধটা তখনই স্পষ্ট হয় যখনই দুই বা ততোধিক আবেগময় অভিনেতা এক দৃশ্যে অভিনয় করেন। এঁব আবেগ আব ওঁর আবেগ দুই ভিন্ন পথে ছুটতে থাকে ; তাব মধ্যে মিল ঘটাবে কে এমন দুরদৃষ্ট। আর অভিনয় একক শিল্প নয়, বহু-ব সমন্বয়। তাই আবেগ-ভিত্তিক অভিনয সব সময়েই অশৈল্পিক!

অভিনেতা দেখলাম কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তবু বললেন—আপনারা কি বলতে চান প্রাচীনবা রিহার্সালে কিছুই কবতেন না?

পরিচালক ধমকে বললেন—হ্যাঁ, তাই বলছি ; কিস্‌স্যু করতেন না। করলে যে আবেগ খানিকটা সংযত হয়ে পড়বে! সে কি হতে দেওয়া যায? আরে মশাই, পার্টটা পর্যন্ত মুখস্থ করতেন না তাঁরা! আর অঙ্গভঙ্গিরই বা কী বাহার! রিহার্সালে গতব তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অভিনয়ের দিন? পুরো নাটকটা চলছে ঢিমে তেতালায়। হঠাৎ-হঠাৎ মুড এসে পড়তেই গলা সপ্তমে এবং হাত শূন্যে উঠল। কতগুলো ফর্মুলা-বাঁধা জেস্‌চার-এরই বকমফেব, বেগে প্রস্থান বা বেগে প্রবেশের মুখে একখানা কোমর-দোলানো অঙ্গুলি-নির্দেশ! সে যে কী কদর্য ব্যাপাব না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এ ছাড়া আরো যে কতকগুলো ভুরু-তোলা বা চোখ-পাকানো বা ক্রূর-হাসির রেওয়াজ আছে সেগুলির অর্থও এখনো আমি বুঝিনি। শেরিডান-এর 'ক্রিটিক' পড়েছেন তো? তাতে রিহার্সালের দৃশ্যে এক অভিনেতাকে বিনা সংলাপে শুধু একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিতে দেখে সমালোচক ড্যাংগল্ বলছেন :

What does he mean by shaking his head in that manner?

তাতে পাফ্ বলছেন .

> Don't you know? Why, by that shake of the head he gave you to understand that even though they had more justice in their cause and more wisdom in their measures, yet, if there was not a greater spirit shown on the part of the people, the country would at last fall a sacrifice to the hostile ambition of the Spanish monarchy.

ড্যাংগল্ হতভম্ভ হয়ে বলছেন ;

Did he mean all that by shaking his head?

এই ছিল আমাদের আবেগাশ্রয়ী অভিনেতাদেরও চেহারা! আবেগ চিরকালই ভাসা-ভাসা ঘোলাটে আবছা-আবছা বস্তু। তাকে রূপ দিতে গেলে ওই পাফ-সাহেবের অভিনেতাদের মতনই আবছা অস্পষ্ট অঙ্গভঙ্গি ছাড়া উপায় কী?

এবার নাট্যকারও দেখলাম তাঁর ডেকে-আনা উকিলের কথাবার্তায় আস্থা হারাচ্ছেন। কারণ তিনি নিজেই জিগ্যেস করে বসলেন—আচ্ছা, আবেগকে মুক্ত বিচরণের অধিকার দিলে আরো একটা সমস্যাব উদ্ভব হয় না কি? অভিনেতা নিজে মানুষ, তাই নানা স্বাভাবিক মানবিক আবেগে তিনি নিজেই বিপর্যস্ত! কিন্তু মঞ্চের উপব তাঁর নিজের আবেগেব কোনো স্থান নেই ; সেখানে আর একটি চরিত্রের আবেগে তাঁকে ডুবতে হবে। কিন্তু আবেগের ছিপি খুলে দিলে আমার তো মনে হয় নিজের আবেগের স্রোতটাই ছুটবে আগে। সব মিলে একটা জগাখিচুড়ি হবার সম্ভাবনা থাকে না? কারণ মানুষ নানা জটিল আবেগের আবর্ত-মাত্র , কিন্তু নাটকের চরিত্র মোটামুটি সবলীকৃত, সিম্‌প্‌লিফাইড।

ভাষাবিদ বললেন—পাউল কর্নফেল ঠিক তাই বলেছেন, শুনুন :

> Concern for many things prevents the real-life person from externalizing himself completely the memory of many things rooted in him and the rays of a thousand events crisscross within him So at any given moment he can only be a changing complex of behaviour

কিন্তু অভিনেতাকে মঞ্চের ওপর হতে হবে not complex. but one! অতএব আবেগকে দমন না কবে উপায় নেই।

পরিচালক বলে চললেন—তা ছাড়া কার আবেগ? অভিনেতা, আপনি বলছেন, তাঁর পার্টের মধ্যে ডুবে যেতেন! কী কবে? কী উপাযে? যতক্ষণ কোনো গেরস্ত-গেরস্ত চরিত্র কবছি ততক্ষণ বলতে পারি সে-চরিত্রের আবেগ হয়তো আমি খানিকটা বুঝতে পাবি। ছেলের আমাশা, বাড়ি ভাডা দেওযা হযনি, গোয়ালা জল মেশায়, গিন্নি আবাব আঁতুব-ঘরে, এ সব সমস্যায জর্জরিত চরিত্রেব যা আবেগ তার সঙ্গে আমার নিজের আবেগকে হয়তো মিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ধরুন শাজাহান, ভারত-সম্রাট শাজাহান, নিজ প্রাসাদে প্রাণপ্রিয় পুত্র কর্তৃক বন্দী শাজাহান, প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ পিতাশ্রেষ্ঠ সম্রাট শাজাহান! কে বলতে পারে, হ্যাঁ, আমার আবেগের সঙ্গে শাজাহানের আবেগ মিলতে পারে? কোথায় সে বত্তবীজ? তবে কি শাজাহানের বিপুল হৃদযাবেগকে খর্ব করে, বাঁধ বেঁধে পূতিগন্ধময জলাশয়ে পরিণত করে টেনে তাকে নিম্নমধ্যবিত্ত অভিনেতাব পর্যায়ে নামাতে হবে? ছা-পোষা অর্ধশিক্ষিত অভিনেতা শ্রীযুত গোলোকচন্দ্রবাবু শাজাহানের পর্যায়ে উঠতে পারছেন না ; ঠিক আছে, শাজাহানকেই টেনে গোলোকচন্দ্রেব পর্যায়ে নামানো যাক!

অভিনেতা অপমানিত আরক্ত মুখে প্রতিবাদ কবে উঠলেন—কেন? গোলোকচন্দ্র যদি ভালো অভিনেতা হন তবে তাঁর কল্পনাশক্তি থাকা উচিত। শাজাহানকে কল্পনা করে নিতে পারেন!

পবিচালক দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন—আবে থামুন না মশাই। কল্পনাশক্তিব একটা সীমা আছে তো। না কী। বাহ্যত একটা শাজাহান খাড়া কবা কঠিন নয় , পোশাক-টোশাক পবে, মুখে দাড়ি-টাড়ি এঁটে বাদশাহকে নকল কবা সম্ভব, এমনকী ভালো দৃশ্যসজ্জা পেলে দববাবেব জাঁকজমকও খানিকটা এনে ফেলা যায় , অনববত ইতিহাসেব বই পড়ে আব দববাবি কানাড়ায খেয়াল শুনে সম্রাট শাজাহানেব মনেব দিকটাও অংশত হযতো মক্সো কবা যায়। আব আগ্রা গিযে চাঁদনি বাতে তাজমহল দেখে বা ববীন্দ্রনাথেব কবিতা পড়েও খানিকটা বাদশাহী মেজাজ না হয আনা গেল। চলনবলনে বেশ একটু বাজসিক ভাব না হয বপ্ত কবা গেল। কিন্তু সে তো আবেগেব পক্ষে যথেষ্ট নয়। সম্রাটেব আবেগ কেমন ছিল সে-অবস্থায়, সেটা যিনি কল্পনা কবতে পাববেন, তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালেব সমকক্ষ হয়ে পড়বেন। শেক্‌স্‌পিযাবেব ওথেলো যখন অজ্ঞান হযে মঞ্চে পড়ে যায, তাবপব উঠে ভুল বকে, বা হ্যামলেট যখন পোলোনিয়াসবে হত্যা কবে, তখনকাব আবেগ কেমন যদি জানতে পাবতাম তবে আমিই শেক্‌স্‌পিযাব হযে বসতাম।

অভিনেতা বললেন—কেন? দ্বিজেন্দ্রলাল আব শেক্‌স্‌পিযাব-এব লেখায সে আবেগ স্পষ্ট ফুটে বযেছে। পড়লেই বোঝা যায।

পবিচালক বললেন—ওঁদেব লেখায় যে আঁচটুকু পাওযা যায় তাব ওপব ভিত্তি কবে সে চবিত্রেব বৃহত্তব আবেগে প্রবেশ কবতে পাবেন? ওইটুকু পবিবেশে গোটা মানুষটাকে ধবতে পাবেন?

নাট্যকাব আব থাকতে পাবলেন না, বলে উঠলেন—অসম্ভব। বড়ো বড়ো পণ্ডিতবা সম্যক বুঝতে পাবেন না ওই সব মহাশক্তিধব চবিত্রদেব, আব অভিনেতা বুঝবেন কী কবে? নাট্যকাব ঠিক কী ভেবে লিখেছিলেন তা যথাযথ বোঝা অসম্ভব। একটা ছবি দেখে পিকাসো-ব আবেগকে সম্যক বুঝতে যাওযা মূর্খতা। দববাবি আলাপ শুনে তানসেনেব আবেগকে চিনতে ভগবানও পাবেন না। কেন বাজে কথা বলছেন?

অভিনেতা দমেন না , বলে চলেন—প্রশ্নটা গুলিযে ফেলছেন। সম্যক আবেগ ধবতে পেবেছি কিনা সেটা বড়ো কথা নয , কথা হল দর্শক আমাকে দেখে শাজাহান বলে মেনে নিচ্ছে কিনা। অভিনযশিল্পেব বৈশিষ্ট্যই হল দর্শকেব স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি।

চেঁচিযে উঠলেন পবিচালক—এক্‌জ্যাক্‌ট্‌লি। দর্শককে ধোঁকা দিতে পাবলেই হল। তবে আবেগেব কথা কেন তুলছেন? দর্শকেব অবিশ্বাসকে স্তম্ভিত কবে নাকচ কবে দিতে পাবলেই হল। সেখানে আবেগেব স্থান কোথায? বিন্দুমাত্র আবেগ আমাব মধ্যে না জাগলেও আমি ঠাণ্ডা মাথায় আমার চলাফেবা, কথাবার্তা, পোশাক-রূপসজ্জা সব দিযে দর্শককে বুঝিযে ছাড়তে পাবি যে, আমি শাজাহান।

অভিনেতা আমতা-আমতা কবছিলেন। তাই পবিচালক উন্মত্ত বিহার্সালি কণ্ঠে ধমক দিলেন—বলুন, পাবি?

অভিনেতা বললেন, শুষ্ককণ্ঠে—হ্যাঁ।

পবিচালক জেবা কবে চললেন—এবং এই ধোঁকাবাজিই যেখানে অভিনয়শিল্পেব ভিত্তি,

সেখানে ঠাণ্ডা মাথাই বেশি কার্যকরী, এটা মানেন? আবেগে অস্থির হলে ধোঁকাবাজি করা যায় না, এটা স্বীকার করেন? আবেগ-ভিত্তিক অভিনয়ের অর্থই হল নিজের ধোঁকায় নিজেই পর্যুদস্ত হওয়া, এটা মানেন?

অভিনেতা মৃদু মাথা নাড়লেন। পরিচালক সদর্পে বলে চললেন—দর্শককে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেওয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে নিজেরই আবেগে বিচলিত হওয়া হল মূর্খতার রেকর্ড! আর ওদিকে শিশিরবাবুর জীবানন্দ নিরুত্তাপ উদাসীন ভাবলেশহীন কণ্ঠে দুটি কথা কইল, আর মুহূর্তে প্রেক্ষাগৃহে আমাদের চোখ জ্বালা করে উঠল! বলুন, অভিনয়ের উদ্দেশ্য কে সত্যি সাধিত করলেন! আপনি ছবিবাবু, অহীনবাবুর নাম করেছেন, কিন্তু নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির নাম সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কেন গেছেন জানি। বাংলার নাট্যশালার মরুভূমিতে শিশিরবাবু একমাত্র ওয়েসিস। আবেগে অস্থির হয়ে তাঁকে কোনোদিন চেঁচাতেও দেখিনি, ডুকরে কাঁদতেও দেখিনি, লম্ফঝম্পও কবতে দেখিনি, ফোকাশ নিতেও দেখিনি। ধীর স্থির মানুষটি মঞ্চের কোণে বসে মৃদু হেসে চলে গেছেন। প্রতি মুহূর্তে নিজের ওপর রেখেছেন সতর্ক পাহারা। সেই সঙ্গে বেখেছেন দর্শকের ওপর সজাগ দৃষ্টি। অথচ দর্শককে কাঁদিয়েছেন আর হাসিয়েছেন বছরের পর বছর। মশাই, শিশিববাবুর কাছ থেকে শিখুন, কাকে বলে বুদ্ধি-আশ্রিত অভিনয়, কাকে বলে অভিনয়। নিজে তিনি আবেগে ভেসে যাননি, দর্শককে আবেগে ভাসিয়েছেন। অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিজে কাঁদা নয়, দর্শককে কাঁদানো। অভিনয়ের উদ্দেশ্য নিজেই হেসে ফেলা নয়, দর্শককে হাসানো। আবেগাশ্রিত অভিনয় কক্ষনো এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না।

অভিনেতা কিয়ৎকাল মাথা ঝুঁকিয়ে ভগ্ন দেবদাসের মতো বসে রইলেন। তারপর একখানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—কিন্তু নটগুরু স্তানিস্লাভ্স্কি পর্যন্ত অভিনয়ে মুহূর্তের আকস্মিক প্রেরণাকে স্বীকার করেন। তাঁর যে ঠাণ্ডা মাথায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিনয়-পরিকল্পনা তার উদ্দেশ্য আবেগকে নিয়মিত জাগাবার একটা রাস্তা বার করা। তিনি বলছেন তাঁর সিস্টেম্ আবিষ্কারের মূলে ছিল এই প্রশ্নটি :

> Are there no technical means for the creation of the mood, so that inspiration may appear oftener than is its wont?

অর্থাৎ আবেগ বা প্রেরণাকে বাদ দেওয়ার কথাই উঠছে না। বরং সেই আবেগকে ইচ্ছেমতো জাগানো যায় কি না।

পরিচালক বললেন—তা স্তানিস্লাভ্স্কিকেই বা চরম বিচারকের আসনে বসাব কেন? স্তানিস্লাভ্স্কি কোনো সিস্টেম আবিষ্কার করেননি। আবিষ্কার বলতে যা বোঝায় তা করেননি। তাঁর পূর্বসূরীদের ধ্যানধারণাগুলোকে তিনি একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার পূর্বসূরীরা এবং তিনি নিজেও আবেগাশ্রিত অভিনয়ে বিশ্বাসী। তাঁর মতকে আমরা মানতে যাব কেন? বিশেষ যখন তাঁর সিস্টেম একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অভিনেতা চমকে উঠলেন—কী! ব্যর্থতায়! মানে?

পরিচালক বললেন—ব্যর্থ না হলে তাঁর সিস্টেম অনুসরণ করলেই প্রেরণা জাগবার কথা!

অথচ মস্কো আর্ট থিয়েটারের বর্তমান পরিচালকদের এবং অভিনেতাদের মন্তব্য পড়ুন ; বুঝবেন অমন সুইচ-টেপা প্রেবণার উৎস তাঁদের হাতে নেই। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিরই আখড়া থেকে আবেগেব চরম শত্রু মায়ারহোল্ডের আবির্ভাবেই বোঝা গিয়েছিল সিস্টেমটির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

অভিনেতা চেঁচিয়ে উঠলেন—কেন এ কথা বলছেন? কী সাহসে? কী স্পর্ধায়?

পরিচালক বললেন—বলছি, বলছি। সিস্টেমটির মূল কথা কী? না, ওসব ইনার সার্কল বা সাইকোটেক্‌নীক-এর কচকচি বাদ দিয়ে মোদ্দা কথায় আসুন।

অভিনেতা বললেন উদ্দীপ্ত হয়ে—স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি পদ্ধতির মূল কথা হল—দ্য ম্যাজিক ইফ্‌। অভিনেতা জানেন তাঁর আশেপাশের দৃশ্যপটগুলো সত্যিই ইটেব দেওয়াল নয় ; তিনি জানেন তিনি সত্যিই গোর্কি-সৃষ্ট মাতাল সাতিন নন , তিনি জানেন আশেপাশের চবিত্ররা সত্যিই চোর-গুণ্ডা-মাতাল নয় , তিনি জানেন পুরো ব্যাপাবট; অলীক। তবু তাঁকে ভাবতে হবে 'যদি এসব সত্যিই হত তবে আমি কী করতাম?' ওই যদিটাকে প্রাণপণে ধ্যান করতে পাবলেই মুড আসবে, আবেগ জাগবে।

পরিচালক শ্লেষাত্মক হাসি হাসলেন, বললেন—যদি এসব সত্যি হত! কী করে সত্যি হবে? আমি কি মাতাল, না পাগল! অভিনেতাব মাথা খাবাপ না হলে ওই যদিটাকে বিশ্বাস কববেন কী করে? আমি তো জানি এসব মিথ্যে। সেখানে ওসব যদি-টদি আমদানিব অর্থই হল—সত্যের ভান। ভান কখনো শিল্প হতে পারে না। দর্শককে ধোঁকা দেওযার জন্য যদি নিজের কাছেও ভান করতে হয়, তবে মশাই শিল্পকে জলাঞ্জলি দিন, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। মঞ্চেব পুরো জিনিসটাই অবাস্তব। দেওয়াল অবাস্তব, চরিত্রবা অবাস্তব, গল্পটা অবাস্তব। ঘবের তিনটে দেওয়াল, চতুর্থটা নেই ; থাকলে দর্শকরা কিস্যু দেখতেই পেতেন না। মাথার উপর ছাদ নেই, আছে কাপড়ের বর্ডার। দেওয়ালেব পাশেই আছে কালো কালো উইংস্‌। মাঝে মাঝে যবনিকা এসে পড়েছে। আমি জানি এসব মিথ্যে। এগুলোকে সত্যি ভেবে এগনোর মানে হল শিল্প নিজেকেই নিজে ভাঁওতা দিচ্ছে। আবো শুনুন মশাই, বাধা দেবেন না! স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে শুরু কবে এদেশেব একক অভিনেতারা পর্যন্ত সকলেই শত মুড সত্ত্বেও কতকগুলো মৌলিক নিয়ম মানছেন, যে-নিয়মগুলো প্রতি মুহূর্তে তাঁদের চলাফেরা কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রিত কবছে। এক অভিনেতা আরেকজনকে ঢেকে দাঁড়াবেন না ; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো দর্শকের দিকে পেছন ফিবে বলবেন না ; গলা তুলে অভিনয় করতে হবে, নিভৃত প্রেমেব দৃশ্যেও ষাঁড়ের মতন চেঁচাতে হবে, প্রেমাবেগে গাঢ় গলা করলে চলবে না ; ইচ্ছেমতো লাইন জুড়ে দেবেন না, তাহলে সহ-অভিনেতাকে আব সংলাপ ধবতে হবে না, উনি মূর্ছা যাবেন!! এরকম বহু নিয়ম তাঁবা মানছেন। এই নিয়মগুলোকে স্বীকার কবেও আবেগকে কী করে মুক্ত করেন তাই আমার কাছে এক বিস্ময়! আসলে হয়তো এদ্দিন যাকে আবেগ বলে তাঁরা চালিয়ে এসেছেন তা নিছক তাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতার অপব্যাখ্যা, এপোলজি। নইলে এঁরা মৃত্যুদৃশ্যে মরার আবেগ আনতে গিয়ে তারস্বরে চাবপাতা সংলাপ বলেন কী করে? এক টাকার সীটকে প্রেমালাপ শোনান কী কবে? শত্রুশিবিবে ঢুকে ফিস্‌ফিস্‌ ষড়যন্ত্রকেও অমন উচ্চগ্রামে ছাড়েন কী করে? তলোয়ারেব রাম-

খোঁচা খেয়েও অমন ভরতনাট্যমের ভঙ্গিতে পতন-ও-মৃত্যু দেখিয়ে হাততালি জাগান কী করে? আবেগই যদি এঁদের প্রধান আশ্রয় হত তবে 'দর্শক চুলোয় যাক' বলে এঁরা নিজের মনে নির্জনে স্বর্গ রচনা করতেন। না! ওই 'আবেগ' কথাটিও বাংলা নাট্যশালার উচ্ছৃঙ্খল অভিনেতাদের একটা ধাপ্পা! আপনি ডেভিড গ্যারিকের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, প্রায় দুশো বছর আগেকার এক অতি-অভিনয়ের প্রবক্তাকে সাক্ষী মেনেছেন। আমি অসংখ্য নজির দিতে পারি পরবর্তী প্রতিভাবান অভিনেতাদের মধ্যে থেকে। এঁরা কেউই আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-টত্ত্ব জানতেন না ; এঁরা প্রত্যেকেই একক অভিনয়ে দিগ্বিজয় করেছিলেন এবং এঁদের আবেগাশ্রয়ী আখ্যাই দিয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ এঁরা প্রত্যেকে বলছেন এঁদের অভিনয়ে আবেগ বা প্রেরণার চেয়ে সচেতন পরিকল্পনার প্রভাব অনেক বেশি। গ্যারিক-এরও আগে যিনি ইংলন্ডের নটগুরু বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন সেই বেটারটন বলছেন :

> Art must be consulted in the study of the larger share of the professors of this art

তারপর তিনি বর্ণনা করছেন কীভাবে ভেবে ভেবে তিনি চরিত্রের বাহ্য চেহারাটা গড়ে তোলেন, আবেগ-আদির উল্লেখমাত্র বেটারটন করেননি। মহাপণ্ডিত দার্শনিক দিদেরো তৎকালীন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ক্লেরোঁ-র অভিনয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন :

> When by dint of work she has got as near as she can to her idea of the part, *the thing is done* ; to preserve the same nearness is a mere matter of memory and practice . . . She repeats her efforts without emotion

আর মাদাম ক্লেরোঁ স্বয়ং তো সদর্পে বলে গেছেন—হাঁ, আমি কলাকৌশল দিয়েই গড়ে তুলি আমার পার্ট ; ওই ভাবেই আমি রোক্সান বা আমেনেজ-এর মতন পার্ট করে আপনাদের কাঁদিয়েছি। গ্যারিক-বেটারটনের সঙ্গে আর যে লোকটি এককালে ইংলন্ডের মঞ্চ কাঁপিয়েছিলেন সেই এডমন্ড কীন সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে, তিনি নাকি এমন প্রচণ্ড আবেগময় অভিনয় করতেন যে ভয়ে সহ-অভিনেত্রীর মূর্ছা যাওয়াটা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই কীন বলছেন :

> I have bestowed the utmost care and attention . There is no such thing as impulsive acting , all is premeditated and studied beforehand

উনিশ শতকের দিকপাল ইংরেজ অভিনেতা ম্যাকরেডি বলছেন, 'আবেগকে দমন না করলে পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়া হবে অথচ :'

> As there must be one form of expression which he finds nearest to the exact truth, in once attaining this, every deviation or declension from it must be more or less a deterioration

তাই তিনি নবীন অভিনেতাদের সামনে একটি ল্যাটিন আপ্তবাক্য রেখেছেন : 'হিক্‌লাবর, হক্ ওপুস এস্ত,' যার অর্থ মোটামুটি দাঁড়ায় 'কাজ করে যাও!' কাজ অর্থে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা। আবেগ বা প্রেরণার মুখ চেয়ে বসে থাকার প্রয়োজন নেই। গত শতকের শ্রেষ্ঠ সমালোচক জর্জ হেনরি লিউইস বলছেন :

> What is called inspiration is the mere haphazard of carelessness or incompetence

হেনরি আর্ভিং-এর চেয়ে বড়ো অভিনেতা পুরাতনদের মধ্যে বোধ হয় কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিনয়কে আবেগ-কম্পিত বলে সবাই বর্ণনা করতেন। আর্ভিং জবাব দিচ্ছেন :

> It is often supposed that great actors trust to the inspiration of the moment *Nothing can be more erroneous* . . The great actor's surprises are generally well weighed, studied and balanced.

নাট্যশালার সংগ্রামী বিপ্লবী গর্ডন ক্রেগ আবেগকে একেবারে বহিষ্কার করার পক্ষপাতী। তিনি বলছেন :

> As the mind becomes the slave of the emotion it follows that accident upon accident must be continually occurring . . Emotion is the cause which first of all creates. and secondly destroys Art can admit of no accidents

এবার দেখা যাক সেই সব আধুনিক অভিনেতাদের যাঁরা 'আবেগবান' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁরা নিজেদের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কী বলছেন? জন্ গীলগুড তাঁর বিখ্যাত হ্যামলেট সম্বন্ধে কী বলছেন, পড়েছেন? গভীর মনোযোগ দিয়ে পূর্ব-নির্ধারিত ছক অনুসরণ করে যাওয়াই তাঁর একমাত্র কাজ ; আর এক-আধদিন যখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন—ধরুন দর্শকদের গণ্ডগোলের ফলে বা নেপথ্যে কুশলীদের খটাখটির ফলে—তখন নিজের অজান্তেই তাঁর দেহ এবং কণ্ঠ নিজ কর্তব্য করে গেছে, দর্শকরা কেউ জানতেই পারেনি যে, হ্যামলেট আজ অমুক দৃশ্যে ভাবছিল শো-এর শেষে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কিনা। আবেগের নিকুচি করেছে। গীলগুড-এর চেয়ে বড়ো অভিনেতা তো মশাই এ শতাব্দীতে দুর্লভ। আমেরিকার নতুন থিয়েটারের জনক ডেভিড বেলাস্কো অভিনয়কে শিল্প বলেও মানতে রাজি নন ; তিনি বলছেন অভিনয় একটা বিজ্ঞান। জন ব্যারিমুর বলছেন, অভিনয়ে টেকনিকটাই বড়ো কথা, আবেগ-টাবেগ বাজে কথা। স্টেলা অ্যাডলার বলছেন, আমেরিকার গ্রূপ থিয়েটারের ভিত্তিই ছিল দলগত অভিনয় ; আর দলগত মানেই ঠাণ্ডা-মাথায় চিন্তা করে অভিনয়। চ্যাপলিন বলছেন, কৌতুকাভিনেতার প্রতি মুহূর্তে দর্শক-সচেতন থাকা চাই ; কৌতুকাভিনয়ের ইতিহাস পড়া থাকা চাই ; এক একটা ক্ষুদ্র দৃশ্যাংশকে পঞ্চাশবার রিহার্সাল দেওয়া চাই। আর ব্রেখ্‌ট তো তাঁর নতুন পদ্ধতিতে অভিনেতাকে একেবারে আবেগশূন্য করতে চেয়েছিলেন ; তাঁর এই পদ্ধতির নাম 'ভেরফ্রেম্‌ডুং'। তাঁর এপিক থিয়েটারের পরীক্ষা সাফল্যের পথে, এ কথাও আজ সর্বজনবিদিত। তিনি চাইছেন 'এলিয়েনেশন' : ঘটনা এবং পরিবেশ থেকে অভিনেতার দূরত্ব বজায় রেখে অভিনয় করা। অভিনেতার কাছ থেকে তিনি চাইছেন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের নিরুত্তাপ দৃষ্টিভঙ্গি। তার জন্যে প্রথমেই আবেগ-আদিকে ছাঁটাই করতে হবে :

> If the A-effect (এলিয়েনেশেন বা ভেরফ্রেমডুং) is to achieve its aim, the stage and the auditorium must be cleared of magic . . . The actor is not to warm the audience up by unloosing a flood of temperament.

এরভিন পিস্‌কাটর সোজাসুজি এই এপিক অভিনয়ের নাম দিয়েছেন 'অবজেকটিভ অ্যাকটিং,' অভিনেতা যেখানে সূত্রধার মাত্র, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মতন। অভিনেতার

'আবেগ' বা 'পার্টে ডুবে যাওয়া' ইত্যাদি শিকেয় তুলে রাখার প্রস্তাব করেছেন পিসকাটর। তাই মশাই, যদ্দূর মনে হচ্ছে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির থিয়োরিটা নেহাৎই ফাঁকা বুলির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর যে অভিনেতা বলেন, 'আজকে পার্ট করতে করতে জগৎ ভুলে গিয়েছিলাম,' হয় তিনি মিথ্যাবাদী, আর না হয় ভুলেছিলেন তিনি ঠিকই, তবে সেটা মদ্যপ্রসাদাৎ!

কিছুক্ষণ চারদিক থমথম করছিল। একটু পরে ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, আর্ভিং-বেটারটন-ম্যাকরেডি-কীন, তারপর গীলগুড-ব্যারিমুর-চ্যাপলিনদের মতামত শুনে আমার মনে হচ্ছে আবেগের স্থান অভিনয়ে নামমাত্র বা নেই!

পরিচালক মাথার ঘাম মুছে বললেন—আর নেই বলেই নবনাট্য-আন্দোলন অভিনয় নিয়ে নূতন পরীক্ষার দিকে পা বাড়াতে সাহস করেছে। নূতন অভিনয়, দলগত অভিনয়। ঠাণ্ডা মাথায় নিরুত্তাপ চিত্তে মঞ্চে না নামলে দলের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ কবা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে যেখানে সহ-অভিনেতাদেব সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রশ্ন, প্রতি মুহূর্তে যেখানে বৃহত্তর কম্‌পোজিশনে নিজের স্থান নেওয়ার প্রশ্ন সেখানে ওই আবেগই হচ্ছে এনিমি নাম্বাব ওয়ান! নবনাট্য আন্দোলনে তাই মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত অভিনেতা বাহাদুরের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে; পরিচালকই এখানে সম্রাট। তাঁর প্রজা হচ্ছে অভিনেতা। অভিনয় চারটি আঙ্গিকের একটি মাত্র। অভিনেতাকে তাই সম্পূর্ণ নূতন চেতনা নিয়ে পরিচালকের বিশাল নক্‌শায় নিজের স্থান নিতে হবে। তার জন্যে রিহার্সাল নূতন ধরনের হচ্ছে, অভিনয়ও—যাক, সে আর একদিন হবে। পরিচালনা সম্বন্ধে যে দিন আলোচনা হবে সেদিন বলব।

এই সময়ে কেষ্ট প্রচুর জলখাবার নিয়ে প্রবেশ করাতে আলোচনায় ছেদ পড়ল। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাস্তব ও বাস্তবোত্তর

সেদিন আলোচনাব মধ্যমণি হলেন দার্শনিক। পরিচালক শুধু খেতে লাগলেন, বড়ো একটা কথা বললেন না। এ দিকে দার্শনিক বললেন—১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হিল নামক এক ভদ্রলোক ক্যামেরা দিযে ছবি তুলে বসলেন। আব যাবে কোথায়? প্রকৃতিকে যে যথাযথ ধরে রাখা যায় এটা জানতে পেরে একদল মানুষ উদ্দীপ্ত হযে উঠল। বাস্তবকে অনুকরণ করা শুরু হল। আমি বলতে চাই এই বাস্তববাদীবা সাহিত্যে, চিত্রকলায়, নাট্যশালায়, সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে পদ্মবনে মত্তহস্তীর মতন শিল্পকলার সর্বনাশ কবেছেন। আবার অচিবেই চিত্রকলায়, সাহিত্যে বাস্তববাদেব বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে গেছে , বাস্তববাদ ওখানে গতাসু। কিন্তু নাট্যশালায় তো কই বাস্তববাদীদের পিছু হঠতে দেখছি না। স্যাব গর্ডন ক্রেগকে পাগল আখ্যা দিয়ে নাট্যশালা থেকে বিতাড়িত কবা হযেছে ; ববার্ট এড্‌মন্ড জোন্‌স্ হতাশ হয়ে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন ; জর্মন এক্‌স্‌প্রেশনিস্টবা আজ নির্বোধ অভিনেতাব উপহাসের পাত্র , মাযারহোল্ড-এর থিয়েটার বন্ধ কবে দেওযা হযেছিল , টলাব আত্মহত্যা কবেছিলেন ; ভাখ্‌তানগভ্ অকালে মবে গেলেন , একমাত্র ব্রেখ্‌ট্‌-এর থিয়েটার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্য পেয়ে টিকে আছে ; আব যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই নাট্যশালায় বাস্তববাদীদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। এর কারণ কী?

অভিনেতা বললেন—কারণ জানি না, তবে বাস্তববাদীদের হাতে আছে বলেই এখনো থিয়েটাব সহজবোধ্য। নইলে হিজিবিজি পিকাসোর ছবিব মতন দুর্জ্ঞেয় হযে উঠত।

ভাষাবিদ বললেন—পিকাসো-ব ছবিকে হিজিবিজি আখ্যা দিয়ে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করছেন।

অভিনেতা সখেদে বললেন—ভাগ্যে আমি পিকাসোকে বুঝতে পাবি না।

দার্শনিক বললেন—সেটা আপনাব লজ্জা, গর্ব নয়। ও নিয়ে বডাই করবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে থিয়েটার বাস্তববাদের ধ্যানে মগ্ন , এই বাস্তববাদ কি আর্টের পর্যায়ে পড়ে?

অভিনেতা বললেন—হ্যাঁ, পড়ে। জীবনকে যথাযথ তুলে ধরাই হল আর্ট।

দার্শনিক বললেন—জীবনকে যথাযথ তুলে ধরা কি সম্ভব? জীবন তো শুধু ঘটনাস্রোত নয়! জীবন বলতে একটা যুগের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা স্বপ্নসাধনা সব। তাকে দু ঘণ্টা অভিনয়েব সীমায় বাঁধবেন কী করে? কালস্থানের সীমায় বাঁধলেই জীবন যে খণ্ডিত হয়ে পড়ছে খেয়াল আছে?

এবার নাট্যকার কঠোব আত্মসমালোচনা শুরু করলেন—তাছাড়া জীবনে কি গল্প থাকে? আমরা যে গল্পের কাঠামো তৈরি করে নিই জীবনে তার অস্তিত্ব কোথায়? জীবনে কি নায়ক-নায়িকা থাকে? জীবনে কি ভিলেন থাকে? যে মুহূর্তে নাটকে গুছিয়ে গল্প সাজাই, যে মুহূর্তে

নাটকেব চরিত্ররা বিশেষ এক টাইপ ধরে, সেই মুহূর্তে আমরা জীবন থেকে দূরে সরে গেছি। তার পরে বাস্তবের কথা বলা বা বাস্তবের ভান করা নিতান্ত মূর্খতা। দার্শনিক বললেন—ঠিক। তবু দেখছি নাট্যশালার শিল্পীরা কিছুতেই বাস্তবতার মোহ কাটাতে পারছেন না।

অভিনেতা উগ্রস্বরে জবাব দিলেন—বাস্তবতাব মোহটা খারাপ কিসে এটাই জানতে চাইছিলাম। আপনারা যা বলছেন তা হচ্ছে মেটাফিজিকাল ধাপ্পা। যা দেখছি, যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করছি, সে বস্তুর আলাদা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। শিল্পী তাকে যে চোখে দেখছেন তার চেয়ে বড়ো সত্য হল বস্তুর অবজেক্‌টিভ অস্তিত্ব। তাকে আমার কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপস্থিত করলে তবে সে আর্ট হবে? এ যে বিজ্ঞান-বিরোধী কথাবার্তা। বস্তুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, মনুষ্য-নিরপেক্ষ। তাকে যথাযথ তুলে ধরাই হচ্ছে প্রকৃত বস্তুবাদীর কাজ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বস্তুকে বুঝতে পাবি ; সেটাই হওয়া উচিত চরম বিচার—ইন্দ্রিয়ের বিচার। তাব ওপব যদি বিমূর্ত চিন্তাব ছায়া পড়ে তবে তা হল মেটাফিজিকাল ধাপ্পাবাজি।

দার্শনিক মৃদু হাসলেন , তারপর বললেন—আপনি মার্কস্‌বাদ বা মেটিরিয়েলিস্টদের যা বুঝেছেন তা আপনিই জানেন! আলবের্ট আইনস্টাইনকে তো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিতে বাধা নেই?

অভিনেতা বললেন—না, নেই।

দার্শনিক বললেন—সেই আইনস্টাইন আপনাব এবং সাধাবণ অজ্ঞ মানুষদেব 'naive realism' সম্পর্কে বলছেন .

> According to it things are as they are perceived by us through our senses This illusion dominates the daily life of men and animals , it is also the point of departure in all of the sciences, especially of the natural sciences.'

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যা দেখছি-বুঝছি তাই চরম—এটা হল সাধাবণ মানুষেব একটা ভ্রান্ত ধারণা। বিজ্ঞান ঠিক উলটো কথা বলছে।

ভাষাবিদ বললেন—হ্যাঁ, ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব অতি-সরল বস্তুবাদকে তিনি বলেছেন : প্লেবেইশে ইলিউসিওন ডেস নাঈভেন রেয়ালিস্‌মুস্‌। এই বোকচন্দ্র বস্তুবাদ ও মার্কস্‌-এব ডায়ালেকটিকাল বস্তুবাদে কোনো সাদৃশ্য নেই।

দার্শনিক বলে চললেন—বাবট্রান্ড রাসেল আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :

> We think that grass is green, that stones are hard, and that snow is cold But physics assures us that the greenness of grass, the hardness of stones, and the coldness of snow, are not the greenness, hardness and coldness that we know in our own experience, but something very different The observer, when he seems to himself to be observing a stone is really, if physics is to be believed, observing the effects of the stone upon himself

অর্থাৎ আপনারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দোহাই দিয়ে বাস্তববাদের সাধনা কবছেন। সেই বিজ্ঞানই কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বলছে, যা দেখছ তা কিন্তু সত্যিই তা নয়। দেখার ফলে তোমাব মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটছে সেটাকেই তুমি চরম ভেবে বসে আছ। অতএব বস্তুকে

স্বতন্ত্র ভেবে লাভ নেই ; সে আমাদের মনের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। অতএব আজ পিকাসোরা যখন বাস্তবকে আঁকতে গিয়ে নিজেদের মনের উচ্ছ্বাসটাকেও তার মধ্যে ঢেলে দেন তখন তাকে হিজিবিজি না বলে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হিশেবে স্বীকার করুন।

নাট্যকারও এই সময়ে আর-এক প্রমাণ দাখিল করলেন—শুধু বিজ্ঞান নয়, মনস্তত্ত্বও আধুনিক চিত্রকবদের পক্ষে বায় দিয়েছে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থুলেস, কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ; নানা আকারের, নানা ঔজ্জ্বল্যের, নানা বর্ণের কতকগুলি অপরিচিত বস্তুকে আঁকতে বলা হয় কয়েকজন শিল্পীকে। শিল্পীরা যা আঁকলেন তার কোনোটাই অভীষ্ট বস্তুগুলির সঙ্গে মিলল না। বাস্তব থেকে শিল্পীরা এই যে সরে এলেন ডা.থুলেস এই পার্থক্যের নাম দিয়েছেন ফেনোমেনাল রিগ্রেশন। বস্তুগুলি শিল্পীদের অপরিচিত ছিল ; তাই সঠিক আঁকতে চেষ্টা করে এঁরা শুধু যা দেখেছেন তাই এঁকেছেন ; এবং যা দেখেছেন তা বাস্তব থেকে বেশ খানিকটা পৃথব। বস্তুগুলি যদি চেয়ার-টেবিল-জাতীয় দৈনন্দিন পরিচিত আসবাব হত তবে ফেনোমেনাল রিগ্রেশন অনেক কম হত, কারণ যা দেখছি তাকে পবিপূরণ করত যা জানি ; চেয়ারের আকার আমার জানা, তাই চেয়ারের খানিকটা দেখেই বাকিটুকু নিজের অজান্তেই পূরণ করে এঁকে দিতাম। কিন্তু অপরিচিত বস্তুকে দূর থেকে খানিক দেখে যা আঁকলাম, তাতে একান্তভাবেই আমার চোখের পরীক্ষা হল। মানুষ আসলে কী দেখে, সেটাই আবিষ্কাব করে বসেছেন ডাক্তার থুলেস ; জ্ঞান বাদ দিয়ে, অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে, পূর্বে আহরিত তথ্য বাদ দিয়ে, কল্পনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র চোখেব উপর নির্ভর করলে আমরা যা দেখি তাতে বাস্তবের সঙ্গে ঘোর পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার বিখ্যাত কিছু আধুনিক ছবি পরীক্ষা করে থুলেস বলেছেন, এখানেও দেখছি সেই রিগ্রেশন ; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীরা যতটা সরে এসেছেন বাস্তব থেকে ঠিক ততটুকুই সরেছেন বড়ো বড়ো শিল্পীরা ; তবে এঁরা সরেছেন সজ্ঞানে। বস্তুটা কী জেনেও সেই জ্ঞাত তথ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র চোখ যা দেখছে তাই এঁকেছেন। ডাক্তার থুলেস-এর পরীক্ষা প্রমাণ করেছে যে আধুনিক শিল্পীরা যে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বস্তুকে আঁকছেন সেটাই হল আসল বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, কারণ আসলে আমরা বাঁকাচোরাই দেখি। অতএব যাঁরা বাস্তবতার নাম করে প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন তাঁরাই অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দেখা-জিনিসের উপর রং চড়িয়ে তাকে জানা-জিনিসে পরিণত করেন। যাকে বাঁকা দেখতে তাকে সোজা দেখাতে চেষ্টা করেন। যেটাকে অসম্পূর্ণ দেখাচ্ছে সেটাকে নিটোল সম্পূর্ণ করে উপস্থিত করেন। বাস্তবাদীরা আসলে অবাস্তববাদী। তাঁরা আসলে সেই প্রাচীন গ্রীক হার্মোনিবাদীদের নন্দনতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করছেন। সেই যে পাইথাগোরাস-এর শিল্পাদর্শ, যার চরম প্রকাশ আরিস্টট্‌ল, এবং যার প্রভাব সেন্ট্‌ টমাস একোয়াইনাস-এর উপর প্রবল। সব জিনিসকে পূর্ণ, নিটোল, সুন্দর করে দেখাবার ইচ্ছে। হার্মনি, অর্ডার, সিমেট্রি, ডেফিনিট্‌নেস প্রভৃতি নানা কথায় তাঁর প্রকৃতিকে নকল করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁরা যে আসলে বাস্তবকে অতিরঞ্জিত অতিসুন্দর করে দেখাতেন তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।

সরল রেখা বা আয়তক্ষেত্র, বা বক্র রেখা বা বৃত্ত—এগুলোকেও তিনি পারফেক্ট বিউটি আখ্যা দিয়েছেন। প্লেটো-প্রদর্শিত পথই তো অবলম্বন করেছেন আধুনিক ইয়োরোপের শিল্পীরা।

কিউবিস্টরা তো স্পষ্টই ফিলিবুসকে তাঁদের বাইবেল বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেজান বলছেন, প্রকৃতির সব সৌন্দর্যের মূলে হল সিলিন্ডার, স্ফিয়ার এবং কোন। অটোমেটিজ্‌ম বা অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট আর্টের মূলও তাই। ফিলিবুসকে ভিত্তি পেয়েছিলেন বলেই পল ক্লী একটি রেখার মধ্যে আবেগ দেখতে পান। শত শত বৎসর ধরে ইয়োরোপীয় চিত্রকবরা তথাকথিত বাস্তববাদের কবজা ভেঙে নূতন বাস্তবোত্তর আর্ট সৃস্টি করছেন।

ভাষাবিদ বললেন—ঠিক তেমনি ঠুনকো ন্যাকা-ন্যাকা সুন্দরপনা ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভয়াবহকে অসুন্দরকে অবচেতনের দুঃস্বপ্নদের ছবিতে স্থান দিলেন। তেমনি যামিনী রায় জীবনানুকরণের পাট চুকিয়ে কণ্ট্যুর আর জ্যামিতির রেখায় বাস্তবোত্তরকে ধরেছেন। যেদিকে তাকাবেন দেখবেন ফোটোগ্রাফির বাস্তববাদ পরিত্যাগ করে বাস্তবোত্তরকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। একমাত্র নাট্যশালাই অন্ধের মতন জীবনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে চলেছে।

নাট্যকার বললেন—সংগীত দেখুন। সংগীতে কেউ বাস্তববাদের ছোঁয়া আশা করে? আগেই একদিন আলোচনা করেছি আমরা। আমাদের রাগসংগীতের কাঁধে বাস্তবের জোয়াল চাপানো সম্ভব হয়নি। তেমনি সম্ভব হয়নি পাশ্চাত্য সংগীতের কাঁধে। এমনকী, ওদের অপেরা দেখুন। পুরো কাহিনী আর আঙ্গিকটা রঙচঙে অতিরঞ্জনাশ্রিত। ভের্দির 'রিগোলেত্তো' অপেরার গল্প জানেন? 'টস্কা'-র গল্প? 'লা বোহেম' বা 'ফাউস্ট' বা 'মাদাম বাটারফ্লাই?' উপকথার বিশালত্ব প্রতিটি গল্পে। কোথায় বাস্তবতা?

দার্শনিক পেনসিলটাকে চর্বিত অবস্থায় পরিত্যাগ করে বলে চললেন—নৃত্যের গোড়ার কথাটা কী? গল্পও আছে, চরিত্রও আছে, জীবনভিত্তিক বটেই। তবু অসংখ্য মুদ্রা আর ভাব আর দেহসঞ্চালনের কায়দায় জীবনকে অতিক্রম করে রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে যায় নাচ, তা ব্যালেই বলুন আর ভরতনাট্যমই বলুন! কই উদয়শঙ্করকে বা উলানোভাকে তো কোনো দিন দেখলাম না নৃত্যছন্দ বিসর্জন দিয়ে জীবনানুকরণ করতে! তেমনি দেখুন, কবিতার প্রধান কৌশলটা কী? কথাগুলো সব জীবন থেকে আহরিত ; তাদের আভিধানিক অর্থ আছে। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ হয়ে তাদের আরেক অর্থ এসে পড়ে, ধ্বনিগত একটা অর্থ, যাকে কোনো অভিধানে বাঁধা যাবে না। কাব্য একান্তভাবেই বাস্তবোত্তর। বাস্তববাদী কবিতা আর সোনার পাথুরে বাটি একই জিনিস।

অভিনেতা মৃদু টেঁকুর তুলে জিগ্যেস করলেন—কিন্তু উপন্যাস? সেখানে তো ছন্দ নেই। প্রতিটি কথা অভিধান-ব্যাকরণের অর্থে ভারাক্রান্ত। কথার অর্থকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই উপন্যাসকে বাস্তবোত্তরের পথে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব।

দার্শনিক বললেন—অসম্ভব বলবেন না ; জেম্‌স্‌ জয়েস তাহলে এদ্দিন ধরে কী করলেন? গদ্যকেও এক নূতন চেহারা দিয়ে তার আক্ষরিক অর্থ ছাড়া আরো কিছু এনে ফেলার চেষ্টা করে জয়েস কৃতকার্য হয়েছেন। দেখুন, প্রতিটি কথার অর্থ থাকতে পারে ; কিন্তু কথাসমষ্টি যে বাক্য সে বাক্যের লজিকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি। ধরুন,

আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ।

প্রতিটি কথার অর্থ সুবিদিত। অথচ সব মিলে যা হল তার অর্থ এ জগতে পাবেন না ; এক সুন্দরতর জগতেব দিকে আপনাকে হেঁচকা টান দিয়েছে লাইনটা। অথবা,

I thought I saw an elephant
Practising on the fife.
I looked again and found it was
A letter from my wife

লিউইস ক্যারল বা সুকুমার রায় অবলীলাক্রমে লজিকের গণ্ডি ভেঙে ভাষাব বাস্তবোত্তরতা দেখিয়ে গেছেন। আবার দেখুন,

দিনরাত তোমার ঐ হিদহিদকারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতংক লাগে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন এ বাক্যটি বোঝবার জন্যে কোন অভিধানের দরকার হয় না। রবীন্দ্রনাথের মাথায় খেলেছিল এক নূতন ভাষার সম্ভাবনা—যেখানে অর্থের শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাবে। ধ্বনিব দ্বারাই সুবের দ্বারাই সে ভাষা নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত কবতে পাববে। সুকুমার রায়-লিউইস ক্যারলের মতোই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিশুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন 'ছড়ার ছবি।' ভূমিকায় লিখলেন—

ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওবা অর্থলোভী জাত নয়।

জানি না বুইটেন্ডিক-এব 'পেইন' গ্রন্থে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা; তিনি বলছেন মানুষ যন্ত্রণাব মুহূর্তেই সত্যিকাবের আত্মোপলব্ধি করে। তাই যদি হয় তবে 'রোগশয্যায' কাব্যগ্রন্থে ববীন্দ্রনাথ যে বলছেন—

অসুস্থ শরীরখানা
কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা—

তার অর্থ কী? রোগ-জর্জরিত দেহে কি রবীন্দ্রনাথ সেই 'ছড়ার ছবি' বা 'গল্পসল্পে'র অর্থমুক্ত পাগল-ভাষার সম্ভাবনার কথা ভাবছিলেন? বাণীর ক্ষীণতা কেন? পার্থিব অভিধানে আবদ্ধ ভাষায় অপার্থিব বিশাল আবেগকে ধরতে পারছেন না, তাই কি এই ক্ষোভ? তাই কি আবাব বলছেন—

কবির ছন্দের খেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি-আঁকাআঁকি।

সেই জন্যেই কি আরো স্পষ্ট ভাষায় বলছেন,

মনে হয়, বৃথা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই ;
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে,
ভাষা পাই নাই।

আরো শুনুন—

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা সম।

লক্ষ করুন—ভাষা পাই নাই, অকথিত বাণীপুঞ্জ। এই অকথিতকে প্রকাশ করার কী উপায়? অর্থের শৃঙ্খল মোচন করে কথাকে উদ্দাম অর্থহীন আবেগে ছুটিয়ে দেওয়া অসম্ভবের পথে। শুনুন, রবীন্দ্রনাথ বলছেন 'জন্মদিনে' গ্রন্থে :

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষাব শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকবণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হযেছে বিদ্রোহী
লঙ্ঘিযাছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থেব শৃঙ্খলপাশ।

বাস্তবেব শেষ রেশকে মুছে ফেলাব এ আহ্বান। এখানে ববীন্দ্রনাথ জয়েস-সুকুমার-ক্যারলের রাজ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উন্মুখ। তাইতেই তো কবিব সুললিত ভাষা ছেড়ে চড়ুই পাখিব অর্থহীন প্রলাপেব দিকে আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ, বলেন ভোরের চড়ুই পাখির উদ্দেশে—

কালিদাসের ঘবের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙা চেঁচামেচি
বাধাও কী কৌতুকে।

এবং সেই পাখিব কাছে কবির একটিই প্রার্থনা—

সহজ প্রাণেব বাণী
দাও আমারে আনি—।

দৈনন্দিনেব অবিরাম কর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত অতি-পবিচিত যে ভাষা তাকেও বাস্তব থেকে মুক্তি দিতে এঁদেব সাধনা, তাইতেই শুনি—

Under the bam
Under the boo
Under the bamboo tree

তাইতেই পড়ি—

Sprıng
Too long
Gongula.

অথচ কী বিচিত্র এই নাট্যশালার পুরোধারা! বাস্তবের আরাধনায় মগ্ন এঁরা। এঁদের কাছে তাই কাব্যনাট্য অপাঙ্‌ক্তেয়; কারণ জীবনে মানুষ তো কাব্যি করে কথা কয় না। রবীন্দ্রনাথেব অধিকাংশ নাটকই তাহলে অবাস্তব! অবাস্তব এলিয়টের 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল!' শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকই বা থাকে কোথায়? মানুষ জীবনে যা করে বা বলে তা অত্যন্ত সীমিত,

বেশির ভাগটাই সে ভাবে। জীবনানুকরণ মানে কি শুধু তার বলার আয়তনটুকু? না-বলার বৃহৎ জগৎটা তবে রইবে পড়ে? এইজন্যেই কি আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তি নিষিদ্ধ? এই জন্যেই কি 'ছেলে খায়নি' আর 'মাইনে বাড়ল না' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবহারবাদে আমাদের নাটক আজ আচ্ছন্ন?

নাট্যকার সরোষে বললেন—আর বলবেন না, দাদা! পেটে টিউমার হয়েছে কি হয়নি, কিনু খেয়ে খাদে গেল না না-খেয়ে গেল, এইসব অবান্তর খাটো কথায় নিজেকে আটকে রাখতে হয়! এই পরিচালকরা মুখে ক্ষীরোদবাবুর, গিরিশবাবুর নাম করবেন , অথচ কার্যক্ষেত্রে ক্ষীরোদ-আদর্শে গঠিত নাটক মঞ্চস্থ করবেন না। লোকে এখন যা চায় তাই দিয়ে যাবেনই এঁরা!

এবার পরিচালক কথা কইলেন, যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে—হ্যাঁ, ঠিক তাই। নাট্যশালা প্রত্যক্ষ দর্শক-সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। আপনারা যা বললেন প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার দর্শক কি একমত? এগিয়ে চলা যাক। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন আমার দর্শকও বাস্তবোত্তরকে চাইবে। সেই দিনই আমি বাস্তবোত্তরের দিকে পা বাড়াব। তার এক মুহূর্ত আগে নয়।

থিয়েটারের ভাষা

থিয়েটারের কোনো নিজস্ব ভাষা আছে কি? লেখকেরা, কবিরা কথা সাজান। চিত্রকর সাজান রং। গায়ক গাঁথেন স্বরের মালা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মাধ্যমের অটুট রীতিনীতি আছে, ব্যাকরণ আছে, ব্যঞ্জনা-অলংকার আছে। কবি বলেন—

আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়-তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতায়
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

আমাদের মন চলে যায় নিভৃতের দিকে, আবেগ আসে কথার জোয়ারে। কিন্তু এটা তো আকস্মিক নয়। রীতিবাগীশ অধ্যাপক তীক্ষ্ণ কলমে ব্যবচ্ছেদ করেও দেখবেন ছত্রে ছত্রে রয়েছে উপমা, কালিদাসীয় ব্যঞ্জনার অঙ্ক-কষা প্রয়োগ। ব্যঞ্জনার মাধ্যমে বাচ্য। ব্যঞ্জনায় বাচ্যে রাজযোটক। বিশ্বকবির হাতে কাব্যরীতির ব্যবহার!

অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন পূর্ববঙ্গের ল্যান্ডস্কেপ। দেখে মন নিরুদ্দেশে উধাও হতে চায়। সেটাও শিল্পী দৈবভরসায় ছেড়ে দেননি। সমালোচকের বেরসিক চোখও ধরতে পারবে না কোনো ভুল—না ড্রয়িং-এ না বর্ণালিবিভঙ্গে। প্যাস্টেল আর ক্রেয়নের পশ্চিমি কায়দাকানুন সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়েছে, রয়েছে কমনীয়তা, প্যাটিনার ধাঁচ, রয়েছে ভেনিশীয় বর্ণচ্ছটা, ধূসর ছবিতে লাল ঘুড়ি—পশ্চিমি বৈচিত্র্যনীতি অনুসৃত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। আঙ্গিকের আইন মেনেছেন অবনীন্দ্রনাথ ; সে-আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই ফুটিয়েছেন সীমানাহীনের চেহারা। আইনটাই তাঁর হাতে অস্ত্র।

ওস্তাদ কেদারা গাইছেন। তানের পর তানে চমৎকৃত হয়ে উঠছি আমরা। কতরকমের গমক হলক। কী বিচিত্র মুখে আসার ভঙ্গিটা। কী অবশ্যম্ভাবী সম-এ এসে দাঁড়ানো। সেই সুরের মায়াজালে চোখের সামনে যেন দেখতে পাই এক যুবতীকে, আলুলায়িত কেশদাম, পরিধানে গৈরিক বসন। তাঁকে ঘিরে নাচছেন সখীরা। মহাদেবের আরাধনায় মগ্না যুবতীও নৃত্যরতা। স্পষ্ট শুনছি শঙ্খধ্বনি আর সখীদের পায়ে নূপুরের রিনিঝিনি। ফৈয়াজ খাঁ থামলেন। চমক ভাঙল। মনে হল সমস্ত আইনকানুনের উর্ধ্বে উঠে গেছেন খাঁ সাহেব। কিন্তু সত্যি কি তাই? কোথাও কি কেদারার বিশেষ রূপ লঙ্ঘিত হয়েছে? বাদী মধ্যম না ছুঁয়ে তান দিয়েছেন? সংবাদী ষড়জকে অবহেলা করেছেন? বক্র গান্ধার না লাগিয়ে মধ্যমে গেছেন? মার্গসংগীতের হাজারটা খুঁটিনাটি সব সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। কেদারা খেয়ালে এসেছে পর পর বেহাগ, শংকরা, হামবীর,

বাগেশ্রী, নট কামোদের ছায়া। রয়েছে ঝাঁপতাল, ত্রিতালের কঠোর ছন্দ। রয়েছে আলাপ, বাহে আলাপ, আস্থায়ী অন্তরা, মুখ-এর জটিল আঙ্গিক। এসবকে স্বীকার করেই ফৈয়াজ খাঁ-র সুরসৃষ্টি। আইন মেনেই বে-আইনের ভান। চরম নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই বেপরোয়া, উদ্দাম অনিয়ম।

কিন্তু থিয়েটারের নিয়ম কোথায়? কোথায় তার ব্যাকরণ, তাব অভিধান?

থিয়েটারে আছেন অভিনেতা। তিনি কথা বলেন, চলাফেরা করেন, হাত-পা নাড়েন। তবে কি তিনিই মূল গায়েন? তাঁর বাচিক অভিনয়ই যদি থিয়েটারের প্রধান উপকরণ হয়, তবে থিয়েটার আর আবৃত্তির পার্থক্য থাকে কি? যদি অভিনেতার অঙ্গসঞ্চালনই মূল হয়, তবে নৃত্যবিদ হেসে বলবেন—আমার শিল্পেরই বটতলা সংস্করণ হল থিয়েটার।

তাবপর আছে দৃশ্যসজ্জা। এখানে আবার থিয়েটাবের সঙ্গে চিত্রকলার নাড়ির যোগ অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে স্থাপত্য-ভাস্কর্যেরও।

তারপর বোধ হয় আলোকসম্পাত। এখানে আবার ভোল্‌টেজ অ্যাম্পিয়ার-সার্কিট-ডিমাব-স্টেপলেন্‌স আশ্রয় কবে এসে পড়েছে নিছক বিজ্ঞান। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি রং-এর খেলায় বয়েছে আবাব ওই চিত্রকলার আমেজ। ঘনত্ব দূবত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্যেও তাই।

তারপর সংগীত। থিযেটারের সংগীত স্বাধীন নয়, এখানে তার মুক্ত উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। নাটকের প্রয়োজনে সে সীমিত, অবরুদ্ধ। তথাপি সে সংগীত। অতএব আর-একটি ললিতকলার আমদানি।

থিয়েটার তাই বারোয়ারি। থিয়েটার নানা শিল্পের সমন্বয়—কথাটা শুনতে বেশ। তেল আর জলেরও সমন্বয় ঘটাবার বৃথা চেষ্টা অনেকে করেছেন। সমন্বয়, না সংঘর্ষ সেটা বিচারসাপেক্ষ।

সমন্বয় কি সম্ভব? এই মূল প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলে ওই সর্বধর্মসমন্বয়ের মতনই একটা না-ধর্ম না-সমন্বয় সৃষ্টি হবে।

কথা আব অঙ্গসঞ্চালনের সমন্বয় কি সম্ভব? দৃশ্যমান মঞ্চসজ্জা ও শ্রুতসংগীতের সমন্বয় কি সম্ভব? অভিনেতার কণ্ঠস্বর ও রঙিন আলোর জাদু—একটা শুনছি, আর একটা দেখছি। এ দুয়ের সমন্বয় কি সম্ভব? এর জবাব যদি কেউ না দিতে পারেন তবে পরোক্ষভাবে স্বীকৃত থিয়েটারের নিজস্ব কোনো ভাষা নেই। সে এতগুলি শিল্পমাধ্যমকে গ্রহণ করেছে, মেলাতে পারে নি ; চুরি করেছে, নিজের করে নিতে পারেনি ; হজম করতে পারেনি।

মূল তত্ত্বগত প্রশ্ন একটিই। যা শুনছি আর যা দেখছি—এ দুয়ের মিলন কি সম্ভব? এমন একটা ক্ষেত্র কি নেই যেখানে দৃশ্য ও সংগীত, নৃত্য ও কথা জাত না খুইয়ে একাসনে বসতে পারে?

সংগীত নিয়েই আগে আলোচনা করা যেতে পারে। লাল গানে নীল সুর সম্ভব হলেই কার্যোদ্ধার হয়। গানের রং আছে কি?

দামোদর মালকোষের রূপ বর্ণনা করছেন—

আরক্তবর্ণো ধৃতরক্তযষ্টিঃ বীরঃ সুবীরেষু কৃতপ্রবীর্যঃ।

মালকোষের রং লাল, হাতে রয়েছে রক্তবর্ণ যষ্টি। মালকোষের স্বরসমষ্টি থেকে একটা স্পষ্ট

রঙের ঝিলিক খেলছে দামোদরের চোখে। রাগের ধ্যান-রূপটা কবিকল্পনা বলে ওড়াতে পারেন, রংটা পারেন না ; তেমনি—মধুমধ সারং কনকবর্ণা পীতবসনা। ভৈরবীও পীতবসনা। পণ্ডিত সোমনাথের চোখে বরাটি নীলাম্বরা। টোড়ি তুষারের মতো শুভ্র। বসন্ত নীলবর্ণ। বিলাবল শ্যামা। রামকেলি সোনালি। প্রায় প্রত্যেক রাগে প্রাচীন সংগীতরসিকরা আবিষ্কার করেছিলেন রং।

ইয়োরোপের পের কাস্তেল যে অকিউলার মিউজিকের তত্ত্ব দিয়েছিলেন তাও এই শব্দবর্ণ-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেঠোফেনের পঞ্চম সিম্ফনির প্রথম আলেগ্রো অংশ যে কালো আর নীল-এর সংমিশ্রণ, তাতে অনেক পণ্ডিতেরই আর কোনো সংশয় নেই। চাইকভ্স্কির লিটল রাশিয়ান সিম্ফনি প্রধানত হল্‌দের উপর আঁকা। বেঠোফোনের কোরাল সিম্ফনি উজ্জ্বল বেগুনি আর লালের আলোড়ন।

রেনে গীলেরে আধুনিক জ্যাজ (Jazz) সংগীত সম্বন্ধে বললেন—'Il n'y a plus de perspective'—এ সংগীতে পার্স্পেকটিভ নেই ; দূরে-কাছে পারস্পরিক অনুপাত নেই। আধুনিক চিত্রকলায় বেন নিকল্সন অথবা জাঁ বাজেন-এর কাজের সঙ্গেই যেন তুলনা চলে Jazz-এর। এঁরা ছবি আঁকেন জ্যামিতিকে কেন্দ্র করে। সোজা সোজা রেখা টেনে গড়ে তোলেন অনেকগুলি এলোমেলো চতুর্ভুজ, ত্রিকোণ। উজ্জ্বল রং-এ ভরিয়ে দেন সেগুলো। মনে হয় আধুনিক সভ্যতার মানুষের ছন্নছাড়া জটিল মনস্তত্ত্ব এক লহমায় রূপ নিল সামনে। দূরে-কাছের কোনো তারতম্য নেই : রাত্রে নিওন উদ্ভাসিত চৌরঙ্গির মতন দূরত্ব বা নিকটত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে ; সবটা যেন একসঙ্গে খাড়া হয়ে এসে গেছে কাছে। জ্যাজ সংগীতের চমক লাগানো চিৎকারেও একই রূপরীতি আবিষ্কার করেছেন গীলেরে। মন্দ্র-সপ্তক আর তার-সপ্তকের সব পার্থক্য ঘুচিয়ে, কাউন্টারপয়েন্টের নিয়মাবলি ভেঙে উড়িয়ে, যে-কোনো স্কেলে যে-কোনো স্বর ব্যবহার করে এক হৈ হৈ কাণ্ড সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিকলসনের স্টিল লাইফের মতোই কোথাও বাঁশির ফিকে সবুজ আর্তনাদ, কোথাও চেলোর কালো কালো ঝংকার, কোথাও ট্রাম্পেটের ক্যাটকেটে হল্‌দে চিৎকার।

সংগীত বাদ দিন—সামান্য স্বরবর্ণগুলির মধ্যেই র‍্যাবো খুঁজে পেয়েছেন এক একটা রং। তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের কবিরাও ভেবে দেখবেন অ বলতে একটা নিটোল শাদা পাওয়া যায় কিনা ; আ বলতে এসে গেল একটু হলদে, একটু দুপুর রোদের ভাব। ই-র মধ্যে যেন গাঢ় রঙের আভাস পাচ্ছি ; সবুজ নাকি? উ আরো গাঢ়, প্রায় কালো।

রঙিন সুর তো পাওয়া গেল। এবার সুরেলা রং পেলেই হয়।

রাজপুত রাগমালাব ছবি বিচার করুন। ষোলো শতক থেকে হিন্দিতে রাগমালা কাব্য লেখা চলন হল। আর এইসব পুঁথিতে রাগরাগিণীর ছবি এঁকে দেখানো হল। ছবিগুলো যে সব সময়ে ভরতবর্ণিত রূপ বক্ষা কবল তা নয়। উপরন্তু রাজপুত শিল্পী মনের আনন্দেই যেন এঁকে গেছেন ছবি। অথচ সে ছবিব রেখায় রঙে, কোথায় যেন ধ্বনিত হচ্ছে সংগীত। গম্ভীর শিবমূর্তি ভৈরব রাগের চেহারা। শিবপূজায় মগ্না বধূ ভৈরবী। ব্রহ্মাপূজা খম্‌বাবতী। ঝুলনের দৃশ্য হিন্দোল। এক নারী বীণা বাজাচ্ছেন, মুগ্ধ হরিণ এসেছে কাছে—টোড়ি। মল্লযুদ্ধ—দেশাখ্য। হোলি আর নাচের উন্মাদনায় আনন্দ—বসন্ত। বর্ষায় কৃষ্ণের লীলা—মেঘ। এক নারী ময়ূরকে সংগীত

শোনাচ্ছেন—গুর্জরী। নায়ক পুষ্পধনু থেকে তীর ছুঁড়ছেন—বিভাস। শিল্পীর রং-রেখায় ফুটে উঠেছে এক-একটি রাগের আমেজ।

হুইস্‌লার ছবির নাম দিলেন 'হার্মনি ইন গ্রীন'। ছবির কোনো প্রচলিত ধাঁচের বিষয়বস্তু নেই, নামেই বোঝা যাচ্ছে হুইস্‌লার সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—বলেছেন তাঁর ছবি আসলে সংগীত, সবুজ সংগীত। এমনি আরো নাম দিয়েছেন—'নকতুর্ন ইন ব্লু অ্যান্ড সিল্‌ভার' (এবং সত্যি, ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকালে শোপ্যাঁর মধুর রাত্রি সংগীত মনে পড়বে), 'নকতুর্ন ইন ব্লু অ্যান্ড্ গোল্ড', 'সিম্‌ফনি ইন হোয়াইট' (শেষোক্তটি কেন জানি না ব্রাহ্‌মস্-এর দ্বিতীয় সিম্‌ফনি স্মরণ করিয়ে দেয়)।

গোগ্যাঁ নিজের একটি ছবি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

> The musical element, harmonies of orange and blue woven together by yellows and violets, all lighted by greenish sparks

তত্ত্বগত ক্ষেত্র তাহলে প্রস্তুত আছে ; রং আর সুরের মাঝে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর কিছু নেই। এমনভাবে অভিনেতাদের নড়াচড়া সম্ভব যা হয়ে উঠবে কথারই চিত্ররূপ ; এমনভাবে দৃশ্যসজ্জা ও আলো সাজানো সম্ভব যা কথা আর সংগীতকেই প্রতিফলিত করবে চোখের উপর। আবার কথা আর সংগীতকেও এমনভাবে সাজানো যায় যা ধ্বনিত করবে দৃশ্যপটের সুরটাকে। এ মিলন যদি সম্ভব হয়, তাহলে থিয়েটারের নিজস্ব ভাষাসৃষ্টিও সম্ভব। নচেৎ কথা, আঙ্গিক-অভিনয়-দৃশ্য-সংগীতে গৃহযুদ্ধ। নচেৎ হয় কথা, নয় আঙ্গিক অভিনয়, নয় দৃশ্য, নয় সংগীতের আধিপত্য, অন্য সকলের আত্মসমর্পণ এবং অন্যের ধার-করা ভাষা নিয়ে থিয়েটারের চর্বিতচর্বণ।

থিয়োরি না হয় পাকা হল, তবু মিলন হয় না কেন? পৃথিবীর অধিকাংশ থিয়েটারেই হয় নি কখনো। বাধা কী?

বাধা সাহসের অভাব। সর্বশিল্পসমন্বয় প্রভৃতি ধোঁয়াটে কতকগুলি আপ্তবাক্য অনেকেই আওড়ান। কিন্তু তার যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সে-দিকে এগুনোর সাহস নেই। মূলে যাওয়ার সদিচ্ছাই যেন কারুর নেই!

এরই বা কারণ কী? কয়েকটা মামুলি কারণ আছে যা সহজেই অপনেয়। যথা, অভিনেতা নামক বিচিত্র জীবটি। এলিওনোরা ডুজের মতন অভিনেত্রী খেদোক্তি করেছিলেন—থিয়েটারকে বাঁচাতে হলে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আগে এক মড়কে সাবাড় হতে হবে। বহু বৎসরের প্রাচীন নজির ঘাড়ে চেপে আছে—অভিনেতাই নাকি থিযেটাবেব প্রধান ও একমাত্র হীরো। তাঁকে আলোকে ফোকাসে উদ্ভাসিত করাই আলোর কাজ। তাঁকে উজিয়ে দিতেই দৃশ্যসজ্জা। তাঁকে কেলাপ পাওয়াতেই নাট্যকারের কথা সাজানো। তাঁর প্রচণ্ড আবেগকে রূপ দিতে মাঝে মাঝে ঝাঁজ আর বেহালার শব্দ করাই সংগীতকারের কাজ। প্রাচীন নাট্যশালার ইতিহাস ঘেঁটে এঁদের বোঝানোও শক্ত যে অভিনেতা মূল গায়েন হয়েছেন বেশি দিন নয়—আঠারো শতকের ইয়োরোপে মাত্র—কারণ যে পাগল হয়েছে সে নিজেকেও খেপিয়েছে, অন্যকেও খেপিয়ে মারছে। দম্ভের মতন সংক্রামক ব্যাধি বিরল। একজন অর্ধশিক্ষিত স্ফীতমস্তিষ্ক অভিনেতা একটা পুরো দলের সর্বনাশ ঘটাতে সক্ষম। সেইরকমই দেখা দেয় আলোকশিল্পীর মধ্যে, দৃশ্যসজ্জাকরের মধ্যে, সংগীতকাবেব মধ্যে। কেউই সামগ্রিক প্রযোজনার সামনে সম্পূর্ণ নতি

স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কিন্তু এগুলি সাধারণ মানবিক অসুস্থতা। একে দমন করা সম্ভব। দ্বিতীয় বাধাটি আরো ভীষণ। এটি হল তথাকথিত রিয়্যালিজম্, বাস্তবতা। কী কুক্ষণে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হিল ফোটো তুলে বসলেন ; তারপর থেকেই রিয়্যালিজম্-এর দাপটে থিয়েটার থেকে কাব্যছন্দ সুর রং বিতাড়িত হয়েছে, কেননা সবটাই নাকি হবে বাস্তব, বাস্তবানুগ। বাস্তবে যা ঘটে তারই অনুকরণ। তাকে কি আর্ট বলে? পুরো থিয়েটারই তো মেকি। সামনে ঝুলছে যবনিকা। মাঝে মাঝে আবার তা সবেগে পতিত হয়ে বাস্তব চিত্রটাকে খান খান্ করে দিচ্ছে। অমন চটকদার বাস্তব ড্রয়িংরুমের দুপাশেই রয়েছে কালো কালো অবাস্তব উইংস। ওপরে ঝুলছে সম্পূর্ণ অবাস্তব ঝালরের সার। চট আর কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অভিনেতাকে মনে করতে হবে এটা আসল ইঁটের ইমারত। এটা কি বাস্তবতা, না বাস্তবতার ভান? আর ভান কী করে আর্টের পর্যায়ে উঠবে বলুন।

মেকি ড্রয়িংরুমে লজ্জা-লজ্জা ভাব করে তাকে খাঁটি বলে চালানোর চেষ্টা বাতুলতা। পুরো আধুনিক থিয়েটারই (কয়েকটি পাশ্চাত্য পরীক্ষাধর্মী মঞ্চ ছাড়া) আজ এই চরম লজ্জায় ভুগছে। ঢেকে রাখার চেষ্টা। পাছে কোথাও কৃত্রিমতা বেরিয়ে পড়ে এই আতঙ্কে জড়সড়। থিয়েটারকে পাছে থিয়েটারি মনে হয় এই ভয়ে হাত পা পেটে সেঁধিয়ে আড়ষ্ট অভিনয়।

অথচ ওই কৃত্রিমতাই হবে থিয়েটারের ভিত্তি। আগেই বলেছি, শব্দকে রঙের পর্যায়ে তুলতে হবে, রংকে শব্দের। সেখানে বাস্তবের চৌহদ্দিতে শব্দকে বা রংকে বাঁধা কি সম্ভব?

কথা যদি কেবলমাত্র অর্থই বোঝায়, শুধু বাচ্যার্থে সীমিত থাকে, তবে কি তাতে রঙের ঝিলিক আসতে পারে? জীবনকে অনুকরণ করলে 'কেমন আছ?' 'উঃ কী জ্বালা!' ধরনের কিছু কথা ছাড়া আর-কিছু বলা যায় কি? প্লট আমদানি করেই নাটক জীবনোত্তর হয়ে গেছে কারণ জীবনে প্লট নেই, নায়ক নেই, ভিলেন নেই। তাই ভাষাকেও জীবনোত্তর করে তুলতে আপত্তি কী? তাকে ধ্বনিত সৌন্দর্য্য দিতে বাধা কী? সত্যিকারের যে যুবক আত্মহত্যা করতে যায়, সে হয়তো দিনের পর দিন মুখ ভার করে বেড়ায়, শুকিয়ে ওঠে, তারপর একদিন গলায় দড়ি দেয়, লিখে যায় আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এটুকু বলার পিছনে না বলার যে বিশাল জগৎটা রয়ে গেল সেটা কি বাস্তবের অংশ নয়? তাই 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' ধরনের কথা দিতে আপত্তি কী? অথবা To be or not to be?

কথার মধ্যে রং আনতে গেলেই তাকে বাচিক অর্থ ছাড়াও আরো একটা কিছু বহন করে আনতে হবে। শব্দের মধ্যে তখনই বর্ণ আসে যখন সে শব্দ হয় ছন্দোবদ্ধ, যখন সে শব্দের থাকে সুর। যে সামান্য সুর নিত্যব্যবহার্য কথাবার্তায় থাকে, তা পর্যাপ্ত নয়। তাকে আশ্রয় করলে নাটক ওই জীবনানুকরণেই আবদ্ধ থাকবে, জীবনোত্তর শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠবে না।

আর এটাই আধুনিক নাটকের স্ব-বিরোধ। নাটক হবে জীবনানুগ, নাটক হবে শব্দবর্ণের সমন্বয়—এ দুটো প্রতিপাদ্য একই সঙ্গে বলা হচ্ছে। অথচ এরা পরস্পরবিরোধী।

তবে নাটক কোন পথ নেবে? কে জানে। নানা মুনি নানা তপোবনে নানা তপস্যায় নিযুক্ত। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষ্য ও টীকা। প্রত্যেকেরই একদল আবেগান্ধ শিষ্য।

কিন্তু গোড়ার কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন কি? থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত

সৃষ্টি, আব এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরেব সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ।

আর এ থিয়োরির শত্রু হলেন বাস্তববাদীরা, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফপন্থীরা। এঁরা ভুলে যান শিল্প ঠিক জীবন নয় ; শিল্প জীবনোর্ধ্ব, কালোর্ধ্ব, দেশোর্ধ্ব একটা কিছু। জীবন প্রবহমান ; থিয়েটার স্থিতু। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ডচিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙে ছন্দে বাঁধতে হবে তাকে। নইলে সে হয়ে থাকবে একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অসংলগ্ন চিত্র।

যামিনী রায়ের ছবি ফোটো নয়। ফোটো হলে সে আর্ট হত কি?

ডস্ পাসোস্-এর, জয়েস-এর উপন্যাস ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার দিনপঞ্জি নয়। কাম্যুর 'লেত্রাঁজের' প্রবেশ করে গেছে নায়কের চিন্তারাশির মধ্যে, ব্যবহারিক জীবনে আটকা থাকে নি।

পিকাসো বা মাতিস কি জীবনবিমুখ? না, জীবনের বৃহত্তর সত্যের অন্বেষণেই তাঁরা ধাবিত?

পশ্চিমের এক মহৎ শিল্পসৃষ্টি হল অপেরা। অপেরায় সংলাপ নেই, আছে গান। রূপসজ্জা উজ্জ্বল, রঙিন—মানুষকে মনে হয় এক বৃহৎ ছবির অংশ। সেই ছবিরই আর-এক অংশ হল কাব্যকল্পনায় উদ্ভাসিত দৃশ্যসজ্জা। এ হেন রঙিন রূপকথার রাজ্যে কী রকম কাহিনী উপস্থিত হচ্ছে?

রিগোলেত্তো রাজসভার বিদূষক, কুঁজো, এনামেলকরা মুখে আবেগহীন নিশ্চল মৃত হাসি। লম্পট ডিউকের সব পাপের সে সহচর। অবশেষে একদিন ডিউকের আদেশে সে যে মেয়েটিকে হরণ করে আনে প্রাসাদে—একটু দেরি করে জানতে পারে সে তার নিজেরই কন্যা। ক্রোধোন্মত্ত রিগোলেত্তো ডিউককে হত্যা করতে সংকল্প করে। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের—যে-দেহটি বস্তায় বেঁধে সে বিজয়োল্লাসে যায় নদীতে নিক্ষেপ করতে, সে দেহটি তারই কন্যার। ভাড়াটে খুনি স্পারাফুচিলের চাতুর্যে নিহত হয়েছে রিগোলেত্তোরই কন্যা, ডিউক নয়। রচয়িতা ভেরদি, ভিক্তর উগোর 'ল্যা রোয়া সামুজ' অনুসরণ করেছেন। কী নেই এতে? খুন, নারীহরণ, একাধিক প্রেমের উপন্যাস, নিয়তির অমোঘ হস্তক্ষেপ। তা বলে কি এ জীবনবিমুখ? নাকি অসংখ্য ঘটনা সংস্থাপিত করে রচয়িতা এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন—যে এতে জীবনকে অনুকরণ করার শিশুসুলভ প্রয়াস নেই, এ হচ্ছে উপকথার মতন ঘটনাড়ম্বরে সমৃদ্ধ। 'রিগোলেত্তো' যে কাহিনী এর জন্যে ভেরদি লজ্জা পান না ; সদম্ভে তিনি বলেছেন—হ্যাঁ, এ কাহিনী। কাহিনী কাহিনীই হবে। কাহিনীকে মুখ লুকিয়ে সত্য ঘটনার ছদ্মবেশ ধরতে হবে না।

'হ্যামলেট'-এ কী নেই? ভূত, ষড়যন্ত্র, বিষপ্রয়োগ, শোকজর্জরিত নায়কের প্রেম-প্রত্যাখ্যান, তলোয়ার খেলা মায় গুটি ছয়েক পতন ও মৃত্যু। তা হলে কি জীবনের সর্ববৃহৎ সত্যের অতি কাছাকাছি পৌঁছতে অপারগ হয়েছেন শেক্স্পিয়ার? সেই রূপনীতিই অনুসৃত হয়েছে উগোর 'এরনানি'-তে, শিলার-এর 'ভিলহেল্ম্ টেল্'-এ, মলিয়েরের 'তার্তুফ'-এ।

অবশেষে এই জীবনোত্তর সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা দেখা দিয়েছে আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে, ব্রেখ্ট, টলার, শেরউড অ্যান্ডারসন, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, টি. এস. এলিয়টের মধ্যে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' বা 'নরনারায়ণ' কি অবাস্তব? রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-তে

আধুনিক সমাজব্যবস্থার নগ্ন চেহারা কি তথাকথিত বাস্তববাদী নাটকের চেয়ে কম ফুটেছে?

আইজেনস্টাইনের ছবিও নাকি বস্তুকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দেখায়। তা বলে 'ইভান' আর্ট নয়? চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন—কারণ থিয়েটারের তুলনায় সে শুধু বয়ঃকনিষ্ঠই নয়, সে অর্বাচীন। অথচ সে সৃষ্টি করে নিয়েছে তার নিজস্ব ব্যাকরণ; তার ব্যঞ্জনা ও অলংকার। এই দেখছি বহু দূরে দিকচক্রবালের কাছে একটা মানুষ, পরের ফ্রেমেই পর্দা জুড়ে সে-মানুষটির ছবি, সে হাত তুলল ঘড়ি দেখতে—চট্ করে পুরো পর্দাটা অধিকার করল ঘড়িটা। কোত্থেকে কোথায় এলাম! এটাই চলচ্চিত্রের নিজস্ব কায়দা—দর্শকচক্ষুকে যত্র তত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। সেটাই সে ব্যবহার করে নির্ভয়ে। বাস্তবতার খাতিরে নিজের বৈশিষ্ট্যকে সে চেপে রাখে না, কুণ্ঠাবোধ করে না।

এতেও হয়তো পার্স্পেক্টিভ খান খান হয়ে ধ্বসে যায়। কিন্তু আর-একটা কিছু সঞ্চারিত হয় দর্শকমনে। চমক লাগে। বৃহত্তর কিছুর আস্বাদ দেয়।

বিশেষ করে আধুনিক জীবন এত বিচিত্র, এত সংঘাতপূর্ণ, এত বাঁকাচোরা, টুকরো টুকরো রূপে, যে এর প্রতিফলনকেও তেমনি জটিল হতে হবে। অতিসরলীকরণে তৃপ্ত হয় শুধু নির্বোধরা।

তাই এক থিয়েটার ছাড়া আর সব শিল্পক্ষেত্রেই চলেছে এই নতুন তালগোল-পাকানো জীবনকে ধরার প্রচেষ্টা।

আগে ইয়োরোপের চিত্রকররা আঁকতেন যথাযথ প্রতিরূপ। পরে এলোমেলো করে দিলেন পার্স্পেক্টিভ। সমালোচনার ঝড় উঠল, যা দেখেছি তা আঁকছে না কেন? এসব আবার কী উদ্ভট জ্যামিতিক খেয়াল? মাতিস জবাব দিয়েছিলেন—'These apparent abstractions have only one end in view . to express the sentiment that the artist has of life.'

অত বলারও প্রয়োজন ছিল না। মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার থুলেস পরীক্ষা চালিয়ে দেখালেন মাতিসরা যা আঁকছেন সেটাই হচ্ছে বস্তুত আসল চেহারা, মানবচক্ষু সেটাই দেখে। প্রাচীনপন্থীরা তাকে পল্লবিত করে, সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেখাতেন। অবাস্তব তাঁরাই, আধুনিকরা নন—

> Some artists have departed very far from perspective drawing. I have found that certain of the post-impressionist painters drew inclined objects in ratios which were about those of the phenomenal shapes as measured in the experiments

ফোটোগ্রাফ বাস্তব নয়, মাতিসের ছবিই আসল বাস্তব, বাস্তবপন্থীরা এবার কী বলবেন?

জপেন দা জপেন যা
১৯৭১-৮৪

শ্রী সত্যজিৎ রায়ের করকমলে

ভূমিকা

একদা বাংলা সাহিত্যের একটা সবল প্রকাশের দিক ছিল প্রবন্ধ-সাহিত্য। মাঝখানের ব্যাপক সময়ে দেখি প্রবন্ধের উষর তেপান্তর। সেই তেপান্তরে নগণ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য ক্রমে ক্রমে পাঠক ও প্রকাশক হারিয়ে ক্রমবন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল। উপন্যাস ও গল্পের প্লাবনের পাশে প্রবন্ধের অবস্থা হয়েছিল প্রায় ধু ধু মরুভূমির মতো। ইদানীং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। অসংখ্য প্রবন্ধগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। খরা কাটিয়ে এবার হয়তো প্লাবনেই ভেসে যাবে প্রবন্ধসাহিত্যের মরুভূমি। এই সব প্রবন্ধগ্রন্থে বিষয়বৈচিত্র্য যথেষ্ট, তবে রচনা বৈচিত্র্য বা ভাষা ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য তেমন দেখি না। তথ্য ও তত্ত্বের অপ্রতুলতা, বিচার-বিশ্লেষণের স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গভীর মননশীলতার অভাব চোখে লাগে ; মস্তিষ্কে বা মনেও কোনো দাগ কাটে না। তথাপি অসংখ্য অর্বাচীন গল্প-উপন্যাসের আগাছার জঙ্গলে যত অধিক সংখ্যায় প্রবন্ধগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। প্রবন্ধের এই বন্ধ্যা দশা নাট্যসাহিত্যে ছিল সমধিক। বাংলায় নাট্য বা চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থ ছিল না বললেই চলে। সেক্ষেত্রেও বিগত কয়েক বছরে ঘটেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। জাদুকরেব ভোজবাজিতে দর্শকের চোখের সামনে নানা বিচিত্র বস্তু হাজির হওয়ার মতো বইয়ের দোকানের শো-কেসে হঠাৎ হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয় নাট্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ক নতুন নতুন গ্রন্থের বর্ণাঢ্য মেলা। যদিও অধিকাংশ গ্রন্থের রচনাপদ্ধতি গতানুগতিক, বিচার-বিশ্লেষণে ধাব নেই। তবু নাট্যকর্মীদের কাছে বাংলায় নাট্যপ্রবন্ধগ্রন্থের বহুল প্রকাশ ও প্রসার সর্বদাই বাঞ্ছনীয়।

এমতাবস্থায় শ্রীউৎপল দত্তের বর্তমান নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নানা ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে কয়েকটি চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রবন্ধকার নাট্যবিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রবন্ধে চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন অবশ্যই শ্রীউৎপল দত্তের মৌলিক চিন্তা নয়। বহুপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাঁর 'পঞ্চভূত' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে, এবং পাঁচটি বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি কবে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্দাম আলোচনার অবতারণা করেছেন। নাট্যবিষয়ে স্তানিস্লাভ্স্কি তাঁর সারাজীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল বিধৃত করেছেন এক পরিচালক, তার সহকারী ও কিছু নাট্যশিক্ষার্থী চরিত্রের নাট্যানুশীলনের বর্ণনা ও কথোপকথনের মাধ্যমে। ব্রেখ্টের 'মেসিংকাউফ ডায়ালগ' নাট্যপ্রবন্ধ রচনায় এহেন আদর্শের আর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীউৎপল দত্ত নিজেও প্রায় কুড়ি বছর আগে 'চায়ের ধোঁয়া' নামক নাট্যপ্রবন্ধগ্রন্থে পরিচালক, নাট্যকার, ভাষাবিদ্, দার্শনিক, অভিনেতা প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে স্বদেশ ও বিদেশের নাট্য-আলোচনায় নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন, নতুন চিন্তার অবতারণা করেছেন। বর্তমান 'জপেন দা জপেন যা' নামক গ্রন্থটিতে শ্রীদত্ত তাঁর

ক্রম অগ্রসর নাট্য অভিজ্ঞতা ও নাট্য গবেষণার আর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তাঁর রচনাকৌশলে জপেন-দা যেমন একটি অসাধারণ চরিত্র হয়ে উঠেছে তেমনি তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে ক্ষুরধার বিচারবিশ্লেষণে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে অসামান্য। শেষের গুটিকয় প্রবন্ধ বাদে প্রবন্ধগুলির বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে জপেনদার জবানিতে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই জপেনদা কে? ইনি কি মুখোশের অন্তরালে শ্রীউৎপল দত্ত স্বয়ং? জপেনদার চেহারা ও চরিত্রের বর্ণনার সঙ্গে বাহ্যিক উৎপল দত্তের বিন্দুমাত্র মিল নেই। তবে মননশীলতা এবং ক্ষুরধার বিশ্লেষণী শক্তির অধিকারী জপেনদার নাট্যভাবনা ও আলোচনায় শ্রীউৎপল দত্তের প্রবল উপস্থিতি অনস্বীকার্য। জপেনদা সম্পর্কে প্রবন্ধকার বর্ণনা দিয়েছেন এই রকম : 'জপেনদার নাম বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে থাকবে না, কেননা উনি কোনো নাটক লেখেননি, কোনো নাটক পরিচালনা করেননি, এমনকী কোনোদিন স্টেজে ওঠেননি—পাড়ার সরস্বতী পুজোর প্লেতেও নয়। উনি শুধু বাক্যবাগীশ, কথার জেহাদি, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক, একজন নির্লিপ্ত বিশেষজ্ঞ।' এ কথা ঠিক, কিন্তু জপেনদার নাম বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে থাকবে না, লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ না করে পারি না। প্রথমত, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বর্তমান প্রবন্ধগ্রন্থটি যেমন স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকবে, এই গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র ও নাট্যচিন্তাবিদ হিসেবে জপেনদার নামও তেমনি চির অমলিন থাকবে। এবং গ্রন্থটিব বিষয়বস্তু যেমনভাবে নাট্যশিল্পের তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে ব্যবহারিক নানা জটিল সমস্যা সমাধানেও সহায়ক হবে তাতে নাট্যশালাতেও জপেনদার নাম নিশিদিন উচ্চারিত হবে। শুধু নাট্যকর্মেই নয়, দর্শক হিশেবে প্রস্তুত হতেও এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। যে-কোনো সাধারণ পাঠকও গ্রন্থখানি পাঠ কবে দর্শক হিশেবে তাঁর নাট্যবোধকে সুশিক্ষিত এবং সুতীক্ষ্ণ করে তুলতে পারবেন, একজন সুযোগ্য দর্শক হয়ে উঠতে পারবেন।

বলাই বাহুল্য, শ্রীউৎপল দত্ত রাজনৈতিক থিয়েটারে বিশ্বাসী। শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক জটিল প্রেক্ষাপটটি তিনি মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আলোকে আলোকিত করে তোলেন, এতদ্দেশীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা এক বিরল দৃষ্টান্ত। নাট্যতত্ত্বের নানা দিককে পরিস্ফুট করতে প্রবন্ধকার জপেনদা এবং তার শাকরেদদের কোথায় না নিয়ে গেছেন! আই এন এ-র মুক্তি আন্দোলনে ধর্মতলা স্ট্রীটে নিহত বালক এবং গোরা সৈন্যের গুলির শব্দে উচ্চকিত আর জনতা-পুলিশের-সংঘর্ষে মুখরিত এসপ্ল্যানেড অঞ্চল থেকে শুরু করে, রাজপথের নাট্যাভিনয়ে, জনসভার অঙ্গনে জপেনদার নিজের ঘর নামক খোপে স্তূপাকৃতি বইয়ের আড়ালে ছেঁড়া মাদুরে শয়ান অবস্থায়, লাঠি, বল্লম আর হাঁসুয়া হাতে বুকের রক্তে বোনা ধান রক্ষায় সমবেত লড়াকু কৃষক যোদ্ধাদলের মাঝখানে।—এই সব কিছুর পটভূমিতে জপেনদা আলোচনা চালিয়ে যান দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের বিষয়ে, শিল্পসৃষ্টির নানা দিক আর স্তরের প্রশ্নে। শেষের গুটিকয় প্রবন্ধ জপেনদার জবানিতে ব্যক্ত নয়, কিন্তু একই চুলচেরা বিশ্লেষণে বিশ্লিষ্ট হয়েছে নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগের নানা জটিল সমস্যা সমাধানে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় চিন্তা ও প্রয়োগের বিষয়। শ্রীদত্ত তাঁর ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে নাট্যশিল্প ও সংস্কৃতি যা কিছু আত্মস্থ করেছেন তা অতি

প্রাঞ্জল ভাষায় এবং অননুকরণীয় ভঙ্গিতে এই প্রবন্ধগ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন—যে ভাষা ও ভঙ্গিতে কখনো ফুটে উঠেছে কৌতুকের কোমল সুর, কখনো বিদ্রূপের কর্কশ স্বর, কখনো ক্রোধের বজ্র নির্ঘোষ।

প্রবন্ধগুলিতে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে। থাকতেই পারে! তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে সুস্থ তর্কবিতর্কের মাধ্যমেই চিন্তার অগ্রগতি সম্ভব। কিন্তু পত্রপত্রিকায় বিতর্কের নামে দেখি শুধুই আক্রমণ, বা আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ না করে সমালোচনার নামে দেখি শুধুই কুৎসা আর অপপ্রচাব। বঙ্গসাহিত্যের বিশাল আঙিনায় যোগ্য সমালোচকের অভাব—একথা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু পত্রপত্রিকাদিতে সমালোচনার নামে যা প্রকাশিত হয়, বিশেষত উৎপল দত্তের নাটক, প্রযোজনা বা অন্যান্য গ্রন্থাদি সম্পর্কে, তাকে ঠিক সমালোচনার স্তরে ফেলা যায় না, অন্তত সেগুলিতে সমালোচকদের যোগ্যতার বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখি না, যদিও উক্ত সমালোচকদের তালিকায় প্রখ্যাত পণ্ডিতদের নামও মাঝে মাঝে যুক্ত দেখি। উক্ত ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ হয়, তাঁদের লিখিত বক্তব্য প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। যাক সে কথা।

শ্রীদত্ত ইতিপূর্বেও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা কবেছেন—শেক্‌স্‌পিয়ার, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি, ব্রেখ্‌ট্‌, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রসঙ্গে—সবই নতুন নতুন চিন্তায় নতুন দিক উন্মোচনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্যও বাংলার অগণিত নাট্যকর্মী। সেই নাট্যকর্মীদের কাজে বর্তমান গ্রন্থটি একটি অবশ্যপাঠ্য ব্যবহারিক পুস্তক হিসেবে আদৃত হবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ভূপেনদার দুপাটি বাঁধানো দাঁতের খটাখট শব্দ তাদের নাট্যকর্মে দিবারাত্র সচকিত করে রাখবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কলিকাতা

১লা মে, ১৯৮৪ — **শক্তি বিশ্বাস**

সূচিপত্র

ধর্মতলার হ্যামলেট

১৯৪৫ সালের নভেম্বরের শেষাশেষি ধর্মতলার ওপরে ওয়াছেল মোল্লার দোকানের সামনে পড়ে ছিল ছেলেটি। হাত দুটো শক্ত করে পেছনে বাঁধা, মুখটা হাঁ হয়ে আছে, মাছি ভন ভন করছে। আর মাথার পেছনে জমাটবাঁধা রক্তের একটা চক্রের মাঝখানে ছোটো একটি ফুটো। ছেলেটি পড়ে ছিল পারিপার্শ্বিকের সব চেতনা হারিয়ে, অথচ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল বহু উত্তেজিত হিন্দু মুসলিমের ভিড়। ছেলেটির পরিচয় কেউ জানে না, বয়সও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মরে গেলে কেমন যেন পরিমাণ হারিয়ে যায়, যেমন জালালাবাদে নিহত টেগরার ছবিতে। কেউ কেউ বলছিল, ভোররাত্রে পুলিশের গাড়ি থেকে ওই উদাসীন দেহটিকে ফেলে গেছে ওইখানে। একজন প্রশস্তবক্ষ বালুচ ফলওয়ালা ভাঙা বাংলায় বলছিল, শালা ফিরিংগি সার্জন্টের বাচ্চারা ওই বালককে খুন করে ভয় দেখাতে চায়। একজন বাঙালি শ্রমিক, তার নাম জানলাম মনিবুদ্দি, ভাঙা গলায় বলছিল, গতকাল রামেশ্বরকে খুন করেছে, তারপর রাত্রে এই ছেলেটাকে—ওরা ভেবেছে এইভাবে মারলে আর কেউ আইএনএ-র মুক্তি আন্দোলনে থাকতে সাহস পাবে না। একজন ছাত্র বলে উঠল, 'কিন্তু ছেলেটার নামটা কী?' কেউ বলতে পারল না।

চৌরংগি থেকে এই সময়ে ঘন ঘন গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, আর শোনা যাচ্ছিল স্লোগান, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ভারত ছাড়ো!' আর আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম একদল গোরা সৈন্য এসপ্ল্যানেডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল উঁচিয়ে, আর তাদের পেছনে একটা ট্রামে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

এই সব দেখতে দেখতে জপেনদা থিয়েটারের গল্প পাড়লেন। বিস্ফোরিত সেই সকালে থিয়েটার বস্তুটা এত অকিঞ্চিৎকর ঠেকল ; কথাটা এমন শূন্যগর্ভ শোনাল, যে আমি বলে উঠলাম, থামুন দিকি, স্থানকালের জ্ঞান নেই?

জপেনদা বললেন, স্থানকালের টনটনে জ্ঞান আছে বলেই বলছি, থিয়েটার যদি করতে চাও, তেমনটা যদি তোমার অভিপ্রায় হয় তবে এই মারামারির নাটকটা ভালো করে শেখ, পড়, বিশ্লেষণ কর। এই বলে জপেনদা হাঁটা দিলেন ওয়েলিংটন স্কোয়েরের দিকে। আমি ছুটলাম পেছনে। জপেনদার নাম বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে থাকবে না, কেননা উনি কোনো নাটক লেখেননি, কোনো নাটক পরিচালনা করেননি, এমনকী কোনোদিন স্টেজে ওঠেননি—পাড়ার সরস্বতী পুজোর প্লেতেও নয়। উনি শুধু বাক্যবাগীশ, কথার জেহাদি, বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক, একজন নির্লিপ্ত বিশেষজ্ঞ! দগ্ধ একটা বাসের কংকালের পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জপেনদা বললেন, এই যে নাটকটা দেখলে, এর নায়ক কে? এর প্রধান উপাদানটা কী? কী নিয়ে নাটকটা গড়ে উঠেছে? বললাম, একটি নিহত ছেলে হচ্ছে নায়ক।

জপেনদা অল্পতেই চটে ওঠেন। ভেঙিয়ে বলে উঠলেন, ছেলেটা কাটা সৈনিক। কথা কওয়ার বাইরে চলে গেছে। সে নায়ক হবে কী করে? ডায়ালগটা বলবে কী করে কচুপোড়া? নায়ক হচ্ছে ওই জনতা, ওই সব মুটেমজুর। আর নাটকটার মূল উপাদান হচ্ছে ঘৃণা। ঘৃণার নাটক অভিনীত হতে দেখলি। শালা একটা পানের দোকানও খোলা নেই?—একনাগাড়ে অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে থামলেন।

মানে দুই রকম ঘৃণার প্রকাশ দেখলি, বলে চললেন জপেনদা, ব্রিটিশ-খুনের দল আমাদের ঘৃণা করে, তাই মেরে গেল ওই ছেলেটাকে। আর আমরা ঘৃণা করি ব্রিটিশ খুনিদের, তার প্রকাশ ওই মুটে-মজুরের দঙ্গলে। মাঝখানে ওই মৃতদেহটি একটি মূর্ত স্বাক্ষর, একটি টোটেম, এই বিবদমান ঘৃণাদ্বয়েব উপলব্ধি। সব নাটকই মূলত এই। দুই শ্রেণীর সংঘর্ষ বা দুই জাতিব সংঘর্ষ হচ্ছে বাস্তব স্থূল ঘটনা। নাট্যকাব কী কবেন? তিনি ওই সংঘর্ষের পেছনে যে তীব্র ঘৃণা কাজ করছে, অর্থাৎ দুই পক্ষেব মনেব মধ্যে যে বিষ জমা হচ্ছে, সেটাকে আশ্রয় কবেন। তিনি তারপব একটা পক্ষ নেন। তারপর তাঁর নির্বাচিত পক্ষের বিষকে জমজমাট কবে কথার মধ্যে ছড়াতে থাকেন।

আমি আর সইতে পারলাম না। বলে উঠলাম সব নাট্যকার পক্ষ নেন না। দুই যুদ্ধরত শ্রেণী থেকেই দূবে থেকে নিঃস্পৃহভাবে সংঘর্ষটাকে বিশ্লেষণ করেন।

বিশ্লেষণ!—চেঁচিয়ে উঠলেন জপেনদা। বিশ্লেষণ মানে? নাট্যকার কি ডাক্তার নাকি? না অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ? বিশ্লেষণ করবে কী কবে? কেন করতে যাবে? একটা প্রবল আবেগেব শিখরে থাকতে থাকতে সে নাটক লেখে, তবে সেটা উতরোয, তবে সেটা লোকের মনে বেখাপাত করে। নইলে বার্নার্ড শ-এর 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান'-এর সঙ্গে শেক্‌স্‌পিয়াবের 'হ্যামলেট'-এর পার্থক্য থাকত না। একটা হচ্ছে সার্জনের ছুরি-চালনা, শব-ব্যবচ্ছেদ , দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ নাটক। ক্ল্যাসিক।

এই বলে জপেনদা বসে পড়লেন এক রোযাকে। সে বোযাক যে-চায়ের দোকানের, সে-দোকানটির সব দরজা বন্ধ দেখেই বোধ হয় তাঁর এই পতন।

আমি গাঁই-গুঁই কবে জানালাম, 'হ্যামলেট'-নাটকে কী যে ঘৃণার সংঘর্ষ আপনি দেখলেন আমি বুঝলাম না। শেক্‌স্‌পিয়ারই বা কোন পক্ষ গ্রহণ করলেন তাও আমার মাথায় ঢুকছে না।

মোটা মাথায় ঢুকবে কেন?—বললেন জপেনদা—'হ্যামলেট' নাটকে দুই শ্রেণী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, এটা দেখতে না পেলে চশমা নে। শেক্‌স্‌পিয়ারের যুগের শ্রেণী-সংগ্রামের চেহারাটা বোঝ। কতিপয় সাহেব পণ্ডিত কী বলেছেন সেটাকে গাড়লের মতন না আউড়ে, নাটকটা পড়। বার বার পড়। শেক্‌স্‌পিয়ারের যুগে ইংলন্ডে কোন শ্রেণী ছিল ক্ষমতায়?

বললাম, প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী।

জপেনদা বীভৎসভাবে ভেঙিয়ে উঠলেন, প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী! আরে উল্লুক, সেটা তো আজ বুঝছিস! ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু সেটা সে-যুগের সাধারণ মানুষ বুঝেছিল? না, নতুন মালিকদের রাহাজানিতে জমিজমা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে অভিশাপ দিচ্ছিল? ওরে, কার্ল মার্ক্‌স্‌ পড়্। 'ডাস কাপিটাল' পড়্। মার্ক্‌স্‌ বলছেন, ইংলন্ডে

পুঁজিবাদ এসেছিল সারা শরীরে নির্যাতিতের রক্ত মেখে দস্যুবৃত্তির তাণ্ডব নাচতে নাচতে। সুতরাং শেক্‌স্‌পিয়ারের চোখে এই নূতন শাসকরা ছিল অর্থগৃধ্নু ষড়যন্ত্রকারী, নীতিবোধবিবর্জিত দস্যুর দল। তাই জগৎ সম্বন্ধে হ্যামলেট বলেন :

'Tis an unweeded garden
That grows to seed , things rank and gross in nature
Possess it merely

এই rank and gross শাসকগোষ্ঠী শেক্‌স্‌পিয়ারের সব নাটকে আক্রমণের লক্ষ্য। হ্যামলেটের কাকা যেমন পকেটমার, 'Cutpurse of the empire', তেমনি অন্যান্য ভিলেইনরাও শুধু টাকাই চিনেছে—ইয়াগো, এডমন্ড, 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর ফ্রেডারিক, 'টেমপেস্ট'-এর আন্তোনিও, ক্লোটেন। আর যেহেতু এরা নাটকে স্পষ্টতই ভিলেইন, আর হ্যামলেট লিয়ারবা নায়ক, তাই তোর মতন গাধা ছাড়া আর কে বলবে শেক্‌স্‌পিয়ার পক্ষ নেন নি? শেক্‌স্‌পিয়ার হ্যামলেটের পক্ষে, না লম্পট ক্লডিয়াসের পক্ষে, এটা বুঝতে অসুবিধেটা কোথায়?

আমি বললাম, পক্ষ না হয় নিলেন, কিন্তু ওই যে দুই শ্রেণীর পারস্পরিক ঘৃণা এসে জমাট বাঁধে নাটকে—আপনি বলেছেন এ কথা—সেটা 'হ্যামলেট'-এ কী প্রকারে ঘটছে?

জপেনদা পকেট থেকে শসা বার করে খেতে শুরু করেছিলেন। এবার বললেন, 'হ্যামলেট' যে একটা আস্ত যুগের প্রতিবাদ এটা বুঝতে হলে লেনিন পড়তে হয়।

আমি হেসে ওড়াবার চেষ্টা করি—'হ্যামলেট' বুঝতে হলে লেনিন পড়তে হবে?

অবশ্য—বললেন জপেনদা—তলস্তয় সম্পর্কে লেনিন যা বলেছেন তা পড়া দরকার। অবশ্য যাদের এলেম আছে তারাই পড়ে বুঝবে, তোর মতন গোমুখ্যু নাও বুঝতে পারে। লেনিন বলছেন, উঠতি পুঁজিবাদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় অর্থলোভের প্রতি তীব্র ঘৃণায় এবং অতীতের কাল্পনিক রামরাজ্যের সুখস্বপ্নে। হ্যামলেট তাই মৃত পিতার আমলের ধ্যানে মশগুল। বর্তমানকে অসহ্য মনে হওয়ায় অতীতকে আঁকড়ালেন হ্যামলেট। তেমনি 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর নির্বাসিত ডিউক এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ চললেন ফিরে সেই অতীতের অরণ্য আশ্রয়ে, সেখানে তাঁরা সুখী জীবন যাপন করলেন—as they did in the golden world. এ কথাগুলো প্রথম দৃশ্যেই রয়েছে। তেমনি প্রোসপেরোর বনবাস। স্বর্ণযুগ—যখন টাকার লোভ মানবসমাজে হানাহানি আনেনি। তেমনি বেলারিউসের গুহায় গমন। 'হ্যামলেট'ও এমনি একটা আস্ত শ্রেণীর প্রতিবাদ, নির্মম আপোশহীন যুদ্ধঘোষণা।

আমি ব্যঙ্গের সুরে বলতে যাচ্ছিলাম—কমরেড হ্যামলেট—কিন্তু জপেনদা হ্যামলেটেরই কথা আবৃত্তি করে উঠলেন—

O from this time forth
my thoughts be bloody, or be nothing worth.

নির্মম রক্তাক্ত যুদ্ধে আহ্বান—বললেন জপেনদা, শসা চিবোতে চিবোতে—একদিকে ক্লডিয়াস পোলোনিয়াসরা, অন্যদিকে নির্বাক এক আস্ত সমাজের বিহ্বল প্রতিনিধি হ্যামলেট। এই দুয়ের ক্ষমাহীন ঘৃণার সংঘাত। আর ওই যে দেখে এলি ছেলেটার মৃতদেহ, সমাজবিপ্লবের মহাপূজার বলি, তেমনি 'হ্যামলেট' নাটকের ওফিলিয়া। দুই পক্ষের bloody thoughts-এর

কেন্দ্রস্থলে জলে ডোবা ওফিলিযাব শান্ত শবদেহ। তেমনি 'কিং লিয়াব' নাটকে, একদিকে বিগ্যান-গনেবিল পাপচক্র, অন্যদিকে কর্ডেলিয়াব জেহাদিবা, মাঝখানে মৃত না হযেও যিনি জীবন্মৃত সেই লিযাব নিজে। ওই নাটকেই সমান্তবাল অন্য কাহিনীটিতে একদিকে এডগাব অন্যদিকে এডমন্ড—মাঝখানে অন্ধ ও পঙ্গু পিতা গ্লস্টাব। ম্যাকবেথ ও ম্যাকডাফদেব মাঝখানে আত্মঘাতিনী লেডি ম্যাকবেথেব শবদেহটা স্মবণ কব—যদি অবশ্য নাটকটা পড়ে থাকিস আদৌ। ওথেলো আব ইয়াগোব সংঘর্ষেব মাঝখানে ডেসডেমোনাও এক বিধ্বস্ত সাক্ষী। ওয়াছেল মোল্লাব দোকানেব সামনে তাহলে তুই কী দেখে এলি বুঝতে পাবছিস? মহানাটকেব মূল উপাদান।

এই সময়ে এসপ্ল্যানেডেব দিক থেকে ধেযে এল একটা ট্রাক। তাব ওপব দাঁড়িযে নির্লজ্জ কিছু ব্রিটিশ সৈন্য এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। জপেনদা শসা ফেলে গলিব মধ্যে দৌড় মাবলেন, পেছনে আমি। দিগ্‌ভ্রান্ত হযে আমবা এসে থামলাম লিন্ডসে স্ট্রীট ধবে চৌবংগিব মোড়ে। সেখানে আব এগুনো যায় না, পার্ক স্ট্রীটেব মোড়ে ছাত্রদেব মিছিল দাঁড়িযে আব এসপ্ল্যানেডে টমিবা। সেই ভযাবহ নো-ম্যান্‌স্‌-ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে জপেনদা বললেন—এই সব বিশাল কাণ্ডকাবখানাব চাবণ-কবি কই? এই bloody thoughts-এব ওযালট হুইটম্যান কোথায?

আমি বললাম—সুভাষ মুখোপাধ্যায, সুকান্ত ভট্টাচার্য। কমবেড আজ নবযুগ আনবে না?—তাবপব বললাম—বসন্ত কী আর্য আহা, এসপ্লানেডে আশ্চর্য জনতা।

জপেনদা দুই বিপ্লবী কবিব উদ্দেশে হঠাৎ নমস্কাব কবলেন আকাশেব দিকে চেযে। তাবপব বললেন—চাবণকবি কথাটা ভুল বলেছি, বলতে চাইছিলাম নাট্যকাব। নাটককে কেন এই ভাঙাগড়াব আদিম খেলায় লজ্জিত হযে থাকতে হয? এবভিন পিসকাটব—তাঁব নাম তুই শুনিসনি, আমি জানি—বিশ্বজযী সেই নাট্যাচার্য—প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব বণাঙ্গনেব গুলিবর্ষণেব মাঝে তিনি যে অভিনেতা, এ কথা বলতে লজ্জা পেযেছিলেন। তাই তাঁবা জর্মনিতে গড়ে তুললেন বিপ্লবী নাট্যশালা। আব এখানে? তোব মতন গোমুখ্যুরা থিযেটাব কবে। কিছু বোঝেই না, মার্ক্সবাদ পড়ে না, চাবদিক চেয়ে দেখে না, গেট আউট।

এতে আমি বড়ো অপমানিত বোধ কবলাম। বললাম, নাটক হচ্ছে। জপেনদা বললেন—কচু হচ্ছে। মোটা দাগেব গপ্পো হচ্ছে। এই সংঘর্ষেব স্থূল শাবীবিক দিকটা মঞ্চে তুলে দিযে তোবা ভাবছিস কি হনু বে? তুই মাও ৎসে-তুং পড়িস?

সেই ১৯৪৫ সালে মাও পড়া ছিল দুঃসাধ্য। তবু বললাম, কিছু-কিছু। জপেনদা বলে চলেন—নূতন পৃথিবীব বিশ্বকর্মা মাও ৎসে-তুং তোদেব মতন গোবুদেব মানুষ কবাব কত চেষ্টা কবলেন। ইয়েনান-ভাষণে তিনি বলেছিলেন, নাট্যবচনাব উপাদান নে আজকেব সংঘর্ষ থেকে, কিন্তু লেখাব সমযে দৃষ্টান্ত ধব প্রাচীন ক্ল্যাসিককে। তাব মানে কী দাঁড়ায়? শুধুই যে এক ইংবেজ চবিত্র আব এক বাঙালি চাষিকে এস্টেজে তুলে দিযে মাবামাবি দেখাবি, তা তো নয। তোদেব নাটকে কী থাকে? প্রথমে এক সাহেব বা এক জমিদাব—চাবুক দিযে বেধড়ক প্যাঁদায় একদল চাষিকে। তাবা বৃন্দাবন দেখে, শুয়ে পড়ে, আব চেঁচায়, হ্যাদে, এককালে ছ্যালো ঘবে ঘবে ধান আব আজ সব নে গেছে জমিদাব। তাবপব আসে কমিউনিস্ট—সকল গুণেব আধাব সে সুশীল

বালক, সকল পাঠ মন দিয়া পড়ে। তার না আছে কোনো দ্বিধা, না কোনো দুর্বলতা, না কোনো দ্বন্দ্ব। এহেন এক নিষ্পাপ সন্ন্যাসী এসে চাষিদের বোঝায়, আর বুঝেই তারা গিয়ে জমিদারকে পেটায়—যবনিকা—ইতি গণনাট্য সংঘস্য নবনাটকম্। এ হচ্ছে তোদের ফরমুলা এ। ফরমুলা বি, সি এবং ডি হচ্ছে ওই এর-ই নানা ভেরিয়েন্ট। কিন্তু মাও-এর কথাগুলো মন দিয়ে পড়লে বুঝতিস, এসব হচ্ছে পোস্টার-অ্যান্ড-স্লোগান স্টাইল, এতে বিপ্লবের ক্ষতি হয়, উপকার নয়। ক্লাসিককে দৃষ্টান্ত হিশেবে সামনে রাখলে দেখতিস, শেক্স্‌পিয়ার শুধু প্যাঁদানি ও প্রতি-প্যাঁদানির রিপোর্টারি করছেন না। তিনি কর্মকাণ্ডের অভিনয়ে দাঁড়িয়ে মনোজগতের অন্দরমহলে উঁকি দিচ্ছেন। Bloody deeds থেকে উনি bloody thoughts-এ যাচ্ছেন। সমাজবিপ্লবের টানাপোড়েনের মাঝে যুধ্যমান নায়কদের মানসক্ষেত্রেও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইতস্ততঃ। যে জন্য বলছিলাম, যে-নাটক আজ চৌরংগির ওপর দেখছিস, তার পেছনে ঘৃণার মনোজগৎটা যদি না দেখতে পাস, দুই ঘৃণার দ্বন্দ্ব যদি না দেখতে পাস, তবে যা, 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার হ', নাটক করিস নে।

আমিও এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললাম, এই লড়াইয়ে ওসব মনোজগতের ভাববাদী তত্ত্বকথার কোনো স্থান নেই।

ধেত্তেরিঃ—ধমকে উঠলেন জপেনদা—ভাববাদী আবার কী? লড়াইটা বাদ দেওযার কথা কোন হারামজাদা বলেছে? লড়াইটাই বিষয়বস্তু। সেটাই পটভূমিকা। বলি, সেখানেই ঘানির বলদের মতন ঘুরলে চলে না, তার পেছনে যে দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্বের মানসিক জগৎ—সে পর্যন্ত গিয়ে তবে থামতে হবে। কবি মাও ৎসে-তুং লং মার্চের মাঝখানে লেখেন—

একটু পরে পুবের আকাশে ফেটে পড়বে ভোর,
বোলো না তখুনি শুরু হবে পথ-চলা,
যদিও সবুজ পাহাড়ের কোলে ঘুরেছি অনেক
তবু বৃদ্ধ হইনি এখনো,
আর এই নিসর্গের তুলনা কোথায়?

এর অর্থ কী? বিপ্লবের মহানায়ক মাও ৎসে-তুং ভোরবেলা হুইচাং ছেড়ে যেতে চাইছেন না, হঠাৎ সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাঁর মন। এতে কি তাঁর বিপ্লবী প্রতিজ্ঞায় ভাটা পড়ে? বল্। জবাব দে!

না, তা কেন—আমি বললাম—এতে দেখা যাচ্ছে, দুর্ধর্ষ যোদ্ধাও হঠাৎ একটা অজানা ফুলের দর্শনে কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে পড়তে পারেন।

এবং এতে তাঁর মানবিকতাই বেশি প্রকট হয়!—চেঁচালেন জপেনদা—বিপ্লবী তো যন্ত্র নয়, দানব নয়, দেবতা নয়, মানুষ। গভীরতম মানবপ্রেমে সে ডুবে আছে। এবং মানুষ বলেই হঠাৎ হুইচাং-এর পাহাড়ের কোলে সে বিশ্রাম চায়। যদিচ আমরা জানি, পরমুহূর্তে সে রাইফেলটি কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে কোয়াংতুং-এর দিকে। তবু ওই মুহূর্তটিও সত্য, ওই ক্ষণিকের বিহ্বলতাটাই মানুষ মাও ৎসে-তুংকে নিয়ে এল আমাদের খুব কাছাকাছি। সর্বহারার নেতারা অতিমানব নন, তাঁরা স্নেহ-প্রেম মায়া-মমতা সম্বলিত আমাদের পাশের

বস্তির মানুষ। ওঁরা হিটলার নন।

আমাকে দমে যেতে দেখে জপেনদা সোৎসাহে বলে চলেন—সুভাষ মুখুজ্যে তো পড়িস শুনলাম। শোন, সুভাষ লিখছে—

মন থেকে আজ মিতালি উধাও
শরীর সে উপনিবেশ নিলো,
জটিল স্মৃতির পায়ে পায়ে তবু
হারানো প্রেমের ছায়ারা ঘোরে।
আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি—

যারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব করে, তারাই জানে এই ত্রিশঙ্কুর দোদুল্যমানতা কখনো না কখনো আসবেই. ভয হবে, হত্যা করতে গিয়ে এক মুহূর্ত বোমাচাপা হাতটা ভিজে উঠবেই। এ কথা শেক্‌স্‌পিয়ার জানতেন, তাই ব্রুটাসের দোদুল্যমানতা ও নীতিগত সংশয় দখল করে রেখেছে আস্ত নাটককে। সেই সংশয়ের সঙ্গে আমাদেব সুভাষ মুখ্যুজ্যেও পবিচিত। হাবানো প্রেমগুলো এসে তাকে পিছু টানে। পেট থেকে যদি সবাই লেনিন হযে পড়ত , তবে আর চিন্তা ছিল কি? অমন হয় না। কিন্তু তোদের ওই অসহ্য নাটকগুলোর কমিউনিস্টরা একেকজন লেনিনের পিতা-বিশেষ। শালাদের কি কোনো মানবিক বৃত্তি থাকতে নেই? কোনো দুর্বলতা থাকতে নেই? ভয়-সংশয তো দূরের কথা, তাদের কি সর্দি-কাশিও হয় না? বস্তিতে থাকতে থাকতে যক্ষ্মাও কি ধরে না? তাহলেও তো স্টেজের ওপর তার চলাফেরা কথাবার্তায খানিকটা জ্যান্তো মনে হত। এইসব খড়ের পুতুলগুলোকে কেন তৈবি করিস? এবা বিপ্লবেব ক্ষতি কবে বুঝিস না?

ক্ষতি কী করে করে?—শুধোলাম বিস্ময়ের ভান করে।

ওই দেবতাদের দেখে চাষি-মজুব কী ভাবে?—পালটা শুধোলেন জপেনদা—ভাবে, আমি এ-জন্মে অমন হইতে পারবো নি বাপু! ই কি রে ভাই? ই তো দেখি পরমপুরুষ, অবতাব। এ বউরে ঠেঙায নে , বাপের সোংগে ঝগডা কবে নে, খেতে দিতে না পেবে পিটিয়ে বালবাচ্চাগুলোনরে চুপ কইরে বাখেনে। এই যদি বিপ্লবী হয, তয় আমি বিপ্লবী হইতে পারবোনি। বিপ্লবী হওযা মোব পক্ষে সম্ভবই নয! বুঝলি, বেকুব? এ-সমাজের সাধাবণ মানুষ মহাবীর, যোদ্ধা, নির্ভীক। কিন্তু ব্যক্তিগত বহু বহু দুর্বলতায় তারা আচ্ছন্ন। তাদের গিযে যদি বলিস, বিপ্লবী হতে গেলে আগে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে হবে, তবে তারা এগিয়ে আসবে না। আর একথা ডাহা মিথ্যে যে বিপ্লবী হতে গেলে আগে রামকৃষ্ণ মিশনেব স্বামীজি হতে হয়। বিশেষত পরাধীন এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা বিপ্লবী সৈনিক হবেন তাঁদের সকলকে যে কমিউনিস্ট হতে হবে তারও কোনো মানে নেই। তিনি দেশপ্রেমিক কিনা. এবং সাম্রাজ্যবাদকে তিনি তীব্র ভাবে ঘৃণা করেন কিনা—এদুটোই একমাত্র মাপকাঠি।

আমি বাধা দিতে গেলাম। জপেনদা খিঁচিয়ে উঠে বললেন—আরো আছে, শোন্। এ সমাজব্যবস্থায় সর্বাঙ্গসুন্দব মানুষ আজও তৈরি হতে পারে কি? যদি পারে, তবে মার্ক্‌স্‌বাদ ভুল। তোরা যে সকল গুণের আধাব নির্লোভ বীর কমিউনিস্টদের নাটকে দেখাস, তা এই সমাজব্যবস্থার ভুল চিত্র উপস্থিত করছে। তা পরোক্ষে এই ঔপনিবেশিক পরাধীন সমাজকে

সার্টিফিকেট দিচ্ছে।

আমি বললাম—তাহলে সর্বহারা বিপ্লবী নায়ককে কীভাবে দেখাব? জপেনদা বললেন—এর চেয়ে সীতা কাব বাপ জিগ্যেস কব না। মাও যা বলেছেন তা থেকে বুঝলি না হাঁদারাম? ক্ল্যাসিক থেকে শেখ্। সর্বহারা নায়ক হবে আজকের হ্যামলেট। সে একাধাবে জটিল ও সরল। বহু ব্যক্তিগত দুর্বলতায় সে জটিল, আর শ্রেণীশত্রুর প্রতি আপোশহীন ঘৃণায় সে সবল, ঋজু, নিঃসংশয়। এটা করতে গেলে বিপ্লবের মনস্তত্ত্বে ঢুকতে হয়। ঘৃণার জোয়ার-ভাটা, আলোছায়া বুঝতে হয়। হুইচাং পাহাড়ের শোভায় বিচলিত মনটার স্পর্শকাতরতা পরিমাপ করতে হয়। হারানো প্রেম কেন হাতছানি দেয় সেটা সমবেদনা নিয়ে বুঝতে হয়। তীব্র ঘৃণা আর বিশাল ভালোবাসা একই সঙ্গে কী করে বিপ্লবী চেতনায় বাস কবে আর পরস্পরের ওপর প্রভাব ছড়ায়, এটা বুঝতে হবে। তবে সৃষ্টি হবে সত্যিকাবেব পূর্ণাঙ্গ পাশের ঘবের সেই লোকটি যে হঠাৎ হয়ে ওঠে মহাবীব যোদ্ধা, শহিদ, নবযুগেব দৌবারিক। একে মঞ্চে দেখে আমাদের শ্রমিক কৃষক দর্শক একে ভালোবাসবে, এর সঙ্গে একাত্ম হবে। দেবতাদের দূর থেকে নমস্কাব করেই মানুষ সরে পড়ে, কারণ তাঁদের সঙ্গে আড্ডা মাবা যায় না কখনো। তাঁরা নিষ্পাপ তাই অগম্য। কিন্তু নানা জটিলতায় ভাস্বর নায়ক দর্শকদের আত্মোপলব্ধিব দর্পণ। যেমন হ্যামলেট সেযুগেব বিদ্রোহী মানবমনের দর্পণ, কারণ সে bloody thoughts-এ উপনীত হবার পথে to be or not to be-র অসহনীয় সংশয় পার হয়ে এসেছিল। শিলার-এর বিদ্রোহী কৃষ্ণকায় দস্যু যেমন নিজেব অক্ষমতায় চিৎকার করে ওঠে—'ভো ইস্ট মাইনে মানহাইট?' কোথায় আমার পৌবুষ? বা বস্তাঁ-র 'সিবানো' নাটক পড়েছিস? চিরবিদ্রোহী তলোয়াবেব কবি সিবানোব মৃত্যুপূর্ব উক্তি ·

'দ্যাঁ কু দে-পে
ফ্রাপে পীব এ্যান্ এরো, ভঁবে লা পোঁয়াৎ ও ক্যর।'—

'আমাকে মরতে দাও কোনো বীবেব তরবাবির আঘাতে, হৃৎপিণ্ডে ইস্পাতফলা আব ওষ্ঠাধরে হাসি নিয়ে—একদিন এ কথা বলেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যের পবিহাস—আমি চোরা আক্রমণে ধবাশায়ী, পেছন থেকে আহত , আমাব যুদ্ধক্ষেত্র এক নোংবা গলি, আমাব মহান প্রতিদ্বন্দ্বী এক ভাড়াটে গুণ্ডা, হাতে তার কাষ্ঠখণ্ড। বেশ হয়েছে! এ জীবনে কিছুই হল না, যুৎসই একটা মৃত্যুও নয়—জোবেই তু মাঁকে, মেম্ মা মর্ত্!' এতে সিরানোব মহিমা কমে না, ববং মৃত্যুঞ্জয়ী চিরবিদ্রোহীর শেষ অট্টহাসিতে মৃত্যু যেন পিছু হটে যায়। আজ ওয়াছেল মোল্লার দোকানের সামনে হাত বাঁধা অবস্থায সিরানো দ্য বের্জেরাককে আবার শুযে থাকতে দেখলাম। সেও কতদিন ভেবেছিল ব্যাবিকেডে মরবে, সুকান্তর কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অথবা জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্রব গান গাইতে গাইতে। ওপবে পত পত কবে উডবে একটি অমলিন লাল নিশান। সে ভাবেনি তাকে তস্করের ন্যায় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় মাথার পেছনে গুলি খেতে হবে। সে এমন এক কদর্য মানবতাবর্জিত ঘৃণার বলি, যে ঘৃণা তাকে যুৎসই একটা মৃত্যুর সম্মানও দিতে নারাজ। শাসকশ্রেণীর ভাড়াটে গুণ্ডা আবার পেছন থেকে আঘাত করেছে সিরানোকে, শুধু এখানে কোনো রস্তাঁ নেই যে তার হাসিটা ধরে রাখে।

এই হচ্ছে জপেনদার সঙ্গে তর্ক করার ঝামেলা। আগড়ম-বাগড়ম ফরাসি-জর্মন-লাতিনের এমন তোড় ছোটান যে কিছুই বোঝা যায় না। এই সময়ে আমরা দেখলাম, পার্ক স্ট্রীটের মোড় থেকে ছেলেরা এগুচ্ছে—হাতে ইয়া ইয়া থান ইট তো আছেই। কতকগুলি বাজারের থলি দেখে বুঝলাম আনারস আদি নানাবিধ বিস্ফোরকেও তারা সুসজ্জিত। সুতরাং আমরা আবার উদ্বাস্তু হলাম। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধরে দক্ষিণদিকে পা চালাতে চালাতে আমি বললাম—দেখলেন তো? অপরিপক্ক সব ছোকরা, বড়ো জোর কলেজে উঠছে। এর মধ্যেই বোমা নিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়। এদের নাটকের নায়ক বানাতে হবে? এরা উগ্রপন্থী, বিপ্লবে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। হ্যামলেট কোথায়? চরমপন্থী সব এজেন্ট প্রোভোকাটুর।

জপেনদা অলস কণ্ঠে বললেন—সেটা বাজনীতির বিশ্লেষণ। নাটক বা কাব্য ওপথে চলে না।

—মানে?

—রাজনীতিবিদরা যখন বসে হিশেব কবেন তখন ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং আর সূর্য সেনের কার্যকলাপে কত যে ভুল পান তার সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু জনতা ঠিক ওদের নিয়েই গান বাঁধে, সে গান ছড়িয়ে যায় দেশের প্রান্তে প্রান্তে। রাজনীতির অচলায়তনে যাবা উত্তর দিকেব জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করে তাদের যতই প্রায়শ্চিত্ত করাই না কেন, জনতা ওদের বলে, ভুল করে করে সত্যকে জানবাব অধিকাব তোমাদের দিলাম। সুভাষচন্দ্রের কত শ্রাদ্ধ কবলি কত জনে, কিন্তু যেই তিনি রাইফেল হাতে নিলেন, অমনি তিনি জনতার অন্তরে বাসা বেঁধে বসলেন জন্মের মতন। জনতার চোখে সশস্ত্র বিদ্রোহীই বরণীয়। আর নির্ভুল ওই নিয়মতান্ত্রিক শান্তিবাদীরা জীবনে কখনো পেল না জনতার প্রণাম। আমেরিকার মানুষ গান বেঁধেছে সশস্ত্র বিদ্রোহী ডালটন ভ্রাতাদের সম্পর্কে, বিলি দ্য কিড্‌কে নিয়ে, জেসি জেম্‌স্‌কে নিয়ে, জন ব্রাউনকে নিয়ে আর সরকারি ঢাক পেটালেও শান্তির দূতদের গলাধঃকরণ করেনি ওখানকার জনতা। মেকসিকোর লোকগাথায শুনি ভিলা আর জাপাটার নাম, কিন্তু কে কবে শুনেছে আধুনিক মেকসিকোর স্রষ্টা রাষ্ট্রপতি মাদেরোকে নিয়ে গান গাইছে মেকসিকোর কৃষক? আয়ার্ল্যান্ডে গ্রিফিথ, কলিনস্‌, ম্যাকসুইনি, ডি ভ্যালেরাকে নিয়ে গান আছে, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের স্রষ্টা টমাস পার্নেলেব নাম নেই। রুশ লোকসংগীতে প্রবেশ করেছে বেপরোয়া সেই নিহিলিস্ট উগ্রপন্থীরা, তারপর ক্রমে এসেছেন লেনিন, স্তালিন আর বুদিয়েনি, কিন্তু ১৯১৭ সালের পার্লামেন্টের মহাতার্কিকদের নাম কি জনতা মনে রেখেছে? আজ মাও ৎসে-তুং-এর নাম গিয়ে যুক্ত হয়েছে চীনা লোকসংগীতে কারণ তিনি সশস্ত্র যোদ্ধৃদলের নেতা। এদেশেও ঠিক তাই। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের নেতারা সুপ্রতিষ্ঠিত গণসংগীতে। বিহারে বিয়ের গানেও এসে গেছেন গেরিলাযুদ্ধের অজেয় নায়ক বাবু কুমাব সিং। মধ্যভারতে লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া গান নেই, মহারাষ্ট্রে নেই ছত্রপতি শিবাজীর জয়ধ্বনি ছাড়া গান। সাঁওতালদের গানে আছেন কানু আর সিধু। ওরাওঁদের গানে ছোটনাগপুরের যুদ্ধের শহিদরা। মুণ্ডাদের ধর্মীয় গানও সশস্ত্র শহিদ বির্সা মুণ্ডাকে ঘিরে। আর আজ বাংলায় ক্ষুদিরামের ফাঁসি গাইছে কৃষক, ক্ষেতে লাঙল দিতে দিতে। আজাদ হিন্দ ফৌজের গান ছডিয়ে যাচ্ছে সারা ভারতে। অথচ গান্ধীবাবাকে দাঁড়

করাতে ব্রিটিশরাও হাত লাগাল, কিছুতেই কিছু হবার নয়—ওই অহিংসাকে নিয়ে গান রচিত হয়নি, অর্থাৎ লোককবিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচনা করেননি, গুজরাটেও না। তোরাই বা কোথায়? কত চেচাঁলি লীগ কংগ্রেস ঐক্য জিন্দাবাদ! কত 'গণ-আন্দোলন' করলি! চটকল আর সূতাকল শ্রমিকদের কত ধর্মঘট সংগঠিত করলি, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে গেলি। গণদেবতার আসন টললো না। কিন্তু যে-মুহূর্তে শোলাপুরে রাইফেলের মুখে ঘোষণা পাঠালি, স্বাধীনতা চাই, মহারাষ্ট্র জুড়ে শহিদদের নিয়ে গান বাঁধা হতে লাগল মুখে মুখে। শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনে জনতার দেহ আসে, মন আসে না। গুলির শব্দে, বোমা ফাটার গর্জনে সে মন নেচে ওঠে।

আমি বিষম ভাবিত হয়ে পড়েছি দেখে জপেনদা মৃদু হেসে বলে চললেন—এটা কেন হয়? কারণ জনতা মূলত যোদ্ধা। ভারতের মতন তথাকথিত শান্তিপূর্ণ দেশের গ্রামাঞ্চলে যা, দেখবি নিহত যোদ্ধাদের মাজারে ফুল দিচ্ছে, চিরাগ জ্বেলে দিচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে। গুজরাটে যা, দেখবি প্রতি গ্রামে পাথর পুঁতে পুঁতে গ্রামবাসীরা স্মরণ করছে সে-গ্রামের দামাল ছেলেদের, যারা যুদ্ধে গেছে কিন্তু আর ফিরবে না। পাঞ্জাবের প্রতি পরিবারে অন্তত একজন সৈনিক না হলে বাপ-মা গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারেন না। আবার চলে আয় পূর্বপ্রান্তে মুর্শিদাবাদে, পলাশীতে দেখবি বীরপূজা কাকে বলে—দীপান্বিতাকৃত শহিদের কবর দেখে আয়, যা। গান্ধীবাবার সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এ-দেশকে নপুংসক, অহিংস করে রাখতে, জনতাকে তার সংগ্রামী অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে, তার পূর্বপুরুষের বীরত্ব ভুলে গিয়ে ছাগলের দুধ খেয়ে নিরামিষাশী হতে। গান্ধীর মাদক দ্রব্য বর্জনের ওকালতিটাও ব্রিটিশেরই স্বার্থে। কোনো উত্তেজনা নয়—উদ্দীপনা নয়—ঘাস খাওয়া অহিংস গোবুর মতন ব্রিটিশের বীফের কারখানায় লাইন বেঁধে ঢোকো। কিন্তু ওরা পারবে কী করে? এ দেশে বাস করে শিখ, রাজপুত, ডোগরা, গড়োয়ালি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, পুরবিয়া, সাঁওতাল, নাগার দল ; এখানে বাস করে বোমারু বাঙালি ; এখানে জনতার বিরাট এক অংশ মুসলিম—যাঁদের কাছে ন্যায়যুদ্ধ বা জেহাদ হল ধর্মের উপাদান। তাই ক্ষুদিরামরাই ওদের আরাধ্য হয়ে রইলেন। আর ব্রিটিশ ক্যামেরায় লক্ষ ফোটো উঠলেও, বিবলবাস মহাত্মাটি হেঁটে বেড়াচ্ছেন গণচেতনার বারান্দায়, অন্দরে প্রবেশ নিষেধ। অথচ শালাদের প্রচারের নমুনাটা দেখ! যেসব জাতি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর চেয়ে মরাই ধর্ম মনে করে, তাদের সারা দুনিয়ায় শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী, মানে ছাগলের-দুধ খাওয়া ভারতবাসী বলে ঢাক পেটাচ্ছে। তাই বলি—যদি সত্যিই ভারতবাসীর মনে আগুন ধরাতে চাস, যদি সত্যিই তাদের কাছের লোক হতে চাস, তবে নাটকে নায়ক কর এমন বীরদের যাদের হাতে আছে আগ্নেয়াস্ত্র। রাজনীতির বিচারে ওই ছেলেগুলো ভ্রান্ত হতে পারে কিন্তু গণনাট্যের বিচারে ওরাই নায়ক। দেখ, পার্লামেন্টের সদস্যকে নিয়ে নাটক হয় না, বা জনসভায় যাঁরা যুক্তিগ্রাহ্য বক্তিমে করেন তাঁদের নিয়ে গান বাঁধা যায় না। নাটক সৃষ্টি হয় সশস্ত্র বিদ্রোহীর প্রতি পদক্ষেপে। এটা আমি মানি, তোদের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিই সঠিক। কিন্তু সে রাজনীতি যদি সত্যই প্রচার করতে চাস তবে ওই ভ্রান্ত বেপরোয়া ছেলেগুলোর জবানিতে কর, সূর্য সেনের আর সুভাষ বোসের জবানিতে কর—লোকে শুনবে।

মাপজোক করা বক্তৃতা যাঁর পেশা তিনি কস্মিনকালেও ঘৃণা জাগাতে পারবেন না। তাই বলছিলাম, ক্ল্যাসিক থেকে শেখ্, ধর্মতলায় যা দেখে এলি তা থেকে শেখ্—দুই বিজাতীয় ঘৃণার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আর মাঝে পড়ে থাকা বাচ্চা একটি ছেলের শবদেহ। ওটাই সব মহৎ নাট্যসৃষ্টির মূল কাঠামো।

এইভাবে হাঁটছি, আর জপেনদা কথা কইছেন। মাঝে একবার টিয়ারগ্যাসের জ্বালায় ছুটতেও হল খানিক, তবু জপেনদার কথায় ছেদ নেই।

বাবুই আর পৌষ

বলিষ্ঠ কালো দেহে ঘাম চকচক করছিল, আব বাতাসে উডছিল পোয না-মানা চুলগুলো। তাকে ঘিরে দাঁডিযেছিল প্রায় দুশো চাষি, হাতে তাদেব বল্লম, লাঠি, হাঁসুযা—আর অদূবে স্টেশনেব সামনে আব বেললাইনেব ওপরে সাব বেঁধে সি-আর-পির সশস্ত্র ক্রুদ্ধ দঙ্গল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না কবে অবাধ্য চুলগুলোকে আরেকবাব ব্যর্থ চপেটাঘাত কবে কৃষক যোদ্ধা বলে যাচ্ছিলেন—ওই যে দাঁড়িয়ে আছে বাবুই পাখিব দল, ক্ষেতেব পাক্না ধান খেতে এসেছে। উড়ে উড়ে ধান খায় আব পড়ে পড়ে রং চায়।

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়ল জনতা। আমিও কাষ্ঠহাসি হাসলাম খানিক, যদিও খুব ভালো বুঝতে পাবছিলাম না কথাগুলোব অর্থ। পাশে জপেনদাব দেখলাম ভাববিহ্বল অবস্থা ; হাতের শসা হাতেই রয়েছে, মুখটাও হাঁ হযে রযেছে লোভাতুব প্রতীক্ষায, কিন্তু মাঝে সম্মোহনের ব্যবধান, শসা মুখে পৌঁছয়নি। তিনি শুনছেন।

বক্তা বলে চলেছেন, বাবুইযেব কত রং বাহাব, এক বাবুই ধলিযা, আর এক বাবুই কালিয়া, আব এক বাবুই—শালাব কপালে তিলক।

আবাব বৃষ্টির ঝাপটার মতন হাসি, আর অদূরে সি-আব-পির মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য। আমার মধ্যে জাগল একটা প্রশ্ন, আচ্ছা, বাংলাই তো বলছে, সবাই বুঝছে, আমি বুঝি না কেন? জপেনদাব দিকে তাকাতে তিনি হাঁ বুঁজিয়ে মৃদুস্ববে বাংলা থেকে বাংলায় তর্জমা কবে দিলেন, ধলিয়া মানে ফর্সা, মানে জমিদাব। কালিয়া, মানে কালো, মানে ওই সেপাইযের দল। কপালে তিলক, মানে গাঁযেব পুরুতঠাকুর, শোযক।

এদিকে বক্তা বলছেন, আজ লাল ঝাণ্ডা ডাক দিযে বলে যাচ্ছে, বাধাব ক্ষেতে বাছুব পড়েছে। বলছে, একলা পুতেব বউ সাত ক্ষেত কেন বাখবে? ওই পুলিশকে কে জোগাচ্ছে পান তেলেব কড়ি?

আমার আবো গুলিযে যাচ্ছে, অথচ চাবিদ্দিকেব সবাই উপলব্ধিব স্তব বেয়ে এতক্ষণে ক্রোধে কম্পমান। আমি জপেনদাকে চাপা স্ববে বললাম, চলুন সরে যাই। ভাবগতিক ভালো নয়। আপনার পাল্লায় পড়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে কি বেঘোবে প্রাণটা খোয়াব?

প্রত্যক্ষ যুদ্ধবিগ্রহ থেকে সটকান দিতে জপেনদা আমাব চেযেও তৎপর। তিনি চলে এলেন আমার পিছু পিছু দীঘির ওধারে বটগাছতলায়। তারপব শসা চিবোতে চিবোতে বললেন, একে বলে মানুষের প্রাণেব কথা। প্রাণের কথাটা প্রাণের কবিতায় বলা। তোরা হলে এতক্ষণে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ', 'শ্রেণীচবিত্র' আব 'মাও ৎসে-তুং-এব চিন্তাধারা' নিয়ে এমন কুস্তি লাগাতিস যে সকলে হাই তুলত। শোন কী বলছে! একবাবও বলছে না, শ্রেণীশত্রু খতম কবো, বা বিপ্লব চাই। শোন্ তার বদলে কী বলছে—

শুনলাম বক্তা জলদগম্ভীর স্বরে বলছেন, আজ সকলকে বলতে হবে, পৌষ তুমি যেও না, জন্ম জন্ম ছেড়ো না, ভাতের হাঁড়িতে থেকো, পৌষ তুমি যেও না।

আর শুনলাম, জনতা আকাশ ফাটিয়ে লাল ঝাণ্ডার জয় ঘোষণা করছে।

জপেনদা বললেন, লোকটা নাট্যকার। ও নাটকের ভাষা আয়ত্ত করেছে। কার্তিক ব্রত আর পৌষ পার্বণের কাব্যকে সে তলোয়ারের মতন ব্যবহার করছে। সে দুরূহতম রাজনীতিকে লোকগীতির মতন রসালো করে বলছে। সে বাবুই আর পৌষকে চিত্রকল্প রূপে ব্যবহার করছে শ্রেণীশত্রু আর বিপ্লবকে প্রাঞ্জল করতে। নাটক যদি লিখতে চাস, ওর কাছ থেকে শেখ্। কাব্য ছাড়া নাটক হয় না।

শ্রেণীযুদ্ধ থেকে বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে এসকল তত্ত্বকথা আমার বরদাস্ত হয় না, কিন্তু জপেনদাকে তো চিনি, ছাড়ান পাওয়া যাবে না। তাই বললাম, কাব্যনাট্যের কথা বলছেন?

জপেনদা আকাশের দিকে চেয়ে খেদোক্তি করলেন, সারাটা জীবন আমার কেটে গেল গোরুদের আশে পাশে! আরে গোরু, কাব্যনাট্য কেন, সব নাটকের কথা বলছি। নাটকের কাব্যের কথা বলছি। সেদিন যে দেখতে নিয়ে গেলি তোদের রিহার্সাল—কী যেন প্লে টা?

আমি তখুনি প্রমাদ গুনেছি, কারণ মনে পড়ে গেছে সে রিহার্সালে জপেনদার বিকট স্বরে হাই তোলার কথা। রিহার্সাল শেষ হতে স্টেজ থেকে ঘাম মুছতে মুছতে নেমে এসে দেখি, জপেনদা ঘুমোচ্ছেন। জাগিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, ঘুমোচ্ছেন যে? রিহার্সাল দেখে মতামত দেবেন বলেছিলেন! জপেনদা চোখ রগড়ে বলেছিলেন, ঘুমোচ্ছি যে, সেটাই একটা মতামত নয়?

এখন আবার সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হচ্ছে দেখে আমি চাপা দেবার উপায় ভাবছি। কিন্তু পারা গেল না।

মনে পড়েছে—বললেন জপেনদা—'ভিজে মাটি'। মাইরি কী দেখালি সেদিন! কান খাড়া করে ছিলাম একটা চিত্তাকর্ষক উপমা, বা একটা নূতন শব্দবিন্যাস শোনা যায় কিনা। বৃথা! তোদের মতো থোড়-বড়ি-খাড়ার বিশেষজ্ঞের কাছে কিছু আশা করা ভুল হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী ব্যবহারে যেসব কথা সবচেয়ে মরমরে হয়ে গেছে সেইসব সাজিয়ে গেলি পাশাপাশি। তার চেয়ে নাটক না করে একজন মঞ্চে দাঁড়িয়ে রেডবুক পড়ে শোনালেই পারতিস।

আমার বেশ অপমান বোধ হল। বললাম আজকাল গৈরিশ ছন্দের হাট বসালে লোকে মারবে। বুঝতে পারবে না আর ইঁট ছুঁড়বে।

এখুনি যে বক্তৃতাটা শুনলি সেটা তো কবিতাই, বললেন জপেনদা—এবং লোকে বুঝে বেশ বাহবা দিলে। বুঝতে তো পারলি না তুই-ই। রামায়ণ-মহাভারতের দেশের মানুষ কাব্য বুঝবে না এ হেন গর্দভসুলভ উক্তি তুই ছাড়া করবে কে? অবশ্য শহরে এক ধরনের চেষ্টিত কাব্য আমদানি করার লক্ষণ দেখি, নানা নাটকের নামেই প্রকাশ . . . যথা কণ্ঠনালীতে সূর্য, বা মলাটের রং মুহূর্ত। এসবের অর্থ নাট্যকাররা নিজেরা বোঝেন কিনা আমরা সন্দেহ আছে। আমি বলছি লোকগাথার কথা, জনতার কাছের কাব্যের কথা।

আমি হন হন করে হাঁটা দিলাম একদিকে। পেছনে আসছে জপেনদা। দেখি একটা ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে লাল নিশান পুঁতে ফসল কাটছে চাষিরা, আর একজন মাদল বাজাচ্ছে ধিত্তা ধিতাং

ধিত্তা ধিতাং। হাঁটতে হাঁটতে আমি রাগতস্বরে বললাম, চেষ্টিত কাব্য আবার কী? ওই মলাটের রং মুহূর্ত হচ্ছে বিখ্যাত মার্কিন নাট্যকার এডওয়ার্ড অ্যালবি-র নাটকের অনুবাদ। আপনি পুরাতনপন্থী, তাই আজকের কাব্য বুঝবেন না। আজকে আর কষ্ট করে তিলোত্তমাকে আমদানি করে কাব্য ভাঁজতে হয় না ট্রামে-বাসে, বাড়ির বৈঠকখানায় যে কথা রোজ শুনি তাকেই আশ্রয় করে কাব্য সৃষ্টি হয়। বাস্তবই শ্রেষ্ঠ কাব্য। অ্যালবি, ইওনেস্কো, পিন্টার, বেকেটরা তাই করছেন। তাঁরা দৈনন্দিনকে কাব্যের স্তরে তুলছেন।

জপেনদা ক্ষণকাল নীরবে হাঁটলেন। তারপর বললেন, প্রথমত উচ্চারণটা অল্‌বি, অ্যালবি নয়।

সে যাই হোক! ঝাঁঝাঁলো গলায় আমি জবাব দিই।

দ্বিতীয়ত, বলে চলেন জপেনদা, অল্‌বি পিন্টাররা দৈনন্দিনকে কাব্যের স্তরে কোথায় কবে তুললেন?

পিন্টারের 'বার্থডে পার্টি' নাটক পড়েছেন?—আমি চেঁচিয়ে উঠি—ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা ফুটে উঠেছে স্রেফ ভাষার চাতুর্যে। [ফশ করে পকেট থেকে বইটা বার করে আমি মুখে মুখে তর্জমা করে শোনাতে থাকি]—

গোল্ডবার্গ বলছে ॥	বোসো।
স্ট্যানলি ॥	না।
গোল্ডবার্গ ॥	ম্যাক্‌ক্যান!
ম্যাকক্যান ॥	বলো, ন্যাট।
গোল্ডবার্গ ॥	ওকে বসতে বলো।
ম্যাকক্যান ॥	বলছি, ন্যাট। [স্ট্যানলিকে] বসতে আপনার আপত্তি আছে?
স্ট্যানলি ॥	হ্যাঁ, আছে।
ম্যাকক্যান ॥	তবু আমি বলি কি, বসলেই ভালো হত!
স্ট্যানলি ॥	আপনারা বসছেন না কেন?
ম্যাকক্যান ॥	না, আমি বসব না! আপনি বসুন।
স্ট্যানলি ॥	ধন্যবাদ, আমি বসব না।
ম্যাকক্যান ॥	ন্যাট!
গোল্ডবার্গ ॥	কী?
ম্যাকক্যান ॥	ও বসবে না।
গোল্ডবার্গ ॥	বসতে বল।
ম্যাকক্যান ॥	বলেছি।
গোল্ডবার্গ ॥	আবার বল।
ম্যাকক্যান ॥	বসুন।
স্ট্যানলি ॥	কেন?

আমি আরো খানিক চালাতাম, কিন্তু জপেনদা বাধা দিলেন। এসব কী হচ্ছে?—তাঁর গলায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে—এসব কী? উপবেশন নিয়ে আর কতক্ষণ চলবে?

প্রতি বাড়ির বৈঠকখানায় যা শোনা যায় রোজ, তাই ধরেছেন পিন্টার—আমি বললাম

কিন্তু তাকে কাব্যের স্তরে তুললেন কোথায়?—শুধোলেন জপেনদা। হাটে-বাজারে যা শোনা যায় তাকেই অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরলে কাব্য হবে কী করে? বাস্তব মানেই যে শিল্প তা তো নয়। বাস্তবের অনেকটাই ক্লান্তিকর, অপ্রয়োজনীয় অহেতুক। তাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে সারবস্তুটাকে মঞ্চে আনতে হয়। উপরন্তু নাট্যকার ফ্রীডরিশ হেবেল বলেন, অভিনয় হচ্ছে জীবনের তড়িৎগতি সংস্করণ। জীবনে যা ঘটতে দশ বছর লাগে, নাটকে সেটা তিন ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং 'বসুন' আর 'না, বসব না' নিয়ে পাতার পর পাতা যে লিখে চলে, বোঝাই যায় তার বলার বিশেষ কিছু নেই।

বলার কিছু নেই!—আমি যেন আৎকে উঠি—পিন্টারকে ছেড়ে দিন, আসুন ইওনেস্কোতে, 'গণ্ডার' নাটকে। শুনুন—

বেরোঁজের বলছে ॥	জীবন এক অস্বাভাবিক কাণ্ড।
জাঁ ॥	ঠিক উলটো। জীবনের চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু নেই, তার প্রমাণ হচ্ছে, মানুষ বেঁচে আছে।
বেরোঁজের ॥	জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মরা মানুষের সংখ্যা বেশি। এবং মড়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। জ্যান্তরা হয়ে পড়ছে দুর্লভ।
জাঁ ॥	মড়াদের অস্তিত্বই নেই, এ কথার নড়চড় নেই। হাঃ হাঃ, তবু তাদের হাতেও তুমি নিপীড়িত? যার অস্তিত্ব নেই সে কী করে নিপীড়ন করে?
বেরোঁজের ॥	মাঝে মাঝে ভাবি আমারই অস্তিত্ব আছে কিনা।

এ পর্যন্ত পড়ে আমি স্মিতমুখে তাকাই জপেনদার দিকে, এইবারে উনি কাবু হবেন এই ভেবে। কিন্তু তা তো হলেনই না, উপরন্তু বিশ্রী শব্দে হেসে উঠে বললেন, এটা কী?

কাব্য, দর্শন—বলি আমি—অতি সাধারণ ভাষায় জটিল দর্শনের অবতারণা।

লোকটা কি পাগল নাকি?—শুধোলেন জপেনদা—নাটকের কাব্যের উদ্দেশ্য কী? এটা তো জোর করে প্রক্ষিপ্ত। অত্যন্ত মজার একটি গল্প বলতে বলতে হঠাৎ ইওনেস্কো-সাহেব তাঁর নিজের গুরুগম্ভীর কথা শোনাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি কির্কেগার্ড-এর দর্শন যে পড়েছেন, এবং সেটা যে তাঁর পছন্দ, এটা জানাবার জন্য সরাসরি বক্তৃতা ফেঁদেছেন। আলবের কাম্যুর 'ল্য মিথ্ দ্য সিসীফ' পড়েছিস? ও, না, কাকে বলছি? তুই পড়বি কাম্যু! তাহলেই হয়েছে! যাক, কাম্যু বলছেন, জগৎ থেকে হঠাৎ সব মায়া এবং মোহ বিতাড়িত হলে মানুষ নিঃসঙ্গ এক আগন্তুকের মতন ঘুরে বেড়াবে। দাঁ এন উনিভের সুর্দ্যা প্রিভে দিলিসিঁও এ দ্য লুমিয়ের, লম্ স্য সঁ এন এত্রোঁজের। ইওনেস্কোর বেরোজেঁরও একই কারণে এ জগতে নিঃসঙ্গ ; গণ্ডারদের এই সংসারের সব কারচুপি সে ধরে ফেলেছে। কিন্তু ইওনেস্কো সাহেবের আস্থা নেই নিজের

নাট্যপ্রতিভার ওপর। পুরো নাটকটা এই কথাটাই বলছে, তবু জোর করে এক জায়গায় সংলাপ মারফৎও বক্তব্যটা স্পষ্ট করে রাখছেন, অর্থাৎ সোচ্চাব হয়ে পড়ছেন। এ ব্যাপারে তিনি আর তোরা একই পথের যাত্রী। তোরাও অমনি হঠাৎ নাটকের মাঝখানে শ্রেণীসংগ্রাম বা গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে এক পাতা লেনিনীয় বক্তৃতা ঝেড়ে সাফাই গেয়ে রাখিস, পাছে পুবো নাটক দেখেও কেউ বুঝতে না পারে যে তোবা কমিউনিস্ট। ইওনেস্কোরও ভয়, পাছে লোকে বুঝতে না পাবে তিনি কির্কেগার্ড-কাফ্‌কার এবসার্ড উলটো মূল্যবোধের সমর্থক। নাটকটাব এখানে-ওখানে নানা ঘোষণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েও তাঁর স্বস্তি নেই—শেষকালে 'লেস্‌প্রি আবসুর্দ এর'-একক প্রবক্তা বেরোঁজের-এর মুখে এক পাতা উপসংহাব বসিয়েছেন, যেমন তোদের নাটকের নায়ক শেষকালে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তারস্বরে বলিষ্ঠ কিছু ঘোষণা করে। নাটকেব কাব্য ওভাবে সৃষ্টি হয় না। নাটকের কাব্য সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

এই সময়ে আমরা ঘেরাও হয়ে পড়লাম লাঠিধাবী অনাবৃত-দেহ একদল কৃষক স্বেচ্ছাসেবক দ্বাবা। তাবা বাব বার বলতে লাগল, এই বাবু বেশধারী আগন্তুকবা নিশ্চয়ই পুলিশেব গুপ্তচব, এবং পুঁতে ফেলাই সমীচীন, না কান কেটে নিয়ে বিতাড়িত করাই শ্রেয়ঃ, এইটুকু যা মতভেদ ওদেব মধ্যে পরিলক্ষিত হল। অনেক কষ্টে ছাডান পেয়ে জপেনদা দেখলাম মুষড়ে পড়েছেন। এত ধকল ওঁর সয় না। অথচ ঘরেব ছেলেদের ঘরে ফেরারও কোনো উপায় নেই, স্টেশনটি দখল করে রেখেছে সি-আর-পি।

কিন্তু আশ্চর্য জপেনদাব নমনীয়তা। সন্দেহপ্রবণ ওই কৃষক যোদ্ধাদের দেওয়া কদমা ও জল খেয়ে মোটে বসেছি পুকুরধারে, ববাবে বাঁধা ইও-ইওব মতন জপেনদা ফিরে এলেন তাঁর বক্তৃতায়।

নাট্যকাব্যের ফাংশনটা কী?—বললেন তিনি—বাস্তবের ফটো নেওয়ার এইসব ছেলেমানুষি ধ্যানধারণা ছাড, দেখবি, নাটক হচ্ছে উপকথা, রূপকথা, পুরাণ আর এপিকের বংশধর। বাস্তবের বিক্ষিপ্ততা, অসংলগ্নতা ও আকস্মিকতাকে বর্জন করে সে গল্প সাজায়, চরিত্র আঁকে। তিন ঘণ্টাব পরিসরে জীবনকে বাঁধতে গেলে, তাকে সুসংগঠিত, অর্থাৎ বাস্তবোত্তব না করে উপায় নেই। তাই মানুষ মিথ্‌ সৃষ্টি করে, পুরাণ সৃষ্টি করে, এপিক সৃষ্টি করে, অর্জুন আর ইউলিসিসকে সৃষ্টি করে। অর্জুন শুধু একটা মানুষ নয়, সে একটা বিরাট গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। সেই পথ বেয়ে সফোক্লিস আর কালিদাসের পদসঞ্চার। তাঁরা দেখেছেন নাটকের ক্ষুদ্র সীমানায় জীবনকে ধরতে গেলে এত বেশি ঘটনা-সংঘাত ও চরিত্র-সংঘর্ষ এসে পড়ে, যে সেটাকে আর বাস্তব মনে হয় না। তাই পুবাকাল থেকে মানুষের গল্প বলার যে রীতি—সেই ছন্দ ও কাব্য এসে পড়ে নাটকে। কবি এসে নাটককে উচ্চতর এক স্তরে তুলে নেয়, যেখানে অবাস্তবতাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কাব্য এসে দর্শকের মনকে দৈনন্দিনের হিশেব থেকে মুক্তি দেয়। কাব্য দর্শককে বিয়োজিত করে দিনগত পাপক্ষয়েব খুঁটিনাটি থেকে। সে প্রস্তুত হয় মিথ্‌কে বিশ্বাস করতে। মহাকাব্যে জনতার স্থায়ী উত্তরাধিকার। 'বসুন' আর 'না, বসব না' অথবা 'মড়াদের অস্তিত্ব নেই' আর 'আমারও অস্তিত্ব নেই'—এসবে আজকের মহাকাব্য সৃষ্টি হয় না। শেক্‌স্‌পিয়ার আর মলিয়ের-এর যিনি উত্তরাধিকারী, তিনি পুরো নাটকটাকে দেখবেন আজকের

অখণ্ড এপিক হিসেবে। তিনি আজকের দর্শককে ফিরিয়ে দেবেন তার উত্তরাধিকার। বিশাল ঘটনার চমৎকারিত্ব আর বিশাল মানুষদের সংঘর্ষ রূপকথার ঢঙে তুলে ধরতে তিনি ইতস্তত করবেন না। দ্বৈপায়নের তীরে দুর্যোধনের বিলাপ আর কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয়ের বিহ্বলতার সমতুল্য হয়ে দেখা দেবে আজকের দুঃখ আর সমস্যা। যেমন দেখছি জঁ্য জেনে-র নাটকে, ব্রেখ্‌ট্-এর নাটকে। উঃ, মিষ্টি আমি খাই না, তবু কেন যে মড়া কদমা খেতে গেলাম!

নইলে মারত, বললাম আমি, ভয়ের চোটে ঢেঁকি গিলেছেন।

যা বলছিলাম, বললেন জপেনদা, আয়েস করে পা ছড়িয়ে দিয়ে, জঁ্য জেনে-র নাটকে রয়েছে মহাকাব্যের আমেজ। যদিও তিনি আমাদের শত্রুপক্ষ, তবু তাঁর প্রতিভার কাছে তোদের গলবস্ত্র হয়ে কিছু শেখা উচিত ছিল। লোকটার অসুখ, দানবীয় তার শক্তি, ধ্বংসে তার আনন্দ. হত্যায় সে মাতাল। মানবমনেব গভীরে অন্বেষণ করে আঁজলা ভরে সে তুলে আনে কলুষ আর কলুষ। পাতাল মন্থন করে নিয়ে আসছে বিষ। তার চরিত্ররা একেক জন মার্কি দ্য সাদ্-এর মতন ভয়ংকর, বিরাট, অর্ধেক-জানা অর্ধেক-অজানা সব পাপ-কামনায় উদ্বেলিত। জেনে-র নাটকে নেই 'ও দাদা, চা খান' আর 'আমার চায়ে চিনি দেবেন না' প্রভৃতি খর্বকায় মধ্যবিত্তের মোল্লার দৌড়। জেনে এমন এক দানবীয় পুরুষকাবের অধিকারী যে তাঁর কাব্যগ্রন্থ তিনি সোচ্চারে উৎসর্গ করেছিলেন 'বিশ বৎসরের এক তরুণ খুনিকে,' 'যার দেহ এবং সুকুমার মুখচ্ছবি আমার বিনিদ্র রজনীগুলিকে ভরে রাখে . গত ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ সাঁ-ব্রিয়ো কারাগারে তার ফাঁসি হয়।' [. . . dont le corps et le visage radieux hantent mes nuits sans sommeill . . Il fut exécute le 17 March 1939 á Saint Brieue]

জপেনদার গলা কেঁপে যায় হঠাৎ, ভয় করে, জানিস? জেনের নাটক পড়ে ত্রাস আর বিষাদে অন্তর পঙ্গু হয়ে আসে। 'ডেথওয়াচ' নাটকের কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী স্নোবল আর সবুজ-চোখ—আর যেহেতু তারা বলপ্রয়োগে মানবসমাজের আইন ভেঙে হত্যা করেছে, তাই পুরো কারাগারে সব বন্দীর চোখে তারা উপাস্য। আগতপ্রায় ফাঁসির মুহূর্তটি দুই নায়কের কাছে বড়োই মধুর, কারণ আত্মনিগ্রহের অসুস্থ আনন্দ তারা পাচ্ছে। সবুজ-চোখ বলে, 'দুর্যোগ চেনা যায় তার মাধুর্য দেখে'। অথবা ধর 'মেড্‌স্' নাটকের দুই বেশ্যা সোলাঁজ এবং ক্লেয়ার; বেশ্যাবাড়ির মাসির অনুপস্থিতিতে তারা মাসির পোশাক পরে কর্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে রোজ, এবং অন্তরে যত ঘৃণা জমেছে তাই ঢালতে থাকে পরস্পরের প্রতি। তারপর সোলাঁজ চেষ্টা করছে ক্লেয়ারকে হত্যা করতে, কারণ হত্যার মাঝেই তার মুক্তি :

> 'হাঁটু গেড়ে বোস! আঃ, তুই কী সুন্দর, কী মধুর যন্ত্রণায় তোর বাহুবিক্ষেপ। চোখের জল্ গড়িয়ে পড়ছে তোর অপূর্ব মুখ বেয়ে। চেঁচিয়ে লাভ নেই। মৃত্যু এসেছে, তোর শিয়রে দাঁড়িয়েছে। এতদিন তোকে বাঁচিয়ে রেখেছি যেমন লোকে বিড়ালছানা বাঁচিয়ে রাখে জলে ডুবিয়ে মারার জন্য। এতদিন নিজের পেটে পিন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে নষ্ট করেছি গর্ভস্থিত প্রতিটি ভ্রূণ, তারপর তা ফেলে দিয়েছি নর্দমায়, শুধু তোকে বাঁচিয়ে রাখতে।'

ক্লেয়ারও জানে এটা অভিনয়, তবু তার তীব্র অভিযোগ অভিনয়েব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—

'প্রতিশোধ নিচ্ছ, না? তোমাব মনে হচ্ছে সেই মুহূর্ত এগিয়ে আসছে যখন সেই মুহূর্ত এগিয়ে আসছে যখন কুমারীত্ব হাবাবার ক্ষোভে তুমি মূর্তিমতী প্রতিশোধ হয়ে দেখা দেবে।'

হত্যা কবতে সোলাঁজ অপাবগ হয়। এখন ক্রেযারেব আত্মপীড়নের নেশা আত্মহত্যার পথ ধবে। গৃহকর্ত্রীর শুভ পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে বিষ খায়। আর হত্যাব প্রয়াসের অপরাধে গ্রেপ্তাব হবাব পূর্বে, সোলাঁজ ক্রেযাবেব মৃতদেহেব উদ্দেশে বলে যায়—

'এর শয্যাপার্শ্বে শেষ সময়ে উপস্থিত ছিল জগতের সব কুমারীবা—সশবীরে নয়, উপস্থিত ছিল তাদের কুমারী নামেব নারকীয যন্ত্রণাগুলি। এখন এব সূক্ষ্ম দেহকে ঘিবে বযেছে তাদেব পবিত্র কুমারীত্বের মৃদু সুবাস, কেননা সকলের অলক্ষে তাব' কুমাবীই ছিল। আমবা সুন্দর, সুখী মাতাল, স্বাধীন।'

এই হচ্ছে খাঁটি নাটকীয কাব্য। প্রতি মুহূর্তে এ কাব্য বক্তাব চবিত্র বিশ্লেষণ কবছে। সেই সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে কাব্য বাস্তবকে অতিক্রম করে আমাদেব পৌঁছে দিচ্ছে বাস্তবোত্তরেব এমন এক উলঙ্গ জগতে যেখানে প্রচলিত সব ন্যাযনীতি ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। জ্যঁ-পোল সার্ত্রই ঠিক বলেছেন · এ কাব্য উদঘাটিত কবছে সুব-বিয়ালিতের দ্বার। ['La realite n est qu'une apparence mais l'apparence revela la surréalité ']

আমি বললাম, এঃ ! গা গুলোচ্ছে ! কী সব নোংবা চবিত্রেব নোংবা কথাবার্তা ! এই জেনের কাছে শিখতে হবে?

আলবাৎ শিখতে হবে! নিজেব উবুতে প্রবল চড মেবে বললেন জপেনদা। [এবং পরমুহূর্তে সে উবুতে হাত বুলিয়ে জ্বালা কমাতে লাগলেন।] ওবে গোবু! ফর্ম শিখতে হবে! নাট্যবচনার কৌশল শিখতে হবে। শিখতে হলে প্রবল পুরুষ জ্যঁ জেনের কাছে শেখ। ওইসব অলবি-পিন্টাবেব আস্তাকুঁড়ে কিসের লোভে যাস ভিখিরিব মতন!

মুখখানা হাঁড়িপানা করে কিয়ৎকাল বাগ সামলালেন জপেনদা। এই সময়েই গুলিব শব্দটা আমাদেব কানে এসে সপাং কবে কশাঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ কবে চতুর্দিক থেকে বল্লম আব লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতে লাগল কৃষক। আমি হুডমুড কবে উঠতে যাচ্ছিলাম, জপেনদা হাত ধবে হেঁচকা টানে আমায শুইয়ে দিযে নিজেও শুয়ে পডলেন জলেব ধার ঘেঁষে। উঁচু পাডেব আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র।

যুদ্ধ তো জানো অষ্টরম্ভা ! দাঁত খিঁচিয়ে বললেন জপেনদা, ওখানে গিয়ে কি সি-আব-পিকে এক্‌সটার্মিনেট করবে? শুয়ে থাকো চুপচাপ।

এই বলে ঘাসে মুখ গুঁজে একটা চারমিনাব ধরালেন, দুবার ধোঁযা ছাডলেন, তারপর তড়িৎ ফিরে গেলেন নিজের কথায়। দূরাগত কোলাহল ও গুলির শব্দের সঙ্গে তাল রেখে অতি শান্তস্বরে তিনি অধ্যাপনা করতে লাগলেন।

যা বলছিলাম, বললেন তিনি, তোবা নাকি বিপ্লবী নাটক কববি! তা বিপ্লবেব নাটককে বুঝি নাটক না করলেও চলে? জ্যঁ জেনে তাঁব প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনকে ত্রাস-উদ্রেককারী করে তোলেন তাঁর কাব্যপ্রতিভা দিয়ে। আর বিপ্লবী নাট্যকার কতকগুলো বাঁধা বুলি দিয়ে তাঁর

নাটককে করে রাখবেন তৃতীয় শ্রেণীব একটা প্রবন্ধের মতন, না? এই তো তোর প্রেসক্রিপশন। শত্রুর নাটক কার্যকারী হোক, আমাদেবটা হবে বাজে! বলিহারি!

কর্দমাক্ত ঘাসে আমার অসুবিধে হচ্ছিল, তবু বলি, বিপ্লবকে কী করে কবিতা করে তোলে আমার জানা নেই!

শুধু জানা নেই নয়, বললেন জপেনদা, তোর চোখও নেই, কানও নেই। শুনছিস গুলির শব্দ আর স্লোগান? দেখেছিলি ক্ষেতের মাঝখানে লাল নিশান? দেখেছিলি সেই বক্তাকে? শুনেছিলি তাঁর বাবুই পাখি নিয়ে কবিতায় বক্তৃতা? বিপ্লবের সবটাই কবিতা। ধ্বংস আর সৃষ্টির কবিতা। সেটা যদি না শুনতে পাস, তবে শেখ! নাটকে যারা বিপ্লবের কাব্য রচনা করে গেছেন তাঁদের কাছে শেখ! অবিশ্যি যদি ঘটে কিছু থাকে। ব্রেখ্‌টের হাতে বিপ্লবেব তত্ত্ব বিচিত্র সব কাব্যকল্পনায় সজ্জিত হয়ে আসে আমাদের সামনে। ধর্‌ তাঁব 'মান ইস্ট গান' নাটক। মানুষ যে অনড় অপরিবর্তনীয় কোনো অমৃতস্য পুত্রাঃ নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে একটা দুর্মর কুসংস্কার মাত্র, এই দুরূহ তত্ত্ব তিনি উত্থাপিত কবেছেন আধুনিক এক রূপকথার সাহায্যে, যেখানে গালি গে নামক এক দরিদ্র আইরিশ মজদুরকে এক সৈনিকে রূপান্তবিত কবে নেয় তিনজন ব্রিটিশ টমি। তাদের বন্ধু জিপের স্থানে তাবা অধিষ্ঠিত করে গে-কে, এবং গে-ও তার ভূতপূর্ব সত্তার মৃত্যুতে এক গুরুগম্ভীর শ্রাদ্ধভাষণ প্রদান করে পুরোদস্তুর সৈনিক বনে যায়—কেননা নাটকের সূত্রধার শ্রীমতী বেগবিকের ভাষায়

ভী অফ্‌ট্‌ ডু আউখ ডেনফ্লুস আনসীহ্‌স্ট, ডের ট্রেগে ডাহিনৎসীহ্‌ট, নী সীহ্‌স্ট ডু ডাস্‌জেলবে ভাসের—

অলসগতি নদীর দিকে যতবার তাকাও না কেন, একই জলকে দ্বিতীয় বার আর দেখবে না। এক ফোঁটাও কখনো ফিরে গিয়ে আবার বয় না ; এক ফোঁটাও ফিরে যায় না উৎসে। মার্ক্‌সবাদের মূল একটি তত্ত্বকে এমন তীক্ষ্ণভাবে উপস্থিত কবা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র কবিকল্পনার সাহায্যে, কাব্যের সাহায্যে, উপকথার আঙ্গিকের সাহায্যে। তেমনি অলৌকিক কাহিনীর কাঠামো 'সিমোন মাশার' নাটকে। নাৎসি-পদানত ফ্রান্সের অতি সরল গ্রাম্য বালিকা সিমোন তার পূর্বসূরী জোন অফ আর্কের মতন মাঝে মাঝে খোয়াব দেখে, দেবদূত এসে তাকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করছে :

সিমোন ॥ শত্রু জয়লাভ করার পরও কি লড়তে হবে?
দেবদূত ॥ আজ রাত্রে কি বাতাস বইবে?
সিমোন ॥ হ্যাঁ।
দেবদূত ॥ আঙিনায় একটা গাছ আছে না?
সিমোন ॥ হ্যাঁ, পপলার গাছ।
দেবদূত ॥ বাতাসের ছাপটায় তার পত্রমর্মর শোনা যায়?
সিমোন ॥ হ্যাঁ, স্পষ্ট শোনা যায়।
দেবদূত ॥ তাহলে শত্রু যুদ্ধ জয় করলেও, লড়ে যেতে হবে।

তোরা হলে এখানে বক্তৃতা ফাঁদতিস। কিন্তু কমিউনিস্ট ব্রেখ্‌ট্‌ এখানে আধুনিক জোন অফ্‌

আর্কের নূতন মিথ সৃষ্টি করছেন, তাই অবলীলাক্রমে দেবদূতকে নিয়ে এসেছেন, সিমোনের সবল চোখ দিয়ে বিপ্লবকে দেখছেন। 'সেচুয়ানের ভালো মানুষ' একটি শুদ্ধ আধুনিক রূপকথা, যার নীতিবাক্যটা বৈপ্লবিক। 'আর্টুরো উই' এ যুগের অভিশাপ হিটলার সম্পর্কে এমন এক নব্য পুরাণ, যার সঙ্গে গ্যোয়টের ফাউস্টকে তুলনা করতে পিছপা হন না সমালোচকরা। এইটাই নাটকের কাব্য। বিপ্লবেব সারমর্মকে মূর্ত কবে তোলা হচ্ছে এক একটি রূপকথাব সাহায্যে যেখানে বাস্তব জীবনেব যুক্তিতর্ক পরাজিত, সন্দিগ্ধেব অবিশ্বাস স্তম্ভিত। আর প্রত্যক্ষ বিপ্লবের কাব্য যদি শিখতে চাস তো ব্রেখ্‌ট্‌-এর 'মা' নাটক পড়, পড় তাঁর পারি কমিউন সম্পর্কে নাটক।

কিছুক্ষণ জপেনদা চুপ করে দূরের কোলাহল শুনলেন, তারপর বললেন, বিপ্লবের কথাগুলো বলার কত উপায় উদ্ভাবন করেছেন পূর্বসূরীরা। এর্নস্ট টলার-এর কাব্যনাট্য 'ম্যাসেস অ্যান্ড ম্যান' পড়,পড পেটেব ভাইস-এর 'মারা-সাদ' আর আর্ডেনের 'সার্জেন্ট মাস্‌গ্রেভ্‌স ডান্‌স্‌'। চমকপ্রদ বাক্য পরীক্ষা দ্বাবা তাঁবা সৃষ্টি করেছেন এক-একটি আধুনিক বেতাল-পঞ্চবিংশতি। নিজ নিজ দেশেব জনতার লোকগাথার ঐতিহ্যকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন আজকের বিপ্লবেব পটভূমিকায়। আর তোরা? বাস করিস এমন এক দেশে যেখানে ব্রতপার্বণে মানুষের জন্ম আব পুষ্টি; যেখানে পাঁচালি আর কথকতায কৈশোরের বিকাশ, যেখানে ছন্দোবদ্ধ যাত্রাই ছিল লোকনাট্য। তোরা নাকি গিরিশ-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক, যাঁবা ছিলেন জাতকবি। দূর হ, তোদের মুখ দেখলে পাপ হয়।

আমবা বাড়ি ফিরলাম পরদিন ভোব রাত্রে। সি-আর-পির সেপাইরা ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়ে পালাবাব পব স্টেশন ফাঁকা হল, ট্রেন চললে আমরা ফিরে এলাম। আর জপেনদা সারা পথ চারমিনারের অভাবে মৃদু গর্জন করতে করতে এলেন।

রবি ঠাকুরের মূর্তি

কলেজেব বাবান্দায রবীন্দ্রনাথেব আবক্ষ মূর্তিটা বহু বৎসব জ্বালিযেছিল আমাদেব। কিছু করাব উপায় নেই। পবীক্ষায সামান্য কিছু টোকাটুকি, বা কোনো উজ্জ্বলবর্ণা ছাত্রীব দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ, এমনকী অর্থনীতির নীবস ক্লাসটা পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া—কিছুই প্রফুল্ল চিত্তে করা যেত না, কাবণ প্রস্তবীভূত অন্তর্দৃষ্টি নিযে তাকিযে থাকতেন ববি ঠাকুব। মূর্তিটি ছিল বড ভীষণ। গাঢ সবুজ। ঝবনাব মতন দাডি বুকের ওপব ভেঙে পডেছে শত ধাবে, আর তাবাহীন দুই চক্ষু। ব্রহ্মা বোধ হয এই বকম দেখতে ছিলেন।

তাবপব এই সেদিন জপেনদা আর আমি কলেজেব সামনে পুলিশের ভিড় দেখে এগিয়ে গিযে উঁকি মেবে দেখি, কে বা কারা ববীন্দ্রনাথেব মূর্তিব মৃত্যু ঘটিয়ে গিয়েছে, খণ্ড খণ্ড হযে পডে আছেন সবুজ ব্রহ্মা। খানিকটা দাডি ছিটকে এসে পডেছে মাঠে, একটা জ্যোতিহীন চোখ পডে আছে সিঁডিতে, আব বারান্দায বযেছে অবশিষ্ট লণ্ডভণ্ড বিশ্বকবি। পুলিসেব অফিসার দেখলাম বাংলাব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায কম্পমান। আমাদেব বললেন, ছি, ছি কী হচ্ছে? এই কি বিপ্লব? শকুন্তলা লিখেছেন যে কবি, তাঁকে এই অপমান?

এখন সমস্যা হচ্ছে, ববীন্দ্রনাথ আমি তেমন পড়ি না। তাঁব শকুন্তলাও পড়িনি। দু চারটে নাটক কযেক পাতা পড়ে মুডে বেখে দিয়েছি, এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শুবু হলে আমি সাধারণত বিজ্ঞেব মতন হুঁ হাঁ ছাড়া বিশেষ কিছুই করি না। কিন্তু সবুজ বঙেব ওই পাষাণ বিবেকেব ওপব আমাব ছিল বহু বৎসবেব জাতক্রোধ। তাই জপেনদাব পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমি সেই জাতক্রোধকে কিছু ভারি ভারি কথায সাজিযে একটা বাজনৈতিক তত্ত্ব খাডা করি। বলি, বুর্জোযাব কবিদের শেষ পর্যন্ত এই দশাই হয। উনি নিজে ছিলেন জমিদাব। তাই আজ জাগ্রত শ্রমিক কৃষকেব হাতে তাঁর বিচাব হচ্ছে।

জপেনদা থমকে দাঁডিযে পড়লেন, এক চোখ বুঁজে কপাল কুঁচকে কিযৎকাল আমার দিকে তাকিযে বইলেন। তাবপব বললেন, কার্ল মার্কস্-এব প্রিয় ঔপন্যাসিক বালজাক রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন গোঁডা রাজতন্ত্রী। এংগেলস্ নিজে এমন কিছু শ্রমিকেব সন্তান ছিলেন না, লেনিনও না, মাও ৎসে-তুংও না। ববীন্দ্রনাথ জমিদার হলে বয়ে গেল কি? আর তোব কি ধারণা শ্রমিক কৃষকবা এসে ও মূর্তি ভেঙে গেছে? আমার তো ধাবণা পুলিসের লোক ভেঙেছে, শকুন্তলা লেখাব অপরাধে। অথবা তোর মতন কোনো অসহ্য পাতিবুর্জোযা বখাটে ছোঁডা।

আমি মনে মনে বলতে শুবু কবেছি—এই রে, এইবার রবি ঠাকুব নিয়ে টানা হেঁচড়া শুবু হবে—আমার তখন বিশেষ অসুবিধে হবে। আর এমন সমযে বাজেনেব দেখা পেতে আমি খড়কুটোব মতন তাকে আঁকড়ে ধরলাম। রাজেন সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে। আমাদেব গণতান্ত্রিক কাবাগারে এবং শকুন্তলা-ভক্ত পুলিসের তপোবনে রাজেনের দৈহিক হাল হযেছে

অনেকটা 'রক্তকরবী'র গজু পালোয়ানের মতন, বাঁ হাতটা উলটো হয়ে ঝুলছে, পা দুটো ফাঁক রেখে রেখে হাঁটতে হয়, মাথায় ব্যান্ডেজ, বুকে প্লাস্টার করা। জপেনদাকে জব্দ করতে কেউ যদি পারে তো এই রাজেন, এরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি ওকে আলোচনায় টেনে নিলাম।

চায়ের দোকানে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে রাজেন বলছিল, হ্যাঁ, ইস্কুল পোড়াব, পুরোনো, ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করব, রবীন্দ্রনাথকে উচ্ছেদ করব, কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে যত বই পড়ে সে তত মূর্খ হয়, বলেছেন মাও।

কোন বইয়ে? প্রশ্ন এল জপেনদার দিক থেকে।

কী? বলল রাজেন।

কোন বইয়ে মাও ও কথাটা বলেছেন?

রাজেন ভেবে পেল না। আমি সাহায্য করতে পারি এমত আমার বোধ হল না। তখন জপেনদা বললেন, কথাটা প্রথম বলেছিল মার্কিন টাইম পত্রিকা, চালিয়েছিল মাও-এর নামে। সেটা কলকাতায় চালু করল স্টেটস্ম্যান পত্রিকা এবং ররটা তুলে নিল কারা সব যেন। মাও ওকথা বলতে যাবেন কোন দুঃখে? তিনি তো আর মধ্যযুগের কোনো কাপালিক নন। এই ব্যবস্থায় বই পড়লে মানুষ যদি মূর্খ হত তবে সবার বড় মূর্খ মার্কস্ ও এংগেলস্, তারপর যথাক্রমে লেনিন, স্তালিন ও মাও নিজে। সুতরাং মাও একথা বলতে পারেন না। উপরন্তু পড়াশুনার সম্পর্কে মাও বহুবার তাঁর মতামত দিয়েছেন . সেগুলো পড়লে তো মনে হয় কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়ার একনিষ্ঠ এবং ব্যাপক সাধনাই হচ্ছে তাঁর উপদেশ। ধরা যাক 'আমাদের পাঠ সংশোধন করো' প্রবন্ধটি। এতে তিনি ইতিহাস পড়তে বলছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে বলছেন, অর্থনীতি পাঠ করতে বলছেন। কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট নন— ১৯৪১ সালের দুর্ধর্ষ চীনা কমিউনিস্টদের পড়াশুনার সম্বন্ধে তিনি তীব্র সমালোচনায় মুখর , বলেছেন, 'বর্তমান এবং অতীতকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার প্রাণোচ্ছল আবহাওয়াটা নেই।' যারা যুদ্ধের মাঝে রাজ্যের বই পড়ে পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হত তাদের সম্পর্কেই মাও এমন কঠোর। আর তোদের দেখলে কী বলতেন ভগবান জানেন। সেই মাও ৎসে-তুং পড়তে বারণ করেছেন, এমন কথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বলে বলুক, তোরা বলিস কোন আক্কেলে? বই-এর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একদল বর্বর দরকার হয় ফাশিস্তদের। বার্লিনের মস্তানদের জড়ো করে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল গোয়েবেল্স্রা। বই পোড়ায় নাৎসি জানোয়াররা। আজ মাও-এর মুখে হিটলারের কথা বসিয়ে তোরা কি ইয়ার্কি মারছিস নাকি? যা! তোদের মুখ দেখলে পাপ হয়!

রাজেন হেসে ফেলে জপেনদার উত্তেজনা দেখে। তারপর মৃদুস্বরে বলল, যা বলেছেন!

এতে আমি বিভ্রান্ত হই। এ আবার কী? কে কার দিকে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

রাজেন বলল, তবু এটাও মার্কসবাদে স্বীকৃত সত্য যে সাহিত্য-দর্শন আইন-ধর্ম প্রভৃতি চিন্তাসৌধ একান্তভাবে উৎপাদন-সম্পর্কের ভিতের ওপর গড়ে ওঠে। তাই ভিৎ পালটালে চিন্তাসৌধ পালটায়। নূতন সমাজব্যবস্থায় পুরাতন ধ্যানধারণা ধ্বংস হয়। রবীন্দ্রনাথের ওপর আক্রমণ সেই হেতুই ঘটেছে।

জপেনদা জ্বলে উঠলেন, টেবিল চাপড়ে খানিকটা চা ঢেলে বলে উঠলেন, মার্কসবাদের কোথায় পেলি এই অপরূপ সূত্র? ভিৎ পালটালে পুরো চিন্তাসৌধ পালটে যায়, কোন্ উজবুক বলে একথা?

আমি আব বাজেন একসঙ্গে উত্তর দিতে উদ্যত, কিন্তু আকাশ ফাটানো কাংস্যকণ্ঠে জপেনদা বলে চলেছেন, ভাষা তো চিন্তাসৌধেব একটা প্রধান থাম। তা তোদের কি ধারণা বিপ্লবের পব ভাষা বদলে যায়? তোদের কি এই ইডিয়টিক ধারণা যে ফবাসি বিপ্লবের পর ফরাসিরা ফরাসি ভাষা ছেড়ে নূতন এক ভাষা তৈবি কবতে বসেছিল? তোদের কি মনে হয চীনে এখন আর চীনা ভাষা বলা হয় না, বলা হয এসপারান্তো? দিনকে দিন তোরা কেমন যেন নিবেট হযে যাচ্ছিস! স্তালিন পড়িস না কেন? পাছে বেশি পড়লে মূর্খ হয়ে যাস সেই ভয়ে? স্তালিন বলছেন, মানুষেব যা মহৎ সৃষ্টি যা নিজ যুগকে প্রতিফলিত কবে তা সর্বকালেব হয, তা উৎপাদন-সম্পর্ককে অতিক্রম করে। তাই ভিৎ পালটালে হোমার-শেক্স্পিযার-গ্যোয়টে পরিত্যক্ত হন না, বরং আবো ব্যাপক অর্থে সত্য হযে ওঠেন, কারণ আগে যেখানে তাঁবা শতকবা তিন কি চাবজনের দখলে ছিলেন, এখন শতকরা নিবানব্বই জনেব নাগালের মধ্যে তাঁদেব এনে ফেলা হবে। জগতেব যা কিছু সুন্দব তা আগেব সমাজে ভোগ কবত শুধু শোষক। শোষককে উচ্ছেদ কবতে গিযে আগেব সব সুন্দর সৃষ্টিকে উচ্ছেদ কবব—এ কথা বলে পাতিবুর্জোযা নৈরাজ্যবাদীবা, ট্রটস্কিপন্থী মধ্যবিত্তবা। শ্রমিকশ্রেণীব দৃষ্টিভঙ্গি ওরকম নয। শ্রমিকশ্রেণী বলে, আমি বিশ্বকর্মা, আমি সৃষ্টি কবছি সম্পদ, আমি গডছি নতুন সমাজ—তাব সৃষ্টিব মূল্য আমি যেমন বুঝি, তেমন আর কোনো শ্রেণী বুঝতে পাবে না। সব সৃষ্টিতে তাই আমাব জন্মগত অধিকাব। জুলুমেব জোবে তোমবা সিন্দুকে বন্ধ কবে বেখেছ সাহিত্য, সংগীত, দর্শনকে। সে সিন্দুক ভেঙে এবাব সব বিলিযে দেব জনতাব মধ্যে, কাবণ শেক্স্পিযাব আমাব, গ্যোয়টে আমাব, আমারই বেঠোফেন। এবং ববীন্দ্রনাথ আমাব। ওবে কানাই চা দে আরেক কাপ।

বাজেন মিটি মিটি হাসছিল, কিন্তু এবাব মুখ খুলতেই জপেনদা আবাব হুংকাব দিয়ে ওঠেন. না, না, তোদের সঙ্গে এক মিনিট কথা কইলে মাথা টিপ টিপ কবে। সর্বকালে সর্বদেশে তোদের মতন হতাশ কিছু মধ্যবিত্ত চ্যাঙড়াব আবির্ভাব হয়। শোষকবা তোদের চাকবি-বাকবি দেয না বলে অভিমানে গাল ফুলিয়ে কালাপাহাড সাজিস। বুশ বিপ্লবের পর সেখানকার চ্যাঙডারা রাপিস্ত, প্রোলেত ইত্যাদি নানা নাম নিয়ে একেবারে লংকাকাণ্ড বাধিযেছিল। বলে, পুশকিন, তুর্গেনেভ, তলস্তয়, সব প্রতিক্রিয়াশীল। বলে, আধুনিক কবিতা হবে সিনথেটিক ওয়ার্ড-কেমিস্ট্রি। বলে, স্তানিস্লাভস্কির থিয়েটার বন্ধ কবে দেওযা উচিত কারণ চেকভ-টেকভের আর দরকার নেই। কিছুকাল এই দৌরাত্ম্য চলাব পব শ্রমিকশ্রেণীব ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বলপ্রযোগে এইসব মধ্যবিত্ত ইয়ার্কির অবসান ঘটান স্তালিন এবং বলশেভিকরা।

তাই বলে শ্রমিকশ্রেণী অতীতের মূল্যায়ন করবে না? বলল রাজেন।

মূল্যায়ন মানে শুয়ারের বাচ্চা বলে গালাগাল? শুধালেন জপেনদা—অবশ্য মূল্যায়ন হবে, যেটা চীনে এখন হচ্ছে। মূল্যায়ন অর্থ স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচাব। মূল্যায়ন মানে ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিতে বিচার। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন

যেহেতু সে-কলেজের প্রাঙ্গণে ইংরেজ ফৌজের ছাউনি পড়েছিল, সেহেতু তিনি ব্রিটিশের দালাল—এর নাম মূল্যায়ন?

এটা আবার কোথায় পেলেন? বললাম আমি।

ছাপার অক্ষরে পড়েছি তোদের কাগজে, বললেন জপেনদা। —আসলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে তোরা অজ্ঞ। তোরা মার্কস্‌বাদ বুঝিস না। ইতিহাসে বুর্জোযাদের যে বিপ্লবী ভূমিকা থাকে সেটা জানিস না। কুসংস্কার আব অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিদ্যাসাগর যে পরোক্ষে শ্রমিক আন্দোলনের পথ পরিষ্কাব করে যাচ্ছেন, এটা তোরা বুঝবি কী করে? চের্নিশেভস্কি সম্পর্কে লেনিনের লেখা তো কচুপোড়া পড়িসনি! আচ্ছা, তা না হয় না পড়লি—কিন্তু কমনসেন্স্‌ও কি থাকতে নেই? তোবা কি জানিস না বাংলা কথ্য ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে গেছেন বিদ্যাসাগব? জনতার ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ব্যাকরণের ভিত্তিতে? শহব ও গ্রামেব ভাষার পার্থক্যকে দূর করে গেছেন? আজ যে কথায় কথায় চেঁচাস, গ্রামে যাও, কৃষককে বাজনীতি দাও—বিদ্যাসাগব না থাকলে গাঁয়ে গিয়ে বলতিস কী রে হতভাগা? কী ভাষায় কথা কইতিস কৃষকেব সঙ্গে? শিখতিস তো সংস্কৃত আব বলতিস, ভো ভো হলধর, বিপ্লবস্য ফৌজম!

বাজেন খুব হাসছিল এবং হাসতে গিয়ে বুকে যেখানে তিনটি পাঁজব ভেঙে দিয়েছেন শিল্পবসিক কোনো পুলিস-অফিসাব সেখানটায় চোট খেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে আত্মসম্বরণ কবল।

জপেনদা ততক্ষণে টোস্ট আনতে হুকুম দিয়ে বলে চলেছেন, তুই মাইবি আর হাসাহাসি কবিসনি, মরে যাবি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আগেব সংস্কাবক ও বিপ্লবীরা যে অস্ত্রগুলো তোদেব দিযে গেছেন, সেগুলো কোথায় শান দিযে আবো ধারালো কবে ব্যবহার করবি—না! তাদের ঠেলে দিযে আসছিস শোষকদের হাতে। বিবেকানন্দ, বামমোহনকে সঙ্গে নিতে পাবিস না. সুভাষকে সঙ্গে পাস না, তোদেব গতি কী হবে? মাও তো দেখি অনবরত কনফুশিয়াস, মেনসিউস, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকেব লিউ সিযাং, খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতকেব কুযান ইউ, সতেবো শতকেব লি-ৎসু-চেং, পৌরাণিক পান কু, খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকেব সেনাপতি সুন ৎসু, ইউয়ান বাজবংশেব আমলেব উপন্যাস 'সব মানুষ ভাই', চাও বাজবংশেব 'ৎসো-চুযান' উপন্যাস, সব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চলেন। কেন দেন? কারণ তিনি আছেন জনতার মধ্যে। তিনি জানেন এইসব যোদ্ধা, ধর্মসংস্কারক, লেখকরা জনতাব হৃদযে স্থান কবে নিয়েছেন। এঁরাই জনতার ঐতিহ্য, জনতার সুমহান অতীত। চীনের জনতা যখন লড়বে তখন এঁদেব নাম মুখে নিয়ে লড়বে। কমিউনিস্টবা হঠাৎ গজানো কোনো আগাছা নয়, তাদের শিকড় থাকে জনজীবনের গভীরে। তারা এক দীর্ঘ ঐতিহ্যেব নূতন বাহক, তারা অবিচ্ছিন্ন এক ধারাব সর্বোত্তম ও সর্বকনিষ্ঠ ধাপ। তোদেরও তাই হতে হবে। আঠারো শতকে এদেশের মানুষ যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই শুরু করেছেন, সেটাই চলছে—এখন তারই উন্নততম ধাপ। তোরা এক বিবাট ঐতিহ্যেব বাহক। তোরা শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে তোরা কী করছিস! এটা কি নিছক মধ্যবিত্ত আদুরে দুলালদেব দুষ্টুমি নয? তোবা সর্বনাশ কবছিস। তোবা দেশপ্রেমিক মুক্তিযুদ্ধের

শিকড় কেটে দিচ্ছিস। তোবা নিজেদের ছিন্নমূল করছিস। জনতার ঐতিহ্যে আঘাত করে তাদের এ যুদ্ধ থেকে ঠেলে দিচ্ছিস। এক কথায় তোবা শাসকশ্রেণীব মহৎ উপকাব কবছিস। মুক্তিযুদ্ধ যাতে শুরুই না হয তাব পাকা ব্যবস্থা কবে ফেলছিস বলিহাবি! জেলেব মধ্যে আত্মহত্যাব বন্দোবস্ত কবেছিস। বাস্তার মোড়ে হাতবাঁধা অবস্থায় গুলি খেয়ে মরার সুচাবু বন্দোবস্ত কবেছিস। জনতাকে দূবে ঠেলে দিয়ে বিপ্লবীদেব যা হয, হতে বাধ্য, সেই সর্বনাশ ডেকে এনেছিস।

রাজেন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমাব সমস্ত দেহ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, জপেনদা, লড়াইযেব আঁচ থেকে গা তো বাঁচাইনি।

জপেনদাও মুখ হাঁড়িপানা কবে বললেন, সে কথা বলছি না। তোদেব বীবত্বের গান গাইবাব জন্য দরকাব ছিল আরেক ববীন্দ্রনাথেব। দূব হতে কি শুনিস মৃত্যুব গর্জন, ওবে দীন, ওবে উদাসীন, লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত বক্তেব কল্লোল, মূৰ্ছিত বিহ্বল কবা মরণে মবণে আলিঙ্গন— । রবীন্দ্রনাথেব মতন করে তোদের কথা কেউ বলতে পাবেনি বে। তোরা এমন স্বার্থত্যাগী নির্ভীব বীর বলেই তো বলছি—এসব কালাপাহাড়ি কাণ্ড বন্ধ কব। তোদের মৃত্যুতে বিপ্লবেব সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। যে ববীন্দ্রনাথ তোদেব কবি, সাম্রাজ্যবাদেব বিবুদ্ধে গণসংগ্রামেব চাবণ কবি, তাঁকে শত্রুর কবলে ঠেলে দিচ্ছিস কেন? নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বাব খুলিতে বিলম্ব কত আব? মা কাঁদিছে পিছে, প্রেয়সী দাঁড়াযে দ্বাবে নযন মুদিছে—তোদেব কথা এমন করে বলে গেছেন যিনি, তোদেব আত্মদানেব মহাকাব্য বচনা কবে গেছেন যিনি, তাঁকে স্লোগানেব মতো ছুঁড়ে দিচ্ছিস না কেন অভিশপ্ত আলিপুর কাবাগাবের আকাশে?

রাজেনেব চোখে কখনো জল আসে না। আমাব ধাবণা তাব স্নায়ুগুলো পিযানোব তাব দিযে তৈবি। সে শুধু একবার মাথা নিচু কবল। তাবপব আবার মুখ তুলে বলল, ঠিক উলটো কথাটাও খুঁজে পাওযা কঠিন নয় ববীন্দ্রনাথে।

জপেনদা বললেন, সাম্রাজ্যবাদেব সপক্ষে কোনো কথা ববীন্দ্রনাথে যদি দেখাতে পারিস, সামাজিক পশ্চাদ্‌পদতাব পক্ষে কোনো ওকালতি যদি বাব কবতে পাবিস, গান্ধীব মতন কুসংস্কাবের বেসাতি যদি কোথাও খুঁজে পাস, তবে দশ জুতো খাব।

আমাব মাথায খেলে গেল 'ফ্রন্টিযার' পত্রিকায পড়া এক প্রবন্ধেব কথা। বললাম, রবীন্দ্রনাথেব নাইটহুড ত্যাগেব চিঠিতে আদতে কী বলা হযেছিল জানেন? কেউ যেন প্রতিশোধ না নেয়, সবাই যেন ক্ষমাব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয, এইসব জঘন্য কথা লিখেছিলেন।

যে ব্যক্তি ওই 'ফ্রন্টিযার' পত্রিকায় লিখেছেন, বললেন জপেনদা, তিনি টিপিক্যাল বুর্জোয়া পণ্ডিত। নইলে ওই চিঠি থেকে অত আয়াসে ওকথা খুঁজতে হত না। ববীন্দ্রনাথেব রচনার সর্বত্র ওসব কথা ছড়ানো রয়েছে। বক্তব্য হচ্ছে ববীন্দ্রনাথেব পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট। ১৯১০ সালে ব্রিটিশ পশুশক্তির মুখেব ওপর উপাধিটা ছুঁড়ে মারাই যথেষ্ট। তার ওপবে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ নির্দেশ কবলেন কিনা, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বললেন কিনা, কৃষকদের মুক্তিফৌজে সংগঠিত হবাব কথা বললেন কিনা এসব যে খোঁজে সে তো বাম জন্মাবার আগে রামায়ণ খুঁজছে। শ্রমিকশ্রেণীব পার্টি এদেশে জন্মাবার আগে রবীন্দ্রনাথকে কমিউনিস্ট হতে

হবে? আর কমিউনিস্ট না হলেই লোকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়? জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক জনতা অংশগ্রহণ করবে ; তোবা কি ঠিক কবেছিস কমিউনিস্ট ছাড়া কাউকে বন্দুক দিবি না? রবীন্দ্রনাথ তাঁব কালের পবিপ্রেক্ষিতে কী দিয়ে গেলেন, মার্কসবাদী তাবই বিচার করে। তিনি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে পাবেননি বলে, শতাব্দী পেবিয়ে তিনি রেড বুক পড়েননি বলে তাঁকে গাল পাড়ে না। তলস্তয়ের কাছে লেনিন তাব বেশি আশা কবেননি, লু-সুনেব কাছে কবেননি মাও!

কিন্তু প্রশ্নের জবাব আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, বলল বাজেন। স্ববিরোধে ববীন্দ্রনাথ কণ্টকিত। চবকাকে মধ্যযুগের পশ্চাদপদতাব প্রতীক যিনি সঠিকভাবে বললেন, তিনিই গান্ধী মহারাজেব শিষ্য বনে গান লিখলেন, চবম বেইমানিব অ্যান্‌থেম্‌ লিখে গেলেন। 'মুক্তধারা' নাটক লিখে যন্ত্রসভ্যতাব শ্রাদ্ধ কবে গেলেন।

অবশ্যই, বললেন জপেনদা, স্ববিবোধ ভূবি ভূবি আছে। ববীন্দ্রনাথদেব বৈশিষ্ট্যই তাই। এক একটা আস্ত যুগকে যাঁবা সাহিত্যে প্রতিফলিত কবেন, তাঁবা নিজ যুগেব সর্বপ্রকাব ঝোঁকের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। যে শেক্‌স্‌পিয়াব ডেসডেমোনা, জেসিকা, পোর্শিয়া, এমনকী হার্মিয়া চবিত্রে নাবীমুক্তিব বলিষ্ঠ প্রচাবক তিনি 'টেমিং অফ দ্য শ্রু' নাটকে প্রায় কলকাতাব স্টাব থিয়েটাবি কায়দায় পতিদেবতাব পদতলে লুণ্ঠিতা নাবীকে সুখী করে দেখান। যে গোর্কি 'মা' উপন্যাসে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীকে তুলে ধবেন, তিনিই আবার 'নীচেব মহল' নাটকে এবং অসংখ্য গল্পে অন্তবেব সব মমতা ঢেলে দেন ভিখাবি, চোব ও ভবঘুরেদেব জন্য যাবা সামাজিক বিপ্লবেব পরিপ্রেক্ষিতে বিপজ্জনক লুমপেন শ্রেণী মাত্র। তলস্তয়েব স্ববিবোধিতা লেনিনকে ধৈর্যচ্যুত করিয়েছে। ববীন্দ্রনাথকে বিচাব কবা প্রয়োজন। বিপ্লবের মানদণ্ডে তাঁকে সতর্কভাবে ওজন কবা প্রয়োজন। কিন্তু সে ব্যাপাবে এদেশে কিছ মুশকিল আছে।

এই বলে কিছুক্ষণ মুখটাকে নানাভাবে বাঁকিয়ে চুরিয়ে জপেনদা টোস্ট চিবোলেন। আমরা শুধোলাম, কিসের মুশকিল?

ববীন্দ্রনাথেব কিছু স্বনিযুক্ত ইজারাদাব আছেন না এ শহবে? খেঁকিয়ে উঠলেন জপেনদা, কিছু কর্তাভজাব দল। ববীন্দ্র আলোচনায় এঁবা সুপাবলেটিভ ছাড়া আব কিছু ব্যবহার করতে দেবেন না কাউকে , এঁরা গুবুবাদী, মোহান্তবাদী, মঠবাদী। ববীন্দ্রনাথ নামে এক কাল্পনিক ঠাকুবেব এঁবা তান্ত্রিক শিষ্য। এঁরা ববীন্দ্রনাথেব মূল্যায়ন হতে দেবেন না, কাবণ এঁবা চান না বৃহত্তর জনতা ববীন্দ্রনাথের নাগাল পায়। মন্ত্রগুপ্তি বুঝিস? আব তোরা ওদেব ফাঁদেই পড়ছিস। যেহেতু ওঁরা রবীন্দ্রনাথকে গুপ্ত শবসাধনার দেবতা বানিয়ে রেখেছেন, তোরাও অমনি চোরেব উপব রাগ কবে মাটিতে ভাত খেতে বসেছিস। ববীন্দ্রনাথকে এইসব কাপালিকের হাত থেকে কেড়ে না এনে, ববীন্দ্রনাথকেই গাল পাড়ছিস। এতে কাপালিকবা বেজায় খুশি। তাদেব অর্থবান মালিকবাও। স্ববিবোধী রবীন্দ্রনাথের যে দিকটাকে ওঁবা ভয় পান, সেটা যে বিল্বপত্রেব স্তূপে চাপা পড়ে গেল এতে ওঁবা আশ্বস্ত।

বাজেন শুধু হাসছে দেখে আমাব পিত্তি জ্বলে গেল। বললাম, আব ববীন্দ্রনাথেব প্রতিক্রিয়াশীল দিকটা?

ক্ষমতা আর সাহস থাকলে বুক ঠুকে সর্বসমক্ষে বল—বললেন জপেনদা—'মুক্তধারা' আর 'অরূপরতনের' মতন নাটক প্রতিক্রিয়াশীল, বিপ্লবের অন্তরায়। নাটকগুলি বিশ্লেষণ করে কথাটা প্রমাণ কর। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর স্থিতধী বৈজ্ঞানিক বিচার। মূর্তি ভাঙলে আর অশ্লীল ভাষায় এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিকে খিস্তি করলে সে বিচারের অধিকার আর তোদের থাকে না। প্রগল্‌ভ শিশুর কথা কেউ শোনে না। তোদের হঠকারিতায় সুবিধেই হয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের। তারা রবীন্দ্রনাথের গান আর নাটককে যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। লক্ষ করেছিস কিনা জানি না, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানের কী ধূর্ত ব্যবহার ওরা করে যাচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে গেলেই রেডিওতে অবিশ্রাম গম গম করতে থাকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান, অন্যথায় নয়। কারণ অন্য সময়ে সে গান গাইতে দিলে হঠাৎ জনতার মনে হতে পারে—এ যেন বরানগরে নির্মমভাবে নিহত বিপ্লবী বীরদের গান, অথবা পেশাদার গুণ্ডার ছোরায় নিহত কোনো শ্রমিক বীরের উদ্দেশে গীত। 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না— ।'

জপেনদার গান শুনে দোকানের সাইনবোর্ডে বসা দুটো কাক সভয়ে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল, কানাইয়ের হাত থেকে ঠাঁই ক'রে কেটলি পড়ে গেল, দোকানের এক খদ্দের চায়ে বিষম খেয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল। আমি আর রাজেন হাঁ হাঁ করে উঠলাম, গাইবার দরকার নেই। কথাগুলো বললেই তো হয়।

কথা ও সুরে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, উদ্দীপ্ত হয়ে বলে চললেন জপেনদা, এত সহজে বাংলার জনতার মনের কথায় আর প্রাণের সুরে আর কেউ বিপ্লবের কথা বলে যেতে পারেননি। 'আসবে পথে আঁধার নেমে তাই বলেই কি রইবি থেমে? ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি, হয়তো বাতি জ্বলবে না'—(গানের সুরে আবার দোকানের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল)। এ গান তো তোদের সম্বন্ধে। 'পাষাণ সমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে, আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে। সময় হল, সময় হল—যে যার আপন বোঝা তোলো, দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।' এ গান আজ কার গান? যে নিবস্ত্র বন্দী বিপ্লবীকে গোয়েন্দা পুলিসের দপ্তরে নিয়ে গিয়ে গুহ্যদ্বারে লোহার রড পুরে দিয়ে বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে, দুঃখ তো সেই ধরেছে মাথায়। 'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না, যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা'—এ তো তোদের গান দ্বিধাগ্রস্ত কমরেডের প্রতি। 'ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে—ওরে ভাই, বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে—ওরে ভাই'—এ তো তোদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা। 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই'—এ গানে শক্তি তো পাবি তোরা। আর তোদের হয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারী শাসকদের বলছেন—'অনেক তোমার টাকাকড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি, অনেক অশ্ব অনেক করী, অনেক তোমার আছে ভবে। ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও—দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে।' কে বলতে পেরেছে এমন সহজ করে? কে গেয়েছে বিপ্লবের অনিবার্য জয়ের গান এমন সহজ সুরে? 'দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু—প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে করো দান,'

তোদের অসংখ্য শহিদদেব প্রাণদানের এটাই তো গর্জিত ঘোষণা। শান্তি আর অহিংসার বৃহন্নলাবৃত্তিকে দূর করে দিয়ে বিশ্বকবি বলেন—'ভীষণ প্রলয়-সংগীতে জাগাও, জাগাও, জাগাওরে এ ভাবতে'—পিস্তলের আওয়াজ শুনছিস না এ গানে? তোরা কি কালা! 'রিক্ত যারা সর্বহাবা সর্বজয়ী বিশ্বে তাবা, গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস'— বিশ্বময় শ্রমিক-বিপ্লবেব দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়েব এ গান তোদের কাজে লাগবে না? তোরা কি দেশের মানুষের ভাষায় কথা বলবি না? আব ওই জুলুমবাজ শাসক দস্যুর দল সাধারণত এ গান গাইতে দেয় না কেন জানিস? এর প্রতি ছত্রে আজকের পশ্চিম বাংলার আজকের কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হবে সেই ভয়ে। বিশ্বেব শ্রেষ্ঠ কবি তোদেব জন্য অসংখ্য গান আর কবিতা লিখে গেছেন, তোর দেশেব মানুষের অতি কাছেব কথায়—'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না মা', 'ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি।' এগুলো এদেশের আপামর জনতাব কাছের ভাষা, প্রাণেব কথা, চেনা জানা রূপকল্প। 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' প্রভৃতি দাঁতভাঙা সংস্কৃত কচকচি ছেড়ে এস— গানেব সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্, তোবা হবি বাঙালির ঘরেব ে া, ঘবেব ছেলে, বক্ষক, সাত বাজাব ধন মানিক।

পাছে উনি আবাব গান ধবে দেন, সেই ভয়ে আমি বিষয়টাকে হেঁচকা টানে নাটকেব দিকে নিয়ে আসি। বলি, কিন্তু নাটক লিখতে বসলেই রবীন্দ্রনাথ এমন সব—কি বলে—সাংকেতিকতা আব প্রতীকের হাট বসান যে মাইরি বলছি সবটাই কেমন জগাখিচুড়ি হয়ে পড়ে। কিছু বোঝা যায না।

বাজে কথা। ধমকে ওঠেন জপেনদা, সাংকেতিকতা আব আধ্যাত্মিকতাব লেবেল চাপিযেছে ভাড়াটে সমালোচকরা, রবীন্দ্রনাথকে দুর্জ্ঞেয় আর বহস্যময কবে রাখাব উদ্দেশ্যে। তুই তো নাটক কবিস শুনি—জানিস না সংকেত-টংকেত কতটা থাকবে না থাকবে সব নির্ভর করে প্রয়োগ-পদ্ধতির ওপর। রবীন্দ্রনাথ কোন নাটকে কতটা সাংকেতিকতাব আশ্রয় নিয়েছেন তা পাঠ্য নাটকেব প্রশ্ন। অভিনয়ের সময়ে বহুরূপীব 'রক্তকববী' কেমন বাস্তব জীবনেব প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, এটা দেখিসনি। আধ্যাত্মিক টাধ্যাত্মিক বাজে কথা। কোনো নাট্যকারই তাঁব নাটকেব ওপর এমনভাবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ চাপিযে দেন না। নিজের নিভৃত মতামতেব চাপে নাটক পিষে মারেন না কেউই। সমগ্র নাটকেব বক্তব্যেব মধ্যে ফুটে ওঠে তাঁর মতামত, নাটকেব প্রতি আনাচে-কানাচে সংকেত ঢুকিযে নিজেব পাযে কুড়ুল মাবেন না কেউ। ববীন্দ্রনাথ যা কবেছেন সেটা নাটকের কাব্য সৃষ্টি কবা। মানুষের আবেগকে কাব্যময় ভাষা ও চিত্রকল্পে প্রকাশ কবা। এবং তোদের জন্য কোনো কোনো নাটকে বিপ্লবেব কবিতা সৃষ্টি কবা। সেটা যখন এর্নস্ট টলাব কবেন বা পেটের ভাইস কবেন বা ব্রেখট্ করেন, তখন তোবা গদগদ হযে সমঝদার সাজিস। আব সেটা বাংলায় করলেই সাংকেতিকতার শৃগালবব তুলিস। কাব্যময় নাটকে বহু অভিজ্ঞতা ঘন হয়ে জমাট বেঁধে আসে। কাব্যের বৈশিষ্ট্যই তাই। নানা ধ্বনি, ছন্দ, উপমা, অলংকারে কবিতা জীবনের সাবাংশকে স্বল্প পরিসবে বাঁধে। বলার ক্ষুদ্র পবিসরে জেগে ওঠে না-বলাব বৃহৎ জগৎ। ইঙ্গিত আভাস চকিত দেখা এ নিয়ে কবিতার কারবার। সবটা গুছিয়ে বললে কবিতা আর কবিতা থাকে না। সেজন্য কবিতা কখনো গদ্যের মতন বাচালও নয়,

সহজবোধ্যও নয়। তাই হয়তো রবীন্দ্রনাট্য এদেশে এখনো সর্বগ্রাসী নয় ; এদেশের সাধারণ মানুষ যত সহজে দ্বিজেন্দ্রলাল বা ক্ষীবোদপ্রসাদেব নাটক বুঝতে পাবে, রবীন্দ্রনাট্যে তাদের অধিকার তত জন্মাযনি। কিন্তু সেটা ট্র্যাজেডি—একটা গণদুর্ভাগ্য। লোককাব্য ও লোকগীতিতে যে জনতা অভ্যস্ত, তাদেব কাছে ববীন্দ্রনাট্যেব কাব্য দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে—এই অসংগতি, এই দুর্যোগেব অবসান ঘটাতে হবে। তোবা কমিউনিস্ট, তোদেবই কাজ এটা—রবীন্দ্রনাট্যের উত্তবাধিকার জনতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে' কিন্তু তোবাই যদি সাংকেতিকতা-আধ্যাত্মিকতা-দুর্বোধ্যতা, এই সব বাজে প্রশ্ন তুলিস—বা জানোয়াবেব মতন ববীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙিস—তাহলে যা কববি শাদা বাংলায তার নাম জনতাব সঙ্গে বেইমানি।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবেব কাজে লাগে কিনা আমাব সন্দেহ আছে, আমি মত দিই বিজ্ঞের মতন—বিপ্লবেব পব ববীন্দ্রনাট্য বিচাব কবতেই হবে। কিন্তু এখন এই অবিশ্রাম লডাইয়েব মাঝখানে কোন কাজে আসবে ওই সব কাব্যি?

রাজেন হঠাৎ আমাকে ধ- :ক উঠল, কাব্যি কেন? কাব্য। মস্তানদেব ভাষা মকশো কবছিস কেন? শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বল।

যাচ্চলে' বলি আমি, তুই কোন দলে বে?

রাজেন উষ্ণস্বরে বলে, সব ব্যাপাবে দল টানিস কেন? ঠাণ্ডা মাথায বিষয়টা চিন্তা কর না। বলুন জপেনদা, আমি শুনতে চাই, আজকেব প্রত্যক্ষ লডাইযে বোমার বিস্ফোবণ আব পিস্তলেব শব্দেব ম:ধ্য রবীন্দ্রনাট্য আমাদেব হাতে অস্ত্র হতে পাবে কিনা।

জপেনদা একটা চারমিনাব ধবিয়ে নীল ধোঁযা উদ্‌গাব কবেই কেশে ফেললেন বিকট শব্দে' তাবপর বললেন, প্রথমেই বলি, তোদেব মধ্যে কোনো কোনো ফিলিস্টাইন আছেন, পদ্মবনে মত্তহস্তী আছেন, যাঁবা কোনো নাটক-গান-সাহিত্যকেই বিপ্লবেব অস্ত্র বলে স্বীকার কবেন না। তাঁদেব মতে অস্ত্র মানে পেটো বা পাইপ-গান। এইসব আক্ষবিক মানুষবা সব নাটককেই ভাবেন বিপ্লবের অন্তরায। সময় নষ্ট কবাব প্রতিবিপ্লবী গ্যাঁড়াকল। এঁদেব রবীন্দ্রনাট্যেব শক্তি বোঝানো আমাব কম্ম নয। মাও বলেন, বিপ্লবী সংস্কৃতি ব্যতীত বিপ্লব হইতে পাবে না। সেই মাও যাঁদের বোঝাতে পাবেননি তাঁদেব কেস খারাপ। তোবা যদি সেই নীবস দলে না হোস, যদি বিশ্বাস কবিস যে নাটক, গান, কবিতা দিয়ে মানুষেব মনকে জয কবে বিপ্লবেব শক্তি বৃদ্ধি কবা যায়, তবেই মুখ খুলতে পাবি।

কিন্তু পাছে আমবা কোনো আপত্তি জানাই তাই পবক্ষণে নিজে থেকেই জপেনদা মুখ খুললেন।

'রক্তকরবী' ধব! এল তাঁব বক্তৃতাব গৌবচন্দ্রিকা—'মুক্তধারা', 'অরূপবতনে' তোদেব আপত্তি আছে, অভিনয করিস নে। কেই ব: মাথাব দিব্যি দিযেছে তোদের যে ওগুলো কবতেই হবে। স্ববিবোধী ববীন্দ্রনাথের একটা দিক সম্পূর্ণ এড়িযে চল্ কিন্তু অন্য দিকটাকে আঁকড়ে ধর। কী তোরা বলবি যা রবীন্দ্রনাথ আগেই বলেননি? তোদের রাজনীতিটাকে 'রক্তকরবী'তে তিনি আদ্যোপান্ত উপস্থিত করেছেন, কিন্তু বাংলায, মধুর বাংলায—তোদের মতন আধা ইংবিজি আড়ষ্ট খটমট ভাষায নয়। তোদের যা যা বক্তব্য সব বলা হয়ে গেছে 'রক্তকরবী'তে,

কিন্তু সেটা বলা হয়েছে এমন ছন্দে, সুরে, ভাবে যে কথাগুলো বুকে গিয়ে বাজে। এইখানেই বিপ্লবী সংস্কৃতির ভূমিকা। তোদের কথাবার্তা আর লেখা শুনে আর পড়ে, আমার ধারণা, জনতাব একটা বিরাট অংশ ছোটে অভিধান দেখতে আর বাকি অংশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে অনুধাবনেব ক্লেশে। সেখানে 'বক্তকববী' দৃষ্টিগ্রাহ্য কতকগুলি ঘটনা ও প্রতীকের সাহায্যে অতি মনোহব খাঁটি বাংলা ভাষায় এমনভাবে তুলে ধবেছে এযুগের শ্রেণীসংগ্রামের সারবস্তুটিকে যা শুধু মগজে আঘাত করে না, হৃদয় আলোড়িত কবে। কার্ল মার্কস-এর শ্রমশক্তি বিক্রয়ের তত্ত্বটা জানিস? ও কাকে বলছি? পড়াশোনা তোদেব ধাতে নেই। শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য মজদুরকে কী কবে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য কবে পুঁজিপতিবা, তার ভযাবহ চিত্র তুলে ধরেছেন মার্কস। তিনি দেখাচ্ছেন প্রক্রিযাটা বৃত্তাকাব সীমাহীন ঘানিতে বাঁধা বলদের মতন। এই অনাদি অনন্ত শ্রমেব ফলে মজদুব বিযোজিত হয় সব সুকুমার বৃত্তি থেকে, হাবায ব্যক্তিত্ব, রুচি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যেব উত্তরাধিকার এমনকী ফিউদাল শোষণে ভূমিদাসেব যে গ্যারান্টিগুলি ছিল, পুঁজিবাদের সুসংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক শোষণে শ্রমিক সে গ্যাবান্টিও হাবায়। এই তত্ত্বই 'রক্তকববী'তে এসেছে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ কবে। যক্ষপুরীব শ্রমিকদের নাম গেছে হাবিযে, পিঠে আঁকা ৪৭ ফ আর ৬৯ ঙ সংখ্যাই তাদের পরিচয়। তাদেব মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তাবা এক অন্ধ শোষণযন্ত্রেব নাটবল্টু। বিশু যখন বলে—

> শেষে দেখি যক্ষপুবীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তাব হাঁ বন্ধ হযে যায়, এখন তাব জঠবেব মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ সেই আশাহীন আলোহীন জঠবের মধ্যে তলিয়ে গেছি—

অথবা

> একদিনেব পব দুদিন, দুদিনেব পর তিন দিন , সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পব দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালেব পব দু তাল, দু তালেব পব তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পব অঙ্ক সাব বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমবা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।

—তখন নিছক কোনো সাংকেতিকতা হচ্ছে না, তোব অশালীন ভাষায় 'কাবিা কবা' হচ্ছে না। তখন একটা বিশেষ শোষণব্যবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ হচ্ছে, যেটা তোবাও অহবহ করে থাকিস—অবশ্য বেহেড তর্কপঞ্চাননী ভাষায। মার্কস দেখিয়েছিলেন, শ্রমের প্রাবল্য, একঘেযেমি, কাজের সময বাড়ানো, কাজেব হার প্রভৃতির ফলে শ্রমিকের ব্যক্তিসত্তা লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে—বিশু তো ঠিক তাই বলেছে। সে কথাবই তো প্রতিধ্বনি শুনি যখন নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে—

> ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে?
> সর্দার ॥ ওদের আমরা বলি বাজার এঁটো।
> নন্দিনী ॥ মানে কী?
> সর্দার ॥ মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী ॥ কিন্তু এসব কী চেহাবা? ওবা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস মজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে?

সর্দার ॥ হয়তো নেই।

নন্দিনী ॥ কোনো দিন ছিল?

সর্দাব ॥ হয়তো ছিল।

নন্দিনী ॥ এখন গেল কোথায়?

আমি আপত্তি কবলাম, শ্রমিক কি শুষে নেওয়া ছিবড়ে, মাংসপিণ্ড? সে কি লড়েও না? শ্রমিকশ্রেণীর এ কী চিত্র?

একটা মিনিট বিদ্যে জাহিব স্থগিত রেখে কথাটা শুনে নে। ভেঙিয়ে উঠলেন জপেনদা। এই শোষণেব বিরুদ্ধে যক্ষপুবের কারিগবদেব বিদ্রোহটাই হচ্ছে 'বক্তকববী' নাটক! কে বলেছে ওরা শুধু পড়ে পড়ে মাব খায়? গজ্জু টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু একটাই তার প্রার্থনা:

দযাময ভগবান, জীবনে যেন একবাব জোব পাই আর .ক দিনেব জন্যেও। . . কেবল ওই সর্দারটাব ঘাড মটকে দেযার জন্য। সর্দারের বুকে যদি একবাব দাঁত বসাতে পারি।

যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিবোধ। গজ্জুব কথায় সর্বহাবার প্রাথমিক অন্ধ ঘৃণাব প্রকাশ। কিন্তু সেখানেই ববীন্দ্রনাথ ছেদ টানেননি যদিও টানলেও আমাদের কিছু বলার থাকত না। 'নীচের মহলের' ব্যর্থ অন্ধকারে আত্মহত্যা আর মাতাল কণ্ঠের গানে নাটক শেষ করলেও কারুর সাধ্য নেই গোর্কিকে বাদ দিয়ে বিপ্লবী সংস্কৃতির কথা বলে। তুলনায় গজ্জুর আক্রোশ আব শ্রেণী ঘৃণা আমাদের হাতে ঢের বেশি ধারালো খডগ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিছক ঘৃণা থেকে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এসেছেন রঞ্জনকে। রঞ্জনের নামোচ্চারণেই শান্তিপ্রিয় পণ্ডিতের দল অনুস্বার বিসর্গের হাট বসিয়ে তাকে নানা কোমল ও অলৌকিক ভাবের প্রতীক বানাবার চেষ্টায় মাতেন। এঁরা চেপে যান প্রতীকেরও দ্বৈত সত্তা থাকে। একদিকে সে স্রষ্টার কোনো মতের বাহন হতে পারে; কিন্তু অন্যদিকে কাহিনীর সীমানায় সে এক বাস্তব চরিত্র হয়ে আসতে বাধ্য। রঞ্জন কোন গূঢ় তত্ত্বের বাহন আমি জানি না , আদৌ কোনো বাহন কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে। আমাব ধারণা সে শুধু মুক্তির দৌবারিক, বিদ্রোহী উল্লাসের কাব্যময় রূপ। কিন্তু নাট্যকাহিনীর লজিকে সে কে? কী তার ভূমিকা? এ-দিকটা চাপবার এত উৎকট প্রয়াস কেন? সে স্পষ্টতই বিপ্লবী, সচেতন এক বিদ্রোহী : 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।' তাই তাকে শিকল দিয়ে বাঁধতে ছুটেছে সর্দারের লোকেরা। অর্থাৎ রঞ্জনকে গ্রেপ্তার করতে চায় ওরা।

মোড়ল বলে, 'শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে—ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে, চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।'

একথার মধ্যে বায়বীয় সব তাৎপর্য খুঁজে মরুক ভাববাদী পণ্ডিতের দল। নাটকের চৌহদ্দির মধ্যে এর অর্থ স্পষ্ট, সরাসরি বাস্তব। রঞ্জন বন্দীদশা থেকে পলায়ন করেছে; সে ছদ্মবেশ ধারণে

দক্ষ ; সে পালিয়ে চলে এসেছে ব্রজগড় থেকে কুবেরগড়ে ; সে খোদাইকরদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন দলেব পর দল নির্ভীক বিপ্লবী যুবকদের, যাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে দেশেব মুক্তি কামনা করতেন, সাম্রাজ্যবাদেব ভাষায় যাঁদের নাম 'সন্ত্রাসবাদী'। বিশুকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে, নন্দিনী শুধোয়, 'কী দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে?' বিশু জবাব দেয় :

এতদিন পরে আজ সত্য কথা বলেছিলুম।

গোর্কির 'মা' উপন্যাসে বন্দী রাইবিনের কথাও তাই। কিন্তু কেউ এসে রাইবিনকে ধোঁয়াটে সব দর্শনের প্রতীক বানিযে তোলেনি।

আর রঞ্জন যে শুধুই এক অতীন্দ্রিয় অলৌকিক পুরুষ নয় তাব প্রমাণ হিসেবে বিশু কিশোরকে বলে যাচ্ছে—

এখন ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবাব আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন কবে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

এই সব নির্দেশ বহুদিন যাবৎ বিশ্বেব সব বিপ্লবীবা দিয়ে যাচ্ছেন সহযোদ্ধাদের। এই প্রত্যক্ষ সত্যকে এড়িয়ে রঞ্জনের মধ্যে শুধুই 'প্রকৃতির ছন্দ' আব 'মানবাত্মাব সংকেত' খোঁজার অর্থ হল রবীন্দ্রনাথকে এমন এক ব্যর্থ নাট্যকাব বলা, যিনি গল্পের গাঁথুনিব তোয়াক্কা বাখতেন না, যাঁর চরিত্রগুলিব প্রাথমিক যুক্তিও নেই, যাঁব নাটকের আত্মা আছে দেহ নেই। সাংকেতিক বা প্রতীকী নাটকের ধর্মই তাই—তার চরিত্ররা গূঢ় অর্থবহ হতে পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদেব হাড় রক্ত মাংসেব স্থূল মনুষ্যও হওয়া চাই। যে সব পণ্ডিত রবীন্দ্রনাট্যেব রক্তমাংসের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুই স্বপ্নের দিকটাকে ধাওয়া করেন, তাঁবা তোদেরই মতন অসুর। তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙে ফেলছেন, নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁবা বিশুদ্ধ ভাববাদী বানাবার চেষ্টায় আছেন।

রঞ্জন-বিশুদের বিদ্রোহের কথাটা বুঝলে তবেই শুধু বোঝা যাবে রঞ্জনের মৃত্যুর তাৎপর্য, বোঝা যাবে কেন তার শবদেহের উদ্দেশে নন্দিনী বলে, 'তোমার জযযাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে!' তাই তো হয়। তোদের আত্মদান থেকে শুরু হয় বিজয় অভিযান। মৃত্যুতে লড়াইয়ের শেষ নয়, শুরু। নন্দিনীর কথায়—

নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বব আমি-যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মবতে পারে না।

রঞ্জনের মৃত্যুকে সামনে রেখেই বুঝি বিশুর কথা :

আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। . . . আয়রে ভাই , এবার লড়াইয়ে চল্।

রঞ্জনকে রাজার জালের পেছনে মরতে দেখে আমি ভাবি সেই আনন্দময় হাস্যোচ্ছল গান-পাগল ছেলেটার কথা, যে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সেরা ছেলে, যার দেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলাম মহামেডান স্পোর্টিং মাঠের কাছে, মাথার পেছনে পুলিসি পিস্তলের গুলির ফুটো। তারপর বিশুদের লড়াইয়ে যাওয়া দেখে ভাবি অদূর ভবিষ্যতের শ্রমিক অভিযানের কথা, খনি

শ্রমিকদেব হাতে দেখি অস্ত্র, দেখি ইস্পাত আব রেল শ্রমিকদের বলিষ্ঠ ছাতি যারা বন্দীশালা ভাঙতে বেবিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে জাদুঘবে বন্দী কবে ফেলতে চায় শত্রুবা, তাঁকে কবতে চায় কণিষ্কেব কবন্ধ মূর্তি, বিশেষজ্ঞেব গবেষণার লক্ষ্য, ইতরজনের বুদ্ধির অতীত। বাজে কথা। ববীন্দ্রনাথ জ্যান্তো, আজকের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি আছেন আমাদের পাশে। নির্জীব কীটদষ্ট পুঁথি তিনি নন, তিনি নন পুবাতত্ত্ব। তিনি এখনো সংগ্রামেব স্লোগান। ঘরেব পাশে বাংলা-দেশে তাঁকে ঘিবে প্রথম জমাট বাঁধে একটা আস্ত মুক্তিযুদ্ধ।

'বক্তকরবী'ব আরেক সম্পদ ধর্মের বিশ্লেষণ, ধর্মকে সোজাসুজি শাসকশ্রেণীর সেবাদাস রূপে নির্দেশ। কার্ল মার্কস ধর্মকে বলেছিলেন জনতাব প্রাথমিক সান্ত্বনা, শোষণ ভুলে থাকবার উপায়। লড়াই এডাবাব যুক্তি, মদ, আফিম। 'বক্তকরবী'ব গোঁসাই-এব একই উপদেশেও সেটাই প্রকট। কাবিগবদের তিনি বলছেন .

> আশীবাদ কবি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুবেব দয়াও তোমাদেব 'পবে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবাব কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হবি'। তোমাদেব সব বোঝা হালকা হযে যাক।

শাসকশ্রেণী ধর্মকে কান ধবে পাঠাচ্ছে শ্রমিক উত্তেজনা প্রশমনের কাজে। সর্দাব বলছেন

> প্রভুপাদ বরঞ্চ ওপাডায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীবা যেন একটু খিটখিট শুরু করেছে।

লাঠি গুলি আব হবিনামেব মধ্যে সম্পর্কটা গোঁসাই মেলে ধরছেন স্পষ্ট করে :

> বাবা, দন্ত্য-ন পাডা যদিও এখনো নড়্নড় করছে, মূর্ধন্য-ণযেবা ইদানীং অনেকটা মধুর বসে মজেছে। মন্ত্র নেবাব মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আবো কটা মাস পাডায ফৌজ বাখা ভালো। . ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা।

জানি না বিশ্বসাহিত্যে কজন পেরেছেন এমনভাবে শোষকের হাতেব পুতুল ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন কবতে। ফৌজেব পেছনে আসে গোঁসাইবা । গুলি চালিযে মানুষ মেবে সেই শ্মশানে ওরা নাম সংকীর্তনের আসর বসায় যাতে জনতা উলটে মাবাব তত্ত্বটা বিস্মৃত হয। বোমারু বিমানেব পেছনে ওরা পাঠায় খ্রিস্টের বাণী, খান সেনাব পেছনেই থাকে মৌলানা, গ্রাম জ্বালিয়ে দিযে ওরা শ্রীচৈতন্যেব কথামৃত শোনায়। শাসকশ্রেণীর দুই অস্ত্র, ফৌজ আব ধর্ম।

গজ্জুকে মেরে মেবে যখন গজভুক্ত কপিত্থেব মতন শক্তিহীন কবে ফেলছে ওরা, তখনই গোঁসাইয়ের আত্মতুষ্টি :

> হবি হরি, এবি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হযে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনেব দলে টেনে নিতে পারব।

বলপ্রয়োগে শাসকশ্রেণী চূর্ণ করে জনতার দেহ, ধর্ম দিয়ে চূর্ণ করে মন। একই বৃন্তে দুটি ফুল—পুলিস আর গোঁসাই। একই অর্থগৃধ্নুশক্তির দুই রূপ। নির্যাতিত বন্দী বিশু সেটাই বলছে :

> চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুব মাবে। যে-রশিতে এই চাবুক তৈরি

সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি।

মেজো সর্দাবও সেই কথাই কইছে :

ওর-যে এক পিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে।

কিন্তু আফিম খাওয়াবার এই বিরাট শান্তিযজ্ঞে বাধা আসে নন্দিনীব কাছ থেকে, বিদ্রোহের মুহূর্তে ব্যর্থ হয় ধর্মেব ষড়যন্ত্র আর অহিংসার ধেনো মদ :

গোঁসাই ॥ এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী ॥ শুধু নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই ॥ মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী ॥ শান্তি যদি পাই তবে ধিক ধিক ধিক আমাকে। তোমাদের ওই ধ্বজদণ্ডের দেবতা,·সে কোনো দিনই নবম হবে না। কিন্তু জালের আডালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমাদের।

ওই একটি 'ব্যবসা' কথাতেই সব ফাঁস, ভগবান অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের গোপন হিসাবের খাতা খুলে পড়েছে।

তোরা বিশুদ্ধ, জীবনবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের যে সমালোচনা করিস, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেটাই করেন অপূর্ব ভাষায় অধ্যাপকের জবানিতে

জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিযে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদেব বাজা যেমন ভযংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

পলায়নে তৎপর পুরাণবাগীশের সম্বন্ধে অধ্যাপক বলছেন :

দেখো না, পুবাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন সরে পডেছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা।

কোথায় পালিযে বাঁচতে চায় বিশুদ্ধ পণ্ডিত? কী করে লড়াই এডাবে সে? ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য ; কোথায় খুঁজছে সে নীলসায়রেব অচিনপুর? তোদের কথাগুলো ছড়ানো পুরো নাটকে। জালে আবদ্ধ রাজা নিজশক্তিতে বন্দী, রাষ্ট্রশক্তি সেজে ভয় দেখাচ্ছে জনগণকে ; আসল শক্তি কিন্তু সে নয়—শক্তি রয়েছে সর্দারের হাতে। নন্দিনীর ভাষায়, জালে জড়ানো মরা ব্যাঙ হাতে ওই রাজা হচ্ছে 'জুজুর পুতুল' মাত্র, তোদের ভাষায় 'কাগুজে বাঘ'। আজকের রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার, তারাও থাকে জালের পেছনে। জনতার সঙ্গে তাদের পরিচয় শুধু বেতারে গুরুগম্ভীর ভীতিকর কণ্ঠস্বর মারফৎ, ঠিক ওই রাজার মতন দুজনই জুজুর পুতুল। আসল ক্ষমতাবানদের হাতে দুজনই ক্রীড়নকমাত্র। এমন তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যিনি করেন, তাঁর মূর্তি ভাঙুক ওই ক্ষমতাবানরা। তোরা তাদের কাজটা করে দিয়ে আসছিস কেন রে কমবখ্‌ত্?

এমনি সময়ে হঠাৎ রাস্তায় শুরু হল ছুটোছুটি। চকিতে চারটে পুলিসের গাড়ি এসে দাঁড়াল দোকানের সামনে। খোলা পিস্তল হাতে জনা-দশেক অফিসার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন দোকানে, দুটো টেবিল উলটে গেল, চেয়ার গেল ছিটকে, দুজন খদ্দের পালাতে গিয়ে অকারণ মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হল। সামনেই দেখি সেই রবীন্দ্রভক্ত অফিসার। এই যে, সাক্ষাৎ এখানেই বসে আছ? বলে তিনি রাজেনকে কলার ধরে হেঁচকা টানে দাঁড় করালেন। চলো শুয়োরের বাচ্চা, মাও ৎসে-তুং-এর বাচ্চা।

রাজেনের ভাঙা পাঁজরের ওপর ধুপ ধুপ করে পড়ল লাঠি। হাত পা ধরে তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল ভ্যানের মধ্যে। রাজেন গোঙাল না, কথাটি কইল না। ভ্যান চলে গেল। দুপাশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইল অসংখ্য মানুষ, চাপা ক্রোধে থমথম করছে তাদের কালো ঘর্মাক্ত মুখ।

মৃদুস্বরে জপেনদা বললেন, রঞ্জন আবার চলে গেল জালের পেছনে।

তারপর—কী আশ্চর্য—জপেনদার দুচোখে চিকচিক করতে লাগল দুবিন্দু অশ্রু। তিনি বললেন,

ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ।

আধখানা মানুষ

আমরা সম্প্রতি এক প্রবল জঙ্গি নাটক তৈরি করে গিয়েছিলাম ডালহৌসি স্কোয়েরের প্রশস্ত রাজপথে অভিনয় করতে। নাটকটা লিখে আমার বিপ্লবী ফুসফুস বেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল। নাটকে আমি এক কৃষক বিদ্রোহের চিত্র তুলে ধরেছিলাম, এবং এ-ও দেখিয়েছিলাম বাবুদের প্রভাব কাটিয়ে কী করে কৃষকরা বিদ্রোহের পথ ধরল। জপেনদার দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা ভাঙিয়ে, দু কাপ চা এবং এক প্যাকেট চারমিনার ঘুস দিয়ে, তাঁকে নিয়ে গেলাম পথনাটিকার বীরত্বটা দেখাতে। নাটকটা জমেও ছিল, এক ফুটপাথ মানুষ নাটক দেখে তারিফ করছিলেন। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কৃষকরা জোতদারকে কোতল করবে করবে করছে, এমনি সময়ে প্রবল শব্দে দুটি বোমা ফাটল আমাদের ব্যূহের মধ্যে। ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে, বাবুদের গন্ধে বার দুয়েক ওয়াক তুলে আমি ছুটতে লাগলাম একদিকে। মনুমেন্টের কাছে এসে দেখি পেছনে ছুটে আসছেন জপেনদা, উদ্‌ভ্রান্ত তাঁর দৃষ্টি, ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল। আমরা মনুমেন্টের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। ওদিকে ডালহৌসি স্কোয়েরে তখন খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে, দর্শকরা মাস্তানদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতেছেন।

কিছুক্ষণ জপেনদা অব্যক্ত ক্রোধে আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—আমার স্যান্ডালজোড়া গেল তোর জন্যে।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম—বা, আমি কী করে জানব শালারা বোমা মারবে?

জপেনদা রাগের চোটে কিছুক্ষণ নৃত্য করে বললেন—না, তুমি কচি খুকু, তুমি জানবে কী করে! শহরের এই অবস্থা, টুঁ শব্দ করলে খুন করছে, আর তোমায় রাজভোগ খাওয়াবে! কেন, গেছলে কেন ওখানে কোমর নাচাতে?

এই অশ্লীল মন্তব্যে আমি ক্ষুণ্ণ হলাম। ধরা গলায় বললাম—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে বাঁধা পড়তে আমরা রাজি নই, গণনাট্য আন্দোলনকে নিয়ে যেতে হবে রাস্তার মোড়ে, জনতার মুখরিত সখ্যে।

পদীপিসির মতন কথা কইছিস কেন?—ধমকে ওঠেন জপেনদা—শীতাতপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে ঢুকলেই তোর সতীত্বে নিউমোনিয়া ধরবে নাকি? শীতাতপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে অভিনয় করলেই নাটক প্রতিক্রিয়াশাল হয়, আর মুক্ত অঙ্গনে করলেই নাটক বিপ্লবী হয়ে ওঠে? কথাগুলো শোনাচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপের বিশুখুড়োর মতন, যে ব্যাটা বড়ো থিয়েটারে ঢুকতেই ভয় পায়।

সে কথা নয়—আমি বাধা দিই—চেয়ারম্যান মাও বলেছেন, কার জন্য নাটক করছি সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এমতাবস্থায় আমরা রাজপথে নেমে গিয়ে জনতার জন্য নাটক করতে চাই।

আমার ভয় হল জপেনদা আমায় চড় মারতে পারেন, তাই দু-পা পিছিয়ে গেলাম। হাতের কাছে আমায় না পেয়ে জপেনদা চিনেবাদাম কিনতে কিনতে বললেন—রাজপথে নেমে গিয়ে

কোন জনতার জন্য আজকেব নাটকটা করলি? কলকাতা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কি তোর চেয়ে কম রাজনীতি জানে? তারা তোকে কানে ধরে রাজনীতি শেখাতে পারে। আজকে যাদের জন্যে ওই জঘন্য কদর্য থাবড়া-খাওয়ার-যোগ্য প্লে-টা করলি, তারাই তো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে এসে নাটক দেখেন। যাঁরা মুক্ত অঙ্গনে দেখেন, তাঁরাই রঙ্গনায় যান, তাঁরাই আসেন রবীন্দ্র সদনে, তাঁরাই শহরের পার্কে ভিড় করেন পথনাটিকা দেখতে। তাঁদের জন্য তোকে দয়া করে কষ্ট কবতে হবে না। প্রাণে অত বিপ্লব জেগে থাকলে যা শ্রমিক-অঞ্চলে, যা গ্রামে, যেটা ছিল চেয়ারম্যান মাও-এর বক্তব্য। কলকাতা শহরের মধ্যেই ঘুরপাক খাব, আর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারের চেয়ে গরম থিয়েটার ভালো এইসব ধাপ্পা দিয়ে বিপ্লবী সাজব, ওসব ফকড়েমি ছাড়, সুবিধাবাদী বেল্লিক কোথাকার! এই চা-ওলা, চা এত ঠাণ্ডা হুয়া কেন?

অতঃপর কিয়ৎকাল চা-ওলার সঙ্গে জপেনদার হিন্দিতে তর্ক, যদিও বোঝা যাচ্ছিল চা-ওলা মেদিনীপুরের লোক। এবং সেও পিতৃমাতৃহীন হিন্দিতে জবাব দিতে লাগল। হট্টগোল থামলে পর জপেনদা আমার দিকে তাকালেন খ্যাপাটে চোখে এবং চোয়াল নেড়ে নকল দাঁতের পাটিকে স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বললেন—মাও ৎসে-তুং-এর নামটা ওই পাপমুখে আনবার আগে নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন কর . জনতা বলতে মাও কী বুঝেছিলেন? শ্রমিক-কৃষক। তোরা কুঁড়ে পাতি-বুর্জোয়ার দল ডালহৌসি স্কোয়েরে গিয়ে মাও-এর পথ ধরছিস্, এটা মিথ্যে কথা। উপরন্তু শহরেব মধ্যে এসব বিপ্লব বিপ্লব খেলা করারই কথা ছিল না। মাও তা বলেননি। বেকুব, মূর্খ!

আমিও এবাব চটে উঠি, মানুষের শরীর তো। বলি—শহরে বিপ্লবী নাটক হবে না? মাও এমন কথা বলেছেন? বলতে পারেন?

বলতে পারেন!—ভ্যাঙালেন জপেনদা—গোরুও তো বই পেলে চিবিয়ে খেয়ে নেয। বইয়ের সঙ্গে সে সম্পর্কটাও তোদের নেই, খাদ্যখাদক সম্বন্ধও পাতাতে পারিসনি। মাও বলেন, লড়াইটা হবে গ্রামাঞ্চলে। শহরে আমরা করব আত্মরক্ষা, আক্রমণ নয়। শহবের আইনের চৌহদ্দির মধ্যে চলবে লড়াই।

কক্ষনো মাও এমন বলেননি—আমি বললাম—শত্রুর আইন মেনে চলতে হবে, একথা মাও বলতে পারেন না।

তৎক্ষণাৎ দাঁতে-ড্রিল-চালানো তীব্র কণ্ঠে জপেনদা বললেন—রচনাবলি চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪, পার্টির ইতিহাস সম্পর্কে প্রস্তাব।

গড়ের মাঠে দাঁড়িয়ে রচনাবলির চতুর্থ খণ্ড আর কোথায় পাব? আর জপেনদার ক্যামেরা-সদৃশ স্মৃতিশক্তির মারপ্যাঁচ আমার জানাই ছিল। তাই আর জবাব দিলাম না।

মোষের মতন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন?—গর্জে উঠলেন জপেনদা এবং সেই সঙ্গে চায়ের ভাঁড়টাকে আছড়ে ভাঙলেন মনুমেন্টের গায়ে—আরো দশ-বিশটা প্রবন্ধের নাম করতে পারি, যেখানে মাও একই কথা বলেছেন।

পাছে উনি আবার পরিসংখ্যানে ব্যাপৃত হন, তাই আমি বলে উঠি—থাক, থাক, হযেছে তো।

এবং কেন বলেছিলেন বুঝলি তো আজ? জপেনদার সরোষ উক্তি—মার খেয়ে পাট হয়ে

বুঝলি তো? সন্ত্রাসের রাজত্বে বেলেল্লাপনা চলে না, শহরে এসে দুটো খোঁচা মেবে কমিউনিস্ট হওয়া চলে না। নিজেব ভালো বোঝো না, সংস্থা সংগঠন বোঝো না, কায়দা কৌশল বোঝো না, পিছু হঠতে শেখোনি, তোমবা আবার বড় বড় বাকতাল্লা মারো।

এই বলে জপেনদা দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিলেন, আমিও পিছু নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে জপেনদা বলতে লাগলেন, আব যে নাটকটা দেখালি আজ ওটা কী?

ওটা নাটক—বলি আমি, জনতার সংঘবদ্ধ যুদ্ধেব ছবি।

জপেনদা দেখলাম আবার বোঁ করে ঘুরে উত্তব দিকে হাঁটতে লাগলেন। বুঝলাম উনি পদব্রজে বালিগঞ্জ যাচ্ছেন না, উত্তেজিত পায়চারি করছেন মাত্র। বললেন—ওই সংঘবদ্ধ কথাটাকে আমি সন্দেহেব চোখে দেখি। তোব নাটকে নায়করা কোথা? তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কোথায়? তাদের ব্যক্তিগত দোষগুণ সব কোথায গেল?

আমি গম্ভীব হযে বলি—ব্যক্তিগত ইযেব দিন গেছে। আজকেব লডাইয়ের নায়ক হচ্ছে সমষ্টি—সমষ্টিবদ্ধ জনতা। আমাব নাটকে তাই সমষ্টিই হচ্ছে নায়ক, যূথবদ্ধ মেহনতি মানুষই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট।

বাস্তব লডাইযেব নায়ক হচ্ছে সমষ্টি' তাই সাহিতোব নাযকও হবে সমষ্টি?—শুধোলেন জপেনদা, ভ্রূযুগলকে কেশসংলগ্ন করে, বাস্তবে সংঘবদ্ধ লড়ছে বলে নাটকেও বৈশিষ্ট্যহীন ব্যক্তিত্বহীন অবযবহীন একপাল লোক দেখাতে হবে? তোব মাথার ইস্ক্রুপগুলো টাইট আছে তো? তোব কাছে কি জীবন ও সাহিত্যে কোনো পার্থক্য নেই, বাস্তবে স্বপ্নে প্রভেদ নেই? এমন লোকদেবই তো পাগল বলে শুনেছি। বাঁচিব টিকিট কেটে দেব?

এই কটূক্তি আমি গায়ে মাখলাম না, বললাম, বাস্তবের লডাইটাকেই তো নাটকে দেখাতে হবে। তাকেই বলে বিপ্লবী বাস্তবতা।

আগ্যে না—খেঁকিয়ে উঠলেন জপেনদা—বাস্তবের লড়াইটাকে দেখালেই নাটক হল না। বাস্তব প্লাস আরো অনেক কিছু তবে ইকোযাল টু নাটক। লেনিন পিসারেভকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, বিপ্লবীবা স্বপ্ন দেখতে শেখো। বাস্তবের সঙ্গে সেই স্বপ্নের হবগৌরী মিলন ব্যতীত নাটক হয না, হয় প্যামফ্লেট। গোর্কির বিপ্লবী বোম্যান্টিসিজ্‌ম-এর তত্ত্বটা পড়েছিস? যাহা বাস্তবে ঘটে কেবল তাহাই নাটকেব বিষয নহে, যাহা ঘটিবে, ঘটা উচিত তাহাও বাস্তব, সুতরাং তাহাও নাটকেব বিষয়। সম্প্রসারণ—গোর্কি একে বলেন বাস্তবের সম্প্রসারণ। এই সম্প্রসারিত বাস্তবই বিপ্লবী সাহিত্যের ভিত্তি। কিন্তু এর মধ্যে ব্যক্তিমানস আসছে কোথায়? আমার অধৈর্য প্রশ্ন—ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা ভয়ভীতি দেখাবার প্রশ্ন উঠছে কেন? সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তি লুপ্ত না হলে সংঘবদ্ধ যুদ্ধেব জন্য শ্রমিক তৈরি হবে কেন, বিপ্লব হবে কেন?

জপেনদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং চোখের দৃষ্টিতে সফেন হলাহল বিকীরণ কবে বলেন—তুই সি আই এ-র এজেন্ট না তো?

আচমকা এমন কথায় আমি বিষম খেয়ে কাশছি সেই সুযোগে জপেনদা হুংকার ছেড়ে বলেন—মহিষের পাল এসে বিপ্লব করে এটা তো সি আই এ-র কথা। বিপ্লবের জন্য উন্নতশিব মানুষ লাগে না, লাগে হস্তীযূথ, পালবদ্ধ চিন্তাশক্তিহীন জানোয়াব—এসব কথা কয

সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে প্রচাবকবা। আর কার্ল মার্কস্-এর কথা হচ্ছে বিপ্লবে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে। শ্রমিক কৃষককে পুঁজিপতিরা করে রাখে ব্যক্তিত্বহীন গোষ্ঠীবদ্ধ উৎপাদনী যন্ত্রমাত্র। তারা আধখানা হয়ে আছে। বিপ্লব তাকে এই পরিচয়হীনতা থেকে মুক্তি দেয়। জগন্নাথের রথের মতন যে সমষ্টিজীবন শ্রমিকের ব্যক্তিসত্তাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সেটাকে ধ্বংস করে শ্রমিক নূতন সমষ্টি গড়ে, সেখানে প্রত্যেকে পূর্ণ বিকশিত। তুই মাইরি জর্জ অরওয়েলের ফিরিওলা!

আমি একটু বিমর্ষ হযে পডলাম। ততক্ষণে চাবমিনাব ধবিয়ে উকিলি কণ্ঠে জপেনদা বললেন, সমষ্টি দ্বিপ্রকার। এক, শোষণের সমষ্টি, তা শাসকশ্রেণী গডে তোলে শোষণের সুবিধার্থে ; যেখানে শ্রমিক ও কৃষকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পিষ্ট ও চূর্ণ হয়। দুই, বিপ্লবী সমষ্টি, যেখানে শ্রমিক ও কৃষক মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যেখানে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিকশিত, যেখানে সমষ্টি ও ব্যষ্টিব মধ্যে বিবোধ নেই, যেখানে প্রত্যেকে পবিপূর্ণ। তোদের অধিকাংশ নাটকে ওই শোষণের সমষ্টির প্রশংসা শুনি। সংঘবদ্ধ শ্রমিক বলতে তোরা শোষণের সংঘকে বড কবে তুলিস, হয়তো নিজেদের অজান্তে। তারপব আবার সাফাই গেয়ে বলিস শ্রমিক যেহেতু সংঘবদ্ধ সেহেতু শক্তিমান। মারাত্মক প্রমাদ! যতক্ষণ শ্রমিক বর্তমানেব চিডিযাখানাব সংঘ ভাঙতে না পাবছে ততক্ষণ সে শক্তিমান নয়, সে উৎপাদনের নাটবল্টু মাত্র। সে আধখানা মানুষ মাত্র। তোবা বিপ্লবী সমষ্টির দিকে শ্রমিককে টানিস না, বর্তমান পাশবিক সমষ্টির গুণগান কবে শ্রমিককে তার মধ্যেই তুষ্ট থাকতে বলিস। সুতরাং তোরা হলি মালিকেব দালাল।

এ রকম গালাগাল খেতে আমাব ভালো লাগল না। আমি ঈশানেব মেঘাডম্ববেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দ্রুত ঘবে ফেরার কথা বললাম।

কিন্তু জপেনদাকে ততক্ষণে তত্ত্বে পেয়েছে। তিনি নির্বিকার চিত্তে বলে চলেন—তোবা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পডিস না, বুর্জোযা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণেব ইতিহাসও পড়িস না। তাই বুঝিস না এ ব্যবস্থায় বঞ্চনা ও শোষণ কত দূর গেছে। তোবা জানিস না, অর্থনৈতিক রাহাজানির দাপটে শ্রমিক কৃষককে কোন পশুর স্তবে নামিয়ে দিযেছে শযতানরা, কীভাবে তাবা কেড়ে নিযেছে শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষাব অধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতা। তোরা পাতিবুর্জোযাবা 'শ্রমিক' বলতেই কেমন গদগদ ভাববিহ্বল গাধা হয়ে উঠিস। মাঝে আবার তোদের কৃষকে পেয়েছিল, ছাপার অক্ষরে লিখতে শুরু করেছিলি 'কৃষক রাজ কায়েম' করার কথা, 'কৃষকেব পায়ের কাছে বসে' শিক্ষালাভ কবাব কথা। পাতিবুর্জোযাব স্বপ্নালু চোখে শ্রমিক-কৃষককে দেখিস, শ্রমিকের চোখে দেখিস না। মাও বলেছিলেন, শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো। তোরা সেদিকে মাড়াসনি কখনো। তোরা শ্রমিক বলতে বুঝিস শুধু সংঘবদ্ধ বিপ্লবী শক্তি। তোরা আডাল কবে রাখছিস শ্রমিকেব বিধ্বস্ত ব্যক্তিসত্তা, এবং এভাবে তোরা গোপন করে রাখছিস এই সমাজব্যবস্থার সর্বগ্রাসী শোষণের চেহারা। এক কথায তোরা নাটকে শ্রমিক-কৃষকের খোশামুদি কবিস, চাটুকাবিতা কবিস। লেনিন তোদের বলে গিয়েছিলেন, তোমবা বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা শ্রমিককে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দাও। অর্থাৎ তোরা শ্রমিকের রাজনৈতিক শিক্ষক, কিন্তু চাটুকার কি কখনো শিক্ষক হয়? তোষণ করে কি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামের কথা শেখানো যায়? 'সোশালিজম, ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়েন্টিফিক' গ্রন্থে এংগেল্‌স্

বহুদিন আগে বলে গেছেন · সমাজবিবর্তনের নিয়মগুলি একবার সম্যক বুঝতে পারলেই মানুষ আর সে নিয়মের অন্ধ বলি হতে রাজি হবে না, সে লড়াই করবে। কিন্তু সমাজবিবর্তনের নিয়মগুলি তো তোরা গোপন করে রাখিস। তোরা তো শ্রমিকের ধর্ষিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মুখ খুলতেই রাজি নস। তোরা তো বর্তমানের সর্ববিধ্বংসী সমষ্টিজীবনের লীলা দেখে ফিঙে পাখির মতন আনন্দে নাচিস। কাল্পনিক বস্তির কাল্পনিক বিপ্লবী শ্রমিক তৈরি করে তোরা তাকে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করিস। বাস্তবের ভয়ংকর বস্তির বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

কী, বলছেন কী আপনি?—আমি মুখ ঝামটা দিয়ে উঠি—নাটকে শ্রমিকের দোষত্রুটি দেখাতে হবে?

শুধু দোষত্রুটি নয়—বললেন তপেনদা—তার অধঃপতন, বেইমানি, মদ্যপান, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, নারীনির্যাতন, কিছুই বাদ যাবে না, যেমন বাদ যায়নি গোর্কির 'মা' উপন্যাসে। প্রচণ্ড বীরত্ব, ধূর্ততা, শ্রেণীঘৃণা, সততা ও মহত্ত্বের পাশে নিকৃষ্টতম তমোগুণের সমাবেশ ঘটাতে হবে। শ্রমিক যা হবে তার সঙ্গে দেখাতে হবে শ্রমিক যা আছে। যা হইয়াছেন এবং যা হইবেন, দুই মূর্তিই সমগ্রাহ্য, তাকে বলে বিপ্লবী বাস্তবতা। গোর্কি ও ব্রেখ্‌ট্ তাই বলেন।

কথাটা আমার কাছে অসহ্য মনে হল। অবশ্য মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল বুড়ো ভ্লাসবের চেহারাটা, গোর্কির উপন্যাসের পাতা থেকে। সেই সঙ্গে মনে পড়ল ব্রেখ্‌ট্-এর 'হাইলিগে যোহানা' নাটকের শ্রমিকদের বিবেকহীন আচরণ।

আমাকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে তপেনদা বললেন—জানি, জানি সমস্যাটা বুঝি। শ্রমিকের ব্যক্তিগত মাৎসর্য-আদি দোষ দেখালে বাজোর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত, রাজনৈতিক দল, এবং পত্রিকা শৃগালবৎ তুলবে শ্রমিকশ্রেণীকে অপমান করা হয়েছে। তা তো তুলবেই, ওরাও পাতিবুর্জোয়া, সুতরাং ওরাও পাতিবুর্জোয়ার ভাববিলাসী চোখে শ্রমিককে দেখে, শ্রমিকের পদতলে কৃত্রিম ভক্তিতে দণ্ডবৎ হয়ে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এড়ায়। কান দিস নে। ওদের চোখ দিয়ে শ্রমিককে দেখিস নে, শ্রমিকের চোখ দিয়ে শ্রমিককে দেখ। তখন দেখবি শ্রমিককে তুই বাইরে থেকে সমালোচনা করছিস না, নিজে শ্রমিক হয়ে আত্মসমালোচনা করছিস।

একটু থেমে অর্থাৎ দম নিয়ে উনি পুনরায় জ্ঞানোদ্গার করলেন—আমি অনেক ভেবে দেখেছি, শ্রমিক-কৃষক বলতেই ন্যাকা ন্যাকা ভাবাবেগ যার জাগে, সে স্পষ্টতই শ্রমিকের সঙ্গে এক হতে পারছে না। এক হলে সে বুক ঠুকে বলত, যে শ্রমিক রাজনীতি-সচেতন নয়, সে মোটেই মহান নয়, সে ক্ষয়িষ্ণু সম্ভাবনা-সমষ্টি মাত্র, সে অনেক বিষয়েই জঘন্য রকমে পশ্চাৎপদ। শ্রমিকের সঙ্গে যে লেখক একীভূত, তার হাতে এটা নিজ শ্রেণীর সমালোচনা মাত্র, দূর থেকে বা ওপর থেকে বর্ষিত বাবুসুলভ গালাগাল নয়। কিন্তু যেই দেখি রামকৃষ্ণ মিশন মার্কা দরিদ্রনারায়ণ পূজার মতন শ্রমিকবর্গকে প্রণাম ঠোকার বহর, অমনি বুঝি এ পাতিবুর্জোয়া মাল, না পেরেছে শ্রমিকের দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে, না বুঝেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এ মাল ওদিকই মাড়ায়নি। এর কাছে শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিজের করে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার

পরিবর্তে এর আশ্রয় হল শ্রমিক-প্রীতি বা শ্রমিক-দরদ, কাঙ্গালীভোজন করবার সময়ে যেমন কর্তাবাবুর জাগে গরিব-দরদ। এঁরাই হলেন পাতিবুর্জোয়াবাবু। স্বকর্মে যাওয়ার পথে গাছতলায় গজিয়ে ওঠা সিঁদুর মাখানো কালো পাথরে মাথা ঠেকাবার মতন, এঁরা ঈষৎ শ্রমিক-পূজা করে নিয়ে অন্যকে খুশি বাখেন, নিজেদেরও ধোঁকা দেন। টিপ করে ওই প্রণামটি করেই যাবতীয় পাতিবুর্জোযা বজ্জাতিতে এঁরা গা ভাসান, অথচ এঁদেব বিবেক থাকে নির্মল, কারণ প্রাভাতিক প্রণামটা তো সেরেই নিয়েছেন, ভোরেব বেলায় স্নান সেরেই হাতে পৈতে জড়িযে মন্ত্রটা তো উচ্চারণ করেই নিয়েছেন। সুতরাং এঁদের মার্ক্‌স্‌বাদী খেতাবটা কেডে নেয কোন শালা? তোর নাটকেও তাই দেখলাম। শ্রমিকায়ঃ নমো বলে কাজ সারলি। এক দঙ্গল চাষিকে মঞ্চে তুললি একদলা তত্ত্বকথা কবে। কাবুর কোনো আলাদা চেহারা নেই, চরিত্র নেই, বৈশিষ্ট্য নেই। স্টীমরোলার চালিয়ে সকলকে কাদা বানিযে একটা মুণ্ডহীন মূর্তি গডে বুকে লিখি দিলি · বিপ্লব। ব্যস। পাতিবুর্জোয়ার প্রণাম ঠোকার আচার রক্ষিত হল। আর তুই ভাবতে লাগলি কতবড় বিপ্লবী নাট্যকার হয়েছিস।

হঠাৎ জপেনদার বামচক্ষু বুজে গেল। ফস করে আমাব কানেব দ্বাবদেশে ওষ্ঠাধব সংলগ্ন কবে বললেন—হিশ্‌শ্‌! পেছনে মামা। তোব পেছনে মামা।

মামা মানে যে গোয়েন্দা পুলিস এটা আমাব জানা ছিল। ঘাড ফিবিয়ে দেখি একটা মুশকো লোক অনতিদূরে দাঁডিযে প্রাণপণে উদাসীন থাকছে। ঊর্ধ্বমুখ হযে মনুমেন্টেব উচ্চতা আন্দাজ করছে। সে মামা কিনা জানি না, কিন্তু আমবা ভাগনে হতে রাজি হলুম না। জপেনদা ততক্ষণে অনেকটা এগিযে গেছেন, আমি সঙ্গ ধরলাম। প্রায ভিকটোবিযা মেমোবিয়াল পর্যন্ত ওই স্থাপত্যভক্ত কৃষ্ণকায ব্যক্তি পিছু পিছু এল। সাবাটা পথ জপেনদা খালি পাযে কাঁকব-পাথর মাড়িয়ে মৃদু আর্তনাদ করলেন। পা পিছলে একবার পড়ে গেলেন, এবং অনবরত ধাবালো স্ফুরিত কণ্ঠে শুধোতে থাকলেন—গেছে, না আছে?

ভিকটোবিয়া মেমোরিয়ালের কাছে আসতে শুবু হল বৃষ্টি, এবং মামাকে আর দেখা গেল না। জলে ভিজে আমবা দুই ঢোল পায়ে পায়ে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলাম এবং জপেনদা উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন—তোর জন্য আমিও বোধ হয এবেস্ট হলাম। রাতটা কাটলে হয। আর আজকাল জেলের যা অবস্থা! রাজবন্দী বলে খাতির করবে তেমনটা তো আর নেই। পিটিয়ে মারবে। সব এই তোব জন্য , হঠকারী, এজেন্ট প্রোভোকাটুর, শুযাব। তোর জুতোজোড়া আমায় দে, হতভাগা, পায়ের চেটো দুটো আর নেই।

তারপর আমার জুতো পরে হরিশ মুখার্জী রোডে পা দিযেই বললেন—তাহলে প্রশ্নটা কী? প্রশ্ন হচ্ছে এই · বিপ্লবী প্রচাবকদের প্রথম কাজ হল শ্রেণীযুদ্ধ প্রচার করা, কিন্তু দ্বিতীয় কাজই হল শ্রমিক-কৃষককে পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে বিকশিত হতে সাহায্য করা।

এমন আকস্মিকভাবে যে উনি মুলতুবি প্রসঙ্গে প্রত্যাগমন করবেন, পশ্চাদ্ধাবনকাবী সেই ভীষণদর্শন মামা বা শালাকে যে উনি বেমালুম বিস্মৃত হবেন, এ আমার জানা ছিল না। তাই খেই হারিয়ে আমি নীরবে নগ্নপদে হাঁটতে লাগলাম এবং পথের গহ্বর কাটাতে কাটাতে মনে মনে সি-এম-ডি-একে গাল পাড়তে লাগলাম।

জপেনদা আত্মগতভাবে বলতে বলতে চলেছেন—কার্ল মার্কস সম্পূর্ণ মানুষের এক আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সকল ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতায় মানুষ সর্বাঙ্গীন, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, সার্থক হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষে-মানুষে সংগতি ও সামঞ্জস্য গড়ে ওঠার কথা ; কাবণ মানুষ দেখতে চায়, শুনতে চায়, ঘ্রাণ নিতে চায়, স্বাদগ্রহণ করতে চায়, অনুভব করতে চায়, ধ্যানে বসতে চায়, জানতে চায়, কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, ভালোবাসতে চায়। এগুলো যেমন তাব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তেমনি অন্য সকলেরও একই বৈশিষ্ট্য থাকায় এগুলি মিলনেব সেতু হবাব কথা। এই পবিবেশে ব্যক্তিগত দুঃখ-বিবহও আনন্দেব অনুভূতি নিয়ে দ্বাবে এসে করাঘাত কবে, কাবণ পূর্ণবিকশিত মানুষবা যখন পরস্পরের কাছাকাছি দল বেঁধে থাকে, তখন ব্যক্তিগত দুঃখ কখনো সামাজিক বিবোধে পবিণত হয না। 'For suffering, viewed humanly, is man's self-enjoyment,' বললেন মার্কস ; পূর্ণাঙ্গ মানুষদেব সমাজে দুঃখেও থাকে আনন্দলোকেব বিহ্বল স্পর্শ। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে এইসব ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিব বিকাশ থেকে বঞ্চিত করে। সম্পত্তি, মূলধন, পুঁজি—এবা মানুষের সব বৃত্তিকে ভোঁতা কবে একটিমাত্র বৃত্তিকে ফাঁপিযে ফুলিযে তোলে। সে বৃত্তি দখলেব বৃত্তি, ধনেব ওপব অধিকাব বিস্তারেব বৃত্তি। একটি সুন্দব জিনিস দেখার স্পৃহা কেড়ে নিয়ে, সে বস্তুব মূল্য কত এই বিচারে আমাদেব প্রবৃত্ত করায। মানুষ হযে যায একপেশে, সংকীর্ণমনা, স্বার্থপব। অধিকাংশ মানুষ শুধু বৈষযিক নয মানসিক জগতেও হয়ে পড়ে বিক্ত, হৃতসর্বস্ব ভিখিবি। এবং এইসব দেউলিযা মানুষকে সমষ্টিবদ্ধ কবলে দেখা দেয পাশবিক হানাহানি, দ্বেষ এবং পবশ্রীকাতবতা। সুতবাং মার্কস বলছেন, এখানে আনন্দও পবিণত হয দুঃখে , একজনের আনন্দে দশজনেব ঈর্ষাদ্বেষ এবং ফলে সামাজিক দ্বন্দ্ব। দখলেব বৃত্তি স্পষ্টতই সমষ্টি-বিবোধী। তাই সম্পত্তিব অবলোপ মানে সকল মানবিক ইন্দ্রিযেব মুক্তি, মানুষের সর্ববিধ প্রবণতা ও শক্তিব শৃঙ্খলমোচন 'The complete emancipation of all human senses and aptitudes।' মানবসত্তা তাব বহুবিধ সিদ্ধি থেকে আজ বিযোজিত , সে উত্তরাধিকাব আমরা ফিবিযে আনব, তাই আমবা শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদী।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ততক্ষণে আমাব মনে হচ্ছে আমবা হাঁটছি না, সাঁতার কাটছি, খালি পাযে হাঁটতে হাঁটতে পাযের সুখতলা খসে যাচ্ছে ; আর কানেব কাছে একশো উড়েব নামতার মতন মার্কস সাহেবের তত্ত্বকথা আমায় সকল বৃত্তিব নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু জপেনদাকে সে-কথা বলবে কে?

এই জন্যেই তো মার্কস এবং এংগেল্‌স্‌ সংস্কৃতিব কথা বলতে গেলেই বলেন শেক্‌স্‌পিযার আর বালজাকের কথা—জপেনদা উবাচ—কেন বলেন? তোর কী মনে হয়?

আমার কিছুই মনে হচ্ছিল না, তবু জপেনদার ভযে মুখগহ্বরের বৃষ্টিব জলটা কুলকুচো করে ফেলে দিয়ে বললাম—ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আব মানুষের গবিমা জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত হয়েছে বলে।

হ্যাঁ—বললেন জপেনদা—শ্রমিকশ্রেণীব খণ্ডিত বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁবা অনবরত সেই যুগেব সাহিত্যকে সর্বত্রগামী কবার চেষ্টা করছিলেন যে যুগে সাহিত্য

বিপ্লবী বুর্জোয়া ব্যক্তির জয়গানে মুখর ছিল। মানুষ যে কত মহান, কত বিশাল, কত জটিল, কত সুন্দর, এ বার্তা মেহনতি জনতার কাছে কোনোদিন পৌঁছয়নি। নব্য লেখকদের কাছে মার্কস-এর আবেদন শেক্‌স্‌পিযার পড়ুন, আপনাদের রচনাকে শেক্‌স্‌পিয়ারাইজ করুন। ব্যক্তিপ্রতিভার নানা দিক সম্পর্কে মেহনতি জনতাকে অবহিত করুন, মানবতাবাদী সাহিত্যকে এনে দিন তাদেব নাগালের মধ্যে। তুই জানিস কি গোডাব দিকে বুশ বিপ্লবেব নেতারা প্রোলেতারীয় সংস্কৃতির অস্তিত্বই স্বীকার করতে চাননি?

আমি চমকে উঠে পড়ে যাচ্ছিলাম সি-এম-ডি-এর গর্তে। অনেক কষ্টে টাল সামলে বলি—সে কি?

স্মিতমুখে জপেনদা আমাব বিপত্তিটাকে উপভোগ করে বললেন—লেনিন বচনাবলি, খণ্ড ৩৩, পৃষ্ঠা ২৩০ দেখলেই বুঝবি। অন্ধকার, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কাব থেকে সদ্য নির্গত মেহনতি জনতাকে শুধু মার্ক্‌স্‌বাদী তত্ত্ব পৌঁছে দিয়ে কোনো লাভ নেই, বলছেন লেনিন, তাকে এনে দাও আঠারো শতকেব বুর্জোয়া বিপ্লবীদেব নিরীশ্বববাদী সাহিত্য, চারিদিক থেকে বিবিধ উপাযে তাকে জাগাও। আর ৩১ খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠা পড়লে দেখবি লেনিন প্রোলেতাবীয সংস্কৃতিকে রীতিমতো ব্যঙ্গ কবছেন , বলছেন, অতীতকে ছাঁটাই কবার পবিবর্তে মার্কসবাদ গত দুহাজাব বছরেব চিন্তা ও সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু মূল্যবান সব আত্মস্থ কবে নিযেছে, তাব বূপান্তর ঘটিয়েছে। সেই জন্যেই মার্ক্‌স্‌বাদ বিপ্লবী প্রোলেতাবিযতেব মতাদর্শ, সেটাই মার্ক্‌স্‌বাদেব ঐতিহাসিক তাৎপর্য। এখন আবাব আলাদা করে প্রোলেটকুল্‌ট্‌-এর প্রয়োজন নেই। অনববত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্যে লেনিন প্রোলেতাবীয় লেবেল আঁটা নবা সোভিয়েত সাহিত্যকে ধূলিসাৎ কবে পুশকিন-লেরমনতভ-তলস্তয়-এব দিকে চোখ ফেবাতে বলেছেন। স্তালিন কী কবেছিলেন? অতীত সাহিত্যের বিপুল প্রচাব দিয়ে তাঁব কর্মকাণ্ড শুবু—শেক্‌স্‌পিয়ার, বায়রন, শেলি, গ্যোয়টে, শিলাব, পুশকিন, গোগোল, তলস্তই, চেকভ, উগোর লক্ষ লক্ষ বই প্রচাব করে স্তালিন মার্কস-লেনিনেব নির্দেশ কার্যকবী কবেছিলেন। শুধু তাই নয, বিল-বেলোৎসেরকভ্‌স্কিকে লেখা চিঠিতে স্পষ্টই বলেছিলেন, সাহিত্য ও থিযেটাবের ক্ষেত্র পার্টির ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বৃহৎ ; সুতরাং 'বামপন্থী', 'দক্ষিণপন্থী' প্রভৃতি পার্টিগত অভিধাগুলোকে দযা করে সাহিত্যের ওপর চাপাবেন না। শিল্প-সাহিত্যেব ক্ষেত্রে পার্টি লাইনকে প্রযোগ কবার ঘোবতর বিরোধী ছিলেন স্তালিন, কারণ যমালয়েব ধূমাচ্ছন্ন প্রদোষ থেকে নির্গত মেহনতি সোভিয়েত জনতাব প্রথমেই দরকার ছিল শিল্পেব মুক্ত বাতাস, যা প্রাণভবে টেনে নিয়ে সে ব্যক্তি হিসেবে মাথা উঁচু করে। পাস্তেবনাকের কবিতা ভালোবাসতেন স্তালিন এবং পাস্তেরনাক তাঁব 'কিং লিযার' উপন্যাসে সবাসরি স্তালিনকে হিংস্র আক্রমণ করলেও স্তালিন কবির কাজে বাধা দেননি। জামিযাতিন তাঁর 'উই' গ্রন্থে সাম্যবাদ ও সোভিযেতকে তীব্র আক্রমণ করলেও জামিয়াতিনের গাযে কেউ হাত দেয়নি ; ববং জামিযাতিন দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইলে স্তালিন নিজে হস্তক্ষেপ কবে তাঁর প্রবাস ববণে সাহায্য করেছিলেন। 'ডেজ অব দ্য তুর্বিনস' নাটক নিষিদ্ধ করার দাবি উঠলে স্তালিন তা প্রতিহত করেছিলেন। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিকে সম্মানিত করে হঠকারী প্রোলেট ও ফিউচারিস্টদের হাত থেকে মস্কো আর্ট থিয়েটারকে বক্ষা করেছিলেন স্তালিন।

গোর্কিকে সোরেন্তো থেকে ফিরিয়ে এনে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্তালিন। বলশয় ব্যালে ও অপেরাকে প্রাচীনের তপস্যায় নিযুক্ত থাকতে সাহায্য করেছিলেন স্তালিন। মায়াকভ্স্কি তাঁর 'বেডবাগ' নাটকে সাম্যবাদকে ব্যঙ্গ করলেও স্তালিন তাঁকে 'সমাজতান্ত্রিক অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি' বলতে দ্বিধা করেননি। আইজেনস্টাইনকে সতীর্থদের ঈর্ষাদ্বেষ থেকে রক্ষা করে পুনরায় চলচ্চিত্র তৈরির কাজে ফিরিয়ে এনেছিলেন স্তালিন এবং সুদূর অতীত থেকে ইভান দ্য টেরিবল-এর ইতিহাস বেছে এনে রাশিয়ার ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়াবার মহাকাব্য রচনার প্রস্তাব দেন স্তালিন। স্তালিনের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারকেই অভিনেতা চেরকাসভ বলেছেন অবিস্মরণীয়। গোর্কি লিখলেন বায়রন সম্পর্কে, তারপর চেকভ ও তলস্তয় সম্পর্কে। লুনাচার্স্কি লিখলেন চের্নিশেভস্কি, পুশকিন, স্ক্রিযাবিন, বেকন, শেক্স্পিযার, জোনাথান সুইফ্ট, হাইনে, ভাগনের, মার্সেল প্রুস্ত, চিত্রশিল্পী রেনোয়া এবং বার্নার্ড শ সম্পর্কে। স্তালিনের পরিচালনায় সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল অতীতের মহত্তম মানবতাবাদী শিল্পকীর্তির প্রচার। শ্রমিকশ্রেণীর সদ্যোত্থিত ঔৎসুক্য ও আগ্রহের আলিঙ্গনে সে শিল্পকে সমর্পণ। কেন এটা ঘটেছিল? কখনো ভেবে দেখেছিস কেন মার্কস, এংগেল্স্, লেনিন এবং গোড়ায় স্তালিন আলাদা কোনো প্রোলেতারীয় শিল্পের কথাই ভাবেননি? কেন তাঁরা স্পষ্টাক্ষরেই বলে দিয়েছিলেন, পার্টির শাসন শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে চলবে না, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্র পার্টির ক্ষেত্রের চেয়ে বৃহৎ?

আচমকা এই প্রশ্নগুলো করেই সব মাটি করেন জপেনবাবু, নইলে মনোযোগের ভান করে দু চারটে হুঁ-হাঁ দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। প্রশ্নে বিব্রত হয়ে দ্রুত বললাম—কেননা বৃহৎই তো ক্ষেত্র সাহিত্য পার্টির!

[এর অর্থ হল কিনা ভাববার সময় ছিল না।]

জ্বলে উঠলেন জপেনদা। ভিজে জামাটার কোনা দুটো নিঙড়ে তারস্বরে বললেন—তোমার মাথা। উল্লুক, তোমার কিস্যু হবে না, যাও ঘোড়ার ঘাস কাটো গে, কৃষকের পায়ের কাছে বসে। বহুবার লিখে গেছেন মার্কস ও এংগেল্স্ যে প্রোলেতারিযত হচ্ছে একমাত্র শ্রেণী যে শ্রেণীহীন সমাজ গড়বে। সুতরাং তাঁরা আলাদা কোনো প্রোলেতারীয় সাহিত্যের কথা ভাবেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন প্রোলেতারিয়ত যে শিল্প সাহিত্য অবশেষে গড়বে তা সমগ্র সাম্যবাদী সমাজের শিল্প সাহিত্য। মার্কস, এংগেল্স্, লেনিন ও স্তালিন মনে করতেন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এক ক্ষণস্থায়ী পরিচ্ছেদ মাত্র , অতি দ্রুত সমাজ পরবর্তী স্তরে উপনীত হবে। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত এক সোভিয়েত পুস্তিকায় শুনি সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর রণধ্বনি · সোভিয়েত শাসন দুই বিপ্লবের মাঝে সামান্য বিরতি মাত্র, স্বল্প বিশ্রামকাল, যখন বিপ্লবের সেনাবাহিনী নিজেদের প্রস্তুত করবে পরের যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধপ্রস্তুতির মাঝে শ্রমিক নূতন সংস্কৃতি গড়ে ফেলবে, তাও কি কখনো হয়? বিশেষত যে শ্রমিক সদ্য বেরিয়ে এসেছে অজ্ঞানতা-আঁধার থেকে। কিন্তু ইয়োরোপে বিপ্লব হল না—কেন জানি না, গর্জন করে উঠলেন জপেনদা—স্তালিনদের আশা ব্যর্থ হল, ফ্যাশিবাদের আঘাতে বিপ্লব পরাস্ত হল মধ্য ইয়োরোপে। শুধুমাত্র ট্রটস্কি তখনো কোলবালিশের মতন আঁকড়ে রইলেন নিখিল-ইয়োরোপে বিপ্লবের আসন্নতার তত্ত্ব। স্তালিনরা বুঝলেন, শ্রমিকের একনায়কত্ব এক আস্ত ঐতিহাসিক অধ্যায় জুড়ে থাকবে, সাম্রাজ্যবাদের

আক্রমণ ঠেকাবে, দেশের অভ্যন্তরে শোষকদের অবশিষ্টাংশকে দমন করবে। আরে দেত্তেরি—

শেষোক্ত সমালোচনাটি বর্ষিত হল বর্ষণসিক্ত দেশলাই-এর প্রতি, কারণ কাঠি জ্বলছে না। তখন আমাব লাইটাবে চারমিনার ধরিযে, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার জন্য আকাশকে ব্যঙ্গাত্মক প্রণিপাত কবে জপেনদা ফেব কথার খেই ধরলেন কম্বুকণ্ঠে [লোকটার গলাও ভাঙে না।]—কিন্তু সেখানেই সমস্যাব শেষ নয়। শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়বে কে? শ্রমিকশ্রেণী। সে শ্রমিকশ্রেণীর মানসিক স্তর কোন পর্যাযে? বুর্জোয়া যখন বিপ্লব করেছিল তার অনেক আগে থেকেই বুর্জোযা মহাধনী সমাজেব উচ্চতর পদগুলির অধিকারী, উচ্চশিক্ষিত, কালচার্ড। তাই ইংলন্ডে, জর্মনিতে, ফ্রান্সে সেই বিপ্লবেব পবে অবলীলাক্রমে বুর্জোয়া শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির কাজে মেতে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু শ্রমিক কি বুর্জোয়া সমাজে সেই সুবিধা পেয়েছে যা বুর্জোয়া পেয়েছিল ফিউদাল সমাজে? একেবাবেই না। বুর্জোয়া তো শ্রমিককে কবে বেখেছে নিঃস্ব। শ্রমিকেব ট্যাঁক খালি, তাব বাসস্থানেব পবিবর্তে বযেছে বস্তি, শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তে অমানুষিক পরিশ্রম। এমনকী তার সুকুমার বৃত্তিগুলি পর্যন্ত দলিতমথিত। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক একটি জ্ঞানই লাভ করে , সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করাব প্রযোজনীয়তা। শুধুমাত্র সেই চেতনাব ওপর নির্ভব কবে আস্ত একটা শ্রেণীর নূতন শিল্প-সাহিত্য গডে ওঠে না। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব , তাই অতীতের যা কিছু মূল্যবান সব গোগ্রাসে গেলার পালা , তাই শ্রমিক-লেখক, শ্রমিক-কবি আবিষ্কারেব ধুম, হোক না তাবা কাঁচা বা অতি সরল। ভাঙা মন জোড়া দেওয়ার পালা আগে , তাবপর না মহৎ সৃষ্টি। এখন গুরুতব সমস্যা। বিপ্লবেব ঝটিকাকেন্দ্র ইযোরোপ থেকে সবে এসেছে এশিযায়, আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায়, যেখানে শ্রমিক শতগুণ বেশি শোষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আধা-গ্রাম্য, গ্রামীণ আচার-নিযমে শৃঙ্খলিত, গলা-পচা সমষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে বুর্জোয়া শোষণের সঙ্গে মিশে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, জমিদারি শোষণ, জাতিগত শোষণ, ধর্মীয় শোষণ, সামাজিক শোষণ, আমলার শোষণ, গ্রামেব চণ্ডীমণ্ডপের শোষণ, গুরুভাব অতীতের শোষণ। এই গগনচুম্বী অচলায়তনকে ভাঙবাব জন্য চীনের অবিস্মরণীয় অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক বিপ্লব ; এশিযার বিধ্বস্ত মানবগোষ্ঠীকে সুস্থ, উন্নত, সৃষ্টিশীল ও সংগ্রামী চিন্তায উদ্বুদ্ধ করার প্রথম অভিযান, আধখানা মানুষকে পুবো করাব লড়াই।

আমি স্থির করলাম একটা কিছু বলা দরকার। নইলে জপেনদা আবার খেপে উঠতে পাবেন। বিজ্ঞতাজ্ঞাপক কিছু এ্যা-উঁ-ইয়ে করে আমি বললাম—চীনেও তো দেখলাম লু সুন, রোমাঁ রলাঁ, শেক্‌স্‌পিয়াব, বেঠোফেন নিয়ে আলোচনার হুজুগ। কিন্তু এসবের ফলে পুরাতন ঐতিহ্যের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়ে উঠছে না? তাহলে নূতন লেখক, নূতন চিন্তা, নুতন আঙ্গিক নিয়ে ভাববে কী করে? পুরাতন সাহিত্যের ঐতিহ্য পিঠে নিয়ে লেখক-নাট্যকারদের নিজের পিঠই তো ঝুঁকে পড়বে ; হামাগুড়ি দিয়ে সে কী নূতন সৃষ্টি করবে মাথায় ঢুকছে না।

মাথায় তোর কিছুই কোনোদিনই ঢোকে না—মুখ ভ্যাঙালেন জপেনদা—কিসের ঐতিহ্যের কথা বলছিস? সাহিত্যের ঐতিহ্যের বন্ধনে শ্রমিকশ্রেণী বাঁধা পড়েছে নাকি? ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও সে পেয়েছে নাকি কখনো? তোব কি ধারণা বিপ্লবের আগে চীনের

শ্রমিক পায়ের ওপর পা চাপিয়ে পিকিং অপেরা দেখত? তোর কি ধারণা কলকাতার বস্তিতে সন্ধ্যার পর সবাই বসে সুর করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে? তোর কি ধারণা বাঙালি শ্রমিক অবসর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে? তুই গাধা কি ভাবিস বিহারী শ্রমিক বিদ্যাপতিব ঐতিহ্যে বাঁধা পড়ে আছে? যার স্বাদই ওরা পেল না, তাতে বাঁধা পড়তে যাবে কী উপায়ে? আসলে এটাও তোদের পাতিবুর্জোয়া বজ্জাতি। নিজেরা ওইসব পুরাতন সাহিত্য খুব কষে পড়ে নিয়েছিস বলে মনে করছিস শ্রমিক-কৃষকেরও পড়া হয়ে গেল। নিজেরা শাসকগোষ্ঠীর কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে নিয়েছিস শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি-বাকরি ; তারপর নিজেব মতামতটাকে শ্রমিক-কৃষকের মতামত বলে চালাচ্ছিস। মাও বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো। আর তোরা পাতিবুর্জোয়া চামারের দল নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে শ্রমিকেব বলে চালাতে চাস। তুই ঐতিহ্য ভোগ করেছিস বলে আর ঐতিহ্যের দরকাব নেই, শ্রমিক-কৃষক যে তিমিবে আছে সে তিমিরেই থাকুক, এই তো তোর বিধান। তোরা রাশিযাব সেই হঠকারী প্রোলেটকুল্টওয়ালাদের বংশধর, সেই লেবেদিনস্কি, ত্রেতিয়াকভ, প্লেতনেভ ইত্যাদি, যাদের ধমকে দিযে স্তালিনের পার্টি বলেছিল . তোমাদের চেয়ে শেক্‌স্‌পিয়াব, পুশকিন, গ্যোয়টেকে শ্রমিকদের বেশি দবকার, কেননা তাঁবা মানুষের মনেব গভীরতা সম্পর্কে শ্রমিককে অবহিত কববেন, মানুষের আবেগ অনুভূতির জটিলতা বোঝাবেন, মানুষ কত বড়, কত বিচিত্র, সেটা বোঝাবেন। প্রোলেটবাদীরা পাতিবুর্জোয়া , তাবা নিজেদের চেতনাব স্তরকে শ্রমিকদের চেতনার স্তর বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল।

আমি আর জবাব দিযে জপেনদাব গাঁড়াকলের শিকার হতে রাজি হলাম না, ওঁকেই নিবুপদ্রব স্বগতোক্তি করতে দিলাম। তিনি বলে চললেন—তোদের নাটক-গল্প-কবিতাতেও দেখি ঘন ঘন এই পাতিবুর্জোয়া একদেশদর্শিতা। লডাইযের কথা, শ্রেণীঘৃণা, উত্তেজনা, এসব অনেক সমযেই তোদের লেখায় থাকে—থাকবেই তো। কিন্তু অন্য দিকটা থাকে না। ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণটা থাকে না, মানবমনের জটিলতা থাকে না, জনতার খণ্ডিত মানসকে পূর্ণ করার সাধনাটা অনুপস্থিত। মানুষ বলতে সাতিন বা হ্যামলেটের যে শিহবণ, তোরা সেটা অনুভব করিস না। শ্রমিকশ্রেণীকে মঞ্চে তুলিস বিপ্লবের প্রাণহীন প্রতীক করে, তার মনের গহনে ঢোকার তোদের ধৈর্য বা আগ্রহ কোনোটাই নেই। তোদেব শ্রমিক সঠিক স্লোগানটা দেয ঠিকই, কিন্তু সে ভালোবাসে না, ভাবে না, হিংসাদ্বেষে কম্পিত হয় না, বদমাইশি করে না, সে যে মানুষ এটাই বোঝা যায় না। তোরা তাকে সেলাম ঠুকিস অনাত্মীযের মতন, অপরিচিতের মতন ভদ্রতার খাতিরে, লোকাচারের স্বার্থে। শ্রমিকের ঘরের লোক তোবা হতে পারছিস না, তাই তোরা লিটল রাশিয়ান বা পাভেল সৃষ্টি করতে পারছিস না, পারছিস না জ্যাক লন্ডন বা স্টেফান হাইম বা চেন-চি-তুং-এর মতন লিখতে।

ভাবলাম এবার বোধহয় জপেনদা থামবেন , আমার গলির মোড়টাও এসে পড়েছে, ঘরেও তো ফেরা দরকার। আমি সটকান দেওয়ার জন্য পা বাডিয়েছি, এমন সময় উনি আমার হাত চেপে ধরলেন।

যাচ্ছিস কোন চুলোয় হতভাগা?—বললেন উনি করাত চালানো গলায়—বলছিলাম, এ

দেশেব সামন্ততান্ত্রিক সমষ্টি অক্টোপাসের মতন আঁকড়ে রেখেছে শ্রমিককে, কৃষককে, সমাজের গলিত শব জড়িয়ে ধরেছে সবাইকে, আর তোরা যারা অগ্রসর প্রচারবিদ, তোরা তো সেই পুঁজ ছড়ানো গোষ্ঠীজীবনকে আঘাত করিসই না, বরং দেখি অনেক সময়ে সেই সব মধ্যযুগীয় চিন্তাগুলোকে প্রশ্রয় দিস, কুসংস্কারকে আমল দিয়ে বসিস।

কখনো না—আমি রেগে উঠে বলি—এসব কী কথা? আমরা হয়তো শ্রেণীসংগ্রামকে যতটা গুরুত্ব দিই, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধটাকে ততটা দিইনি, কিন্তু কুসংস্কারকে আমল দিই, প্রশ্রয় দিই এটা মিথ্যা।

জ্ঞানত দিস না হয়তো-- বলেন জপেনদা—ভেবে চিন্তেই যে দিস তা হয়তো না। কিন্তু তোবা বাপ-নেওটা পাতিবুর্জোযা নাড়ুগোপাল, অজান্তেই দিস, কারণ নিজেরাই তোবা নানা কুসংস্কারে বিশ্বাস কবিস। তোবা নিজেরাই যে আধখানা মানুষ। তোদের মনের মধ্যেই যে দাদ আছে, চুলকানিটা যাবে কোথায়?

এরকম অসভ্য গাল খেয়ে আমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কবলেম, জবাব দিলাম না।

জপেনদা বলে চললেন—নানাভাবে ফুটে বেবোয তোদেব নোংবামি। এই যে নাটকটা আজ দেখালি, তাতে প্রথমেই শহুরে বাবুদেব কৃষকেব হয়ে গাল দিলি কেন রে শয়তান? অনেক নাটকেই, বহু গল্পেই এটা দেখি। কেন রে? বিপ্লবেব বার্তা তো শহরেব ছেলেরাই নিয়ে যাবে গ্রামে, নিয়ে গেছেও। কুসংস্কাবাচ্ছন্ন চাষি তাদের পদ্মবনে মত্ত হস্তী মনে কবে, গ্রামেব স্পন্দনহীন নিস্তবঙ্গ প্রাণহীন শান্তির বিঘ্ন মনে করে। তোরা সে গলায় গলা মেলাস কেন? চাষি কি সচেতন শহুরে কমবেডের চেয়ে অগ্রসর নাকি? চাষিব পশ্চাৎপদতাকেও সমর্থন করতে হবে? বহুবাব শুনি 'ইংবিজি-কেতাব-পড়া' বাবুদের নিন্দা। এটা তো জোতদারদের কথা, শ্রেণীশত্রুর কথা। তাবাই তো চাষিদের গিয়ে বোঝায় পড়াশোনা পাপ, ইংরিজি কেতাব ছুঁলে সর্বনাশ হয়। জোতদাবেব কথাগুলো তোরা বলিস কেন? তোরা না মার্ক্স্বাদী? মার্ক্স্বাদের জ্ঞানটাই তো পেয়েছিস ইংরিজি কেতাবের মারফৎ। নাটক-ফাটক যা লিখেছিস সব ওই কেতাবের দয়ায। জোতদারেব সঙ্গে হাত মিলিযে তোবাও যদি ইংবিজি কেতাবের বিবুদ্ধে কোমর বাঁধিস, তাহলে তোরা চাষিদেব অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের প্রহরী হয়ে দাঁড়ালি, জোতদারের ভাড়াটে দারোয়ান হযে দাঁডালি, এটা বুঝিস?

সেখানেই শেষ নয, বললেন জপেনদা, হঠাৎ হঠাৎ তোদেব লেখায় দীর্ঘশ্বাস শুনি শহুবে গোলমালের বিবুদ্ধে। শহর থেকে দূরে গ্রামের কেবোসিন-জ্বালা সন্ধ্যায় তোদের নায়ক হঠাৎ শান্তি পায়। সে হঠাৎ শহুরে বাবুদের স্বার্থপরতা আর চাষিদের ঔদার্য নিয়ে কথা কয়ে ওঠে। এমনকী সে মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক পাখা বা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গুহাবাসী সন্ন্যাসীর মতন। তোরা আবাব মার্কসবাদী' এসব তো যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে গান্ধীর কথাবার্তার মতন। কে বলেছে শহুরে হট্টগোলের চেযে গ্রামের শান্তি ভালো? মার্কসবাদী একথা বলে না। সে বলে সমাজতন্ত্র সবচেয়ে ভালো, কিন্তু যদি সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম আর বুর্জোয়া সমাজের তুলনা হয়, তবে শহর সহস্রগুণ শ্রেয়ঃ। শহরের হট্টগোলে মার্কসবাদী দেখে যন্ত্রসভ্যতার সূত্রপাত, আর গ্রামের শান্তিকে সে মনে করে কববের শান্তি। শহুরে হট্টগোলে সে

প্রাণের স্পর্শ দেখতে পায়, গ্রামের নৈঃশব্দ্যে সে দেখে মৃত্যু। তাকেই বলে মার্ক্স্বাদী। কে বলেছে বাবুদের তুলনায় চাষি উদার? চাষি ঢের বেশি সংগ্রামী, নির্মম, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন—এইটুকুই মার্ক্স্বাদী স্বীকাব কবে। কিন্তু তার বাইরে কৃষক সংকীর্ণমনা, জমি-লোভী—এও শ্রমিকরা জানে, মার্ক্স্বাদীব জানার কথা। ফ্যান আর শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রকে তোরা গাল দিস কেন বে বেকুব? সে তো চণ্ডীমণ্ডপেব মান্ধাতারা দিযে থাকে প্রতি বৈকালে। তোরা কি শেষ পর্যন্ত মেশিনের বিবুদ্ধে বিযোদ্গার শুবু করবি ল্যাংটাবাবার মতন? চাষির কথা বলতে গিযে চাষি হয়ে যাস কেন? তোবা না শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি? চাষির দিকে অমন হাত জোড করে ভক্তিভরে তাকাস কেন? তোরা না কমিউনিস্ট, যন্ত্রের ব্যাপকতর ব্যবহারের প্রবক্তা, যন্ত্রসভ্যতার অগ্রদূত?

আবো আছে—বললেন জপেনদা—লেনিন ক্লাবা জেটকিনকে বলেছিলেন, অনেক কমিউনিস্টকে নাবীজাতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেই বেবিযে পডে এক একটি দানব। তোবাও তাই। রোজ দু-চারটে কবে নিদর্শন পাই নাবী প্রশ্নে তোদের মালিকানাব মনোভাবেব। ভেতরে ভেতরে তোরা অনেকেই নাবীকে মনে কবিস সম্পত্তি। নইলে হঠাৎ-হঠাৎ আজকেব মেযেদের বেশভূষা নিয়ে দুমদাম অমন মন্তব্য লিখে ফেলিস কেন? সেদিন এক বলিষ্ঠ গল্পেব মাঝখানে দেখি 'স্লাক্স্-পবা মেয়ে' সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি যার সঙ্গে একটা অশিক্ষিত বর্বর জোতদাবেব কথাবার্তাব কোনো প্রভেদ নেই। অনবরত তোদেব গল্পে দেখি পরোক্ষে সতীত্বের জয়গান, যদিও তোরা জানিস এ সমাজে সতীত্ব মানে দাসত্ব। তোদেব গল্পে মেয়েবা আপিসে চাকবি নিলেই সাহেবেব লোভেব শিকার হযে পডে ; পরোক্ষে তোরা বলছিস আপিস বড ভীষণ ঠাঁই, বাবা কুলবধূ কুলবধূ হয়ে থাক, হেঁসেলে যাও বা বাচ্চা বিযোও। আরেক বিপ্লবী নাটকে মেয়েদেব ধূমপান নিযে যে রসিকতা করা হয়েছে তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। কেন রে? পুরুষ সিগাবেট খেতে পারে, মেয়ে পাবে না কেন? মেয়ে সিগারেট খেলে চোখ কপালে তোলে সমাজেব ঘৃণ্যতম জীবগুলো যারা বিবাহ বিচ্ছেদের নাম শুনলে মূর্ছা যায় ; তোরা এদের মুখপাত্র হযে উঠবি নাকি? তোদের মনের মধ্যে এমন সব বিষ লুকিযে আছে। অথচ বাইরে মার্ক্স্বাদের বুলি? নাটকে তোরা পদাঘাতে ভাঙবি হেঁসেল, আঁতুডঘরের প্রাচীর, সৃষ্টি করবি ইবসেনেব নোবার বাঙালি ভাষ্যকে, মুক্তিব ডাক বয়ে আনবি শৃঙ্খলিত মাতৃজাতির কাছে, সরোষে বলবি চুলোয় যাক আইনসংগত বেশ্যাবৃত্তি, নারী-পুরুষেব প্রকৃত ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগে ভাঙো নারীব পাযের বেড়ি। তা নয় চাকুবে মেয়ে, প্যান্টপরা মেয়ে, সিগারেট-খাওযা মেয়ে, এদেব নিয়ে ইতরসুলভ রসিকতা। এমনকী মাঝে মাঝে শহুরে প্রেম নিয়ে তোরা—।

হঠাৎ উনি থামলেন। আমার পেছনে কাকে দেখে ফিস ফিস করে বললেন—মামা, আবার মামা!

এই বলেই গলিব অন্ধকারে জপেনদা সাঁ কবে হারিয়ে গেলেন। আমি ফিরে দেখি মামা নয় পাড়ার শীতেশবাবু গামছা কিনছেন ফুটপাতের দোকান থেকে।

শিকড়

আমরা মিটিংটা খুব জমিয়ে করছিলাম। অপসংস্কৃতিব বিরুদ্ধে জনসভা, সুতরাং লোক উপচে পড়েছিল। বাইরে মাইকের স্পীকার ঝুলিয়ে ভেতরে ফের পা দিয়েছি, আর মঞ্চে তখন আমাদের একজন বক্তৃতা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে সপ্তমে গলা তুলেছে, এমন সময়ে প্রেক্ষাগৃহের ভেতবে বেরসিক এক টুকরো হায়েনার হাসি শুনেই বুঝেছি, সর্বনাশ হয়ে গেল, জপেনদা কোথাও উপস্থিত আছেন। আমি ব্যাকুল দৃষ্টিতে খুঁজছি কোথায় সেই বলিরেখাঙ্কিত বিশ্রী মুখখানা আর পুরু কাঁচের পেছনে মদন-ভস্ম-করা চক্ষুযুগল। ওদিকে মেশিন-গানের মতন খক-খক-খক হাসি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বক্তা যেই বলেছে, নাটকে অশ্লীলতা ও খুনজখম বন্ধ কবতে হবে, অমনি হাসিটা হাঁপানি বুগির কাশির দিকে ঘেঁষল। বক্তা তারপর যেই বলেছে, বাবা তারকনাথের মতন ছবি বিষ ছড়াচ্ছে চতুর্দিকে, তখন হাসিটা ক্লান্ত হয়ে মধ্যাহ্নের চিলের অবসাদগ্রস্ত ডাকের সুব ধরল। তাবপর প্রেক্ষাগৃহেব এক কোণে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল। বুঝলাম সেই মল্লযুদ্ধেব কেন্দ্রস্থলে পাওয়া যাবে জপেনদাকে। আমি এবং মধু ছুটে গেলাম। দেখি এক দল ছাত্র জপেনদাকে কংগ্রেসের দালাল ভেবে ঠেলে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করছে আর তিনি একনাগাড়ে হেসে চলেছেন আর মাঝে মাঝে ষাঁড়েব মতন গভীর মন্দ্রস্ববে বলছেন, 'হো লালা, হো লালা!'

কোনোমতে তাঁকে উদ্ধার করে বাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেল। জপেনদার চশমাজোড়া ঠেলাঠেলিতে নাকের ডগায় এসে পডেছিল। সেটিকে যথাস্থানে স্থাপন করে তিনি বললেন, 'কফি খাওয়া।'

আমি বললাম, 'তা খাওয়াচ্ছি', কিন্তু মিটিঙের মধ্যে অমন কাণ্ড করলেন যে? একটা ইয়ে নেই?'

জপেনদা আবার হাসতে শুরু করলেন লগুড়াহত কুক্কুবের মতন আর্তনাদে। বললেন, 'শিব্রাম চক্রবর্তী অমন বলতে পারতেন না, পাবতেন না বিভূতি মুখুজ্যে, এমনকী পরশুরাম। তোরা মাইরি সার্কাসে চাকরি নে, ক্লাউনের পেশায় দু-পযসা আসে শুনেছি। লোক-হাসানোকে জীবনের ব্রত কর্।'

আমি এবং মধু পরস্পর তাকালাম নিতান্ত থ হয়ে। কী যে অপরাধটা করেছি বুঝতে পারলাম না। তারপর কফি হাউসে বসে দীর্ঘ শব্দে আধকাপ একবারে পান করে জপেনদা বললেন, 'নাটকে খুনজখম বন্ধ করবি? তাহলে প্রথমে একটা তালিকা তৈরি কর্—শেক্স্পিয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কার কার কোন কোন নাটক নিষিদ্ধ হল! মহাভারত টিকলো কিনা এও বিবেচ্য, কারণ ও বইটায় যত্র তত্র খুনজখম। তোদেরই একটা পালায় দেখেছিলাম মালিক গুণ্ডা লাগিয়ে শ্রমিক-নেতাদের খুন করাচ্ছে—নিষিদ্ধ কর্। ব্রেখ্ট্ হঠাও, কারণ খুনজখম ছাড়া লোকটা প্লটই

ভাবতে পারে না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ সব বাদ দে নাটকের চৌহদ্দি থেকে, কেননা খুনোখুনি ছাড়া ওই হতভাগা বিদ্রোহীরা কিছুই ভাবতে পারেনি। দেখা যাচ্ছে কিছু নিরামিষ প্রেমের উপাখ্যান এবং ড্রইং-রুম কমেডি ছাড়া তোদেব হাতে কোনো নাটকই নেই। অথবা গান্ধীজীবনটা অভিনয় কর্, ছাগলের দুধ-সহযোগে অহিংসার মোলায়েম গল্পে খুনজখম থাকবে না।'

মধু বলার চেষ্টা করল, 'না, না, সে-খুনজখমের কথা আমরা বলতে চাইনি, আমরা—'

জপেনদা ট্রামের দীর্ঘশ্বাসের মতন নিঃশব্দ হাসি ছাড়তে মধু চুপ করল। আমি নিলাম ব্যাখ্যার দায়িত্ব, 'মানে আমরা বলছিলাম যৌনসম্পর্কিত খুনজখম, যেমন বোম্বাইমার্কা চলচ্চিত্রে দেখায়, বা কলকাতার পেশাদার নাট্যশালায় প্রায়শই—'

জপেনদা টেবিল চাপড়ালেন, চিনির বাটি কাত হয়ে খানিক ছড়িয়ে গেল, কফির চামচগুলো ঝনৎকার তুলল। গর্জন করে বললেন, 'তা সেটা স্পষ্ট করে বলিসনি কেন? খুনজখম কথাটাকে নিরালম্ব একটি তুরীয় ধারণা করে তুলছিস কেন? তোরা না মার্ক্‌স্‌বাদী? প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি বস্তুকে শ্রেণীসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে না? খুনজখম তোদের হাতে হবে বিপ্লবী নাটকের বলিষ্ঠ উপাদান, আর শাসকশ্রেণীর দালালদের হাতে ওটা হয়ে ওঠে বোম্বাইয়া ফিল্‌ম্ বা কিছুদিন আগে কলকাতায় অভিনীত 'বিবর' নাটকের মতন পচা স্ফীত দুর্গন্ধময় একটা শবদেহ। প্রতিটি ধ্যানধারণাই তাই। শ্রেণীসংগ্রাম জিনিসটাই যেখানে খুনজখমের প্রাথমিক স্তর, বিপ্লব বস্তুটিই যখন খুনজখমের বিশাল একটা কুরুক্ষেত্র, সেখানে তোদেব মুখে খুনজখমের নিঃশর্ত নিন্দা শুনে আমি হাসব না?'

মধু মৃদুকণ্ঠে বললে, 'ওটা আমরা ঠিক করে নেব খন। কিন্তু ওভাবে হাসাহাসি করলে আমাদের মনে লাগে। আরো তো পয়েন্ট ছিল। অশ্লীলতা, নারীধর্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে যখন আমাদের যুগলদা বলছিলেন তখনো তো আপনি হাসছিলেন—'

'আগ্যে হ্যাঁ!' ভেঙিয়ে বললেন জপেনদা, 'হাসছিলাম! এখনো হাসি পাচ্ছে আমার!'

'কেন? কেন?' আমাদের সমস্বরে জিজ্ঞাসা।

'কেননা ওসবকেও শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে না দেখলে ডুববি গভীর জলে। ধর্ষণ মাত্রকেই নিষিদ্ধ করলে 'নীলদর্পণ' নিষিদ্ধ হবে। এই সেদিন মধুমালাই অরণ্যেব মধ্যে পুলিস ও অরণ্যরক্ষকরা দুটি নারীর ইজ্জত নিয়েছে। এটা তোদের নাটকে আসতে পারবে না? কলকাতার উচ্চ কিছু পুলিস-অফিসার এই সেদিনও কমিউনিস্ট নারীদের ধর্ষণ করেছে, এটা দেখালে তোদের পুরুত ঠাকুরের নৈতিকতায় বাধবে? এসব দেখালে জনগণ উত্তেজিত হবে, ক্রুদ্ধ হবে, ভারত সরকারের স্বরূপ বুঝবে, লড়াইয়ের দিকে একধাপ এগিয়ে যাবে। তোরা কি গ্রামের অশীতিপর জোতদার সেজে 'অশ্লীল' বলে নাক সেঁটকাবি? 'নীলদর্পণে' ক্ষেত্রমণির ওপর নীলকরেব আক্রমণ, এবং 'বারবধূ' নামক ডাস্টবিনে বেশ্যার অভিসার, এক জিনিস তোদের কাছে? তোরা উঠে যা এ-টেবিল থেকে, তোদের সঙ্গে দু-মিনিট কথা কইলে মাথা টিপ টিপ করে।'

মধু আরো কফির অর্ডার দিল জপেনদাকে শান্ত করার আশায়। ওষুধ ধরল। জপেনদা

বললেন, 'গাভীব সদ্যোজাত বৎসের মতন তোদের বুদ্ধি মাইরি। শ্লীল-অশ্লীল প্রশ্নও শ্রেণীযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া অবাস্তব, ইডিয়টিক, ফিউডাল চণ্ডীমণ্ডপের ধারাবাহী। জানিস না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীবা দীনবন্ধু-উপেন দাস-গিরিশের দেশপ্রেমিক নাটক বে-আইনি করত 'অশ্লীলতার' অভিযোগে? জানিস না আজ কলকাতাব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিবাজ মহলে তোদের সব দলেব সব নাটক 'অশ্লীল'? কারণ তোরা বস্তির মানুষ আর ক্ষেতমজুরকে তুলে ধরিস কলকাতাব বঙ্গমঞ্চে, তাদের বিশ্রী ময়লা পোশাক আব দাড়িওলা কালো মুখ ওঁদের রুচিতে আঘাত করে, ওঁদেব শালীনতায় নখের আঁচড় কাটে, ওঁদের নরম ফর্সা তলপেটে আচমকা ঘুঁসি মারে। তাই নিছক 'অশ্লীল' বলে জগতে কিছু নেই, অশ্লীলতা আপেক্ষিক। শেক্‌স্‌পিয়াবকে অশ্লীল বলেছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। ওফিলিযাব গান, হ্যামলেটের শ্লেষ, ইযাগোর প্ররোচনা, টাচস্টোনের রসিকতা, লিযারেব হাহাকাব—সব নাকি 'অশ্লীল', 'লুক্রীস-ধর্ষণ' কবিতাটা নাকি আগাগোড়া ভদ্রসমাজে অপাঠ্য! ভিকতর উগোকে অশ্লীল বলেনি? বালজাককে বলেনি? রবীন্দ্রনাথকে বলেনি দ্বিজেন্দ্রভক্তবা? তোদের যুগে লেখা হাওয়ার্ড ফাস্টেব 'স্পার্তাকুস' পড়েছিস? সমকামী প্রেমিকদেব বর্ণনায় দাস-শ্রম-ভিত্তিক রোমক সাম্রাজ্যেব আসন্ন মহাপতন ফুটে উঠেছে—এটা হচ্ছে আমাদের কথা। আব শ্রেণীশত্রুর কথা হচ্ছে, 'স্পার্তাকুস' 'অশ্লীল'—এক কথায শেষ। যেমন তোরা আজ সামনে মাইক পেয়ে অম্লানবদনে বলে গেলি। তোরা ওই শ্রেণীশত্রুর দালাল!'

আমি ধমক খেতে খেতে সামান্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলাম। রুষ্টস্ববে বললাম, 'তা সংজ্ঞাটা কী? ডেফিনিশনটা কী হবে 'অশ্লীলতাব'?'

'চাঁদু, তোমায ডেফিনিশনটা বলে লাভটা কী হবে?' মুখ বিকৃত করে বললেন জপেনদা! 'ডেফিনিশন তো এর মধ্যেই বললাম সাতবার, তোমার শিলনোড়ার মতন মাথায় কিছু ঢুকছে না। শ্রেণীসংগ্রামকে যা এগিয়ে নিয়ে যায় তা শ্লীল, তাতে যতই ধর্ষণ-টর্ষণ থাকুক না কেন। আর যা কিছু শাসকশ্রেণীকে সাহায্য কবে, জনগণকে বিভ্রান্ত করে, নিছক যৌনতায় সুড়সুড়ি দিয়ে তার রুচিবিকার ঘটায়, সম্ভাব্য যোদ্ধাব মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়, তাই অশ্লীল। তাতে একটিও ধর্ষণ না থাকলেও তা অশ্লীল। তাতে রাসভবিহারীর হারেম-নাট্যশালার অনুরূপ নগ্ন নারী না দেখিয়ে যদি নারীকে আপাদমস্তক বোবখা পরিযে নামায় তবু তা হাজারবার অশ্লীল।'

গরম কফিতে ঠোঁটে ছ্যাঁকা লাগায় জপেনদা থামলেন। সেই সুযোগে আমি একটি প্রশ্ন গুঁজে দিয়েছি, 'আজকেব মিটিঙে বহু রকমের লোক ছিল। সেখানে অনবরত শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলাটা কি উচিত হত?'

জপেনদা জখম ঠোঁট চাটতে চাটতে বললেন, 'তাই লজ্জাবতী লতার মতন এমন একটি বক্তব্য রাখলি যার যে-খুশি যা-ইচ্ছে অর্থ করে নিয়ে তোদেরই পেটাতে শুরু করতে পারে, প্রগতিসাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে! অবগুণ্ঠিতা অসূর্যম্পশ্যা নারীর মতন এ অন্তঃপুরীয় লজ্জা কবে ভাঙবে, রোশন-আরা? শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণটা সর্বসমক্ষে উপস্থিত করাটা কি সংকীর্ণতাবাদ? যাঁরা বসে তোদের ওই দ্বিগ্বিদিকহীন অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনছিলেন সবাই তো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, শ্রেণীসংগ্রামে তাঁবা তো তোদেরই পাশে লড়ছেন। গাধা,

শ্রেণীসংগ্রামের কথাটা পার্টি-সিক্রেট হল কবে থেকে রে? মানুষের নৈতিক মনোবল ভেঙে দিচ্ছে শাসকশ্রেণীর অপসংস্কৃতি, তোরা গেছিস মানুষকে রক্ষা করতে, তাকে জাগাতে, তাকে লড়াইয়ে নামাতে—তার নিজের স্বার্থে। সে লড়াইটা শ্রেণীসংগ্রামের আরেক রূপ, মতাদর্শের রূপ। শ্রেণীসংগ্রাম এবং মতাদর্শের সংগ্রাম অবিচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, অভিন্ন। এটা বাদ দিলে ওটা যে হাওয়ায় ঘুঁসি ছোঁড়া হয় এটা বুঝিস না? শত্রু কংক্রীট, বাস্তব, স্থূল। যে কৃষক উচ্ছেদ করছে, কর্মচারী ছাঁটাই করছে, মজদুর শোষণ করছে, সে-ই অপসংস্কৃতি সৃষ্টি করছে। এটা যতক্ষণ স্পষ্ট করে তুলে না ধরছিস, ততক্ষণ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই তোদের মতন কয়েকটা কর্মীব মধ্যে আটকে থাকবে, কেউ সাড়া দেবে না।'

জপেনদা এবাব বেয়ারাকে ডাকাডাকি করে স্যান্ডউইচ, বাদাম, পকোড়া ইত্যাদি আনাতে লাগলেন, আর আমরা পকেটে হাত ঢুকিয়ে টিপে টিপে দেখছি টাকা কত আছে, হাতির খোরাকের দামটা দিতে পারব কিনা।

জপেনদা আবার সরব হলেন আচমকা, 'তা নাচতে নেমে সলজ্জ বধূর ঘোমটা তো টানলি। তারপরই তোদের বক্তা পুনরাবির্ভূত ট্রট্স্কির মতন ধর্মের কথাটা তুলতে গেলেন কেন?'

মধু বলল, 'কী?'

'বাবা তারকনাথ নামক পূতিগন্ধময় চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তোদের মোগলদা না কী নাম—'

'যুগলদা! যুগলদা!' দুজনে বললাম।

'হ্যাঁ, তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দশ মিনিট একটানা বললেন কেন? তিনি পেয়েছেন কী শুনি?'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'বাঃ, ধর্মের বদমাইশির বিরুদ্ধে বলতে হবে না?'

কলকাতার স্টেট-বাসের ব্রেকের মতন তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ চিৎকার জাগল জপেনদার কণ্ঠে, 'তোরা আনার্কিস্ট! তোরা বাকুনিনবাদী একেকটি মূর্তিমান প্রতিবিপ্লবী কালাপাহাড়! তোরা ট্রট্স্কির সর্বশেষ বংশধর!'

আমরা হাঁ হয়ে গেছি আক্রমণের প্রাবল্যে।

'মার্ক্স্বাদী কখনো বিপ্লবের পূর্বে ধর্মের বিরুদ্ধে ওভাবে কথা কয় না। সে জানে বিপ্লবের পরও বহু বৎসর ধরে ধীরে ধীরে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম নামক বিপজ্জনক চিন্তাটাকে মানুষের মন থেকে দূব করা যাবে। কিন্তু বিপ্লবের আগে ধর্মকে অপসংস্কৃতি আখ্যা দিলে যে-মানুষকে চাইছিস তোর পাশে, সে দাঁড়াবে তোর বিপক্ষে। বিপ্লবের পূর্বে ধর্ম একটা গুরুত্বহীন ব্যাপার। বিপ্লবের পূর্বে আমাদের একটিই মাপকাঠি—মানুষ তার অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক ক্ষমতা-দখলের লড়াই লড়বে কিনা। তোদের কি এই নৈরাজ্যবাদী ধারণা আছে যে ধর্মভীরু মানুষ লড়াই করে না? কোন ইতিহাসে পেলি এই কিম্ভূত খবর? রুশিয়ায় যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, নাবিক, সৈনিক, অকটোবর বিপ্লব করেছিল তারা সব লেনিনের মতন নাস্তিক ছিল নাকি রে হতভাগা? চীনের লালফৌজ সব ঘোর ধর্মবিরোধীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? কিউবায় বহু ক্যাথলিক পাদ্রি মুক্তিফৌজকে সাহায্য করেছিলেন সে-খবর রাখিস?

ভিয়েতনামের প্রায় গোটা লোকসমষ্টিই যুদ্ধে নেমেছিল—আগে নাস্তিকতার পরীক্ষা দিয়ে বুঝি? তোবা চাইছিস কী? শ্রেণীসংগ্রামের জরুরি কথাটা বলব না, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মের মতন বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় একটা প্রসঙ্গ টেনে এনে মোর্চা ভেঙে দেব, হিন্দু মুসলিম সবাইকে ঠেলে দেব শত্রুশিবিরে—এই তো নগ্ন নির্লজ্জ উদ্দেশ্য তোদের?'

বিষম দমে গিয়ে মধু বলল, 'ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে?'

'দেত্তেরি!' হুংকার দিলেন জপেনদা, 'বলছি ময়দানে বন্ধ কবতে হবে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্য ক্ষেত্র আছে, ভিন্ন পদ্ধতি আছে। জনসভায় চিৎকার করে ও-সংগ্রাম করা যায় না রে বেকুব। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে নাটক কর না, তাঁর জবানিতেই ধর্মীয় কুসংস্কারকে আক্রমণ কবতে পারবি। তোদের পরমারাধ্য যুগলদার চেয়ে বিদ্যাসাগরের কথা বেশি শুনবে লোকে। বিবেকানন্দ-বেশী অভিনেতা যখন বিবেকানন্দের কথাতে বলবেন, শাস্ত্র পড়ার চেয়ে ফুটবল খেললে বেশি লাভ হয়, লোকের মনে কথাটা ধরবে। নইলে ধর্ম সম্পর্কে গুরুগম্ভীর বই লেখ্ যদি ক্ষমতা থাকে। প্রাচীন ভারতে ধর্মের উৎপত্তি বোঝা, নাস্তিকতা ও বস্তুবাদ যে এককালে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত ছিল এসব উদ্ধৃতি-সহযোগে বর্ণনা কর্। তার লোকায়ত দিকটাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধর্। তারপর শাসকশ্রেণীর হাতে তাব ব্যবহার এবং বিকৃতি বিশ্লেষণ কর্। ক্রমশ যে ধর্ম নিজের বিপরীতে পরিণত হয়েছে, এই মার্কস্‌বাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা কব্—তবে একটা কাজের কাজ হয়, উচ্চশিক্ষিতদের একাংশকে সঙ্গে পেয়ে যাবি। কিন্তু এই মুহূর্তে সাধাবণ মানুষের সামনে গিয়ে ধর্মকে অপসংস্কৃতি বললে আত্মহত্যা করবি। থেকে থেকে শুনি হতাশ নাট্যকাব ও অধৈর্য চলচ্চিত্রকারের খেদোক্তি—আর কাজ করে কী হবে? যে জনগণ সি-পি-এমকে ভোট দেয তারাই আবাব বাবা তাবকনাথ দেখতে ভিড় করে। তোদেরও প্রতি বক্তৃতায় ওই একই নাকে কান্না শুনি, গেল, গেল, সব গেল! বাংলার যুবশক্তি বোম্বাইয়া ছবি দেখে দেখে উচ্ছন্নে গেছে, মদ খাচ্ছে, গাঁজা খাচ্ছে, মাস্তানি করছে! এটা মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণ? ইতিবাচক কিছুই নেই, শুধুই নেতি? আলো নেই, শুধু আঁধার? সেটা অসম্ভব, সেটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সেটা ডায়ালেকটিক্‌স্‌কে অস্বীকার। অনেকে বাবা তারকনাথ দেখলেই এ কথা বোঝায় না দর্শক সব ভেড়ার পাল হয়ে গেছে। কিছু ছোকরা বিপথে গেলেই এটা প্রমাণ হয় না আস্ত যুবশক্তি উচ্ছৃঙ্খলতায় ভেসে গেছে। যে তারকনাথ দেখে গদগদ হচ্ছে, সেই যথাসময়ে অস্ত্র হাতে ছুটে যেতে পারে ব্যারিকেডে। বাংলার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ যুবক মদও ধরেনি, গাঁজাও ধরেনি—তারা চাকরি খুঁজছে, কারখানায় উদয়াস্ত খাটছে, ক্ষেতে সারাদিন লাঙল দিচ্ছে, আপিসে কলম পিষছে। এটাই বৃহত্তর সত্য। এটা চেপে দিয়ে মুষ্টিমেয বডলোক ও ক্রিমিনাল ছোকরার অধঃপতন নিয়ে মজে আছিস কেন তোরা? বাংলাব মনোবল ভাঙতে চাস নাকি? এ তো দেশ-অমৃত-আনন্দবাজার করে থাকে। বন্যার সময়ে মজুতদারের পয়সা খেয়ে হেডলাইন ছাড়ে—'কলকাতায় আতঙ্ক!' ভয়ে মানুষ থমকে দাঁড়ালে, জনজীবন স্তব্ধ হলে, হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো যাবে। তোরা বাজারি পত্রিকার সঙ্গে গলা মেলালি কোন আক্কেলে? তোরা তো সর্বসময়ে দেখাবি কীভাবে লডছে বাংলার মানুষ, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে তার বীরত্বটাই হবে তোদের বক্তব্য। তোরা তো বলবি, তারকনাথের পর করুণাময়ীকে

পদাঘাতে তাড়িয়েছে ওই বাংলার মানুষ। সেটাই হবে তোদেব লাইন। তোরা বুক ঠুকে বলবি, এতদিনকাব কংগ্রেস-পিষ্ট বাংলা আজ লালঝাণ্ডা তুলে ধরেছে, সেটাই হিমালয়-প্রমাণ সত্য। বিধ্বস্ত বাংলায় সত্যজিৎ আছেন, মৃণাল সেন আছেন, আসছেন একাধিক নবীন আদর্শবাদী। ক্যাবারে-নাট্যের চেযে অনেক শক্তিমান গণনাট্য আন্দোলন। বিপুল পরাজয়ের মধ্যে একটি যদি সামান্য জয হয়, সেটাকেই তুলে ধবাব কথা তোদেব। আব যে প্রদেশে সমানে-সমানে মোকাবিলা চলছে, আঘাতেব উত্তবে আঘাত হানছে শিল্পী-সাহিত্যিকরা, সেখানে তোদের কুড়ি পৃষ্ঠার কর্মসূচিতে বিলাপ ছাডা কিছু নেই? তোদেব পাতি-বুর্জোযা হতাশা রোগে ধরেছে, চিকিচ্ছে করা।'

খাওযা-দাওযা সেরে হৃষ্টচিত্তে জপেনদা রাস্তায নামলেন, আমাব শেষ সম্বল দিয়ে পান-সিগারেট কিনলেন এবং মধুব শেষ সম্বলটুকু নিজেব পকেটে পুরে ফেললেন ট্রামের ভাড়া বাবদ। কিন্তু ট্রামে তিনি চাপলেন না, ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিযে পুনবায় বলতে শুরু করলেন, 'আসলে কী বলতে হবে না-হবে তা তোদেব মাথাতেই আসতে পাবে না, কারণ বিপ্লবের কোন্ স্তবে আমবা আছি তাই নিবক্ষবতাহেতু বা গর্দভবৃত্তি হেতু তোবা জানিস না।'

আমি বুক্ষস্ববে বললাম, 'তা জানব না কেন? নিশ্চয জানি। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবেব স্তরে।'

জপেনদা অনুকম্পার হাসি হেসে বললেন, 'ও তো দেযালেব লেখা দেখে বলছিস। কথাটার মানে কী?'

মধু আমাদেব মধ্যে প্রখব তাত্ত্বিক। ও বডো বডো উদ্ধৃতি দিযে অকাট্য যুক্তি ফাঁদতে পারে। সে তৎক্ষণাৎ বলল, 'যেহেতু ঔপনিবেশিক দেশেব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কবার শক্তি ধরে না, সেইহেতু শ্রমিকশ্রেণীব নেতৃত্বে প্রথমে সে-বিপ্লব সমাধা কবতে হবে, তাবপর সমাজতন্ত্রে এগুতে হবে।'

জপেনদা জুডে দিলেন, 'এবং এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবেব স্তবকে হনুমানেব লম্ফত্যাগ করে যে পেবিয়ে গিযে একচোটে সমাজতান্ত্রিক স্বর্ণলঙ্কায পৌঁছুতে চায তাকে ওই হনুমান বা মর্কট নামেই অভিহিত কবা শ্রেয়ঃ। তা তোবা হনুমানবা যেভাবে ধর্মেব কথাটা তুলছিস তাতে ভয হয কখন বুঝি বা গাছে উঠে হুপ হুপ করিস। কাবণ ওসব অনেক পরেব স্লোগান, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পবেব স্লোগান। তা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট কী বলে, কী করে?'

মধু সৈনিকের মতন দুই গোডালি এক কবে বলল, 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণসংস্কৃতি গড়ে।'

জপেনদা রোষকষাযিত নেত্রে মধুব কুচকাওয়াজের ভঙ্গিটা দেখেন। তীক্ষ্নস্ববে বলেন, 'মুখস্থ-কবা বুলি ছাড়! বেয়াদপ ছোকরা। যা বলছিস তার অর্থ বুঝিস? সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী না হয় বুঝলি, সামন্ততন্ত্রের বিবুদ্ধে সংস্কৃতিকে অস্ত্রেব মতন ব্যবহাব করার অর্থ কী জানিস? ইয়োরোপে যে কাজটা বিপ্লবী বুর্জোয়া সম্পন্ন কবেছিল আঠারো এবং উনিশ শতকে, সেকাজ এখানকাব হনুমানভক্ত বর্বব ঘি-খাওয়া চোর ব্যাপারিরা কখনোই করতে পাবে না। মানুষের মনকে মুক্ত করা, সমাজের পশ্চাদ্‌মুখী শাসন থেকে ব্যক্তিকে উদ্ধার করা, তার শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা কবা, চণ্ডীমণ্ডপের ডিকটেটরি খতম করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ঘটানো —এটাই হচ্ছে মূল কাজ। পরে সমাজতন্ত্রের যুগে পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিরা আবার স্বেচ্ছায় সমষ্টিতে মিলিত হবে। ব্যবহারিক জগৎ থেকে উদাহরণ ধর্। এ-যুগে কৃষকের হাতে জমি দিতে হবে, কিন্তু সমাজতন্ত্রেব যুগে আবার কৃষকরা যৌথ খামার বা কমিউনে মিলিত হবে। মানসক্ষেত্রে তাবই প্রতিফলন। ফিরিয়ে দিতে হবে সব মানবিক অধিকার, অন্ধ অশিক্ষিত সামন্তযুগীয় সমাজের পেষণ থেকে মুক্ত কবতে হবে ব্যক্তিকে। তার স্বাধীন চিন্তাকে পাখা মেলতে দিতে হবে। তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। নইলে সমাজতন্ত্রের যোদ্ধা তৈরিই হবে না। পূর্ণ বিকাশ ঘটলে তবে মানুষ নতুন সমাজে নিজেকে বিলীন করবে, নইলে নয়।'

আমি একটু আমতা আমতা করি, 'কথাটা পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে না?'

'আপনার লম্বা কর্ণে ডায়ালেকটিক্স্ যে পরস্পরবিরোধী শোনাবে লম্বকর্ণ মহাশয়, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ কোনোদিনই ছিল না,' আভূমি নমস্কার করে বললেন জপেনদা, 'তবে আমরা যাবা ছাগল্ নই, আমাদের বুঝতে কষ্ট হয না যে এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সামন্ততন্ত্রের নরক থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত না করলে সে থেকে যাবে বুকে-হাঁটা সবীসৃপ। একপাল দাস নিয়ে সমাজতন্ত্র গড়তে যায যে উজবুক সে সমাজতন্ত্র গড়ে না, গড়ে নাৎসি সমাজ, ফাশিস্ত ব্যাবাক।' —বলে সিগাবেটে দীর্ঘ টান মেরে জপেনদা বাঁধানো দাঁতের পাটি একবাব হাতে নিয়ে নাচালেন। আবার মুখে পুরে মুখশ্রী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বললেন, 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কাজ কী, এ প্রশ্নে যাওযার আগে (তোদেব ঘটে যদি বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকত) তোদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল শত্রু কোনদিক থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। উত্তব-ভারতীয জোতদার-জমিদারের যে মধ্যযুগীয় চক্রকে ভাবতেব বৃহৎ পুঁজিপতিরা দিল্লির গদিতে বসিয়েছে, তারা এবং কলকাতায় তাদেব মদাপ সেবাদাসবা কোন পথে জনগণের মনের মধ্যে নিস্তেজক বিষ ঢালছে এটা আগে না বুঝলে প্রতিরোধ কববি কী করে? সবকাবের চবিত্র বোঝ্। দিল্লিব ঘুষ আব লাম্পট্যের রাজ্যে অধিষ্ঠিত বোধ কবি আজ বিশ্বেব সবচেয়ে পশ্চাৎপদ সবচেযে বিজ্ঞানবিরোধী একদল উচ্চবর্ণ হিন্দু। তাদেব মতাদর্শের কলকাত্তাই প্রচারকরা স্কচ-খাওয়া বৃহৎ সংবাদপত্র পোষিত তথাকথিত লেখকগোষ্ঠী, যাদেব কলমে আজকাল পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর কিছু বেরোয না। বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে যারা নির্লজ্জতম মিথ্যার হাট সাজায় সংবাদপত্রে, তাবাই গল্প-উপন্যাসের আবরণে যৌনতা ছড়ায়। তাদেবই একটি বিশেষ সুবাসক্ত মূর্খ যাত্রাজগতে হামলা চালাচ্ছে কিছু অধিকারীর পয়সা খেয়ে। এরা সকলে গিয়ে নিরক্ষর বাসভবিহারীব পযসা খেযে তাকে এই সেদিন গিবিশ নাট্যোন্নয়নের হোতা এবং নেতা আখ্যা দিয়েছিল। ওই রাসভ এবং বারবধূর অধঃপতিত ব্যবসায়ীরাই বাংলা নাট্যশালায় নগ্ন নারীর নৃত্য চালু কবেছে ওই লেখকগোষ্ঠীর উৎসাহ ও প্রেরণায়। দেখছিস? একটাই তো চক্র। একটাই এদেব সদর দপ্তর, দুটি সংবাদপত্রের সাইনবোর্ডেব পেছনে। বিশাল জনগোষ্ঠীর পাশে এরা অতি ক্ষুদ্র। বিদেশি টাকার জোর ছাড়া এদের আর কিছু নেই। পদাঘাতে এরা দূরীভূত হবে অতি শীঘ্র, যদি তোরা এদের পরিচয়টা উদঘাটিত কবতে পারিস, মানুষকে বোঝাতে পারিস।'

একটু থেমে জপেনদা বললেন, 'কিন্তু তোরা তা করছিস না। তোরা সুনির্দিষ্ট শত্রুকে চিহ্নিত

করার বদলে এলোমেলো চতুর্দিকে ঘুঁসি ছুঁড়ছিস। তোরা ছাতারের নৃত্য লাগিয়েছিস। দেখ্ না। শত্রুর প্রথম এবং মারাত্মক প্রচার চলছে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। দিল্লির কুলাকচক্র সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তাই ভারতের জনগণের যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য রয়েছে তাকে নির্মূল করা ওই শয়তানদের প্রথম কাজ। একটা প্রচার ইদানীং পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত বাংলায়, আর তেমন ধারে কাটছে না। যথা, স্বাধীনতা এনেছেন গান্ধী এবং তাঁর অহিংসানীতি ; যাঁরা বন্দুক ধরেছিলেন তাঁরা বিপথগামী নির্বোধমাত্র। কিন্তু তোদের লড়ে যেতেই হবে, যতক্ষণ না গান্ধীর নাম পর্যন্ত নিতে ভয় পায় দেশদ্রোহীর দল। সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী বিপ্লবটা তারই পরিণতি, ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী। কিন্তু গান্ধীকে নিয়ে এ তল্লাটে কল্কে না পেয়ে, সাম্রাজ্যবাদেব বেতনভুক দাসের দল অন্য পথ ধরেছে। তারা কথায় কথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যত্র তত্র। ইংলন্ডে বসে নীরদ চৌধুরী মহাশয় ববার্ট ক্লাইভেব জীবনী লিখে প্রমাণ করছেন, ভাবতবাসী ছিল অসভ্য, মহামতি শ্বেতচর্ম ক্লাইভসাহেব সভ্যতাব আলো এনেছিলেন হেথায়। একটা তৃতীয় শ্রেণীব জালিয়াৎ এবং চোরকে ইতিহাসের নির্মম বিচার থেকে রক্ষা কবতে ছুটে গেছেন অসভ্য দেশেব নীরদবাবু। 'বেগম মেরি বিশ্বাস' পড়েছিস, বা রাসভের অসভ্য নাট্যরূপ দেখেছিস? রবার্ট ক্লাইভ সেখানে মহৎ, উদাব, ক্ষমাশীল। যাত্রায় চেষ্টা হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মতন একটা জোচ্চোর খুনিকে নাযক করে পালা সাজাবার। সে নাকি দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার কান্না শুনে আর স্থিব থাকতে পাবেনি, ছুটে এসে যত নষ্টের গোড়া রেজা খাঁকে পদচ্যুত করে বাংলাকে বাঁচিযেছিল! প্রাক্তন বঙ্গেশ্বব দেশ পত্রিকায খুব কষ্ট কবে স্মৃতিচাবণা করছেন ; হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সিবাজদ্দৌলাকে তেড়ে গাল দিতে লাগলেন, কেননা বিশ্বইতিহাসেব সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী হলওযেল সাহেবেব বইতে বঙ্গেশ্বর পডেছেন সিবাজ বড বদ ছিলেন। তা শুধু সাদা চামডাব জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মিথ্যুকের কথাও যদি বঙ্গেশ্ববের কাছে বেদবাক্য হয়, তাহলে আবেক ধাপ এগুলেই পারেন। সিবাজ যদি সত্যিই অত্যাচারী হন, তাহলে মীবজাফব গৌরবর্ণ মহাপ্রভুব পাদুকা শিরে ধারণ করে সিরাজকে হত্যা করিয়ে সঠিক কাজই করেছিলেন। সুতরাং বাংলাব নূতন হিরো হল মীবজাফব, বঙ্গেশ্বর এবং হলওয়েলেব যুগ্ম আশীর্বাদে। 'জব' চার্নক নামে একটা ভবঘুরের নাম গল্পে, ফিল্মে ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে, যদিও লোকটার আসল নাম ছিল 'জোব'। সে নাকি কলকাতা প্রতিষ্ঠা করেছিল, ওই হলওয়েলেব স্যাঙাৎদের তাই থিওবি। শ্বেতচর্ম যে-কোনো ইতিহাসের লেখককে শুধো, আচ্ছা লন্ডন কে প্রতিষ্ঠা করেছিল জানেন? স্মিতহাস্যে তিনি তোর নির্বুদ্ধিতাকে ক্ষমা কবে বলবেন, অতবড় একটা শহর কি কোনো একজন লোকে গড়ে? শত শত বৎসর ধরে বিকশিত হয। কিন্তু কলকাতার বেলায় তা হতে পারে না, সাহেব বলেছে। জোব চার্নকের প্রপিতামহ যখন মায়ের পেটে আসেননি, তখনকাব—সেই চোদ্দ শতকের —বাংলা পাণ্ডুলিপিতে, মনসামঙ্গলের পাতায় পাতায় কালীঘাট, কলিকাতা, বরানগর প্রভৃতির নাম রয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না, সাহেব বলেছে। সেসব তো নেটিভদের বসতি। দে ডোন্ট কাউন্ট। জোব চার্নক এসে নেটিভদের ঘরেব মাঝে ইংরেজ বাণিজ্যের একটি কুঠি খুলতেই বিস্ফোরণের মতন, গুণগত পবিবর্তনের মতন,

তিন এটম অক্সিজেন থেকে ওজোন সৃষ্টির মতন কলিকাতা মহানগবী দাঁড়িয়ে গেল সভ্যতার মানচিত্রে। মূল হচ্ছে জোব চার্নকেব ওই গদি, ওই দোকানখানা। পাশেই সুপ্রাচীন কালীমন্দিরে শত শত বৎসব ধরে পুজো (এবং নববলি) দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু সেটা তো মন্দির, সাহেবেব গোসলখানা তো নয়। পুজো দিয়েছে কেলে বাঙালি, সাহেব তো সেখানে যায়নি। সুতবাং তাব কোনো ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পাবে না, সাহেব বলে দিয়েছে। এবং সাহেব যেহেতু বলে দিয়েছে সেহেতু চার্নকেব শৌচালয় প্রতিষ্ঠা থেকে কলকাতাব বযস নিবূপণ কবে, চার্নককে হিবো কবে, উপন্যাস লেখা হয়ে গেল। একটি গাঁজাখুরি গল্প সাহেবরা পূর্বে চালু করেছিল, চার্নক নাকি এক সতীকে চিতা থেকে উদ্ধাব কবে বিবাহ কবেছিলেন। পববর্তীকালে কিছু সাহেবই আবার বলে ফেললেন, গল্পটি অসত্য, যদ্দুব মনে হয় একটি বা একাধিক বাঙালি নারীকে ওই চার্নক বেখেছিলেন স্রেফ জৈবিক কামনা চবিতার্থ কবতে, সতীউদ্ধাব-টুদ্ধাব সব গুল। কিন্তু সাহেবভক্ত বাঙালি তা শুনবে কেন? সে একটা চমৎকাব অজুহাত পেযে গেছে সাহেব ভজনাব, ইতিহাসেব ফোপরদালালি সে সইবে কেন? দেবতুল্য, মহামহিম, বাঙালি নাবীব বক্ষাকর্তা, বাংলার বন্ধু জোব চার্নক আত্মপ্রকাশ কবলেন উপন্যাসে। এদিকে পাদ্রি লং ওই চার্নক-পুঙ্গব সম্পর্কে লিখে গেছেন, লোকটাব এমনই সব বিকৃত যৌনক্ষুধা ছিল যে সে খেতে বসলে একদল উলঙ্গ বাঙালি চাষিকে লাইন করে দাঁড কবিয়ে চাবুক মাবা হত, তাদেব আর্তনাদটা হত লাঞ্চটাইম মিউজিক। কিন্তু ওই বাঙালি ঔপন্যাসিক দৃঢ়চেতা পুবুষ, পাদ্রি লং-এর জবানবন্দীও কোনো দাগ কাটলো না তাঁব ইংরেজ ভক্তিতে। উপন্যাসে নাবীধর্ষক চার্নক হলেন নাবীত্রাতা, কৃষকপীডক হলেন বঙ্গবন্ধু। এখন সেটি চলচ্চিত্রে বূপাযিত হচ্ছে যাতে কলিকাতাব পিতা জোব চার্নকেব নাম মাহাত্ম্য দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয—বঘুপতি রাঘব এবং জোব চার্নক।

'এবকম লজ্জাহীন সংকোচহীন সাহেবতোষণ ছাডাও ছোটোখাটো খুচখাচ এখানে-ওখানে সাম্রাজ্যবাদীদেব প্রশস্তি গেযে নেওয়া হয। বেললাইন সম্পর্কে প্রবন্ধেব মধ্যে, আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনীতে। মায় দেশ-পত্রিকায দার্জিলিং শহবেব ইতিহাস লিখতে গিযে জনৈক কলমপেষা লাইনে লাইনে ইংরেজ শাসনেব প্রশংসা এবং নেপালের নিন্দা করে গেছেন। এখনো তৈবি হ কমবেড্স, এখনো সময় আছে। বডো ভীষণ খেলা খেলছে শাসকশ্রেণীর ভাডাটে লেখকবা। এই সেদিনও তারা ভিয়েতনামি মুক্তিযোদ্ধাদেব চীনের দালাল বলত, আর মার্কিন ডাকাতগুলোকে বলত সামাবাদের বিবুদ্ধে মুক্তিব প্রাচীর। মিথ্যায এদেব জন্ম, মিথ্যায় পুষ্টি। এবা এখন মালিকের হুকুমে ভারতবাসীর দেশপ্রেমে ফাটল ধবাতে চায়। একবাব যদি দেশেব মানুষেব দেশপ্রেমিক অতীতটাকে মসিলিপ্ত কবে দেওযা যায, যদি দেখানো যায় ইংরেজই এদেশকে সভা কবে গেছে, ইংরেজ শাসক আসাব আগে আমবা ছিলাম প্রাগৈতিহাসিক পশুবিশেষ, তাহলে দুশো বছরেব অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়ে পড়ে অসভ্য আরণ্যক মানুষের বার্থ উল্লম্ফন। এরা মানুষকে তাব গর্বিত অতীত থেকে বিয়োজিত করতে চায়, যাতে সে হযে পড়ে নিবুদ্যম, হতাশ, সংগ্রামবিমুখ। তাই বড় বড করে লেখ্ তোদেব ঘোষণাপত্রে—অপসংস্কৃতির সবচেয়ে ভীষণ প্রকাশ হচ্ছে দেশদ্রোহীদের সাম্রাজ্যবাদী প্রচাব।

তারা দেশপ্রেমেব শিকড় ধরে টান মারছে।'

জপেনদার কথাগুলো শুনে বুকের মধ্যে কেমন যেন গুড গুড করে উঠল, মনে হল এখুনি দেখব কলকাতার নৈশ আকাশে সেক্রেটাবিযেট গৃহের মাথা ঘেঁষে উড়ে আসছে মার্কিন বোমাবু ঝাঁক, নাপাম বোমা প্রসব করতে করতে।

জপেনদা বললেন, 'এক্ষেত্রে তোদেব কী করতে হবে? সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণসংস্কৃতি গড়বি বলছিস, কিন্তু কী কবছিস? কটা দল নাটকেব মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধেব ঘটনাগুলো তুলে ধরছে? সময় এসেছে এ প্রদেশেব প্রতি কোনায় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী পৌঁছে দেওযার, সেই সিবাজ, মীরকাশেম, মজনু শা থেকে ডিবোজিও, তিতুমীব, সিধু-কানু, মেঘাই সর্দার, কুঁযব সিং, ঝাঁসিব বানী, আজিমুল্লা, নানাসাহেবেব পথ ধবে, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ হযে মীবাট ষডযন্ত্র মামলার নতুন ধবনেব বিপ্লবীদের কথা পর্যন্ত। সুভাষ, আই এন এ, নৌবিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা, চটকল আব সূতাকলেব শ্রমিকদের সংগ্রাম—এসব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিবুদ্ধে আমাদেব পূর্বসূবীদেব প্রচণ্ড আপোসহীন লডাযের একটি অধ্যায। এসব তোরা দেখিয়ে যা, নিযমিত, কোমব বেঁধে—নইলে গেলি। আক্রমণ এসে গেলে শুধু হাত কামড়াবি, যদি এখন থেকে আদা জল খেয়ে না লাগিস।'

'অপসংস্কৃতির দ্বিতীয় প্রকাশ—জাতিনির্যাতন', হঠাৎ কথাটা তাবস্বরে বলে উঠলেন জপেনদা। জনাকযেক পথচাবী প্রবল চমকে উঠল, একজন ফুটপাথেব বই বিক্রেতা বলে উঠল, 'আস্তে।'

মধু শুধোল, 'জাতি-নির্যাতন? এদেশে? ইন্ডিযায?'

জপেনদা দাঁত বাব কবে খিঁচিযে বললেন, 'তা জাতিপীডন কি শুধু মার্কিন মুলুকে হয? চোখ নেই আহাম্মুক? ও দুটো কী তাহলে কোটবেব মধ্যে জুলজুল কবছে? এদেশে অন্তত বিশটি পৃথক পৃথক জাতি বাস কবে। যতগুলো ভাষা ততগুলো জাতি। স্তালিন পড়িসনি, বেআক্কেল? এবং এইসব জাতিকে নিঃস্ব রিক্ত কবে দিল্লিকে ইন্দ্রপুরী বানাচ্ছে কুলাক শাসকচক্র। সর্বস্ব লুঠে নিযে যাচ্ছে, টুঁ শব্দ কবলে সি-আব-পি, বি-এস-এফ, মিলিটাবি পাঠাচ্ছে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাতে। সেই অর্থনৈতিক বাহাজানিবই বাজনৈতিক প্রতিফলন দেখবি সংবিধানে। রাজ্যেব কোনো ক্ষমতাই নেই। তোদেব নির্বাচিত সবকাবকে ববখাস্ত কবতে পাবে যখন-তখন, তোব বাজ্যেব মধ্যে কেন্দ্র থাবা বাডাতে পাবে যেদিন খুশি, মায তোব বাজ্যটা সুদ্ধু ইচ্ছে হলে অন্য রাষ্ট্রকে দিযে দিতে পাবে—তোব কিছু বলাব থাকবে না। এই দস্যুবৃত্তিব সনদের জোবেই তো দেখিসনি বন্যাব সমযে হুজুরদের চেহারা? এবোপ্লেনেব দবজায দাঁড়িয়ে একেক মহামান্য করুণার দৃষ্টি মেলে দিযে বলছেন, 'এ টাকাটা আমি বরাদ্দ কবে দিচ্ছি'। ববাদ্দ করছেন কার টাকা? সে টাকা তোদেরই বাংলা থেকে বস্তা ভবে নিযে গেছেন মহামান্যরা গত ত্রিশ বছর ধবে। আজ সে-টাকা 'বরাদ্দ' করছে ঘুষখোর অপদার্থ মন্ত্রী। তোদেবই টাকা তোদেবই ভিক্ষে দিচ্ছে, ভিখিরি বানিয়ে তোদের ব্ল্যাকমেল কবছে। যে কোনো সময়ে টাকা আটকে তোর নির্বাচিত সরকারকে অগাধ জলে ফেলে দিতে পাবে ওই দিল্লি। তা এবকম দিনে দুপুবে ডাকাতিব সাংস্কৃতিক দিক নেই? এই অর্থনৈতিক জুলুমেব একটা মতাদর্শগত সমান্তরাল

নেই ভাবছিস?'

মধু বলল, 'না, না, থাকাই তো স্বাভাবিক।'

জপেনদা সবকারি উকিলেব মতন মধুব নাকের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, 'কী সেটা? কোন গোপন পথে সেটা ওরা প্রচার করছে? এ এমন দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দেন, তিনি পুরো নাগাজাতিটাকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ এমন জাতিনির্যাতনের লীলাক্ষেত্র যেখানে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলার ঔদ্ধত্য রাখেন যে জাতিগুলির স্বাধিকারের কথা কইলে তিনি ফৌজ লেলিয়ে দেবেন ; সেদেশে স্বভাবতই শাসকশ্রেণী আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রতিটি জাতিব ভাষা, সংস্কৃতি, নিজস্বতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাজাত্যাভিমানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সবাইকে এক 'অখণ্ড ভারত' নামক শোষণেব বধ্যভূমিতে একত্র করতে। জাতিগুলির স্বাধিকাবচেতনাকে আগে নির্মূল করতে না পারলে কিছুতেই তাদেরকে ভারতীয় ইউনিয়ন নামক অবাধ লুণ্ঠনেব বাজত্বের দাস কবে রাখা যাবে না। তাই ঘন ঘন গগনভেদী চিৎকাব—'ভারতমাতা', 'ইমোশনাল ইন্টেগ্রেশন', 'পবিত্র সংবিধান'। তাই হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়াব উৎকট কদর্য জাতিবিদ্বেষী পাঁযতাবা। এর প্রতিক্ষেত্রে তোদের রুখে দাঁড়াতে হবে। বলবি, ভারতের প্রতি জাতির পূর্ণ ও অবাধ সাংস্কৃতিক বিকাশ চাই। আমরা সবাই স্বকীযতায় ভাস্বর হলে, তবেই ঐক্যবদ্ধ হব। আবাব সেই ডাযালেকটিক্স্। বাংলা মরলে উত্তরপ্রদেশ বাঁচবে না। মহারাষ্ট্র পূর্ণ বিকশিত হলে তবে সে পাঞ্জাবের হাত ধবতে পারবে। সেই সঙ্গে তোবা দেখাবি, দিল্লির বেইমানদেব মুখে ভাবতমাতাব নাম হচ্ছে চোবেব মুখে বাম নাম। দেখাবি, ওদেব ইন্টেগ্রেশন মানে পুঁজিপতিদেব কাঁচামাল ও বাজাবেব ইন্টেগ্রেশন। বলবি, এ সংবিধান জাতিগুলির দাসত্বেব মুচলেকা। সজোবে বলবি, সাম্রাজ্যবাদের দালালরা যেন ভাবতেব জাতিগুলিকে দেশপ্রেম এবং ভাবতেব ঐক্যেব কথা না শেখাতে আসে। বলবি, এই সেদিন যাবা ব্রিটিশ মালিকেব জুতোব ঠোক্কর খেয়ে অখণ্ড ভাবতমাতাব দেহে দা চালিয়ে তাঁকে খণ্ড খণ্ড করেছে তাদেব মুখে ভারতমাতাব স্তবগান ঠিক ভালো শোনাচ্ছে না।

'কিন্তু জাতিগুলিব প্রতিরোধ ভাঙবাব জন্য অন্য যে কৌশলটি জল্লাদেরা গ্রহণ কবেছে তা ভাবতেব প্রতি বাজ্যে দিল্লির হুকুমবাহী প্রসাদপুষ্ট তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী প্রয়োগ কবে চলেছে অহবহ। যেমন দেশপ্রেমিক ঐতিহ্যকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যে বিষয়ে এখুনি বললাম, তেমনি প্রতিটি রাজ্যেব সাংস্কৃতিক অতীতকে কলঙ্কিত কবার এক প্ল্যান নেওয়া হয়েছে, সংস্কৃতিব শিকড ওপড়াবার চেষ্টা চলছে। গুণ্ডাব দল মূর্তি ভাঙছে। তারা যে কাজটা প্রত্যক্ষ অ্যাকশন মাবফৎ করছে, সেটাই ঢের বেশি বিপজ্জনকভাবে করে চলেছে একদল লেখক। মূর্তি ভেঙে একজন মনীষীকেও ঘায়েল করা যাবে না, এটা নির্বোধেও বোঝে। কিন্তু সাহিত্যের বেশমি বস্ত্রেব আড়ালে যে সুনিপুণ প্রচারকার্য চলছে তা যদি কিছু মানুষকেও নিজ ঐতিহ্যের মুখে ইতরেব মতন তুড়ি মাবতে শেখায, তবে তা দ্রুত ছড়াতে শুরু করবে হতাশ মধ্যবিত্ত যুবকদেব মধ্যে এবং কিছুদিনের মধ্যে আমবা আক্রান্ত হব পেছন থেকে। রবীন্দ্রনাথকে বারংবার অযৌক্তিক নিন্দায় ভূষিত হতে হয়েছে। ওটা অবশ্য কিছু পাতিবুর্জোয়া লেখকের একটা হবি। কাজ না থাকলেই রবিঠাকুবকে এক হাত নিয়ে নেওযা। ওদিকে বেশি এগুতে

না পেরে এবার রবীন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষ থেকে আরম্ভ কবা হয়েছে। রামমোহন রায়কে সম্প্রতি বহু গঞ্জনা সইতে হচ্ছে। রামমোহনকে নিযে কি আলোচনা হবে না? তিনি যে নীলকরদের বাংলায় বসতি করা সমর্থন করেছিলেন তা কি তুলে ধরা হবে না? হাজাব বার হবে, কিন্তু মানুষকে যেন তেন প্রকাবেণ আমার মতে টেনে আনবাব জন্য বামমোহনের শুধুমাত্র ভুলভ্রান্তি-অপকীর্তি তুলে ধরব এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর লডাইটা চেপে যাব 'সে তো সর্বজনবিদিত' বলে, এই অসাধুতা নিয়ে ইতিহাসেব পর্যালোচনা করা যায় না। বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা সর্বদেশে সর্বকালে প্রথমেই ধর্মসংস্কারেব এক প্রয়াস চালায। সেটা তারা উদীয়মান বুর্জোয়ার সাংসারিক স্বার্থেই করে বটে, কিন্তু ইতিহাসেব দৃষ্টিতে এইসব নবধর্ম প্রচলনের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। শুধু নেতি বা শুধু ইতি নিয়ে যাঁরা পুরাতত্ত্বেব ওপর চডাও হচ্ছেন তাঁবা শুধু বাংলাব কৃষ্টির শিকড় আলগা করে দিচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বোম্বাই-ফিল্মেব চিত্রনাট্যকাব বললেন এক লেখক 'দেশ' পত্রিকায, এবং স্বভাবতই সেটা ছাপা হল। এটাকে কি বঙ্কিম সাহিত্যেব আলোচনা বলে ধরা হবে? কিছুদিন পবেই উক্ত লেখক মধুসূদনকে টেনে নামালেন নিজের এবং তাঁর ইযারদেব সমপর্যায়ে। মাইকেলও অত্যাধুনিক কিছু বাঙালি লেখকেব মতন 'মাল' খাচ্ছেন, ইতবামি করছেন, প্রেমেব নামে মেযেছেলেব সঙ্গে ঢলাঢলি কবছেন, সমকামিতায গা ভাসাচ্ছেন, এই হচ্ছে লেখকের আঁকা চিত্র, ওই 'দেশ' পত্রিকায। আব কোথায়ই বা ছাপা হবে এই সব অমর সাহিত্য? তোবা ছোটো, জানিস না, কিছুদিন আগে এক প্রখ্যাত কবি অনেক কসরত করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—মাইকেলেব কবিপ্রতিভা এক দুর্মব কুসংস্কাব মাত্র। এইবার তাঁব মন্ত্রশিষ্যবা আবো সাহসী পথ ধবেছেন, তাঁবা বলছেন মাইকেল সমকামী বকবাজ মাত্র। আনন্দবাজাবেব কলমবাজ এই সেদিন সুকান্তকে কযেকটি বাক্যে মুছে দিলেন সাহিত্যেব পঙ্ক্তি থেকে। বিদ্যাসাগব আক্রান্ত। সুভাষচন্দ্র আক্রান্ত। কদর্যতম গলির ভাষায়। আমার মনে হচ্ছে আব কদিন সময পেলে দিল্লি ও ওয়াশিংটনেব উচ্ছিষ্টভোজীবা বাঙালির ইতিহাস বস্তুটিব অি: :দেবেন ঘুচিয়ে, বাঙালিরা সবাই টেস্ট টিউব বেবি এই তত্ত্বে এসে দাঁড়াবেন তাঁবা। জাতিব শিকড়টাই তাঁরা উপড়ে নেবেন।'

আমি এবং মধু দুজনেই এসব সংবাদে উত্তেজনা প্রকাশ কবতে লাগলাম। 'এসব হচ্ছে কী?' 'খুব জোর প্রতিবাদ করতে হবে'—এসব বলছি, আর জপেনদা উঠলেন গর্জে, 'শুধু মার্কিন দালালদেব গাল দিয়ে কী হবে? তোদেব মধ্যেও তো ঢুকে পডেছে কালাপাহাড, ধ্বসিয়ে দিচ্ছে সব ঐতিহ্য আর অতীত। 'দেশ' পত্রিকাব সঙ্গে ঐকতান বজায বেখে চলেছেন তিনি। 'দেশ' প্রভৃতি গোষ্ঠী ভিখাবি বাঘবেব সেনা, আর সেই ঈর্ষান্ধ ব্যক্তিটি বিভীষণ। রাঘবের দাস আমি। তাই ভেতর থেকে তোদেব ধ্বসিয়ে দিচ্ছেন।'

আমরা সোবগোল তুললাম—'কে সে? কোথায় লুকিযে আছে?'

'লুকোবে কেন? 'গণনাট্য' পত্রিকায ছাপাব অক্ষবে তিনি গিবিশচন্দ্রের বিচাবে বসলেন, রায় দিলেন—গিরিশ মাতাল আব বিনোদিনী তাঁব বক্ষিতা মাত্র। 'দেশ' ইত্যাদির কলমবাজবা মাইকেল-বঙ্কিমকে যে ভাষায খিস্তি করছে, শ্রীবিভীষণ সেই ভাষায় নিজেব স্বাভাবিক স্থূলতা ও অশালীনতা মিশিয়ে গিরিশকে একহাত নিলেন। ওঁরা বাংলা সাহিত্যের মূলোচ্ছেদ কবছেন,

ইনি বাংলা নাটকেব। একে বলে জব ডিভিশন। একই কার্যসূচির দুই দিক। একই ষড়যন্ত্রের দুই অংশীদার। দুদিক থেকে জাতির সাংস্কৃতিক শিকড় টেনে ছেঁড়ো।'

'আমাব মনে হয় শ্রীবিভীষণ গিরিশ সম্পর্কে আলোচনা কবতে গিয়ে ভাবসাম্য হারিয়ে—' বলছিল মধু।

'আলোচনা!' চেঁচালেন জপেনদা, তাঁব সিগারেটটা ছিটকে এসে পড়ল মধুব গায়ে। 'গিরিশ নাট্য সম্পর্কে একটা কথা নেই, 'বলিদান' নাটক সম্পর্কে কথা নেই, 'প্রফুল্ল' সম্পর্কে নেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কেন গিবিশের পব পর তিনটি নাটক বেআইনি কবে দিল সে বিষয়ে গেলেন না ঘবসন্ধানী বিভীষণ, শুধু মদ্যপান সম্পর্কে একটা গেঁযো মন্তব্য কবলেই আলোচনা হল? বিনোদিনী সম্পর্কে ওভাবে যে উনিশ শতকেব বাবুব মতন উক্তি কবতে পারে তাকে কী বলা হবে? গিবিশচন্দ্র সম্পর্কে দীর্ঘ ও দাযিত্বপূর্ণ আলোচনাব অবকাশ আছে। দেশপ্রেমিক নাটকেব পাশেই তাঁর ব্রিটিশতোষণেব পবিচয আছে। সামাজিক কুসংস্কারেব বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বক্তব্য উপস্থিত কবেই পৌবাণিক নাটকে আশ্রয়গ্রহণেব নজিব আছে। ইতি আছে, নেতি আছে। অগ্রসবতা আছে, পশ্চাৎমুখীনতা আছে। এই জটিল বিশ্লেষণেব জন্য নিষ্ঠা লাগে, লাগে তথ্যানুসন্ধান। এক কথায় উডিযে দিলেই বোঝা যায শ্রীবিভীষণেব উদ্দেশ্য অন্য। 'দেশ'পত্রিকায মাইকেল যেমন নিছক মাস্তানে পবিণত, বিভীষণেব কলমে গিবিশ তেমনি লম্পট। উদ্দেশ্য দুজনেব এক। অতীতকে ধূলিসাৎ কবা, জাতিকে নিরস্ত্র কবা, শিকডহীন কবা।'

আমবা কী আব বলব? যুক্তিব তোডে মনেব মধ্যে যে সব ঢেউ জেগেছিল সেগুলিকে গুনতে লাগলাম।

হঠাৎ গলাটা অস্বাভাবিক মোটা কবে জপেনদা বললেন, 'আলোচ্য ব্যক্তি যে বাংলা নাটকেব অতীতকে কলঙ্কিত কবার বিশেষ দাযিত্ব নিযেছেন এ-বিষযে কোনো সন্দেহ থাকে না, যখন দেখি তিনি 'নবান্ন' নাটককে অনববত খিস্তি কবে চলেছেন। 'নবান্ন' নাটক তৃতীয় শ্রেণীর, সর্বত্র অভিনয়ও কবা যেত না, অভিনয হয়ও নি বেশি, প্রভৃতি চটুল মন্তব্যে তাঁব সব লেখা ভবপুব। অর্থাৎ গণনাট্য আন্দোলনেব গৌববময অতীতে যেটা সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রেরণাস্থল, সেটাকে ধ্বসিযে দিচ্ছেন শ্রীবিভীষণ। যাতে তোবা সবাই ঐতিহ্যহীন ভুঁইফোঁড কিছু নাট্যামোদীতে পবিণত হোস। অবশ্য শ্রীবিভীষণের বচনা পাঠ কবা কিছু কষ্টকব। নানা জঞ্জাল হাতডে বক্তব্যে পৌঁছুতে হয়, যথা বিভীষণ কবে ভালো অভিনয় করে মেডেল পেয়েছিলেন, শ্রীবিভীষণ কী কবে হাতে ধরে অমুককে লাইনে আনেন, শ্রীবিভীষণ আসলে কী সম্ভাবনাময় পবিচালক ছিলেন লোকে তা বুঝল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব মহাবিনযের নিদর্শন দুহাতে সরিয়ে যদি বক্তব্যে পৌঁছুতে পাবিস তবে দেখবি গোটা গণনাট্য আন্দোলনকে নাকচ করা হচ্ছে লোকটির স্থিব লক্ষ্য। একমাত্র বিভীষণবাবু ছাড়া সবাই ছিলেন মতলববাজ, সুবিধাবাদী, ব্যর্থ লেখক। শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্য দুজনেই বিভীষণবাবুর মূর্খ ঈর্ষার হিংস্রতায় জর্জরিত হচ্ছেন। নিশ্চয়ই শম্ভুবাবু-বিজনবাবু সম্পর্কে আলোচনা হবে। কিন্তু এ-ব্যক্তির হাতে আলোচনা সদাসর্বদা গাঁয়ের ক্ষান্তপিসিব ভাষা, ভঙ্গি ও বক্তব্যে পর্যবসিত হয—এবং ফাঁকে ফাঁকে 'যখন আমি অভিনযের জন্য মেডেল পেলাম বাগদিপোতা গ্রামে—'। এ-ব্যক্তি চাইছে গণনাট্যের ইতিহাসটাকেই

উঠিয়ে দিতে। এ ব্যক্তি বলতে চাইছে তোরা সব টেস্ট টিউব বেবি। এ-ব্যক্তি 'দেশ' ইত্যাদি গোষ্ঠীর যোগ্য অনুচর, সুযোগ্য অনুগামী।'

এবাব জপেনদা হাঁটা দিলেন, জানেন যে-চার ফেলেছেন পেছনে দুই কাতলা ঠিক ছুটবে। পেছন থেকে শার্টের খুঁট টেনে বলি, 'কথাটা শেষ না করে চললেন কোথায়?'

জপেনদা হাঁটতে হাঁটতেই বলতে থাকলেন, 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে চাই ব্যাপকতম সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। শত্রুশিবিরের মুষ্টিমেয় প্রচাবক ছাড়া সবাইকে আনতে হবে এই ফ্রন্টে। গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসি খুঁজে বেড়ালে তো তোদের চলবে না। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রাম এটা, শ্রীবিভীষণেব ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবাব জায়গা নয়। ধর, শ্রী শম্ভু মিত্র। যাই তিনি করে থাকুন না কেন, জাতিব ঐতিহ্যের প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা কী ছিল? তিনি কি প্রবল শক্তিতে রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে তুলে ধরেননি? তিনি কি জাতিকে রবীন্দ্রনাট্যের বিস্মৃত উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেননি? বিজন ভট্টাচার্য মহাশয় কি সারা জীবন গ্রাম বাংলাব রূপ ও রসে তাঁব পালাগুলো সমৃদ্ধ করেননি? কাউকে তো দেখলাম না তাঁর নাটকের দেশজতার কয়েক মাইলেব মধ্যে যেতে। এখন জাতির আত্মবিকাশের লড়াই, এ লড়াইয়ে শম্ভু-বিজন থাকবেন না তো কি বাক্যবীরেরা থাকবেন? একটাই এখন মাপকাঠি—কে জাতির ঐতিহ্যেব জন্য সংগ্রাম করবে? কে অতীতকে কলঙ্কলেপন থেকে বাঁচাবে? এই মাপকাঠিতে তোরা অগ্রণী, কারণ তোরা জাতি ছাড়াও প্রত্যক্ষ বিপ্লবের কথা বলিস। কিন্তু তোদের পেছনে জড়ো হবেন যাঁরাই জাতির সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্বিত। অর্থাৎ দেশেব শতকবা নব্বইজন সাহিত্যিক ও শিল্পী—যদি সঠিকভাবে প্রশ্নটা বাখতে পারিস। অপসংস্কৃতির প্রশ্নের পিছনে যে জাতিনির্যাতনের বৃহৎ প্রশ্ন রয়েছে সেটাকে সামনে আনতে পাবলে দেখবি মুহূর্তের মধ্যে তোদেব ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। বৃহত্তর প্রশ্নটা চেপে দিলে বোম্বাইয়া ছবি আর ক্যাবাবে নাট্যেব প্রসঙ্গটা অসংলগ্ন থেকে যায়। বহু মানুষই বুঝতে পারছেন না এটা ভারতের মহান জাতিগুলির অস্তিত্বের প্রশ্ন। ভাবছেন, কিছু লোক তো চিরদিনই নগ্ন নাবীর ফোটো বেচে খায়, এও তেমনি একটা সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতা। আমাদের কৃষ্টি এত গভীর ও দৃঢ় যে আঁচড়ও পড়বে না। মহাপ্রমাদ! কৃষ্টি বায়ুনির্ভব নয়, উৎপাদননির্ভর, উৎপাদনী-সম্পর্ক নির্ভর। জাতিকে অর্থনৈতিক শোষণে যদি বধ করা যায়, তবে তাকে মানসিক দিক থেকেও পঙ্গু করা যায়। জাতিকে আগে তাব ঐতিহ্য থেকে বিয়োজিত করতে পারলে নগ্ন নারীই একদিন হয়ে উঠতে পারে বাংলা সংস্কৃতিব অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা। এটা বোঝা সবাইকে, আশাব কথা শোনা, গেল-গেল রব তুলিস নে, বৃহত্তর সম্পর্কটা তুলে ধব, দেখবি জাগ্রত জাতি ঝাঁটা হাতে জঞ্জাল সাফ করাব জন্য তোদের পাশে পৌঁছে গেছে। ভাষা ও কৃষ্টির শিকড়টা দৃঢ় কর বে, আগায় জল দিসনে।'

জপেনদা চলন্ত ট্রামে উঠে চলে গেলেন দক্ষিণে।

কবরখানা

ছেঁড়া মাদুরে শায়িত জপেনদা দশ স্তূপ বই-এর আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে ছিলেন। তেমনি সটান শুয়ে থেকে শুধোলেন, 'থিয়েটাব কি ইয়ার্কির জায়গা?'

আমি এবং মধু আকাশ থেকে পডলাম। মাত্র আগের দিন সন্ধেয় আমরা ব্রেখ্‌ট্‌-এর বিপ্লবী নাটক 'আর্টুবো উই'-এর বাংলা অনুবাদেব এক দুঃসাহসিক প্রযোজনা করে বিদ্বজ্জনেব প্রশংসা কুড়িয়েছি। আমাব বগলে রয়েছে আজকের স্টেট্‌স্‌ম্যানখানা, তাতে নাট্যসমালোচকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ বর্ষিত হয়েছে। জপেনচন্দ্রও নাটক দেখতে গিয়েছিলেন এবং মঞ্চ থেকে তাঁর 'বেড়ে'! 'শোভান্তরি।' 'মৃত্তিকে রে বাবা মৃত্তিকে।' প্রভৃতি মন্তব্যও আমরা শুনেছিলাম। কাজে কাজেই না আজ মধু এবং আমি তাঁর বিস্তারিত প্রশংসা শুনতে গুটি গুটি উপস্থিত। আর সেক্ষেত্রে প্রথমেই তাঁর বক্রোক্তি চপেটাঘাতেব মতন গণ্ডদেশে এসে লাগতে দুজনেই আমবা বিহ্বল হয়ে পডলাম।

'জবাব দিচ্ছিস না যে?' বললেন জপেনদা, তেমনি শুয়ে শুয়ে কডিকাঠ দেখতে দেখতে। 'থিয়েটারটা কি রোযাক পেয়েছ?'

মধু কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ব্রেখ্‌ট্‌ কি ইয়ার্কি?'

জপেনদাব হাড্ডিসার বুক ঃ াবেগে ওঠানামা করতে লাগল। 'ব্রেখ্‌ট্‌ ইয়ার্কি হতে যাবেন কেন? জিগ্যেস কবছি তোদের কথা—এ-শহরেব বিটল ইন্টেলেকচুয়াল মূর্খদের কথা। ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাটক বলেই কাল কিছু কিছু কেয়াবাত ধ্বনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ইচ্ছে করছিল স্টেজে উঠে তোদের একেকটাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিই।'

আমরা সংকুচিত হয়ে মাদুবে বসলাম। মধু একবার আলগোছে জপেনদাব পা টিপতেও শুরু করেছিল, কঙ্কালের দীর্ঘ পদাঘাতে নিরস্ত হল।

কিযৎকাল পরে নকল দাঁতের খট-খট শব্দ কবে জপেনদা বললেন, 'ব্রেখ্‌ট্‌ নাটক লিখতেন কেন?'

'মানুষকে রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করতে, এ সমাজকে বদলাবার প্রযোজনীয়তা বোঝাতে,' আমি বললাম।

'তোরাও সেইজন্যই নাটকটা করলি তো?'

'অবশ্য।'

'তাহলে বলি . . তোদের বাঙালি দর্শক এক অক্ষর বুঝতে পারেনি, সমাজও চেনেনি, রাজনীতিও বোঝেনি। বরং আগে যাও বা বুঝত, তোদের অভিনব নাট্য-পরীক্ষার চডকিপাকে পড়ে তাও গুলিয়ে ফেলেছে।'

ধড়মড় করে জপেনদা উঠে বসতে আমরা চমকে পিছিয়ে গেছি। আঙুল তুলে জপেনদা বললেন, 'কোনো কোনো নিবেট অশিক্ষিত বুদ্ধিবাজ বলে থাকে, ব্রেখ্‌ট্‌ করছি এদেশের

মানুষেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটাবার জন্য। চেকভ, শ, শেক্‌স্‌পিয়ার, সবার সঙ্গে এদেশেব মানুষের পরিচয় ঘটাতে তারা ব্যস্ত। এদেশের মানুষ মানে এদেশের বুদ্ধিজীবী, যাঁরা ব্রেখ্‌ট্‌, শ, চেকভ, শেক্‌স্‌পিয়ারকে খুব ভালোভাবে চেনেন কেতাব-মারফৎ। অন্তত থিয়েটারেব মালদের চেয়ে অনেক ভালো চেনেন। ওসব পেঁয়াজিতে ভবি ভোলে না। ব্রেখ্‌ট্‌-এর উদ্দেশ্য আর তোদের উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তবেই ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাটক করা যায, নচেৎ কখনো নয। ব্রেখ্‌ট্‌ বিপ্লব প্রচার করেছেন। তাঁর বাংলা প্রযোজনার একটি এবং কেবলমাত্র একটিই রেজোঁ দেত্রে থাকতে পারে—ওঃ, বেনাবনে ফরাসি মুক্তো কেন যে ছড়াচ্ছি?—ব্রেখ্‌ট্‌ বঙ্গানুবাদের একটিই কারণ, অস্তিত্বের একটিই যুক্তি থাকতে পাবে—বাংলা ভাষােও বিপ্লব প্রচারিত হবে। এবং বিপ্লব প্রচারেব একটি মাত্র ক্ষেত্র আছে, সেটি মজদুর-কিষান-মধ্যবিত্ত জনসমষ্টি। অর্থাৎ বিপ্লবটা এমনভাবে প্রচারিত হবে যেন মজুর-কৃষক-কর্মচারীব বোধগম্য হয। বিপ্লব প্রচার করছি অথচ এমন ঢঙে করছি যাতে বিপ্লবী শ্রেণীবা বুঝতে না পাবে, এব চেয়ে হাস্যকব গর্দভসুলভ মিথ্যাচাব আর কী হতে পারে আমি জানি না।'

মধুব এবার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। ধবা গলায় বলল, 'না, আমরা তো বিপ্লব প্রচারেব উদ্দেশ্যেই—মানে—হিটলারের অভ্যুত্থান সম্পর্কে নাটক দেখে যাতে মানুষ ফ্যাশিবাদের চরিত্র বুঝে নিতে পাবে, ভারতেব জরুরি অবস্থা ও ইন্দিবাশাহীব গোড়ার কথাগুলো সম্বন্ধে সজাগ হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই—'

জপেনদা দাঁত খিঁচোতে মধু থামল। 'তা সেটা 'আর্টুরো উই' নাটক দেখে এদেশেব রাম-শ্যাম-যদু-মধু কী কবে বুঝবে? 'উই' তো রূপক নাটক। বাইরে তো সেটা শিকাগোর মার্কিন-ইটালিয়ান দস্যুদেব কীর্তি-কাহিনী।'

'কিন্তু ভেতরের গল্পটা—'

'ভেতরের গল্প! ভেতরের গল্পেব কোনো ঘটনাই যে দর্শক জানে না সে কী মাথামুণ্ডু বুঝবে? বাইরের গল্পে ডগ্‌স্‌বরোর আত্মসমর্পণ দেখে তারা বুঝে ফেলবে এটা হচ্ছে হিটলারের ব্ল্যাকমেইল এবং হিণ্ডেনবুর্গের আত্মসমর্পণ? এদেশের মানুষ কি হিণ্ডেনবুর্গের কুষ্ঠি-ঠিকুজি জেনে বসে আছে? সিসেবো শহরকে নিজেদেব কবাযত্ত কবছে শিকাগোব দস্যুরা, এটা দেখে দর্শকরা হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল বুঝে নেবে? ডালফীটেব করুণ অবস্থা দেখে অস্ট্রিয়ান বাষ্ট্রপতি ডলফুসের পরিণতি বুঝে নেবে সবাই? ডলফুসের নাম শুনেছে কজন? দস্যুদেব দলপতি উই নিজের বিশ্বস্ত-সহকারী রোমাকে হত্যা করাচ্ছে; এ থেকে বাংলার দর্শক কী করে বুঝবে যে হিটলার তাঁর ঝটিকা বাহিনীর নেতা রোমকে হত্যা করেছিলেন? রোম নামে ইতিহাসে কেউ যে ছিল সেটা এদেশে জানে কজন? উই-বা গুদাম পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে; সুতরাং হিটলারদের রাইখ্‌স্টাগ পোড়াবার ঘটনা বাংলার দর্শকের মনে পড়বে, এটা কোন গাধা বলেছে তোদের? বাইরের মাফিয়ার কাহিনীটা বুঝতেই যেখানে বাঙালি দর্শক গলদঘর্ম হয়ে যাবে, সেখানে পদে পদে জর্মন ইতিহাসেব লুকোনো ইঙ্গিতগুলো তার চোখে স্পষ্ট হবে কোন অলৌকিক যোগাযোগে? তার ওপর তোদের বিচিত্র দাবি—মাফিয়া এবং জর্মনির ইতিহাস ভেদ করে দর্শককে পৌঁছুতে হবে ভারতেব জরুরি অবস্থার বিচারে। আক্কেলগুলো কোন

ব্যাংকে জমা বেখেছিস বল্ তো? ত্রিবিধ রূপকের এই গোলক ধাঁধাঁয় মানুষ তো খাবি খাবে!'

আমরা কাতরভাবে উত্তবের জন্য শূন্যে হাতড়াচ্ছি দেখে জপেনদা আরো খোলসা করে বললেন, 'ধর কোনো ভারতীয় নাট্যকার একটি রূপক নাটকে দেখালেন এক অর্ধোলঙ্গ সন্ন্যাসীকে একদল খদ্দরের টুপি পরা মাস্তান হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে, কারণ সন্ন্যাসীটা প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে। শহরটাকে দুই মাস্তানদেব দল দু ভাগ কবে শান্তিতে যে যার বদমাইশি কবতে চাইছে, কিন্তু উলঙ্গ সাধুটা বাদ সাধছে। শেষকালে দেখা গেল এক মাস্তান নেতাদের নির্দেশে গুলি ঝেড়ে দিল, সন্ন্যাসী 'হায রাম' বলে ইহলীলা সম্ববণ করলেন। এটা বুঝতে ভাবতীয় দর্শকের কোনো অসুবিধে নেই, কারণ যে-বাজনৈতিক ঘটনার কথা এখানে প্রচ্ছন্নভাবে আসছে সেটা সবার জানা। সবাই বুঝবে সন্ন্যাসী হচ্ছেন গান্ধী, দুই মাস্তানের দল হচ্ছে যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, যে-শহর তারা ভাগাভাগি করে ভোগ করতে চাইছে, সেটা আসলে ভারতবর্ষেব প্রতীক। কিন্তু এ-নাটকটা যদি কেউ জর্মন ভাষায় অনুবাদ করে বার্লিনে অভিনয় করে তবে জর্মন দর্শক কী বুঝবে? তারা তো একটা নিছক রূপকথাই দেখবে। তাই তারা ও-নাটক বার্লিনে অভিনয় কববে না কস্মিনকালে, কাবণ তারা নিজেদেব দর্শককে শ্রদ্ধা করে, নিজ দর্শকের সেবায় তারা মগ্ন। কিন্তু এই পোড়া দেশে সবই সম্ভব! ভারতেব ফ্যাশিবাদ বোঝাবাব জন্য এখানে জর্মন রূপক অভিনীত হয়। জর্মন ইতিহাসেব সবচেয়ে জটিল দুরূহ দুর্বোধ্য খুঁটিনাটিতে ভবা নাটক দেখতে হবে বাংলাব দর্শককে, ইন্দিবার ভাবগতিক বোঝবার জন্য। আসলে ওই সব একান্ত জর্মন ঘটনা দিয়ে তোবা বাংলার দর্শকের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত গুলিয়ে দিচ্ছিস, তাব দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছিস, তাকে বেকুব বানাচ্ছিস। আসলে তোরা ব্রেখ্টেব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অন্তব থেকে মেনে নিসনি, প্রচারটা তোদের উদ্দেশ্যই নয। তোরা ব্রেখ্ট্ অভিনয করছিস ইন্টেলেকচুয়াল সাজবাব জন্য, পশ্চাদ্দেশে 'বিদগ্ধ' লেবেল এঁটে জাতে উঠবার জন্য। ব্রেখ্ট্ সারা জীবন তোদেব মতন খেতাবের কাঙালদের বলতেন কফ্‌লোস হুন্ড, মুণ্ডহীন কুকুর, উচ্চশিক্ষিত মহলের কুকুর হতে চাস, কিন্তু তোদের মাথা নেই বলে ওরা আমল দিচ্ছে না, কুকুর বলেই মানছে না।

সক্কালবেলায় কুকুর গালাগাল শুনে মেজাজটাই গেল খিঁচড়ে। যথাসম্ভব তিক্তস্ববে বললাম, 'তা বিদেশি নাটক অভিনয় করার দবকার নেই? আন্তর্জাতিক দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্ধকূপে বসে থাকব?'

জপেনদা কিয়ৎকাল আনমনা তাকিয়ে রইলেন। আমি ভেবেছি কথা তাঁব কানে যায়নি এবং আরেকটু উঁচু পর্দায় আবার বলতে গেছি, এমন সময়ে শান্তকণ্ঠে জপেনদা বললেন, 'মাঝে মাঝে ভাবি তুই কি সত্যিই অমন নিরেট ইডিয়ট, না নির্বুদ্ধিতার ভান-করা সি-আই-এ এজেন্ট?'

'কেন—কেন এমন বলছেন?' আমাব সরোষ প্রশ্ন।

'কেননা কথা হচ্ছিল প্রত্যক্ষ প্রচাবনাট্য সম্পর্কে, ব্রেখ্টের রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে—' জপেনদার বিনয়ী উত্তর—'আর আপনি অতি শেয়ানা কইমাছের মতন পিছলে অন্য বিষয়ে চলে গেলেন, ইয়োরোপীয় ক্ল্যাসিক সাহিত্যের প্রশ্নে চলে গেলেন। মহাশয়, আমি এটা জানি শেক্সপিয়ার, মলিয়ের, গ্যোয়টে, ইবসেন, গোর্কি, চেকভ, শ—সব আমাদের। সে-ব্যাপারে

মহাশয়ের দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাজনৈতিক নাটকের উদ্দেশ্য কিনা রাজনীতি আরো ব্যাখ্যা করা, প্রাঞ্জল করা, খোলসা করা। সেস্থানে মহাশয়রা এমন নাটক করলেন যেখানে বাজনীতি আরো জটিল হল, ধাঁধাঁ হল, হিং-টিং-ছট্ হল, এরকম পশ্চিম জর্মন সমরবাদী সরকারের দালালি আর কতদিন চালাবেন, প্রভুপাদ? মাক্স্‌মুলাব ভবনের আর কত টাকা পকেটে পুরবেন, তপোধন?'

মোলায়েম খিস্তির জ্বালা সামলাচ্ছি, এমন সময়ে আরো বিগলিত স্বরে জপেনদা বললেন, 'ব্রেখ্‌ট্‌কে যদি সত্যিই বাংলায় আনতে চান জনাবে আলি, যদি তেমন হিম্মৎ সত্যিই ধরেন জনাব-এ-ফজল, তবে 'আর্টুরো উই'কে দৃষ্টান্ত ধরে ইন্দিরাবাই নামক মেয়ে-ডাকাতের আধুনিক একটি চম্বল-কাহিনী ফাঁদুন না হুজুব-ই-ওয়ালা। অথবা স্বমূত্রপায়ী এক বিচিত্র গেছো ডাকাতের সর্বাধুনিক রূপক করুন না, যার প্রতিপক্ষ ওই কাঠেব-ঘোড়ায়-চড়া ইন্দিবাবাই এবং মাথায় রুমাল বাঁধা স্ববিঘোষিত হনুমান। ডাকাতদলের খেয়োখেয়ি, লুঠ ভাগেব দরাদবি, আর ঘন ঘন প্রাণনাশের প্রয়াস—এসবেব জন্য শিকাগোয যাবার আর কী দবকার, মেহেববান? নাসাগ্র থেকে দৃষ্টিটা একটু তুললেই সব চোখে পডবে ঘরের কাছে। হিটলাবেব গল্প বাঙালি দর্শকেব কাছে আনতে গেলে অনেক সহজ, অনেক টীকাভাষ্য-সম্বলিত, অনেক সুগম গল্প ধবতে হবে, এটা কি বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে, রহমান?'

চারমিনার ধরিয়ে সামনের এক স্তূপ বইয়ে মাথা ঠেকালেন জপেনদা সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে। 'সর্বত্র এক'—বললেন তিনি ভক্তি-গদগদ আকুল কণ্ঠে—'সর্বত্র আপনাদের গেরুয়া বসন আর ন্যাড়া মাথা দেখছি, অবধূত! আপনারা ছেয়ে ফেলছেন থিয়েটার, চলচ্চিত্র, সাহিত্য—সব। যাত্রায পর্যন্ত উপস্থিত হযেছিলেন এমনি এক মহাপাদ, ব্রেখ্‌ট্ করে বিপ্লব আনবেন বলে। লোকে বোঝেনি—ছোটোলোক কিনা! ভালো ছবি দেখতে যাই, দেখি আপনাদেব লীলা সেথায়ও। কিছু বুঝতে পারি না। বিপ্লবী ছবি হচ্ছে এমন আধুনিক ঢঙে যে এদেশেব বিপ্লবী শ্রেণীরা সেগুলো দেখছে না। ত্রুফো, গদাব-এর বাক্যচ্ছটায় ভুলি—আমার ক্যামেরা একটি বাইফেল—ছুটে যাই তাঁদের কীর্তি দেখতে, বুঝি যে সুউচ্চ প্রতিভাবা ছাড়া কেউ তাঁদের ছবি বুঝতে পারবে না। ফিলিম সোসাইটির আলোচনা শুনি—সেই আন্তোনিওনি, সেই ত্রুফো, সেই বের্গমান, সেই গদাব, সেই ভিসকন্তি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, ভুলেও কোনো স্বামীজী সোভিয়েত চলচ্চিত্রেব উল্লেখ করেন না, করেন না বন্দারচুকেব আলোচনা, কারণ রুশ ইতরেরা ছবি করে ইতরদের জন্য। মার্কিন চলচ্চিত্রেব কোনো সুখ্যাতি কবা সেখানে বেআইনি, স্ট্যানলি ক্রেমার অচ্ছুৎ, কপোলা অন্ত্যজ, শ্লেসিংগাব ব্রাত্য, কারণ তাবা এমন নীচাশয় যে ছবি করে জনসাধাবণের জন্য। ফিলিম সোসাইটি নামক মঠে ফ্রান্স এবং ইটালির বাইরে কোনো জগৎ নেই, একমাত্র ফ্যাশিস্ত বের্গমান বাদে। বুলগাবীয ছবি 'রাষ্ট্ররক্ষা আইনের সংশোধনী' বোমার মতন ফাটে কলকাতার উৎসবে, কোনো ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি নয়ন মেলেন না, কোনো সমালোচক এক লাইন লেখেন না। তাঁদের কারা যেন বলে দিয়েছে, পূর্ব ইযোবোপ নামে ভৌগোলিক ভূখণ্ড থাকতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রের বিচাবে ওসব মরুভূমি। 'জেড' এবং 'অবরোধ' ছবি তুফান তোলে ইতরদের হৃদয়ে। ততোধিক তোলে '[illegible]রেশন ডেব্রেক',

ছোটোলোক দর্শকেরা হাততালিতে ফেটে পড়ে, নাৎসি সেনাব ওপব গেরিলারা গুলি চালালে স্লোগানে মুখর হয়—ঠিক সেই কাবণেই সিদ্ধ পুরুষরা নির্বিকার থাকেন, ছোটোলোকের চেঁচামেচিতে সায় দিলে তাঁবা ধর্মচ্যুত হবেন। এবং ফেব তাঁবা নিজ নিজ নাভিমূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সবচেয়ে দুর্বোধ্য, সবচেয়ে ক্লান্তিকব, সবচেয়ে শ্রেণীবিচ্ছিন্ন কিছু ছবিব চিন্তায় মগ্ন হন। দুর্বোধ্যতার অনুশীলন চলছে। চেষ্টিত জটিলতাকে আর্ট বলে চালাচ্ছে। অন্তঃসারশূন্য কসরৎকে শাশ্বত শিল্প বলে প্রচার করছে' কলকাতাব বুদ্ধিগর্বী চিত্রপ্রাঙ্গণে শূদ্রেব প্রবেশাধিকাব নেই, ব্রাহ্মণের বর্ণদম্ভে সে প্রকম্পিত।

'সাহিত্যের আলোচনায় আব যাচ্ছি না। কবিতা একদা ছিল একান্তভাবে জনতাব নিজস্ব। হাটে বাজারে কবিয়াল গিয়ে গেয়ে শোনাত যে-কবিতা, সে আজ বুদ্ধিজীবীর পাঠাগারে বন্দী, কতিপয় ইন্টেলেকচুয়ালের পাঠ্য, ধোঁয়াটে নানা বিলাপেব অবোধ্য প্রকাশের রক্তশূন্য মাধ্যম। কিন্তু চমকে উঠেছিলাম নাট্যশালায় বন্ধ্যা বুদ্ধিবাজিব হস্তক্ষেপে। নাটকের কোনো অর্থ নেই, অর্থহীনতাই হচ্ছে নাটক—এই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া স্লোগান নিয়ে নাট্যশালায় চড়াও হয়েছিলেন অনেকে, ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম ইয়োরোপের এবসার্ড থিয়েটাবেব উচ্ছিষ্ট নিয়ে। আরো কত সংজ্ঞা শুনেছিলাম এককালে—লিভিং থিয়েটার, থার্ড থিয়েটাব, ফিজিকাল থিয়েটাব, মাস থিয়েটাব অ্যান্ড থেরাপি। তাবারা কেন শোনে না, ইন্দ্রজিৎ যে কে, ঈশ্বববাবু কেন এলেন না, প্যান্টাফটাস মানে কী—এইসব সুগভীব দার্শনিক জিজ্ঞাসা উত্থাপিত হচ্ছিল এই সেদিন পর্যন্ত বাংলা বঙ্গমঞ্চের একাংশে এবং ইতবজনেবা থিয়েটাব ছেড়ে দলে দলে ধাবিত হচ্ছিল রঙিন হিন্দি ছবি দেখতে, কেননা গাঁটেব পয়সা গচ্চা দিয়ে কেউ শিবঃপীড়া বাধাতে চায় না। কারুব এত সময় নেই যে তৃতীয় শ্রেণীব বিকাবগ্রস্ত মার্কিন নাটক 'উই গট বিদ্‌ম্' থেকে চুরি-করা বাংলা বিলাপ শুনবে, মানুষেব বিচ্ছিন্নতা ও হতাশাব তিন-ঘণ্টা ব্যাপী চটকানো বাসি খই গিলবে। শুনছি এইসব নাট্যবিদদের কেউ কেউ ইদানীং মত পালটেছেন, দু-চারটে সংগ্রামী নাটক লিখেছেন। উত্তম কথা। কিন্তু যে ক্ষতি তাঁবা পূর্বে কবেছেন তা সামলাতে নাট্য-আন্দোলনকে আবো বেশ কয়েক বছব হিমসিম খেতে হবে। জনগণকে এঁবা থিয়েটাব থেকে তাড়িয়েছেন, থিয়েটাবকে নিয়ে গেছেন সমাজেব উচ্চস্তবেব যক্ষ্মাগ্রস্ত পবিবেশে। ফলে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে বাববধূব বারস্বামীরা, বাসভবিহাবীবা। যে-বাণিজ্যিক মঞ্চ কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল নাট্য আন্দোলনেব সর্বাত্মক আক্রমণে, তাকে টাল সামলাতে সাহায্য করেছেন এইসব পশ্চিমা অবক্ষয়ের বাঙালি হকাবরা, কংগ্রেসি গুণ্ডা, সিদ্ধার্থ বায় আব ইন্দিবা গান্ধীর আশ্রয়পুষ্ট হয়ে। এঁদেব একজনের নাটকে শুনিসনি বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি শ্লেষ আর উপহাস? দেখিসনি কলকাতাব মিছিল 'কাকাতুয়াব মাথায় ঝুঁটি' স্লোগান দিতে দিতে মঞ্চ পরিক্রমা করছে?

'আমি জিগ্যেস কবি—কে এদের অধিকার দিয়েছে চলচ্চিত্র, কাব্য, নাট্যশালাকে বুদ্ধিবাজ পরগাছাদের পায়ে বিসর্জন দিয়ে আসতে? চেয়াবম্যান মাও-এব কথা স্মরণ কর—কার জন্য শিল্প সাহিত্য, এটাই মূল প্রশ্ন, আর সব গৌণ। উচ্চতম দার্শনিক আইডিয়াকেও পবিবেশন কবতে হবে শ্রমিক-কৃষকেব বোধগম্য করে। আর এঁরা সরলতম বস্তাপচা আইডিয়াগুলোকেও খুব খেটে দুর্বোধ্য করে তোলেন, পাছে শ্রমিক-কৃষক বুঝে ফেলে। বিশেষ কবে নাট্যশালায়

এই আক্রমণ পবিচালিত হচ্ছে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র থেকে, ড্রাগখাওয়া বিকাবগ্রস্ত যৌনবীব কিছু বুর্জোযা বুদ্ধিবাজেব নেতৃত্বে—আব এদেশেব কিছু স্বল্পবুদ্ধি শাদা-চামড়া-ভজা দালাল তাব অক্ষম পুনরাবৃত্তি কবে মৌলিকতার দাবি জানাচ্ছে।'

'আধুনিক নাট্যশালার পরীক্ষা-নিবীক্ষা মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে শুরু?' আমি বলি, বিশেষ সন্দেহেব সুরে।

'পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাকে বলে না!' দাঁত খিঁচোলেন জপেনদা। 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবে সিরিয়াস নাট্যকর্মী। যাবা থিযেটাবকে ভাবে অবাধ যৌনসংগম এবং এল-এস-ডিব আখড়া, তারা পবীক্ষা-টবিক্ষা কবে না। তাবা চেষ্টা করছে মার্কিন যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙতে, কামানেব খোবাক সৃষ্টি কবতে, পরের ভিযেৎনামেব ফৌজ তৈবি কবতে। এ সবেব শুরু ১৯৫৯ সালে গ্রীনিচ ভিলেজে এলেন কাপ্রোব তথাকথিত হ্যাপেনিং থেকে। হ্যাপেনিং—মানে আকস্মিক একটা ঘটনা, নাটক-ফাটক নয়। দর্শকদের বলা হল, ঘণ্টা বাজলেই সবাই উঠে দাঁড়াবেন, সব কাপড-জামা খুলে ফেলবেন, উলঙ্গ হয়ে নাচবেন, তারপব পাশেব ঘবে যাবেন। নানা ড্রাগেব অলৌকিক নেশায আচ্ছন্ন দর্শকবা তাই কবলেন। পাশেব ঘবে গিয়ে দেখলেন পর্দায় একটি নগ্ন নাবীর চলচ্চিত্র আব কক্ষেব মধ্যস্থলে সেই নারীই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় নৃত্য কবছে। আব কাপ্রো এবং তাঁব পাঁচ সহ-অভিনেতা কক্ষের নানাস্থানে কেউ ছবি আঁকছেন, কেউ গিটাব বাজাচ্ছেন, কেউ উচ্চৈঃস্বরে গ্রন্থ পাঠ কবছেন, কেউ বা হাত-পা ছুঁড়ছেন—সবাই একসঙ্গে। উলঙ্গ দর্শকবৃন্দেব কোনো উপায় নেই কোনো একদিকে মনোনিবেশ করাব। ব্যস, তাবপর হ্যাপেনিং শেষ। সঙ্গে সঙ্গে বণোন্মাদ মার্কিন শাসকগোষ্ঠীব বিশ্বজোড়া উল্লাস—নূতন নাট্যধারা জন্ম নিয়েছে, ব্রেখট্‌বা কোন রসাতলে যে এবাব ডুবে যাবেন তাব ঠিকানা নেই। কাপ্রোব দেখাদেখি অবতীর্ণ হলেন চিত্রকর জিম ডাইন। তিনি মঞ্চে বসে ছবি আঁকতে থাকলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'যা করছি এ আমাব বড পছন্দ।' বলেই রঙেব একটি বাটি তুলে ঢক্ ঢক্ কবে রং খেয়ে ফেললেন, অন্য দুটো বাটিব রং ঢেলে ফেললেন নিজেব মাথায। তারপর যে ক্যানভাসে ছবি আঁকছিলেন, তার ওপব ঝাঁপিয়ে পডে তাকে ভেদ কবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, নেপথ্যেব দিকে—আরেকটি মহান হ্যাপেনিং-এব যবনিকা পডল, এবং দেশ জুড়ে বুদ্ধিজীবীরা বাহবা দিযে উঠলেন।'

'এর নাম থিয়েটাব?' মধুর প্রশ্ন।

'এর নাম অবক্ষয়,' বললেন জপেনদা। 'রোমক সাম্রাজ্য যখন পতনেব মুখে তখন হত এবকম অর্জি, উলঙ্গ নাবী পুরুষেব মদোন্মত্ত বিহাব, আব তাকে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যের ভাডাটে দার্শনিকরা বলতেন, ঈশ্বর-উপাসনা। আজ বিশ্বপুঁজিবাদেব অন্তিমকাল। আবাব সেই অর্জির পথে চলেছে পুঁজিবাদী আর্ট। কাপ্রোর ফরাসি অনুগামী জ্যাঁ-জাক লেবেল নাটক কবলেন এইরকম—দুটি নগ্ন নারী দেওয়ালে ছবি আঁকছে আর লেবেল নিজে মেয়েদুটিব নগ্ন পাছায় ছবি আঁকছেন। টি-ডি-আর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে লেবেল এটাকে বললেন, নূতন নাট্যশালার প্রথম আবির্ভাব। বললেন, আমরা যুক্তি-বিবেচনাব বিরুদ্ধে, মার্ক্‌স্‌বাদী ডায়ালেকটিক্‌স্‌-এর বিরুদ্ধে, পশ্চিম ইয়োরোপের মানবতাবাদী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। বললেন, সব ধ্রুপদী ঐতিহ্য

ভাঙতে হবে কেননা ক্ল্যাসিকাল আর্ট মানেই বুর্জোয়া আর্ট। ইতিহাসের প্রাথমিক জ্ঞানও এই লেবেল-সাহেবের নেই—ক্ল্যাসিকাল আর্টের বেশির ভাগটাই যে দাসসমাজ ও ফিউদাল সমাজে সৃষ্ট, বুর্জোয়ার দ্বারা নয়, এটাও ৺ার জানা নেই। সবশেষে লেবেল সাহেব বললেন, শিল্প হচ্ছে বিষ্ঠা, আর্ট ইজ্ শিট্। শুনতে পাচ্ছিস ফ্যাশিবাদের কণ্ঠ, হিটলার-গোয়েবেল্স্‌দের কালাপাহাড়ি তত্ত্বের প্রতিধ্বনি? আর্ট মাত্রেই আবর্জনা, আর্ট কথাটা শুনলেই পিস্তল টানতে ইচ্ছে করে। মার্ক্স্‌বাদও বিপজ্জনক, পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়া-মানবতাবাদী মহৎ শিল্পসাহিত্যও পোড়াতে হবে! হুবহু রোজেনবের্গ-গোয়েবেল্স্-এর পুনরাবৃত্তি। কাপ্রো-লেবেলরা নয়া নাৎসি, ধ্বসে-যাওয়া পুঁজিবাদের বিকৃতমস্তিষ্ক মাস্তান। পুঁজিবাদের কবরখানা থেকে উঠে আসা কিছু শবদেহ।

'এইসব নগ্নদেহ সংস্কৃতির শত্রুদের মাঝে বোধ করি নিউ ইয়র্কের জুলিয়ান বেক ও জুডিথ মালিনা এসেছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ও ক্ষমতা নিয়ে। তাঁদের লিভিং থিয়েটারে ছিল আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আইডিয়া। তাঁদের 'ফ্রাংকেনস্টাইন' নাটকে ছিল চমকপ্রদ কল্পনাশক্তি ও বক্তব্য, যদিও সহস্র দৈহিক কসরতের ঠেলায় সে-বক্তব্য সাত হাত মাটির তলায় কবরস্থ হয়ে পড়ল। ইন্টেলেকচুয়াল সাজবার রিরংসায় দেখতে দেখতে বেক ও মালিনা তলিয়ে গেলেন হিপি কালচারে। গাঁজা, হশিশ, এল-এস-ডি সেবন করে, অবাধ যৌনসংগমে গা ভাসিয়ে, জারজ সন্তানদের জন্ম দিয়ে লিভিং থিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দ বিচিত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এস্ট্যাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে। আদতে করলেন আত্মহত্যা। মার্কিন শাসকগোষ্ঠীই যে এই রকম আত্মঘাতী বিদ্রোহের উশকানিদাতা, বিদ্রোহীরা ড্রাগ খেয়ে পাগল হলে এস্ট্যাব্লিশমেন্ট যে রক্ষা পায়, এটা পুঁজিবাদী মুলুকের বিষণ্ণ ধনীর দুলালদের কে বোঝাবে? অচিরেই বেক ও মালিনা বলতে শুরু করলেন, নাটকের কথাই হচ্ছে শিল্পের বাধা ; সুতরাং কথা বাদ। তার পরিবর্তে চিৎকার, গোঙানি, বিদঘুটে ঘোঁৎকার, এইসব হবে নাটকের ভাষা। আর অভিনেতারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নানা আকৃতি সৃষ্টি করবেন মঞ্চে, সেটাই হচ্ছে অভিনয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, যোগ, বৌদ্ধধর্মের বাহ্যজ্ঞানলোপ ও ধ্যান, এইসব নাকি লিভিং থিয়েটারের আশ্রয়। যে জন্য একঘেয়েমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লাখোপতি মার্কিন পুঙ্গবরা হরে-কৃষ্ণ-রাম ভজতে এদেশে আসেন—সেই সঙ্গে সাইড বিজনেস হিসেবে কিছু গুপ্তচরবৃত্তি—ঠিক সেই বড়লোকি বিলাসে ডুবলেন বেক ও মালিনা। মার্কিন মহাবিদ্রোহীরা সব একই বাঁশবনের শেয়াল। তাঁরা সকলে অকস্মাৎ হিন্দুধর্মের মধ্যে মহা মহা সব সত্য আবিষ্কার করেন, সকলে হশিশ খেয়ে দিবারাত্র চক্ষু ঢুলুঢুলু করে রাখেন, সকলে যখন যাকে পান তাঁর সঙ্গে রমণে লিপ্ত হন। এবং এইরকম জীবনযাপনকে তাঁরা বলেন, এস্ট্যাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! আসলে এঁরা ওই এস্ট্যাব্লিশমেন্ট নামক শবদেহেরই পচে-যাওয়া নাড়িভুঁড়ি, ওই মৃতদেহের শেষ বিষ্ঠা, তার শেষ বিকৃত চিহ্ন। নিউ লেফ্ট্ নাম নিয়েছেন তাঁরা। লেফ্ট্ কথার এমন অপমান আর হতে পারে না। এবং—স্মরণ রাখবি—এই নিউ লেফ্টের মধ্যে একজনও শ্রমিক নেই, একজনও না। সব বড়োলোকের বখাটে ছেলে এবং মার্কিন বুদ্ধিজীবী। বেক ও মালিনা এই শ্রমিকবিরোধী প্রতিবিপ্লবী যোনিকীটদের মতাদর্শই এনে চাপালেন থিয়েটারে। জুডিথ মালিনা

স্পষ্টই বলেছেন, শ্রমিক-টমিককে আমাদের থিযেটারে দরকার নেই, আমরা চাই শিক্ষিত মানুষকে। 'শিক্ষিত' কথাটা লক্ষ কর্। এডুকেটেড মেন। তারা নাকি লিভিং থিয়েটাবের নাটক দেখে বুঝে ফেলবে সমাজেব গলদ কোথায, এবং সমাজকে বদলে দেবে। চাতুরিটা বোঝ্। বেক ও মালিনা নিজেদের বলেন আনার্কিস্ট, নৈবাজ্যবাদী, এবং সে-নৈবাজ্যবাদ একান্তভাবে শিক্ষিতেব মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। আপামব মার্কিন জনগণের মধ্যে সেসব কথা ছড়িয়ে গেলে সত্যিই বিপ্লব হয়ে যাবে যে। সেটা কি এস্ট্যাব্লিশমেন্টেব সেবাদাসরা সইতে পারেন? অবশ্য বেক ও মালিনাব আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। লিভিং থিয়েটাব এমন শিক্ষিত প্যাঁচপয়জারে মঞ্চ প্রকম্পিত করতে লেগেছিল, যে শ্রমিকবা ও-থিয়েটারের চৌকাঠ মাডাযনি কোনোকালে। ধব্ না লিভিং থিয়েটাব প্রযোজিত 'মিস্ট্রিজ' নাটক। সে-নাটকের প্রোগ্রামে বেক লিখলেন, ভারতীয় যোগীরা আমাদের আদর্শ, কাবণ তাঁরা সমাহিত, সামাজিক বা রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁরা জডান না—they do not engage in social or political struggles। অহো, কি বুদ্ধি! গোড়াতেই গুপ্তকথা ফাঁস। রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়ানোটাই হচ্ছে যত নষ্টেব মূল। সবাই সংগ্রাম ছেড়ে ধ্যানমগ্ন হও, এমনিতে না পারলে গাঁজা খেয়ে হও, তাহলেই এস্ট্যাব্লিশমেন্ট জব্দ হয়ে যাবে। বুর্জোয়াব এরকম প্রত্যক্ষ ও নির্লজ্জ সেবা আব কেউ পেরেছে করতে?

'তারপব নাটক শুরু হল। মানে শুরু হল, এবং হল না। মঞ্চে এক অভিনেতা দাঁডিয়ে আছেন, এবং আধঘণ্টা তিনি নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়েই রইলেন। এই আধঘণ্টার নিবেট নীববতা বোধ করি দর্শকদেরও হিন্দু যোগীর মতন সমাহিত করে ফেলার জন্য। তাবপর হঠাৎ অভিনেতাদেব বিকট চিৎকার, মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহে ছুটোছুটি। আবাব হঠাৎ নীরবতা, এবং হিন্দু সন্ন্যাসীব ন্যায় স্বয়ং জুলিযান বেকের মঞ্চে পদ্মাসনে উপবেশন। বেক এবার তাঁর বাজনৈতিক কর্তব্যটা দ্রুত সেরে ফেললেন, পব পর দ্রুত বলে গেলেন, ভালো কবে বাঁচো, যুদ্ধ বন্ধ কর, আণবিক বোমা নিষিদ্ধ কব, কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্ত কর, নিজেকে বদলাও, এখুনি স্বাধীনতা চাই। ব্যস, মহান থট্স্ অফ্ বেক খতম, বাজনৈতিক দাযিত্ব সম্যক পালিত। অতঃপব অভিনেতারা পবস্পবকে জডাতে শুরু কবলেন, মাঝে মাঝে সুউচ্চ ওঁ ধ্বনিতে ফেটে পড়লেন, যোগব্যাযাম প্রদর্শন কবলেন। অতঃপর দর্শকের পিলে চমকে দিযে এক অভিনেতা আর্ত চিৎকার করে উঠলেন এবং ধপাস কবে পড়ে গেলেন। তখন ধপাধপ অন্যেরাও মবে গেলেন। মঞ্চ ভর্তি সব লাশ। জুলিয়ান বেকের দার্শনিক চিন্তা এক স্টেজ মৃতদেহে পর্যবসিত হল। নাটক শেষ। থিয়েটাব এক কবরখানা। পুঁজিবাদের কবরখানা থেকে এ থিয়েটাবের জন্ম।

'এই মনোভাব নিয়ে এঁরা ব্রেখ্ট্-এর ওপর চডাও হয়েছিলেন। সফোক্লিসের 'আন্তিগোনের' একটি ভাষ্য তৈরি করেছিলেন ব্রেখ্ট্। লিভিং থিয়েটার সেটি নিয়ে, কথা সব ছাঁটাই করে, দৈনন্দিনের শার্ট ও জীনের প্যান্ট পরে চেঁচামেচি ও জড়াজড়ি কবে গ্রীক ট্র্যাজেডি পবিস্ফুট করলেন। কলকাতাতেও দেখছি গুরু কুর্তা আর পেন্টুলন পবে রোমান পরিবেশ সৃষ্টির মূর্খ প্রয়াস। নকল করতে হলে বেক আর মালিনা ধরা কেন? সত্যিকারের ইয়োরোপীয় প্রযোজকদের ধরাই উচিত নয় কি? নাকি যেন-তেন প্রকারেণ মার্কিন অবক্ষযকে এদেশে চালু করার পেছনে কোনো অর্থলোভ কাজ করছে?

'বেকদের অধঃপতনের চূড়ান্ত নিদর্শন তাঁদের 'প্যারাডাইস নাও' নাটক। 'ইয়েল থিয়েটাব' পত্রিকায এ নাটক সম্বন্ধে বেক নিজে লিখেছেন, আফিম-মাবিজুয়ানা-হেরোইন প্রভৃতি ড্রাগ খেযে তবে আমবা অভিনয করি এবং এভাবে আমরা নিজ নিজ দেহেব প্রতি সম্মান প্রদর্শন কবি। এবং ড্রাগ-মাতাল হবার ফলেই বোধ করি মঞ্চের ওপর মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ এবং দু-এক রজনীতে ধর্ষণ পর্যন্ত কবতে পাবলেন অভিনেতৃগণ। শৌচাগার এবং থিয়েটারের পার্থক্য ঘুচে গেছে এদের কাছে, উঠে গেছে বেশ্যালয় এবং নাট্যশালার সীমাবেখা। এই নাটকে বিস্মিত দর্শক প্রথম দেখলেন উলঙ্গ নর-নারীর জড়াজড়ি এবং মঞ্চে তাদেব স্তূপাকৃত দেহ, যাকে বেক বলেন লাভ-পাইল। দর্শকদেব থেকেও কেউ কেউ উঠে কাপড জামা খুলে সেই মাংসেব পাহাড়ে ঝাঁপিযে পড়তেন। সে বকম এক দর্শক, মাইকেল টমাস, লিখেছেন, ওই স্তূপে প্রবেশ কবে তিনি যাকে নারী ভেবে জাপটে ধরে স্পর্শসুখ পেলেন, পবে মঞ্চে আলো প্রখর হতে দেখলেন সে একটি বালক।

'এক ন্যক্কাবজনক গণমৈথুনকে নাটক বলে চালাচ্ছিলেন বেক। জুডিথ মালিনা বলাব স্পর্ধা রাখেন যে এ-নাটক নাকি দর্শন মাত্রে মানুষকে বিপ্লবী বানাতে চায—it is a play that wants to make revolutionaries of people on the spot ! বিপ্লবী বলতে জুডিথ বোধ হয লালসার দাস কোনো পশু বোঝেন। সেই সঙ্গে জুডিথ মালিনা তিন পৃষ্ঠা ধবে বোঝালেন যে বিপ্লব বলতে তিনি অবশ্যই অহিংস বিপ্লব বোঝেন—non-violent revolution। সেকথা বলাব দবকাব ছিল না, ড্রাগ-খাওয়া মার্কিন শ্বেতচর্ম ধনী নিউ লেফ্‌টেব কাছ থেকে আব কিছু আশাই কেউ কবে না। জুডিথ কিন্তু ছাড়েন না। বলে চলেন, শত্রু বলে আব কিছু নেই, শত্রুকে মিত্র কবে ফেলবে লিভিং থিয়েটাবেব নাটক। অর্থাৎ মঞ্চেব ওপর অভিনেত্রীকে বিষ্ঠাত্যাগ কবতে দেখলে, বা কুড়ি-পঁচিশজন নাবী-পুরুষেব গণ-বমণ দেখলেই সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্য ছেড়ে দেবে, পুঁজিপতি ধন বিলিয়ে দেবে, এফ-বি-আইব কর্তারা সন্ন্যাসী হযে বনে চলে যাবে। ড্রাগ না খেলে এমন বুদ্ধিদৃপ্ত কথা বোধ হয বেকতেই পাবে না। 'ইযেল থিযেটার' পত্রিকায দেখছি, 'মিস্ট্রিজ' নাটকেব এক অভিনযেব সময়ে জনৈক দর্শক উঠে দাঁড়িযে চেঁচিযে বলেছিলেন, ভিযেৎনাম মরে যাচ্ছে, আব আপনাবা বিবস্ত্র হওযাটাকে মনে কবছেন খুব বসিকতা? আমি শুধু ভাবি অমন সমাজসচেতন মানুষ পথ ভুল করে লিভিং থিয়েটাবের পাগলাগারদে টিকিট কিনে ঢুকেছিলেন কেন?'

আমি আব মধু চমকিত। এসব তো আমবা কখনো শুনিনি। আমি একবার অস্ফুটস্বরে বললাম, 'কিছু কিছু বাংলা নাটকে ইদানীং দেখছি ওই সব হাত-পা ছুঁড়ে নানা চিত্র সৃষ্টিব চেষ্টা রয়েছে। আমি ভাবতাম সেসব মৌলিক—'

'মৌলিকের নিকুচি কবেছে,' বললেন জপেনদা, 'নকল করা আর বিনা স্বীকৃতিতে মেবে দেওযা তোদেব মজ্জাব মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীবা ঢাক পিটোচ্ছে লিভিং থিয়েটাবেব। যত 'পবীক্ষা' চলছে ওই বিধ্বস্ত দেশে, সবই বেকের পদাঙ্ক ধরে। দেখ্‌না ওদের বড গর্বের ওপেন থিয়েটাব যা কিনা চাইকিন আব ফেল্ডম্যানেব নেতৃত্বে এই দশক পর্যন্ত জ্বালিয়েছে সত্যিকারেব বিপ্লবী থিযেটাবকে। ওদের 'সার্পেন্ট' বা 'টার্মিনাল' নাট্য প্রযোজনার

কথা ভাব্। সেই নগ্ন নারীপুরুষের জাপটাজাপটি, সেই যোগ আব প্রাণায়াম, সেই প্লটবিহীন ছুটোছুটি, চিৎকার। এঁদের নাটকে কিছু কথা থাকে, কিন্তু চাইকিন স্পষ্ট বলেছেন, সে-কথাব উচ্চাবণ এমন বিকৃত ও চিৎকৃত হবে যাতে তার আক্ষবিক অর্থটা কেউ বুঝতেই না পাবে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে কথা বাখা কেন? লিভিং থিয়েটাবেব মতন 'আ-উ-ই' বাখলেই হত! এঁদেব 'সার্পেন্টি' নাটকেব এক দৃশ্যে উলঙ্গ নবনাবীর গণমৈথুন চলে চল্লিশ মিনিট ধবে। এবং এঁদেব স্পষ্ট ঘোষণা—আমরা নাটক করি বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্রছাত্রীদেব জন্য অর্থাৎ শ্রমিক নামক জন্তুটিকে এঁদেব দরকাব নেই।

'তেমনি শেখনাবেব পাবফর্মেন্স্ গ্রুপ। কী শক্তিমান পবিচালক। অথচ ধসেব সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গিয়ে হাজির হলেন নাবকীয অন্ধকাবে। তাঁব 'দিওনিসৃস ইন সিক্সটি-নাইন' নাকি কালজযী প্রযোজনা, মার্কিন বোদ্ধাদেব পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিচারে। তাব শুরুতেই উলঙ্গ নবনাবীব ছটফটানি, জডাজডি, যৌনলীলাব অতিবাস্তব অভিনয়, এবং সেই মাংসেব তাল থেকে দেবতা দিওনিসৃস বেবিযে এলেন—এই নাকি তাঁব ভূমিষ্ঠ হবাব নাটকীয রূপাযণ। পবেব দৃশ্যে থীব্স্ অধিপতি পেনথেউসকে পবাস্ত কবে দিওনিসৃস বলছেন, আত্মসমর্পণেব নিদর্শন স্বরূপ তুমি আমাব জননেন্দ্রিয মুখমধ্যে ধাবণ কব। আমাদেব পিতাব ভাগ্য যে প্রযোজনা কবতে গিয়ে এটা মঞ্চে ঘটাননি শেখনার, ঘটিয়েছিলেন নেপথ্যে। কিন্তু পবমুহূর্তে অন্য ভীষণতব কাণ্ড ঘটে। উলঙ্গ অভিনেতা ও অভিনেত্রীবা দর্শকদেব ওপর হামলে পডেন, তাঁদেব কামনা জাগ্রত কবাব যাবতীয় যত পদ্ধতি কামশাস্ত্রে আছে সব প্রযোগ কবতে থাকেন, এবং ফলে অনেক বজনীতেই অস্বাভাবিক সব কাণ্ড ঘটেছিল, শেখনাবেব নিজেব তাই জবানবন্দী। শেখনাব লিখেছেন, 'ক্রমবর্ধমান হাবে দর্শকবা অভিনেত্রীদেব সঙ্গে সংগমেব চেষ্টা কবতে লাগলেনও অনেক সময়ে অন্ধকাব কক্ষে কুৎসিত সব কাণ্ড ঘটতে থাকল। অভিনেত্রীবা দর্শকেব অঙ্গে হাত বুলোতে অস্বীকার কবতে লাগল। একটি অভিনেত্রী স্পষ্ট বলে দিল, 'আমি কোনো বৃদ্ধের সঙ্গে যৌনসংগমেব জন্য নাট্য দলে আসি নি।' ' এটা পাবি প্রকাশিত নাটক 'দিওনিসৃস ইন সিকস্টি নাইনেব' ভূমিকায। তেমনি তাঁব 'পাবলিক ডমেইন' গ্রন্থেব ২২৮ পৃষ্ঠায শেখনাব এও স্বীকাব করেছেন যে এবকম গণ-উন্মাদনা জাগানোটা এক ধবনেব ফ্যাশিবাদ, কাবণ আউর্শভিট্স্-এব হত্যালীলা ও নুবেমবের্গে নাৎসিদেব উচ্ছৃঙ্খল সমাবেশগুলিও একই বকম উন্মত্ততাব ফল। এই 'পাবলিক ডমেইন' বই-এব প্রকাশক নিউ ইযর্কের বব্স্-মেবিল , প্রকাশকাল ১৯৬৯ সাল। স্তানপাপী শেখনাব, তিনি জানেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি হিটলাবেব ভূমিকায অবতীর্ণ। আব উদাহরণ বাডাচ্ছি না, মার্কিন মুলুকে এক্সপেবিমেন্টাল থিযেটাব বললেই বোঝায ফ্যাশিস্ত থিযেটার।'

জপেনদা হঠাৎ উঠে পডলেন, পায়চাবি কবতে লাগলেন চাব বর্গ ফুট জায়গাব মধ্যে, তাবপব মোটা দুটো বইয়ে হোঁচট খেয়ে থামলেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবাব বক্তৃতার খেই ধরলেন, 'পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তিমকাল উপস্থিত। পশ্চিমা নবনাট্যের সর্বাঙ্গে পচা মৃতদেহেব গন্ধ। সাংস্কৃতিক ফ্যাশিবাদ হচ্ছে সংস্কৃতির শেষ অবস্থা, গঙ্গাযাত্রা, নিদানকাল। এদের শুরু আর্তোদেব 'নিষ্ঠুবতার নাটক' থেকে। এরা হচ্ছে ইওনেস্কো, বেকেট, পিন্টারদেব সুযোগ্য উত্তবসূরী।

ইওনেস্কোদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশের বলিষ্ঠ নাট্য আন্দোলনের পথ রোধ করা, যাতে পশ্চিম ইয়োরোপে ব্রেখ্‌ট্‌দের মহৎ প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে। তাঁরা থিয়েটারকে করলেন চ্যাংড়ামির হায়াহীন আড্ডা। কিমিতি-জ্যামিতি-দুর্মতি প্রভৃতি নানা দুর্বোধ্য নামের আড়ালে তাঁরা বলতে চাইলেন—নাটকের কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। এই এক গোয়েবেলসীয় বাক্যে তাঁরা নস্যাৎ করতে চাইলেন সফোক্লিস-শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে গোর্কি-শ-ইবসেন-চেকভ পর্যন্ত পুরো ইয়োরোপীয় ঐতিহ্য। বেক-চাইকিন-শেখনারবা সেই তত্ত্বকেই তার স্বাভাবিক পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন মাত্র। ইওনেস্কোরা বলেছিলেন, নাটক অর্থহীন হবে ; বেকবা বলছেন নাটকে ভাষাই থাকবে না। ইওনেস্কোরা বলেছিলেন, পুরো নাট্য-ঐতিহ্যটাই ভুল পথে চলে গেছে, বেকবা বলেছেন আর্ট বিষ্ঠামাত্র। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ইওনেস্কোয়-বেকে। বিপ্লবী নাট্য-আন্দোলনকে ছলে-বলে-কৌশলে রুখতে গিয়ে ইওনেস্কোর ইয়ার্কি আর বেকদেব ফ্যাশিবাদেব জন্ম। এখন ওই কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী থিয়েটাবের রকবাজ ইওনেস্কো কেঁদে কেঁদে বলতে পারবেন না, মঞ্চে ব্যাপক যৌনলীলা আমরা চাইনি। অবশ্য চেয়েছিলেন। সোভিয়েত বিদ্বেষ, ব্রেখ্‌ট্‌ বিদ্বেষ, সাম্যবাদ-বিদ্বেষ এবং নিম্নশ্রেণীব ঈর্ষা ওই ইওনেস্কো সাহেবদের নিযে গিয়েছিল এমন এক হট্টমালার দেশে, যেখান থেকে সোজা প্রশস্ত বাজপথ চলে গেছে আফিম আর সংগমের বেশ্যালয় পর্যন্ত। লক্ষ কবিস, মার্কিন ফ্যাশিস্ট নাট্যবিদদেব একজনও কৃষ্ণাঙ্গ নন, অতগুলো দলেব একজন সদস্যও কালো মানুষ নন। সবটাই শ্বেতাঙ্গ ধনী এবং শ্বেতাঙ্গ চিন্তাবিদদের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে বদ্ধ ডোবায় ঢেউ-এর মতন। ভিয়েৎনামে যত পদাহত হয়েছে শ্বেতাঙ্গের সাম্রাজ্যবাদী কুত্তা, ততই সে স্বদেশে কামড়ে ধরেছে সংস্কৃতির টুঁটি।'

মধু কিছু পড়াশোনা করে। তাই সে হঠাৎ বিদ্যে ফলাতে গেল, 'সব দোষ আমেরিকানদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন' পোলান্ডেব গ্রোতোভ্‌স্কিব কোনো হাত নেই এই সর্বনাশে?'

'গ্রোতোভ্‌স্কি।' গর্জন করে উঠলেন জপেনদা, 'ইযার্সি গ্রোতোভ্‌স্কিকে টেনে আনলি এই যৌনব্যাধিগ্রস্ত পবিবেশে? গ্রোতোভ্‌স্কির নামটা ওই মার্কিন যৌনবিশারদরা ঘন ঘন নেয় বলে তুই গোরু ভাবছিস গ্রোতোভ্‌স্কি ওদেব জাতভাই?'

'না, গ্রোতোভ্‌স্কিও দুর্বোধ্য কিনা, তাই বলছিলাম,' আমতা আমতা করল মধু।

'কোন আঁটকুড়িব ব্যাটা তোকে বলেছে গ্রোতোভ্‌স্কি দুর্বোধ্য?' চেঁচালেন জপেনদা, 'তুই জানিস কী গ্রোতোভ্‌স্কি সম্পর্কে? তুই বুঝিস কী?'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'না, যত বোঝেন সব আপনি!'

ভাগ্যিস জপেনদা শুনতে পাননি। তিনি একনাগাড়ে বলে চলেছেন, 'মার্কিন পণ্ডিতদের কাছে গ্রোতোভ্‌স্কি দুর্বোধ্য হলেই তিনি যে নিজের পোলিশ দর্শকের কাছে দুর্বোধ্য হবেন তা তো নয়। ক্যাথলিক প্রতীক এবং ব্যঞ্জনায় তাঁর নাটক ভরপুর। তাঁর নাট্যশালায় প্রবেশ করলেই অভিনেতারা দর্শকদের যে রুটি বিলি করেন, সেটাও হোলি ইউকারিস্তের ঐতিহ্যবাহী একটি আচার, যীশুর দেহরূপ রুটি আহাব করে ক্যাথলিকরা পূর্ণতা লাভ করে। গ্রোতোভ্‌স্কির 'বিশ্বস্ত যুবরাজ' নাটকের কাহিনী আটশো বছর পূর্বেকার পোলিশ ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। তাঁর

'ফিগুরিস' নাটক যে-কোনো ক্যাথলিককে কাঁদিয়ে দেবে। যাঁরা ক্যাথলিক নন, কিন্তু অন্য জাতি-সম্বন্ধে ধর্ম-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল তাঁরা কাঁদবেন। প্রাচীন পোলান্ডের এক গ্রামে গতরে খাটা একদল ক্ষেত-মজুর স্থির করেছে তারা যীশুর জীবনী অভিনয় করবে এবং গ্রামের যে হাবা আজন্ম-নির্বোধ, সকলের যে উপহাসের পাত্র, সে করছে যীশুব পার্ট। নাটকেব অভিনয় চলতে চলতে কোনো এক সময়ে যীশুর সারল্য, স্বর্গীয় মহিমা, বিশাল ভালোবাসা সব ওই নির্বোধ লোকটির অস্ফুট উচ্চারণে প্রকাশ পেতে লাগল। ক্রমশ নির্বোধের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল। একটু পরে বোঝার উপায় থাকে না যীশুই নির্বোধ ছিলেন, না নির্বোধেরাই যীশু। এই মহান প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করছিস মার্কিন নটচ্যাংড়াদেব, যারা নাটকের সংলাপেই বিশ্বাস কবে না? ইযোরোপীয় জনগণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে অবগাহন কবে তবে গ্রোতোভ্স্কি এসেছেন আধুনিক নাট্যপরীক্ষায়। তাঁর সঙ্গে তুলনা কবছিস ছিন্নমূল গঞ্জিকাসেবী কিছু মাস্তানেব, যারা মঞ্চে প্রস্রাব কবে, মলত্যাগ করে?'

মধু বলল, 'ঘাট হযেছিল, আর বলব না।'

জপেনদা আবার পায়চাবি করে বললেন, 'অনুবাদ নাটকের জোয়াব ডেকেছে বাংলাব মঞ্চে। অনুবাদ নিশ্চযই কবতে হবে, তাই বলে এমন বাড়াবাড়ি কি ভালো? যে-কোনো মার্কিন বটতলার নাটককে বাংলা রূপ দিলেই হল? তাও সেই নাটকেও যতটা সাহসেব পরিচয আছে, সেটুকুও বাংলায আনবাব মুরোদ নেই বাঙালি পাতিবুর্জোয়ার। এই তো দেখলাম সেদিন—তৃতীয় শ্রেণীর মূল নাটক 'জিগার-জ্যাগাব' ; তাতে ছিল নায়কের মা বেশ্যাবৃত্তি করে পেট চালান , বাংলা রূপে তাঁকে মা করা হয়নি, পালিকা মাসি করা হয়েছে, পাছে মাতৃরূপা দেবীর হীন আচরণে কলকাতার পাতিবুর্জোয়া দর্শকের আত্মতুষ্টি ব্যাহত হয, পাছে সে চমকে ওঠে! অথচ 'জিগাব-জ্যাগার' নামক মূল্যহীন নাটকে এটুকুই যা ছিল দার্ঢ্য। এই রকম কাপুরুষতা নিয়ে পশ্চিমা নাটকেব মুখোমুখি হওয়াই অশোভন। মাক্স্‌মুলার ভবন নামক আধা-ফাশিস্ত পশ্চিম জর্মনির সংস্থার দাক্ষিণ্যে অকিঞ্চিৎকব নামগোত্রহীন কিছু নাটকেব অভিনয় করে চলেছে একটি নাট্যসংস্থা। কেন রে? ব্রেখ্‌ট্‌-ডুরেনমাট-ভাইসের পাশে ওই সব চতুর্থ শ্রেণীর পশ্চিম জর্মন আবর্জনা ভারতে নিয়ে আসাব কী এমন প্রয়োজন পডল? প্রয়োজনটা স্পষ্ট হয় যখন সে-দলের পরিচালক প্রকাশ্য জনসমাবেশে ঘোষণা কবেন পূর্ব জর্মন সমাজতান্ত্রিক সরকাব হচ্ছে সংস্কৃতির শত্রু কাবণ ওদেশে নাটকের ওপর বিধিনিষেধ আছে ; আসল বাধাহীন লাগামহীন গণতন্ত্র আছে পশ্চিম জর্মনিতে।'

'সে কি!' আমরা সমস্বরে বলি।

'হ্যাঁ, স্বকর্ণে শুনেছি,' বললেন জপেনদা, 'ভদ্রলোককে প্রশ্ন কব্—গণতন্ত্রই যদি থাকবে পশ্চিম জর্মনিতে, তবে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি কেন? কেন সেখানে বাডের-মাইনহফ গোষ্ঠীব বাছা বাছা কমিউনিস্টদের জেলের মধ্যে হত্যা করা হয়? কেন সে-সরকারের বড়ো বড়ো পদে বসে আছেন যুদ্ধাপরাধী মনুষ্যেতব নাৎসি জানোয়াররা? আবো জিগ্যেস কর্—পূর্ব জর্মনিতে নাটকের ওপর বিধিনিষেধ আছে, এই মহামূল্য সাম্রাজ্যবাদী কাহিনীটি বাংলা দেশে প্রচার করার ভার ওই ভদ্রলোক নিয়েছেন কত মার্কের বিনিময়ে? তিনি পূর্ব জর্মনি

গেছেন কবার? পশ্চিম জর্মনিকেই বা কতটুকু দেখেছেন? কোন ভালো নাটকটা পশ্চিম ইয়োরোপে অভিনীত হয়েছে যা কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ব জর্মনিতেও অভিনীত হয়নি? অন্যপক্ষে পূর্ব জর্মন নাটক কটি অভিনীত হয়েছে পশ্চিমে? স্ট্রিটমাটের বা বোলৎস-এর নাম শুনেছে পশ্চিম জর্মনির মানুষ? বিধিনিষেধ তো যত দেখছি উগ্র জাতিবিদ্বেষী, কমিউনিস্ট-বিরোধী পশ্চিম জর্মন সরকারই আরোপ করে চলেছে সেই ১৯৪৫ সাল থেকে। যে আধা-নাৎসি সরকার ব্রেখ্‌ট্‌কে প্রায় নিষিদ্ধ করে রেখেছিল, পিসকাটরকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লৌহযবনিকায় ঘিরে রেখেছিল, তাকে সংস্কৃতির পরিপোষক বলে সার্টিফাই করছেন বাংলার ওই পরিচালকপ্রবর। এটুকু বুঝলাম, পশ্চিম জর্মন ফাশিস্তরা নাটকের পরিপোষক না হোক, ওই বাঙালি পরিচালক মহোদয়ের পরিপোষক নিঃসন্দেহে।

'এসব দেখেই ভাবনা হয়। পশ্চিমা পুঁজিবাদের কবরখানা থেকে খাবলা খাবলা পচা মাংস যাঁরা ভারতে নিয়ে আসছেন, তাঁরা অচিরে এদেশে বেক-চাইকিনের স্বেচ্ছাচারও আমদানি করতে পারেন। পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ হচ্ছে অপক্ক বাঙালি পাতিবুর্জোয়ার এক প্রিয় খেলা। তার পুরো সুযোগ নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা। শেখনার কটি অভিনয় করে গেছেন এদেশে , সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের-মুখাপেক্ষী মৌলিকতাহীন একদল লোক তাঁর পদলেহী চেলা হয়ে পড়েছেন। পূর্ণ উদ্যমে তাঁরা পারফর্মেন্‌স্‌ দলের অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে লেগেছেন। এর পরিণতি তো মঞ্চে বিষ্ঠাত্যাগ এবং গণধর্ষণে। অনুবাদ নাটকের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার বান ডাকলে বিপদের কথা। বেনো জলে কারুর উপকার নেই, শুধু দেশের ফসল ডুবে যায়, পচে যায়।'

আমরা উঠে পড়ি কেটে পড়ার জন্য। কিন্তু এগুতে পারি না, দরজা আগলে দণ্ডায়মান ভূষণ্ডীর মাঠের কারিয়া পিরেত। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'পশ্চিমা পুঁজিবাদ কথাকে আর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম করতে সাহস পাচ্ছে না, চাইছে কথা হোক ভাব গোপন করার অস্ত্র, সব কিছু গুলিয়ে দেওয়ার হিং-টিং-ছট, জনগণের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার অসংলগ্ন কিছু শব্দ। একটা বই পড়ছিলাম—কেনেথ হাডসনের 'জার্গন অফ দ্য প্রোফেশনস্'—।' বইটা জপেনদা কুড়িয়ে নিলেন ঘরের কোণ থেকে। 'এই দেখ্, পশ্চিমের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকের ভাষা উদ্ধৃত করেছেন হাডসন। বলতে হবে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের প্রেম হল, বিয়ে হল। সমাজবিজ্ঞানী লিখছেন, 'their libidinal impulses being reciprocated, they activated their individual erotic drives and interpreted them in the same framework of reference!'

'এসব কী?' মধু বলল।

'এ সব হচ্ছে জরাগ্রস্ত পশ্চিমা পুঁজিবাদের প্রলাপ। ধর এক অর্থনীতিবিদের রিপোর্ট 'attempts which require at the theoretical, historical and predictive levels the formulation of consumptive and savings functions manifested in propensity to save schedules contained in various levels of income!' মানে বুঝলি?'

'পাগল নাকি!' আমি বলি, 'কী করে মানে বুঝব?'

'মানে হচ্ছে—আয় বেশি হলে লোক বেশি খরচ করে আর আয় কম হলে কম খরচ করে। পাণ্ডিত্যটা বোঝ। সবচেয়ে সহজ কথাটাকে এমন অর্থহীন শব্দের জিমন্যাস্টিকে পরিণত করার

বৈদগ্ধ্যটা বিচার কর। অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্ব যেন জনতার বোধগম্য না হয তার জন্য কী প্রাণান্তকব প্রয়াস দেখ। পুঁজিবাদের চবম সংকটের খববটা যেন লোকেব কাছে না পৌঁছে যায তার জন্য কী আকুলিবিকুলি। সেই মানসিকতাই কাজ কবছে বহু পশ্চিমা চলচ্চিত্র ও নাটকে। দেউলিযাপনা ঢাকবার জন্য দুর্জ্ঞেয় সাজা। ধোঁযাশা সৃষ্টি কবে মনেব গলিত কুষ্ঠ ঢেকে রাখা। পরস্পবাহীন তাৎপর্যহীন ধ্বনির ধূলিঝড়। বেক ও মালিনা তাই কবেছেন যা মার্কিন অর্থনীতিবিদরা কবছেন। চাইকিন ও শেখনাবও ঠিক ওইটিই কবছেন। এবং ঠিক সেই মানসিকতাই বের্গমান আদি চলচ্চিত্রকারকে নিযে গেছে অবোধ্য কিছু ছবিব মালা গাঁথবাব শোচনীয গবেষণায়। সাধু সাবধান! এঁদেব ফাঁদে যে পা দেবে সে নিছক একটু ইন্টেলেকচুযাল প্যাঁচ কষবে না, মূলত সে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলেব অংশীদাব হবে, সে মার্কিন বা পশ্চিম জর্মন ফাশিস্তদেব হুকুমবরদাবে পবিণত হবে।'

দুর্বোধ্যতাব এই আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা শুনে আমবা থ। মধু বলল, 'না, এ বিষযে আমবা সতর্ক যে অনুবাদ-নাট্য কখনো মৌলিক নাটকেব পবিবর্ত হতে পাবে না। নিজেব দেশকালেব মৌলিক নাটকেব দাযিত্ব এড়াবার জন্য অনববত খ্যাত-অখ্যাত উত্তম-অধম বিদেশি নাটকে জীবন কাটাব—এটা যে এক ধবনেব আত্মহত্যা, এটা আমবা জানি। কিন্তু উপাযটা কী? দেখছেন না, আজকেব কলকাতায শতকবা পঁচাত্তব ভাগ নাটক অনুবাদ বা রূপাযণ? যে নাটক প্রথম বাক্য থেকেই একান্তভাবে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব মিড-ওযেস্ট অঞ্চলেব স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে ভরপুব, অবলীলাক্রমে সে-নাটককেও ঘাড়ে ধবে ধুতি চাদব পবিযে বাঙালি বানানো হচ্ছে। যে নাটকেব পটভূমিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন বিমানবাহিনীব ফ্যাশিবিরোধী বীবত্ব, তাকেও হাতুড়ি মেবে দুমড়ে মুচড়ে বাংলাব এক রেল দুর্ঘটনাব পবিবেশে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। হাস্যকব তাব ফলাফল, উদ্ভট তাব সংলাপ। তবু হাল ছাড়েন না নাট্যবীববা। বাঙালি নাট্যকাবেব আন্তবিক বাংলা নাটক খুঁজে বাব কবাব পবিশ্রম কেউ স্বীকাব কববেন না। কিন্তু কববটা কী?'

'কববিটা কী?' পালটা শুধোলেন জপেনদা, 'এতদিন গণনাট্য কবছিস, আব এটা জানিস না? তোব নিজের দেশেব লোকগাথা, উপকথা আব মহাকাব্যে অবগাহন কব্। মাইকেল মধুসূদন যে এদেশেব নাটককে কী দিয়ে গেছেন আজ পর্যন্ত তাব হিসেব কেউ কবল না। তোবা মাইকেল থেকে ফের আবম্ভ কব্। মাইকেল পশ্চিমকে চিনতেন এ যুগেব অর্ধশিক্ষিত নাট্যবিদদের থেকে ঢেব ঢেব বেশি। তিনি পশ্চিমের শুধু সেইসব বিরাটকায কবিদের কাছে নতিস্বীকাব করেছিলেন যাঁরা গুরুপদেব যোগ্য। তাঁব পাঠ হোমাব-ভার্জিলেব কাছে, মূল গ্রীক ও লাতিনে। তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন শেক্‌স্‌পিযাব ও মিলটন। সেই সঙ্গে মূল ইটালিয়ানে দান্তে, মূল সংস্কৃতে কালিদাস, এবং খাঁটি বাংলায কৃত্তিবাস, কাশীবাম দাস এবং মৈথিলীতে জয়দেব, বিদ্যাপতি। তিনি ভারতের মার্গ সংগীতে অধিকাবী ছিলেন, এবং শোবি মিঞা ও নিধুবাবুর টপ্পা মুখে মুখে বন্ধুদের গেয়ে শোনাতেন। সর্বোপবি বাংলার লোককাব্যে তাঁব দখল ছিল বিস্ময়কব, যা 'ব্রজাঙ্গনাব' রূপরীতিতে সম্যক প্রকাশিত। দেশজ সংস্কৃতিব এই গভীর চেতনা নিযে মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি কবে প্রায শত বৎসবেব বাংলা নাটক ও যাত্রাপালাব মূল কাঠামো তৈরি করে দিয়ে গেছেন। গৈরিশ ছন্দ মাইকেলেব দান। সে-ভাষায ধ্বনিব বৈচিত্র্য আছে, ছন্দেব নানা চলন আছে, পৌরুষ আছে, আছে কোমলতা। কিন্তু কোথাও নেই অস্পষ্টতা,

দুর্বোধ্যতা, বা পাতিবুর্জোয়া বিদগ্ধতা। কি বিদ্যুৎ গতিতে সে-ভাষা বাংলার গ্রামাঞ্চলের গভীরে ছড়িয়ে গেল, তার পরিমাপ পাবি যাত্রার ইতিহাস পাঠ করলে, এমনকী যে-কোনো জেলার বৃদ্ধ চাষির দৈনন্দিন গুরুগম্ভীর ভাষা শুনলে। একটা কুসংস্কার চল্লিশের দশক থেকে নাট্যআন্দোলনে ব্যাপ্ত হয়েছে যে চাষি নাকি আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় নাটক হলে, তবে বুঝতে পারে। চাষির সামনে যে কস্মিনকালে যায়নি একমাত্র শহুরে বুদ্ধিবাজের মুখ থেকেই বেরুতে পাবে এহেন নিরেট উক্তি। এক অঞ্চলের ভাষায় নাটক হলে অন্য অঞ্চলের চাষি যে কিছুই বুঝবে না, ওটা ওই বিশারদরা বোঝেননি। উপরন্তু কোনো জেলার 'পাতোয়া,' বা ডায়ালেক্ট, অর্থাৎ কথ্য ভাষা শুনলে কৃষক-দর্শকরা যে সাধারণত টিটকিরি সহযোগে হেসে ওঠেন, কখনো বা মৌনী হয়ে নীরব প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, এটা নিজে মফঃস্বলে নাটক করতে না গেলে কারুর জানাব উপায় নেই। না। চাষি তাব নিজের কথ্য ভাষা শুনতে যাত্রা বা থেটাব দেখতে আসে না। মাইকেলের পব থেকে তাবা থেটারে আসে কাব্যঝংকার শুনে বোমাঞ্চিত হতে। থিযেটাব যাত্রা তাদের কাছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পবিত্র সমাবেশ। মাইকেল অব্যর্থ শরসন্ধানে বাংলাব কৃষকজগতের সাংস্কৃতিক হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ কবেছেন। তিনি সেই ভাষা আবিষ্কাব করেছেন যা কৃষকের মহত্তম আকাঙক্ষাগুলিব প্রতিধ্বনি, তার জটিলতম প্রার্থনাব পূবণ। সেই ঐতিহ্য চলে আসছিল অপ্রতিহত গতিতে। বাংলা নাট্যশালাব গদ্য-নাটকও ছিল কাব্যিক অতিশয়োক্তির গীতিময় আসর। রবীন্দ্রনাথে এসে সেই ধারার প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণ। কাব্যনাট্য 'বিসর্জনের' চেয়ে গদ্যনাট্য 'তপতী' বা 'বক্তকববী' কোনো অংশে কম কাব্যিক নয। পেশাদার নাট্যশালাব লেখকরাও ভাবতে পারতেন না নিছক মামুলি 'কেমন আছ' 'ভালো আছির' মধ্যে নাটককে আবদ্ধ রাখার কথা। ক্ষীবোদপ্রসাদেব 'নব-নাবায়ণ' মাইকেলি কাব্যে রচিত , কিন্তু তাঁর গদ্যনাট্য 'আলমগীরের' ভাষাও ছন্দোময়। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' পড়ে দেখ্, পড়্ শচীন সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকগুলি। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ্—বাংলা নাট্যশালাব সেই জনপ্রিয় নাট্যকাব্যের ঐতিহ্য হাবিযে গেছে। এসেছে কতকগুলি অশিক্ষিত অপদার্থ যৌনব্যবসায়ী, বারবধূ আব সাহেব-বিবি-গোলামেব সিফিলিটিক পসরা নিয়ে। ফিবিয়ে আন সেই ফর্ম, সেই কাব্যছন্দোময় রূপরীতি, যেটা ছিল একাধারে বুদ্ধিদৃপ্ত এবং জনপ্রিয। পদাঘাতে দূর করে দে যৌনব্যবসায়ীদের। ঘাড় ধরে বাব করে দে হঠাৎ-নবাব সব বুদ্ধিবাজদের, যারা দুর্বোধ্যতাব অনুস্বাব-চন্দ্রবিন্দুব ধমকে থিয়েটার থেকে তাড়াতে চাইছে শ্রমিক-কৃষককে। বেহুদার মতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোরে নাটক ভিক্ষা না করে মাইকেল থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত যে ঐতিহ্য তাকে আঁকড়ে ধর্ এবং সেই ঐতিহ্যকে এক ধাক্কায় দশ বছর এগিয়ে দে নতুন বৈপ্লবিক বিষযবস্তু যোজনা কবে। সেই মাইকেলি ফর্ম ধবে নেমে যা লক্ষ মানুষের জমায়েতে, আর সেই ফর্মে বল্ বিপ্লবের কথা, শ্রেণীসংগ্রামের কথা, শ্রমিক কৃষকের মরণজয়ী সংগ্রামের কথা। পশ্চিমা কববখানার নাটক নিয়ে আর টানাহ্যাঁচড়া কবিস নে।'

আবেগে নিজের বুকে মাইকেলি ছন্দে কবাঘাত করলেন জপেনদা, এবং পরমুহূর্তে কেশে, খাবি খেয়ে, হাঁপিয়ে, শুযে পডলেন মেঝেতে, এবং আমরা 'জল,' 'পাখা,' 'ডাক্তার' প্রভৃতি শব্দে কোলাহল করে উঠলাম।

থিয়েটারের ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌

প্রথম দিন

জয়ন্ত খাটছিল খুব, টপ টপ করে ঘাম ঝরছিল তার আঁট আঁট গাল বেয়ে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, কিছু হচ্ছে না। সে নিজেও বুঝতে পারছিল কেননা দর্পণের মতন তার সামনে ছিল পরিচালকের চশমার কাঁচজোড়া আর তার ওপর ঈষৎ অবিশ্বাসে নৃত্যমান একজোড়া ভুরু। নাটকটা ছিল 'গাংচিল', আর জয়ন্ত করছিল কিশোরের পার্ট। কিশোর নাটকের মধ্যে এক নাটকের অভিনয় করছে তাব মা এব' মায়ের বন্ধুদের সামনে, অতীব ধোঁয়াটে এক বুদ্ধিবাজ নাটক। আর মা যেহেতু প্রাক্তন অভিনেত্রী, তাই থেকে থেকে সমালোচনায় সোচ্চার হচ্ছেন। ফলে হঠাৎ কিশোর নাটক ছেড়ে মাকে প্রচণ্ড গালাগালি দিয়ে বেবিয়ে যাবে। এই দৃশ্যের রিহার্সাল হচ্ছিল। স্নেহাতুর পুত্র হঠাৎ বিস্ফোরিত অবাধ্য মাতৃনিন্দুকে পরিণত হয় কী করে এটাই বোধহয় জয়ন্তেব সাধ্যের উপলব্ধির বাইরে থেকে যাচ্ছিল। অবশেষে যখন পবিচালক চশমা নামিয়ে ফেললেন চোখ থেকে তখন জয়ন্তও অর্ধপথে মূক হল কেননা এটা পবিচালকের সুপরিচিত এক ইঙ্গিত—থামো, যাচ্ছেতাই হচ্ছে।

সুলেখা করছিল মায়েব পার্ট। সে মৃদুস্বরে বলে উঠল, 'সেবেছে।' এর ফল হল মারাত্মক। জয়ন্ত পার্টের খাতাটা মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে গত এক মাসের নিরুক্ত সব যন্ত্রণাকে ভাষা দিল।

'অভিনয়েব চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার আব কিছু নেই,' বলল সে, 'আমি ঘুমোতে পারি না, খেতে পারি না। এ পার্ট আমার দ্বাবা হবে না। ইন ফ্যাক্ট অভিনয়ই আমাব দ্বারা আর হবে না। যেচে এমন গ্লানি ভোগ করার কোনো মানে হয়?'

পরিচালক চট করে বললেন, 'না, হয় না।'

জয়ন্ত বোধ হয় ভেবেছিল সবাই এসে গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবে, জবাব শুনে একটু থতমত খেল। বলল, 'আমি চললাম।'

পরিচালক বললেন, 'নমস্কাব।'

কিন্তু জয়ন্তর যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চিন্তিত মুখে সে প্রশ্ন করল, 'কী বললেন?'

পরিচালক বললেন, 'বললাম, নমস্কার। যান, আব পার্টের খাতাটা ক্ষেত্রকে দিয়ে যাবেন যাওয়ার সময়ে। ক্ষেত্র!'

স্টেজ ম্যানেজার ক্ষেত্র এসে খাতায় হাত দিতেই জয়ন্ত তাকে দাঁত খিঁচোল নীরবে, তারপর তীর্থের কাকেব মতন তাকিয়ে বইল পরিচালকের দিকে। পবিচালক নীচু হয়ে প্রায় নাকটা স্ক্রিপ্‌টে ঠেকিয়ে কী পড়ছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে জয়ন্তকে দেখে বললেন 'একি এখনো যান

নি? অভিনয় যদি যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়, ছেড়ে দিন। অভিনয় একটা শিল্প, এখানে শুধুই আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। এখানে সৃষ্টির প্রবাহে মাঝে মাঝে ভাটা পড়ে, পড়তে বাধ্য। সেই অচল অবস্থাও আনন্দের। কেননা শিল্পীর কাছে চ্যালেঞ্জ। এসবে যদি আপনার জ্বালা ধরে, তবে বিদেয় হোন, কোথাও কলম পিষুন গে—অভিনয় আপনার জন্য নয়।'

পরিচালক আবার টেবিলে উপুড় হলেন। তখন বাসুদেব সাহস করে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'মানে জয়ন্ত আসলে জানতে চাইছে ও পার্টটা ধরতে পারছে না কেন।'

'তাই বলুন।' বললেন পরিচালক। 'তাহলে যন্ত্রণা, গ্লানি পেটব্যথা, মাথাধরা—ওসব দেবদাস-মার্কা কথা কী হেতু?'

সুলেখা হঠাৎ বলে বসল, 'দাদা, এই নাটকটাই বাজে। এমন হঠাৎ হঠাৎ চরিত্রগুলো উলটো বাঁক নেয়, মোড় ঘোরে যে কিছু ঠাহর করতে পারি না। এই দেখুন না—আমি কিশোরের মা, বাঘা অভিনেত্রী, ছেলেকে না দেখে থাকতে পারি না। আবার ছেলে কাছে এলেই তাকে অপমান করতে থাকি। এ নাটকে কোনো গলদ আছে।'

পরিচালকের একটা বিশেষ খাদে নামানো গলা আছে। যখন উনি কোনো বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করতে উদ্যত হন, তখন অহীন্দ্র চৌধুরী-সদৃশ ওই কণ্ঠের তিনি আশ্রয় নেন। সবাই বলে, তাঁর গলা নির্শপিশ করে। তখন সেই মেঘমন্দ্র কণ্ঠে তিনি বললেন, 'নাটকটা চেকভের সী-গাল। বিনা স্বীকৃতিতে মেরে দেওয়া। সুতরাং একে বাজে নাটক বলে নিজেদের অক্ষমতার সাফাই না গাইলেই ভালো হয়।'

'কিন্তু পার্টটার আগাপাশতলা কিছুই বুঝি না কেন?' কাতর কণ্ঠে বলল জয়ন্ত।

পরিচালক আবার ধমকালেন, 'নাকে কান্না ছাড়ুন। বীরের মতন, পুরুষের মতন পার্টটার মুখোমুখি দাঁড়ান। কী ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেটা আগে শুনি।'

জয়ন্ত নিজের পার্টের খাতাটা মেলে ধরল টেবিলে—লাল এবং নীল পেন্সিলে সেটা দাগানো। সেসব দেখিয়ে সে বলতে লাগল, 'এইখানে প্রথমে দেখছি কিশোর মাকে প্রায় দেবীজ্ঞানে পুজো করে। এই সিনে এসে দেখছি সে মীরাকে চায় দেবী নয় মানবীরূপে। মার বোধহয় ঈর্ষা হয়। তাই তিনি আমাকে লাঞ্ছিত করেন সর্বসমক্ষে, তাই এখানে কিশোরের অভিমান। এই যে লাল পেন্সিলের দাগ, এখানটায় আমার অভিমান ঘৃণায় পরিণত হয়েছে, কারণ মায়ের অতীত সম্পর্কে আমার প্রবল বিতৃষ্ণা জাগ্রত হয়েছে। ভেতরে ভেতরে মাকে এখন আমি ডাইনি মনে করছি। আর এই যে নীল পেন্সিলের দাগ—'

'থামুন!' বললেন পরিচালক। 'আপনি মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। ব্যবচ্ছেদ করে শবদেহকে। জীবন্ত মানুষকে কাটা ছেঁড়া করলে প্রাণহীন কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মানুষটা মরে যাবেই। আপনার পার্ট বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভুল পথে চলে গেছে। সুলেখা দেবী, আপনার কথা শুনেই বুঝেছি, আপনিও ও পথের পথিক। আপনিও ছক কেটে নিয়েছেন—এইখানে মা কিশোরকে ভালোবাসে, এইখানে মা কিশোরকে ঘৃণা করে, এইখানে মা মীরার প্রতি ঈর্ষায় জ্বলছেন, ইত্যাদি। সঠিক?'

সুলেখা বলল, 'সঠিক।'

পরিচালক বললেন, 'ঠিক সেই জন্যেই চবিত্রের এক মানসিক অবস্থা থেকে আব এক অবস্থায় যেতে আপনাদের প্রাণান্ত হচ্ছে, এবং সেই পরিবর্তনকে বিশ্বাসযোগ্য না কবতে পেবে দুজনেই অযথা চেঁচাচ্ছেন এবং অস্বাভাবিক থিয়েটাবি কিছু প্যাঁচ কষে ব্যাপারটা নাটকীয় কবে তুলেছেন। চবিত্র-বিশ্লেষণের পরিবর্তে আপনাবা চবিত্র ব্যবচ্ছেদ কবেছেন। সংক্ষেপে বলি, আপনারা মার্ক্সীয় ডায়ালেক্টিক্স্ প্রযোগ কবেননি।'

বাসুদেব চিবদিনই সন্দিহান লোক। তাব বাঁকা প্রশ্ন, 'মার্ক্সীয় ডায়ালেক্টিক্স্ প্রয়োগ কবে অভিনয় করা যায়?'

পবিচালক বললেন, 'ভালো অভিনয করার জন্য ডায়ালেক্টিক্স্ ছাডাও আরো অনেক কিছু লাগে—কণ্ঠ, উচ্চারণ, দৈহিক ক্ষমতা ইত্যাদি—কিন্তু পার্টটা বুঝতে গেলে ডায়ালেক্টিক্স্ ছাডা অন্য কোনো পথ নেই! ভালো অভিনয়ের জন্যও অন্যান্য গুণেব সঙ্গে ডায়ালেকটিক্স্-এব বোধ অপবিহার্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাবা অধিকাংশই না জেনেই ডায়ালেক্টিকেলি নিজেব পার্ট কবে গেছেন। চ্যাপলিন বলেন, হাসিব মধ্যে আমি কান্না খুঁজে বেড়াই। স্তানিস্লাভ্স্কি দাবি কবেন একই সঙ্গে সজাগ এবং বিহ্বল হতে হবে। উনিশ শতকেব এডমন্ড কীন বলেন, কাব্যনাট্য একাধাবে কাব্য ও কর্কশ গদ্য। ফবাসি অভিনেতা কোকল্যাঁ প্রবন্ধ লেখেন, অভিনেতা একই সঙ্গে দুজন মানুষ। এঁরা সবাই ডায়ালেক্টিক্স্ প্রযোগেব নজিব বাখছেন. এটা বুঝতে পাবছেন তো? আব আজকের ব্রেখ্ট্-শেপার্ডের যুগে ডায়ালেক্টিক্স্ সজ্ঞানে প্র... এটা তো সবাই জানে।'

চাবিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করছে দেখে পবিচালক দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন এবং পায়চাবি কবতে কবতে বলতে লাগলেন, 'এখন এই মার্ক্সীয় ডায়ালেক্টিক্স্ কী। কীভাবে প্রযোগ করব নাটক বুঝতে, পার্ট বুঝতে, পার্ট কবতে? আপনাবা নিজেব পার্টকে নানা ভাবে ভাগ করে প্রতি অংশকে একটা স্বতন্ত্র চেহাবা দিযেছেন, লাল নীল পেন্সিলের দাগে টুকবো টুকরো কবেছেন। ডায়ালেক্টিক্স্ এ পদ্ধতিকে মানে না। ডায়ালেক্টিক্স্ এমনই এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিযা যে বলে এ বিশ্বে থেমে-থাকা কিছু নেই, সবই নিয়ত পবিবর্তনশীল। সুতরাং কিশোব চবিত্রটি এখানে গবম ওখানে নরম এবকম চিন্তা আসতেই পাবে না। কিশোর চরিত্র একটি পবিবর্তনশীল প্রক্রিযা, একটি ক্রমবর্ধমান ও ক্রমবিকাশমান মন। সে কোনো মুহূর্তেই অচল একটা ছবি নয়। এ তত্ত্ব অবশ্য মার্ক্সেব মৌলিক নয়। প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভাবতে দার্শনিকবা ডায়ালেক্টিক্স্-এব এই চিন্তাটুকু প্রবর্তন করে গেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকরা যখন বলেন, জগতে সত্তা বলে কিছু নেই; আছে 'ভব,' আছে উৎপাদ্যমান বস্তু, তখন তাঁরা ডায়ালেক্টিক্স্ কইছেন। কিন্তু যেখানে মার্কসীয় ডায়ালেক্টিক্স্ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল সেটা হল এই যে পবিবর্তন সেটা সাধাবণ পরিবর্তন নয়। প্রতি মুহূর্তে সব কিছু নিজের বিপরীতে পরিণত হচ্ছে এটাই পরিবর্তন। প্রতিটি বস্তু প্রতিটি মানুষ প্রতিটি চিন্তার মধ্যে দুই বিপরীত উপাদান সহবাস করছে এবং পবস্পর দ্বন্দ্বে মাতছে—একই সঙ্গে তাদের মিতালি ও ঝগডা। ফলে সব বস্তু, মানুষ চিন্তা পবিবর্তিত হতে হতে একেবারে অন্য জিনিসে রূপান্তরিত হয, বিপবীতে পবিণত হয়।'

সবাই কিঞ্চিৎ চিন্তাগ্রস্ত। তাই পবিচালক বললেন, 'উদাহবণ দিই তাহলে সহজ হবে।

১৯৫৮ সালের ২০ মার্চ চেংতু সম্মেলনে মাও ৎসে-তুং যে সব উদাহরণ দিয়েছিলেন তারই কিছু বলছি। ধরুন গেরিলা বাহিনী প্রবল যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা শুরু হয়ে গেছে। তাই কিছুকাল পরে দেখি যুদ্ধ রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্রামে। আবার বিশ্রাম শুরু হতেই পরবর্তী যুদ্ধের ডাক আসতে শুরু করেছে। তাই দেখি বিশ্রাম রূপান্তরিত হল যুদ্ধে। যুদ্ধ ও বিশ্রাম এক অপরের মধ্যেই ব্যাপ্ত, এক অপরে পরিণত হচ্ছে। কেউ যখন শুতে যায় তখুনি তার ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ; উঠলেই পুনর্বার শোয়ার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। এই যে আমরা রিহার্সাল-এ সমবেত হয়েছি, রিহার্সাল শেষ করে বাড়ি যাবার পর্ব কি সঙ্গে সঙ্গে চলছে না? অচিরে রিহার্সাল কি বাড়ি যাওয়ায় রূপান্তরিত হবে না? এবং কাল সকালেই কি আবার রিহার্সাল নয়? ঐক্য হলেই কি অনৈক্যও শুরু নয়? ঐক্য অনৈক্যে পরিণত হয়, অনৈক্য আবার নানা তর্ক বিতর্ক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ঐক্যে পরিণত হয়। দ্বন্দ্ববিহীন বিশুদ্ধ ঐক্যের কথা যারা বলে, মনান্তরবর্জিত বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের কথা যারা বলে তারা কি মিথ্যেবাদী নয়? অর্থনীতি ধরুন—উৎপাদন পরিণত হয় ভোগে, ভোগ পরিণত হয় উৎপাদনে। কৃষি ধরা যাক—বীজবপন পবিণত হয় ফসল কাটায়, ফসল কাটা আবার বীজবপনের রূপ নেয়। ঋতুগুলি কী কবছে? গ্রীষ্ম কি বর্ষায় পবিণত হচ্ছে না? বর্ষা শবতে, শরৎ হেমন্তে, হেমন্ত শীতে, শীত বসন্তে? প্রতি ঋতুতে পবের ঋতুর বীজ বপ্ত। জন্ম শেষ হয় মৃত্যুতে, মৃত্যু জন্মে পরিণত হয়—কেননা মৃত বস্তু প্রাণ পায় বলেই জন্ম। মায়ের পেটে একদলা মৃত মাংস, দুদিন বাদেই সে জীবন্ত। শস্য প্রতি বছব জন্মায় প্রতি বছর মবে। তেমনি গাছের পাতা, ফুল, ফল। উদ্‌গমেব সঙ্গেই এদেব ঝরাব পালা, ঝরলেই পুনরুদ্‌গমের পালা। পিতা পুত্রের জন্ম দেয়, পুত্র নিজে আবাব পিতা হয়। পুরুষ কন্যাব জন্ম দেয়, নারী পুত্রেব জন্ম দেয়—দার্শনিক অর্থে এখানে পুরুষ নাবীতে রূপান্তবিত হচ্ছে, নারী পুরুষে। রাজা প্রজা হতে যাচ্ছে, প্রজা হতে যাচ্ছে বাজা—অর্থাৎ আজকেব শাসক শ্রেণী আগামী সমাজে হবে শাসিত, আব আজকের শোষিত আগামীর শাসক। প্রক্রিয়াটা এখুনি চলছে। যুদ্ধ শান্তিতে পরিণত হয়, শান্তি হয় যুদ্ধে। পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজে উন্নীত হয়, সমাজতান্ত্রিক হয় সাম্যবাদীতে।'

সবাই ইতিবাচক মাথা নাড়ছে দেখে পবিচালক সোৎসাহে বললেন, 'তাহলে জয়ন্ত যে ছক কাটা গাণিতিক চবিত্র কল্পনা কবেছে, সেটা অবাস্তব, অসম্ভব, প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিশোর এই অংশে মাতৃভক্ত, ওই অংশে মাতৃবিদ্বেষী—এরকম পৃথকীকরণ কৃত্রিম। মার্ক্‌সীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ আত্মস্থ করলে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পাবে না। প্রকৃতপক্ষে কিশোব যখন মাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করে, তখনই সে একই সঙ্গে মাকে ঘৃণা কবে—ঘৃণাব প্রক্রিযাও শুরু হয়ে গেছে ভক্তির পাশাপাশি। তাই ভক্তি পবিণত হয় ঘৃণায। আবার ঘৃণা বিকশিত হতেই শুরু হয়ে গেছে ভক্তির বিকাশ, ঘৃণা আবাব যাচ্ছে ভক্তিব রূপ নিতে। কিশোব প্রতি মুহূর্তে দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন। প্রতি দৃশ্যে সে একাধারে মাতৃভক্ত ও মাতৃবিদ্বেষী। সে এক মানুষ, কিন্তু দুই সত্তা। সে একটা যুদ্ধক্ষেত্র, বিপরীত দুই শক্তির সংঘর্ষকেন্দ্র। তেমনি সুলেখা দেবী, আপনাব মায়ের চরিত্রটিও একই সঙ্গে ছেলেকে চায় এবং চায না। ভালোবাসে ও ঘৃণা করে। কাছে পেতে চায় ও তাড়াতে পারলে বাঁচে। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ আমাদের দেখায়—চবিত্রকে টুকরো টুকরো কোরো না, এখানে সাদা

ওখানে কালো এভাবে চিন্তাই করো না। পুরো চরিত্রটা এক, অখণ্ড, আস্ত। তার বাহ্যিক আচরণে কখনো এদিকে ঝোঁক পড়ছে কখনো ওদিকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার মনের মধ্যেকাব বিরোধিতার কখনো অবসান ঘটেছে। জয়ন্তবাবু, যখন কিশোর মাকে ভালোবাসছে, তখন যদি ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখাতে পাবেন এবং যখন কিশোব ঘৃণা করছে তখন যদি চকিতে দেখাতে পারেন গভীর ভালোবাসার আভাস—তবে না চেকভেব জটিল সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন, তবেই না সেটা অভিনয় হল। নইলে নক্‌শা-কাটা এই যে একপেশে সব চর্বিত চর্বণ, এ কি অভিনয়? এ তো ইস্কুলের ছেলেদের প্রাইজ-ডের একটিং।'

বোঝা গেল ওষুধ ধবেছে, সবাই যেন গভীর চিন্তায় আক্রান্ত হয়েছে। বাসুদেব হঠাৎ বলে উঠল, 'অভিনয সম্পর্কে এভাবে কখনো ভাবিনি তো। একই সঙ্গে দুটো উলটো ভাব বজায় বাখার কথা কখনো চিন্তা করিনি।'

পরিচালক টেবিলে মৃদু চড মেরে বললেন, 'তার কারণ আপনি কখনো ডাযালেক্‌টিক্‌স্‌কে আমল দেননি। অথচ ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ ব্যতীত কোনো সিরিয়াস পার্টকে বোঝাই সম্ভব নয়। ডাযালেক্‌টিক্‌স্‌কে বাদ দিয়ে কোনো জটিল চরিত্র অভিনয করাই সম্ভব নয়। বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ যত চবিত্র—হ্যামলেট-ওথেলো থেকে শুরু করে ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ পর্যন্ত—ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ প্রযোগ না করে তাদেব প্রাথমিক কার্যকলাপই বোঝা যাবে না। হ্যামলেট পাগল কিংবা পাগল নয় শেক্‌স্‌পিয়ার এভাবে সমস্যাটা উত্থাপনই করেননি ; হ্যামলেট একই সঙ্গে উন্মাদ ও সুস্থমস্তিষ্ক, এটাই হচ্ছে নাটকের প্রতিপাদ্য। সে একই সঙ্গে মাকে ভালোবাসে ও ঘৃণা করে এটাই হচ্ছে কথা। সে ওফিলিযাকে বুকে টেনে নিতে চায আবাব জীবন থেকে দূর কবে দিতে চায়, এটাই হ্যামলেটের যন্ত্রণা। সে প্রেতেব কথা বিশ্বাসও কবে, অবিশ্বাসও কবে, এটাই তাব সংকট। প্রতি মুহূর্তে সে দ্বিধাবিভক্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বে কম্পমান। ডাযালেক্‌টিক্‌স্-এর সাহায্য ছাড়া এ পার্ট করবে কে?'

সুলেখা প্রশ্ন কবল, 'কিন্তু এ অভিনয় কি সম্ভব? দুই বিপবীত চিন্তা এক সঙ্গে জড়িয়ে প্রকাশ করা কি সম্ভব?'

পবিচালক বললেন, 'ডাযালেক্‌টিক্‌স্ প্রয়োগ করলে সম্ভব , অবশ্য সম্ভব। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা তাই কবে থাকেন। সে আবেক দিন আলোচনা কবা যাবে, এবাব রিহার্সাল আরম্ভ করুন।'

দ্বিতীয় দিন

জযন্ত। গতকাল আপনি বললেন, অম্লানবদনে বলে গেলেন, অভিনয়ে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ প্রযোগ করতে হবে, দুই বিপরীত ভাবকে উপস্থিত করতে হবে। এটা কি সম্ভব?

পরিচালক। সম্ভব তো বটেই। সেটাই সব শ্রেষ্ঠ অভিনযের ভিত্তি। জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক বিশ্বেব শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা ডায়ালেক্‌টিকেলি অভিনয় করে থাকেন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরিচালকেরা অভিনযের ডায়ালেকটিক্‌স্ নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন, ঘামিয়েছেন,

মোটা মোটা বই লিখেছেন। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ কথাটা উচ্চারণ কেউ করেননি, কিন্তু যত সমস্যার সমাধানে তাঁরা চেষ্টিত হয়েছেন সেগুলো সবই ডায়ালেকটিক্‌স্-এর সমস্যা।

সুলেখা। তাহলে আমি প্রস্তাব করছি রিহার্সাল বন্ধ রেখে আগে ওই ডায়া কী যেন কথাটা?

বাসুদেব। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্।

সুলেখা। হ্যাঁ, ওই ভাবে অভিনয় করা শেখা যাক।

পরিচালক। আপনার কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ আপনার ধাতস্থ হয় নি এখনো। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে আমরা দেখব জগতে কোনো বস্তুই অনড় নয়, সবই পরিবর্তনশীল। কোনো বস্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়, সবই পরস্পর সম্পৃক্ত। আরো দেখব, সব বস্তু নিজের বিপরীতে পরিবর্তিত হচ্ছে। গতকাল আমরা এটা আলোচনা করেছি। এ রকম জটিল একটা অবস্থায় কে সে দুরদৃষ্ট যে এক-দুই-তিন করে আপনাকে নিয়ম বলে দেবে, যা প্রয়োগ করলেই অভিনয় সঠিক হবে?

সুলেখা। তাহলে কী হবে?

পরিচালক। আগে মন—মন তৈরি করতে হবে। ডায়ালেক্‌টিক্ চিন্তায় অভ্যস্ত হতে হবে। এ বিশ্ব যে দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন এটা মজ্জার ভেতব ঢুকিয়ে নিতে হবে। চোখকে শিক্ষিত করতে হবে যেন প্রতি মানুষ প্রতি বস্তুকে সে পরিবর্তনশীল রূপে দেখতে পায, ক্রমবিকাশমান রূপে দেখতে পায়। প্রতি ক্ষেত্রে দুই বৈপরীত্যের সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া চাই-ই চাই। কেননা থিযেটার বস্তুটি আগাগোড়া বৈপরীত্যের যুদ্ধ, উলটো এবং সোজার হাতাহাতি, সাদা ও কালোর বকসিং ম্যাচ।

বাসুদেব। মানে?

পরিচালক। অভিনেতার কাজটা কী? সে মঞ্চে গিযে চেষ্টা করে সত্য হতে, বাস্তব হতে, অথচ সামনে বসে আছে এক ঘর দর্শক যাদেবকে সে ভুলতে পারে না। যাদের জন্য তাকে গল্প বলতে হয, সেটা স্বভাবতই অবাস্তব, অসত্য। তাই অভিনেতা একই সঙ্গে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী। অভিনেতা এক শতবার রিহার্সাল দিয়ে মঞ্চে আসে, তার প্রতিটি কথা অঙ্গভঙ্গি অনুশীলিত, সুনির্দিষ্ট, অথচ মঞ্চে প্রতি মুহূর্তে তাকে এমনভাবে কথা কইতে হয যে মনে হবে জীবনে এই প্রথম কথা কইছে। প্রবল শৃঙ্খলাব মধ্যে তাকে স্বাভাবিক হতে হয়। অভিনেতা একই সঙ্গে শৃঙ্খলিত এবং মুক্ত, নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। যে চরিত্র সে অভিনয় করবে তার মধ্যে তাকে ডুবতে হবে, অথচ প্রতি মুহূর্তে বাইবেও থাকতে হবে, সজাগ লক্ষ রাখতে হবে আলো মুখে পড়ছে কি না, সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়েছে কি না, বিজনেসগুলো যথাযথ হচ্ছে কি না। শিশির ভাদুড়ি মহাশয় বলতেন, 'রাম অভিনয করতে করতে আত্মহারা হব কী করে? ওই সময় লব কুশকে নিয়ে বাঁদিকে এনে মুখে আলো নিতে হয় আমাকে।' সুতরাং অভিনেতা একই সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম ও চবিত্র থেকে বিযোজিত। বুঝতে পারছেন?

সুলেখা। মানে অভিনয়টা আগাগোড়াই ডাযালেক্‌টিক্‌স্?

পরিচালক। আগাগোড়া। যে-পার্ট অভিনয় করব, প্রতিমুহূর্তে তার সাদা দিক এবং কালো দিক একত্রে উপস্থিত করতে হবে। এটাও ডায়ালেক্‌টিক্‌স্। এটা আমরা গতকাল আলোচনা করেছিলাম। আবো দেখুন—একটা পার্ট পেলেই অভিনেতা কী করে—মানে কী তাব করা

উচিত? (সব অভিনেতা যে করেন এমন কথা বলা যায় না, করলে আর ভাবনা ছিল কী?) সে চরিত্রটির শ্রেণী বিশ্লেষণ করে, শ্রেণীগত মানুষ হিসাবে চরিত্রটির কীরকম বেশভূষা আচরণ চেহারা হওয়া উচিত তাই সে প্রথমে ঠাহর করে। কিন্তু তার পরেই সে দেখতে পায় চরিত্রটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মিছিল। নাট্যকার যদি বিশেষ নিরেট না হন, তাহলে শ্রেণীচরিত্র ছাড়াও তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরোপ করেন, ব্যক্তিগত ভিন্নতায় পার্টটাকে উজ্জ্বল করেন। গোর্কির সাতিন, চোর-বেকার-ভবঘুরে অথচ দার্শনিক। ওথেলো উঠতি ভেনেশিয় প্রজাতন্ত্রের ভাড়াটে সেনানী, অথচ প্রেমিকশ্রেষ্ঠ। হ্যামলেট এক বন্ধ্যা রাজ্যের রাজকুমার, অথচ সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তাবিদ, প্রতি মুহূর্তে প্রতি চরিত্র শ্রেণীগত অথচ ব্যক্তিগত।

জয়ন্ত। আর উদাহরণের দবকার নেই বাবা। আমি স্টেজে উঠেই হাড়ে হাড়ে ডায়ালেক্‌টিক্ যন্ত্রণা বোধ করি, কারণ আমি শুধু এক মনে জপি কথাগুলো। মুখস্থ আছে কিনা এটাই আমার একমাত্র ধ্যান। অথচ বাইরে দেখাতে হয় আমি কত শান্ত, ধীর, কন্‌ফিডেন্ট।

পবিচালক। অবশ্যই। টেনশন বনাম রিল্যাকসেশন, উত্তেজনা বনাম প্রশান্তি অভিনয়েব ডায়ালেক্‌টিক্‌স্-এর এও এক দিক। বিশ্বের সব মহারথীবা ডায়ালেক্‌টিক্‌স-এব সমস্যা সমাধানে সময় কাটিয়েছেন। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির ঝোঁক পড়ল পার্টে ডুবে যাওয়ার মধ্যে, ব্রেখ্‌ট্-এব পড়ল পার্ট থেকে দূবে সরে আসায়। মায়ারহোলড এবং আজকের গ্রোতোভ্‌স্কি এই দ্বন্দ্বে অস্থির হয়েই অতিবৈপ্লবিক সমাধান হাজির করলেন, তাঁরা যুধ্যমান দুই পক্ষের এক পক্ষকে ঝেঁটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় করতে চাইলেন। তাঁরা থিয়েটারকে পুরোদস্তুর নির্ভেজাল উগ্র থিয়েটারি প্যাঁচ করতে চাইলেন, অন্যদিক অর্থাৎ বাস্তবতার দিককে পদাঘাতে দূর করতে চাইলেন। ভাবলেন তাহলে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না, ডায়ালেক্‌টিকস্-এর টানাপোড়েন শেষ হবে। গর্ডন ক্রেগ চেষ্টা করেছিলেন অভিনেতাকে নিষ্প্রাণ বস্তু বানানো যায় কিনা, মুখ মুখোশে ঢেকে তাকে প্রস্তরমূর্তি বানানো যায় কিনা—জীবন্ত অভিনেতা মানেই হচ্ছে ডায়ালেক্‌টিকাল টাগ-অফ-ওয়ার। সার্কাসের ক্লাউনের মুখ অমন রং করা বলেই মনে হয় তার হাসিটা চিরস্থায়ী, কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব তার নেই। পুরাতন চ্যাপলিনের নানা জয়ে পরাজয়ে মনে হয় রয়েছে এক নির্লিপ্ততা, ঔদাসীন্য, দ্বন্দ্বহীনতা, যা নাকি মানুষকে হাসিয়ে মারে। কিন্তু সত্যি কি তাই? মুখোশের পেছনে যে মানুষ সে তো পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্বসংকুল। জীবন্ত ভাঁড়কে মুখোশ পরালে নূতন ডায়ালেকটিক্‌স্-এব সৃষ্টি হয়—প্রাণবন্ত অভিনেতা বনাম নিষ্প্রাণ মুখ, জীবন বনাম মৃত্যু, চাঞ্চল্য বনাম স্থিতি, সচল বনাম অচল, এই ভীষণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তাই ক্রেগ, মায়ারহোল্‌ড্, গ্রোতোভ্‌স্কির সমাধান কোনো সমাধানই নয়, সমাধান এড়ানো, সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়া। তাঁরা কেউই মার্ক্‌সীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করেননি। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন দ্বন্দ্ব সর্বব্যাপী, অমোঘ, অনিবার্য। সে দ্বন্দ্বকে বন্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস না চালিয়ে তার প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা উচিত। সেই দ্বন্দ্বকেই অভিনেতার কাজে লাগানো উচিত।

জয়ন্ত। এটা বুঝতে পারছি। ধরুন কেউ যদি আমাকে একটা সুতো বাঁধা পুতুলের পার্ট করতে বলে, তাহলে প্রতি সেকেন্ডে আমাতে পুতুলে সংঘর্ষ বাধবে।

ক্ষেত্র। যদিও আপনার অভিনয় দেখে অনেক সময় আমার মনে হয় আপনি পুতুলই।

জয়ন্ত [গায়ে না মেখে]। কিন্তু একটা কথা বোঝান দিকি। বাস্তব জীবনে অবশ্যই মানুষ নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু নাট্যকার যেই তাকে নাটকে ধরলে, সে তো অনড় হয়ে গেল, লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, সুপরিনির্দিষ্ট হয়ে গেল। তার আবার পরিবর্তন কোথায়? ওথেলো কি বছর বছর বদলে যাচ্ছে?

পরিচালক। হ্যাঁ, যাচ্ছে বই কি। আপনার কি ধারণা চারশো বছর আগে ওথেলো যেভাবে অভিনীত হত, আজো তাই হচ্ছে? আপনি জানেন কি শাইলক এককালে ছিল নাটকের ভিলেন, আজ সে হিবো? আপনি কি মনে করেন আজকের বুদ্ধিজীবী হ্যামলেট চিরদিন এমনি ছিল? যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সমাজের সঙ্গে বেড়ে চলেছে, গভীরতর হচ্ছে, বর্তমানকে প্রতিফলিত করছে। সে অর্থে লিপিবদ্ধ নাটকও পরিবর্তনশীল। সে আজকের দর্শক ও আজকের অভিনেতার সান্নিধ্যে এসে আধুনিক হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আপনাদের চিন্তা আড়ষ্ট রয়ে গেছে, গতিশীল ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ আপনাদের হাতে নেই, এটা বোঝা যাচ্ছে। পুরাতন দর্শনের ভিত্তি ছিল অ্যারিস্টট্‌ল-এর সহজ অঙ্ক $x = x$. ক রাশি ক বাশির সমান। মার্ক্‌সীয় দর্শনের মূল হল এই নূতন অঙ্ক x কখনোই x -এর সমান নয়, ক কখনোই ক-এর সমান নয। আপনারা ওই পুবাতন অঙ্কে আটকে আছেন।

বাসুদেব। খেয়েছে। নতুন ফ্যাক্‌ড়া বাধল। ক আব ক সমান নয়?

পরিচালক। কখনোই নয। দুটো লিখে দেখুন। আধুনিকতম মুদ্রণযন্ত্রে দুটো অক্ষব ছেপে দেখুন, শক্তিশালী অণুবীক্ষণের তলায় ফেললেই দেখবেন, দুটি অক্ষর সমান নয। যে কোনো শ্রমিক জানে দুটি হুবহু সমান ইস্ক্রুপ বা সিলিন্ডার তৈরি করা সম্ভবই নয।

সুলেখা। এক সেব চাল এক সের চালের সমান নয?

পবিচালক। নিশ্চয়ই নয! তণ্ডুলকণাগুলো গুনতে শুরু করুন, বিরাট ফারাক বেরুবে। অনেকেব ধারণা এক টাকা সত্যিই এক টাকাব সমান। অর্থনীতির ছাত্র মাত্রেই জানে কথাটা মহা ভুল। টাকার মূল্য অনবরত বদলাচ্ছে। বর্তমানে এক টাকা ইজ ইকোয়াল টু পনেরো পয়সা, যদি না আমি বলতে বলতে আরো পড়ে গিয়ে থাকে।

জয়ন্ত। কিন্তু বিমূর্ত চিন্তা হিসাবে ধরে নিতে পারি তো যে ক আর ক সমান?

পরিচালক। বিমূর্ত? হ্যাঁ, যা বলেছেন—বিমূর্ত। অর্থাৎ কল্পিত এক জগতে আপনি স্রেফ কল্পনাশক্তিতে দুটি সংখ্যা ভাবতে পারেন, যাদের কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু বাস্তব জগতে যার পরিবর্তন নেই, তাব অস্তিত্ব নেই। আপনি অবশ্যই অস্তিত্বহীন ওই সব চিন্তায় আনন্দ পেতে পারেন। ক-এর মূল্য কেন, আপনি আর এক ধাপ এগিয়ে পরিবর্তনহীন চরম বা পরমকে ধ্যান করতে পারেন। শনি পুজোও কবতে পারেন ফুটপাতে। পৃথিবীর কিছুই এসে যাবে না।

সুলেখা। কিন্তু এক সের চালকে এক সের ভাবি বলেই তো কাজ চলছে। কযেক কণা চাল কম হলে ক্ষতি কী?

পবিচালক। সঠিক! চাল কিনতে গেলে দু-এক কণা কমবেশিতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির মতন জটিল প্রক্রিয়ায় ওই কমবেশিটা হয়ে উঠতে পাবে মারাত্মক! ছোট্ট সংখ্যাগত ফারাকে কিছু যায় আসে না, কিন্তু বৃহৎ গুণগত পার্থক্যে গণেশ উলটে যেতে পারে।

জয়ন্ত। অভিনয় করতে গিয়ে যে এমন বিষম কচকচির পাল্লায় পড়তে হবে ভাবিনি।

পবিচালক। অভিনয় যদি সিবিয়াসলি করতে চান, অভিনয়কে যদি আর্ট বলে মনে কবেন, তবে অভ্যস্ত চিন্তার দাসত্ব আগে ঘোচান। অনড আড়ষ্ট গতানুগতিক ধ্যানধারণা ভাঙুন চুরমার করে। বুঝতে পারছেন না মার্ক্সীয় শিল্পচিন্তার বৈপ্লবিক শক্তি? এতদিন সব বস্তু, সব নাটক, সব চরিত্রকে ভেবে এসেছেন স্থিরচিত্র। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ দেখাচ্ছে চলচ্চিত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি আপন কবে নিতে পারেন, তবেই আরো এগুনো যায়, প্রত্যক্ষ বিহার্সালে প্রয়োগ কবা যায় দ্বন্দ্বতত্ত্ব—নইলে একটু গলা ভালো করা যায়, কিংবা হয়তো চলাফেবা আরো ছিমছাম করা যায়, সামান্য অভিনয উন্নত করা যায়, কিন্তু অভিনয়ে গুণগত উন্নতি অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব।

[ঘবে নীববতা থৈ থৈ করছে।]

সেই জন্য বলছিলাম, রোজকাব দেখা ও শোনায ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ প্রয়োগ করুন। দ্বন্দ্বমূলক বিচাবকে স্বভাবে পবিণত ককন। নিজেকে শিক্ষিত করুন প্রতি পদক্ষেপে। সকালে কাগজ পডলেন—ওযাগন ব্রেকাব পুলিশের গুলিতে নিহত। সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরো সামাজিক নক্‌শা আপনাব চোখে ভেসে উঠছে কি? ওই ওয়াগন ব্রেকারেব পেছনে যে ব্যবসাযী চোবাকারবার করছে তার চেহাবা দেখতে পাচ্ছেন? মৃত দস্যুর পরিবাববর্গকে দেখতে পাচ্ছেন? সামাজিক ড্রামাটা ধরতে পাবলেন কি? বাস্তায় দেখলেন ধর্মঘটী শ্রমিকদেব মিছিল। শ্রেণীসংগ্রাম আব শোষণ ছাড়াও একথাও কি একবার আপনার মনে উঁকি দিচ্ছে যে দালাল-ইউনিয়ন অনেক সময মালিকেব মুনাফার স্বার্থে স্ট্রাইক করায, উৎপাদন কমায? ট্রামে ক্লান্ত বিপর্যস্ত বেকার যুবককে দেখে একথা কি মনে হয সামনে বসে আছে সম্ভাব্য খুনি অথবা আত্মঘাতী? গ্রামে পথচলা শীর্ণ চাষিকে দেখে সাবমেশিনগান হাতে গেরিলাকে দেখেন কি? সন্ধের পর পার্ক স্ট্রীটে নেশাগ্রস্ত ধনীর দুলালকে গাডিতে উঠতে দেখেন, কিন্তু তার মধ্যে গণহত্যাকারীকে দেখেন কি? বডোলোক গ্রেপ্তার হয়েছে কালোবাজারির দায়ে--আপনি কি প্রগতিশীল সবকারেব ভালো কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, না খতিযে দেখেন অন্য কোনো বড়োলোকের আদেশে বাজাব থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরাবার ষড়যন্ত্রে বাষ্ট্রযন্ত্র শামিল হযেছে কি না? লেবাননের যুদ্ধ কি সত্যিই মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, না বিপ্লব? চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বকে আপনি বৃহৎ শক্তিদেব রেষারেষি বলে উড়িয়ে দেন, না বোঝেন আপনার দেশের ভবিষ্যৎও জড়িয়ে আছে তার মধ্যে?

জয়ন্ত। অর্থাৎ দৃশ্যমান প্রতি বস্তু পবিবর্তনশীল এবং অন্য সব বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেখামাত্র সেই পরিবর্তন ও সেই যোগাযোগও যেন দেখতে পাই, এই তো?

পরিচালক। হ্যাঁ। শাদা বাংলায়, নাটক আমাদের কাছে একান্তভাবে একটি সামাজিক ক্রিয়া। সমাজপরিবর্তনের প্রেক্ষিতে যদি তাকে ধরতে হয়, তবে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন লক্ষ করার চোখ তৈরি কবতে হয়। উপরন্তু, অভিনেতা নিজেই এক জীবন্ত মানুষ, ক্রমান্বয়ে পবিবর্তনশীল। কোনো দুটো রিহার্সাল কখনোই এক হয় না, হুবহু এক হয় না। হয়?

ক্ষেত্র। অসম্ভব।

পরিচালক। তাই অভিনেতা যদি নিজেকে জানতে চান, তবে ডায়ালেক্‌টিকাল মন তৈরি না করে উপায় কী?

পরিচালক। ক যেহেতু কখনোই ক-এর সমান নয়, সেহেতু রোজ একই অভিনয় করা কখনো সম্ভব নয়। নানাবিধ বিজনেস, চলাফেরা, ওঠাবসা, সব আমি মোটামুটি হুবহু করে যেতে পারি, কিন্তু আমার মানসকে প্রতি সন্ধ্যায় একই মার্গে উন্নীত করার কথা বলাও বাতুলতা। স্তানিস্লাভ্স্কি নানা অনুশীলনে অভিনেতাকে বেঁধে এটাই কবতে চাইছিলেন, শেষ জীবনে এসে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। মার্ক্সবাদী ব্রেখ্ট্ বুঝলেন এটা সম্ভব নয়, তাই সোজা বললেন—এর প্রয়োজনও নেই। অভিনেতার মানসকে যখন প্রতি সন্ধ্যায় জটিল চরিত্রের আঁকাবাঁকা গলিতে ঢোকানো যাচ্ছে না, তখন চরিত্রকে জটিল কবা বন্ধ হোক, গলিপথ ভেঙে প্রশস্ত সব চৌবঙ্গি হোক। দর্শক আলাদা করে দুটো দিক দেখে নিজেই এক করে নেবে। এটাই মহাকাব্যেব ধর্ম, এপিকের বৈশিষ্ট্য। অর্জুন কখনো মহাবীর, কখনো যুদ্ধবিমুখ। কর্ণ কখনো নাবীপীড়ক, কখনো মাতৃস্নেহবঞ্চিত হৃতভাগ্য, কখনো ত্রিভুবনবিজয়ী বীব, কখনো মহত্তম দাতা। এতসব একসঙ্গে দেখাবাব প্রযোজন ব্যাসদেব দেখেননি ; একেক অধ্যাযে কর্ণেব এক এক রূপ। ব্রেখ্ট্ সেই পথেই চলেছেন, তাই তাঁর থিযেটার এপিক থিয়েটার। কিন্তু মার্ক্সবাদী হিসাবে আমবা এ সমাধানে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। এপিক তো কথক ঠাকুর আবৃত্তি কবে শোনান দূরত্ব বজায় রেখে। অভিনেতাকে নিজে কর্ণ হতে হয়। ব্রেখ্ট্ যতই বলুন অভিনেতাকে কথকেব মতনই নিরপেক্ষ হতে হবে, নির্লিপ্ত থাকতে হবে, কার্যক্ষেত্রে তা হয না। আমি স্বচক্ষে দেখে তবে বলছি। হেলেনে ভাইগেলকে প্রতি মুহূর্তে মাদার কারেজেব জটিলতায় ডুব দিতে হয়েছে, একেহার্ড শালকে মোকাবিলা করতে হয়েছে আর্টুরো উই চবিত্রেব নানা উদ্ভট সমস্যা। ব্রেখ্ট্ লিখে রেখে যেতে পাবেন—এখানে মাদার কারেজ ব্যবসায়ী মাত্র, আর এখানে সে মাতা। কিন্তু মঞ্চে গিয়ে হেলেনে ভাইগেলকে ব্যবসাযীব মধ্যেও মাতাকে ধরে রাখতে হয়েছে, নইলে বোধ কবি এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে তিনি যেতে পারতেন না। আচমকা এক ভাব থেকে অন্য ভাবে মঞ্চে যাওয়া যায না। তাই ব্রেখ্ট্-এব হাতে তৈরি শক্তিশালী অভিনেতাবা ব্রেখ্ট্-এব সামনেই ব্রেখটীয় পদ্ধতি লঙ্ঘন কবে এসেছেন বাবংবাব। কেননা ব্রেখ্ট্-এর তত্ত্বে মানুষ কতকটা কৃত্রিমভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, টুকবো টুকরো, কাটা কাটা। মার্ক্সীয় দশনে মানুষকে ওভাবে বিশ্লেষণ করা অবৈধ।

জয়ন্ত। অর্থাৎ ব্রেখ্ট্-এর পদ্ধতিতেও মূল সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে—অভিনেতাব মানসিক অবস্থা। জটিল চবিত্র সৃষ্টি কবতে গেলে অভিনেতার মনের যে স্থৈর্য, একাগ্রতা, প্রশান্তি, তৎপবতা দবকার, সেটা রোজ এক রকম থাকে না।

পরিচালক। সঠিক, কিন্তু থাকা দরকার। রোজ হুবহু এক কখনোই থাকবে না, কিন্তু মোটামুটি এক রাখতেই হবে। (সজোরে) এবং সেটা সম্ভব একমাত্র দ্বন্দ্বতত্ত্বের সচেতন প্রয়োগে, আব কোনো উপায়ে নয়।

সুলেখা। আত্মম্ভরিতা দিয়ে ব্রেখ্ট্-এব বিকল্প দাঁড় করানো যায় না।

পরিচালক। আত্মম্ভরিতা নয়, আত্মপ্রত্যয়। যেহেতু মার্ক্সবাদ সত্য, যেহেতু ডায়ালেক্‌টিক্‌স্

একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সেহেতু আমরা মার্ক্স্‌বাদীরা আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়।

সুলেখা। কী, বলতে চাইছেন কী? আপনার তত্ত্বটা কী?

পরিচালক। অভিনেতাব মানসিক অবস্থাব এমন হেরফেব ঘটে কেন? কারণ প্রথমত, সে সামাজিক-অর্থনৈতিক নানা সমস্যায পীড়িত, এব সমাধান বিপ্লব, সুতরাং এব আলোচনা জরুরি অবস্থা বিধায় এখন মুলতুবি থাক। দ্বিতীয়ত, অভিনেতা মঞ্চে উঠে নানা ছোটোখাটো প্রশ্নে বিভ্রান্ত হন। নিজের স্বাস্থ্য, কণ্ঠ, মুখস্থ বিদ্যা প্রভৃতি তো আছেই, তার ওপব চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটা যে কোন মুহূর্তে আঁকড়ে ধববেন, এটাই তিনি ঠিক করতে পারেন না। বিহার্সালে তিনি চরিত্রের একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিযে দেন। প্রথম দিককার অভিনয়ে তিনি ভয়ে ভয়ে থাকেন, কোনোমতে বিহার্সালের নকশাটাই উপস্থিত করে দিয়ে ঘাম মোছেন। কিন্তু যত অভিনয হতে থাকে, তত তিনি সংলাপগুলো মুঠোর মধ্যে পান, ততই তিনি চরিত্রটাকে 'আরো ভালো' করার অনির্দিষ্ট এক নেশায় মাতেন। তখনই আসে সমস্যা। এটা তিনি বোঝেন যে চবিত্রেব নানা দিক আছে, নানা ঝোঁক আছে। কিন্তু কখন কোনটা কীভাবে দেখাব—এ প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করতে পাবেন না। তখন ক্রোধেব অংশটা আতিশয্যের দিকে ঝোঁকে, প্রেমেব দৃশ্যটা হয বিগলিত, খুনেব দৃশ্যটা হয় অতিশয় হিংস্র। পরেব বাত্রে আবার একটু হেবফের ঘটিযে নিজেব মনে হিসেব করে দেখেন 'আরো ভালো' হল কিনা। কিন্তু 'আরো ভালো' হযনি, হয আরো গোলমেলে, আবো অনিশ্চিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে অতি অভিনয, এটা আপনারা সবাই নিজের অভিজ্ঞতায দেখেছেন আশা কবি।

বাসুদেব। আমাব জীবনে এটা সর্বদা ঘটে। পার্টটা আযত্তে এসে গেলে কোথায় চবিত্রের গভীরে ঢুকব, না চবিত্রটা এবপর ধোঁযাটে হযে যায়। তখন নানাভাবে অভিনয় করে করে দেখি কোন কথাটা কীভাবে বলব।

জযন্ত। এবং বলাব সেই ভঙ্গিটাই ধরি যেটা দর্শকের ভালো লেগেছে বলে মনে হয়।

পরিচালক। অর্থাৎ চবিত্র বিশ্লেষণে কোনটা সঠিক সে বিচাব পরিত্যাগ করে, স্রেফ হাততালি বা হাসি পাবাব উপায খোঁজেন। তাই বলছিলাম, অভিনেতাব দৃষ্টি মূল প্রশ্ন থেকে সবে যায গৌণ প্রশ্নে, চবিত্র থেকে সরে যায দর্শকে। তাই মহৎ সৃষ্টিব অনুকূল মানসিক পরিবেশ সে হাবিযে ফেলে। বোজ কি মানুষের মন এক থাকে?—এ-প্রশ্ন অবান্তব। পেশাদাব অভিনেতা অভিনয কবতে এসেছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, সাবা জীবনেব সাধনা নিয়ে, মনের উড়ু উড়ু ভাব জয করে। মঞ্চ তাঁব কাছে পবিত্র শিল্পসাধনার মন্দিব। নেহাৎ চ্যাংড়া কিছু ফিল্‌মি ছোকরা ছাড়া সকলেই অভিনয়কে সংগ্রামের হাতিয়াব হিসাবে গ্রহণ কবেছেন। তাই পারিবারিক কোনো অশান্তিব জন্য তাঁব মন বিক্ষিপ্ত হয়, বা অর্থনৈতিক কাবণে তিনি উদ্বিগ্ন থাকেন, এসব ভ্রান্ত ধাবণা। আমবা যে অভিনেতাব কথা বলছি তাঁবা সেই প্রতিজ্ঞা নিয়ে থিয়েটারে আসেন যে প্রতিজ্ঞা নিযে কমিউনিস্ট আসেন রাজনীতিতে। ক্যাবাবে মার্কা নাট্য ধর্ষকদের মনে কি হয না হয় আমবা জানি না, জানার দবকার দেখি না। তাঁবা হয়তো সেদিনকার মদ্যপানটা যথেষ্ট হযনি বলে অভিনয়ে মনঃসংযোগ কবতে পারেন না। তাঁবা মনঃসংযোগ করতে না পারলেও নাট্যশালার কিছু এসে যায় না। আমরা যাঁদেব কথা বলছি তাঁরা ১০৩ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে মঞ্চে

নামেন, শ্মশানে পিতার মবদেহ ভস্মীভূত কবে সোজা আসেন নাট্যশালায় হাজিরা দিতে, শিশুকন্যার বোগজর্জর দেহ ঘরে রেখে ছুটে এসে মেকআপ করতে বসেন। আমবা নাট্যযোদ্ধাদেব কথা আলোচনা কবছি। এবং তাঁদেব আদর্শনিষ্ঠ যুদ্ধোদ্যম দেখে আমাব বার বাব মনে হয়েছে, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি, ব্রেখ্‌ট্ ও পিসকাটর অভিনেতা মানসে চাঞ্চল্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা আংশিক সত্য মাত্র। সাবাদিনের ক্লান্তি বা ব্যক্তিগত দুঃখদুর্দশাব জন্য অভিনেতার একাগ্রতা নষ্ট হয, একথা সর্বাংশে সত্য নয়। প্রবল নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শনিষ্ঠাব দ্বাবা এ দুর্বলতাকে জয় করা যায়, নইলে বিশ্বনাট্যশালায় একদিনও ভালো অভিনয় হত না। একদল চিবসুখী সদানন্দ দাম্পত্যসুখভোগী অভিনেতা অভিনেত্রী কোথায় পাওযা যাবে? এ দুনিয়ায় নয়। তাই ওটা কোনো কথা নয। প্রবল দুঃখ থেকেও মহৎ সৃষ্টি হয। প্রবল জ্বালা থেকে গোর্কি বেবিয়ে আসেন, আধপেটা খেযে শেক্‌স্‌পিয়াব লিখেছেন, অনাহারগ্রস্ত শুবের্ট অমব সংগীত সৃষ্টি কবেছেন, ভবঘুবে জ্যাক লন্ডন কালজয়ী ক্ল্যাসিক লিখেছেন। না, দুঃখ দারিদ্র্য কোনো প্রতিবন্ধক নয়—ওযাল্ট হুইটম্যান সামনে দাঁড়িযে আছেন দীর্ঘ ছাযা ফেলে। ব্যক্তিগত দুঃখ ববং অনেক সময মহৎ শিল্পসৃষ্টিব উপাদান হিসেবে প্রমাণিত হযেছে ইতিহাসে।

সুলেখা। নইলে ফাঁসিব আগেব রাত্রে লোবকা কবিতা লেখেন কী কবে? আব জেলখাটা নিঃস্ব অপবাধী জ্যঁ জেনেতে পবিণত হয কী কবে?

বাসুদেব। বিশেষ করে বিপ্লবী লেখক শিল্পীবা তো দাবিদ্র্য ও নির্যাতনকে আলিঙ্গন কবেন সহোদবের মতন। এটাই তো ইতিহাসে দেখছি। জেল, চাবুক, নির্যাতন—এসব তো তাঁদেব মহৎ শিল্পী কবে তোলে—ভিকতর উগো থেকে বেবটোল্‌ট্ ব্রেখ্‌ট্ এই তো চলছে।

পরিচালক। সুতবাং অভিনেতা কোন বিশেষ আদুরে নাড়ুগোপাল এলেন যে ব্যক্তিগত দুর্দশার আঁচ গাযে নিতে পাবেন না? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায ও সুকান্ত কোন রাজভোগ খেযে কলম ধরতেন? নজরুলকে তো আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী করে বাখেনি! মুকুন্দ দাস তো পোলাও খাননি জেলে বসে। না, না। আমার মনে হয় অভিনেতাব সমস্যা অন্যখানে—কোথায় মনোনিবেশ করা হবে এটা স্থির করতে না পেবেই যত বিপত্তি। তিনি বলেন নাটকটা কী বলতে চাইছে, তিনি জানেন নাট্যমধ্যে তাঁর চরিত্রটিব কী ভূমিকা, সব সংলাপ তাঁর মুখস্থ, সব বিজনেস তাঁর নখদর্পণে—কিন্তু দৈনন্দিন অভিনয়ে প্রতি মুহূর্তে এসব তাঁকে সাহায্য করতে পারছে না। এসব তাঁর মজ্জার মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু তাঁব চেতনা, তাঁর মানস কী নিয়ে বস্ত থাকবে এটা তিনি জানেন না, শেখেন না। সচেতন মনটাকে কী দিয়ে ভরে বাখব—এ প্রশ্নেব সমাধান তিনি বলতে পারছেন না। তাই শূন্য চক্ষু মেলে দেন দর্শকেব দিকে।

জয়ন্ত। সমাধানটা কী?

পবিচালক। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্। (অল্প নীববতা)

জয়ন্ত। মানে? পরিষ্কার করে বলুন না ছাই।

পরিচালক। দুটো অভিনয় বা দুটো বিহার্সাল যখন কিছুতেই এক হবার নয, তখন প্রথমেই বলে দেওয়া যায় যে আত্মবিহ্বল অভিনেতাবা বিপজ্জনক মাল। যাঁরা বলেন অভিনয়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া উচিত, তাঁদের হাতে দুই অভিনযের মধ্যেকার ফাবাক কমে আসাব পরিবর্তে বেড়ে

যাবে। একেই যেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থা, সেখানে আবার বিশৃঙ্খল মুড-বিশারদ অভিনেতা এসে চড়াও হলে টালমাটাল কাণ্ড হবে। না! সচেতন সতর্ক অভিনেতাই পারেন অনিবার্য ফাবাকগুলোকে সর্বনিম্ন স্তরে সুসংযত কবে রাখতে। আগের দিন আমরা বলেছিলাম অভিনয় বস্তুটাই ডায়ালেক্‌টিকাল। আপনি মঞ্চে ভুলতে পারেন না আপনি জয়ন্তবাবু। অথচ আপনি হ্যামলেটও বটেন। আপনি একাধারে হ্যামলেট এবং হ্যামলেট নন। সেখানে মঞ্চে এসে আপনি কোন বিষয়ে আপনার সব মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবেন? এতদিন দর্শক কী ভাবল না ভাবল, দর্শক কোথায় হাততালি দিল, এইসবে মনোযোগ অপব্যয় কবেছেন। অর্থাৎ এতদিন মঞ্চে পুবোপুরি জয়ন্তবাবুই থেকেছেন, হ্যামলেট হতে ভুলে গেছেন। হ্যামলেটের দায় পড়েছে দর্শকের মোসাহেবি কবতে! কী করা উচিত ছিল? যদি আমবা ধরে নিই পার্ট আপনাব সম্পূর্ণ বপ্ত, কণ্ঠস্বব নিটোল, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো, সব বিজনেস মুখস্থ, শরীর চলনসই বকমের তৎপব তাহলে মঞ্চে প্রতি মুহূর্তে আপনাব মনোনিবেশ কবা উচিত চরিত্রটিব ডায়ালেক্‌টিক্‌সে। মনে বাখতে হবে পথনাটিকা বা সবাসবি প্রচাবনাটকে এ কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা সেখানে অধিকাংশ চরিত্রেই কোনো দ্বন্দ্ব নেই, ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ নেই। সেখানে চরিত্রবা নানা বাজনৈতিক শক্তিব প্রতীক মাত্র। প্রতীক হিসেবেই তাদেব মঞ্চে আসা প্রয়োজনীয়, জটিলতা সৃষ্টি কবতে গেলে নাটকেব উদ্দেশ্যই যাবে ভণ্ডুল হয়ে। কিন্তু গভীবতর নাটকে চবিত্রদেব দ্বৈত সত্তা থাকতে বাধ্য, তাই পার্ট-টার্ট বপ্ত হয়ে গেলেই অভিনেতার পূর্ণ অখণ্ড মনোযোগ চবিত্রেব দ্বিত্ব, দ্বন্দ্ব, বৈপবীত্যের ওপব কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মুহূর্তে, সচেতনভাবে, মুডফুড চুলোয যাক—

সুলেখা। কেমন? ঠিক বুঝতে পারছি না।

পবিচালক। জয়ন্তবাবু আপনি 'গাংচিল' নাটকেব প্রথম দৃশ্যে কিশোবেব সেই অংশটা বলুন, যেখানে সে বেগে নাটকটাব অভিনয় বন্ধ কবে দিল।

জয়ন্ত। এতদিন যেভাবে বলেছি? তাই বলব?

পবিচালক। আমরা দর্শক, স্টেজে যেমন বলবেন ভাবছেন তেমনি বলুন।

জয়ন্ত [একটু চিন্তা করে নিয়ে]। 'না, পর্দা ফেলে দাও। এখানে নাটক বোঝে এমন কেউ নেই। এখানে যাঁরা বসে আছেন তাঁবা শুধু নিজেদেব ভালোবাসেন, আর স্বার্থপর মানুষ শিল্প বোঝে না। নাটক বন্ধ। হবে না—নাটক হবে না।'

(কিশোরবেশী জয়ন্ত যেন ছুটে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায।)

পবিচালক। ফিরে আসুন, ফিরে আসুন।

(জয়ন্তর পুনঃপ্রবেশ)

জয়ন্ত। কেমন হল?

পবিচালক। জঘন্য। আপনি কী করলেন?

জয়ন্ত। ক্রোধে কম্পমান হলাম, চেঁচালাম।

পরিচালক। কেননা ক্রোধ হলেই লোকে চেঁচায়—এই আপনার ধারণা।

জয়ন্ত। দর্শকের তাই ধারণা!

পরিচালক। দর্শকেব সেটাই কুসংস্কার এবং আপনি নিজের চবিত্র ছেড়ে দর্শকের অতি মামুলি প্রত্যাশা পূরণ কবতে লেগেছেন। এই হয়। মঞ্চে এটাই ঘটে। পার্টটা আয়ত্তে এসে গেলেই কোনোমতে দর্শকের মনোরঞ্জনেব দিকে অভিনেতা ঝোঁকে। অথচ আপনার বোঝা উচিত ছিল ক্রোধ মানেই উচ্চকণ্ঠ নয়। দৈনন্দিন জীবনে ট্রামে টিকিট কাটা নিয়ে যে ক্রোধ তাতে হয়তো চেঁচামেচিটাই প্রধান হয়। কিন্তু চেকভে সেটা প্রযোজ্য নয়। চেকভ ক্রোধের অনেক গভীরতব বিশ্লেষণে গেছেন। দর্শকের প্রাথমিক প্রত্যাশা পূবণ না কবে ক্রোধের এই বিচিত্র জটিল চেহারা সম্পর্কে তার ঔৎসুক্য জাগ্রত করা ছিল আপনাব প্রাথমিক কর্তব্য। সেই জন্যেই দর্শক চেকভ দেখতে এসেছে, আবেগেব সূক্ষ্মতাব স্বরূপ বুঝতে এসেছে, মানবমনের নানা চোবাগলিব মানচিত্র দেখতে এসেছে। এবং এটা আপনি দর্শককে উপহাব দিতে পাবতেন যদি কিশোব চরিত্রেব দ্বিত্ব, তাব দ্বন্দ্ব, তাব ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

জয়ন্ত। অর্থাৎ?

পরিচালক। এই মুহূর্তে কিশোবেব অন্তবটা কুরু-পাণ্ডবেব কুরুক্ষেত্র। আপনি বলছেন সে ক্রুদ্ধ। কার ওপর ক্রুদ্ধ?

জয়ন্ত। মায়েব প্রতি।

পরিচালক। কেন?

জয়ন্ত। কেননা মা বারংবাব চেঁচিয়ে নাটকটির সমালোচনা কবছিলেন।

পরিচালক। সেটাই শেষ কথা নয়। কিশোব জানে নাটকটি খাবাপ হয়নি। সে জানে মায়েব সমালোচনা সৎ নয়। সে অনুভব কবছে মায়েব তীব্র ভর্ৎসনা আসছে ঈর্ষা থেকে। তাই সে বলছে : 'এখানে যাঁবা বসে আছেন তাঁবা শুধু নিজেদের ভালোবাসেন।' এখানে বহুবচন শুধু লৌকিকতাব খাতিরে, আসলে একমাত্র লক্ষ্য কিশোবের মা। এখানে আপনাব বিজনেসেরও ভুল ছিল। আপনাব চোখ ঘুবে বেড়াচ্ছিল সব অতিথিব মুখ থেকে মুখে। আপনি আক্ষরিক অর্থে লাইনটা ধবেছেন, অন্তর্নিহিত অর্থে যাননি। প্রতি লাইনেবও তো ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ আছে। বড়ো নাট্যকারেব সংলাপ অনেক সময় বিপরীত অর্থেব বাহক। প্রকাশিতটা শুধু অপ্রকাশ্যেব ইঙ্গিত। কিশোব আসলে বলছে কোনো মা যে নিজেব পেটের ছেলেব প্রতি এমন নীচ স্বার্থসর্বস্ব ঈর্ষা দেখাতে পাবে তা আমাব জানা ছিল না। সুতবাং কিশোব এখানে এক যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে ভালোবাসা ও ঘৃণা পব স্পবেব সঙ্গে অসিক্রীড়ায মত্ত। সুতরাং ক্রোধ এখানে বহুলাংশে অভিমান। সুতরাং জয়ন্তবাবু এ ক্রোধ কি চিৎকারে ফেটে পড়বে?

সুলেখা। আমাব মনে হয় এখানে কিশোবেব কথাগুলো আসলে কান্না।

বাসুদেব। আমারো এখন মনে হচ্ছে। চাপা ক্রন্দনের মতন কথাগুলো বুকেব পাঁজর ভেঙে বেরুনো উচিত।

জয়ন্ত (সহসা)। এবং ওই শেষ কালেব ওই 'নাটক বন্ধ! হবে না—নাটক হবে না' কথাগুলোও এমনভাবে বলা উচিত যাতে . যাতে মনে হয়, মানে কিশোব আসলে বলছে 'আমাব বেঁচে থাকাব আর কোনো মানে হয় না।'

পরিচালক। চমৎকার। অভিমান চিরদিন আত্মঘাতী। অপরকে আঘাত কবাব চেয়ে নিজেকে

আঘাত হানতেই সে ভালোবাসে। তাহলে জয়ন্তবাবু, আপনি যদি দর্শককে চমকিত কবাব লোভ সংবরণ করে চরিত্রের ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌-এ মনোনিবেশ করতেন, তাহলে দর্শক আরো চমকিত হত। এটা আবার দর্শকেব ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌। আপনি যত দর্শককে ভুলবেন তত সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। যত আপনি চরিত্রের গভীবে যাবেন তত দর্শক মানবচবিত্রের নূতন দিগন্ত দেখতে পেযে শিহরিত হবে। অন্যথায় আপনি যদি দর্শককে লক্ষ্য কবে অভিনয় ফাঁদেন তাহলে, অনিবার্যভাবে আপনি চরিত্রটাকে শাদামাটা সহজবোধ্য অধিকাংশ দর্শকের বোধগম্য করার খেলায় মাতবেন। তাতে অধিকাংশের আশীর্বাদ পাবেন না, পাবেন ধিক্কার। কারণ কিশোরকে দেখে তাঁরা নূতন কিছুই পাবেন না, মানুষকে নূতন করে চিনবেন না, দৈনন্দিন জীবনে যা দেখছেন তাব অতিবিক্ত কোনো অভিজ্ঞতা তাঁরা পাবেন না। এককথায় শিল্পী হিসেবে আপনি কর্তব্যচ্যুত হবেন।

জয়ন্ত। আজকে যা বুঝলাম তাব সাবমর্ম এই—প্রথমেই যা মাথায় আসে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল। বাগলেই চেঁচাতে হয়, ভালোবাসলেই কণ্ঠ কোমল হয, হাসিব কথা কইতে গেলেই মুখ ভ্যাঙাতে হয় এসব হচ্ছে নিরেট আক্ষরিকতা, অবভিয়াস বিজনেস, যা শিল্প হতে পাবে না।

পবিচালক। সঠিক। চরিত্রের গভীরে যদি অনবরত ঢোকার চেষ্টা কবি, তাবপব দেখব সচরাচব দেখা পূর্বনির্ধারিত কোনো ছকে মানুষকে বাঁধাই যাচ্ছে না। হ্যামলেট ওফিলিযাকে ভালোবাসেন বলেই তাকে কুৎসিত ভাষায অপমান কবেন—কথাটা শুনতে বিচিত্র শোনাচ্ছে না? নিবেট অভিনেতাব কাছে তাই শোনাবে, ভালো অভিনেতা কথাটা শুনেই উদ্বুদ্ধ হবেন। ওথেলো ডেসডেমোনাকে হত্যা কবেন, কেননা তিনি তাঁকে ভালোবাসেন—মানবচবিত্রেব বিশ্বজযী বিশেষজ্ঞ এভাবেই সমস্যাটা এনেছেন। এখন বিশ্বনাট্যশালায যে চিবাচরিত বিতর্ক—দর্শককে ভুলব, না দর্শকের সঙ্গে কথা কইব?—আমরা বিতর্কেব অর্থই বুঝতে পারি না। দর্শককে ভুলবও না, আবাব দর্শকেব সঙ্গে কথাও কইব না—এটাই তো ডাযালেক্‌টিকাল সমাধান। থিয়েটার এমন স্থান যেখানে দর্শক থেকে যত দূবে যাব ততই তাব কাছে আসব। আমি যত হ্যামলেটেব অবিশ্বাস্য দ্বন্দ্বেব মধ্যে ঢুকব, তত দর্শক সেটা বিশ্বাস করবেন। আমি যত ওথেলোর জটিল সমস্যায় অবগাহন কবব, দর্শক ততই মানব মনেব দুর্জ্ঞেয় বহস্যে আকৃষ্ট হবেন। পার্টে ডুবে যাও, ওসব ছেঁদো কথা এখানে হচ্ছে না। আমবা বলছি সচেতনভাবে চবিত্রের ডাযালেক্‌টিক্‌স্‌ বিচাবে প্রবৃত্ত হও। প্রতি মুহূর্তে অভিনেতাব মনকে সুদৃঢ়ভাবে বেঁধে বাখতে হবে চবিত্রেব দ্বন্দ্বে। কিশোরের ওই অংশে ফিরে যাই। একই সঙ্গে ক্রোধ ও ভালোবাসাকে উপস্থিত করতে হবে, যাব যোগফলকে আমবা বাংলায বলে থাকি অভিমান। এখন দুটো অভিনয যখন কিছুতেই হুবহু এক হতে পাবে না, তখন ওই অভিমানের চেহাবাও প্রতি সন্ধ্যায় হুবহু এক হবে না। কোনোদিন ক্রোধের অংশ কিঞ্চিৎ বেশি হয়ে যাবে, কোনোদিন বা ভালোবাসার অংশ। কিন্তু এই দুই আবেগেব আনুপাতিক ভাবসাম্য বজায বাখা একটা হোলটাইম জব। কখনো ভালোবাসাবর্জিত বিশুদ্ধ ক্রোধ যাতে ফেটে না পড়ে, বা ক্রোধ-বর্জিত নিছক ভালোবাসা যেন ঝরে না পড়ে এই প্রয়াসে নিরন্তব লিপ্ত থাকতে হবে অভিনেতাকে।

এইদিকে তার একাগ্র অখণ্ড মনোযোগ নিযুক্ত হোক। এর পরের দৃশ্যে আবার অন্য সমস্যা—প্রেয়সীকে ভালোবেসে কিশোর মা-কে আঘাত করতে চাইছে, আবার মা-কে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বলে প্রেয়সীকে সহ্য করতে পারছে না, আবার ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌। প্রেমালাপের প্রতি ছত্রের পেছনে আবার এই আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্ব। 'ভালোবাসি' বলার পেছনে 'ঘৃণা করি'র আভাস। এই দ্বন্দ্বের চরম সমাধান রিহার্সালেই করে ফেলবে এমন অভিনেতা পৃথিবীতে নেই। প্রতি সন্ধ্যায় প্রত্যেক অভিনয়ে নূতন করে দুই বিপরীত আবেগ একত্রে সৃষ্টির খেলায় মাততে হবে অভিনেতাকে। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ প্রয়োগ করে যে অভিনেতা সে প্রতি সন্ধ্যায় নূতন সৃষ্টি করে, কখনো ভালোবাসার আধিক্য হয়ে যায়, কখনো বা বৃদ্ধি পায় ঘৃণার তীব্রতা। কিন্তু নির্জলা ভালোবাসা বা নির্জলা ঘৃণা দেখিয়ে খেলো অভিনয় সে করে না কখনো। তাই অভিনেতার যাবতীয় প্যাঁচ পয়জার দর্শককে লক্ষ্য করে পেশাদারি খেল দেখিয়ে হাততালি পাওয়ার অপচেষ্টা। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌-এ নিবদ্ধ মনের সময়ই থাকবে না ওসব ভাববার। তাহলে বন্ধ হবে অভিনেতার শূন্য মনে ঘুরে বেড়ানো, যেটা ক্লান্ত অভিনেতার জীবনে প্রায়ই ঘটে। আনমনা অভিনেতা কণ্ঠস্থ সংলাপ বলে চলেন কিছু না ভেবে, সব চলাফেরার নির্দেশ পালন করে চলেন যান্ত্রিকভাবে। ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ বিশ্লেষণে নিমগ্ন অভিনেতার মনটা থাকবে ভরপুর, টইটম্বুর। ফাঁকি দেওয়া পার্ট-আওড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর প্রতি কথা প্রতি অঙ্গসঞ্চালনের পেছনে থাকবে নানা বিপরীতমুখী আবেগের সংঘাত, সুতরাং বলা এবং চলা দুই-ই প্রতি মুহূর্তে হবে রসঘন।

ক্যাবারে নাট্য

রামকৃষ্ণদেবের ছবিটি ঠিকই ঝুলছে। তার সামনে ধূপধুনো ফুল রয়েছে যথারীতি। চন্দনের প্রলেপে ঠাকুরের পায়ের পাতাদুটো ঢাকা পড়ে গেছে। তাকে সাক্ষী রেখে কড়া হলুদ আলোয় মেয়েটি একে একে খুলে ফেলছে দেহের বাস, অন্তর্বাস এবং একেক ঝাঁকুনিতে মেলে ধরতে চাইছে বাহু, উরু এবং তলপেটের নানা লোমহর্ষক খাঁজ। দর্শকরা করতালি দিলেন, বাহবা দিচ্ছেন। মিস গ্রীন চলে গেলেন সাজঘরে। রামকৃষ্ণদেব নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বাংলা নাটকের এই সর্বশেষ জয়ের দিকে।

এই পর্যন্ত দেখে আমরা দুই বন্ধু গলির কর্দমে, দুটো অলস মহিষকে কাটিয়ে দ্রুত এগোলাম ট্রাম-রাস্তার দিকে। ওই নাট্যশালায় এক বর্ষার সন্ধ্যায় দেখতে এসেছিলাম শিশিরকুমারের নিমচাঁদ। সেদিনও রামকৃষ্ণদেব একই ভাবে হাসছিলেন, মনের ভাব বুঝতে দেননি কাউকে।

হাঁটতে হাঁটতে বন্ধু বলছিলেন, 'এই নাট্যশালার মালিকরা একদিন গিরিশচন্দ্রের নামের আড়ালে নাট্যোন্নয়নের বাজার বসিয়েছিলেন। তখন যাবতীয় পত্রপত্রিকা এবং জনাপঞ্চাশেক অধ্যাপক ও লেখক মালিকদেরকে বাংলা নাটকের বেসরকারি জনক বলে অভিহিত করেছিলেন। আজ মিস গ্রীন তাদের সকলের চোয়ালে নৃত্যরত পদের একেকটি আপারকাট ঝেড়ে দিয়েছেন। তখন ওই সব পত্রপত্রিকা ও বেসরকারি জনকের সরকারি সন্তানগণ একযোগে গাল পাড়তেন গণনাট্য দলগুলিকে। গাল পাড়তেন মিনার্ভা থিয়েটারকে যেখানে 'কল্লোল' নাটক চলছিল। তাঁরা তখন 'প্রমাণ' করে দিয়েছিলেন 'কল্লোল' নাটক অশ্লীল, কারণ নাটকের নায়করা নাবিক এবং তারা কিছু কড়া কথা ব্যবহার করতেন। আজকে শিশিরবাবুর মঞ্চে নারীদেহকে প্রত্যক্ষ পণ্য রূপে প্রকাশিত হতে দেখে তাঁরা বোধ করি আবার 'প্রমাণ' করে দেবেন যে বস্তুটি খুবই শ্লীল। তাঁরা অনায়াসে বুঝিয়ে দেবেন যে এই গিরিশ, শিশিরের ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার—ওই উলঙ্গ মেয়েটি। তাঁরা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে খোলসা করে দেখাবেন যে ওই হলুদবর্ণ নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকট হচ্ছে জনা, উদিপুরি ও চিত্রাঙ্গদা। আমাদের গিলিয়ে ছাড়বেন এই বৈপ্লবিক তত্ত্ব যে বাংলা নাটক গোড়া থেকে এই লক্ষ্যপথেই এগুচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ এই চাইছিলেন করতে পারেননি, আজ অভিনব ও জগতে প্রথম 'বিশ্বস্কোপ' প্রণালী প্রয়োগে বাংলা নাটক মিস গ্রীনের স্পন্দিত উরুদেশে পৌঁছে সার্থক হয়েছে, সিদ্ধিলাভ করেছে।

এরপর আমরা ক্রমান্বয়ে আরো কটি নাট্যশালায় মিস ব্রাউন, মিস ব্ল্যাক, ও মিস হোয়াইটের রবীন্দ্রজয়ী নাট্যপ্রতিভা প্রত্যক্ষ করলাম এবং সর্বত্রই দেখলাম ঠাকুরের প্রশান্ত মুখের সামনে প্রভাদেবীর নগ্ন উত্তরসূরীরা আখাম্বা ঠ্যাং ছুঁড়ে দিচ্ছেন। বোধ করি নমস্কার জানাচ্ছেন।

এই রকম নাট্যপ্রতিভার তাড়নায় আমরা আবার রাস্তায় ছিটকে পড়লাম, এবং বন্ধু বললেন, 'দেখ, আমি পাষণ্ড নাস্তিক, ধর্মের নাম শুনলে আমার গা জ্বলে যায়! কিন্তু ঠাকুরের ছবির সামনে

এমন বেলেল্লাপনা আমি করতে পারতাম না, মরে গেলেও না। কিন্তু যাঁরা নগ্ন নারী নাচাচ্ছেন তাঁরা ঘোর ধার্মিক। তাঁরা ঠাকুরের চিত্রেব সামনে, কৃতাঞ্জলিপুটে একবার আত্মসমর্পণ না করে মঞ্চে ওঠেন না। তাহলে এইসব ল্যাংটো নাচ বোধহয় জমিদারের বাগানবাড়ির ঐতিহ্য নয়। তান্ত্রিক কোনো কুমারী পুজো-টুজো হবে। এঁরা বোধহয় অবলীলাক্রমে মায়ের চিতা থেকে সিগারেট ধরাতে পারেন। পাড়ার মাস্তান যেমন শনিপুজো করে মাতাল হয়ে।'

একটু নীরবে হেঁটে বন্ধু আবার বললেন, 'ধর্ম খুব জটিল ব্যাপার, বুঝতে পারি না। উনিশ শতকে সমাচার-চন্দ্রিকা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হিন্দুয়ানি ত্যাগের হুজুগ দেখে লিখেছিল, ভালো, ইহাতে যদি সাহেবেরা খুশি হইয়া চাকুরি দিত তাহা হইলেও বুঝিতাম, কিন্তু সাহেবলোক ইহাদের সহ্য করে না। এই ধরনের কথা। মানে চাকুরি পাওয়া গেলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ কর, আমাদের আপত্তি নেই। চাকুরিও হইল না জাতও গেল—এই ব্যাপারেই আপত্তি। এইরকম নিরেট হিসেবেব খাতাবন্ধ ধর্ম বর্তমানে এইসব নাট্যমালিকদের ভর করেছে। বামকৃষ্ণকে শিখণ্ডী রেখে এঁরা হিসেবের খাতা খুলেছেন।'

আমি বললাম, 'ওদের দিকটাও বোঝো। ওঁরা বলেন, লোকে ওসব চায়, তাই ওঁরা দেন।'

বন্ধু উত্তর করলেন, 'জানো, লোকে অনেক কিছুই চাইতে পাবে। চাইলেই দিতে হবে এমন মুচলেকা লিখে কেউ শিল্পের জগতে আসে না। অনেক লোক আফিম চায়। সঙ্গে সঙ্গে সেটা যারা সাপ্লাই করতে এগিয়ে আসেন, তাদের বলে আফিমের ব্যবসায়ী, সে-ব্যবসায়ীরা কখনো নিজেদের নূতন কোনো 'স্কোপের' স্রষ্টা বলে জাহির করেন না। আরেক দল আছেন যাঁদের বিদেশি জিনিস পছন্দ , যাঁবা জোগান দেন তাঁদের বলে স্মাগলার, নাট্যাচার্য নয়। এক বৃহৎ জনসমষ্টি নিষিদ্ধ নারীদেহ কামনা করেন, যাঁরা তৎক্ষণাৎ সে চাহিদা মেটাতে ব্যবসায়ে নামেন তাঁদের বলে পিম্‌প্‌ বা দালাল , কখনো তাদেব শিল্পী বলে না। লোকে চাইছে সুতরাং দিতে হবে এ যুক্তি পিম্‌পের যুক্তি। শিল্পী একথা বললে বিশ্বে হাস্যরোল ওঠে। এ যুক্তি মানলে রবীন্দ্রনাথ বটতলার উপন্যাস লিখতেন, অবনীন্দ্রনাথ আঁকতেন চৌরঙ্গির মোড়ে বিক্রি করার যৌন চিত্রাবলি, শিশিব ভাদুড়ি মঞ্চস্থ করতেন ফরাসি ফোলি বেজের ধরনেব নগ্ন নারীব অঙ্গভঙ্গি, আর উদয়শঙ্কর—তাণ্ডব নৃত্য কল্পনা করতেন পার্বতীর বসন বাদ দিয়ে। লোকে যা চায় তাই দেবার জন্য নাট্যশিল্পের উদ্ভব হয়নি। শিল্পীর দায়িত্ব থাকে সমাজেব প্রতি, তার মানসিক স্বাস্থ্যেব প্রতি। সেটা যে পালন করে না তাকে তো স্মাগলার বা পিম্‌পের মতোই কোমরে দড়ি দিয়ে হাজতে নিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে সে অধিক দিন নাট্য ব্যভিচার চালাতে না পারে।'

একটি চায়ের দোকানে ঢুকলাম আমরা, কড়া চায়ে যদি কলকাতার পেশাদার নাটকের স্বাদটা মুখ থেকে দূর করা যায়। বন্ধু বললেন, 'আসলে এই নাট্যপিম্‌প্‌রা একটা বৃহত্তর ছকের অংশ। ধবো যে সব গল্প আজকাল ছাপা হয়, তার অনেকগুলিই আমি শেষ করতে পারি না। আঁতকে উঠে পত্রিকাটা আছড়ে ফেলি মেঝেয়। যুক্তাক্ষরবর্জিত এরকম অশিক্ষিত বাংলায়—যাকে ওঁরা বলছেন 'ঝরঝরে', সেই সদ্যসাক্ষর মধ্যবিত্তের জন্য আবিষ্কৃত আধো-আধো ভাষায় লেখক শুধু হাঁসফাঁস করেন কতক্ষণে নায়ক ও নায়িকাকে বেআব্রু করে দৈহিক

নৈকট্যে আনবেন। ডি এইচ লরেনস এক কবিতায় হ্যামলেট নাটককে আক্রমণ-সূত্রে বলেছিলেন, অন্যের অগম্যাগমনের বর্ণনার চেয়ে ক্লান্তিকর কিছু আমার কাছে নেই। আমাদের নব্য লেখকদের এক বৃহদংশ অনবরত সেই বর্ণনায় মগ্ন হয়ে থাকছেন—মানে যখন বঙ্কিমকে গাল না পাড়ছেন, বা সোলজেনিৎসিনের দুঃখে অশ্রুমোচন না করছেন।'

আমি পুনরায় অন্য মতের মর্যাদা রক্ষার্থে বললাম, 'নারীপুরুষের মিলন একটা সত্য। তাকে রূপ দিতে হবে না? লরেনস যাই বলুন না কেন—ধরো হেমিংওয়ে যখন—'

বন্ধু চায়ের পেয়ালাটা ঠক করে টেবিলে স্থাপন করে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'হেমিংওয়ে যখন রবার্ট জর্ডান ও মারিয়ার অভিসারের কাহিনী লেখেন—সেই যখন বস্ত্রের রুক্ষতার পরিবর্তে সান্নিধ্যে আসে মসৃন শীতল ত্বক, এটা হেমিংওয়ের ভাষা—মিলনেব বৃহত্তর দিকটা, সত্য দিকটা, সৃষ্টির দিকটা বড়ো হয়ে ওঠে. যৌন উত্তেজনাটা পায় প্রাকৃতিক শক্তি, একটা কালবোশেখির মতন সে এসে জীর্ণ পুরাতনকে উডিয়ে নিয়ে যায়। কোথায় সেই আসন্ন নূতনের ইঙ্গিত আমাদের নব্য সাহিত্যে? দু-একজনকে বাদ দিলে সবাই নাবীপুরুষের মিলনে দেখেন শুধু কামনা। আগামীর বীজ যে বপন হচ্ছে, সে-মিলন যে সৃষ্টিব আশ্চর্য প্রক্রিয়া, কোথায় এমন ইঙ্গিত? গোর ভিডাল সমকামীদেব সঙ্গম বর্ণনাতেও যেভাবে দুলে-যাওয়া নক্ষত্রখচিত আকাশেব প্রেরণাময় ছবি আঁকেন, কই তার ধাবে কাছে যায় এমন কিছু তো চোখে পড়ছে না। অবশ্য আমি পণ্ডিত নই, যথেষ্ট পড়িনি। তবে আমার মনে হয় বাংলার নবীন লেখকগণ গুরু ঠাউরেছেন আর্ভিং ওয়ালেসেব মতন তৃতীয় শ্রেণীর কোনো ব্যবসায়ীকে, যাঁরা পাঠক যা চায় তাই দেওয়ার নাম কবে সাহিত্যে স্মাগলিং এনে ফেলেছেন। দেখছ? এক্ষেত্রে নাট্যশালাব নগ্ন নারীব পৃষ্ঠপোষক ওই মালিকরা এবং শয্যার কামড়াকামড়ির ব্যাখ্যাতা ওই লেখকরা একই কাজ করে যাচ্ছেন।'

এক চুমুক চা খেয়ে বন্ধু বলে চললেন, 'আবাব দেখ ধনীর দুলালদের এবং তাদের মধ্যবিত্ত আশ্রিতদের যে-হারে গাঁজা, এল-এস-ডি, হশীশ সাপ্লাই করা হচ্ছে, সেটিও এই ক্যাবারেসংকুল নাটক ও রমণসংকুল সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তেমনি আমি মনে করি, অকস্মাৎ ফুটপাথে ফুটপাথে ভীষণ প্রাযবিস্মৃত সব দেবদেবীকে সবলে ফিবিয়ে আনার শহরব্যাপী প্রয়াসটাও এই ছকের একটি কোণ। বিজ্ঞান থেকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে কাবা যেন। ওলাউঠার চিকিৎসা হচ্ছে ওলাইচণ্ডীর পুজো। বসন্তের প্রতিষেধক টিকা নয়, শীতলা মায়ের তুষ্টিসাধন। বেকারি, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ অনাহারের সমাধান শনিপুজোয়। পচে গেছে! এ সমাজব্যবস্থা একটা শবদেহ। দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে এখন। নিষ্কর্মা ধনী যুবকরা বোরড হয়ে খুঁজছে বিকৃত উত্তেজনা, আর হতাশ মধ্যবিত্ত খুঁজছে কোনো প্রাগৈতিহাসিক দেবতা যার কৃষ্ণবর্ণ পদযুগলে শান্তি পাওয়া যাবে। এইসব বিকৃত চাহিদা মেটাবার জন্যে পিম্‌প্‌রা প্রস্তুত আছেন—ওই ক্যাবারে নাট্যেব ব্যাপারি, যৌনকাহিনীর পাটোয়ারি, মদ ও গাঁজার দোকানি এবং ফুটপাথের মন্দিরের উপাসক। ভারতীয় পুঁজিপতি শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে চিরদিনই ষণ্ড বিশেষ। সে বিশ্ব পুঁজিবাদের দরবারে উপহাসের বস্তু, কারণ স্টারডাস্ট বা ওই-ধবনের চলচ্চিত্রাভিনেতাদেব যৌন-লীলা-সংক্রান্ত পত্রিকার চেয়ে গভীর কিছু সে পড়তে পারে না,

তার মাথা ধরে। আব মধ্যবিত্ত যুবকের দল বোধ করি খুঁজছে একটু আশা, একটু স্তোকবাক্য। আজকেব দিনটা কেমন যাবে, কী বাশি তোর, যাই কালীবাড়ি গিয়ে দেখি। বোথ দীজ ক্লাসেস আর ডাইং! বাঁচবার আশা যখন আর থাকে না, শাসকের দণ্ডটাকে যখন মনে হয় যমরাজের গদা, বিকল্প যখন আর থাকে না—তখন মধ্যবিত্তেব অসুস্থ চাওযাটাকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে যাঁরা পযসা কামান, সভ্যদেশে তাদেব বলে ক্রিমিনাল।'

একটু পরে বন্ধু বললেন, 'সমগ্র চিত্রটা অবশ্যই এই নয়। শ্রমিক-কৃষক যুবকদের এসব মৃত্যুকালীন সমস্যা নেই। এসব দেশের ক্ষুদ্রতম এক ভগ্নাংশেব আকুলিবিকুলি। কিন্তু পত্রিকা পড়, দেখবে বড় অক্ষরে প্রতিবেদন—যুবশক্তি গাঁজার প্রভাবে হীনবল, যুবশক্তি বিপথে যাচ্ছে, ছাত্রদের মধ্যে মদ্যপান বৃদ্ধি। যেন মধ্যবিত্ত যুবকই হচ্ছে দেশের মোট যুব। পেশাদার থিয়েটাবে যাও—দেখবে মধ্যবিত্ত পরিবাবের বৃহন্নলা ক্রন্দন হচ্ছে নাট্যকাহিনী, নগ্ননৃত্যেব ফাঁকে ফাঁকে। সাপ্তাহিক খুলে গল্প পড়—মধ্যবিত্তের মেয়ে অফিস যাচ্ছে, ব্লাউস ঘামে ভিজে গেছে, মধ্যবিত্ত স্বামী পঙ্গু, তাব জন্য ফল কিনে ফেরার পথে সাহেব লিফট দিল গাড়িতে এবং অবশ্যই মেয়েটির সতীত্ব নিয়ে খানিক টানাহেঁচড়া হবে। সব ঘুরপাক খাচ্ছে কববখানার মধ্যে, মধ্যবিত্তদের গলিত মৃতদেহের চাবদিকে। ওদের কাছে মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কোনো শ্রেণী নেই।'

প্রসঙ্গটা ক্রমশ শ্যামবাজাবেব নাট্যশালা ছেড়ে দূরে উধাও হচ্ছে দেখে আমি বললাম, 'বুঝলাম, বুঝলাম। কিন্তু গিরিশচন্দ্র, শিশিবকুমাবেব নাট্যশালায় নগ্ন নারীর নৃত্য—এ তো অতি আধুনিক এক প্রক্ষেপণ। এর সুযোগ, এত সাহস, ওই পাটোযারিরা পেল কোত্থেকে?'

হা হা করে হেসে উঠলেন বন্ধু। 'বিকল্পটাকে যে হাতে এবং ভাতে মেবে ভিটে ছাড়া কবে দিয়েছেন বাবুরা,' বললেন বন্ধু, 'এখন আব বাংলা নাটকেব দুর্দশায় কেঁদে ভাসালে কী হবে? এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? ম্যাগসেসে পুবস্কাব এসে শম্ভু মিত্রকে নিয়ে নাট্যশালা খোলাব সুযোগ দেয, নইলে অধ্যাপনা করতে কবতে তিনি স্রষ্টা হিসেবে শুকিযে যেতেন—এটা আমাদেব লজ্জা নয়? গুণ্ডাব সংঘবদ্ধ আক্রমণে নাটক পণ্ড হয়, বাস্তাব ওপব অভিনেতাবা লগুডাহত, চপেটাহত হন, গণনাট্য সংঘেব অফিস পুড়ে ছাই হয, নাট্যনির্দেশককে ফুটন্ত জলে চোবানো হয়—এমনকী রাষ্ট্রদ্রোহিতাব দাযে আদালতে আসে নাটক, কাবণ তাতে ক্যাবারে নেই, আছে বাস্তব কলিকাতার চেহারা। তাতেও নিষ্কৃতি নেই—মঞ্চের ভাড়া, বিজ্ঞাপনের ঊর্ধ্বমুখী হার, লজ্জাকব পৌবকর—স্মর্তব্য, কলিকাতার পুরসভা আজ পর্যন্ত কলিকাতার স্বাস্থ্যের জন্য যা করেছেন নাটকেব জন্য কবেছেন তার চেয়েও কম, অর্থাৎ বৃহৎ অবিমিশ্র একটি শূন্য—এই সব ব্যয়ভাব চাপিয়ে গণনাট্যকে একেবারে পিষে মারা যায কিনা তার গবেষণা চলছে উচ্চমহলে, যাতে ওই ক্যাবারে-মার্কা ব্যভিচাব চলতে পারে বিনা প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতাটা তীব্র কিনা। কর-ব্যয-মাস্তান-আইন সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়ে এখনো কতকগুলি দল বেঁচেবর্তে আছে। তাদের নাটকেব টিকিট ঘোষণা-মাত্রে নিঃশেষ হয়। লোকে চাইছে নগ্ন মিস গ্রীনকে—এ দাবিটা দেখা যাচ্ছে মাত্র আংশিক সত্য। বিপুল এক জনতা কিছুতেই গাঁজা ধবে না, শনিপুজো করে না, ক্যাবারেকে বাংলা নাটকেব বিস্ময়কর এক ধাপ বলে মানে না। এই বেযাড়া লোকগুলি ঠিক গিয়ে ভিড করে ওই দাবিদ্র্যগ্রস্ত বিপর্যস্ত দলগুলিব অভিনযে।

এই জন্য বিশেষ বিশেষ মহল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ওই বজ্জাত দলগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন কী করে করা যায় তারই গণতান্ত্রিক প্রণালী নির্ধারণে অনেকে এখন ব্যস্ত।'

'তবু তো কিছু হচ্ছে,' আমার আবার ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, 'জাতীয় নাট্যশালা বোধ হয় খোলা হবে—।'

বিশ্রী শব্দে হাসলেন বন্ধু, বললেন, 'জাতীয় নাট্যশালা মানে সরকারের মালিকানায় নাট্যশালা? সেখানে নির্দেশক ও অভিনেতারা হবেন সরকারি বেতনভুক কর্মচারী। আমি বিশ্বাস করি না সে নাট্যশালা আজকের মানুষকে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিতে পারে। সেখানে ক্যাবারে হয়তো হবে না, কিন্তু সুদূর নীহারিকাসম কিছু ক্ল্যাসিক ব্যতীত ওখানে কিছুই দেখা যাবে না এটা নিশ্চিত।'

চায়ের দাম দিয়ে বাইরে এসে হাঁটছি লোকারণ্য বিডন স্ট্রীট ধরে। বন্ধু আনমনা স্বরে বললেন, 'বারবার আসল কথাটা গুলিয়ে দেওয়ার কী প্রাণান্ত প্রয়াস। হঠাৎ বব উঠল, 'নবনাট্য'। গণনাট্য নামক অসুবিধাজনক কথাটাকে সংশোধন করে নিয়ে, 'নবনাট্য' চালাতে পারলে, 'নব মানেই ভালো' এমন একটা তত্ত্বকে গলাধঃকরণ করানো যেত। তারপর সৎ নাটক! মানেটা যে কী এখনো বুঝিনি—কার প্রতি সৎ হবে, সততা মানে কী? তবে এটা বুঝেছিলাম, এটাও সেই মূর্তিমান বিবেক-স্বরূপ 'গণনাট্য' কথাটাকে অভিধান থেকে মুছে দেবার চেষ্টা। এবারো ব্যর্থ হয়ে এখন 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটা হযবরল চালু করার চেষ্টা চলছে। যেন ভালো টীমওয়ার্ক হলেই ভালো নাটক বলতে হবে, গ্রুপ এফিশিয়েন্টলি কাজ করলেই নমস্কার জানাতে হবে। নাটকের বিষয়বস্তু যদি শ্রমিকের বদমাইশি ও মালিকের বদান্যতা হয়, তবু। গণনাট্য কথাটা অনেকের কাছে বড়ই বিপজ্জনক, কারণ তার মধ্যে মিশে আছে বহু বছরের একটা দাবি—নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার।'

এই সংগ্রামের কথা কইতে কইতে আমরা এগুতে লাগলাম সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে দক্ষিণে।

রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ

অত্যাধুনিক বুদ্ধিজীবীর দাড়ি থাকে, জামাকাপড় কিছুটা নোংরা, চুল অবিন্যস্ত। কাঁধ থেকে আলম্বিত এক খাঁটি বাঙালি থলে, কিন্তু তার ভেতরে ইংরাজি বই। সে বইগুলো প্রায়শ শস্তা নরম মলাটের 'রুদ্ধশ্বাস' মারামারিকাহিনী—আর্থার হেইলি বা কেন ফলেটের লেখা। সেইহেতু বুদ্ধিজীবী অন্যের সামনে কখনো ঝুলি খোলেন না, অন্যের কুতূহলি দৃষ্টির জন্য তাঁর হাতে থাকে মার্কুয়েজের 'শত বর্ষের একাকীত্ব' উপন্যাস। দুবছর হয়ে গেল ওই বইটিই বুদ্ধিজীবীর হাতে বিজ্ঞাপিত হয়ে আছে। পয়সার অভাবে মেসকালিন ধরনের কিছু সেবন করতে পারেন না, তাই তিনি বিড়ি খেয়ে স্বাতন্ত্র্য জাহির করেন।

নাট্য পরিচালক রিহার্সাল সেরে এসে মাত্র কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় শুরু হল বাক্যবিতণ্ডা।

বুদ্ধিজীবী। এ নাটকটা হল রাজনৈতিক নাটক, তাই তো?

পরিচালক। অবশ্য।

বুদ্ধিজীবী। আগেই বুঝেছি। এমন হাঁকডাক, এমন তারস্বরে চিৎকার, অমন ধপাধপ পতন ও মৃত্যু, আর কোথায় হবে? তা রাজনৈতিক নাটক এমন চড়া তারে বাঁধা থাকে কেন?

পরিচালক। নাটক কোন তারে বাঁধব তা নির্ভর করে আমার দর্শকের ওপর। বাংলা রাজনৈতিক নাটক কার সামনে অভিনীত হবে? রাজনৈতিক নাটক তৈরি করে তারপর আকাদেমি নামক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে কয়েক কুড়ি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে অভিনয় করতে থাকলে, সেটা আর রাজনৈতিক নাটক থাকে না; সেটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়। যেখানে এ-নাটক প্রধানত অভিনয় হবে, সেখানে থাকবে দশ থেকে বিশ হাজার শ্রমক্লান্ত মানুষ, থাকবে অত্যন্ত নির্জীব মাইক, এবং থাকবে আশেপাশে হাটুরে কোলাহল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যসুষমামণ্ডিত সামাজিক নাটক অভিনয় করতে যাওয়ার বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতা যার হয়েছে, সে-ই বোঝে কেন রাজনৈতিক নাটক আমাদের দেশে চড়া সুরে বাঁধতে হয়। আর ধপাধপ পতন ও মৃত্যু শেক্‌স্‌পিয়ারের সুপরিচিত কৌশল। তাঁকেও ১৬০০ সালের লন্ডনের হাটুরে দর্শকের মনোযোগ ধরে রাখতে হয়েছিল, তাই 'টাইটাস অ্যান্ড্রনিকাসে'র বীভৎস রস। শেক্‌স্‌পিয়ারের মতন চড়া সুরে এখনো একটা নাটকও আমরা বাঁধতে পারলাম না বলে দুঃখ হয়। আর বর্তমান পালাটা একটা সদ্য-ঘটা বাস্তব হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট মাত্র। মালোপাড়ায় বাস্তবিকই ধপাধপ পতন ও মৃত্যু ঘটে গেছে এই সেদিন। সুতরাং তার নাট্যরূপে মৃতদেহের কিছু আধিক্যই স্বাভাবিক।

বুদ্ধিজীবী। কিন্তু বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাট্যকার ব্রেখ্‌ট্‌ তো এভাবে বলেন না তাঁর গল্প। এই অসভ্য উত্তেজনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন না কখনো। তিনি ঘটনাকে দর্শক থেকে দূরত্বে

স্থাপন করেন, যাতে তারা চিন্তা করে, ভাবে। আপনাদের নাটকে চিন্তার কোনো অবকাশই রাখেননি।

পরিচালক। জানতাম আপনি ব্রেখ্‌ট্‌-এ আসবেনই। ব্রেখ্‌ট্‌-এর দুর্ভাগ্য যে তিনি কলকাতায় কতিপয় বুদ্ধিবাজের আড্ডার নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠেছেন। বেঁচে থাকলে তিনি এ-সংবাদ শুনেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারতেন। কেননা এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছিল তাঁর দু-চোখের বিষ, এই ড্রাউফগ্যেঙ্গর-এর দল, যারা মনে করে নিছক তত্ত্বের স্টীমরোলার চালিয়ে তারা সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করবে। ব্রেখ্‌ট্‌-এর দর্শক আব আমাদের দর্শক কি এক? দুই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার তারতম্যে দুই রকমের দর্শক-মানস গড়ে ওঠেনি? দর্শক-মানসের ওপর ঐতিহ্যেব প্রভাব থাকে, প্রভাব থাকে পুরাণের, ধর্মেব, কথকতার, জমিব্যবস্থার, জমিদারের, মধ্যস্বত্বভোগীদের, প্রকৃতিব, নদীপ্রান্তরের, প্রতিবেশীর, রাষ্ট্রের, খাজনার, অত্যাচারের। তাই স্থিতধী জর্মন দর্শক এবং যাত্রা-দেখা বাঙালি দর্শকের মধ্যে মিল নেই। এই অমিল নীচের তলায় প্রকট। ওপরমহলে দেশে-দেশে ক্রমশ মনের মিল বৃদ্ধি পায়। কলকাতার বুদ্ধিজীবী সাবা বিশ্বেব সাহিত্যেব সঙ্গে পরিচিত। জর্মন বুদ্ধিজীবী বহুপূর্বেই ঋগ্বেদ-সুদ্ধু পাঠ কবে সেবেছে। ওপরমহলে পরস্পরের চিন্তার বিশেষ ভঙ্গিমা আদানপ্রদান হচ্ছে প্রতিদিন। একজন খাঁটি বাঙালি বুদ্ধিজীবীর কাছে বারট্রান্ড রাসেল বা আর্নল্ড হাউজার অত্যন্ত কাছের মানুষ। কিন্তু পবস্বাপহাবক সমাজব্যবস্থায় এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব নীচের দিকে প্রসারিত হয় না। যে কৃষককে বাংলা সাহিত্যেই অধিকাব দেওযা হয়নি, যার কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি নীহারিকাসম নাম মাত্র, তাকে বিশ্বচিন্তার প্রাঙ্গণে ডেকে আনা অতই সোজা? শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখি এই বিশ্ববোধকে শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে বিস্তৃত করার দৃঢ় তপস্যা, তাও বহু ব্যর্থতায় কণ্টকিত, বহু শোচনীয় পরাজয়ে ক্লান্ত। এই জন্যই বলি, এদেশে যাঁরা ব্রেখ্‌ট্‌-অনুবাদ প্রযোজনা করছেন, তাঁদের সাহস ও সদিচ্ছা অভিনন্দনার্হ, কিন্তু তাঁরা অনিবার্যভাবে ব্রেখ্‌ট্‌কে ওই ওপরমহলে সীমাবদ্ধ করে ফেলবেন। এতে ব্রেখ্‌ট্‌কে হত্যা করা হবে, কারণ ব্রেখ্‌ট্‌ শ্রমিকশ্রেণীব চারণ-কবি, তাঁকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাঁচতে হবে। বন্ধ্যা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীব মধ্যে ব্রেখ্‌ট্‌নাট্যের শ্বাস রুদ্ধ হবে।

বুদ্ধিজীবী। তাহলে ব্রেখ্‌ট্‌-এর যে চিন্তাশ্রয়ী নাট্যকৌশল, বাংলা বাজনৈতিক নাটক তার দিক মাড়াবে না?

পরিচালক। ব্রেখ্‌ট্‌-এর কাছে যা শিখবার শিখতে হবে। মার্ক্‌স্‌বাদী নাট্যকর্মীর কাছে ধ্রুপদী নাটক প্রধানত আঙ্গিক শিক্ষার ক্ষেত্র। রাজনৈতিক নাট্যকর্মীর কাছে বুদ্ধিজীবীর পিঠ-চাপড়ানি পরিত্যজ্য, সমালোচকের ভ্রূকুটি উপেক্ষণীয়। সে ব্রেখ্‌টের কাছেও শিখবে, শেক্‌স্‌পিয়ারের কাছেও, গিরিশের কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য তো একটাই—রাজনীতি প্রসারিত করা নীচের মহলে। সেখানে বিশেষ করে ব্রেখ্‌ট্‌কে কতটা অনুসরণ করা হল সে-প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হঠাৎ যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক নাটককে শুধু ব্রেখ্‌টীয় মাপকাঠি দ্বারা বিচার করে বাতিল করছেন, এটি একটি সাম্প্রতিক বদমাইশি। কিছুদিন পূর্বেও এঁরা ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাম জানতেন না, বা নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। এখন এঁরাই সংগ্রামী দারিদ্র

জর্জরিত অসমসাহসিক রাজনৈতিক নাট্যদলগুলিকে 'ব্রেখ্‌টের মতন হয় নাই!' বলে উপহাস করেন। তা সেও আমাদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বই কি। ধরুন কোনো কবিকে যদি বলা হয় 'রবীন্দ্রনাথের মতন হয়নি,' তাহলে প্রত্যাশার দিকটা নিন্দার চেয়ে ঢের ভারি হয়ে পড়ে। আপনারা যে ব্রেখ্‌ট্‌কে কত কম জানেন তা এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আপনি আমাদের নাটকটা পুরো দেখেও ধরতে পারলেন না এটি ব্রেখ্‌টীয় কাঠামোয় গঠিত। আপনি হাঁকডাক, পতন ও মৃত্যু সম্বন্ধে এমনভাবে কথা কইলেন যেন ব্রেখ্‌টের নাটক নীরব, যেন সেখানে কেউ মরে না। 'আর্টুরো উই-এর চিৎকার' আজ জর্মন ভাষায় এক প্রবাদে পরিণত হয়েছে, এবং 'কমিউনের দিনগুলি' নাটকের শেষে ধপাধপ পতন ও মৃত্যুই ঘটে। পারি কমিউনের গল্পে মৃত্যু ঘটবে না তো কী ঘটবে? কথা হচ্ছে নাটকের বিষয়টা কী? কেরানির জীবনে বেশি মৃত্যু ঘটে না বলে এলসিনোর দুর্গেও ঘটবে না, প্যারিসের ব্যারিকেডেও না, মালোপাড়াতেও না—এ আবার কোন দেশি আব্দার?

বুদ্ধিজীবী। এ নাটক ব্রেখ্‌টীয় কাঠামোয় গড়া কথার অর্থ? কোথায় ভেরফ্রেমডুং—দূরত্বস্থাপন, দর্শকের চিন্তাভাবনার নিভৃত অবকাশ?

পরিচালক। আপনি ভুলে গেছেন নাটকের প্রথম দৃশ্য—ভুলিয়ে যে দিতে পেরেছি সেটাও আমাদের সাফল্য। সেটা একটা রিহার্সালের দৃশ্য। একটা দল ব্যুখনারের 'দাঁতো' নাটকের বাংলা রূপ মহলায় ফেলেছে। এক বাঙালি নাট্যকার মাঝখানে বাধা দিয়ে মালোপাড়াব ঘটনা মহলা আরম্ভ করে। এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে নাটকের গতিতে বাধা দেয়, নিজের নিদারুণ মানসিক প্রতিক্রিয়া জানায়, চরিত্রদের সাক্ষাৎকার নেয়। এর সবটাই ব্রেখ্‌টের কাছে শেখা। 'ককেশিয় খড়ির গণ্ডি' থেকে 'সমাধান' পর্যন্ত এই একই কৌশল। আসল ঘটনাটা অভিনয়ের-মধ্যে-অভিনয় মাত্র, সেটাই তো দূরত্ব স্থাপন করছে দর্শক ও নাটকের মাঝে। আপনি বাঙালি তো, তাই ঘটনার উত্তেজনায় মূল কাঠামোটা বিস্মৃত হয়েছেন। তাতে দোষের কিছু নেই। আপনি জর্মন দর্শক থেকে ভিন্নভাবে নাট্যরস আস্বাদন করতে অভ্যস্ত, এতে কুণ্ঠার কী কারণ থাকতে পারে?

[বুদ্ধিজীবী একটু থতমত খেয়ে বিড়িতে টান দেন।]

বুদ্ধিজীবী। যেভাবে এ-নাটকের সূত্রধার আমাদের বাস্তব ঘটনার খেই ধরিয়ে দেয় বারংবার—

পরিচালক। এবং যেভাবে স্লাইডে মালোপাড়ার বাস্তব মৃতদেহগুলির আলোকচিত্র দেখানো হয়—

বুদ্ধিজীবী। হ্যাঁ তাও—তাতে নাটক যে একটা ঘটনার আক্ষরিক রিপোর্ট এটাই আভাসিত হয়। রাজনৈতিক নাটকের কাজ কি সংবাদ-সরবরাহ? তাহলে পার্টির সংবাদপত্র ও নাট্যদলে পার্থক্য কী?

পরিচালক। আপনার রসবোধ সম্পর্কে আমার ক্রমশ সন্দেহ জাগছে। নিরপেক্ষ অচঞ্চল বিবরণ হচ্ছে নাটকটার রূপরীতি, এটির আঙ্গিক। সত্যিই কি এটা শুধু তথ্য নাকি? মালোপাড়ার তোহমিনা বেগমের আকুল মাতৃত্ব হচ্ছে নাট্যকটির মর্মকেন্দ্র। তাঁকে ঘিরে বিকশিত হচ্ছে অনেকগুলি মানুষের আবেগ, তাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক মনোমালিন্য, তাদের বিদ্যা-অর্জনের

স্পৃহা, তাদের ছোটো ছোটো ভালোবাসা, আশা নৈরাশ্য। আর পটভূমিকায় বৃহৎ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অনিবার্য শ্রেণীসংঘর্ষ। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলির আর সেই চেহারা নেই। জোতদার-কৃষকের মরণপণ লড়াই ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতে এসে পড়েছে সেই কবরখানার সাবেক শান্তিকে ছিন্নভিন্ন করতে। নাটকের পাত্রপাত্রীরাও অনেকে বিশ্বাস করতে চায়নি ইতিহাসকে। তাদের চৈতন্যোদয় হয় জল্লাদের উদ্যত কুঠারের তলায়। এই বিষয়টাকে উপস্থাপিত করতে আমরা যে আঙ্গিকটা গড়ে তুলেছি সেটায় রয়েছে একটা নির্লিপ্ততার ভান, ঔদাসীন্যের অভিনয়। তাই বলে নাটকটা সত্যিই নিরপেক্ষ নাকি? রাজনৈতিক নাটক কখনো পক্ষপাতশূন্য বা নিরপেক্ষ হয় নাকি?

বুদ্ধিজীবী। মানে আপনি কনফেস কবছেন আপনারা সত্য উদ্ঘাটনে আগ্রহী নন, আগ্রহী শুধু এক বিশেষ রাজনীতি প্রচাবে?

পরিচালক। সত্য-উদ্ঘাটন? কোন সত্য?

বুদ্ধিজীবী। মানে?

পবিচালক। বিমূর্ত ঐশ্বরিক সত্যেব অস্তিত্বই আমরা স্বীকার করি না। সত্য সর্ব সময়ে শ্রেণীসত্য—ক্লাস ট্রুথ। হয় আপনি এ শ্রেণীব সত্য বলবেন, না হয ও শ্রেণীর। হয় আমরা কৃষকেব পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদাবেব। হয শ্রমিকেব সত্য উচ্চারণ করব, নইলে মালিকের। মাঝামাঝিব দালালি তো সত্যেব ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণীসত্য।

বুদ্ধিজীবী। শ্রেণীসত্যের খোঁজে আপনারা কতদূর যেতে প্রস্তুত? তথ্য বিকৃত করে?

পবিচালক। তথ্য তো একটাই—দুই শ্রেণী একই তথ্য থেকে দুই বিভিন্ন ধাবণায় উপনীত হচ্ছে। মালোপাডায় যা যা ঘটেছে তাব বোধ করি একটি কংগ্রেসি ব্যাখ্যাও আছে, যেটা আমরা উপস্থিত কবি নাটকের শেষ দিকে।

বুদ্ধিজীবী। তাকে শ্লেষে বিদ্ধ করাব জন্য উপস্থিত করেন।

পরিচালক। অবশ্যই। আকাট নির্বোধের মতন তাবা মালোপাডাব ব্যাখ্যা দিয়েছেন—গণ-অভ্যুত্থান ইত্যাদি। কিন্তু তথ্য তো সর্বজনস্বীকৃত। সেটা বিকৃত করা যায় কিভাবে? তেরোজনের লাশ যে পডেছিল এটা তো ওঁরাও অস্বীকাব কবতে পারেন না। তথ্যবিকৃতির কোনো প্রয়োজনই হয না। বরং সব তথ্য যথাযথ উপস্থিত করা রাজনৈতিক নাটকেব একটি প্রধান কাজ, সরেজমিনে তদন্ত করে, সংশ্লিষ্ট সকলের বিবৃতি নিয়ে—প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা কয়ে—যে প্রক্রিয়ায় 'মালোপাড়ার মা' লেখা হয়েছে। নিজ পাঠাগারে বসে রাজনৈতিক নাটক লেখা যায় না। আমরা তথ্যের সততা রক্ষার্থে কোথায় না গিয়েছি? বোম্বাই-এর ওয়াটারফ্রন্ট বস্তি থেকে কয়লাখনির নীচে পর্যন্ত। 'মালোপাড়ার মা' নাটকে আমরা পুলিশের কাছে প্রদত্ত সাক্ষীদের বিবৃতি ব্যবহার করেছি, আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য আস্ত তুলে এনে সংলাপ হিশাবে বসিয়ে দিয়েছি, আমাদের সংগৃহীত সাক্ষাৎকাব ব্যবহার করেছি—যাতে তথ্যের কোনো হেরফের না হয়। বিরোধটা তথ্য নিয়ে নয়, সত্য নিয়ে। সত্যটা তথ্যের চেয়ে অনেক বড়। সত্য ইতিহাসের অংশ। এবং যেহেতু মেহনতি মানুষ হচ্ছে ইতিহাসের উদীয়মান শক্তি, তাই তার সত্যটাই সত্য। এবং যেহেতু

জোতদাররা ইতিহাসের বিচারে ইতিমধ্যেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হবে, তাই তাদের সত্যটা সর্বসময়ে দ্বিধাগ্রস্ত, বিবেক-দংশিত, স্ববিরোধী—এক কথায় মিথ্যা। নইলে মালোপাড়ার ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা বলতে পারতেন না যে মুসলিম জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিচ্ছিল। ল্যাটিনে বলে, যার মরার সময় হয় ঈশ্বর তাঁকে আগে পাগল করে দেন। পাগল ছাড়া কেউ এরকম একটা অবিশ্বাস্য মিথ্যা রচনা করতে পারত না।

বুদ্ধিজীবী। আপনারা অন্য নাটকে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন—'মালোপাড়ার মা'-তে যদি নাও করে থাকেন।

পরিচালক। যথা?

বুদ্ধিজীবী। 'দুঃস্বপ্নের নগরীতে' শেষকালে শ্রমিকরা যে লোহার রড নিয়ে গুণ্ডাদেব আক্রমণ করল, সেটা সেই সন্ত্রাসের কালে কোথাও ঘটেনি।

পরিচালক। ঘটেছে। শ্রমিক-অঞ্চলে সে-সময়ে গুণ্ডামি হত না কেন জানেন? লিলুয়া, মেটেবুরুজ, হাওড়ায় প্রচণ্ড মার দেওয়াব ফলে।

বুদ্ধিজীবী। আপনারা ছাড়াও সে-সময়ে গণনাট্য সংঘেব একাধিক নাটক দেখেছি, সেখানে দেখানো হয়েছিল, কৃষকেরা বিদ্রোহ করছে, অথচ তখন অমন কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল।

পরিচালক। না ঘটে থাকলেও বিদ্রোহী কৃষক দেখিয়ে গণনাট্য সংঘ কোনো ভুল করেনি। কারণ সেটাই সত্য। তথ্য না হলেও সত্য। বোঝেন? গোর্কি ও ব্রেখ্‌ট্‌ দুজনেই বলে গেছেন—শুধু যা ঘটছে সেটাই দেখাব না। যা ভবিষ্যতে ঘটবে, যা ঘটা উচিত তাও আমরা দেখাব। সন্ত্রাসের সময়ে কৃষক পড়ে মার খাচ্ছিল শুধু সেটাই সত্য, আর অদূর ভবিষ্যতে সে যে বিদ্রোহ করবেই এই অনিবার্য ইতিহাসটা সত্য নয়? শুধু যা দেখছ তাই দেখাও—এটা হচ্ছে বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদের দাবি।

বুদ্ধিজীবী। বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদ?

পরিচালক। হ্যাঁ। বুর্জোয়ারাই প্রথম ইয়োরোপে ওই আক্ষরিক বাস্তবতার ধুয়া তোলে, কারণ বুর্জোয়ার কাছে পুঁজিবাদী জগৎ স্থাণু, অনড়, শাশ্বত। এ দুনিয়া যে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, সে সত্য তার কাছে অসহ্য, কারণ তাহলে পুঁজিবাদও যে একদিন অপসৃত হবে এই দারুণ চিন্তা জনমনে জেগে উঠতে পারে। তাই ভোলতেয়ার, শ, তলস্তয়, রোমাঁ রলাঁরা শেক্‌স্‌পিয়ারকে অবাস্তব বলেছিলেন। একটা উচ্ছিন্ন চাষিকে উচ্ছিন্ন হিশেবেই দেখাও, এই হচ্ছে বুর্জোয়ার কথা। সে-চাষির মধ্যে যে একজন যোদ্ধাও বাস করে একথা ঘুণাক্ষরেও বোলো না। তাই গোর্কি যখন মাতাল সাতিনের মধ্যে এক দার্শনিককে আবিষ্কার করেন, তখন বুর্জোয়ার শৃঙ্খল ভাঙার কাজ নাট্যশালায় আরম্ভ হয়। বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফল ব্রেখ্‌ট্‌ যিনি বুর্জোয়া বাস্তববাদী থিয়েটারের বিরুদ্ধে এপিক থিয়েটার দাঁড় করান। অর্থাৎ বুর্জোয়ার সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ ভেঙে, ড্রইং রুমের সীনে সমাবিষ্ট কেরানিদের নাকচ করে ব্রেখ্‌ট্‌ অন্য শ্রেণীর প্রয়োজনে থিয়েটারকে নিযুক্ত করলেন। বাংলা রাজনৈতিক নাটকও বেঁটেখাটো চরিত্র, খাটো-খাটো কেরানির নিস্তরঙ্গ জীবনকে যথাযথ প্রতিফলিত করতে অস্বীকার করছে।

বিপ্লবী বাস্তবতাবাদ জীবনের ফোটোগ্রাফ উপস্থিত করে না, জীবনকে অনুকরণ করে না। তার দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক। সে জীবনকে ধরে তার গতির মধ্যে, তার অনিবার্য ভবিষ্যৎ-সহ। 'কল্লোল' নাটকে খাইবার জাহাজের নাবিকরা কেন আত্মসমর্পণ করে না [বাস্তবে নাকি করেছিল], এ প্রশ্ন তখন তুলেছিলেন কেউ কেউ। তখন তাঁদের এই উত্তর দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিলাম—কারণ আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রে পোটেমকিনের নাবিকরা আত্মসমর্পণ করে না [যদিও বাস্তবে করেছিল]। 'মালোপাড়ার মা'-তে অবশ্য বিপ্লবী ভবিষ্যৎটা খুব সংযতভাবে চাপা স্বরে উচ্চারণ করে সূত্রধার—অখ্যাত মালোপাড়াকে নিকারাগুয়া, এল সালভাদোরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ব্যাপারটা একই। ওরা এসে মেরে গেল, সেখানেই ঘটনা শেষ নয়, একরকম শুরু বলা যায়। রাজনৈতিক নাটক শেষ যবনিকায় শেষ হয় না, একটা অসমাপ্তির বেশ থেকে যায়। কারণ ইতিহাসের সমাপ্তি নেই।

বুদ্ধিজীবী। তাহলে রাজনৈতিক নাটক শুধু মানুষকে রাগাবে, উত্তেজিত করবে? বোঝাবে না কিছুই?

পরিচালক। এ-সিদ্ধান্তে কোন যুক্তি-পরম্পরায় পৌঁছুলেন বুঝলাম না। এমন কোনো রাগাবার নাটক হতে পারে না, যা কিছুই বোঝায় না। এমন কোনো বোঝাবার নাটকও হতে পারে না যা কখনো রাগায় না, তিন ঘণ্টা ধরে নিরুত্তাপই থাকে। দু-রকমই রাজনৈতিক নাটক হতে পারে—প্রধানত বুদ্ধিনির্ভর ও প্রধানত উত্তেজক। আমাদের পথনাটিকাগুলো যদি দেখে থাকেন তবে জানেন নিশ্চয়ই সেগুলো মূলত তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ, উত্তেজনার স্থান সেখানে গৌণ। 'মালোপাড়ার মা' মূলত উত্তেজক হলেও, তথ্যের তেমন ঘাটতি নেই।

বুদ্ধিজীবী। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনারা রাজনৈতিক নাটককে শ্রেণীসংগ্রামে শামিল করতে চান।

পরিচালক। যথার্থ।

বুদ্ধিজীবী। সেটা কি কোনো রাজনৈতিক দলের নির্দেশ মেনে? তার সামনে নতজানু হয়ে? তাহলে শিল্পীর স্বাধীনতা কোথায়?

পরিচালক। কোনো দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে-শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকারই কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোনো পার্টিই দেয় না, দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে-লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্যদলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণীসংগ্রামে নাটককে শামিলই করা যাবে না। যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে শৌখিন নাট্যকলার বিলাস ভোগ করতে হবে। শ্রেণীসংগ্রামে যাঁরা রয়েছেন, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যাঁরা করছেন, অবশ্যই নাটককে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যে কাজ করতে হবে। তাতে নাটকেরই উপকার হবে। নাট্যকাররা এ-সমাজে বিচ্ছিন্ন বিয়োজিত জীবন যাপন করেন। মেহনতি মানুষের সঙ্গে তাঁদের সুদূরতম যোগাযোগও নেই। এই বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র পথ হচ্ছে পার্টি। একমাত্র পার্টিই পারে নাট্যকারকে জনতার মধ্যে নিয়ে যেতে, সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত করতে, তার বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে যে 'রাজনৈতিক' নাটক সৃষ্টি হয় তার উদাহরণ আমরা মাঝে মাঝেই দেখতে পাই। এসব নাটকে

বন্য মহিষের ন্যায় ধুলো উড়িয়ে সবকিছুকে গুঁতোবার এক মূঢ় অভীপ্সা দেখতে পাই—রাষ্ট্র, পুলিশ, মন্ত্রী প্রভৃতি সম্পর্কে ঘুষের প্রসঙ্গ টেনে চর্বিতচর্বণ তো আছেই, অকস্মাৎ ট্রেড-ইউনিয়নকে, মিছিলকে, বামফ্রন্টকে হিংস্র অন্ধ আক্রমণ। এর মধ্যে কোনো পক্ষ নেওয়া নেই। নাট্যকার শুধু নিজের পক্ষে। তিনি বিশ্বকে ডেকে বলছেন, 'আমায় দেখ্! দেখেছিস আমি কেমন সকলের শ্রাদ্ধ করছি!' পাড়ার নিন্দুকের একটা বিশ্রী বড়াই থাকে, আমি কারুর পরোয়া করি না বাবা, পষ্টাপষ্টি বলে দিই। এই নাট্যকাররা সেই কুচুটেপনার সাধনায় লিপ্ত আছেন। শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে এঁরা শোষকেরই সেবা করে ফেলেন শেষ পর্যন্ত, নিরপেক্ষভাবে সবাইকে খিস্তি করার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও। এঁরা অবধারিতভাবে যে বক্তব্যে উপনীত হন, তা হচ্ছে—সব মানুষই বদ, সব আন্দোলনই কতিপয় নেতাব অর্থকবী স্বার্থে, সুতরাং আন্দোলন করারই কোনো অর্থ হয় না। এইরকম নিম্নস্তরের রসিকতাকে নানাবিধ তথাকথিত 'মঞ্চ পরীক্ষার' অজুহাতে নাট্য আন্দোলনেব অঙ্গনে প্রবিষ্ট কবানো হয় ; মঞ্চে দেখা যায় কলকাতাব জঙ্গি মিছিল 'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি' স্লোগান দিচ্ছে। বাজনৈতিক নাটককে এরকম নেতিবাদ থেকে বক্ষা করার একমাত্র পথ হচ্ছে মার্ক্স্‌বাদে দীক্ষা, পার্টির নিকটে থাকা, প্রতি মুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান স্তর ও শক্তিবিন্যাস অধ্যয়ন করা, কোন রাজনীতিটা এই মুহূর্তে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন সেটা বোঝা। সেটা কোনো নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, এলিয়েনেটেড নাট্যকারের পক্ষে সম্ভবই না, যদি না সে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়।

বুদ্ধিজীবী। বাজনৈতিক নাটক করতে গেলে যাঁরা রাজনৈতিক লড়াই-এর মাঝখানে আছেন তাঁদেব সাহায্য প্রয়োজন, এ কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু আমি বলছি এর কুফলেব কথা। পার্টি যদি ভুল কবে, তবে সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-আন্দোলনও বিপথগামী হয়ে ধ্বসে যাবে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত দেশে এবং চীনে আমরা দেখেছি কখনো কখনো পার্টিব নির্দেশ হুকুমে পরিণত হয় , তখন নাট্য-আন্দোলনের প্রাণশক্তি লুপ্ত হয়।

পরিচালক। আমিও শুনেছি কেউ কেউ গাড়িচাপা পড়েছে, তাই আর বাড়ি থেকে বেরুই না!

বুদ্ধিজীবী। পবিহাস করে উড়িযে দেবেন না, উত্তর দিন।

পরিচালক। প্রথমত, পার্টি যদি ভুল পথে যায়। যেতেই পারে। সহস্র ভুল করতে পারে। কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনো সামগ্রিকভাবে ভুল পথে যেতে পারে না। যে মার্ক্স্‌বাদী সে জানে শ্রমিকশ্রেণী সাবা বিশ্বে লড়ছে। কমিউনিস্ট পার্টি কোনো একটি দেশে বা অঞ্চলে বা ভাষায় বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়। উপবন্তু কমিউনিস্টরা ইতিহাসের সেনাপতি, তাদেব অভিযানে রয়েছে ইতিহাসেব গতি। তাই শেষ বিচারে কমিউনিস্ট আন্দোলন সামগ্রিকভাবে সঠিক পথেই থাকে। এ কথাটা বুঝতে পারছেন? শ্রেণীসংগ্রামেব ক্ষেত্রে এক বিশেষ দেশে বা কালে একটি পার্টি ভুল কবতে পারে ; কিন্তু আপনি তখন সে-পার্টির বাইবে বা বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সঠিক কাজ করতে পারবেন না। You can be right only with the Party, not against or without it। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলি—আপনি সোভিয়েতে জ্দানভের আমল এবং চীনে দুষ্ট চতুষ্টয়ের উদাহরণ দিয়ে কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।

আপনার দুটি অবচ্ছিন্ন উদাহরণের বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে কমিউনিস্টরা বিপন্ন সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করেছে, শিল্পী ও স্রষ্টাদের মুক্ত সৃষ্টিব সুযোগ করে দিয়েছে, শিক্ষা ও জ্ঞানেব আলোকে পশ্চাৎপদ দেশকে উদ্ভাসিত করেছে। আর জ্দানভ ও চীনের চার জুলুমবাজের ভুলভ্রান্তির অত দ্রুত সংশোধনই বা কোন দেশে হতে পারত এও এক প্রশ্ন বই কি। ইতিহাসের বিপুল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে জ্দানভ ও চিয়াং চিং-এর নামোল্লেখে কিছুই এসে যাচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদী পত্রপত্রিকা—যারা নিজেরা কখনো কোনো স্বাধীনতার মুখও দেখে নি—তারা ওই নামগুলোকে জুজু করে তোলে, আর আমাদের দেশেব 'স্বাধীন শিল্পীরা' যাঁবা কতকগুলি শিল্পবোধহীন মালিকের সেবাদাস মাত্র, তাঁরা সোভিয়েতেব শিল্পীদের দুঃখে সংবাদপত্রে কাঁদতে বসেন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে কমিউনিস্টদের হাতেই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেযে গতিশীল, সবচেয়ে মানবমঙ্গল-সচেতন। তাই মিখাইল শোলোকভ বলেছিলেন, আমি প্রথমে কমিউনিস্ট, তারপর ঔপন্যাসিক।

বুদ্ধিজীবী। আবাব আপনাদের নাটকে ফেরা যাক। এত আতিশয্য কেন? তোহমিনাকে শেষকালে তো পাগল কবে দিয়েছেন। আঘাতে পাষাণবৎ মূক ও স্থিবও তো কবতে পারতেন। কেন কবলেন না? দুই পুত্রকে চোখেব সামনে মরতে দেখলে দুরকম প্রতিক্রিযাব কথাই বিজ্ঞান বলে। বেছে বেছে ওই গান-গাওযা উন্মাদিনীর রূপটাই ধরলেন কেন?

পরিচালক। এই আবার আপনি নিজেব অজান্তে বুর্জোয়া নাট্যাদর্শেব পৃষ্ঠপোষকতা কবছেন। আবেগেব তীব্রতা বুর্জোযাবা সইতে পারে না। শেক্স্‌পিয়াবেব বিরুদ্ধে সেটাই ছিল তাদের প্রধান বক্তব্য। অমন বিস্ফোরণের মতন একেকটি চরিত্রের বিলাপ ও প্রলাপ, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হয়ে মূর্ছিত হযে পড়া—এসব কী? শান্তভাবেও তো সবই বলা যেত। রোমাঁ রলাঁ তো নিলর্জ্জের মতন বলে বসেছিলেন 'হ্যামলেটেব' শেষ দৃশ্য দেখে তাঁর হাসি পায়। বস্তুত তিনি বুর্জোযার দৃষ্টি দিয়ে হ্যামলেটকে দেখেছিলেন। কার্ল মার্ক্‌স্ বলেছিলেন, বুর্জোয়ার আদর্শ নায়ক হচ্ছে একটা কৃপণ, বা একটা মিতব্যযী পরিশ্রমী মজুব যে তার উপার্জনেব একাংশ নিয়মিত সেভিংস ব্যাংকে রাখে। তারপব 'মার্চেন্ট অফ লন্ডন' নামক নাটক উল্লেখ করে মার্ক্‌স্ উদাহরণ দেন কীভাবে বুর্জোযাদের নাট্যাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাটকেব উপর। স্বভাবতই বুর্জোয়াদের অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র দ্বন্দ্বহীন আবেগহীন আতিশয্যহীন ভদ্র নাট্যপরিকল্পনায় হ্যামলেট ধরে না। বুর্জোযা পণ্ডিতরা হ্যামলেটেব কার্যকলাপের 'লজিক' খোঁজেন , মানুষ যে অসংযমের উল্লাসে অকস্মাৎ কার্যকাবণবহিত কোনো ভীষণ আবেগে উদ্বেল হতে পারে, বুর্জোয়া তা মানে না। আপনি তোহমিনার উন্মাদিনী রূপ সইতে পারছেন না। হ্যামলেটও তো উন্মাদই। বুর্জোয়া পণ্ডিতরা হ্যামলেটকে উন্মাদ বলেই নাট্যেব আসর থেকে বাদ দিতে চান। কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁস, যিনি বুর্জোয়াব তল্পিবাহক কখনো হননি, তিনি কিন্তু বললেন, হ্যামলেটের কাজেব কোনো সংগতি নেই বলেই, সে পাগল বলেই, জীবন্ত। ববীন্দ্রনাথও বুর্জোয়া পাটোয়াবির ধার কোনোদিন ধারেন নি। তিনি লিখেছেন :

পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমবা খেপা

> বলিয়া ভক্তি কবি, আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খেপামির একপ্রকার বিকাশ কিনা এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে, কিন্তু আমরা একথা স্বীকার কবিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা খেপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট-পালট করিতেই আসে। . . . শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া 'তুচ্ছতার' পূর্বেকার ভারতীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্য দু কথায় মেলে ধরলেন আমাদের সামনে। রামায়ণ-মহাভারতের নায়কদের সংযমহীন আচরণ, নিমাই-এর খেপামি, চাঁদ সদাগব, কবিকঙ্কণ—সব ছুঁয়ে গেল এই কটি কথা। আমাদেব সামনে স্পষ্ট হল সেই নাট্যাদর্শ যা অবলম্বন কবে আমরা নাটক নিয়ে যাব তাদেব সামনে যারা ওই রামায়ণ-মহাভারতে ডুবে আছে। মাঝের বুর্জোয়া দোকানদারদেব ক্ষুদ্র কথাগুলি উড়িয়ে দিয়ে হাজির হতে হবে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে, অর্থাৎ খাঁটি দেশি পরম্পরায় ; ইয়োবোপে কী নিয়ে বাদানুবাদ চলছে তাতে আমাদের আগ্রহ শুধু অনীহ পাঠক হিসেবে। বাজনৈতিক নাটককে দাঁড়াতে হবে স্বল্প বা অর্ধ শিক্ষিত মানুষের কাছে যারা খেপামিকে বুর্জোয়া অণুবীক্ষণের তলায় ফেলে হিসেবের বস্তু করতে শেখেনি। তোহমিনা তাদের জন্য সৃষ্ট, আপনার জন্য নয়। আরেকটা কথা বলব? আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি মালোপাড়ায় তোহমিনা ওই রকম গানের সুরেই কাঁদছেন, উন্মাদিনীর মতন তাকাচ্ছেন। এমনকী তাঁর গানটাও আমরা তাঁরই মুখ থেকে শুনে এসে অবিকল বসিয়ে দিয়েছি নাটকে। আপনাব অসহ্য লাগলে আমি নাচার।

স্তানিস্লাভ্স্কি থেকে ব্রেখ্ট্
(১৯৭৩-৮১)

সহযোদ্ধা শক্তি বিশ্বাসকে
উৎপল দত্ত

সূচিপত্র

স্তানিস্লাভ্স্কির পথ

ভূ মি কা

বহুদিন যাবৎ দেখছি তাই হয়তো কিছু বলার অধিকাব জন্মেছে। অনেকে আসেন অভিনয় করতে, আসেন বহু আশা এবং কিছু প্রতিজ্ঞা নিয়ে, নানা দলেব দরজায় টোকা দিয়ে ফেরেন, দরজা না খুললেও তাঁরা হাল ছাড়েন না। এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছেলেমেয়েরাই অবশেষে গণনাট্য আন্দোলনে সমাবিষ্ট দলে প্রবেশ কবেন এবং কেউ কেউ মঞ্চে সফল হন। অধিকাংশ কিন্তু ব্যর্থ হন, এবং নিজেব ব্যর্থতা ও আহত গর্বকে চাপা দেবাব জন্য দল ছাড়েন, দল ভাঙেন, নূতন দল গড়েন, আবার সে দলও ভাঙেন। কিন্তু কখনও এঁবা মুখে স্বীকাব কবেন না যে তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র একটি পরাজয় থেকেই এই কালাপাহাড়ি কাণ্ডকারখানা। ববং প্রতিটি ডিগবাজির সমর্থনে তাঁবা মহা মহা রাজনৈতিক তত্ত্ব খাড়া কবেন, ছেড়ে-আসা দলেব মুণ্ডপাত করতে থাকেন, মাও ৎসে-তুং থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অতঃপর সত্যিকাবেব গণনাট্য সৃষ্টিব সংকল্প ঘোষণা কবেন। তারপর? তারপর একদিন বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যান। কারণ তাঁদেব বাবংবার দল ভাঙাব পিছনে ছিল ব্যক্তিস্বার্থ, আদর্শ নয়।

অভিনেতাব সঙ্গে পবিচালকের যে শিল্পগত সমঝোতা, নাট্য বিষয়ে তাঁদের যে বোঝাপড়া জান-পহচান, এতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় বহু কাবণে।

পবিচালকদের অনমনীয়তা, হুকুমদাবি, আদর্শহীনতা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি যেমন বিঘ্ন, আনকোবা অভিনেতাদেব ব্যক্তিত্বের মধ্যেও তেমনি লুকিয়ে থাকে বহু বাধা, বহু ফ্যাকড়া। অভিনয় বস্তুটাই অভিনেতাব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। স্তানিস্লাভ্স্কি এবং বিখ্যাত জর্মন অভিনেতা ইল্‌ফ্‌লান্ড দুজনেই বলতেন, মঞ্চে যদি অভিনেতা মহিমামণ্ডিত হয়ে দেখা দিতে চান তবে ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁকে মহিমামণ্ডিত হতে হবে। অভিনয়শিক্ষাব বহু প্রণালী আছে, কণ্ঠ ও দেহকে সুশিক্ষিত কবার নানা পদ্ধতি আছে—পদ্ধতিগুলি আবাব অনেক সময়ে ঘোরতব পবস্পববিরোধীও বটে। কিন্তু সে সবের মধ্যে যাওয়াব পূর্বে অভিনেতাব নিজেকে তৈরি কবে নেওয়া প্রয়োজন। মঞ্চাভিনয়েব কলাকৌশলে প্রবেশ কবার পূর্বে নিজ মানস পুনর্গঠন করে নেওয়া দরকাব, মঞ্চে ঢোকার যোগ্যতা অর্জন কবে নেওয়া প্রযোজন। নইলে স্তানিস্লাভ্স্কি-পদ্ধতিই বলুন, বা ব্রেখ্‌ট্‌-পদ্ধতিই বলুন কোনোটাই আযত্ত হবাব সম্ভাবনা নেতি।

কী পুঁজি নিয়ে আসেন আমাদের অভিনেতাবা? কলকাতায় বেশির ভাগই আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসি এবং আসি স্বশ্রেণীর যাবতীয় দোষগুণ সহ। দোষগুলিব মধ্যে যেটি পর্বতপ্রমাণ হয়ে অনেক সময়ে শিল্পকর্মের পথ রোধ করে দাঁড়ায় সেটা হল পাতি বুর্জোয়াব দম্ভ। এব প্রকাশ অধিকাংশ সময়েই সহজ খোলা পথ ধবে না, চোরাগলিতে প্রবাহিত হয়ে অন্য

রূপে আত্মপ্রকাশ কবে, যেমন মান-অভিমান, ঈর্ষা, কলহপ্রিয়তা, অন্য কোনো সামান্য ছুতোয় ঝগড়া বাধানো ইত্যাদি। এই দম্ভের প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছে পার্ট পাওযা না-পাওয়াকে ঘিরে, বড়ো-পার্ট ছোটো-পার্টকে ঘিরে। পরিচালক যদি নেহাতই একটি গবেট না হন, তবে তিনি পার্ট বিলি কবেন নাটকেব চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে চোখ রেখে। বড়ো-পার্ট থেকে বঞ্চিত অভিনেতা সুতরাং অক্ষম বলেই বঞ্চিত। কিন্তু আমাদের দম্ভ এটাকে স্বীকার কবতে দেয় না। নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করলে যেন অন্যান্য সদস্যদের কাছে হীন হয়ে পডব—এই রকম এক ভ্রান্ত দর্প আমাদেব মনেব মধ্যে আগুন ধরিযে দেয়। এ থেকেই উৎপন্ন হতে থাকে সহ-অভিনেতার প্রতি ঈর্ষা, এবং বিশেষ কবে নবাগত অভিনেতাদেব প্রতি দ্বেষ। যেসব দল কডা শৃঙ্খলায় চলে সেখানে এইসব বিকৃত চিন্তা চাপা পডে থাকে, কিন্তু বহু দলের ভাঙনের জন্য দায়ী দম্ভজনিত অসূয়া ও বিদ্বেষ।

সাংগঠনিক এইসব ব্যাঘাত ঘটানো ছাড়াও, সুপ্ত দম্ভ অভিনেতাকে অভিনেতাই হতে দেয না। দাম্ভিক মানুষ অভিনেতাই হতে পাবে না। অভিনয়েব প্রাক্‌শর্ত হচ্ছে নিজ সত্তা বিলোপ। নিজেকে ভুলে নাটকের চরিত্র হতে হবে। দাম্ভিক মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে না। যত রিহার্সালই দিক না কেন, নিজের অজান্তে সে নিজেকে চরিত্রটির ওপর আবোপ কববে, নিজের ওপর চবিত্র আরোপ করবে না। দাম্ভিক মানুষ মনে মনে পরিচালকের বিরোধিতা করতে থাকবে, নির্দেশ অমান্য কবতে থাকবে। দাম্ভিক মানুষেব কাছে নাট্যকারের উদ্দেশ্য মূল্যহীন, গোটা-নাটকটার বক্তব্য গুরুত্বহীন, তার কাছে নাটক হচ্ছে নিজেকে জাহিব করার একটা বাহনমাত্র। সুতবাং পবিচালক, গোষ্ঠী, নাট্যকার ও নাটক সকলের সঙ্গে অভিনেতার বিবোধ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অভিনয়কলার মূলোচ্ছেদ করতে পারে দম্ভ।

অথচ এ দম্ভকে উৎখাত করা মোটেই কঠিন নয়। বিনযী হতে বেশি পবিশ্রম লাগে না। মঞ্চসজ্জার কাজে মেহনত করা থেকে এটা শুরু হতে পাবে , মঞ্চ ঝাঁট দেওয়া, আসবাব বসানো-সবানো, প্রপ্‌স্ বওয়া, প্রোগ্রাম বিক্রি থেকে শুরু করে সফররত দলেব ভারী মালপত্র কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া—এ সবই প্রাথমিক দম্ভকে চূর্ণ কবতে সাহায্য করতে পারে। কায়িক পরিশ্রম হচ্ছে দম্ভের মহৎ শত্রু। ক্রমশ অভিনেতা যত পোড় খাবেন তত বুঝবেন অহেতুক আত্মপ্রত্যয়ের নির্বুদ্ধিতা। নিজেব অভিনয়ের ত্রুটিগুলি ধরতে পারলে তবে না অভিনয় উন্নত হবে, আর দম্ভ থাকলে নিজের ত্রুটিগুলি চোখে পড়বে কী করে? ক্রমশ অভিনেতা বুঝবেন রিহার্সালে পবিচালকের কঠোর সমালোচনা শুনলে মুখ লাল হয়ে ওঠার কোনো কারণ নেই, অপাঙ্গে অন্যান্য অভিনেতাদের দিকে তাকাবারও কোনো দরকার নেই। তিনি বুঝবেন, পরিচালকেব গালাগাল দম্ভের বর্মকে ভেঙে ফেলছে , এতে অভিনেতার লাভ। তিনি আরো বুঝবেন, পরিচালক যদি মৌনী হয়ে যান তবেই আশঙ্কার কারণ , চেঁচামেচি করলে বুঝতে হবে অভিনেতার সম্ভাব্য ক্ষমতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল—নইলে অত সময় এবং শক্তি তিনি অপচয় করতেন না। তখন অভিনেতা বুঝবেন, অক্ষমতায় লজ্জার কিছু নেই। চেষ্টা করে না পারলে হীনতা প্রমাণ হয় না, হয বীরত্ব। পুরো নাটকটি এবং পুরো দলটির প্রতি তখন অভিনেতা দাযিত্ব অনুভব কবেন।

কিন্তু এই দম্ভেব সঙ্গে আজকাল জড়িয়ে থাকছে চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার মোহ। আজকাল নাট্যদলগুলি থেকে অভিনেতা নির্বাচন করতে শুরু করেছেন চলচ্চিত্রকাররা। এটা ভালো জিনিস। বাংলা চলচ্চিত্রেব অভিনয়মান এব ফলে উর্ধ্বে উঠছে এমন মনে করার যথেষ্ট কাবণ বযেছে। কিন্তু সেই সূত্র ধবে এক শ্রেণীব মোহগ্রস্ত বকেব যুবক এখন ছুটোছুটি করছেন নাটুকে দলে ঢোকার, যাতে দলটাকে পাদানিরূপে ব্যবহাব কবে চট কবে ফিলিমে ঢুকে পডা যায়। এঁদেব দম্ভ বোধ হয যাবাব নয, কাবণ বঙ্গমঞ্চেব প্রতি কোনো শ্রদ্ধা এঁদের ধাতেই নেই। এঁদের বোধ হয় খেদিয়ে দেওযাই সমীচীন।

এবপর রয়েছেন আরেক ধবনের প্রচণ্ড 'বিপ্লবী', যাঁবা পডাশুনার একটা ভানকে উপজীব্য করে নানা দলে ঢোকেন। আদতে এঁদেব পডা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, ব্রেখ্‌ট্‌-এর নামটা জানেন, আমেরিকাব বিপ্লবী গেরিলা থিযেটাবেব নামটাও শুনেছেন। এইরকম কিছু বাক্য মনের মধ্যে সংকলন কবে এঁবা আজকাল ব্রেখ্‌ট্‌কে প্রতিবিপ্লবী বলছেন, নানা দলে ঢুকে দীর্ঘ কেশ ও দাড়ি নেড়ে 'চাব দেওযালেব থিয়েটাব ভেঙে দাও' প্রভৃতি আজব কথা বলছেন—যেন কত পথনাটক ওঁবা অভিনয় কবে সেবেছেন। যেন এদেশেব মানুষকে তাঁবা বুঝে ফেলেছেন—যদিচ উনিশ শতকেব একটি বাংলা নাটকও তাঁরা পাঠ কবেননি। পডেছেন এযুগেব শীর্ষেন্দু-সুনীলের কিছু লেখা। মার্কিন ইউনিভাবসিটি সেন্টাব বা কফি হাউসের চৌহদ্দিতে নবজাগ্রত এই নাট্যপ্রীতি আসলে নাট্য আন্দোলনকে ভেতব থেকে বিধ্বস্ত কবাব এক ষড়যন্ত্র।

তাই বলে আমরা পড়াশুনাব গুরুত্ব কমাতে চাইছি না। যেসব অভিনেতা শত দুর্বলতা সত্ত্বেও আন্তবিকতা নিযে এগিয়ে আসেন নাটক করতে, তাঁদেব পডতেই হবে প্রচুব—দেশি-বিদেশি সব। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিকে বীতিমতো অধ্যয়ন করতে হবে, অধ্যযন করতে হবে বিপ্লবী নাট্যকাব ব্রেখ্‌ট্‌কে! পডতে হবে শেক্‌স্‌পিয়াব, জানতে হবে তাঁব নাট্যশৈলী। গ্যোয়টে-শিলার-মলিযেব-গোর্কি-লর্কা—সব পড়ে ফেলতে পাবলে খুবই ভালো। কিন্তু সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে বাংলা নাটককে—মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশ, ক্ষীবোদপ্রসাদ, ববীন্দ্রনাথের ধাবাটাকে বুঝতে হবে, মীর মশাবফ হুসেনকে জানতে হবে। জনতার ঐতিহ্যে অবগাহন কবতে হবে, বাংলার কবিগান-যাত্রাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। জনতাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অনুবাদ নাটকে বুদ্ধিব প্যাঁচ প্রযোগ কবতে থাকলে যেমন জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পডতে হবে, তেমনি লোকনাট্যেব কলাকৌশল অধ্যয়ন না করলে সেই অজ্ঞাতবাসেই যেতে হবে।

সেই সঙ্গে আমবা মনে কবি, জীবন আজ যেরকম জটিল, শ্রেণীসংগ্রাম আজ যেমন ব্যাপক ও দুর্বোধ্য, তাতে মাত্র নাটক পড়ে বা বিশুদ্ধ অভিনয়শিক্ষাব মাধ্যমে কোনো অভিনেতাই চবিত্র-বিশ্লেষণ করে উঠতে পাবেন না। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি বলতেন কোনো চবিত্র অভিনয় কবাব আগে স্থিব কবা সে কে, কোত্থেকে এসেছে, কী কবতে চায, কোথায় যেতে চায, কেন যেতে চায়, কোথায় যাবে। এ সব কি তাব শ্রেণী-বিশ্লেষণ না কবে সম্ভব? চবিত্রেব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে সর্ব সময়ে মিশে রয়েছে তাব শ্রেণীগত অবস্থান, সমাজগত অবস্থান, আব সেসব বুঝতে হলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছাড়া আর কোনো পথ নেই, মাও-এব ইয়েনান ভাষণ ছাডা পথ নেই।

এ ছাডাও নবাগতরা নিয়ে আসেন মুদ্রাদোষরাশি। কোনো অসতর্ক পরিচালকের হাতে পূর্বে

শেখা কিছু প্রচলিত এবং বস্তাপচা প্যাঁচ, যা তাঁরা সর্বত্র প্রয়োগ করতে থাকেন, প্রায় নিজের অজান্তে। কতকগুলি উদাহরণ দিই . প্রতি কথার সঙ্গে দুলতে থাকা, প্রতি কথার সঙ্গে হাতদুটো উরুর কাছে রেখেই কবজি ঘুরিয়ে বিকট নৃত্যভঙ্গি, পদচারণা, পার্ট ভালো করে না শিখে 'ইয়ে' 'এ্যাঁ' 'উঁ' প্রভৃতি দিয়ে প্রতি বাক্য শুরু করা, বৃদ্ধের পার্ট পেলেই পিছনে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সামনে ঝোঁকা, নিজের আঁচল নিয়ে অনবরত খেলা, ভুরু নাচানো ইত্যাদি। অবাক হয়ে দেখি—যাঁর জিভ থেকে এখনো আঞ্চলিকতা কাটেনি, যিনি 'শ' উচ্চারণ করতে পারেন না, যিনি 'র' ও 'ড়'-এর পার্থক্য বোঝেন না, যিনি পুরো চ-বর্গকে দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে বলে যান, তিনিও কিন্তু থিয়েটারি মুদ্রাদোষ ঠিক অর্জন করে ফেলেছেন। যিনি কয়েকবার মাত্র পাড়ার মঞ্চে নেমেছেন, মুদ্রাদোষ তাঁকেও চেপে ধরেছে। কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

এইসব মঞ্চগত কুসংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক [এবং দুর্মর] হল—'বাই-প্লে' বা 'রিয়্যাকশন'। অন্য অভিনেতা যখন কোনো কথা কইবে আমাকে তখন নীরব প্রতি-অভিনয় করে যেতে হবে—এইরকম একটি গবেটের পরামর্শ কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। নটসূর্য অহীন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে 'কর্ণার্জুন' নাটকে এই বাই-প্লের প্রবর্তন এবং আধিক্য সম্বন্ধে লিখেছেন ; দৃশ্যের পর দৃশ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সকলের নীরব প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের ঠেলায়। বাই-প্লে-ওয়ালারা ভুলে যায়, দর্শক মঞ্চের এক স্থানেই মনোযোগ দিতে পারে এবং দেয়। সবাই একসঙ্গে মুখভঙ্গি এবং নড়াচড়া করতে থাকলে, দর্শক কিছু শুনতে পায় না, কোনোটাই দেখতে পায় না। পরিচালক ইচ্ছে করে নাটকের মধ্যে কয়েক স্থানে সামগ্রিক কোলাহল বা ছুটোছুটি প্রয়োগ করতে পারেন। অন্যথায় ব্রিটিশ নাট্যশালার সেই সাবেক নির্দেশই শ্রেষ্ঠ—When your fellow-actor talks, hold your character, but do nothing—চরিত্রটি ধরে রাখুন দেহে ও মুখে, কিন্তু কিছু করবেন না, দোহাই আপনার।

ইত্যাকার মুদ্রাদোষ সব ঝেঁটিয়ে বিদায় না করলে, অভিনয় শিক্ষার কথা বলা বাতুলতা মাত্র। স্তানিস্লাভ্‌স্কিরা অভিনয়কলার যে গভীরে গেছেন, তাকে বুঝতে হলে এই নাট্য-ইয়ার্কি আগে বিসর্জন দিতে হবে। এইসব মুদ্রাদোষ দিয়ে নবাগত অভিনেতারা ঢেকে রাখেন আসল দুটি ব্যাপারে তাদের অক্ষমতাকে . এক—কণ্ঠ, দুই—দেহ।

কণ্ঠের দুই দিক রয়েছে। প্রথমত, গলা তুলবার সময়ে সুর তুলতে হয়। যে ষড়জে অভিনেতা কথা কইছেন, চেঁচাতে গেলে সেই সপ্তকের মধ্যম বা পঞ্চমে যেতেই হবে [শম্ভু মিত্র অবলীলাক্রমে উপরের ষড়জ ছাড়িয়ে চলে যান, এটা শুনেও তো শেখা উচিত।], অন্যথায় একই পর্দায় চেঁচালে আওয়াজও বাড়ে না, অভিনেতার গলায়ও লাগে চোট। সুতরাং গলায় সুর না খেললে কোনোদিনও ভলিউম তোলা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, গলায় নানারকম আওয়াজ তুলতে পারা চাই—bass, tenor, baritone, ভাঙা গলা, কাঁপা গলা, চার-পাঁচরকম কর্কশ স্বর—এগুলো আয়ত্তে আনা প্রাথমিক শিক্ষাতেই সম্ভব—শুধু যদি মুদ্রাদোষের চাতুরি ভুলতে পারি। এরই সঙ্গে সম্পৃক্ত দমের ব্যাপারটি, যেটি সম্পূর্ণ দৈহিক এবং সহজ ব্যায়ামের মাধ্যমে দখলে আনা যায়।

আর দেহেব দিক থেকে এটুকু বলা যায়, এই সমাজব্যবস্থায় অভিনেতারা অধিকাংশই ভগ্নস্বাস্থ্য। মঞ্চে দেহের যে তৎপবতা এবং শৈথিল্য প্রয়োজন তাকে আয়ত্ত করা খাদ্যাভাবে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তথাপি ব্যায়াম, তলোয়াব খেলা, মূকাভিনয, নৃত্য প্রভৃতি চালিয়ে না গেলে, স্তানিস্লাভ্স্কি বা ব্রেখ্‌ট্ যে ধবনেব দাবিদাওয়া উত্থাপিত কববেন তা আমরা মেটাবো কী কবে?

১

নাট্যপরিচালনাব প্রযাস চালাতে চালাতে আমার বাববার মনে হয়েছে আমাদেব অভিনয়ের মানকে উর্ধ্বে তুলতে গেলে স্তানিস্লাভ্স্কিকে এড়িযে কিছু কবার উপায নেই। সাম্প্রতিককালে এ বিযয়ে দুটি প্রতিবন্ধক দেখা দিয়েছে। প্রথম বাধা মার্কিন ইউনিভার্সিটি সেন্টাবেব আর্শীবাদপুষ্ট দাড়ি ও চুলওলারা, যাদেব স্বল্প বিদ্যা ভযংকরী হযে দেখে দিয়েছে। এবা প্রতিনিয়ত স্তানিস্লাভ্স্কিকে গাল পেড়ে থাকেন, তাঁকে না জেনে না বুঝে। এঁরা আধুনিক ইয়োরোপীয় কিছু মহারথীব নাম শিখেছেন এবং সেই নামগুলো ছুঁড়ে মাবেন ইঁটেব মতন স্তানিস্লাভ্স্কিব গায়ে। এঁবা জানেন না (হোমিওপ্যাথিক ডোজে জ্ঞান অর্জন করলে জানা সম্ভবও নয) যে, মাযাবহোল্‌ড্ ভাখ্‌তানগভ থেকে শুরু করে আজকের ব্রেখ্‌ট্-গ্রোতোভ্স্কি পর্যন্ত সকলেই এক হিসেবে স্তানিস্লাভ্স্কিব মন্ত্রশিষ্য। ব্রেখ্‌ট্‌কে স্তানিস্লাভ্স্কিব বিরুদ্ধে দাঁড কবাতে পাবে একমাত্র নিবেট অক্ষরবাদীরা ; সামান্যতম ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই দেখা যায ব্রেখ্‌ট্ স্তানিস্লাভ্স্কির বিবুদ্ধবাদী নন, তাঁর পরিপূবক মাত্র।

অন্য বাধাটি আসছে সনাতনপন্থী গোঁড়া হিন্দুব বেশে, প্রায় পৈতে ঝুলিযে টিকি দুলিযে। রব তোলা হযেছে বাঙালি হতে হবে, আমাদের যা কিছু শিক্ষণীয সব এদেশেই পাওয়া যায়, সব প্রশ্নেব উত্তর হাতের কাছেই ছড়িয়ে আছে। তীব্র অভিমানে আহত কণ্ঠে বলা হচ্ছে, শিশির-অহীন্দ্রের কাছে পাঠ না নিয়ে মস্কো-বার্লিনেব দিকে তীর্থযাত্রা কেন? একেক জন এমনই অভিমানাহত যে আবেগের বশে ছাপা প্রবন্ধ সবটা পডতে পাবেন না, আগেই ক্রোধান্ধ হয়ে কলম ধবে বসেন। আমবা এক বিদেশি পত্রিকায লিখেছিলাম, ভাবতীয় নাট্যশালা বলে কিছু নেই ; ভাবতে যতগুলি ভাষা ও কৃষ্টি ততগুলি নাট্যশালা হবে , কেবালা, মহাবাষ্ট্র, গুজরাট, বাংলা, আসাম, ওড়িশা—প্রত্যেক প্রদেশেব নাট্যধাবা স্ব স্ব ভাষা ও বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হবে। কিন্তু উল্লিখিত ক্রোধান্ধ ব্যক্তি শুধু প্রথম বাক্যটি পড়েছেন—'ভারতীয় নাট্যশালা বলে কিছু নেই'—এবং দেশপ্রেমে বিগলিত হযে বহুরূপী সংস্থাকে খাঁটি ভাবতীয় নাট্যধারার প্রবক্তা বলেছেন, এবং অধীনকে বিদেশের অনুবক্ত দো-আঁশলা কিছু বলে 'প্রমাণ' কবে ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এদের সীমিত ও সংকীর্ণ জ্ঞানগম্যিব ওপর ভরসা রাখলে আমাদের চলবে না। ক্রোধান্ধ ওই মেকি বাঙালি অহীন্দ্র-শিশিরের অভিনয় কত দেখেছেন জানি না, আমরা নিযমিত দেখেছি ও বিশ্লেষণ কবেছি। ভদ্রলোক যাত্রার সঙ্গে আদৌ পরিচিত কিনা জানি না, তবে আমরা

যাত্রাজগতেব গভীরে প্রবেশ করে শিক্ষালাভের প্রযাস পেযেছি। সেই দাবিতে বলছি, শিশিরকুমারেব প্রতিভাকে নমস্কাব করেও বলতে হবে তাঁব অভিনয়ধারা কোনো পদ্ধতি নয়, কোনো বৈজ্ঞানিক নিযমাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয , সেটা একান্তভাবে তাঁব নিজস্ব প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের নিময়মভাঙা বিস্ময়কব স্ফুবণ। তেমনি বড়ো ফণীবাবুর বইটি চমৎকার হলেও, সেটাকে 'বড়োফণী পদ্ধতি' আখ্যা দিয়ে নূতন অভিনেতাকে তাতে দীক্ষিত করা যায না। গিরিশ-অর্ধেন্দুব লেখা থেকে খুঁজে বাব কবা যাবে না কোনো দৃঢমূল প্রক্রিযা। আজকেব অভিনেতাকে শুধু কণ্ঠ ও দেহেব অনুশীলনে তা হয়তো উদ্বুদ্ধ কবতে পাবে, কিন্তু নাটক ও অভিনয সম্পর্কে তাব দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবকে প্রভাবান্বিত করাব ক্ষমতা তার নেই। অভিনযশিল্পেব মূলে প্রবেশ কবেছে এমন কোনো তত্ত্বের জন্ম বাংলাদেশে এখনো হযনি, এ কথাটা স্বীকাব করতে দ্বিধা কেন থাকবে? অভিনেতার মানসগঠনকে ধরে নাড়া দিতে পাবে এমন চিন্তা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কেউ কবতে পারেননি, এতে লজ্জারই বা কী হযেছে?

অন্যপক্ষে স্তানিস্লাভ্স্কি পদ্ধতিকে সর্ববোগহব কোনো দাওযাই ভাববাব কোনো কারণ নেই। অনেক নাটকেই স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনযধাবা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শেক্স্পিয়াবেব ছন্দ ও বিশালত্বকে এ-নিযমে বাঁধতে গেলে হাস্যকব এক জিনিস তৈবি হতে পাবে। তেমনি বিপর্যয হবে গিবিশবাবুর কাব্যনাট্যে বা ববীন্দ্রনাথেব কোনো কবিত্বময নাটকে। কিন্তু যেখানে ভাষা মোটামুটি দৈনন্দিন কথাবার্তাব কাছাকাছি, যেখানে চবিত্রগুলি অন্তর্মুখী, যেখানে আপাতক্লান্ত মামুলি কথোপকথনেব পেছনে লুকিযে আছে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব, সেখানে স্তানিস্লাভ্স্কি একচ্ছত্র সম্রাট। ইবসেন, হাউপ্টমান, চেকভ, গোর্কি, শ, তলস্তয-এব নাটকগুলিব পূর্ণ প্রকাশই ঘটবে না স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনযধাবা প্রযোগ না কবলে। অনুরূপ বাংলা সামাজিক নাটককে যথাযোগ্য গভীবতা ও সূক্ষ্মতায উন্নীত কবতে গেলেও স্তানিস্লাভ্স্কিকেই প্রযোজন, পুবাতন-বাংলা পেশাদাব নাট্যশালাব নাটুকেপনাব অনুশীলনে লাভ হবে না কিছুই। এ-ছাড়াও আমাদেব ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায ভিন্ন স্বাদেব নাটকেও ঘন ঘন উপস্থিত হয এমন এক একটি মুহূর্ত, এমন রসঘন ও থমথমে এক-একটি মুহূর্ত, এমন বসঘন ও থমথমে এক-একটি সিচুয়েশন যেখানে স্তানিস্লাভ্স্কিব ধাবা প্রযোগ না কবলে অভিনেতা পাবেন না অন্তর্নিহিত জটিলতাকে সম্যক প্রকাশ কবতে।

কিন্তু যেটা স্তানিস্লাভ্স্কিব সাধনাব সিদ্ধি, সেটা অভিনেতাব মনেব ক্ষেত্রে, নাটক অভিনয সম্পর্কে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গিব ক্ষেত্রে। অভিনেতাব মানসে বিপ্লব ঘটাবার ক্ষমতা বাখেন স্তানিস্লাভ্স্কি। বহুল-প্রচলিত কিছু প্যাঁচপযজারে তুষ্ট থাকার দিন শেষ কবে দিযেছেন ওই নটশ্রেষ্ঠ। অভিনেতাকে টেনে বার করে এনেছেন নকলনবিশি আব হাততালির মোহ থেকে, তাকে মুখোমুখি দাঁড কবিযেছেন তার শিল্পেব সঙ্গে, কঠোর তপস্যার আদর্শ তুলে ধবেছেন, অভিনেতাকে স্রষ্টাব আসনে তুলে এনেছেন। স্তানিস্লাভ্স্কি পদ্ধতি কিছুদিন অনুশীলন কবলে অভিনেতা অন্য মানুষ হয়ে যান, শিল্পী হিসেবে তিনি নবজীবন লাভ করেন—এটা প্রমাণিত সত্য। এটা বলছি মস্কো আর্ট থিযেটাবেব চৌদ্দটি নাটক দেখাব পব, বার্লিনে মাক্সিম গোর্কি থিযেটাবেব গোর্কি প্রযোজনা দেখে, লন্ডনে অলিভিযেব পবিচালিত চেকভেব নাটকগুলিকে

রাতের পর রাত দেখে। আত্মবিভোর সমাহিত অভিনয় কাকে বলে সেটা চাক্ষুষ দেখে, তবে মনে করছি, আমার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এই আশ্চর্য ধারাকে এনে মেলাতে হবে, আমার দেশের অভিনেতার মানসজগতে ঘটাতে হবে এই আলোড়ন। তাই পৈতেনাড়া উগ্র দেশপ্রেমিকের তোয়াক্কা না রেখে আমরা স্তানিস্লাভ্স্কি পদ্ধতি আঁয়ত্তে আনার চেষ্টা চালাব, এবং তার পরে [আগে নয়!!] অন্যান্য ইয়োরোপীয় তত্ত্ব অধ্যয়ন করব, কেননা বায়োমেকানিক্স্ই বলুন, আর টোটাল বা এপিক থিয়েটারই বলুন, আর ফিজিকাল অ্যাকটিংই বলুন, কিছু শেখা হবে না যদি না আমরা সকলের পূর্বসূরী স্তানিস্লাভ্স্কির পথ ধরে অভিনয়কে পেশা তো বটেই উপরন্তু জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করি। এবং এই সব আমরা শিখব আমাদের দেশজ ধারাকেই পুষ্ট করতে, তার বিকল্প দাঁড় করাতে নয়।

'এনিমি অফ দা পীপল্' নাটকে ষ্টকমান-চরিত্রে কিছুদিন অভিনয় করার পর ফিনলান্ডে ছুটিতে গিয়ে এক পাহাড়ের ওপর বসে নাট্যাচার্য স্তানিস্লাভ্স্কি নিজ-অভিনয়ের পর্যালোচনা করছিলেন আপন মনে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগছিল গোড়ায় ষ্টকমান-চরিত্রে তিনি যে আনন্দ ও প্রেরণা অনুভব করতেন, পরবর্তী কালে সে প্রেরণা গেল কোথায়? কেন শুধু যান্ত্রিকভাবে সংলাপ উচ্চারণ করছেন? কেন কোনোমতে চলাফেরা-ওঠাবসার নির্দেশগুলো পালন করছেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিখ্যাত সাইকোটেকনীকের জন্ম। এমন কি কোনো কৌশল নেই, যা প্রয়োগ করলে ওই প্রেরণা বস্তুটি অভিনেতার চিরসহচর হবে, হাতজোড় করে প্রেরণা দেবীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না?

বাগ্‌দেবীকে বন্দী করার পথে প্রথম বাধাটি সুবিদিত । অভিনয়টা হয় একঘর দর্শকের সামনে, অথচ বাগদেবী সলজ্জা, ভীরু , লোকসমাগমে তিনি অন্তর্হিতা হন। প্রেরণা একটি নিবিড় নিভৃত অনুভূতি, প্রথম প্রেমের উন্মেষের মতন , বারোয়ারি মণ্ডপের বস্তু সে নয়। বহু সজাগ চক্ষুর ভয়েই অভিনেতা হারাতে শুরু করেন আবেগের সূক্ষ্মতা ও ইন্টিমেসি , সবটাকে স্থূল ও উৎকট করে কাজ সেরে আসবার ঝোঁক তাঁকে পেয়ে বসে। যাবতীয় থিয়েটারি প্যাঁচ ও চেঁচামেচির জন্ম এই দর্শকচক্ষুর ভয়ে। স্তানিস্লাভ্স্কি ভেবে দেখলেন সত্যিকারের গভীর চরিত্র-চিত্রণ শুধু তখনই সম্ভব যখন অভিনেতা নিজেকে বলতে পারেন—যদি আমি সত্যি এই চরিত্র হতাম এবং এই রকম অবস্থায় পড়তাম, তা হলে আমি জীবনে যা করতাম মঞ্চে তাই করছি। ওই 'যদি'র ওপরই সব দাঁড়িয়ে আছে , ওই 'যদি'-মন্ত্র উচ্চারণ করেই অভিনেতার তপস্যা শুরু, কিন্তু যেটা হয়ে ওঠে না সেটা হচ্ছে—'জীবনে যা করতাম মঞ্চে তাই করছি'। গণদৃষ্টির প্রকোপে অভিনেতা মঞ্চে যা করতে থাকেন তা কস্মিন্‌কালে জীবনে করেননি, করবেনও না। এমনকী বলা যায় বেশির ভাগ অভিনেতা মঞ্চে যে-আচরণ করেন কলকাতার রাস্তায় বা চায়ের দোকানে তা করলে পাড়ার ছেলেরা পাগল বলে ইঁট ছুঁড়বে। মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলছেন। লোকচক্ষুর ভয়ে তিনি এমনই কুঁকড়ে যাচ্ছেন যে হ্যামলেট বা সিরাজদ্দৌলাকে নিজের করে নেওয়া তো দূরের কথা, তিনি নিজেকেই ভয় পাচ্ছেন। তিনি ভাবছেন, আমি এমনই সামান্য লোক যে এই সহস্র দর্শককে খুশি করার যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই নেই, তাই কোনো ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই বাবা। আজকে ট্রামে আসতে

আসতে আমি যেভাবে কথা কয়েছি বা একটু আগে বাড়িতে আমার ভাইয়ের সঙ্গে যে সুরে কথা কয়েছি, সেসব মামুলি জিনিস দিয়ে এই ভীষণ সহস্রচক্ষু দানবকে তুষ্ট করা যাবে না। তাব চেয়ে প্রবল হাঁক পেড়ে বেগবান দুটো প্রবেশ প্রস্থান করে, বাব কয়েক নিম্ব-ভক্ষণের মুখভঙ্গি দ্বাবা শোকপ্রকাশ করে কাজটা উতবে দিই। আত্মপ্রত্যয ব্যতীত অভিনেতা পযদা হয় না। অভিনেতারা বেশির ভাগই হীনতাবোধে ভুগছেন।

কেউ কেউ বলেন, স্তানিস্লাভ্স্কি নাকি অভিনেতার নিজস্ব ব্যক্তিত্বেব বিকাশ ঘটতে দেন না, কেননা তিনি চরিত্রের মধ্যে অভিনেতাব বিলুপ্তি চাইতেন। কথাটা নির্জলা মিথ্যা। স্তানিস্লাভ্স্কিব মতে অভিনেতাব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও প্রবল বিকাশ না ঘটলে সে কোনো চবিত্রেব মধ্যেই প্রবেশ কবতে পাবে না। 'যদি আমি হ্যামলেট হতাম'—এ কথাটা বলারই অধিকাব থাকে না ব্যক্তিত্বহীন ভীরু মানুষের। হ্যামলেটেব সমকক্ষ যার তেজ, পৌরুষ আব সাহস, সে-ই পারে হ্যামলেট সাজতে। এবং তখনই সে বলতে পারে—হ্যামলেট হলে জীবনে আমি এইভাবে কথাগুলো বলতাম, এবং মঞ্চে ঠিক তাই কবছি। নানাবকম প্যাঁচ কবাব কোনো প্রয়োজন আমাব নেই। আমি নিজেই আশ্চর্য সুন্দব বহস্যময এক মানুষ , আমাকে দেখে জনতা হ্যামলেটকে দেখতে পাচ্ছে।

এখন ছলনাময়ী প্রেরণাদেবীকে দাসী করে বাখি কী কবে? স্তানিস্লাভ্স্কি অভিনেতাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবেছেন—সৃষ্টিশীল, অনুকবণশীল এবং উৎকট। সৃষ্টিশীল অভিনেতাই শুধু প্রেরণা অনুভব কবেন, প্রেবণাব প্রয়োজন অনুভব কবেন। অনুকবণশীল অভিনেতা প্রথম দিককার বিহার্সালে কিছু প্রেবণা পান, তাবপব সেই প্রেবণাটুকু মনে রাখাব চেষ্টা কবেন, ব্যর্থ হন, এবং তাবপর রিহার্সালে যেমন চলাফেবা ওঠাবসা কবেছিলেন, যেমন কবে কথা বলেছিলেন, সেটাকে মঞ্চে যথাযথ অনুকরণ কবে চলেন। অনেক সময়ে সাধারণ দর্শকেবা বুঝতেই পাবেন না যে এ অভিনযেব পেছনে কোনো প্রেবণা নেই, কোনো উল্লাস নেই, কোনো আবেগেব গভীবতা নেই। এই সব অভিনেতা বিশেষত পবিচালককে অনুকবণ কবাব ব্যাপারে হন সুদক্ষ। যখন দেখা যায় কোনো দলেব সব অভিনেতাব কণ্ঠস্বব পর্যন্ত এক হয়ে আসছে তখন বোঝা যায় সে দল অনুকবণশীল সদস্যে ঠাসা। তাঁদেব অভিনয যেহেতু ছকবাঁধা সেহেতু কণ্ঠস্ববেব নিপুণ ওঠানামায চমক দিতে পাবে, কিন্তু দর্শকেব হৃদযে আঘাত হানতে পাবে না। এবং সত্যিকারেব গভীর মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশে এঁবা শোচনীযভাবে ব্যর্থ হবেন।

আব উৎকট অভিনেতাবা—যাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি—তাঁদেব আশ্রয হচ্ছে অতি-অভিনয, এবং যেখান-সেখান থেকে প্যাঁচ আমদানি কবে যত্রতত্র তা লাগানো। হবদম অভিনেতাদের বলতে শুনি—'দ্য সার্জেন্ট' চলচ্চিত্রেব অমুক জায়গায় রড স্টাইগাব কেমন পুবো দেহটা দুবাব বোঁ বোঁ কবে ঘুবিযে দিল ; ওটা কোথাও লাগাতে হবে। এঁরা অবলীলাক্রমে শম্ভুবাবুব অয়দিপাউসেব কোনো অঙ্গবিক্ষেপ তুলে এনে কলকাতাব মাস্তানদেব দেহে বসিয়ে দিতে পারেন। এঁরা চরিত্র-অধ্যয়নেব কোনো প্রয়োজনই দেখেন না , শুধু দেখেন ব্যাপারটা জমল কিনা। এই জমাজমিব হট্টগোলই বাংলা নাট্যশালার শাশ্বত অভিশাপ। এই সেদিন পর্যন্ত কলকাতায় 'এমেচার শিশির ভাদুড়ি' আর 'এমেচার অহীন্দ্র চৌধুরীদের' ছিল ছড়াছড়ি। আজ

'এমেচার শম্ভু মিত্র' বা 'এমেচাব অজিতেশরা' বযেছেন। এদেশেব প্রসিদ্ধ নট আত্মকথায় লিখে যেতে পারেন কী করে মার্কিন ছবি 'সাইন অফ দ্য ক্রস' থেকে তিনি কিছু কিছু বিজনেস ও হাঁটাব ভঙ্গি এনে জুড়ে দিলেন মহাভারতেব এক নায়কের অভিনয়ে। উৎকট অভিনেতারা বিজনেস বলতে বোঝেন সহ-অভিনেত্রীদেব কণ্ঠ ধরে মঞ্চ থেকে দু ফুট তুলে ফেলা, বা শেষ কথাটি খুব 'জমাটি' কবে ছেড়েই নৃত্যভঙ্গিতে প্রস্থান করা—যাতে ব্যাপারটা 'জমে'। পাড়ার থিয়েটাবে, অফিস ক্লাবে, এমনকী গণনাট্য আন্দোলনেব কিছু কিছু দলে 'এমেচার উত্তমকুমার' বা 'এমেচাব সৌমিত্রেব' দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কি? একবার তো 'রাতেব অতিথি' নাটকের পাগল প্রৌঢ় মেঠো নায়ক কালীকিঙ্করকে দেখেছিলাম নবযৌবনের ওপর গোলাপি রং চড়িয়ে দামি ইভনিং ড্রেস পরে মায় কেশগুচ্ছ কপালের ওপব ফেলে মঞ্চে আবির্ভূত হতে। তারপর যখন দেখলাম তিনি বাক্‌ভঙ্গিতেও উত্তমকুমাবের অক্ষম অনুকবণই কবতে চান তখন প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ কবে বাইবে এসে খৈনি খেয়ে বাঁচলাম। মফঃস্বলেব অধিকাংশ নাটকই তো 'কলকাতায় যেমন হয়েছিল' তাব হুবহু পুনবভিনয়।

কিন্তু সৃষ্টিশীল অভিনেতাব প্রয়োজন হয় প্রেবণা, তাঁব দবকাব হয় চবিত্রেব ভেতবে ঢোকাব, চবিত্রেব মানসিক দ্বন্দ্বে প্রবেশ কবাব। এবং যেহেতু মানুষ দাবাব ছক নয়, সেহেতু তাব খানিকটা অজ্ঞাত ও বহস্যময় থাকবেই। মহৎ নাটকেব চবিত্রবাও তাই আঁধাবে ঘেবা, স্পষ্ট ও অস্পষ্টেব মাঝে তাদের দুর্জ্ঞেয় বিচবণ। হ্যামলেটকে ফাইলবন্দী কবা যায় না; ভ্রেপলেভ সম্পর্কে শেষ কথা কখনই বলা যায় না, সাভিনকে বা মাদাব কাবেজকে পুরোপুবি বুঝে ফেলেছে এমন কেউ নেই। তাই এদেব অবচেতনে প্রবেশ কবতে পারলে অভিনেতা অনেক কিছুই কবতে থাকবেন, যাব সম্যক অর্থ তিনি নিজেই বুঝবেন না। প্রতি অভিনয়ে নূতন নূতন আবিষ্কাবেব সম্মুখীন হবেন, নিজেই তাতে চমকিত ও শিহরিত হবেন। প্রতি অভিনয়ই হবে নূতন সৃষ্টি। অভিনয় তাঁব কাছে অনন্ত জিজ্ঞাসা, নিত্য নতুন আবিষ্কার, মানবমনেব সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বোজ তিনি দিগন্তে নতুন তটরেখা দেখতে থাকবেন।

এই প্রেবণাকে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি দৈবেব হাতে ছেড়ে দিতে বাজি নন, আকস্মিকতাব কোনো স্থান বাখতে তিনি বাজি নন। তাঁব মতে, সচেতন থেকে যেতে হবে চবিত্রেব অবচেতনে। অভিনেতা যদি নিজেকে সচেতনভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈবি কবেন তবেই তাঁর পক্ষে চবিত্রের গভীরে অবগাহন করা সম্ভব। অর্থাৎ তিনি যদি সঠিক অভিনয় করতে পাবেন, করেক্ট অ্যাকটিং কবতে শেখেন, তবে প্রেরণা তাঁব বশীভূত হবে। আমাদেব দেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এমন সব জনপ্রিয় হাততালি পাওযা অভিনেতাব আধিপত্য ছিল যাঁবা ছাপার অক্ষরে লিখে গেছেন কেমন কবে একদিন হঠাৎ তাঁব এমন 'প্রেবণা' এসে গেছিল যে, ডাক্তার এসে সহ-অভিনেত্রীব প্রাণবক্ষা কবেন। এখনো শুনি, নব্য অভিনেতা ঘাম মুছতে মুছতে বলছেন, ওঃ আজ এমন মুড এসে গেল যে . . . । সে যে কী তা অবশ্য তাঁবা আর গুছিয়ে বলতে পাবেন না। এখনো কোনো কোনো পরিচালককে অভিনযেব দু-মিনিট আগে বলতে শুনি, এই মুড নে, মুড নে। মুড আবাব কী বস্তু? মুডের ঠেলায় নাটকেব সর্বনাশ হতে দেখেছি, অভিনেতাকে মহলা-বহির্ভূত চেঁচামেচি বা ছুটোছুটি কবতে দেখেছি যাতে সহ-অভিনেতাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

পড়েন। ছাপাব অক্ষবে প্রসিদ্ধ নট এদেশে লেখেন, কেমন কবে তিনি এবং সহ-অভিনেত্রী চুপিচুপি কিছু বিজনেস বেওযাজ কবে বাখলেন, বলাবলি করলেন 'কাউকে কিছু বলা হবে না', তাবপর মঞ্চে গিযে আচম্বিতে সেইসব ষডযন্ত্রমূলক বিজনেস দিযে অন্যান্য হতভাগ্য অভিনেতাদেব একেবাবে বোমকে দিযে মঞ্চ ছেডে চলে গেলেন। এবং এমনও দর্শক থাকেন যাঁরা ওই উৎকট বাজাবি কাববাব দেখে হাততালি দিযে ওঠেন।

না, স্তানিস্লাভ্স্কি বর্ণিত প্রেবণা (ইন্স্পিরেশন) এবকম উচ্ছৃঙ্খল ও স্বার্থপব অভিনেতাদের জন্য নয। এ প্রেবণা নির্ভব কবে অভিনেতার সাবা জীবনেব সংযম, শিক্ষা, মনোযোগ, শৃঙ্খলা, অধ্যয়ন, সাধনার ওপব। স্তানিস্লাভ্স্কি যখন বলেন, সৃষ্টিশীল অভিনেতা বোজ নতুন কবে সৃষ্টি কবেন, তাব মানে এই নয যে তিনি বেমক্কা চেঁচিযে ওঠেন, যেখানে ডানদিকে দাঁডাবাব কথা সেখানে বাঁ দিকে গিযে দাঁডান, বা যেখানে বসে থাকাব কথা সেখানে পাযচাবি শুরু কবেন। নতুন সৃষ্টি মানে মনেব মধ্যে নতুন প্রতিমা গডা। যে-চবিত্র অভিনয কবছি তাব নূতন বাঁক, নূতন গলি, নূতন চৌবাস্তা আবিষ্কাব। তাব ফলে সুপবিনির্দিষ্ট চলাফেবা পালটাতে হয না একেবাবেই, পালটে যায অভিনেতাব অনুভূতি, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি। তাব ফলে অভিনয হয আবো তীক্ষ্ণ, আবো মিতব্যযী, আবো সূক্ষ্ম, আবো আবেগময, আবো সংযত। মনেব জটিলতা পাকিযে উঠলে, দেহেব নডাচডা কমে আসে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।

২

স্তানিস্লাভ্স্কি বর্ণিত সৃষ্টিশীল প্রেবণাব সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল অভিনেতাব দাপাদাপিব কোনো সম্পর্ক নেই। 'মুডেব মাথায' বিপুল হাঁক ছেডে গোটাদুই প্যাঁচ কষে কিছু হাততালি আদায কবে যাঁবা সাজঘবে ফিবে বিজযীব হাসি হাসেন, তাঁদেব কাছে প্রেবণা কথাটির অর্থই হল মহলায যা কিছু তৈবি হযেছে তাব বিরুদ্ধাচবণ কবা। এইসব উৎকট অভিনেতারা মঞ্চে বানিযে সংলাপ বলেন, আচমকা গলা তোলেন বা নামান, নতুন নতুন বিজনেস আবিষ্কার করেন, পার্শ্ববর্তী অভিনেতাকে চমকে দিযে আনন্দ পান, পবিচালকের নির্দেশগুলি ছেঁড়া কাগজেব ঝুডিতে নিক্ষেপ করেন।

স্তানিস্লাভ্স্কি এঁদেব দু-চক্ষে দেখতে পাবতেন না। তাই তাঁব 'কবেক্ট অ্যাকটিং'-এব প্রথম নীতি হল—প্রাক্শর্তগুলি মেনে চলা, গিভেন সাবকামস্টানসেস মেনে চলা। অভিনেতা নিজ চবিত্র নিযে কোনো চিন্তা কবাব পূর্বে প্রাক্শর্তগুলিব কাছে আত্মসমর্পণ কববেন—যথা, নাটকটিব প্লট, নাটকে বর্ণিত ঘটনাবলি, নাটকেব স্থান ও কাল, তৎকালীন জীবনপ্রণালী, পবিচালকেব ব্যাখ্যা, পবিচালকেব সমগ্র নির্দেশাবলি, মঞ্চবিন্যাস, মঞ্চসজ্জা, পোশাক, প্রপ্স, আবহ-সংগীত, আবহ-ধ্বনি ইত্যাদি। এসব আগে বিনাবাক্যব্যযে মেনে নিয়ে তবে অভিনযেব প্রক্রিযা শুরু। বিশদ কবে বলতে গেলে—ধবা যাক, নাট্যকাহিনী। গোডা থেকেই অভিনেতা যদি পরিকল্পনা কবতে শুরু কবেন—এখানে একটু খোঁচা দেব, এখানে জোবে বলব, এখানে ধীরে, এখানে দ্রুত, তাহলে হযতো এমন এক চবিত্র সৃষ্টি হযে যাবে যাব সঙ্গে নাট্যকাহিনীব

বিরোধ ঘটবে। নাটক যে চরিত্র চাইছে, নাট্যমধ্যে চরিত্রের যে ভূমিকা, সেটাকে আগে স্বীকার না করে নিলে, নাটকটার গঠন ও পরম্পরার দফা-রফা হবে। ধরা যাক, নাট্য-বর্ণিত ঘটনার স্থানকাল-জীবনধারা। ওর ওপরে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি এত জোর দিচ্ছেন কেন? কেননা ভুল অভিনয় অনেক সময়ে এই প্রাক্‌শর্তকে অবজ্ঞা করার ফলে শুরু হয়। অভিনেতা ভুলে যান বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ শ্রেণীর আচার-ব্যবহারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাঁকে চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। শাজাহান জাহানারাকে ডেকে পাঠাতে গেলে আজকের গেরস্তের মতন ডাকেন না। প্রাচীন জমিদার-গৃহে ভৃত্যরা বাবুর সঙ্গে রসিকতার সুরে কথা কইতে পারে না। রুশ নাটকের বাংলা অনুবাদে রুশ পোশাক পরা ও মেক-আপ করা অভিনেতাকে কলকাতার মঞ্চে জিভ কাটতে দেখেছি, অথচ ইয়োরোপে জিভ কেটে লজ্জা প্রকাশের রেওয়াজ নেই। তেমনি একটি বিদেশি নাটকে বিদেশি পোশাকে অভিনেতাকে দেখেছি হাতছানি দিয়ে প্রতিবেশীকে ডাকতে, কিন্তু ইয়োরোপে হাতছানিটা বিদায়ের ভঙ্গি, ডাকার নয়। গ্রামীণ বধূকে মঞ্চে দেখেছি বঁটির দু-পাশে পা রেখে বসতে, ডানদিকের কাঁখে ঘড়া নিয়ে ঢুকতে, গলায় আঁচল না দিয়ে তুলসীতলায় নমস্কার করতে। বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষা কইতে কইতে অবলীলাক্রমে অভিনেতাকে জল-চব্বিশ-পরগনায় পৌঁছোতে শুনেছি। শ্রমিক চরিত্রকে বিদেশি কায়দায় কাঁধ দুলিয়ে শ্রাগ করতে দেখে আঁৎকে উঠেছি, এবং বুঝেছি এটা বোম্বাই ফিল্‌ম্‌ থেকে রপ্ত করা। সাহেবচরিত্রকে ঘরের মধ্যে টুপি পরে ঘুরতে দেখেছি, টুপি মাথায় রেখে মহিলার সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছি। তেমনি বারবার দেখেছি ধনী বাঙালিকে ড্রেসিং-গাউন পরে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করতে। অহরহ তো দেখা যাচ্ছে ফর্মুলায় ফেলা কৃষক-চরিত্রদের, সেই একটা অনির্দিষ্ট অঞ্চলের কথনভঙ্গি, কতকগুলি বাঁধা বুলি, কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মোছা, তারপর হুংকার ছেড়ে জোতদারকে আক্রমণ। [কখনো বা সমবেত নৃত্য-সহযোগে, যে নাচের কুষ্ঠি ঠিকুজি খুঁজে পাওয়া ভার।] এই রকম স্থান-কাল-নিরপেক্ষ বাঁধা গৎ ছিল স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির দুচোখের বিষ। এরকম এক-একটা ভুল পুরো চরিত্রকে মিথ্যা করে দেয়। স্থান-কাল-শ্রেণী বহির্ভূত একটি ভঙ্গি বা একটি বাক্যোচ্চারণ প্রমাণ করে দেয় যে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছেন। ইনি বিন্দুমাত্র গভীরে যাননি। ইনি চরিত্রের প্রাথমিক চেহারা ও আচরণ সম্পর্কেই কিছু চিন্তা করেননি, অন্তর্দ্বন্দ্বে যাওয়া তো দূরের কথা। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি চাইতেন তাঁর শিষ্যরা যেন নাটকের স্থান-কালে অবগাহন করে, সে-কালের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ধ্যানধারণায় ভরপুর হয়, চরিত্রগুলি যে শ্রেণীর মানুষ সেই শ্রেণীর ভাবভঙ্গিতে যেন ডুবে যান অভিনেতারা। এবং এইভাবে বিশেষ একটা যুগের বিশেষ একটা শ্রেণীর ঐতিহাসিক অধ্যয়নে নিযুক্ত হলেই ফর্মুলা আর প্যাঁচের রাজত্ব খতম হবে। ফর্মুলা হচ্ছে অজ্ঞতার আশ্রয়, আলস্যের ছদ্মবেশ, ফাঁকির অবলম্বন। প্যাঁচ করে সে যে চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। তাই স্থান-কাল-জীবনপ্রণালীকে প্রাক্‌শর্ত হিশেবে মেনে নিতে হবে। নাটকে বর্ণিত দেশকালের সীমায় নিজেকে শক্ত করে বাঁধতে হবে, ভাসা-ভাসা ফর্মুলা ছেড়ে চরিত্রের প্রাক্‌নির্ধারিত আচার-আচরণে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে হবে।

পরিচালকের যাবতীয় নির্দেশাবলিকে যে মানতে হবে, এটা বোধ হয় আজকাল পুনরাবৃত্তির

অপেক্ষা রাখে না। তবু এই সত্তরের দশকেও এমন দেখা যায়, বিশেষ করে হাসির দৃশ্যে, অভিনেতা পরিচালকের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে শুরু করেন। দর্শক যদি প্রবল হাসিতে কোনো কথাকে অভ্যর্থনা জানান, তবে পুলকিত অভিনেতা আর নিজেকে সামলাতে পারেন না, গদগদ চিত্তে আরো খানিক হাসাবার চেষ্টায় জিনিসটাকে তেতো করে ছাড়েন। কোথাও যদি দর্শক থেকে 'বাঃ বাঃ' ধ্বনি ওঠে, বা হাততালি ওঠে, সেখানেও অভিনেতার স্থৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখেছি, গর্বস্ফীত অভিনেতার পরবর্তী অভিনয় আতিশয্যের দিকে ঝুঁকেছে এমনটা দেখা গেছে। এগুলোই পরীক্ষা, এগুলোয় উতরোতে পারলে তবে সাধনা শুরু। পরিচালকের প্রতিটি নির্দেশকে এমনভাবে অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে নিতে হবে যে দর্শকের প্রশংসাধ্বনিগুলো হাঁসের পিঠে জলকণার মতন পিছলে চলে যাবে, অভিনয়ের ছক একটুও ভাঙবে না, মনে হবে অভিনেতা দর্শকের কোলাহল শুনতেও পাননি, তাঁর কাছে পৌঁছুনোই যায় না।

পরিচালকই স্থির করে দিয়েছেন পারস্পরিক অবস্থান—কমপোজিশন। এগুলি দৃঢ় প্রাক্‌শর্ত। আগে থেকে নাটক পড়ে যদি স্থির করে ফেলি—ওঃ, বক্তৃতাটা পায়চারি করতে করতে বললে যা জুৎ হবে!—এবং তারপর মহলায় যদি শুনি পরিচালক বলছেন, এ বক্তৃতাটি দর্শকের দিকে পিঠ দিয়ে বসে বলতে হবে—তখনই শুরু হয় অভিনেতার নিজের মধ্যে বিরোধ, তিনি হন বিভ্রান্ত। আগেই যদি স্থির করি, এটা বসে বলব, তারপর পরিচালক বলেন, এটা দাঁড়িয়ে বলতে হবে—সেটা অভিনেতার চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ হয়। এইসব ছোটো ছোটো মানসিক কষ্টগুলি জট পাকিয়ে অভিনেতাকে নিরুদ্যম করে, তাঁকে প্রাণ ঢেলে চরিত্রচিত্রণ করতে দেয় না। অবচেতন যদি বিমুখ হয়, বিদ্রোহী হয়, তা হলে নিজের অজান্তেই অভিনেতা চরিত্রের বিরোধিতা করতে থাকবেন এবং চরিত্রে প্রবেশ করতে না পেরে অবশেষে অগতির গতি সেই ফর্মুলা অবলম্বন, সেই প্রাণহীনভাবে পরিচালকের নির্দেশ-পালন ও তাঁকে অনুকরণ। এইসব প্রাথমিক হতাশা কাটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে চলাফেরার নির্দেশগুলিকে প্রাক্‌শর্ত হিশেবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। অর্থাৎ মহলার পূর্বে অভিনেতা চলাফেরা ওঠানামা সম্পর্কে কিছুই ভাববেন না, সেগুলি পরিচালকের দায়িত্ব। এবং পরিচালক সেগুলি নির্দিষ্ট করে দিলে পর সেগুলিকে নিঃশর্তভাবে শিরোধার্য করে তবে অভিনয় সম্পর্কে ভাবনা শুরু করা উচিত।

মঞ্চসজ্জাও একটি শিরোধার্য প্রাক্‌শর্ত। আগে থেকে যদি ভাবতে শুরু করি, এখানটায় সারা ঘর প্রদক্ষিণ করে কথা কইব, আর কার্যক্ষেত্রে গিয়ে যদি দেখি কক্ষটি শুধু ক্ষুদ্র নয়, আসবাবে ঠাসা, আমার প্রদক্ষিণের কোনো সুযোগই নেই—তবে আমার বিমর্ষ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যেখানে ভেবেছি ডান দিকে যাব, সেখানে পথ রোধ করে আছে সিঁড়ি, যেখানে ভেবেছি হেলান দেব, সেখানে দেখি ফ্ল্যাটের কমজোর স্থান, যেখানে ভেবেছি প্রিয়ার হাত ধরে দুটো নিভৃত কথা কইব, সেখানে দেখি আমি আছি দশ ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর আর প্রিয়া রইলেন নীচে ধরাছোঁয়ার বাইরে সুদূর নীহারিকাসম। এইসব অর্থহীন আশাভঙ্গের পাল্লায় পড়া মোটেই কাজের কথা নয়।

তেমনি পোশাকের গুরুত্ব। আগে থেকে তলোয়ারের মুষ্টি ধরে গম্ভীর ভাষণের কথা কে না ভেবেছেন? কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তলোয়ার ঝোলাবার ব্যাপারটাই বাদ গেছে। যেখানে

ভেবেছি চুলে হাত বুলিয়ে চুল খিমছে আত্মগ্লানি প্রকাশ করব সেখানে হঠাৎ দেখি মাথায় টুপি। যেখানে ফেঁদে বেখেছি অতিশয় তীব্রগতি কোনো লম্ফ, সেখানে ধুতি পাঞ্জাবি শালের জড়াজড়িতে ভূতলশায়ী হবার উপক্রম। পকেটের সমস্যাব সম্মুখীন হননি এমন কেউ আছেন? ভেবে বেখেছি এ-পকেটে থাকবে বিড়িব কৌটো, ও পকেটে চিঠি আর পিস্তল, আব কার্যক্ষেত্রে জেনেছি শ্রমিকেব জামার পকেট নেই—এই নিদারুণ সমস্যায় জর্জবিত হননি এমন অভিনেতা আছেন কোথাও? প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মহলা দেবার স্বভাব আছে অনেকেব, চবিত্রটাকে একটু বাঁকা ভাবে অবস্থিত কবতে সুবিধে হয় তাঁদেব , পবিচালক অসতর্ক থাকলে এঁদের সর্বনাশ আসন্ন, কেননা চবিত্রটি হয়তো মঞ্চে ধুতি পবে আসবে, এবং ড্রেস বিহার্সালে এইসব অভিনেতা হাত নিয়ে উদভ্রান্ত হন, ধুতিতে পকেট খোঁজেন, তাবপব হয়তো সমাধান হিশেবে বাহু দুটোকে বুকেব ওপব পবস্পব আবদ্ধ কবে কাষ্ঠপুত্তলি সেজে থাকেন। যেখানে সৃষ্টিশীল অভিনয় নির্ভর কবছে চূড়ান্ত প্রত্যয় ও একাগ্রতাব ওপব, সেখানে এই ধবনেব ছোটোখাটো অসংগতি অনিবার্যভাবে অভিনযেব সর্বনাশ কববেই।

যে প্রপটা হাতে পাব সেটাব ওজন ও আকাব আগে নিশ্চিতভাবে জেনে তবে তাব সঙ্গে অভিনয়কে যুক্ত কবতে হবে। যে-ছড়ি আমি বোঁ বোঁ করে ঘুবিয়ে হালচালে কথা কইব ভাবছি, সেটা হয়তো এত ভাবী যে অমন ঘুববে না। যে চুরুট ধবাতে ধবাতে কথা কইব ভাবছি সেটা অত সহজে নাও ধবতে পাবে। যে বিড়িব সুখটান নেব ভাবছি, সেটা এত বড়ো হতে পাবে যে সুখটানটা আত্মঘাতী হয়ে উঠল। কথা কইতে কইতে পকেট থেকে কিছু বাব কবা যে মঞ্চে এক দুরূহ ব্যাপার, এটা সব অভিনেতাই বোঝেন।

আবহসংগীত এবং ধ্বনিকে গোড়াতেই স্বীকাব করে না নিলে কথা শোনানোই সম্ভব নয়। আবহসংগীতেব সঙ্গে কলহে লিপ্ত না হয়ে, সংগীতেব নির্ধাবিত ভূমিকাটা স্বীকাব কবে নিলে, অভিনয় ও সংগীত পবস্পবকে সাহায্য কবে।

যে অভিনেতা উচ্ছৃঙ্খল, যাঁবা মহলা-বহির্ভূত লাফালাফি কবে থাকেন, তাঁদেব কাছে এইসব প্রাক্‌শর্ত এক বিষম বাধা বিশেষ। তাঁবা আকস্মিক সব কাণ্ডকাবখানায় বিশ্বাসী, সুতবাং বাঁধাধবা ছক তাঁবা সইতে পাবেন না, নিয়মলঙ্ঘনেই তাঁদেব আনন্দ। কিন্তু সৃষ্টিশীল অভিনেতাব কাছে এইসব প্রাকশর্ত বাধা তো নযই, ববং এগুলিই তাঁব অবলম্বন, এগুলি অভিনয়কে গভীবতব উন্নততব কবে তোলে। সৃষ্টিশীল অভিনেতা দিবাবাত্র এইসব প্রাক্‌শর্তেব ধ্যানে নিবিষ্ট হবেন, এগুলিকে আপন কবে নেবেন, এদেব পক্ষপুটে থেকে চবিত্রসৃষ্টিতে লিপ্ত হবেন। তখন দেখা যাবে এগুলি সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ যা বেয়ে অভিনেতা সৃষ্টিব স্বর্গে উঠছেন। বিমূর্ত প্রেবণাকে শূন্যে খুঁজে না বেড়িয়ে, এইবকম কঠোর নিযমাবলির কাবাকক্ষে খুঁজলেই প্রাপ্তিব সম্ভাবনা বেশি। বে-আক্কেল অভিনেতারা ভাবেন তাঁদেব মনেব কোণে যে স্বর্গীয় ভাব লুক্কায়িত বয়েছে, উন্মুক্ত প্রান্তব না পেলে সে ভাব প্রকটিত হবে না। এঁবা ভাবেন বাগ্‌দেবীকে ডাকলেই পাওয়া যায়। পূজাব সহস্র নিয়ম, মন্ত্র উপচাব, আচাব, শুদ্ধি উপবাসে এঁদেব অনীহা। এঁবা ভুলে যাচ্ছেন উপাসনা বস্তুটিই এক প্রবল নিয়মানুবর্তিতা। শত প্রকাব পূজাবিধি দ্বাবা মনকে সুসংহত সংযত না কবলে দেবীপ্রাপ্তিব আশা নাস্তি। নিজেকে তপস্যায় ক্লিষ্ট করে সহস্র উপচাবে দেবীবরণেব

ব্যবস্থাই শাস্ত্রীয়। অন্যথায় উচ্ছৃঙ্খল পূজারির প্রতি দেবী হঠাৎ অকারণে তুষ্ট হয়ে হুশ করে ব্যোমযানে চড়ে পৌঁছুবেন এমন নজির পুরাণে নেই। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির সার কথা এই।

প্রাক্‌শর্তগুলি মেনে নেওয়ার পর অভিনেতার করণীয় কী? স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি কতকগুলি ধাপ নির্ধারিত করেছেন, যথা—

(১) কল্পনা, (২) মনোযোগ, (৩) দেহের শৈথিল্য (relaxation), (৪) নাটককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্তিকরণ ও প্রতি খণ্ডের সমস্যা সমাধান, (৫) সত্য ও বিশ্বাস, (৬) স্মৃতি, (৭) দর্শকের সঙ্গে সংযোগ, (৮) বাইরের সাহায্য।

বর্তমান রচনায় আমরা এর কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব।

৩ অভিনেতার কল্পনাশক্তি

স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির সমালোচকরা বহুবার তাঁকে আক্ষরিক বাস্তববাদী ফোটোগ্রাফার, স্বাভাবিকতাবাদী প্রভৃতি গালাগালে ভূষিত করেছেন। হুবহু বাস্তবতা নাকি ছিল তাঁর পদ্ধতির সারকথা। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির নিজের লেখা পড়লে অবশ্য এ ধরনের ভ্রমে পড়ার কারণ থাকে না, কারণ তিনি বারংবার স্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন—জীবনকে অনুকরণ করলে শিল্পসৃষ্টি হয় না। অভিনয় মানে রাস্তায় দেখা কোনো মানুষকে যথাযথ ভ্যাঙানো নয়। অভিনয় বাস্তবোত্তর জিনিস, জীবনোত্তর এক সুষমাময় স্ফূর্তি। এবং জীবনকে জীবনোত্তরে নিয়ে যেতে হলে অভিনেতার দরকার হয় প্রখর কল্পনাশক্তি। এই বিশেষ শক্তির অভাবে মাঝে মাঝে ধ্যানমগ্নতার নামে দেখা যায় ক্লান্তিকর ফিকে জোলো অভিনয়, যা দেখে দর্শকের হাই ওঠে। কল্পনা প্রয়োগে অভিনয়কে এমন একটি সূক্ষ্ম আতিশয্য দিতে হবে যাতে গভীর বাস্তবতার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও ক্ষণে ক্ষণে দর্শককে চমকিত উল্লসিত ভাবাক্রান্ত ও ক্রোধকম্পিত করে তোলা যায়। এই তো সেদিন নতুন একটি দলের অনুবাদ-নাটক দেখতে গিয়ে সীটে বসে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে কেলেঙ্কারি করে ফেলেছিলাম। কল্পনাশক্তির শোচনীয় অভাবের ফলে ওই দলের কেউ গলাই তুলছিলেন না, পাছে বাস্তবের সুর কেটে যায়। চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে কী সব গুজ-গুজ ফুস-ফুস করতে করতে তাঁরা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেললেন। এ রকম 'আয় ঘুম আয় রে' ধাঁচের অভিনয় স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির তত্ত্বে নেই।

অভিনেতার কল্পনাশক্তির দ্বিতীয় প্রয়োজন—স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির মতে—নাটকের অসম্পূর্ণতা পূরণের ক্ষেত্রে। নাট্যাচার্য মনে করেন, পৃথিবীতে কোনো নাট্যকার নেই, যিনি তিন ঘণ্টার পরিসরে একটি চরিত্রকে সামগ্রিক রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করে দিতে পারেন। চরিত্রের জীবনের দু-চারটে ঘটনা মাত্র তিনি সাজাতে পারছেন এবং সে ঘটনার আলোকে চরিত্রের মুখটা খানিকটা উদ্ভাসিত হচ্ছে মাত্র। এতে কি অভিনেতার সমস্যা মিটে গেল? চরিত্রটির কুষ্ঠি-ঠিকুজি না জানলে আমি তাকে দর্শকসমক্ষে হাজির করব কী করে? তার জন্ম থেকে নাটকের ঘটনাকাল পর্যন্ত আমাকে সব জানতে হবে। সে কী রকম পিতামাতার সন্তান, কী পরিবেশে মানুষ হয়েছে, অতীতে তার জীবনে কী কী ঘটনা ঘটেছে যে আজ সে এমন হয়ে গেছে—এসব অভিনেতাকে

জানতে হবে, নইলে চবিত্রটির মনেব গভীবে ডুব দেওয়াব আশা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু এসব তো নাটকে নেই, থাকতে পারে না। পর্দা ওঠাব আগে চবিত্র কোথায কী কবছিল বা পিতামাতাব আদবের ফলেই হয়তো অমন কুচক্রী হয়ে উঠল কিনা, কিংবা 'প্রফুল্ল' নাটক শুরু হবার আগে যোগেশ ও বমেশেব সম্পর্ক কেমন ছিল, এসব নাট্যকারবা বলেন কোথায়? তাই স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি বলেন এসব অভিনেতা নিজে মনে মনে কল্পনা কবে নেবেন। প্রত্যেক চবিত্রের সম্ভাব্য জীবনী লিখে নেবেন অভিনেতাবা। নাটকের ঘটনা থেকে পিছু হটে গিয়ে চরিত্রেব সমগ্র অতীতেব এক কাল্পনিক ইতিহাস বচনা কবে নেবেন অভিনেতা। মস্কো আর্ট থিয়েটারেব শিক্ষাকেন্দ্রে এখনো এটা প্রাথমিক পবীক্ষা কোন ছাত্র কত প্রখব কল্পনা প্রযোগ কবে অভিনেয চরিত্রের অতীত জীবনটা লিপিবদ্ধ কবতে পাবেন।

কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিব কবা উপায ওইটি। যে-কোনো চবিত্রেই আমি অভিনয কবি না কেন, তাব জীবনী লেখা অভ্যাস কবতে থাকলে ক্রমে দেখব আমার সীমিত মানসেব ওপব প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, গিবিশচন্দ্রেব কোনো চবিত্রেব শৈশব-কৈশোব-যৌবনের কথা বাস্তবতাব মধ্যে বেখে কল্পনা কবতে গেলে দেখব গিবিশচন্দ্রের সমকক্ষ হবাব প্রযোজন দেখা দিচ্ছে। সেটা মানসিক দৈন্য ঘোচাবাব পক্ষে দবকাব, আমাব স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা বাড়াবাব পক্ষে দবকাব, আমাব কল্পনাব দিগন্তকে বহু যোজন প্রসাবিত কবাব জন্য দবকাব। এবং এই যে প্রসাব এটা কোনো বিমূর্ত ঈশ্ববকে পাবাব জন্য নয, বক্তমাংসেব মানুষকে পেতে। চবিত্রেব জীবনী লিখতে লিখতে আমি মানুষকে বেশি কবে চিনতে শুরু কবব, তাব দৌর্বল্যে শক্তিতে, দোষে গুণে আকৃষ্ট হব, তাব মানসিক দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা আনন্দ উল্লাসে অভিজ্ঞ হব। আমাব কল্পনাব বাজ্য ছেয়ে যাবে নানা জ্যান্ত মানুষে। এ না হলে অভিনেতা হব কী কবে?

এভাবে জীবনী লিখতে গিয়ে গিবিশে আমাতে দ্বন্দ্বও অনিবার্য। আমি যেভাবে যোগেশ-চবিত্র ভেবেছি তাতে হযতো আমাকে যোগেশেব অতীতে ডুব দিয়ে কল্পনা কবতে হযেছে একান্নবর্তী পবিবাবেব প্রবল অত্যাচার, এবং যৌবন থেকেই বোজগাবে বাধ্য এক যোগেশকে। আমি হযতো যোগেশেব বিশ-বাইশ পঁচিশ ও ত্রিশ বছব বযসে এককেটি ঘটনা কল্পনা কবেছি, যাতে পবিবাবের অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিত যোগেশ ক্রমে উদাসীন ও সিনিকাল হয়ে উঠছে। এইসব কল্পিত অতীত ঘটনাব আশ্রযে আমি মঞ্চে এক বিষাদেব হাসি হাসা ক্লান্ত যোগেশকে উপস্থিত কবতে চাইছি। গিবিশ তা নাও ভেবে থাকতে পারেন। গিবিশের যোগেশ আব আমাব যোগেশে অজস্র গবমিল দেখা দিতে পাবে। সে-ক্ষেত্রে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব বিধান চবম ও নির্মম। তিনি বলেন, অভিনেতাব যোগেশই শেষ কথা, নাট্যকাবেব মতামতেব মূল্য সামান্য। নাট্যকারের সৃষ্টিটি ভ্রূণাবস্থা মাত্র, তাকে সম্পূর্ণ অবযব দিচ্ছেন অভিনেতা নিজ দাযিত্বে। সুতবাং নাট্যকাবকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকাব স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি দিতে বাজি নন। নাট্যকাব জন্মদাতা সত্য, কিন্তু পিতাব কর্তব্য পালন কবেন অভিনেতা, তিনিই পালেন, পোষেন, বড়ো কবেন, চবিত্রটিকে সাবালকত্বে উন্নীত করেন। শুধু জন্ম দিলেই কি পিতা হওযা যায?

স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির নাট্যশালায সুতবাং নাট্যকাববা চিরদিন সশঙ্কচিত্ত অবজ্ঞাত। চেকভেব সঙ্গে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব মনোমালিন্যেব কাবণও এইখানে। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির শিষ্যরা—

মায়াবহোল্‌ড্‌, ভাখ্‌তানগভ, জাভাদ্‌স্কি, বোলেস্লাভ্‌স্কি, কমিসারেভস্কি, ৎসারিওভ কেউই মূল নাটককে গীতাব মর্যাদা দিতে বাজি হননি, নাট্যকারকেও কেশব-জ্ঞানে পুজো কবেন নি। মায়াবহোল্ড এবং ব্রেতিয়াকভ তো নাটকের ওপর কলম চালাবার ব্যাপারে রীতিমতন বাড়াবাড়ি কবেছিলেন! যাই হোক, নাট্যকারবা সংগত কারণে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির ওপর খাপ্পা হয়েছিলেন কিনা, সে-তর্কে আমাদেব এখুনি প্রবেশের প্রযোজন নেই। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি এত বড়ো পবিচালক ও অভিনেতা ছিলেন যে তাঁব সৃষ্টি সত্যিই নাট্যকারেব মূল সৃষ্টিব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ জানাত। চেকভেব 'সীগালেব' চেয়ে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব মঞ্চরূপ কোনো অংশে ন্যূন ছিল না , চেকভের কল্পনাব ত্রিগোবিনের সঙ্গে স্তানিস্‌লাভস্কি অভিনীত ত্রিগোরিন মিলত না, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বিচাবে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির ত্রিগোবিনও কালজয়ী এক ক্ল্যাসিক। অর্থাৎ স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব মতন অভিনেতা প্রতি মুহূর্তে এক শক্তিধর নাটাকারও বটেন। চেকভ তাঁকে 'ছিঁচকাদুনে শিল্পী' বলে উপহাস কবলেও ইতিহাসের বিচারে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি চেকভের সমকক্ষ ও সমান্তবাল প্রতিভা বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

অভিনেতা যদি নাট্যকাবেব স্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত কবতে চান, তবে তাঁকে নাট্যকাবেব মতনই মৌলিক স্রষ্টা হতে হবে। কল্পনাশক্তির যথাযথ থিয়েটাবি ব্যবহাব ব্যতীত এ সম্ভব নয। অভিনেতার কল্পনা ও কবির কল্পনা এক জিনিস নয। খুব খানিকটা ভাবে গদগদ হযে থিযেটাবে কোনো লাভ নেই। থিয়েটাবেব সবটাই অতি বাস্তব, স্থূল, কংক্রীট। থিযেটারের কল্পনা কোনো বিহঙ্গ নয যাকে পাখা মেলে আকাশে উডতে দেখা যায়। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থিযেটারি কল্পনাকে বলেছেন মনশ্চক্ষুর প্রতিমা, অন্তবের চোখ দিযে গডা মূর্তি। তাঁর মতে অভিনেতা চবিত্রটিব অতীত ও বর্তমানে বিভোব হযে কোনো বিমূর্ত ভাসাভাসা ধাবণায গিয়ে পৌঁছবেন না। অভিনেতা অলীক স্বপ্ন দেখতে পাবেন না, সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত কবতে হবে, মঞ্চে কংক্রীট রূপ দিতে হবে, এটা মনে রাখা চাই। তাই চরিত্রটির অতীত বর্তমান প্রভৃতি গবেষণাব পব অভিনেতাকে সুপরিনির্দিষ্ট কিছু ছবি সাজিয়ে নিতে হবে অন্তরে। নাটকের প্রতি ঘটনায় চবিত্রটিব কী চেহারা হবে, তাকে বাইবে থেকে দেখতে কেমন হবে, এসবেব স্থিব ও দৃঢ় চিত্র আগে থেকে পবপর সাজিয়ে নিতে হবে মানসপটে, তেমনি চরিত্রটির প্রতি মুহূর্তে মানসিক চেহাবা কী হচ্ছে, কীভাবে তা পবিবর্তিত হয়ে পবেব চেহারায় পরিণত হচ্ছে, তারও থাকবে মানসচিত্রেব সাবি। পরিচালক যে-কোনো প্রাক্‌শর্ত (given circumstance) আরোপ করুন না কেন, প্রতিটি চলাফেরা, ওঠা-বসা, হাসি-কান্নার নির্দেশ পালন করাব সময়ে অভিনেতার মানসপটে ভেসে উঠবে ওই চিত্রকল্পগুলি, চলচ্চিত্রের ফিল্মের মতন। ফ্রেমের পব ফ্রেম ছুটে যাবে অভিনেতার মনশ্চক্ষুর সামনে দিযে। একমাত্র তখনই পরিচালকের প্রতিটি নির্দেশ হযে উঠবে চরিত্রসৃষ্টিব অবলম্বন, বাধা নয ; প্রতিটি নির্দেশ পালিত হবে চরিত্রের সঙ্গে ভাবসংগতি বজায় রেখে। এমনকী বলা যায় তখন অভিনেতা আব নির্দেশের অধীন থাকেন না, নির্দেশটাই হয়ে ওঠে তাঁব কল্পনাচিত্রের অধীন।

উদাহরণস্বরূপ—ধবা যাক গিবিশচন্দ্রের দানশা ফকির চরিত্র। গিরিশ তাকে যে বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষা দিয়েছেন, যে ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণতায় মণ্ডিত করেছেন, যে কুচক্রীব

চেহারা দিয়েছেন, তা থেকে ধরা যাক অভিনেতা দানশার অতীত কল্পনা করে নিলেন , তাকে করলেন খঞ্জ, লোকের পরিহাসে জর্জরিত হয়ে হয়ে তার মানস বিকৃত কদর্য হয়ে গেছে। আরো ভেবে ঠিক করলেন, নবাব দানশার ওপর চরম অবিচার করেছিলেন, তাই দানশার প্রতিহিংসারও একটা কারণ আছে। এমনিতে হয়তো লোকটা তত খারাপ নয়, কখনো-সখনো লোকটার সারল্য বেরিয়ে আসে না এমন নয়। তারপর ধরা যাক নবাবের বন্দী হবার দৃশ্যে পরিচালক প্রাক্‌শর্ত আরোপ করলেন—বললেন, এই কথাগুলো অস্থিরচিত্তে পদচারণা করতে করতে বলবে। তৎক্ষণাৎ ওই দৃশ্যের মানসপ্রতিমাগুলি উন্মোচিত হল , অভিনেতা দানশাকে খঞ্জ করে দেখাবার সুযোগ পেলেন, তার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আস্ফালনকে বড়ো করে আঁকবার মৌকা পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে দানশার হাতের কম্পন, তার দাড়ি-নাড়ার মুদ্রাদোষ—যা কিছু ভেবেছিলেন অভিনেতা, সব খেলবার পরিসর পেল। সেই সঙ্গে যখন সিরাজ শিশুর জন্য খাদ্য চাইছেন, গিন্নিশের সংলাপকে হুবহু রেখেও মানস-প্রতিমার চালনায় অভিনেতা কোথায় যেন এনে ফেললেন বিষাদের সুর, হয়তো ভীষণ দীর্ঘশ্বাসে অভিষিক্ত হল দানশার নেহাতই মামুলি মুদ্রাদোষ . 'যেমন তেমন দানশা পাইছ!' এ শুধু তখনই সম্ভব যখন অভিনেতার সুশৃঙ্খল দেহ পালন করে সব নির্দেশ, মেটায় নাটকের সব চাহিদা, অথচ তাঁর চোখ থাকে নিজ অন্তরের দিকে ফেরানো, কল্পনায়-গড়া মানসমূর্তির ধ্যানে মগ্ন। এইরকম পরপর সহস্র কল্পচিত্রের মিছিল অভিনেতার মানসকে মুখরিত করে রাখলে প্রতিটি মূহূর্তে অভিনেতা হবেন সত্যবাদী। অন্যথায়—এই কল্পনাশক্তি না থাকলে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি অভিনয়ে-ইচ্ছুক প্রার্থীদের বলতেন, অভিনয় হবে না তোমার, ছেড়ে দাও।

৪. মনোযোগ

অভিনেতার মনোযোগের ক্ষেত্রেই বোধ করি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির উপদেশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী। সর্বদেশের ও সর্বকালের অভিনেতাদের কাছে এ এক জরুরি ও ফলপ্রসূ উপদেশ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনেতা কোন বস্তুর ওপর মনঃসংযোগ করবেন? কোথায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলে চরিত্রের গভীরে অবলীলায় প্রবেশ করা যায়? আমাদের কলিকাতাস্থিত নাট্যজগতে অবশ্য বিরাট সংখ্যক মানুষ তাঁদের মনপ্রাণতনু সমর্পণ করে থাকেন 'পার্টের' ওপর। যে কথাগুলো বলতে হবে সেগুলোকে সঠিক পরম্পরায় বলতে পারছি কিনা, এই মর্মান্তিক কসরতেই তাঁদের মনোযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পদ্ধতিতে এই পার্ট-শেখার দিকটা প্রাথমিক মহলার সময়েই সম্পন্ন করার কথা। মহলার দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন নাট্যগোষ্ঠী পৌঁছেছেন তখনই পার্টটা যান্ত্রিকভাবে গড়গড় করে বলে যাওয়ায় কারুরই আটকাচ্ছে না। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন মহলা চলছে তখন সংলাপগুলো ঢুকে গেছে মজ্জার মধ্যে, শয়নে-স্বপনে তখন অভিনেতারা পার্ট আওড়াচ্ছেন। সুতরাং মঞ্চে যখন তাঁরা আসছেন, তখন 'কী করব' বা 'কী বলব' এসব প্রশ্ন ওঠার অবকাশ থাকে না। এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পরে আসবে মনোযোগের সমস্যা। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির শিষ্যরা মঞ্চের ওপর এসে 'পার্ট'

বা 'বিজনেস' প্রভৃতি প্রাক্‌শর্ত নিয়ে মাতেন না, বৃহত্তর ও গভীরতর সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন। তরাইয়ের জঙ্গল বহু পূর্বেই ভেদ করা হয়ে গেছে, এবার পর্বতশিখরে আরোহণ।

তাই মনোযোগ সম্পর্কে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির নির্দেশ অধ্যয়নের পূর্বে মুখস্থবিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে, সংলাপকে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতন সহজ, অনিবার্য, প্রায় ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত করে তুলতে হবে। আজ টেপরেকর্ডারের যুগে পল মুনির মতন অভিনেতা নিজের পুরো সংলাপ রেকর্ড করে সর্বক্ষণ কানের কাছে বাজিয়ে সেটাকে প্রায় অবচেতনে ঢুকিয়ে নেন , দাড়ি-কামানোর সময়ে, স্নানে, আহারে, বিশ্রামে, শয্যায় অনবরত বাজে নিজ-কণ্ঠে উচ্চারিত [আবেগবর্জিত অভিনয়-রহিত আবৃত্তি মাত্র] নাট্যসংলাপ। এ উপায় যদি হাতের কাছে না থাকে, তবে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির ব্রিটিশ শিষ্যদের প্রক্রিয়াটি অতি সহজলভ্য। এর জন্য দরকার একটি ফুট-বল ; ক্রিকেট বলও ব্যবহার হয়ে থাকে। অভিনেতারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তীব্রবেগে বল লোফালুফি করতে করতে পার্ট বলবেন , কখন কে কাকে বল ছুঁড়ে দেবেন ঠিক নেই—সে বল লুফতে হবে, হাত গলে বেরিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে হবে কারুর দিকে, কিন্তু সংলাপ বলায় কোনো বিরতি থাকবে না, ছেদ পড়বে না। এই বলখেলার এলোমেলো ছন্দে সংলাপমুখী একগুঁয়েমি কেটে যায়, বল এসে বলা-কে উত্যক্ত করে, ক্রমে অভিনেতার মনোযোগ বলের গতিপথে নিবদ্ধ হয় আর সংলাপ বেরুতে থাকে অভ্যাসবশে। তখন বুঝতে হবে পার্ট রপ্ত হয়েছে, সে আর অভিনেতার সচেতন প্রয়াসের অপেক্ষা রাখছে না, যে-কোনো অবস্থায় সে বাধাহীন স্রোতে প্রবাহিত হবে। এরকম নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, তবে সেই সংলাপকে নিয়ে খেলা যায়, সংলাপের পেছনে যে মানুষটা তার মনের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।

তেমনি চলাফেরা ওঠাবাসা ও নানা বিজনেসকে এমনই আত্মস্থ করে নিতে হবে যে তাদের পেছনে মনোযোগ অপব্যয় না করতে হয়। প্রায় ঘুমন্ত অবস্থাতেও অভিনেতা যথাযথ চলাফেরার নির্দেশ পালন করে যাবেন, এমন অনুশীলনে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি বিশ্বাস করেন। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির ডাক প্রায় নিশির ডাক, বলেন তাঁর জর্মন সমালোচকরা, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির নাট্যশালা এক ধর্মীয় মঠ, এই তাঁরা বলেন। এখানে অভিনেতারা প্রায়োপবেশনে ক্লিষ্ট একদল ভিক্ষু যাঁরা অন্ধকারে একই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে রোজ অন্তহীন বৃত্তে ঘুরে ঘুরে এক সম্মোহিত মূঢ়তায় উপনীত হন, সমাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁদের ভর হয়, ধর্ম নামক আফিমে তাঁরা বুঁদ হন, তাঁরা নাকি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ সমালোচনার ব্যঙ্গ-কটূক্তি বাদ দিলে যা থাকে তা কিন্তু স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির দৃষ্টিভঙ্গির পরোক্ষ জয়গানই করে , নাটককে কী গভীর শ্রদ্ধাসহকারে তিনি দেখতেন, কী দুঃসহ তপস্যায় তিনি ব্রতী হয়েছিলেন তারই পরিচয় প্রকাশ হয়। আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে আত্মসম্মোহনে মগ্ন হবার কথাটা একেবারেই অলীক , জ্ঞান হারানো দূরের কথা, জ্ঞানকে টনটনে করে তোলার জন্যই এই সাধনা। তবে সে-জ্ঞানকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে, এইটুকুই স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির দাবি। মনোযোগের অপচয় যেন না ঘটে, খুঁটিনাটিতে যেন অভিনেতা না মজে থাকেন, তিনি যেন মুক্ত মনে সৃষ্টিতে মাততে পারেন, তার জন্যই স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির এত কড়াকড়ি। মানুষের মনটা প্রাসাদ নয়, প্রকোষ্ঠ মাত্র। উদাসীন আনমনা

চিন্তা তাতে প্রচুব ধবে, কিন্তু একাগ্র ধ্যানের বেলায় একটির বেশি দুটি ধরে না। অভিনয় মানে অখণ্ড একাগ্রতা। সেখানে কথাবার্তা চলাফেরাকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে দিলে চলে না।

স্তানিস্লাভ্স্কিব অভিনেতা যখন মঞ্চে আসেন তখন তিনি তীক্ষ্ণ মনঃসংযোগের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্তানিস্লাভ্স্কি বাজে ভাসা ভাসা কথা বলেন না। 'পার্টে ডুবে যাও' বা 'চরিত্রেব মধ্যে ডুবে যাও'—এসব হচ্ছে অক্ষম পবিচালকদেব চালিয়াতি। স্তানিস্লাভ্স্কির নির্দেশ কংক্রীট, বাস্তব, কার্যকবী। আমবা আগে দেখেছি, তিনি চান কল্পনাশক্তিব প্রয়োগে অভিনেতা মানসচক্ষে দেখতে থাকবেন তাঁব চরিত্রের চেহারা—আচরণ—পোশাক—হাবভাব—মুদ্রাদোষ, চলচ্চিত্রের মতন পবম্পবায়। এখন মনঃসংযোগের বেলায় সেই চিত্রপবম্পবাই তাঁর আশ্রয়। কিন্তু মনোযোগকে সেই চিত্রে কেন্দ্রীভূত করতে গেলে নিছক হুকুমজাবি কবে লাভ নেই। কার্যকরী পদ্ধতি একটা চাই। বহু পবীক্ষা নিরীক্ষায স্তানিস্লাভ্স্কি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মঞ্চে উপস্থিত হয়েই পুরো মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহকে হাতের মুঠোয় আনাব চেষ্টা কবে লাভ নেই। সেটা কবতে গেলে মনোযোগ ভেঙে চুরমার হয, বহু-আয়াসে গড়ে তোলা চরিত্রেব মানসপ্রতিমা চূর্ণ হয। মঞ্চে ঢুকেই যাঁবা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্যাঁচ কষেন এবং কখনো কখনো হাততালিও পান, তাঁবা অভিনেতাই নন, সার্কাসের ভাঁড়। অন্যপক্ষে যাঁবা ভাবেন চোখের সামনে ভাসবে শুধুই চবিত্রের মুখ, তাতে ডুবে থাকব, তাঁরা অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলো, পোশাক, মঞ্চসজ্জা, ঘরভর্তি দর্শক প্রভৃতিব মাঝে পডে মনোযোগ হারাবেন, চবিত্রের মানসমূর্তি হাবিয়ে ফেলবেন। তাব বদলে স্তানিস্লাভ্স্কি বলেন, প্রথমে মঞ্চেব কোনো ক্ষুদ্র জিনিসেব ওপর দৃষ্টি ও মনোযোগ একান্ত ভাবে নিবদ্ধ করুন—কোনো টেবিলেব কোণ বা চেযাবেব পাযা বা টেবিল-বাতিব প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে মনোযোগকে দৃঢভাবে সুসংহত কবুন। প্রয়োজনবোধে প্রথম সংলাপগুলি পর্যন্ত ওই বস্তুব দিকে চেযে আরম্ভ কবুন। মনোযোগ বস্তুটিব এমনই উড়ু-উড়ু ভাব যে তাকে বাঁধতে গেলে খুঁটি চাই। মঞ্চের ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে খুঁটি বানিযে মনোযোগকে আগে শক্ত করে বাঁধতে হবে। তারপর ক্রমশ মনোযোগের পরিধি বাড়াতে হবে, সহ-অভিনেতাদের একে একে মনোযোগ-বৃত্তের মধ্যে স্থান দিতে হবে। পুবো মঞ্চ অভিনেতার মানসে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে মনোযোগ-বৃত্তকে (circle of attention) আরো বাডিযে পুবো প্রেক্ষাগৃহে বিস্তৃত কবতে হবে। ব্রেখ্ট্ ও অন্যান্য জর্মন এক্স্প্রেশনিস্টরা যে বলতেন, মস্কো আর্ট থিয়েটাবের অভিনেতাবা কাল্পনিক চতুর্থ দেওযালের পেছনে নিজেদের মধ্যে মশগুল থাকেন, দর্শককে ভুলে যান, সে-কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ সত্য নয। অথচ স্তানিস্লাভ্স্কি বলেন প্রকৃত অভিনেতা সে-ই যে মনোযোগ-বৃত্তের মধ্যে পুরো দর্শককে স্বাগত জানাতে পাবে। ব্রেখ্ট্-এব অভিনেতা থিযেটারকে থিয়েটাবই ভাবেন, 'ম্যাজিক ইফ' মন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তিনি মঞ্চে এসেই সজোবে ও সদর্পে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি কথা শুরু করেন। স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনেতা সে-ক্ষেত্রে 'যদি'-মন্ত্রের কঠোর তপস্বী , সুতরাং দর্শকের কাছে তাঁর যাওয়াটা একটা বিলম্বিত প্রক্রিয়া, ক্ষুদ্রতম বস্তু থেকে ক্রমশ বৃহত্তর পরিসরে যাওযা, সতর্ক ধাপে-ধাপে, পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়। কিন্তু দর্শককে বাদ দিয়ে অভিনয়ে মগ্ন হবার কথা স্তানিস্লাভ্স্কি কস্মিন্‌কালেও বলেননি।

মনোযোগ-বৃত্তকে শুধু ছড়িয়ে দিলেই চলবে না, তাকে আবার এক মুহূর্তে গুটিয়ে আনাও শিখতে হবে। স্তানিস্লাভ্স্কি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, বৃত্তের সীমারেখা হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসে নানা কারণে, মনোযোগের তীব্রতা হ্রাস পায়, গভীরতা কমে আসে—এবং এটা ঘটে যখন মনোযোগ-বৃত্ত তার বৃহত্তম পরিধিতে পৌঁছেছে। বৃত্ত যত বৃহৎ হয় তার তীক্ষ্ণতা ততই হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আকারে ও প্রকৃতিতে চিরদিনের বিরোধ। বৃত্তের সীমারেখা ঝাপসা হতে পারে বহু কারণে, যেমন অভিনেতার ক্লান্তি, দর্শকদের হাততালি ইত্যাদি। তখন দ্রুতগতিতে মনোযোগ-বৃত্তকে ছোটো করে এনে আবার ক্ষুদ্র বস্তুটির ওপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আবার মনের স্থৈর্য ফিরে পেলে ধীরে ধীরে বৃত্ত বড়ো করার পালা। এইরকম সতর্কভাবে বৃত্তের সম্প্রসারণ ও সংকোচন চলবে পুরো নাটক জুড়ে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, আবার বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রে। চরিত্রের মানস-প্রতিমায় দৃঢ়ভাবে মনঃসংযোগ করার এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা, স্তানিস্লাভ্স্কির মতে। এবং এটা যে নিছক তত্ত্বকথা নয়, বাস্তব একটি পন্থা, তার প্রমাণ মিলেছে মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয় দেখতে বসে। তলস্তয়ের নাটকে সোভিয়েত জনগণের শিল্পী তোপোরকভ নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে অভিনয় শুরু করলেন, এবং দেখতে দেখতে দশ-বারো লাইনের মধ্যে পুরো প্রেক্ষাগৃহ তাঁর করতলগত হয়ে পড়ল, এটা স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি আবাকুমভকে টেবিলে রাখা একটা কাঁটাচামচ নিয়ে খেলা করতে করতে সংলাপ শুরু করতে অস্ত্রোভ্স্কির নাটকে, এবং ধাপে ধাপে মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ অধিকার করে নিতে। এমন কী লরেন্স্ অলিভিয়েরকে চেকভের নাটকে নিজের চশমাটা হাতে নিয়ে তাতে মনঃসংযোগ করে অভিনয় আরম্ভ করতে দেখেছি। স্তানিস্লাভ্স্কির পথ যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের অভিনয়ের শক্তি মূলত মনোযোগ-বৃত্ত নিয়ন্ত্রণে নিহিত, এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। পুরো প্রেক্ষাগৃহকে মর্যাদা দিয়েও নিজ-চরিত্রে সম্পূর্ণ ডুবে থাকার ডায়ালেক্‌টিকাল প্রক্রিয়া একটিই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমাদের দেশের নাট্য-আন্দোলনের জগতে মনোযোগ-বৃত্ত সৃষ্টি করার আরো জরুরি প্রয়োজন হয়েছে, এটা বোঝা যায় প্রচলিত কাণ্ডকারখানা দেখেই। অভিনেতার মনোযোগ প্রথমত কেন্দ্রীভূত থাকছে মুখস্থ করা লাইনগুলো উগরে দেওয়ার সাধনায়। সেটা যদি বা দূর করা গেল, ক্লান্তিকে রোখা যাবে কী করে? আমাদের অনেক অভিনেতাকে মঞ্চে এত অবসন্ন দেখায় কেন? জানি দু-মুঠো অন্নের জন্য তাঁরা সারাদিন প্রাণপাত করেন, কিন্তু নাট্যদেবতা পাষাণ-হৃদয়, করুণা তাঁর ধাতে নেই, ক্লান্তি আমার ক্ষমা করেন না প্রভু। সেক্ষেত্রে মনোযোগ-বৃত্তের কৌশল আয়ত্ত করলে পরিশ্রান্ত মনটাকেও কাজে লাগানো যায়। তা ছাড়াও কোনো দলে থাকে নেপথ্যের গণ্ডগোল এবং সাজঘরের বাকবিতণ্ডা, থাকে মঞ্চসজ্জা পরিবর্তনে বিশৃঙ্খলা, শোনা যায় লোহার ব্রেস পড়ে যাওয়ার মেঘমন্দ্র শব্দ। এসব থেকে অভিনেতার মনোযোগকে রক্ষা করতে পারে স্তানিস্লাভ্স্কির পথ।

মনোযোগের সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িত দৃষ্টির প্রশ্ন, মুখভাবের প্রশ্ন। অভিনেতার মনোভাবের বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে মুখভাব। অভিনেতার মনের হদিশ মেলে তাঁর চোখ দুটিতে। মনোযোগের ধার যাঁরা ধারেন না, আমাদের দেশের এরকম উৎকট কিছু নট বলতেন 'এক্স্প্রেশন দে!' সে

এক ভয়ংকর দৃশ্য। অভিনেতা তরতর করে অনেক কথা বলতে বলতে হঠাৎ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে ঠোটে এক মোহন হাসি ফুটিয়ে মুখের মাংসপেশী থরথর করে কাঁপাতে লাগলেন—অবশ্যই কড়া ফোকাসের আলোয়। এই হল ক্রোধেব এক্‌স্‌প্রেশন, অথবা দিল্লির বাদশার প্রতি অবজ্ঞাসূচক চ্যালেঞ্জের। আবার ধরা যাক কাঁপানো গলায় বিলাপ করতে করতে হঠাৎ সংলাপ বন্ধ, শেষ কথাটাকে বাব বার পুনরাবৃত্তি আর্ত ব্যাকুল স্ববে, এবং তখন মুখটাকে নিম্বভক্ষণের পববর্তী অবস্থায় অভিষিক্ত করে দবদব কবে সত্যিকারেব অশ্রুমোচন—কড়া ফোকাস! হাততালি! এটা হল গে দুঃখের এক্‌স্‌প্রেশন।

এইসব প্যাঁচ-পয়জারি আসলে অভিনয়ই নয়, এটা আর বলার অবকাশ রাখে না। 'এক্‌স্‌প্রেশন' বলে আলাদা কিছু নেই। চরিত্রের ধ্যানে মগ্ন থাকলে, নির্ধাবিত নাট্যঘটনার সম্মুখীন হয়ে যা স্বাভাবিক ভাবে মুখভাবে প্রকাশ পাবে তাই যথেষ্ট। তার বেশিটা দুর্বিনয় বা স্পর্ধা।

কিন্তু নাট্য আন্দোলনেব অভিজ্ঞ গোষ্ঠীতেও দেখি অনেকে যেন স্থিবনিশ্চয় নন কোনদিকে তাকাবেন। কেউ সদাসর্বদা দর্শকের দিকে তাকিয়ে থাকাটাকে ব্রত হিশেবে গ্রহণ কবেছেন, সহ-অভিনেতার দিকেও একবাব ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করেন না। কেউ আছেন যাঁদের চোখ সদা চঞ্চল, অস্থিরা হরিণীব ন্যায় সে-চোখ সদা ধাবমান, দুদণ্ড কোথাও দাঁড়াবাব সময় নেই; সে-দৃষ্টি যেন সুকান্তর রানাব, সূর্য ওঠাব ভয়ে সে ছুটছে তো ছুটছেই। কারুর কারুর চোখের পাতা পিটপিট কবে অনবরত, যেটা স্টেজ-ফ্রাইট বা মঞ্চভীতি ঢাকবার একটা অচেতন প্রয়াসমাত্র। এঁরা বোঝেন না চোখের স্থৈর্য তথা মুখেব প্রশান্তি ব্যতীত কোনো চরিত্রই দানা বাঁধতে পারে না।

স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি পদ্ধতিতে যাঁরা শিক্ষিত হন, তাঁদেব চোখ আলাদা জিনিস। সে চোখ কখনো শান্ত, সমাহিত, কখনো প্রখর। সে-দৃষ্টি কখনো নিজেব অন্তরে আবদ্ধ, কখনো সহ-অভিনেতার চোখের দিকে মেলে-দেওয়া, কখনো কোনো বস্তুকে দগ্ধ করা। কখনো আত্মবিশ্লেষেণে সে-চোখ উদাস হয়ে আসে [স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির আলোকচিত্র দেখুন]; কখনো বা সহ-চরিত্রের কোনো কথায় চট করে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সে-চোখের পলক প্রায় পড়ে না। যে-দিকে তাকাচ্ছেন সচেতন ভাবে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাকাচ্ছেন। দৃষ্টিতে রয়েছে বিনীত ও নীরব একটি ঘোষণা—এই মঞ্চ-মানুষ-বেশভূষা সব কিছুকে আমি বিশ্বাস করি, এসব এই মুহূর্তে সত্য। চোখের এই সততা, সত্যবাদিতার উৎস হচ্ছে মনোযোগ-বৃত্তের সঠিক নিয়ন্ত্রণ।

৫. মাংসপেশী

উৎকণ্ঠার চাপে অভিনেতার দেহের কোনো না কোনো অংশে টান ধরবেই, কোনো না কোনো পেশী শক্ত হয়ে উঠবেই। রিহার্সালে সাথীদের সামনে এটা কিছু কম পরিমাণে হয়, মঞ্চে গিয়ে তার দ্বিগুণ। অথচ স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পথে এগুতে গেলে—'যদি এটা সত্যি হত' এ কথাটাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে গেলে—শরীরটাকে রাখতে হবে শান্ত, শিথিল, স্বাভাবিক। বিন্দুমাত্র

আড়ষ্টতা অভিনয়কে অসত্য করে দেয়—এটা স্তানিস্লাভ্স্কির দৃঢ় মত। বিশেষ করে আবেগপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে অভিনেতার দেহ বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। ওই বিশেষ মুহূর্তটি আসার কিছু আগে থেকেই অভিনেতার পেটে বা কাঁধে বা বাহু দুটিতে উদ্বেগের শিহরণ জাগতে শুরু করে, এ অভিজ্ঞতা সব অভিনেতার আছে। তারপরই পেশী সংকোচন ঘটে এবং অভিনেতা তার মোকাবিলা করেন 'পোজ' দিয়ে দেহটাকে অস্বাভাবিক এক ভঙ্গিমায় স্থাপন করে। স্বাভাবিক হতে না পারলে অস্বাভাবিকটাকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরার একটা প্রবণতা জাগে। আর রঙ্গমঞ্চে ক্ষুদ্রতম দোষও বহুগুণ বৃহৎ হয়ে দেখা দেয়, কেননা তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত মঞ্চের দিকে সহস্র জোড়া চক্ষু যেন দূরবিন কষে তাকিয়ে থাকে।

দেহের প্রতিটি মাংসপেশীকে সুতরাং নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ব্যায়াম ও খেলাধূলা মারফৎ। কিন্তু তবু মঞ্চের উৎকণ্ঠা একেবারে কাটে না, এটা স্তানিস্লাভ্স্কির অভিজ্ঞতা। ব্যাযামে পেশী-সংকোচন কমে, কিন্তু নির্মূল হয় না। তাই স্তানিস্লাভ্স্কি পেশীর আড়ষ্টতাকে চেতনার স্তরে তুলে আনতে বলেছেন। অভিনয়কে ধ্বংস করে পেশীর টান, সেটা অভিনেতার অজান্তে ঘটে যায় বলেই সমস্যা। অভিনেতা ব্যস্ত থাকেন পার্ট বা চরিত্র নিয়ে আর তাঁর অন্তঃসলিলা সেই উৎকণ্ঠা সেই সুযোগে গোপনে ছড়িয়ে যায় দেহের কোনো সীমান্তে, বিষক্রিয়ায় মৃতবৎ শক্ত কবে দেয কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে। এখন অভিনেতা যদি এ-সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকেন, তাহলে সেই অনিবার্য দুর্ভাগ্যকেও তিনি ব্যবহাব করতে পারেন অভিনয়ের স্বার্থে। তিনি মানসিক দিক থেকে নিজেকে এমনভাবে তৈরি কববেন যে তাঁর অজান্তে কিছু ঘটতে পারবে না শবীরে। পেশী-সংকোচন মাত্রেই তিনি সতর্ক হবেন। তখন হয় জোরে দম নিয়ে বা কোনো একটা জিনিস নাড়াচাডা কবে অথবা চবিত্রানুগ অন্য কোনো টুকরো কাজেব মধ্য দিযে একই সঙ্গে মাংসপেশীব উত্তেজনাকে প্রশমিত করবেন এবং চরিত্রকেও আরো পবিস্ফুট কববেন। উত্তেজনাকে যদি একেবাবে দমন কবতে নাও পারেন, তবে চবিত্রানুগ ওই সব ছোটোখাটো হাত বা মুখেব কাজে যা সৃষ্ট হবে সেটা কৃত্রিম কোনো দেহভঙ্গিমা নয়, সচল এক চিত্র যা সামগ্রিক চরিত্র-চিত্রণেব সহায়ক। সেটা আব 'পোজ' থাকবে না, হবে 'অ্যাকশন'।

স্তানিস্লাভ্স্কিব কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন শিষ্য আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন, মাংসপেশীব বিক্ষেপ যখন অনিবার্য. তখন সেটাকে দেহেব কোনো এক অংশে কেন্দ্রীভূত করে নিলে বাকি দেহটা তৎক্ষণাৎ নিস্তবঙ্গ ও শান্ত হয। কেউ একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ কবেন, কেউ বা একটা কাঁধ শক্ত কবে সেখানে টেনে নেন দেহেব সব আড়ষ্টতা। স্পেনসার ট্রেসি লিখেছেন, বিখ্যাত মার্কিন অভিনেত্রী ক্যাথাবিন কর্নেলের পায়ের চেটো রক্তাক্ত হযে যেত, এত জোরে তিনি মেজেতে পাযের চাপ দিতেন।

বিভক্তিকরণ। স্তানিস্লাভ্স্কি ভাসা ভাসা চিন্তা ও ধোঁয়াটে কথা একদম সইতে পারতেন না। আস্ত একটি চরিত্রকে দু-কথায বর্ণনা কবা যায় এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না। 'লোকটা বাইরে কঠোর, ভেতরে কোমল'—এ ধরনের সরলীকরণ তাঁর মতে অর্থহীন, অভিনেতার কাছে বিপজ্জনক। চরিত্রায়ণ হবে মূল নাট্যাংশেব লাইন ধরে ধরে! যে কোনো ভালো নাট্যকারের

যে কোনো চরিত্রের সংলাপে-সংলাপে থাকে পরিবর্তন, ঝোঁকের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য। কংক্রীট সংলাপের ভিত্তিতে চরিত্রের জটিল ও আঁকা-বাঁকা গতি লক্ষ করতে হবে, তার প্রতিটি রহস্যের হিশাব নিতে হবে। সেইজন্য অভিনেতার কর্তব্য হচ্ছে, নিজের পার্টকে ছোটো ছোটো খণ্ডে ভাগ করে ফেলা এবং আলাদা প্রতি খণ্ডের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া। তারপর সেগুলো জুড়ে অনুশীলনের মাধ্যমে সামগ্রিক অখণ্ডতায় উন্নীত হতে হবে। প্রতিটি খণ্ডের একটি শিরোনামাও দেওয়া উচিত, একটি ক্রিয়াপদকে আশ্রয় করে নাম দিলে সমগ্র চরিত্রের সহজ অংশ হিশেবে খণ্ডটা চিহ্নিত হয়। যেমন 'ওথেলো' নাটকের 'রুমাল' দৃশ্যটা স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি উনিশ খণ্ডে ভাগ করে নাম দিয়েছিলেন ; যথাক্রমে 'আমি ডেসডেমোনাকে ভালোবাসতে চাই', 'আমি তাকে পরীক্ষা করতে চাই', 'আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করতে চাই', 'আমি তাকে ঘৃণা করতে চাই' ইত্যাদি। ওথেলোর চাওয়াকে নানা রূপে নানা দিক থেকে দেখছেন অভিনেতা স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকে বেঁধে রেখেছে ওথেলোর ব্যাকুল চাওয়া। সুতরাং পরে এদের একসূত্রে গ্রথিত করা সহজ একটি প্রক্রিয়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য, নাট্যদৃশ্যের এই বিভক্তিকরণ ও নামকরণ ব্রেখ্‌ট পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে।

সততা। অভিনেতার চোখে সত্য কী? যাঁরা বলেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি বাস্তবতা ও সততা নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করতেন, তাঁরা স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি পড়েননি। বরঞ্চ স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি বলতেন, মঞ্চে 'সত্য' নিয়ে আদিখ্যেতা অভিনয়ের সর্বনাশ করে, 'মিথ্যা' সম্পর্কে ছুৎমার্গ অভিনয়কে ভিতু করে দেয়। অভিনেতার সততা শুধু এইটুকুই যে নিজের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি চলাফেরা **নিজের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠবে।** কথাগুলো বলে ভালো লাগবে, মনে হবে এই প্রথম বললাম। মনে হবে কথাগুলো আমারই অন্তর থেকে বেরুচ্ছে। প্রতিটি চলাফেরা ও ছোটো কাজকে মনে হবে অনিবার্য ও যথাযথ। তার বেশি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি কিছুই চাননি।

বিমূর্ত চরিত্রচিন্তা যেহেতু স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির অসহ্য তাই সততা সম্পর্কেও তাঁর নিদান বাস্তব ও স্থূল। কী করে অভিনেতা প্রতি মুহূর্তে নিজের কাজে সৎ থাকবেন? কী উপায়ে অভিনেতার প্রতি কথা ও কাজে আন্তরিকতার সুর লাগবে? বড়ো বড়ো দার্শনিক তর্কের পরিবর্তে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি দিয়েছেন সহজ সমাধান : ছোটো ছোটো অসংখ্য 'বিজনেসে' ভর্তি করে নাও পার্ট, ছোটো ছোটো কাজে নিযুক্ত রাখো হাত দুটিকে, সেইসব কাজ করতে করতে সংলাপ বল—দেখবে [যদি অবশ্য প্রাক্‌শর্ত ও যদি-মন্ত্র মেনে নাও] কথাবার্তা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হচ্ছে, নিজেকে সাবলীল মনে হচ্ছে, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছ। পুরো চরিত্রটা একেবারে সত্য হচ্ছে কিনা, এ প্রশ্ন যে তোলে সে মূর্খ। বহু ছোটো ছোটো চলাফেরা, ওঠাবসা, গেলাস তোলা-নামানো, চশমা মোছা-পরা-খোলা, ঘড়ি দেখা বা তাতে দম দেওয়া, বই খোলা, লেখা, চুরুট-সিগারেট নিয়ে খেলা করা ইত্যাদির সাহায্যে একেকটা মুহূর্তকে সত্য করে তুললে সবটাও সত্য হবে, নচেৎ নয়। এইরকম ছোটো কাজের ছটি বিশেষ গুরুত্ব নির্দিষ্ট করেছেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি:

(১) প্রচণ্ড সংঘাতপূর্ণ নাট্যমুহূর্তে ছোটো একটি 'বিজনেস' রীতিমতন চমক সৃষ্টি

করে বৈপরীত্যের পথে।

(২) সংঘাতপূর্ণ মুহূর্তে অতি-অভিনয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা অবদমিত হয় ছোটো 'বিজনেসে' মনোনিবেশ করলে।

(৩) অভিনেতার মনে পার্টের যে অংশটি সম্পর্কে আশঙ্কা বা উদ্বেগ থাকে, সে-অংশ এগিয়ে আসতে থাকলে অভিনেতা এইসব ছোটো 'বিজনেস' দিয়ে নিজেকে শান্ত করতে পারবেন।

(৪) ছোটো ছোটো 'বিজনেস' শরীরের নড়াচড়াকে ছন্দোবদ্ধ করে, কথার সঙ্গে দেহকে এক ছন্দে বাঁধে।

(৫) বাস্তব জীবনে কথার পেছনে থাকে অনেক চিন্তা ও নানা অর্থের আমেজ। মঞ্চে অন্যের লেখা কথায় এই পশ্চাৎপট থাকে না বলেই তা অসত্য শোনাবার ভয় থাকে। এই শূন্যতা ভরাট করে 'বিজনেস'। যেমন বাস্তবে আমার বন্ধু বললেন, 'রাত এগারোটা বাজল, ওঠা যাক।' সঙ্গে সঙ্গে আমার অবচেতনে 'রাত এগারোটা' কথা-দুটি চিত্রকল্পের বান ডাকাল , আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছেন গৃহে, ক্ষুধা অনুভব করছি, ঘুম পেয়েছে, কীসে ফিরব, ট্রাম কি চলছে এখনো, শয্যা বড় আরামের, কাল ভোরে কাজ আছে অনেক, ইত্যাদি। এইসব চিন্তা ক্ষণপ্রভ গতিতে মনের মধ্য দিয়ে ছুটে যায়, তাই আমি বলে উঠি, 'সেরেছে! এগারোটা?' বাস্তব জীবনে 'সেরেছে! এগারোটা?' সংলাপটি তাই বেরোয় সত্য হয়ে। স্তানিস্লাভ্স্কি বলছেন, মঞ্চে এই সম্পৃক্ত-চিন্তার অভাবকে পূরণ করতে পারে ছোটো ছোটো 'বিজনেস'।

(৬) কথার মাঝে হঠাৎ যতি পড়লে যেমন নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়, তেমনি সে-যতিকে শতগুণ উজিয়ে দেওয়া যায় ও যদি বিজনেসেও পড়ে ছেদ—স্তব্ধতার সঙ্গে যুক্ত হয় স্থিরচিত্র।

স্মৃতি। অভিনেতারা চিবদিন একটা ব্যাপারে অযথা বলক্ষয় করে থাকেন। কবে কোন রিহার্সালে বা অভিনয়ে একটা জায়গায় পার্ট বলতে বলতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল, চোখে এসেছিল জল। তাবপর আর কিছুতেই হচ্ছে না, সেরকমটি আর হল না। অভিনেতা মানসিক কষ্টে কাল কাটাতে থাকেন, আর মাথা খুঁড়ে মনে করার চেষ্টা করতে থাকেন সেই গৌরবময় মুহূর্তটিতে কীভাবে কথাটা বলেছিলেন। গায়ের জোরে তিনি বিস্মৃত সেই মুহূর্তটাকে ধরবার চেষ্টা করতে থাকেন। স্তানিস্লাভ্স্কি বলেন, এটা শক্তির অপচয়। ঠিক যেভাবে বলেছিলেন সেটা মনে পড়লেই বা লাভ কী? এবার ঠিক সেভাবে বললেও কোনো রোমাঞ্চ না জাগার সম্ভাবনা, কেননা প্রথমবারটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত ; দ্বিতীয়টি হবে চেষ্টিত, আয়াসলব্ধ, গলদ্‌ঘর্ম।

তার চেয়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতি সংলাপে আগের সব ভুলে গিয়ে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করি, নতুন করে অনুভব করি—রোমাঞ্চ ও অশ্রুর উদ্রেকের সম্ভাবনা তাতে ঢের বেশি। মঞ্চের আলো, সজ্জা, সহ-অভিনেতারা, প্রাক্‌শর্তগুলি—সবের কাছে রোজ একবার

নতিস্বীকার করে রোজ নতুন করে বাঁচি , তাতেই জীবন্ত চরিত্র হতে পারব। অভিনেতার স্মৃতিশক্তি চালিত হোক জীবনে-দেখা বাস্তবে-দেখা নানা মানুষের দিকে, তাদের হাবভাব আচরণ কথাবার্তার দিকে। অমুক তারিখে অমুক জায়গায় কী যে করেছিলাম এখন আর মনে আসছে না—ছায়ার সঙ্গে এই মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ হোক। রোমাঞ্চটাকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা না করে, রোমাঞ্চের যেটা উৎস সেই প্রাক্‌শর্তগুলির ধ্যানে মগ্ন হোন—এই হচ্ছে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির সার কথা।

মূ ল্যা য নে র প্র য়া স

স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিকে গাল দেওযা বহুদিনের একটা ফ্যাশান। অকটোবর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ইউনিযনে কয়েক বৎসর এই গালাগাল হিংস্রতার পর্যায়ে ওঠে। বুখারিন তখন মানুষকে মৌমাছিব সমগোত্রীয় বলছেন। প্রোলেটকুল্‌ট্‌ গোষ্ঠীরা প্রকাশ্যে বলছেন তাঁরা পুশকিন, গোগোল, দস্তয়েভ্‌স্কি ও তলস্তয়কে নির্মূল করে ফেলেছেন। লোককবিরা প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছেন। ইমেজিস্ট ও প্রতীকবাদীরা সোজা বলে দিচ্ছেন শিল্পসাহিত্যে অর্থ ও তাৎপর্যের কোনো প্রয়োজনই নেই, স্রেফ রং, স্রেফ ধ্বনির কসবতটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ব্রিউসভ বলছেন, কাব্য বলে কিছু নেই, দোকানে বসে রসায়ন দ্বারা কবিতা তৈরি কবা যায়। সস্‌নভ্‌স্কি বলছেন, রুশ জাতিটাই নির্বোধ, এদের নিশ্চিহ্ন করা দরকার। এমনকী গোর্কি বলছেন, রুশ চাষিরা আধা বর্বর, চলচ্ছক্তিরহিত। মায়াকভ্‌স্কি কবিতার কারখানা খুলতে চাইছেন। ট্রট্‌স্কি লিখছেন, প্রোলেতারীয শিল্প বলে কিছু নেই। পার্টি-নেতৃত্ব এই সব কালাপাহাড়ি পাতিবুর্জোয়া চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াই কবতে পাবছিলেন না, বৃহত্তর যুদ্ধের সমস্যায় মগ্ন থাকার ফলে।

নাট্যশালাতেও এইসব ট্রট্‌স্কিবাদীরা তুলকালাম কাণ্ড বাধায় এবং তার নেতৃত্ব করেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব ছাত্র মায়ারহোল্‌ড্‌। 'অকটোবব থিয়েটার ফ্রন্ট' নামে এক যুদ্ধং দেহি সংগঠন গড়ে, মাযাবহোল্‌ড্‌ ও ফরেগার এক সার্কুলার জারি করেন , তার দু নম্বব অনুচ্ছেদে লেখা আছে: 'সর্বপ্রকার পুরাতন নাটকের উচ্ছেদ চাই'। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নূতন নাট্যসৈনিকরা পুবাতনকে উপড়ে ফেলার নেশায় বহু চমকপ্রদ পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। স্বভাবতই এইসব আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য কনস্তানতিন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি, তাঁর থিয়েটাব, তাঁর পদ্ধতি। সর্বপ্রকাব পুরাতন নাটক উচ্ছেদ হলে, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি তাঁর চেকভ-ইবসেন-তলস্তয়-হাউপ্টমানের পসরা নিয়ে উচ্ছেদ হতে বাধ্য। মায়ারহোলডের বায়োমেকানিক্‌স্‌-তত্ত্ব প্রযুক্ত হলে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পদ্ধতি টেঁকে না। মায়ারহোল্‌ড্‌ বললেন, উন্মাদ ছাড়া কেউ ভাবতেও পারে না আমি সত্যিই হ্যামলেট হব। তিনি বললেন, থিয়েটার প্রবলভাবে থিয়েটারই হবে। থিয়েটার কুণ্ঠিত হয়ে থাকবে কেন? সে যা নয় তা হবার ভান করবে কেন? স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি মিথ্যাচারী; সত্যের ভান করে তাঁর জীবন কেটেছে। ভান কখনো শিল্প হতে পারে না। ট্রট্‌স্কির সুপারিশে সোভিয়েত সরকার মায়ারহোল্‌ড্‌কে জনতার শিল্পী উপাধিতে ভূষিত কবলেন, এবং কুৎসিত গালাগালে

ভূষিত স্তানিস্লাভস্কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মানসিক যাতনায় দিন কাটাতে লাগলেন।

অবশেষে লেনিন স্বয়ং বারংবার বক্তৃতা ও লেখায় প্রোলেটবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, এইসব নয়া কালাপাহাড়রা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, অবক্ষয়ী বুর্জোয়া মাত্র। তিনি অতীতের সব মহান সাহিত্যকে শ্রমিকের কাছে নিয়ে যাবার ডাক দিলেন, এবং পরবর্তীকালে স্তালিন এই নির্দেশ কার্যকরী করেন।

প্রোলেটবাদীরা স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির যা সমালোচনা করেছিলেন তার অনেকটাই ঈর্ষা ও বিদ্বেষপ্রসূত। প্রকৃত সুসংবদ্ধ সমালোচনা এসেছিল বাইরে থেকে, জর্মনি থেকে, এক্স্প্রেশনিস্টদের মূল্যবান রচনাগুলিতে—পিসকাটর, কর্নফেল্ট্ ও ব্রেখ্টের কলম থেকে। ১৯২২ সালে সফররত মস্কো আর্ট থিয়েটার বার্লিনে 'তিন ভগ্নী' অভিনয় করেন , ব্রেখ্ট্রা সে নাটক দেখে 'অভদ্রভাবে হেসে উঠেছিলেন' একথা ব্রেখ্ট্ পরে লজ্জিত বিনয়সহকারে স্বীকার করেছিলেন (নাবোকভ বিবিসি সাক্ষাৎকার)। কিন্তু ব্রেখ্ট্-এর এপিক থিয়েটারের তত্ত্ব স্তানিস্লাভস্কি পদ্ধতির যে বিরোধিতা করে তা তীক্ষ্ণ ও অনেকাংশে অকাট্য যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রেখ্ট্-এর সমালোচনা সর্বহারা বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা। ব্রেখ্ট্ দেখলেন ইয়োরোপের নব্য থিয়েটার স্তানিস্লাভস্কির সর্বাত্মক প্রভাবে এক রক্ষণশীল বিশুদ্ধতার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যে স্তানিস্লাভস্কি পুরাতন সব পচা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তিনি নিজেই এখন এক অনড় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছেন। পুরাণ পুড়িয়ে ফেলে তিনি নিজেই হয়ে পড়েছেন পৌরাণিক দেবতা। সে থিয়েটারকে আঘাত না করে এক কদমও কেউ আগে বাড়তে পারছে না। মার্ক্সবাদের একটি সূত্রই এই সব বস্তু নিজের বিপরীতে পরিণত হয়, সর্বসময়ে হচ্ছে।

স্তানিস্লাভস্কি-পদ্ধতি অনুসরণ করে অভিনেতারা যেন নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে গেছেন। নিজেদের একটি ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে চলছেন, ফিরছেন, মৃদুস্বরে কথা কইছেন, দর্শককে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন অন্য এক জগতে। বিকল্পে ব্রেখ্ট্-এর দাবি, অন্য জগতে নয়, দর্শককে তার নিজের জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করাই হচ্ছে থিয়েটারের কাজ। সে-জগতের যত দ্বন্দ্ব সব মেলে ধরে সে-জগৎকে পরিবর্তিত করায় উৎসাহী করাই হচ্ছে কাজ। স্তানিস্লাভস্কির থিয়েটারে কি তা সম্ভব? সেখানে পূর্বেই ধরে নেওয়া হচ্ছে—**যদি** এই ঘরটা সত্যি হত, **যদি** এটা চেকভ-বর্ণিত গ্রাম্য জমিদারের গৃহ হত, **যদি** আমি সত্যিই ত্রেপলেভ হতাম, ইত্যাদি। ব্রেখ্ট্-এর থিয়েটারে এই স্বপ্নভিত্তিক মিথ্যা '**যদির**' কোনো স্থান নেই। বিপ্লবী ব্রেখ্ট্ একটি **যদিই** স্বীকার করেন—**যদি** দর্শককে সচেতন করতে হয় তাহলে আমি কী করব?

মনোযোগ-বৃত্ত সম্পর্কে স্তানিস্লাভস্কির যে নির্দেশ, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দর্শককে ভুলে যাওয়া। ক্ষুদ্র কোনো বস্তুতে মনোযোগ নিবদ্ধ করে ক্রমশ সে-বৃত্তকে বাড়িয়ে প্রেক্ষাগৃহে বিস্তৃত করতে হবে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহটা অভিনেতা দেখতেই পাবেন না, এমনই অন্তর্মুখী তাঁর মনোযোগ। এবং সামান্যতম গোলযোগের সম্ভাবনায় চট করে বৃত্ত ছোটো করে ক্ষুদ্র বস্তুতে ফিরে আসতে হবে। ব্রেখ্ট্-এর বিপ্লবী থিয়েটারে এটা আত্মহত্যার সামিল। দর্শক হচ্ছে থিয়েটারের লক্ষ্য , তাকে বাদ দিয়ে যে একান্ত অভিনয় তা অকিঞ্চিৎকর একটা বিলাস মাত্র, সমাজজীবনে তার

কোনো স্থান নেই। থিয়েটারকে হতে হবে সমাজের বিশাল ভাঙাগড়ার দর্পণ এবং ব্যাখ্যাকার। শ্রেণীসংগ্রামের জটিল প্রকাশগুলিকে রূপ দিতে হবে, দ্বন্দ্বগুলির স্বরূপ খুলে ধরতে হবে। স্তানিস্লাভ্স্কির আত্মমগ্ন অভিনেতারা চরিত্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে মঞ্চের জগৎটাকে চরম ও পরম ভেবে নিয়ে তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন , ইতিহাসের ব্যাখ্যাতার ভূমিকায় তাঁরা ব্যর্থ, সমাজের সৃষ্টি ও লয়ের বিশালত্বের পাশে তাঁরা খেলো, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ।

এপিক থিয়েটারে তাই পার্টে ডুবে যাওয়া চলে না। দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার অভিনেতা একই সঙ্গে হ্যামলেট ও হ্যামলেটের ব্যাখ্যাকার। তিনি দূরত্ব রক্ষা করে চলেন। তিনি যেন দর্শককে এসে বলছেন, হ্যামলেটের জীবনে এইসব ঘটেছিল, দাঁড়াও তোমায় আমি করে দেখাচ্ছি। প্রাচীন মহাকাব্যের ঐতিহ্যই তাই। সঞ্জয়ের মুখেই তো শুনি কুরুক্ষেত্রের বিবরণ, এনেয়াসের মুখে শুনি ত্রয়-নগরী ধ্বংসের বর্ণনা। সেই সূত্র ধরে ব্রেখ্ট্ সৃষ্টি করেছেন আজকের মহাকাব্য। এপিক কেন এপিক হয়, আর কেন চেকভকে মনে হয় শুধুই একটি ঘটনা? অর্জুনের জীবনের সামান্যতম ঘটনাকে মনে হয় ঐতিহাসিক মহিমায় মণ্ডিত আর 'সী-গাল' নাটকের শেষে নায়কের আত্মহত্যাকেও কেন চেকভ ঘরোয়া দৈনন্দিনে আটকে রাখেন? ব্রেখ্ট্ এই পার্থক্যের মূলটা ধরে ফেলেছেন। মহাকাব্য, উপকথা, পুরাণ, পাঁচালি—সর্বত্র থাকে একটা দূরত্ব, ঘটনা থেকে শ্রোতার দূরত্ব, চরিত্র থেকে কবির দূরত্ব। গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত দেববন্দনার পর সেই 'শুন শুন ভদ্রজন, অর্জুন মাহাত্ম্য কবির বর্ণন'। কখনোই কবি বলেন না, আমি অর্জুন। অথচ অর্জুনের সংলাপে এসে তিনি যথোচিত বীররস ঢেলে অভিনয় করেন, কিন্তু পরক্ষণেই চলে যান হয়তো একটি সূর্যোদয়ের বর্ণনায় যেখানে ব্রাহ্মণরা সূর্যস্তব করছেন। দর্শক শুধু অর্জুনকে দেখেন না, দেখেন এক বিশাল পটভূমিকায় অর্জুনকে। দর্শকও অর্জুনের সঙ্গে একাত্ম হন না কোনো সময়েই। সেটা নিতান্ত ধৃষ্টতা বলে তাঁদের কাছে প্রতিভাত। কিন্তু অর্জুনের বীরত্বে রোমাঞ্চিত হন, তাঁর পুত্রবিয়োগে অশ্রুপাত করেন, তাঁর জয়ে আনন্দিত হন। কিন্তু সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ—তাঁরা ধারাবাহিক কোনো উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনীর প্রত্যাশাও করেন না। মহাভারত অজস্র খণ্ডচিত্র মাত্র। বহু সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা মেলে সে নায়কদের তুলে ধরছে নানা আলোকে। একটি ঘটনায় অর্জুন মহাবীর, পরের ঘটনায় যুদ্ধবিমুখ, এক ঘটনায় তিনি নারীরক্ষক, পর দৃশ্যে ভক্ষক। কর্ণ কখনো জঘন্য নারীপীড়ক, কখনো বা মাতৃস্নেহলোলুপ বঞ্চিত জ্যেষ্ঠপাণ্ডব। এখানে গল্পের মামুলি লজিক কেউ আশা করে না। তার চেয়ে ঢের বৃহৎ এক পরিপ্রেক্ষিত এখানে উপস্থিত। নানা দৃষ্টিতে একই মানুষকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা হচ্ছে। তার শাদা এবং কালো দিক পাশাপাশি তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষ ক্রমে নানা দ্বন্দ্বে ভরা নানা জটিল বৈপরীত্যে আচ্ছন্ন আস্ত এক নায়ক হিসেবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা শুধু অর্জুনকে দেখি না, তাঁকে বিশ্লেষণ করতে শিখি।

এটাই ব্রেখ্ট্-এর এপিক থিয়েটারে পুনরায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছে মানবচরিত্র হচ্ছে 'সর্বপ্রকার সামাজিক অবস্থায় সামগ্রিক চেহারা (Totalitat) এবং একমাত্র এপিক শৈলীতেই সেটাকে ধরা সম্ভব' ['শ্রিফটেন ৎসুম টেয়াটের']। সেই জন্যেই প্রতি দৃশ্যের আলাদা শিরোনাম দিয়ে খণ্ডচিত্রগুলি সুনির্দিষ্ট করে দেখা, চরিত্র থেকে দূরে থাকার জন্যেই

এপিক নির্লিপ্ততা। এইজন্যই গালিলেওর মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনার পাশে তাঁর কুম্ভীলক-বৃত্তি ও ধূর্ত কাপুরুষতার অবতারণা , মাদার কারেজকে দেখি মাতা, ব্যবসায়ী, কোমলপ্রাণ ও নির্দয় চেহারায়। সার্কাসের মতন তাই উল্লসিত ইতিহাস—'আর্টুরো উই', কেননা ক্লাউনের চেয়ে বড়ো উদাসীন ব্যাখ্যাকার এখনো জন্মায়নি। চ্যাপলিন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এপিক অভিনেতা। তাঁরই মুখচ্ছবি ধাবণ করে একেহার্ড শাল হিটলারকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখান আমাদের সামনে। স্তানিস্লাভ্স্কির ধ্যানমগ্ন জগৎ এখানে চুরমার। এখানে বৃহত্তর জগতের সারাংশকে ধরা হচ্ছে উপকথাব চৌহদ্দিতে। 'একদা অর্জুন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন'—এই গৌরচন্দ্রিকায় দর্শককে কিঞ্চিৎ দূরত্বে ঠেলে দিয়ে তাকে বেশি দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়, খুব বেশি কাছে এগিয়ে এলে সমগ্রটা চোখে পড়ে না , তেমনি 'একদা য়োহানা শহর নামক অরণ্যে গিয়াছিল' বলে ব্রেখ্ট্ দর্শককে দৃষ্টি-ফোকাসে সাহায্য করেন, আজকের একরত্তি মেয়ে য়োহানার ক্ষুদ্র অ্যাডভেঞ্চাবটি হঠাৎ বিশাল হয়ে ওঠে। সেটি আজকেব কুরুক্ষেত্রের একটি আস্ত পর্ব হযে ওঠে। নানা রথী-মহারথী, কৌরব শোষক এবং ধর্মঘটী পাণ্ডব-সেনাব আবির্ভাবে, যুদ্ধের প্রাক্কালে নানা ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির প্রযোগে, তারপর চক্রব্যূহের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনে যোহানার আত্মদানে দর্শকরা আস্ত ইতিহাস দেখেন। আজকের কুরুক্ষেত্রের সেনাবিন্যাস বুঝে নেন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিহ্বল দর্শক এ জিনিস কখনো দেখেননি।

তাহলে মূল প্রশ্নটা এইখানে এসে দাঁড়ায়, ব্রেখ্টের মতে বাস্তববাদী নাটক পরিবর্তনশীল দুনিয়া এবং তার দ্বন্দ্বগুলিকে ধবতে পাবে না, কারণ সে-নাটক মার্ক্সীয ডায়ালেক্টিক্স্-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সে-অভিনয় 'স্থূল, জোলো', 'যন্ত্রণাদায়ক'। সে শাদা এবং কালোকে পাশাপশি দেখাতে পারে না, সুতরাং সে দর্শককে জগৎ বুঝতে সাহায্য কবে না। সে-অভিনয মিথ্যা ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সে ধরে নিয়েছে জগৎ ও প্রকৃতি অনড়, অনন্ত। নইলে সে একটি দৃশ্যের বা একটি চবিত্রেব মধ্যে ডুবে থাকে কেন? প্রতি মুহূর্তকে চরম ভাবছে কেন?

'Ein grober und flacher Realismus, der also besonders quälend wurde, wo er auf tragische Wirkungen ausging, da er ja nicht, wie er glaubt, eine ewige und unveränderliche Natur darstellte'—*Die dialektische Dramatik*]

কিন্তু দুটি পালটা প্রশ্ন উঠতে পারে .

(১) ব্রেখ্ট্ যেহেতু কমিউনিস্ট হিসেবে প্রশ্ন তুলেছেন, সেহেতু তাঁব বোধ হয় উচিত ছিল প্রচারের কার্যকারিতার প্রসঙ্গ আলোচনা কবা। স্তানিস্লাভ্স্কি নাট্যকার নন, পরিচালক। তাঁর পদ্ধতি একটি ফর্ম মাত্র। কমিউনিস্টদের কাছে ফর্মের প্রশ্ন চিরদিন জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। স্তালিনেব ভাষায়, শিল্পসাহিত্য হবে বিষযবস্তুর প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু ফর্মের প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী। প্রতি জাতি শত শত বৎসর ধবে নিজস্ব রূপরীতি, নিজস্ব গান-ছড়া, নিজস্ব নাট্যবীতি গড়ে তোলে। তাতে বিদেশি প্রভাব এসে পড়ে, তবু ক্রমে তা একেকটি ভূখণ্ডের স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের আবরণেই আনতে হবে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু, যেমন পিকিং অপেবার বহু সহস্র বৎসবেব ঐতিহ্যকে বজায বেখেই তাতে বিপ্লবী কাহিনী সংযোজিত হচ্ছে। ব্রেখ্ট্-এর এপিক অবশ্যই মানবজাতির সুমহান ঐতিহ্য থেকে বিবর্তিত।

কিন্তু স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি পদ্ধতিও আরেকটি ঐতিহ্য থেকেই উদ্ভূত, যেটা তুলনায় অর্বাচীন হলেও নেহাত ফেলনা নয়। এই বাস্তববাদী ধাবার পেছনে রয়েছেন শিলার, ফিলডিং, ডিকেনস, মেরেডিথ, হার্ডি, এমিল জোলা, তলস্তয়, হাউপ্টমান, ইবসেন, তুর্গেনেভ, দস্তয়েভস্কি, শ, চেকভ, গোর্কি। ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনগণের এক বৃহৎ অংশ এই ধারাকে আপন করে নিয়েছেন। থিয়েটারে গ্যোয়টে, সাক্‌স্‌-মাইনিংগেন, আঁতোয়ান, ব্রাম, গ্র্যানভিল-বার্কার, রাইনহার্ট এবং সর্বোপরি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি এই ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং তা বিশ্ব-নাট্যশালার এক বৃহৎ অংশে ছড়িয়ে গেছে। কমিউনিস্ট একে কী করে একেবারে উড়িয়ে দেবেন? তাঁব কাছে ফর্মের প্রশ্ন হচ্ছে কার্যকারিতার প্রশ্ন, সুবিধার প্রশ্ন। বিশ্ব-নাট্যসাহিত্যের অনেক অমূল্য সম্পদ আছে যা এপিক কায়দায় অভিনয় করলে বিপর্যয় হবে, ঠিক যেমন বিপর্যয় ঘটেছিল যখন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি তাঁর পদ্ধতি নিয়ে চড়াও হয়েছিলেন শেক্‌স্‌পিয়ারের ওপব।

বিষয়বস্তুই যদি আমাদেব প্রধান উপজীব্য হয, তাহলে সেটা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওযার জন্য যে-কোনো আঙ্গিকেব আশ্রয় নিতে হবে, কোনোরকম ছুৎমার্গ থাকলে চলে না। একান্ত বাস্তববাদী ঢঙে বিপ্লবী নাটক কি সৃষ্টি হযনি, যেগুলি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি পদ্ধতিতে অভিনীত হযে লক্ষ মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে? চীনের 'কমরেড আপনি ভুল পথ ধরেছেন' বা 'লং মার্চ' অথবা 'স্টীল্‌ড্‌ ইন ব্যাট্‌ল্‌' কোন পদ্ধতিতে অভিনীত হবে? রাশিযায় 'আর্মার্ড ট্রেন' বা 'অপটিমিস্টিক ট্র্যাজেডি' বা পোগোদিনেব 'রাইফেল হাতে লোকটি' বা লেনিন-সম্পর্কিত নাটকগুলি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি-পদ্ধতিতেই তো অভিনীত হয়েছে এবং হচ্ছে। লিলিযান হেলম্যান বা অডেট্‌স-এর বিপ্লবী নাটক অভিনয় করার আব কোন পদ্ধতি আছে? সমাজচেতনা জাগাবার জন্য এলমার রাইস, শেরউড, ও-কেসি, অসবোর্ন বা ওয়েস্কাব কি কিছু করেননি?

এটা ধ্রুব সত্য যে সমাজ-পরিবর্তনেব নিয়মগুলি বোঝাতে গেলে ব্রেখ্‌টের কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মার্কসবাদীব কাছে বোঝানোটাই একমাত্র কাজ নয়—উত্তেজিত করাটাও কাজ, শ্রেণীঘৃণা জাগানোটাও কাজ, 'দর্শকের অবচেতনে বুর্জোযা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অনাস্থা ঢুকিয়ে দেওয়াটাও' কাজ [লেনিন, 'কী করিতে হইবে']। লেনিনের মতে তো এই গোপনে-সঞ্চারিত অনাস্থাবোধটাই প্রচারের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতবাং ব্রেখ্‌ট্‌ যে বাস্তববাদী পদ্ধতিকে একেবারে নাকচ করে দিচ্ছেন সেটা বোধ হয সুবিচার নয়।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরো গভীবে। শিল্পসাহিত্যের মার্কস্‌বাদী চিন্তা কি আদৌ মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখাবার পক্ষপাতী? শাদা-কালোকে আলাদা দেখাব না দুয়ে মিলে আধা-বহস্যময় ধূসর দেখাব—এ প্রশ্নের কি সমাধান হযে গেছে? মানুষকে বেশি বিশ্লেষণ করলে সে ছকবাঁধা, স্কিমেটিক হয়ে পড়ে। গোর্কি যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কথা বলেছেন তাতে মানুষের শ্রেণীচবিত্র, ব্যক্তিগত গুণাগুণ, মহত্ত্ব ও নীচতা, সব মিলিয়ে আস্ত একটি মানুষকে উপস্থিত করাব কথা বলা হয়েছে। প্রোলেতাবীয় মানবতাবাদ মানুষের অতিসবলীকরণে বাদ সাধে। সাতিন যে মানুষের জয়গান করে তাকে গিনিপিগের মতন কাটাছেঁড়া করলে তার অপমান হয়।

১৯৫৩ সালে ব্রেখ্‌ট্‌কে এই প্রশ্নেই জর্মন পার্টিব তীব্র সমালোচনাব মুখোমুখি হতে হয়। 'নযেস ডয়েট্‌শ্‌লান্ড্‌' পত্রিকা তাঁকে 'আঙ্গিকসর্বস্ব' এবং 'স্কিমেটিক' বলে অভিযুক্ত করে। সোভিযেত ইউনিযনেও তাঁকে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাব' বিবোধী শক্তি হিসেবে একবাব চিহ্নিত কবা হয ('টেযাটেব ডের ৎসাইট', ডিসেম্বব ১৯৫৬)। আরো বহু সমালোচনা ব্রেখ্‌ট্‌ শোনেন। তার মানে এই নয যে বিশ্বেব বিপ্লবী নাট্যজগতে ব্রেখ্‌টেব অগ্রণী স্থান কেউ কেড়ে নিতে পাবে। এইসব সমালোচনাব অর্থ এই ব্রেখ্‌ট্‌ একটি স্বতন্ত্র ধাবা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাব বাইবে আবেকটি শক্তিশালী ধারা। সেটিও বৈপ্লবিক (এবং পববর্তী অভিজ্ঞতায় প্রমাণ হযেছে বোধ হয সর্বাধিক বৈপ্লবিক ও বুদ্ধিদৃপ্ত)। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, যাব ভিত্তি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি-পদ্ধতি, সেটিও একটি স্বীকৃত প্রকাশভঙ্গি। অধ্যাপক জ্‌দানভ তো অন্য কোনো ধাবাকে মানতেই চাইতেন না (সাহিত্য, সংগীত ও দর্শন প্রসঙ্গে)। স্তালিনেব সোভিযেতে নানা থিযেটাবি ফর্মেব মধ্যে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি-পদ্ধতিকেই প্রকৃত মার্ক্‌স্‌বাদসম্মত, দ্বন্দ্বভিত্তিক মনে কবা হত।

সুতরাং এপিক থিযেটাবেব বুদ্ধিনির্ভব বিশ্লেষণী ভঙ্গিকে **একমাত্র মার্ক্‌স্‌বাদ**-ভিত্তিক ফর্ম বলাটা বোধ হয এখনো তর্কাতীত নয।

কিন্তু ব্রেখ্‌টেব সমালোচনা যে কত অকাট্য তাব প্রমাণ স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব নিজেব জীবনেই ছড়ানো বযেছে। তিনি নিজেই নিজেব পদ্ধতিব সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন ও চিন্তাকুল হযে উঠেছিলেন। অমিত্রাক্ষব ছন্দ আবৃত্তিব ক্ষেত্রে নিজেব শোচনীয অক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি অকপটে লিখে গেছেন স্মৃতিকথায। পব পব কাব্যনাট্য ও ঐতিহাসিক নাটক ধবে তিনি বেবিযে আসতে চাইছিলেন ক্ষুদ্রাকাব ড্রইংরুম-সাজানো মঞ্চ থেকে। ইবসেনেব 'পিযাব গিন্ট', হাউপ্টমানেব 'নিঃসঙ্গ জীবন' ও 'জলমগ্ন ঘণ্টা', এমনকী মেটেবলিংক মঞ্চস্থ কবে তিনি তাঁব পদ্ধতিব একদেশদর্শিতা ঘোচাতে চাইছিলেন। একটিব পব একটি অপেবা পবিচালনা কবে নূতন দিগন্ত দেখতে চাইছিলেন। সোভিযেত সরকাব ও জনগণেব জযগান শুনে অসুস্থ স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি তাঁব নার্স দুখোভস্কাযাকে বলেছিলেন, ওবা আমাকে যে পদ্ধতির জন্যে প্রশংসা কবছে, আমি নিজেই আব তাতে বিশ্বাস কবি না। এই তীক্ষ্ণ আত্মসমালোচনার দৃষ্টি, এই বিনয, এই চিবস্থাযী শৈল্পিক অসন্তোষ, এ সবই এক মহান শিল্পীব সততাব পরিচাযক। শেষ বযসে নাটকেব স্ক্রিপ্ট করা পর্যন্ত তিনি পবিত্যাগ করেছিলেন অথচ আগাগোড়া দাগানো এবং অজস্র নির্দেশমালায খচিত ওই স্ক্রিপ্ট এককালে ছিল তাঁব পদ্ধতিব মূল স্তম্ভ। লিখছেন .

> আজকাল আমি যখন বিহার্সালে যাই তখন আমি অভিনেতাদেব মতনই অপ্রস্তুত থাকি। তাদেব সঙ্গে বসে একযোগে ভেবে দেখি কোথায কী করা যায়। পরিচালকেব উচিত অভিনেতাদেব মতন সতেজ ও পবিষ্কাব মন নিযে নাটকে প্রবেশ কবা এবং ওদের সঙ্গে নিযে নাটকটির ধ্যানধারণায ক্রমে পুষ্ট হওয়া।

শেষ বযসে বাষ্ট্রীয নাট্য শিক্ষাযতনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নিজের পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপবীত এক ধারাব ইঙ্গিত দিযে বললেন :

> ধবা যাক হ্যামলেটেব পার্ট কবছেন। কীভাবে শুরু করবেন? আমবা এতদিন কী

কবেছি? মধ্যযুগেব ইতিহাস পড়েছি, এলসিনোরেব পুবাতন প্রাসাদের কল্পচিত্র ধ্যান করেছি, ভেবেছি এক পাণ্ডুর অবিন্যস্তকেশ রাজকুমার। এ ছবি দেখে উৎসাহ পাচ্ছেন? আমি আর পাই না। এখন আমাকে কেউ হ্যামলেট করতে বললে আমি ভাবব না—যদি আমি হ্যামলেট হতাম। আমি ভাবব, আমিই হ্যামলেট—ওই দুর্গেব মধ্যে ঘুবে বেড়ানো উদ্‌ভ্রান্ত যুববাজকে আমাব দবকার নেই। কবে এটা ঘটছে? **আজ, এখন, মধ্যযুগে নয়।** কোথায় ঘটছে? এখানে মস্কোয়, এই লিয়নতিয়েভ গলিতে, এলসিনোবে নয়। এখন আমাকে বলা হল, ওই থামটার পেছন থেকে আমাব মৃত পিতা বেবিয়ে আসছেন . । আমি কী কবব? কী **অনুভব করব সেটা এখন ভাববাব দরকার নেই। শরীর দিয়ে কী করব—এটাই প্রথম বিবেচ্য।**

নতুন এক আবিষ্কাবেব প্রান্তে উপনীত হচ্ছিলেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি, তাঁব বহু লেখায় ও বক্তৃতায় এটা স্পষ্ট। নিজ শিল্পেব প্রতি যে অনুগত সে কখনো মূঢ় তৃপ্তি নিয়ে বসে থাকতে পাবে না।

কিন্তু অকটোবব বিপ্লবেব প্রতি স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, এ বিষযটি নিয়ে ট্রট্‌স্কিপন্থীবা সেই ১৯১৮ সাল থেকে প্রচুব জল ঘোলা করেছেন। বোগদানভ ও প্রোলেটওয়ালাবা স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিকে প্রতিক্রিয়াশীল, সনাতনপন্থী, বেইমান প্রভৃতি বহু গালাগালই দিয়েছে। এমনও বটানো হয়েছে যে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি নাকি আমেবিকায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। গোর্কি ও দানচেংকোব কাছে লেখা তাঁর পত্র পড়লে তো মনে হয দুনিয়ায একটি দেশ সম্পর্কেই তাঁর ছিল বিজাতীয় ক্রোধ, সেটি মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র। সোভিয়েত সরকাব যখন আর্ট থিয়েটারকে আমেবিকা সফবে পাঠান, তখন সে দেশেব নাট্যশালাগুলির ওপর নিবেট অর্থগৃধ্নুদের কবজা দেখে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি শিহবিত হয়েছিলেন এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁব পত্রাবলি থেকে দেখা যায। আব তিনি তো কমিউনিস্টই নন , তিনি পালাতে চাইলে তার জন্য দায়ী পাতি-বুর্জোযা কালাপাহাড়বা। কিন্তু গোর্কি তো আজীবন সোৎসিয়ালদেমোক্রাৎ, নবজীবন পত্রিকার সম্পাদক , তিনি যে লেনিন ও বলশেভিকদেব আদ্যশ্রাদ্ধ কবে চলে গিয়েছিলেন ইটালি। (এবং বহু সাধ্যসাধনায় স্তালিন তাঁকে ফিবিয়ে আনেন) সেই অপরাধে গোর্কিও কি অকস্মাৎ বুর্জোয়া বা প্রতিক্রিযাশীল আখ্যা পাবেন?

এই সব কুৎসা ভুলে গিযে মূল্যায়ন করতে হবে গণবিপ্লবের সঙ্গে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব সম্পর্কের। তিনি বাইরের লোক, ধনীর সন্তান, জীবনে কোনো দিন বাজনীতির দিক মাড়ান নি। তথাপি শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণের পব শিল্পী হিশেবে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন কিনা, তাঁব জগদ্বিখ্যাত পদ্ধতিকে শ্রমিক বাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত কবেছিলেন কিনা, এটাই দেখতে হবে। এবং এ আলোচনায় তথ্যেব কোনো অভাব কারুর হতে পারে না কারণ স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির ছিল এমন এক অকপট সাবল্য ও সততা যে নিজেব চিন্তাধাবাব প্রতিটি বাঁক প্রতিটি মোড় তিনি স্পষ্টাক্ষবে লিখে গেছেন উত্তরকালের জন্য।

নাটকে সর্বপ্রকাব প্রচারকার্যের ওপব তাঁর ছিল বিষম বিতৃষ্ণা। ১৯০৫ সালেব বিপ্লবের

সময়ে তিনি লিখছেন :

> আমাদের রঙ্গমঞ্চকে কিছুতেই প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হতে দেওয়া যায় না। সামান্যতম ব্যবহারিক উদ্দেশ্য বা দলগত ঝোঁক শিল্পকে হত্যা করে।

এবকম স্পষ্ট যাঁব ছিল বিশুদ্ধ শিল্পের পলায়নপর সাধনা, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তিনি জারিস্ট রুশিয়ায় একের পর এক ক্ল্যাসিক নাটক মঞ্চস্থ করে উগ্র বোগদানভ-বাদীদের অলক্ষ্যে এক মহৎ কাজ কবে যাচ্ছিলেন, যার বিববণ ও প্রশংসা পাই লুনাচার্স্কির লেখায়। লুনাচার্স্কি বলেছেন, সেটা ছিল এক অন্ধকার যুগ, যখন গোয়েন্দা-পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করত থিয়েটারকে, মাতাল অভিজাত আর মাথামোটা বুর্জোয়া ছিল থিয়েটারের রুচি ও উৎকর্ষের বিচারক। তখন 'যাঁরা বিপ্লবের পথে পা দেননি তাঁরা মানুষের মহৎ সৃষ্টিগুলিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রতিবাদের অস্ত্র হিশেবে। . . স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিও জনতাকে জাগাচ্ছিলেন, মনস্তাত্ত্বিক পথে। উচ্চতর ভাবে, মহৎ মানবিক ভাবে পূর্ণ করছিলেন দর্শকদেব অন্তর।'

পুলিশ ও স্থূলরুচি শাসকশ্রেণীব বিরুদ্ধে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির এই সংগ্রাম জনতা বুঝেছিলেন ঠিকই। সেই ১৯০০ সাল থেকে ইবসেনের 'জনতার শত্রু' নাটকের অভিনয়ে সমগ্র দর্শক বারংবার উঠে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিয়ে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিকে সাধুবাদ করেছে। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ে এ-নাটক রীতিমতন বাজনৈতিক হাতিয়াব হয়ে উঠেছিল। সে সময়কার নিষিদ্ধ নাম গোর্কিকে মঞ্চে এনেছিলেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিই। ১৯০৫ সালেব অকটোবরে গোর্কির নাটক অভিনয়কালে গুণ্ডার দল সশস্ত্র আক্রমণেব জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সেন্‌সরের হস্তক্ষেপে নাটকের পব নাটকেব সর্বনাশ হয়ে যেতে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি প্রতিবাদ-আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ১৯১৪ সালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হতে মস্কো ও পেত্রোগ্রাদে কদর্য 'দেশপ্রেমিক' নাটকের বান ডাকলে, স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি দৃঢ়ভাবে সবকারের দালালি করতে অস্বীকাব করেন। এটিই বোধ হয় তাঁর শিল্পীর সততার সর্ববৃহৎ প্রমাণ, কারণ তখন যুদ্ধবিরোধিতার অর্থই ছিল সাইবেরিয়ায় কাবাবাস। নেহাত লোকলজ্জার ভয়ে পুলিশ তাঁর গায়ে হাত দিতে পাবেনি।

লুনাচার্স্কির বিশ্লেষণ সঠিক বলে মনে হচ্ছে কাবণ ১৯০৫ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত একাদিক্রমে মস্কো আর্ট থিয়েটারের ক্ল্যাসিক নাট্যসাধনায় হস্তক্ষেপ কবতে থাকে সেন্‌সব ও পুলিশ। ক্ল্যাসিকগুলি যে শাসকদেব উৎকট ও অধঃপতিত 'শিল্পের' পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল সেটা তাদের ত্রস্ত আচরণ থেকেই প্রমাণিত।

আমাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গোড়াতেই স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির মতামতে এল গুণগত পরিবর্তন। নিজ শিল্পের মর্যাদা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে সজাগ শিল্পী যুদ্ধের মধ্যেই নূতন রাজনৈতিক প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। যুদ্ধ যখন বাধে তখন মস্কো আর্ট থিয়েটার জর্মনিতে। সকলকে বন্দী করে জর্মন পুলিশ ট্রেনে তুলে পাঠিয়ে দেয় সুইট্‌জারল্যান্ডে। সেই ট্রেনের একটি ফোর্থ ক্লাস কামরায় বসে সহযাত্রী রুশ লেখিকা গুবাভিচকে অবাক করে দিয়ে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি বলেন :

> অন্য ধরনের জীবন চাই, যে-জীবনে মানুষের অভাব মিটবে, এবং শিল্প সুযোগ পাবে জনতাব স্বার্থে কাজ করার। যে লোকগুলি বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্যে আকণ্ঠ

ডুবে আছে তারা বিতাড়িত হবে থিয়েটার থেকে।

জনতার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি। একটি নাটক প্রয়োগ কবার পূর্বে মাসের পর মাস তিনি ও তাঁর সহযোগীরা ঘুবে বেড়িয়েছেন গ্রামে, শ্রমিক-বস্তিতে, চোব আর বদমাশদের আড্ডায়। যে জনতাব কাছাকাছি থাকে তার রাজনৈতিক উত্তরণ হয অবিশ্বাস্য গতিতে।

কিন্তু অকটোবব বিপ্লবের পরমুহূর্তে আচমকা নানা অপমান ও কুৎসায় স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির মনোবল ভঙ্গ হবার উপক্রম হয়। এই কুৎসা-অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন কে? মালিনভ্‌স্কি ওরফে বোগদানভ। তিনি এমন বলশেভিক যে লেনিনকে চিরকাল বলে এসেছেন আপোশপন্থী বিশ্বাসঘাতক। তারপর তিনি হলেন ঈশ্ববে বিশ্বাসী। লেনিনের প্রত্যাক্রমণে পালাবাব পথ না পেয়ে তাঁব বিষম 'বলশেভিক' চেতনাব ভার নিয়ে চড়াও হলেন শিল্প ও নাটকের ওপর। তাঁর পেছনে আছেন ট্রট্‌স্কি। পাশে মায়ারহোল্‌ড্‌, ফরেগাব, ব্রিউসভ অ্যান্ড কোম্পানি। একহাতে তাঁবা তলস্তয়-চেকভের মুণ্ড কাটছেন, অন্য হাতে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কিব।

এই অন্যায় আক্রমণের ফলে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি যদি হঠাৎ একদিন ঊষাকালে ঘোষণা করতেন এই শুভমুহূর্ত থেকে তিনি পুরোপুবি বিপ্লবী প্রযোজক, তাহলে বোগদানভ হয়তো তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন, কিন্তু রুশ শ্রমিকশ্রেণী তাঁর কাপট্য ও প্রতারণায় শিহরিত হতেন। যুগের জো-হুকুমি কবে কেউ কেউ বোগদানভদের হিংস্র নীতিহীন আক্রমণ যে এড়াতে চাননি এমন নয়। স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি সে-জাতের লোক ছিলেন না বলেই সোভিযেত সরকাবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে নেন প্রথমেই। থিয়েটাব শিল্পীদের সম্মেলনে প্রবল ও অপ্রাসঙ্গিক গালাগালির জবাবে তিনি লুনাচার্স্কির উদ্দেশে বললেন :

> আনাতোলি ভাসিলিচ, আমি বিপ্লবের বিরোধী নই। এ বিপ্লব যে কত গভীর কত পবিত্র তা আমি বুঝি। . . কিন্তু এই নূতন দুনিয়ার সংগীতকে মঞ্চের ভাষায় রূপায়িত করতে অনেক সময় লাগবে। আশে পাশে যেসব নাটক দেখছি সেগুলি যতই বিপ্লবের উচ্চ আদর্শেব কথা বলুক না কেন, নাটক হিসাবে সেগুলি অসম্পূর্ণ, আড়ষ্ট ; এগুলো যদি আমায় মঞ্চস্থ করতে বলেন তাহলে শিল্পী হিসেবে বিপ্লবের সেবা করতে আমি ব্যর্থ হব।

এর পর থেকে বোগদানভদের গালাগাল এক দেশব্যাপী কনসার্টে পবিণত হয়, কিন্তু সোভিয়েত সরকার ক্রমশ আর্ট থিয়েটারকে রক্ষা করতে এগিযে আসতে শুরু করলেন। এ সিদ্ধান্ত শ্রমিকশ্রেণীর। শ্রমিকরা প্রোলেটদের দুর্বোধ্য মহাবিপ্লবী নাটকগুলিকে বর্জন করল আর কাতারে কাতারে এসে লাইন দিল আর্ট থিয়েটারের দোরগোড়ায। তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় উচ্চকিত হয়ে প্রথমেই চাইল অতীতের উত্তরাধিকাব, তারা চাইল ইবসেন-তলস্তয়-চেকভ-গোর্কিকে। তারা স্বাদ পেতে চাইল বিশ্বগৌরব আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ের। আর পাতি-বুর্জোয়া প্রোলেটবাদীদের রণহুঙ্কারপূর্ণ নাট্যপ্রয়াসগুলি ফাঁকা প্রেক্ষাগৃহে মাঠে মারা যেতে লাগল। লেনিন এবং তারপর স্তালিন আর্ট থিয়েটারের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শ্রমিক-কৃষক দর্শকে পূর্ণ হল আর্ট থিয়েটার। প্রেক্ষাগৃহে স্থান সংকুলান হয় না বলে মাঝে মাঝে বিশাল

সোলোদোভনিকভ থিয়েটারে আর্ট থিয়েটারের অভিনয়েব ব্যবস্থা হল। এই নূতন দর্শকের সামনে যেতে আর্ট থিয়েটাবেব শিল্পীদেব যে দ্বিধা ও শঙ্কা ছিল তাব চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন স্তানিস্লাভ্স্কি। শ্রমিকরা প্রথম প্রথম নাটক দেখতে দেখতে আহার করত, চর্বণের মচ্মচ্ ও কাগজেব মোড়কেব খড়খড় শব্দে চেকভের নিরিবিলি অভিনয় বিঘ্নিত হত। একদিন স্তানিস্লাভ্স্কি পর্দাব বাইবে এসে নাটক কী করে দেখতে হয় সে-সম্পর্কে বীতিমতন ক্রুদ্ধ এক বক্তৃতা করেন। আশ্চর্য, পবদিন থেকে শ্রমিক দর্শকবা প্রমাণ করে দিল চেকভের তারাই প্রকৃত সমজদাব। বিস্ময় ও আনন্দে স্তানিস্লাভ্স্কি লিখে গেছেন :

> এ অন্য দর্শক! এরা আনন্দ পেতে থিয়েটাবে আসে না, আসে শিখতে। ওরা যেখানে হাসে, যেখানে কাঁদে, সেসব অনুধাবন করে আমরাও নাটকগুলিকে নূতন করে বুঝলাম।

শ্রমিকদেব সঙ্গে আর্ট থিযেটারেব সংযোগ ঘটিয়ে দিয়ে সোভিয়েত সবকাব ও কমিউনিস্ট পার্টি স্তানিস্লাভ্স্কিকে **নিজের পথ ধরে** বিপ্লবী চেতনার দিকে এগুতে দিলেন। স্তানিস্লাভ্স্কি যাতে শ্রমিকের কাছে শিখতে পাবেন এ-ব্যবস্থা করে, পার্টি কঠোর সমালোচনায় বোগদানভদেব ফিঙের নাচকে জর্জবিত কবতে লাগল।

কৃতজ্ঞ স্তানিস্লাভ্স্কি পরে লিখেছেন :

> বিপ্লবেব একটা ঝোড়ো মুহূর্ত এসেছিল যখন লেনিনও বলে দিযেছিলেন, শিল্প সাহিত্যেব জন্য এখন কিছুই কবা যাবে না। তখন আমাদের সাংস্কৃতিক বত্নভাণ্ডাবটিকে বাঁচিযে বাখতে হয়েছিল, নানা ঝাপটা থেকে [বোগদানভ অ্যান্ড কোং—লেখক] থিয়েটাবটিকে বক্ষা কবতে হয়েছিল। তখন সোভিযেত সরকাব আমাদের সাহায্যে এগিযে এলেন এবং তাঁদেব জন্যই আমরা ঝড তুফানের মধ্যে থেকে বেবিযে আসতে পেরেছিলাম। . সোভিযেত সবকাবেব কাছে অন্য এক কারণেও আমি কৃতজ্ঞ। আমবা মস্কো আর্ট থিয়েটাবেব পুরনো অভিনেতাবা অনেকেই প্রথমটায় বাজনৈতিক ঘটনাবলি বুঝতে পারিনি। তখন সরকাব আমাদেব লাল বং মেখে যা আমরা নই তাব ভান কবতে বাধ্য কবেননি। সেটা কবলে আমবা ডিগবাজি-খাওযা প্রতারক হতাম, স্বার্থরক্ষাব জন্য সুবিধাবাদী হতাম। কিন্তু আমবা বিপ্লবের প্রতি আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে উদ্‌গ্রীব ছিলাম। লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলে যোগদান কবায় আমাদের আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আমাদেব দেশেব বিপ্লবী অন্তবে প্রকৃত দৃষ্টি নিক্ষেপে সচেষ্ট হয়েছিলাম। এই বিজ্ঞানে, এই শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ চেতনাকে আরো উন্নত করার কাজে আমরা আমাদের সব সময নিযুক্ত করেছিলাম, এবং নিরুদ্বেগে এটা করতে দেওযার জন্য আমি সরকাবকে ধন্যবাদ জানাই।

স্পষ্ট এবং আন্তবিক কথা। ভান এবং প্রতারণা এই লোকটির ধাতে ছিল না। বোগদানভেব মতন ডিগবাজি তিনি খেতে শেখেননি কোনোদিন।

সোভিয়েত শ্রমিকের সান্নিধ্যে এসে স্তানিস্লাভ্স্কিব প্রাণে এক উদ্বেল আনন্দ লেগেছিল।

গুরেভিচকে পত্রে তিনি লিখছেন :

আমি প্রোলেতারিয়েত হয়ে গেছি। ঠিক অনাহারে অবশ্য এখনো দিন কাটছে না [তখন যুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের সময়]। প্রতি সন্ধ্যায় থিয়েটারের বাইরে অভিনয় করছি। শিল্পগত মান পড়তে দিইনি কিন্তু। থিয়েটারের বাইরে প্রতি অভিনয়ে আমি উপস্থিত থাকি।

স্তানিস্লাভ্স্কি উত্তরণ করছেন। শিল্পের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য তাঁকে নিয়ে আসছে জনতার প্রতি আনুগত্যে। অবশেষে মস্কো আর্ট থিয়েটার আধুনিক সোভিয়েত নাটক ধরল—'তুর্বিন পরিবার'। প্রোলেটবাদীরা আবার চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল—নাটকটা প্রতিক্রিয়াশীল কারণ গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় এ-নাটক শত্রুসেনার প্রতি মমত্ব প্রকাশ করেছে। গণ্ডগোলে বিরক্ত হয়ে কমরেড স্তালিন এগারোবার নাটকটি দেখলেন এবং কড়া নির্দেশ জারি করলেন—নাটক চলবে, শত্রুসেনার প্রতিটি সৈনিক যে নরপশু একথা সত্য নয় ; ওদের এক বিরাট অংশ আমাদের দিকে যোগদান করবে শীঘ্রই। পরোক্ষে এ নাটক সোভিয়েত ব্যবস্থার জয়গান করছে। এতেও প্রোলেটবাদীরা থামেননি। অবশেষে তাঁদের জনশূন্য শ্রমিকঅধিকৃত থিয়েটারগুলি বন্ধ হয়ে যেতে তাঁদের ঈর্ষাবিকৃত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয় এবং আর্ট থিয়েটার ইভানভের বিপ্লবী নাটক 'আর্মার্ড ট্রেন' মঞ্চস্থ করে প্রমাণ করে দিল তারা বিপ্লবী শ্রমিকের সাথী। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, স্তানিস্লাভ্স্কি-পদ্ধতির আশ্রয়ে বিপ্লবী বিষয়বস্তু প্রচণ্ড শক্তি নিয়েই আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

পরপর স্তালিনের সরকার তাঁকে অর্ডার অফ রেড ব্যানার এবং অর্ডার অফ লেনিনে ভূষিত করলেন। যেখানে তিনি থাকতেন সেই লিওনতিয়েভ গলির নাম হল স্তানিস্লাভ্স্কি সড়ক। শ্রমিকরাষ্ট্র তাদের প্রিয় নাট্যগুরুকে সম্মানিত করে পাতিবুর্জোয়া প্রোলেটবাদীদের মুছে দিল সোভিয়েত ভূমি থেকে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত স্তানিস্লাভ্স্কিকে একদিন বাইরে শীতে বসে থাকতে দেখে তাঁর এক সহকারী ব্যাকুল প্রশ্ন করেন, 'এখানে বসে আছেন কেন? গায়ে জ্বর রয়েছে, এটা নভেম্বর মাস।' স্তানিস্লাভ্স্কি বললেন, 'রিহার্সাল দিচ্ছি। পরশু সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচন। ভোট আমাকে দিতেই হবে। তাই শীতটা সইয়ে নিচ্ছি।'

তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'স্টুডিওগুলি' আজো তাঁর পদ্ধতিতে গোর্কির ভাষায় 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা' তৈরি করে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

শত দ্বিমত সত্ত্বেও ব্রেখ্ট্-এর অভিনেতারা কি একদিক থেকে স্তানিস্লাভ্স্কির ছাত্র নন? ব্রেখ্ট্-পত্নী আমাদের কালের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেলের ভাষায় :

স্তানিস্লাভ্স্কির পদ্ধতির সঙ্গে ব্রেখ্টের তত্ত্বের মিলের দিকটাও বুঝতে হবে। তাঁর কাছ থেকেই আমরা শিখেছি জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার দৃষ্টি, দলগত অভিনয়, সত্যবাদিতা এবং মঞ্চে উদ্বেগমুক্ত ও শিথিল থাকার কৌশল। সবচেয়ে দরকারি জিনিস শিখেছি ওই দলগত অভিনয়।

সত্যিই, স্বেচ্ছাচারী 'বড়ো' অভিনেতাদের হাত থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করে অভিনয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন স্তানিস্লাভ্স্কি। সেই উর্বর ক্ষেত্রে

সত্তাব বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। তাই না ব্রেখ্ট্-এব কাজ সহজ হয়েছিল।

ব্রেখ্ট্ নিজেও শেষে এসে শ্রদ্ধাভরে তালিকা প্রস্তুত করে বলে গেছেন কী কী তিনি শিখেছেন মহোব মনীষীব কাছে :

নাটকের কাব্যগুণ উপলব্ধি কবা

সমাজের প্রতি দায়িত্ব

দলগত অভিনয়

নাটকের কাহিনী বিন্যাস

সততা সহকারে চবিত্রেব মুখোমুখি হওয়া

অনুভূতি ও কৌশলের ভারসাম্য

বাস্তবকে দ্বন্দ্বে-ভবা রূপে উপস্থিত কবা

মানুষেব মহত্ত্ব।

ব্রেখটেব এপিক থিয়েটারও তাহলে স্তানিসলাভ্স্কি সৃষ্ট ভিতেব ওপব দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষত জগৎকে দ্বন্দ্বেব ভিত্তিতে উত্থাপন যদি ব্রেখ্ট্ স্তানিস্লাভ্স্কিব কাছে শিখে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে এপিক থিয়েটারেব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটাব পেছনেও স্তানিস্লাভ্স্কিব দান আছে। ব্রেখট একথা স্বীকাব করে শেষ অভিবাদনেব ভঙ্গিতে বলেছেন :

স্তানিস্লাভস্কি মানবতাবাদী, এবং মানবতাবাদই শেষে তাঁকে ও তাঁব নাট্যশালাকে সমাজতন্ত্রেব দিকে নিয়ে গেছে।

[স্তানিস্লাভস্কিব স্মাবকে উদ্ধৃত]

তাহলে 'স্তানিস্লাভ্স্কি বনাম ব্রেখ্ট্', এই দ্বন্দ্ব যাঁবা উপস্থিত কবেন তাঁরা দুই ধাবার অন্তবেব যোগটা দেখতে পান না। কমিউনিস্ট হিসেবে ব্রেখ্ট্ এগিয়ে আছেন হয়তো অর্ধশত বৎসব। কিন্তু এটা ফর্মেব প্রশ্ন, আঙ্গিকেব প্রশ্ন। এখানে দুজনে দুই আলাদা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। দুজনেব কলাকৌশলই অব্যর্থ, বিপ্লবী বিষয়বস্তু দর্শকেব কাছে পৌঁছে দেওয়াব তীক্ষ্ণ হাতিয়াব। ব্রেখট্ যেখানে দর্শকগোষ্ঠীকে সজাগ করেন, স্তানিস্লাভ্স্কিব পদ্ধতি সেখানে দর্শককে টেনে নেয় 'দ্বন্দ্বে ভবা বাস্তবে'। এপিক থিয়েটাব বুর্জোয়া সমাজকে ব্যবচ্ছেদ করে প্রখব যুক্তিতে মানুষকে কমিউনিস্ট করে তুলতে চায় , বাস্তববাদী থিয়েটাব আবেগ ও সমব্যথা জাগিয়ে মানুষকে কবতে চায় বিদ্রোহী। এপিক স্বভাবতই অনেক পবিণত, অনেক বড়ো, অনেক বৈজ্ঞানিক। তবুও বিকল্প আঙ্গিক হিশেবে বাস্তববাদী ধাবাও বহু বৈপ্লবিক বার্তার বাহন হয়ে বেঁচে রয়েছে সাবা বিশ্বে। প্রাচীন ও আধুনিক বিবাট নাট্যসাহিত্য বয়েছে যা এপিক কায়দা ছাড়া দর্শকেব কাছে নিয়ে যাওয়াই যায় না , কিন্তু তাব পাশে বয়েছে অন্য বহু নাটক যেগুলির আশ্রয় একমাত্র বাস্তববাদী প্রযোগধাবা। তাই নাটককে যাঁবা প্রচাবেব বাহন হিশেবে, সংগ্রামেব হাতিযাব হিশেবে দেখেন তাঁদেব কাছে দুই ধাবায কোনো বিবোধ তো নেই-ই ববঞ্চ তাবা পবস্পবের পবিপূবক।

এপিকের সারকথা

বের্টোল্ট্ ব্রেখ্ট্ বিশ্বের নাট্যজগতে কিংবদন্তী, কিন্তু কলকাতায় এক কুসংস্কার। তাঁকে নিয়ে যে টানা-হ্যাঁচড়া চলছে সে আর কহতব্য নয়। বিষ্যুৎবারের বারবেলার মতন তাঁকে টেনে আনা হয় যে কোনো নাট্যব্যর্থতার কৈফিয়ৎ হিশেবে। ধান ভানতে শিবের গীত এ-শহরে আছেন হতভাগ্য বে-বে [ব্রেখ্ট্ নিজেকে 'ডের আর্মে বে-বে' নাম দিয়েছিলেন বোধ হয় কলকাতার কথা ভেবেই]।

কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলিতে একদল লোক নিজেদের 'নাট্যসমালোচক' আখ্যা দিয়ে চলতি নাটকের সমালোচনা লেখেন। এঁদের অধিকাংশের মূর্খতা এবে সর্বজনবিদিত প্রবাদবাক্য। সেই মূর্খতার একটি উৎকট প্রকাশ ব্রেখ্ট্-এর নামকে আশ্রয় করে। প্রয়োজনায় সামান্য কিছু নূতনের আঁচ পেলেই তাঁরা 'ব্রেখ্টীয় রীতি' আবিষ্কার করেন। অভিনেতারা যদি প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে ওঠেন, তবে অনিবার্যভাবে ওই সদাসাক্ষর ক্রিটিক-রা লিখবেন, 'নাটকে কিছু ব্রেখ্টীয় পদ্ধতি লক্ষ করা গেল।' কস্মিনকালে ব্রেখ্ট্ মঞ্চ ছেড়ে প্রেক্ষাগৃহে যাননি। সেটা এডমন্ড জোনস্ করতেন তিরিশের দশকে আর মস্কোয় অখলপ্কভ যাটের দশকে। এমনকী অভিনেতারা যদি নিজেরাই আসবাব মঞ্চে বয়ে আনেন [যেমন কোনো নাটকে ঘটেছিল] শুক্রবারের এক সাপ্তাহিক অবলীলাক্রমে লিখতে পারেন, 'ব্রেখ্টীয় রীতিতে অভিনেতারা নিজেরাই মঞ্চ সাজাচ্ছিলেন।' এই সকল গণ্ডমূর্খরা ছাপাখানা হাতে পেয়ে যা খুশি ছাই-ভস্ম লিখে ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছে। কোনটা যে ব্রেখ্টীয় আর কোনটা নয়, ব্রেখ্টীয় রীতিটা আদতে কী— এইসব বিষয় ক্রমশ এক গ্রাম্য ধাঁধার আকার নিয়েছে।

নাট্যদলগুলির মধ্যে স্বভাবতই ব্রেখ্ট্-সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ দেখা দিল। কিন্তু ওই রীতিরহস্যের ধোঁয়াশায় পথ হারিয়ে প্রায় সবাই ঘুরপাক খেয়েছেন। জর্মন ভাষা না জানায় দ্বারস্থ হয়েছেন উইলেট নামক ধূর্ত কমিউনিস্ট-বিরোধীর বা উলটেছেন মার্টিন এর্সলিনের স্বৈরাচারী নাম সম্বলিত গ্রন্থখানার পাতা। ওইসব বই-এ ব্রেখ্টীয় রীতির সহজিয়া ভাবকে কুস্তি করে দুর্বোধ্য করে তোলা হয়েছে। ফলে কিছুই বুঝতে না পেরে মনগড়া সব প্যাঁচকে ব্রেখ্টীয় বলে চালিয়েছেন কিছু দল। একজন তথাকথিত পরিচালক ব্রেখ্ট্ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়ার লোভ কোনোদিনই সংবরণ করতে পারলেন না, এবং সে-জ্ঞান কোনো দিনই একটি বিচিত্র বাক্যের বেশি কিছু হল না শিশির ভাদুড়ি মহাশয় নাকি ব্রেখ্ট্ পড়ে ওই জ্ঞানবান পরিচালককে বলেছিলেন, 'দেখিস তো আমাদের যাত্রার সঙ্গে এর মিল আছে কিনা।' এতে আমাদের জ্ঞান কতটা বৃদ্ধি পেল জানি না, তবে ভাদুড়ি মহাশয় একথা বলতে পারেন বলে প্রত্যয় হয় না, কারণ যাত্রাপালার অতি-নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে ব্রেখ্ট্-এর কোনো মিল নেই, থাকতে পারে না।

উইলেটের বই পড়েই ব্রেখ্‌ট্‌কে বুঝে ফেলেছি ভাবলে এই বিশ্বাস করতে হয় যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বার্লিনের ক্রুদ্ধ, বিযার-ভক্ত, বক্‌সিং-অনুরক্ত একদল বুদ্ধিজীবীর পানশালার আড্ডা থেকে ব্রেখ্‌ট্‌-এর উদ্ভব, আর কোনো পরিবেশ বা উপাদান অন্বেষণ প্রয়োজন নেই। ব্রেখ্‌ট্‌ যে বন্দুক হাতে বাভারিযান বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা সমান্তরাল বাভারিযা সোভিয়েত সরকারের সদস্য ছিলেন, এসব বিচার করারও দরকার নেই। উইলেটের শোচনীয় প্রভাবের একটি বিশ্রী নির্দশন দেখেছি দিল্লিতে জাতীয় নাট্যবিদ্যালযে , ইব্রাহিম আলকাজি একটি স্লাইড-সহ বক্তৃতায় ছাত্রদের ঠিক উইলেটের কথা কটিই উপহার দিলেন—ব্রেখ্‌ট্‌কে বুঝতে হলে যেতে হবে সিগারেটের ধোঁযায় আচ্ছন্ন বিযার-হলে।

নান্দীকার দলের ব্রেখ্‌ট্‌ প্রযোজনায় আন্তরিকতা যতটা ছিল, রীতিতত্ত্বের অজ্ঞতাও ততোধিক। নইলে 'তিন পয়সার পালায' অত শস্তা খ্যামটা ঢোকাতে তাঁরা ইতস্তত করতেন। আর সবাইকে স্তম্ভিত করে অকস্মাৎ ১৮৭৬-এর কলকাতায় ইতস্ততঃ 'বুর্জোয়া' শব্দের ব্যবহার তাঁরা করতে পারতেন না। রুদ্রপ্রসাদবাবু এতদূর গেলেন যে একটি সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলে বসলেন, ব্রেখ্‌ট্‌কে তাঁরা সংশোধন করে নিয়েছেন—ব্রেখ্‌ট্‌ যেখানে ব্যাংক-মালিকের উল্লেখ করেছিলেন, সেখানে নান্দীকার 'কারখানা-মালিক' কথা ব্যবহার করে ব্রেখ্‌ট্‌কে আরো বিপ্লবী করে তুলেছেন। যাঁরা এই সামান্য কথাটা জানেন না যে বিশ শতকেও ভারতে বুর্জোয়া কতটা বেড়েছে সেটা বিচারসাপেক্ষ, যাঁরা জানেন না ব্যাংক-মালিকের হাতেই অন্য সব মালিকের টিকি বাঁধা থাকে, তাঁদের হাতে ব্রেখ্‌ট আদৌ নিরাপদ নন। ব্রেখ্‌ট্‌কে বাঙালি পরিবেশে রূপান্তরিত করা অবশ্যই চলবে, তাই বলে তাঁকে হত্যা করে নয়। দস্যু ম্যাকিকে যাঁরা নাটকের রোম্যান্টিক নায়ক সাজান, তাকে দিযে অনর্গল কবিতা বলান, বা তাকে রাধাকৃষ্ণের রাসনৃত্যে অংশগ্রহণ করান, ব্রেখ্‌ট্‌-এর ম্যাকি কে এবং কী তা তাদের মস্তিষ্কে ঢোকেনি। সর্বোপরি ব্রেখ্‌ট্‌ ও অন্যান্য বহু আধুনিক নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁরা বোঝেননি—নেগেটিভ নায়কের লোমহর্ষক জীবনবিরোধী মতামত কেন মঞ্চে আসছে তাই তাঁরা বুঝতে অসমর্থ। সুতরাং ম্যাকিকে ন্যাকা ন্যাকা প্রেমিক বানিয়ে তাঁরা বাঙালি মধ্যবিত্তের বরণীয় করে তুলেছেন। রূপান্তর অবশ্য মানব, কিন্তু আত্মহত্যাকামী নীল আকাশের প্রতিবেশী বিমানচালককে ট্যাক্‌সি-ড্রাইভার বানিয়ে কারো বারোটা বাজালে সহ্য করা শক্ত ('ভালোমানুষ' পালার কথা বলছি)।

আসলে ব্রেখ্‌ট্‌ যিনি প্রযোজনা করবেন তাঁকে আগে মার্ক্‌সবাদ-লেনিনবাদে দীক্ষিত ও প্রপ্তু হতে হবে। ব্রেখ্‌ট্‌ নিজেই শুধু মার্ক্‌স্‌বাদী নন, তাঁর মতে (অমার্কিন কার্যকলাপ কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেখুন) মার্ক্‌স্‌বাদী না হলে আজকে আর নাট্যকারই হওয়া যায় না। তিনি আরো বলেন, শ্রেণীসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ না নিলে অভিনেতা হওয়া যায় না ('শর্ট অরগানুম' দেখুন)। ফর্ম ফর্ম চিৎকারে ব্রেখ্‌ট্‌কে ধাওয়া করলে আদপেই সে-ফর্ম করায়ত্ত হবে না কারুর। ব্রেখ্‌ট্‌ একজন বিপ্লবী নাট্যকার। তিনি নিরপেক্ষ নন, প্রতি মুহূর্তে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। আঠারো শতকের ইংলন্ডে ('থ্রি-পেনি অপেরার' মূল কাহিনী হচ্ছে ইংরাজি নাটক 'বেগার্স অপেরা') গিয়ে তিনি বুর্জোয়া-শ্রমিকের সংঘর্ষ খোঁজেন না। মার্ক্‌স্‌বাদী খোঁজেন **তৎকালীন** শ্রেণী-সংঘর্ষ। 'গালিলেও' নাটকে উদীয়মান প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের জ্ঞান-

বিজ্ঞানেব অগ্রদূত এক বৈজ্ঞানিক হচ্ছেন নায়ক। কিন্তু 'মাদাব কারেজ' নাটকে তিনি নির্বোধের মতন বুর্জোয়া আবিষ্কাব করেন না, সেটা ফিউদাল যুগ, বুর্জোয়া তখনো সংগঠিত হয়নি। মার্ক্‌স্‌বাদের জ্ঞান ব্যতীত শ্রেণীবিশ্লেষণই কবা যায় না, আব শ্রেণীবিশ্লেষণ কবতে না পারলে ব্রেখ্‌ট্‌-প্রযোজনা নির্বোধের দুঃসাহস।

ফর্ম শূন্য থেকে মাদারি কা খেল মারফৎ ব্রেখ্‌ট্‌-এব ঘাড়ে গিয়ে ভব করেনি। ফর্মের উদ্ভব বিষয়বস্তু থেকে, নাট্যকারের চিন্তাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে। ব্রেখ্‌ট্‌-এব নানা নাটকে নানা ফর্ম ব্যবহৃত, সর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেননি। এমন নাটকও তিনি লিখে মঞ্চস্থ করেছেন যেখানে তিনি হুবহু স্তানিস্‌লাভস্কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন ('সেনোবা কাবাব' প্রযোজনা একটি উদাহরণ)। ফর্মের খোঁজে ব্রেখ্‌ট্‌ পিনিং অপেবাব কাছে গেছেন, কাবুকি বুঝতে চেয়েছেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পড়েছেন, মার্ক্‌স অধ্যয়ন করেছেন। তাঁব কাছে ফর্ম কোনো দিনই অনড় কোনো ফর্মুলা নয়। যেভাবে হোক সাত সমুদ্দুরের নানা পাড় থেকে যে কোনো বং জোগাড় করে হোক, বিষয়বস্তুটাকে পৌঁছে দিতে হবে দর্শকের মগজে, মিশিয়ে দিতে হবে দর্শকের চিন্তাধারায়। আজ হঠাৎ ফর্ম-ফর্ম রব উঠল কেন? উত্তরের জন্য যেতে হবে সেই উইলেট-এসলিন-বেন্ট্‌লি-ভেসিদের জটলায়। এরাই হঠাৎ ব্রেখ্‌ট্‌-এব আঙ্গিক নিয়ে তোলপাড় করতে লাগলেন ইয়োরোপ-আমেরিকার ঘোলা জল, পাছে কমিউনিস্ট ব্রেখ্‌ট্‌কে লোকে জেনে ফেলে। প্রথম অনুবাদগুলোর কথা ভাবুন—'থ্রিপেনি', 'কারেজ', 'গালিলেও', 'চক সার্ক্‌ল'। অন্তত দু-শো বছর আগের ঘটনা নিয়ে লেখা হওয়া চাই, যাতে পারি কমিউনের লাল ঝাণ্ডা নিয়ে শেষ যুদ্ধ, অথবা রুশ বিপ্লবের কাহিনীগুলির মারফৎ বিপ্লবী ব্রেখ্‌ট্‌ মঞ্চে আবির্ভূত না হয়ে পড়েন। 'ব্রেখ্‌টীয় পদ্ধতি' নিয়ে অসাধু এই চিৎকার শুনলে মাঝে মাঝে তো মনে হয় হিটলার ব্রেখ্‌ট্‌কে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর এপিক পদ্ধতির জন্য, অথবা অভিনেতাদের এলিয়েনেশন শেখাবার অপরাধে। এরিক বেন্ট্‌লি সাহেবের তো এত বড় হিম্মৎ যে 'মাদার কারেজ' অনুবাদ করতে বসে তিনি কিছু কথা বাহুল্য জ্ঞানে বাদ দিয়েছেন।

ব্রেখ্‌ট্‌ যে বিপ্লবের চারণকবি—এটাই প্রধান কথা, মূল কথা। তাঁর যুগের কোনো বিপ্লবই তাঁর চোখ এড়ায়নি। পারি কমিউন ('ডী টাগে') থেকে শুরু করে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লব ('মা'), স্পেনের গৃহযুদ্ধ ('কারার'), হিটলারের অভ্যুত্থান ('উই'), চীনের বিপ্লব ('সমাধান'), ফ্রান্সের নাৎসি-বিরোধী পার্টিজান যুদ্ধ ('সিমোন মাশার'), স্তালিনের বিপুল কর্মযজ্ঞ ('চক্‌ সার্ক্‌লের' প্রস্তাবনা, 'লুকুলুস') একের পর এক সব এসেছে নাটকের পটভূমিকা হিশেবে। ছুরির মতন তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি চলে গেছে পুঁজিবাদের সারাৎসারে ('হাইলিগে যোহানা') এবং ধর্মপ্রাণ অহিংসাবাদীর শোচনীয় ব্যর্থতায়। নাটকের পর নাটকে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের সবব প্রচারক, অস্ত্রের উপাসক। পারি কমিউনের শেষ অধিবেশনে যখন উদারহৃদয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন তখন মার্ক্‌স্‌বাদী রিগোল্ত্‌ চেঁচিয়ে বলেন, 'উন্টেবড্রাক্‌ট্‌ ওডের ভেবডেট্‌ উন্টেবড্রাক্‌ট্‌'—'দমন কর নয়তো দমিত হবে'—মাঝে অন্য পথ নেই। এটাই ব্রেখ্‌ট্‌-এব প্রধান পরিচয়—তিনি বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের এক যোদ্ধা।

তাঁর যেসব নাটকে বিপ্লবের প্রত্যক্ষ চিত্র নেই, সেখানেও প্রতি মুহূর্তে মানুষের নানা বৃত্তিকে পরীক্ষা করা হচ্ছে শ্রেণীর ভিত্তিতে, শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পটভূমিকায়। বোধ করি সবচেয়ে বেশি যে বৃত্তিকে ব্রেখ্‌ট্ বিশ্লেষণ করেছেন, তা হচ্ছে লোভ, মুনাফাগৃধ্নুতা। কিন্তু কখনোই তা সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত কোনো 'সহজাত' লোলুপতা নয়, ব্যক্তির উৎকেন্দ্রিকতা নয়, কখনোই তাঁর চরিত্ররা কাম্যু-র বহিরাগত মানুষ নয়। মাদার কুরেজের মুনাফালোভ হচ্ছে শাসকশ্রেণীর লুণ্ঠনবৃত্তির অনুকরণ মাত্র, শাসকরা শতবর্ষ ধরে যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছে মুনাফার জন্য, আর সর্বহারা কুরাজের এত বড়ো স্পর্ধা যে তাদের আদর্শে নিজেকে দীক্ষিত করতে গেছে, নিজ শ্রেণী ছেড়ে মুনাফাখোর শ্রেণীতে উঠতে গেছে। তাই ইতিহাস তাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে যায়। তুলনা করুন বুর্জোয়ার লোভের হিংস্র প্রতিনিধি পিয়ারপণ্ট মলার, 'হাইলিগে যোহানা' নাটকে। তাঁর হঠাৎ জাগ্রত জীবে দয়া, গোরুদের প্রতি মমত্ব, আসলে শিকাগোর মাংসের বাজার করায়ত্ত করার কৌশল। যোহানার দয়াধর্মে তাঁর যে আসক্তি সেটা শুধু শ্রমিকদের প্রতারিত করার জন্য। জমাট-বাঁধা লোভের প্রতিমূর্তি পুঁজিপতি মলার—সুসংবদ্ধ আবেগহীন শোষণের মার্কিন বিশেষজ্ঞ। 'ভালোমানুষ' পালায় ছোটোখাটো মানুষদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এলোমেলো লোভের উন্মেষ—সেও শোষিত ঔপনিবেশিক সমাজের ফল।

ব্রেখ্‌ট্ বোধ করি একমাত্র আধুনিক নাট্যকার যিনি নারী পুরুষ সম্পর্ক চিত্রায়ণে 'বিশুদ্ধ প্রেম', 'নিষ্পাপ আবেগ' আর 'নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ' প্রভৃতি মিথ্যাকে কোনো আমল দিতেই রাজি হননি মার্ক্সবাদী ব্রেখ্‌ট্ জানেন, শোষিত সমাজে প্রেম কলঙ্কিত, বিকৃত, কদর্য হতে বাধ্য। ব্রেখ্‌ট্ জানেন, ফিউডাল সমাজে প্রেম হচ্ছে ধর্ষণের নামান্তর এবং বুর্জোয়া সমাজে প্রেম হল লেনদেনের একটা হিশেবি সম্পর্ক। ব্রেখ্‌ট্‌কে ধাঁওতা দেওয়া যায় না। এ সমাজে মানুষ তার সব সুকুমার বৃত্তি থেকে বিযোজিত হয়ে গেছে, তার ভালোবাসা-স্নেহ-মমতা-শ্রদ্ধা যে টাকার ক্লেদাক্ত স্পর্শে কলুষিত হয়ে গেছে, এটাই বারবার ব্রেখ্‌টের সৃষ্টিতে ঘোষিত, প্রদর্শিত, বিশ্লেষিত। প্রেম নামক কোনো এক আদিম স্মৃতি হঠাৎ হয়তো ছুঁয়ে যায় 'মাদার কারেজের' পাচক চরিত্রকে। তুষারাবৃত প্রান্তরে কুরাজ নামক এক ভীষণদর্শনা প্রৌঢ়ার সঙ্গে অন্বেষণে বেরিয়ে, এক সৃষ্টিছাড়া খেয়াল সে দেখে কয়েক মুহূর্ত। সে গান গেয়ে অভিযোগ জানায়—'জো ইস্ট ডী ভেল্ট্ উন্ড্ মুস্ নিশ্ট্ জো সাইন' – এই তো ভবের বাজার বানিয়েছ তোমরা, কিন্তু এরকম হওয়া উচিত নয়। উল্লিখিত পাচক প্রেমের অংকুরটিকে আর আঁকড়ে থাকতে পারে না। যে কুরাজ আর দুদিন বাদেই দেউলে হতে পারেন তাঁর সঙ্গে নিজেকে জড়ানো কাজের কথা নয়—সমাজ পাচককে এই শিখিয়েছে। সুতরাং পলায়ন এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল কোনো বৃদ্ধার খোঁজে যাত্রা। ম্যাকি নামক দস্যুর কাছে নারী হচ্ছে নিজের পৌরুষ জাহির করার মাধ্যম, আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠার সোপান। ম্যাকির চোখ মাস্তানের চোখ। নারী তার কাছে ব্যবহার্য মাংসপিণ্ড। (অন্য কোনো ব্যাখ্যা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে মঞ্চে।) আর্টুরো উই প্রেম নিবেদন করে কূটনীতির প্রয়োজনে। হিটলারি শাসনে স্তব্ধ জর্মনিতে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের সম্পর্ক পরিণত হয় পারস্পরিক সন্দেহ ও ত্রাসে ('ফুর্শ্ট্ উন্ড্ এলেন্ড্ ডেস ড্রিটেন রাইখ্‌স্')। অধিকাংশ নাটকে ব্রেখ্‌ট্ প্রেমিক-

প্রেমিকা নামক মিথ্যাবাদীদের সযত্নে পরিহার করেই চলেছেন, কারণ তিনি স্থিরনিশ্চয় যে বিপ্লবের পূর্বে প্রেম পূর্ণ রূপ পেতে পারে না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রেম এক গাপ্পা।

শুধুমাত্র শ্রেণীযুদ্ধের ব্যারিকেডে বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে যখন সহযোদ্ধা নারী ও পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকায়, তখন ব্রেখট্ তাদের মধ্যে দেখেন মৃত্যুঞ্জয় প্রেম, কেননা তখন সে প্রেম নূতন সমাজের গর্ভসঞ্চার, সে-প্রেম শৃঙ্খলিত প্রেমকে মুক্ত করার প্রেম। তাই 'ডী টাগে ডের কম্যুনে' নাটকে দেখি প্রবল যুদ্ধের মাঝে, আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে জাঁ ও বাবেৎ, জেনেভীভ ও ফ্রাঁসোয়া পরস্পরকে প্রকৃত ভালোবাসার অভিবাদন জানায়, এবং পরমুহূর্তে গুলি চালায় অগ্রসরমান সরকারি ফৌজের পরে। তাদের মাথার ওপর উড়ছে গুলিবিদ্ধ দগ্ধ বিবর্ণ একটি লাল নিশান। (মধ্যবিত্তমনা পরিচালকদের জানাই, জাঁ ও বাবেত্তের তীব্র ও বর্ণাঢ্য প্রেম-সম্ভাষণ আপনারা সইতে পারবেন না, তবে প্রথমতঃ তারা প্যারিসের মজদুর, বাগিচায় আলাপন তাদের আসে না, আর দ্বিতীয়ত তাদের দেহজ ভালোবাসাটা নূতনের জন্মদাতা বলেই সার্থক।) সেইরকম মহত্ত্বে উন্নীত ভালোবাসা সিমোন মাশার। ফ্রান্সের এই কৃষককন্যা তার সব প্রেম আর সাবলা নিয়ে হিটলারি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলেই তার প্রেম সার্থক, এক লহমায় সে জোন অফ আর্কের ভূমিকায় উন্নীত। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কেন্টলি উইলেট থেকে শুরু করে কলকাতার কিছু নাট্যকর্মী পর্যন্ত যে ভাবছেন ব্রেখটের প্রত্যক্ষ বিপ্লবপ্রচারক নাটকগুলো চেপে গিয়ে 'কম বিপজ্জনক' 'সামাজিক' নাটক নিয়ে পড়ে থাকি, তারা খরগোসের মতন চোখ বুজে আছেন। শ্রেণীচেতনা ও বিপ্লবচেতনা অখণ্ড এক বিশ্বরীক্ষা, মার্কস্‌বাদ একটি আস্ত ভেলটানশাউং। সমাজ, প্রেম, বিবাহ অপত্যস্নেহ মাতৃভক্তি, ধর্ম, আইন, সাহিত্য, চিন্তার প্রতি আনাচে কানাচে বিস্তৃত ব্রেখট্ এর শ্রেণীচেতনা। সব পথ বেঁধে দিয়েছেন ব্রেখট্, ভিতুরা পালাবেন কোন গলি দিয়ে? বন্ধনহীন গ্রন্থি সর্বত্র।

মার্কস্‌বাদী বিপ্লবী ব্রেখট্‌কে স্বীকার করে নিলে তবে আসে কর্মের কথা, কলাকৃতির কথা, প্রযোজনা তত্ত্বের কথা। বিপ্লবী নাট্যকারের মতামত আগে স্বীকার না করলে তার নাটক প্রযোজনা করা যায় বলে আমি মনে করি না। বিপ্লবী নাটক আর পাঁচটা বিশুদ্ধ আনন্দের নাটক নয়, এখানে নাট্যকার ও পরিচালকের রাজনীতির ঐক্য প্রয়োজন।

সমদৃষ্টি ব্যতীত এস্থলে সর্বনাশ অনিবার্য, কেননা এসব নাটকে রাজনীতিটাই প্রধান। ইওনেস্কোর মতন ব্যর্থ নাট্যকার কাগজেকলমে লেখার স্পর্ধা রাখেন, ব্রেখট একটা রাঙ্কাউট মাত্র। ইওনেস্কোর নাট্যশালায় কোনোদিন লোক আসেনি, বুর্জোয়ার রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাকে নানা প্রচারের ঠেকনো দিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। বর্তমানে ঠেকনো ও কিমিতিবাদ সমেত ইওনেস্কোরা ধরাশায়ী। কিন্তু রাঙ্কাউট ব্রেখট্-এর প্রভাবে পশ্চিম ইয়োরোপে এসেছে আঙ্গিক-বিপ্লব, শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল স্ট্র্যাটফোর্ড নাট্যশালাতেও— মঞ্চস্থাপত্যে, অভিনয়রীতিতে, এমনকী পরিচ্ছদপরিকল্পনায়। ইয়োরোপের অনুকরণেই ভাবতের চিন্তাবিদরা ভাবেন, লন্ডনে বৃষ্টি হলে এখানে ছাতা খোলেন, কিন্তু ঔপনিবেশিক এই সুদূর কোণে সংবাদ পৌঁছুতে বড় দেরি হয়। ওখানে বর্ষা কেটে রোদ উঠলেও এখানে অনেকের ছাতা খোলা থাকে। তাই ওখানে ইওনেস্কো-পিন্টার কোম্পানির শৈল্পিক বিপর্যয়ের বহু পরেও

কলকাতার কিমিতিবাদ কিছুদিন সফরীর ন্যায় ফড়ফড় করেছে। দশ বছর আগের ইয়োরোপের খবর এখন পৌঁছুচ্ছে—প্রায় সব উদীয়মান ইয়োরোপীয় পরিচালকই এখন ঘোর এস্ট্যাব্লিশমেন্ট বিরোধী, প্রচারধর্মী ও বয়স্কাউট ব্রেখ্‌টের মন্ত্রশিষ্য। এতে কলকাতায় অনেকের কপালে বলিরেখা দেখা গেছে, কেননা ইয়োরোপের এই সাম্প্রতিক ঝোঁকটাকে অনুকরণ করার বহু ঝামেলা এই জরুরি অবস্থার ভারতে। কিন্তু সেই দলকে কী বলা হবে যাঁরা একই সঙ্গে ব্রেখ্‌ট ও ইওনেস্কোর নাটক মঞ্চস্থ করেন? তাঁরা ঝগড়াঝাঁটির ঊর্ধ্বে? নাটক তাঁদের কাছে নাটক মাত্র? শিল্পের জন্যই শিল্প করেন? তাঁরা তপোবনচারী নির্বিরোধ ঋষি? ব্রেখ্‌ট কিন্তু স্পষ্টতই এহেন নপুংসক চিন্তাসর্বস্বদের দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর প্রশ্ন পরিচালকদের কাছে আপনি যদি নিরপেক্ষ হন, শ্রেণীসংগ্রামে যদি আপনার আগ্রহই না থাকে, তবে আমার নাটক স্পর্শ করবেন না ('ডের ডিয়ালেক্‌টিশে ড্রামাটিকে' দেখুন)। যাদের কাছে ইওনেস্কো ব্রেখ্‌টে কোনো তফাত নেই, তাঁরা স্পষ্টতই ব্রেখ্‌টের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা নন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ব্রেখ্‌টের রাজনীতি তো দূরের কথা ব্রেখ্‌টের ফর্ম বোঝাও সম্ভব নয়, কারণ ব্রেখ্‌টের এপিক রীতি নাট্যশালায় মার্ক্‌সবাদী ডায়ালেক্‌টিকস প্রয়োগের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত মাত্র। তাঁর সারা জীবনের বিপ্লবচিন্তা, নাট্যচিন্তা এবং আঙ্গিকচিন্তা অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

আঙ্গিককে রাজনীতির অধীন রাখলেও পরিচালক জীবনে প্রয়োজনানুযায়ী স্টাইলের বহু পরিবর্তন ঘটালেও, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ব্রেখ্‌ট শেষ কটি প্রয়োজনায় ফর্ম সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। সেগুলোকেই তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূর্ত কতকগুলি ফর্মুলায় পর্যবসিত করেছেন পশ্চিমা কিছু নাট্যবিদ। ভেরফ্রেমডুং, এলিয়েনেশন, এপিক, এমপেথি প্রভৃতি কথাকে ব্রেখ্‌ট-এর রচনা থেকে ছিঁড়ে এনে তাঁকে বিশুদ্ধ এক আঙ্গিকবিদে পরিণত করতে চেয়েছেন তাঁরা যাঁরা ব্রেখ্‌ট-এর রাজনীতি সইতে পারেন না। যে-বিষয়টি চাপা দেওয়ার আন্তর্জাতিক প্রয়াস চলছে সেটা এই—ব্রেখ্‌ট-এর আঙ্গিক পুরোপুরি মার্ক্‌স্‌বাদী নাট্যচিন্তার নূতন সম্প্রসারণ, নূতন সংযোজন মাত্র। মার্ক্‌স্‌-এংগেল্‌স থেকে শুরু করে মাও-এর হাত ঘুরে আজকের গোর্কি, জদানভ, কডওয়েল, টমসন, ভ্লু ইয়াং, লুকাচ ফ্যাশ প্রভৃতি পর্যন্ত মার্ক্‌স্‌বাদী সংস্কৃতিচিন্তা ও বিতর্কের পরম্পরায় যদি ব্রেখ্‌টকে না দেখি, তবে তাঁর রূপরীতি হিং-টিং-ছট হয়ে থাকবে। একটি পুরাতন প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ব্রেখ্‌টের এপিক তত্ত্বে, বিপ্লবী নাট্যকার দর্শকের আবেগে ঘা দেবেন, না বুদ্ধির কাছে আবেদন রাখবেন? মার্ক্‌স্‌বাদী তো ডেমাগগ নন। প্রবল নাট্যক্রিয়ায় তিনি দর্শককে অভিভূত করবেন কেন? যুক্তির শান্ত পরিবেশনে যেমন মার্ক্‌স্‌বাদী তাঁর বিপ্লবের তত্ত্ব পৌঁছে দেন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, নাট্যকারও তেমনি বিশ্লেষণী কৌশলে দর্শককে বোঝাবেন সমাজবিবর্তনের ধারা, সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ব্রেখ্‌টের এই সমাধানই যে চরম ও সর্বশেষ এমন মনে করার কোনো কারণ ঘটেনি। মার্ক্‌স্‌বাদীদের আলোচনা কখনোই থামে না। মার্ক্‌স্‌ও এংগেল্‌স্‌-এর বিপরীত উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন নাট্যকারদের , বলেছিলেন, নাটককে শেক্‌সপিয়ারাইজ কর, শিলারাইজ কোরো না, প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতে নাটককে আবেগময় কর, বিশ্লেষণ কোরো না। স্তালিন নাটককে বলেছিলেন শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াও আরো অনেক কিছু,

সুতরাং একান্ত পার্টিগত যে অভিধাগুলি—বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী—এসব নাটকের ক্ষেত্রে, দোহাই তোমাদের, কখনো ব্যবহার কোরো না। সমাজবাদী বাস্তবতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গোর্কি ভিন্ন কথা বলেছেন। চেয়ারম্যান মাও যখন সর্বতোভাবে শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের জন্য নাটক লিখতে বলেন, তখন আবার ব্রেখ্ট্-এর বিশ্লেষণী ভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—বিশেষত ইয়োরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী যেখানে ব্রেখ্টের লক্ষ্য। বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহেই এইসব বিতর্ক, সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই ব্রেখ্টের ফর্ম অন্বেষণ। বিতর্কটা বহু পুরাতন, মার্ক্‌স্‌বাদীর কাছে সুপরিচিত।

এপিক থিয়েটারকে সুতরাং গুপ্তমন্ত্রের মতন জটিল করে তোলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বিশেষ করে প্রাচ্যের মানুষের কাছে তত্ত্বটা সহজ এবং অতি পুরাতন। চীন এবং ভারতের মানুষ এপিকেই চিরদিন অভ্যস্ত, ড্রামাটিকে তার আসক্তি অতিশয় সাম্প্রতিক। মহাভারতের সবটাই এপিক, ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত নয়, কারুর মুখে বর্ণিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা সঞ্জয় উবাচ। এটাই এপিক ফর্ম, ব্রেখ্ট্ কর্তৃক আধুনিক ভাবে ব্যবহৃত। 'মা' নাটকের মে দিবসের রিপোর্টিংটা পড়লেই বোঝা যাবে মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলির সঙ্গে তার গভীর মিল। বাংলার লোককবি চিরদিনই ভণিতা প্রয়োগ করেন, নিজ নাম উচ্চারণ করেন—সেটা এলিয়েনেশন, মধ্যেমধ্যে ইচ্ছাকৃত সুর কেটে দেওয়া, শ্রোতাকে সম্বিত ফিরিয়ে দেওয়া। পাঁচালিকার চিরদিন ঘটনা বিবৃত করেন, নানা চরিত্রের সংলাপ একাই বলেন। কীর্তনিয়ারও সেটাই কাজ—কখনো তিনি রাধা, কখনো কৃষ্ণ, কখনো বা গোপী। এটাই এপিক। এটাই এলিয়েনেশনের মূল কথা। কথকঠাকুরের মুখে মহাভারতের কাহিনী যে শুনেছে সে ব্রেখ্ট্-এর মূল কথাটা বুঝে নিয়েছে অনায়াসে। কথক অর্জুনের হয়ে কথা কইছেন, কিন্তু নিজে কখনোই অর্জুন হচ্ছেন না। কারণ পরমুহূর্তে তিনি অর্জুনের আচরণের ব্যাখ্যাকারও বটেন। নিজে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে আর ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রত্যক্ষ ঘটনাবলি অভিনয় করলে শ্রোতারা তাতে ডুবে যান, মাঝে কথক এসে দাঁড়ালে ঘটনাগুলো সরে যায় কিঞ্চিৎ দূরে, অন্যের মুখে ঘটনার কবিত্বময় বর্ণনা শুনলে শ্রোতা সমগ্র ছবিটা দেখতে পান। তখন তাঁরা শুধু আবেগমথিত হন না, ঘটনার কার্যকারণ বোঝেন। এই রীতি প্রযুক্ত হয়েছিল বলেই বাংলার কৃষক-সাধারণ মহাভারতের নীতিকথা তথা দর্শন এত গভীরভাবে বুঝেছিলেন। এই এপিক ফর্ম বোঝাবার জন্য এমন কষ্টকর আঁকুলিবিকুলি কেন? ব্রেখ্ট্ তো মহাকাব্যের ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনেছেন আজকের কথা বলার জন্য। অন্য আরেক পুরাতন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন ব্রেখ্ট্—মানুষকে কীভাবে দেখাব? ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ প্রয়োগ করলে মানুষকে নানা বিপরীত বৈশিষ্ট্য সমেত এক জটিল দ্বন্দ্বসংকুল চরিত্র করে দেখাতে হয়। শেক্‌স্‌পিয়ার ও বালজাকের একনিষ্ঠ পাঠক মার্ক্‌স্ তাই চাইতেন। গোর্কি নাটকের নায়ককে রোম্যান্টিক চোখে দেখতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের কোনো নাটকে তা দেখেননি। তাঁর চরিত্ররা নির্মম ভাবে বাস্তব ও দ্বন্দ্বজর্জর। চেয়ারম্যান মাও বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, বিপ্লবের কথা বলতে গেলেই আপনাদের চরিত্রগুলো অমন খড়ের পুতুল হয়ে পড়ে কেন? ডায়ালেকটিক্‌স্ কখনো দ্বন্দ্বহীন মানুষের কথা চিন্তা করতে দেয় না। নাট্যচরিত্ররা হবে নানা দ্বন্দ্বে কম্পমান, বিপরীত সব ভাবে ভরপুর। সাম্প্রতিককালে চীনের

জু-ইয়াং এ লাইন থেকে সরে এসেছিলেন অনেক। মার্ক্‌স্‌বাদী গবেষক লুকাচ চরিত্রচিত্রণে আরো বেশি দ্বন্দ্ব ও সংশয় দাবি করেছিলেন বলে জু-ইয়াং তাঁকে কঠোরতম সমালোচনা করে বলেন, বিপ্লবী নাটকে বিপ্লবী হবে শাদা, প্রতিবিপ্লবী হবে কালো, জনতাকে বিপ্লব বোঝাবার এটাই একমাত্র পথ। জু ইয়াং সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তীব্রভাবে ধিকৃত হন, কিন্তু সেটা এই মত প্রকাশের অপরাধে নয়—কেননা আজও বিশ্বে এই বিতর্ক চলছে এবং বহু সাংস্কৃতিক কর্মী এই স্পষ্ট শাদা কালো তত্ত্বের সমর্থক। প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নামলেই বোঝা যায় দ্রুত কার্যকরী প্রচারের প্রয়োজনীয়তা।

ব্রেখ্‌ট্‌-ও বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—একত্রে বহু ভাব দেখালে নাটকে জটিলতা সৃষ্টি হয়, সাধারণ দর্শকের পক্ষে বিপ্লবতত্ত্ব বুঝতে অসুবিধা হয়। অন্যপক্ষে মার্ক্‌স্‌বাদী হিসেবে, ডায়ালেকটিশিয়ান হিসেবে তাঁর পক্ষে মানুষকে স্রেফ শাদা বা স্রেফ কালো মনে করা ছিল অসম্ভব। সমাধান হিসেবে তাঁর এপিক রীতি আবিষ্কার—বা বলা চলে পুনরাবিষ্কার। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে যেমন তিনি দূরত্ব সৃষ্টি ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, মানুষকে কীভাবে দেখাব এ প্রশ্নের উত্তরও সেই মহাকাব্য থেকেই সংগ্রহ করলেন। শেক্‌স্‌পিয়ারে চরিত্ররা যেমন দৃশ্য থেকে দৃশ্যে জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হতে থাকে, প্রাচীন মহাকাব্যে তা কখনো হয় না। অর্জুন বা কর্ণের বিপর্যয় নেই, তারা পাষাণপ্রতিমার ন্যায় বৃহৎ ও শান্ত। তাদের একেক পর্বে একেক ভাব। অর্জুন কখনো প্রেমিক, কখনো মহাবীর, কখনো বা যুদ্ধবিমুখ। কর্ণ কখনো নারী উৎপীড়ক, কখনো বীরশ্রেষ্ঠ, কখনো বা মাতৃস্নেহলোলুপ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। শাদা ও কালো দুই চিত্রই উপস্থিত হচ্ছে, তবে একত্রে ধূসর বর্ণ ধারণ করে নয়, আলাদা, পর পর। এতে তথাকথিত লজিকের প্রয়োজন হয় না। মহাকাব্য নিজের দূরত্ব বজায় রাখে বলে দৈনন্দিনতার আবদ্ধ নয়। উপকথার যেমন জাগতিক লজিক লাগে না, মহাকাব্যেরও নয়। এই ফর্মকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোয় সংশোধিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্রেখ্‌ট্‌, থিয়েটারকে দিয়েছেন উপকথার বৃহত্ত্ব, মহাকাব্যের গরিমা। মানুষকে ব্রেখ্‌ট্‌ দেখিয়েছেন একেক দৃশ্যে একেক রূপে, প্রতি রূপকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন বৃহৎ লিখিত বিজ্ঞপ্তি মারফৎ, 'তখন কুরাজ ব্যবসায়ে নামলেন' বা 'যোহানার ধর্মভাব' অথবা 'গালিলেও স্বর্গ উঠিয়ে দিলেন'। কুরাজ যে কখনো মাতা, কখনো কূট ব্যবসায়ী, কখনো ফিউডাল যুদ্ধবাজদের সমালোচক, কখনো বা হতভম্ব নির্বোধ—এইসব একের পর এক চিত্র চলে যায় দর্শকচক্ষুর সামনে দিয়ে। সবগুলির সমন্বয়ে আস্ত মানুষ কুরাজ সৃষ্টি হয় দর্শকমনে। এইভাবে এপিকের দূরত্ব, আপাত-নির্লিপ্ততা এবং একেক পর্বে একেক ভাব মারফত ব্রেখ্‌ট্‌ সৃষ্টি করেছেন আজকের কুরুক্ষেত্র, আজকের কুরু-পাণ্ডব।

মার্ক্‌স্‌বাদীদের কাছে এ-ও কোনো তর্কাতীত বেদবাক্য নয়। জ্‌দানভ-এর নেতৃত্বে সোভিয়েত সমালোচকরা ব্রেখ্‌ট্‌কে এক মহান বিপ্লবী নাট্যস্রষ্টা আখ্যা দিয়েও, ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌-এর অপপ্রয়োগের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের শাদা দিক ও কালো দিক একসঙ্গেই থাকে ও পরস্পরের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। সেটাই ডায়ালেক্‌টিকাল দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষকে কাটাছেঁড়া করে একেক দৃশ্যে দ্বন্দ্বহীন এক এক অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করলে আমরা দেখি পরপর

কতকগুলি মৃতদেহ, এবং দশটি মৃতদেহের যোগফল কখনোই একটি জীবন্ত মানুষ নয়। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, ব্রেখ্‌ট্ ডায়ালেক্‌টিক্‌স্-এ বুঝেছেন শুধু বৈপরীত্যের সহাবস্থান। আসলে ডায়ালেকটিক্‌স্-এর মূল কথা হল বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব। তাই মানুষকে কখনো বীর, কখনো কাপুরুষ দেখালে এপিক হয়তো হয়, কিন্তু ব্রেখ্‌ট যে দাবি করেন এটা মার্ক্‌সীয় দ্বন্দ্ববাদ, তা মানা যায় না। বীরত্ব ও কাপুরুষতা একই মানুষে ও পরস্পরের মধ্যে চলে তীব্র দ্বন্দ্ব—এই ছিল সোভিয়েত সমালোচনা। ব্রেখ্‌ট এ সমালোচনা স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে 'লুকুলুস' অভিনয়ের পর স্বদেশেও তিনি পার্টির সংস্কৃতি-মুখপাত্রদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন ওই ফর্মের প্রশ্নে। মানুষ ও জীবনকে অত্যধিক স্কিমেটিক বা ছক-বাঁধা রূপে ব্রেখ্‌ট্ দেখান, এই ছিল অভিযোগ। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রাক্‌শর্তগুলি ব্রেখ্‌ট্ মানেন না, এ প্রশ্ন তোলে 'নয়েস ডয়েট্‌শ্‌লান্ড্' পত্রিকা। কিন্তু ব্রেখ্‌টকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বাইরের এক প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তি বলে স্বীকার করে নিতে জার্মান পার্টির বাধেনি।

ফর্মের প্রশ্নে কোনো চরম বা পরম নেই। ফর্মুলা হচ্ছে নাটকের অশনিসংকেত। উপরন্তু স্তালিনের মতে ফর্ম হবে চিরদিন জাতিগত, বিষয়বস্তু হবে সমাজতান্ত্রিক। প্রতি জাতি নিজ নিজ প্রিয় ফর্ম সৃষ্টি করেছে বহু শতাব্দী ধরে। সেই ফর্মেই সে দেখতে চাইবে বৈপ্লবিক নাটক। জাপানিদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি মারফত সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃত্য মারফত, মহারাষ্ট্রে তামাশায়, উত্তরপ্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওয়াইয়ে। আসল কথা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। ফর্ম দেশকালসাপেক্ষ, বিষয়বস্তু চিরন্তন। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই বের্টোল্‌ট্ ব্রেখ্‌ট্ এ শতাব্দীর মহত্তম নাট্যকার, বিপ্লবী নাটকের পতাকাবাহী।

ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্‌সবাদ

১

ব্রাজিলের বিপ্লবী নাট্য পরিচালক আউগুস্তো বোয়াল তাঁর 'নির্যাতিতের নাট্যশালা' গ্রন্থে বলেছিলেন, ব্রেখ্‌ট্‌ এর থিয়েটারের নাম হওয়া উচিত ছিল 'মার্ক্‌স্‌বাদী থিয়েটার', 'এপিক থিয়েটার' নয়। তাঁর মতে 'এপিক' ও 'থিয়েটার' কথা দুটি পরস্পর বিরোধী। এপিক অতীতের ঘটনার পুনঃপ্রচার, থিয়েটার একান্তভাবে বর্তমান। যা ব্রেখ্‌ট্‌ সারা জীবন করে গেছেন, তা হচ্ছে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে, আঙ্গিকে, অভিনয়ধারায় এবং দর্শকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে মার্ক্‌স্‌বাদের প্রয়োগ। [Augusto Boal, *Theatre of the Oppressed*, London 1979, pp. 92।]

এপিক থিয়েটার অভিধাটি সংগত হয়েছে কিনা সে বিচারে না গিয়েও, আমরা বোয়ালের সঙ্গে অবশ্যই একমত যে ব্রেখ্‌ট-এর সাধনার মূল কথাটাই হল—মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ। তাঁর চিন্তা সর্বতোভাবে মার্ক্‌স্‌বাদী। তাঁর উদ্দেশ্য চিরদিনই ছিল নাট্যশালাকে সর্বাগ্রসর বিপ্লবী শ্রেণীর রণযাত্রার সঙ্গী করে তোলা।

> নাট্যশালা শুধুমাত্র তখনই মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পারবে যখন সে সমাজের তীব্রতম স্রোতগুলিতে গা ভাসাতে পারবে, যখন সে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে যারা সমাজে বিরাট পরিবর্তন ঘটাবার জন্য সবচেয়ে অধীর। [ব্রেখ্‌ট্‌, 'শর্ট অরগানুম', অনুচ্ছেদ ২৩]

ব্রেখ্‌ট্‌ হচ্ছেন সেই ভদ্র পরিচালক যিনি মনে করেন অভিনেতা অভিনয়ই শিখতে পারেন না, যদি না তিনি প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন [ঐ, অনুচ্ছেদ ৫৫]।

অগভীর বিচারে ব্রেখ্‌টের এইসব উক্তি কতকগুলি তাৎক্ষণিক স্লোগান হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু ব্রেখ্‌টের আজীবন চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দাবিটাকে আমরা তাঁর মার্ক্‌স্‌বাদী দর্শনের গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে দেখতে পাব।

ইমান্যুয়েল কান্ট বুর্জোয়া দর্শনের সর্বশেষ মহৎ প্রবক্তা। তাঁর মতে মানুষের দিগ্বিজয়ী মন সব বস্তু বা চিন্তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে, শুধু একটি ছাড়া—যাকে দর্শন বলে পরম বা চরম, যাকে কান্ট বলতেন 'ডিং ইন জিশ' [নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ বস্তু] যাকে ইয়োরোপীয় শাস্ত্রে বলে 'নুমেনা'। কার্ল মার্ক্‌স্‌ এই বুর্জোয়া দর্শনের ইমারত ধ্বসিয়ে দেওয়ার সময়ে একথা প্রমাণ করলেন যে বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে এই অজ্ঞেয়কে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে কাজ করছে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ। কান্টের পদ্ধতির মূল কথা হল জগৎকে স্থিতিশীল ভাবা, ধ্যানমগ্ন হয়ে অজ্ঞেয় কোনো পরমের চিন্তা করা। সময় যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে, ইতিহাসের গতি

যেন স্তব্ধ—নইলে নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অপরিবর্তনীয় 'ডিং ইন জিশ' কী করে স্থান পায়? তবে বুর্জোয়ার যে জীবন-অভিজ্ঞতা, কান্টের দর্শন তার যথাযোগ্য ও পূর্ণ প্রকাশ, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বুর্জোয়ার কাছে কারখানা সভ্যতা, পুঁজি, পণ্য, বাণিজ্য, ধনসৃষ্টি সবই অপরিবর্তনীয়। পুঁজিপতির কাছে পুঁজিবাদ ক্রমবিকাশমান ইতিহাসের সামান্য এক পরিচ্ছেদ নয়, তার কাছে পুঁজিবাদী দুনিয়া অনন্ত, চরম, পরম। তার কাছে পুঁজিবাদ-ই হচ্ছে ডিং ইন জিশ।

কিন্তু শ্রমিকের দৃষ্টিতে আবিলতা থাকে না। তার প্রধান কারণ তার শোষিত বিপর্যস্ত অবস্থা। তার অবসর নেই, চরম বা পরমের ধ্যানে মগ্ন হবারও সময় নেই। মার্ক্সীয় ডায়ালেক্টিক্স্-এর এ এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। যেহেতু শ্রমিক মানসিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে পড়ে, তাই সে ই সত্যদ্রষ্টা, তার মানসই প্রস্তুত হয় যথার্থ বিশ্ববীক্ষার জন্য। যেহেতু তাকে বিশ্বের দিকে তাকাতেই দেওয়া হয় না, তাই সে-ই প্রথম মুক্ত হয় অতীতের সব কুসংস্কার থেকে। বুর্জোয়া বস্তুকে দেখে ভোগ্য পণ্য হিশেবে। শ্রমিক বোঝে সে নিজেই একটা পণ্য। সে বোঝে তার শ্রমশক্তিও একটা বাণিজ্যের বস্তু। তাই বুর্জোয়া দার্শনিক পরিবর্তনশীল জগৎকে দেখতে পান না, কিন্তু শ্রমিক নিজেকে চেনার মাধ্যমেই জগতের স্বরূপ বুঝে ফেলে। 'তার চেতনা হচ্ছে বাণিজ্যপণ্যের আত্মচেতনা, অর্থাৎ তার চেতনায় পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপ তার পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময় সমেত উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।' [Georg Lukacs *Histoire et conscience de classe* Paris 1960, p 210]। শ্রমিক নিজেই একটি বিশাল উৎপাদনী প্রক্রিয়ার অংশ, সে উৎপাদনের একটি মুহূর্তমাত্র। সুতরাং সে বিশ্বকে স্থাণু ও অচল হিশেবে দেখতে পারে না, দেখে প্রক্রিয়া হিশেবে। চলমান জগৎ এই ভাবে তার চেতনায় প্রবেশ করে, কারণ প্রক্রিয়া মানেই পরিবর্তন, লৌহ আকর থেকে ইস্পাতের বীমে, অরণ্যের বৃক্ষ থেকে আসবাবপত্রে, সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষ থেকে নিঃস্ব শ্রমিকে।

শ্রমিকের মতাদর্শই তাই সত্যে পৌঁছায়। দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্কবিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও ভঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। মার্ক্সবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখটীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন-সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।

২

ব্রেখ্‌ট্‌-এর থিয়েটারের প্রধান পরিচয় সে আরিস্টোটল-এর নিয়মবিধির বিরোধী, সে সচেতনভাবে 'নন-অ্যারিসটোটেলিয়ান'। ব্রেখ্‌টের গ্রন্থ 'মেসিংকাউফ কথোপকথনে' যিনি দার্শনিক তিনি বলছেন :

প্রাচীনেরা মনে করতেন ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্য হল করুণা এবং ত্রাস সৃষ্টি। এটাকে

এখনো গ্রহণীয় উদ্দেশ্য বলে ভাবতে পারতাম যদি করুণা বলতে বুঝতাম জনগণের জন্য করুণা, ত্রাস বলতে বুঝতাম মানুষের পারস্পরিক ত্রাস এবং নাট্যশালা যদি সেই অবস্থার অবসান ঘটাতে আত্মনিয়োগ করত যে অবস্থায় মানুষ মানুষকে করুণা করে, ভয় করে।

[*Messingkauf Dialogues*]

আরিস্তোত্‌ল্-এর ট্র্যাজিডির কাঠামোর বিরুদ্ধে ব্রেখ্‌ট্ অসংখ্য মন্তব্য রেখেছেন। সেসব উদ্ধৃত না করে আমরা দ্বন্দ্বটার মূলে যেতে চেষ্টা করব। একটা কথা সহজেই বোঝা যায়, যিনি বিশ শতকের উপযোগী নতুন নাটক ও নাট্যশালা সৃষ্টি করতে উদ্যত, তিনি পুরাতন অভ্যস্ত চিন্তার দাসত্ব করতে পারেন না। তাঁকে বিদ্রোহ করতেই হবে দর্শক ও অভিনেতার অভ্যাসগুলির বিরুদ্ধে। কিন্তু এটা আনুষঙ্গিক মাত্র। শ্রমিকশ্রেণীর প্রবক্তা ব্রেখ্‌ট্ কেন আরিস্তোত্‌ল্‌কে আক্রমণ করতে বাধ্য, তার কারণ আমাদের আরো গভীরে গিয়ে খুঁজতে হবে। পাশ্চাত্যের কিছু পণ্ডিত যাঁরা ব্রেখ্‌টের মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আমলই দেন না তারা অবশ্যই এপিক থিয়েটারের আঙ্গিক চমকেই মজে থাকেন, কেন এবং কোথায় আরিস্তোত্‌ল্ ও ব্রেখ্‌টের বিরোধ সে অন্বেষণ করেন না।

মার্ক্‌স্‌বাদী শিল্পচিন্তার মূল কথাই হল দ্বৈতবিচার। যে কোনো শিল্পসৃষ্টি বা দার্শনিক তত্ত্ব তার নিজ যুগের চেতনার প্রকাশ, আজকের চোখে সেটা অসুন্দর বা ভ্রান্ত মনে হলেও। কিন্তু সেখানেই মার্ক্‌স্‌বাদী গবেষণা থেমে যায় না। মার্ক্‌স্‌বাদ শুধুমাত্র কোনো বস্তু কী সেই চিন্তাই করে না সে বস্তু কী নয় তাও বোঝার চেষ্টা করে। হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্‌স্-এ এর নাম ডায়াক্রনিক কাঠামো। একটি তত্ত্ব কী এবং কী নয়, সেটা সম্যক বোঝার কোনো উপায়ই নেই, যদি আমরা শুধুমাত্র সে তত্ত্বের নিজ কালের চেতনায় নিজেদের আবদ্ধ রাখি। কার্ল মার্ক্‌স্ তাঁর 'জর্মন আইডিঅলোজি' গ্রন্থটি আগাগোড়া সাজিয়েছেন দ্বৈতবিচারপদ্ধতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিশেবে। তিনি অতীতের অসংখ্য শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বকে প্রথমত তাদের নিজ কালের চেতনার প্রতিনিধি হিশাবে বিচার করেছেন , তারপরই তাদের দেখেছেন ইতিহাসের পটভূমিকায়, শিল্পের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, আজকের সর্বহারার চেতনার আলোকে। দ্বন্দ্বমূলক চিন্তা অতিসরলীকরণের ঘোর শত্রু। আরিস্তোত্‌লের চিন্তাকেও ব্রেখ্‌ট্ দেখেছিলেন পরিবর্তনশীল জগতের সামনে রেখে, এবং কোথায় যে আরিস্তোত্‌লের তত্ত্ব শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের বিরোধী এবং আজকে অনিবার্যভাবে বুর্জোয়ার হাতে হাতিয়ার, এটা মার্ক্‌সবাদী ব্রেখ্‌ট্ ধরে ফেলেছিলেন।

মার্ক্‌স্‌বাদী ইতিহাসবেত্তা আর্নল্ড হাউজার তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'সোশাল হিস্টরি অফ আর্ট'-এ দেখিয়েছেন গ্রীক নাট্যশালায় গোড়ায় ছিল শুধু কোরাস, শুধুই জনগণ। জনগণই ছিল থিয়েটার নামক উৎসবের নায়ক, পথে পথে গান ও নৃত্যই ছিল থিয়েটার। থেস্‌পিস্ যেই এই জনসমষ্টি থেকে আলাদা করে প্রোটাগনিস্ট (নায়ক) সৃষ্টি করলেন, সেই মুহূর্তে নাট্যশালা অভিজাত হয়ে উঠল [Arnold Hauser, *The Social History of Art*, New York 1957, vol 1, p 83 f]। তারপর এই নতুন নায়কের সঙ্গে কথা কইবার জন্য ক্রমে এল অন্যান্য

অভিজাত চরিত্র [দিউতেরাগনিস্ট, ত্রিতাগনিস্ট ইত্যাদি]। অর্থাৎ 'ট্র্যাজিক নায়ক' নামক অভিজাত কর্তাটির আবির্ভাব এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নাট্যশালাকে দমননীতির সহচর করার কাজ একই সঙ্গে ঘটে।

এই নাট্যশালার নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আরিস্তোত্‌ল্ তৎকালীন অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর মতামতই প্রতিধ্বনিত করতে বাধ্য—সেটা ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় আজকে স্পষ্ট। আরিস্তোত্‌লের নাট্যশাস্ত্রের সামান্য আলোচনাতেই সেটা প্রতিভাত হবে। তাঁর তত্ত্বে ট্র্যাজিক নায়ক মঞ্চে যা করবে (ইথোস) এবং তার পেছনে যে যুক্তি দাঁড় করাবে (দিয়ানোইয়া) তা হবে সুন্দর। তার আচরণ এবং চিন্তা হবে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু তার থাকবে একটি গুরুতর চরিত্রদোষ (হামার্তিয়া) এবং সেই দোষের ফলে ঘনাবে তার সর্বনাশ। কিন্তু কোনটাকে গুণ বলব আর কোনটাকে বলব দোষ? মাপকাঠি কী হবে? আরিস্তোত্‌ল্ এ-বিষয়ে অতি স্পষ্টবক্তা। 'সংবিধান', 'রাষ্ট্রের আইন', এগুলোই হচ্ছে মাপকাঠি, কারণ 'রাজনীতিই হচ্ছে নানা শিল্পরূপের মধ্যে সম্রাট।' ['Politics is the sovereign art.' S. H. Butcher *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, New York 1951, p. 75]

এই যে নায়কের একটিমাত্র হামার্তিয়ার ফলে ঘটনার মোড় ঘুরল, এই নাট্যমুহূর্তকে আরিস্তোত্‌ল্ বলেন পেরিপাতেইয়া। এর পরে নায়ক নিজেই নিজের ওই গুরুতর দোষ সম্পর্কে সচেতন হবে (আনাগ্নোরিসিস), ভুল বুঝতে পারবে, অনুতাপে জর্জরিত হবে। কিন্তু ততক্ষণে বিয়োগান্ত ঘটনা এমন গতি নিয়েছে যে সর্বনাশ (কাতাস্ত্রোফে) ঠেকাবার কোনো উপায় নেই।

এদিকে দর্শক কী করছে? গোড়া থেকে সে ট্র্যাজিক নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তার সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে, সে সহমর্মিতা (এমপ্যাথি) অনুভব করছে। নায়কের যেটা মহৎ দোষ, সে-দোষ দর্শকেরও আছে। সুতরাং দর্শকের মনে ভয়ের উদ্রেক হতে শুরু করে। তারপর প্রবল আঘাতে নায়কের জগৎ ভেঙে খানখান হলে দর্শকের ভয় ত্রাসে পরিণত হয়, কেননা হামার্তিয়া তার নিজেরও রয়েছে। এবং শেষে ইদিপাসের উৎপাটিত চক্ষু দেখে সে করুণায় বিগলিত হলে, তার নিজের শুদ্ধিকরণ (কাথার্সিস) ঘটে, সে নির্মল মানুষ হয়, তার হামার্তিয়া দূরীভূত হয়। আরিস্তোত্‌লের কথায় :

> করুণা জাগ্রত হয় নায়কের দুর্ভাগ্য দেখে, আর ভয় জাগ্রত হয় কারণ নায়ক আমারই মতন এক মানুষ। [*Poetics* ch 13]

এই করুণা ও ভয় মিশে এমপ্যাথি, নায়কের সঙ্গে দর্শকের একাত্মতা।

কিন্তু দর্শক যে এইসব কষ্টকর আবেগের ফলে বিশুদ্ধ হয়ে নাট্যশালা থেকে বেরিয়ে যাবে, আরিস্তোত্‌লের এ-কথার অর্থ পণ্ডিতরা আজও খুঁজে পাননি। শুদ্ধিকরণ কিসের থেকে? কোন দোষ বা পাপচিন্তা থেকে দর্শক মুক্ত হবে তার কোনো হদিশ আরিস্তোত্‌ল্ স্পষ্টভাবে দিয়ে যাননি। তবে যেহেতু নায়কের দোষগুণ বিচার হবে রাজনীতির নিরিখে, সেহেতু দর্শকেরও রাজনৈতিক অপরাধপ্রবণতাই যে আরিস্তোত্‌লের লক্ষ্য ছিল, এটা বোঝা যায়। অর্থাৎ সামাজিক আচরণবিধি (ইথোস) লঙ্ঘন করতে পারে এমন সব প্রবণতা দর্শকের মন থেকে দূর করাই

গ্রীক ট্র্যাজিডির লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ আরিস্তোত্‌লেব নাট্যশালা ছিল ভীতিপ্রদর্শনের অস্ত্র, দমননীতির সহায়ক, বলপ্রয়োগের বিকল্প।

এবং আরিস্তোত্‌লের নাট্যশাস্ত্র অধিকার কবে রেখেছিল ইয়োরোপীয় মানস শতাব্দীর পর শতাব্দী। এমনকী শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক আলোচনাকালে পণ্ডিতবা বহু বছব আরিস্তোত্‌লীয় কাঠামোই ব্যবহাব করে এসেছেন অভ্যাসবশত। তাঁরা ওথেলো এবং হ্যামলেটের হামার্তিয়া আবিষ্কাব কবেছেন, তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে নাকি পেরিপাতেইয়া ঘটে তাও গাযেব জোবে প্রমাণ কবতে চেয়েছেন, ওথেলোর 'loved not wisely. but too well'-এব মধ্যে আনাগ্‌নোবিসিস খুঁজে পেয়েছেন। ইত্যাকাব বহু উদ্ভট আবিষ্কারে তাঁবা শুধু এটাই প্রমাণ কবেছেন যে শেক্‌স্‌পিযারেব ছটফটে ঘোড়াব মতন নাটককে তাঁবা আবিস্তোত্‌লীয় আস্তাবলে বেঁধে বাখতে বদ্ধপবিকর। এমপ্যাথি যে নাটকেব প্রাক্‌শর্ত, এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ, এমনি একটা ধাবণায় আচ্ছন্ন ছিল সাবা ইয়োবোপ।

দর্শককে করুণা ও ভয়ে আচ্ছন্ন কবে ফেলে, তাদেব মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে হিস্টিরিযাগ্রস্ত এক হিংস্র জল্লাদেব দলে পরিণত কবাব বৃহৎ আবিস্তোত্‌লীয় নাটক ব্রেখ্‌ট্‌ দেখেছিলেন নাৎসিদেব অভ্যুত্থানে। 'মেসিংকাউফ ডায়ালগস্' গ্রন্থে 'উবের ডী টেয়াট্রালিক ডেস ফাশিস্‌মুস' প্রবন্ধে ব্রেখ্‌ট্‌ নাৎসিদেব থিয়েটাবি কলাকৌশল বর্ণনা কবেছেন অন্ধকাব চিরে ঊর্ধ্বমুখী সার্চলাইট, সহস্র নিশান, ভাগ্‌নেব-এব মাদকতাময় সংগীত, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চাবণেব মতন হিটলাবেব জয়ধ্বনি। ধীবে ধীবে শ্রোতৃবর্গেব বিচাববুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ধর্মীয় উন্মাদনায় মেতে ওঠে মানুষ। মানুষেব আবেগ নিয়ে এই সর্বনাশা ছিনিমিনি দেখে ব্রেখ্‌ট্‌ আবো বেশি কবে শাসকশ্রেণীব হাতে এম্‌প্যাথি যে কী দারুণ অস্ত্র সেটা বুঝেছিলেন। এমনকী পববর্তীকালে তিনি স্বীকারও কবে গেছেন যে হিটলাবেব প্রচাবকার্যে আবেগেব আতিশয্য দেখে তিনি হয়তো আবেগ বস্তুটিকেই সন্দেহেব চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন।

যাই হোক, আবিস্তোত্‌ল্‌কে পরাস্ত না কবে সর্বহাবাব থিয়েটাব প্রতিষ্ঠিত হতে পাবে না, ব্রেখ্‌টেব এটাই ছিল সিদ্ধান্ত। মার্কস্‌বাদ একটা বিজ্ঞান, মানুষেব সম্পর্কেব সেটা এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইতিহাসেব বিবর্তনেব নিয়মাবলি আবিষ্কাব কবেছিলেন কার্ল মার্ক্‌স্। মানুষ যেমন এক সময়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের নানা আবিষ্কাবের ফলে আজ প্রাকৃতিক শক্তিকে সে নিজ কার্যে নিয়োগ কবতে পেবেছে, তেমনি কার্ল মার্ক্‌স্-এর আবিষ্কারেব ফলে সে সমাজবিবর্তনেব নানা শক্তিকে আজ নিজ সেবায় প্রযোগ কবতে সক্ষম। তাকে জানতে হবে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব। মানুষকে কবে তুলতে হবে বৈজ্ঞানিক। সেটাই প্রোলেটারিয়ান থিয়েটারেব উদ্দেশ্য। তাই ব্রেখ্‌ট্‌-এব থিয়েটাব আরিস্তোত্‌লের নাট্যশাস্ত্রকে চ্যালেঞ্জ কবতে বাধ্য ছিল, কাবণ ভয়-করুণায় কাতব মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পাবে না। দর্শককে উত্তেজিত কবার পবিবর্তে তাকে শান্ত করতে হবে, তাকে চিন্তা ও বিশ্লেষণের অবকাশ দিতে হবে।

এ থেকেই ব্রেখ্‌ট্‌-এব ভেরফ্রেমডুং বা দূবত্ব স্থাপনের তত্ত্বের উদ্ভব। কথাটি নিয়ে বহু প্রকার হাস্যকব কসরৎ লক্ষ করা গেছে সারা বিশ্বে। আসলে 'এপিক' কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে

দূরত্বের দাবি। এম্প্যাথির বিপরীত। নায়কের সঙ্গে একাত্ম হওয়া নয়, দূরত্ব বজায় রেখে তার কার্যকলাপের বিচার করা। যা দর্শকদের অতি পরিচিত তাকে হঠাৎ অপরিচিত করে দেওয়া, কেননা রোজ বাস্তব জীবনে দেখে দেখে দর্শক যে ঘটনাকে অনিবার্য এবং স্বতঃসিদ্ধ মনে করছে সে সম্পর্কে সে আর চিন্তা করে না। সেই অতিপরিচিতকে অকস্মাৎ মঞ্চে অদৃষ্টপূর্ব রূপে দেখলে সে বিশ্লেষণ করবে, তার কার্যকারণ বুঝতে চেষ্টা করবে। ফৌজে গিয়ে অন্ধভাবে হুকুম তামিল করতে জর্মন শ্রমিক-কৃষক বহুদিন থেকে অভ্যস্ত, 'মান ইস্ট মান' নাটকে তারা যখন দেখল ডক শ্রমিক গালি গে-কে সৈনিক বনতে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজসত্তা হারিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর হাতে জল্লাদ হয়ে উঠতে, তখন তাদের নিজেদের অতিপরিচিত সামরিক জীবন হঠাৎ সত্তাবিলোপের ভয়ংকর রূপকে পরিণত হল তাদের চোখের সামনে। গালি গে-কে তারা যেমন ভালো করে চেনে, তেমনি চেনেও না। একই সঙ্গে পরিচিত ও অপরিচিত। কেননা এই দৃষ্টিতে তাবা নিজেদের ফৌজি জীবনকে আগে কখনো দেখেনি। অতিপবিচিত গালি গে-র অতিঅপবিচিত কার্যকলাপে দর্শকদেব উপলব্ধি ঘটে উচ্চতর স্তরে। যা তাবা এবং তাদের পূর্বপুরুষ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছে সহস্র বৎসর ধরে—'সৈনিক বৃত্তি মহা গৌরবের', 'স্বদেশপ্রেমেব মহত্তম প্রকাশ জর্মন সেনাবাহিনী'—সে সম্পর্কে এবার সহস্র প্রশ্নে দর্শকদের মন উদ্বেল হয়ে উঠতে বাধ্য।

প্রক্রিয়াটি তাহলে কতকটা এইরকম :

চেনা + অচেনা = গভীবভাবে চেনা।

মার্ক্সীয় থিসিস্ + অ্যান্টিথিসিস = সিনথেসিসেব নিখুঁত প্রযোগ। প্রতি বস্তু ও চিন্তার মধ্যেই নিহিত থাকে তাব বিপরীত, এই দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয উচ্চতর চিন্তা। এই মার্ক্সীয সূত্রের থিয়েটারি রূপ হল ব্রেখ্‌টের এলিয়েনেশন।

সুতবাং এ কথাও ভুল যে ব্রেখ্‌টেব থিযেটাবে এম্প্যাথির কোনো স্থানই নেই। আছে, থাকতে বাধ্য। এলিয়েনেশন বললেই এম্প্যাথিব অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল, দূরত্বের চিন্তাব মধ্যেই নৈকট্য আভাসিত। গালি গে প্রথমত দর্শকদের নিকটাত্মীয়, অতিপরিচিত, প্রতিনিধিস্থানীয়। একই সঙ্গে সে দূরের লোক, অপবিচিত [fremd] শত্রুস্থানীয়। এই দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব চলে দর্শকদের মনে। এ কি আমি, না আমাব দুঃস্বপ্ন? একাত্মতা ও দূরত্বের দ্বন্দ্ব।

সারা জীবন ব্রেখ্‌ট্ এই ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ প্রয়োগ করেছেন তাঁব নাট্যরচনায়, চরিত্র-অঙ্কনে, প্রযোজনায়। 'ট্রমেলন্ ইন ডের নাখ্‌ট্' নাটকের আন্দ্রেয়াস ক্রাগ্‌লের বিপ্লবী বার্লিনের শ্রমিকদের অতিপরিচিত। তার ছন্নছাড়া বিদ্রোহী চেহারা বার্লিনের ব্যারিকেডে বহু দেখেছে শ্রমিকবা, যাবা নিজেবাই স্পার্তাকিস্ত বিদ্রোহের অভিজ্ঞ সৈনিক। একই সঙ্গে ক্রাগ্‌লেরের স্বার্থপবতা, কাপুরুষতা ও যুদ্ধ থেকে 'শূকরের মতন' পলায়ন, তার নিজের ঘোষণা 'আমি শুয়োর, এবং শুয়োর এখন ঘরে চলল' [Ich bin ein Schwein, und das Schwein geht heim]—এসব যেমন তার চবিত্রের বিপরীত দিক, তেমনি তাকে করে দেয় দূরের মানুষ, অজ্ঞাত ও ভযাবহ মানুষ। দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব—চেনা মানুষ, অচেনা মানুয—শুরু হয়

দর্শকের চেতনায়। যত ব্রেখ্‌টের পরিপক্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তত তাঁর নাটকে এই ডায়ালেক্‌টিকাল প্রক্রিয়ার গভীরতর ব্যবহার লক্ষ করা যায়—ইতিহাসের নায়ক গালিলেই এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক উদরপরায়ণ গালিলেই, যুদ্ধবিধ্বস্ত জর্মনিতে অতিপরিচিতা মাতা কুরাজ এবং তাঁর শৃগালবৎ আচরণ, অতিপরিচিত হিটলার এবং তার শিকাগো-দস্যুর রূপ পরিগ্রহণ—এসবই এলিয়েনেশন ও এমপ্যাথির ডায়ালেক্‌টিকাল দ্বন্দ্বমূলক প্রয়োগ।

ব্রেখ্‌ট্‌ এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলেছেন :

> যা স্বাভাবিক তার চমকে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই। কারণ ও ফলাফলেব নিয়মগুলি উদ্‌ঘাটন করার আর কোনো পথ নেই।
>
> [*Vergn gunustheater oder Lehrtheater*]

অর্থাৎ তাঁর থিয়েটারে যে দর্শককে শান্তভাবে বিচার কবার সুযোগ দিতে হবে, তার অর্থ এই নয় যে দর্শককে নিশ্চিন্ত থাকতে দেওয়া হবে। শান্তির সঙ্গেই অশান্তি, নির্লিপ্ততার মধ্যেই নিহিত তার বিপবীত—চমক। বিশুদ্ধ নির্লিপ্ততা বলে কিছু নেই , বিশুদ্ধ নির্লিপ্ততার অর্থ নিদ্রা। সমাজেব কোন ফলাফলের কী কারণ, এটা বুঝতে হলে চাই সজাগ ও সতর্ক দর্শক। তাই চমক [erstaunen]।

এর প্রয়োজন হয় কেননা দর্শকবা বিচ্ছিন্নতাব শিকার। মার্ক্‌সের সমাজবিশ্লেষণের একটি মূল কথা এলিয়েনেশন, Entäusserung Entfremdung। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা মানুষকে তার সব সুকুমার বৃত্তি থেকে, তার প্রতিবেশী থেকে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মার্ক্‌স্‌-এর কথায় :

> শ্রমিক যত বেশি উৎপাদন করে, তত নিজে কম ভোগ করে। যত সে মূল্য সৃষ্টি করে তত সে নিজে হয় মূল্যহীন এবং মর্যাদাহীন। তাব সৃষ্ট বস্তু যত সুন্দর হয, সে নিজে হয তত অসুন্দর। তার সৃষ্ট সমাজ যত সভ্য হয, সে নিজে হয় তত বর্বর। তার শ্রম যত বেশি শক্তিশালী হয়, তত সে নিজে হয় শক্তিহীন। তাব শ্রম যত সূক্ষ্ম হয়, সে নিজে হয় তত স্থূল এবং ততই প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়। শ্রম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অথচ শ্রমিককে করে পঙ্গু . . . তাকে করে দেয় নির্বোধ ও হাবা। [Marx-Engels : *Collected Works* Moscow 1975, vol. 1, p 513]

পুঁজিবাদী শ্রমবিভাগ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং বিনিময়, এই তিন দানবীয় শক্তি মানুষকে এইভাবে খণ্ডিত ও একক করে দিচ্ছে, '১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে' মার্ক্‌সের এই সিদ্ধান্ত। শ্রমশক্তিকে যে-বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে সেই বস্তুই শ্রমিকের বিরুদ্ধে শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বহিরাগত, অজ্ঞেয়, অপ্রাকৃত, রহস্যময় এক শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মার্ক্‌সের ঐতিহাসিক আবিষ্কারের পর ক্রমশ অন্যান্য মেহনতি শ্রেণীও কারখানা-সভ্যতার সর্বগ্রাসী বিয়োজন-ক্রিয়ার শিকার হয়েছে। আজ পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের দিকে তাকালে মার্ক্‌সের তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বোঝা যাবে। এমনকী পশ্চাৎপদ ভারতেও, কারখানা-সভ্যতা যতটুকু আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে, সেই অনুপাতে এ-দেশীয় মধ্যবিত্তও

বিচ্ছিন্ন, অন্য মানুষেব সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক-বহিত, বন্ধ্যা জীবন যাপন কবতে বাধ্য হচ্ছে।

মার্ক্সেব এলিযেনেশন-তত্ত্বকে লেনিন মার্ক্সবাদেব মূলনীতি বলে গেছেন অতি সংগত কাবণেই [*Conspectus on the Holy Famiy oj Karl Marx* দেখুন]।

সুতবাং ব্রেখ্‌ট্ যখন মার্ক্সীয, বৈজ্ঞানিক নাট্যশালাব গোড়াপত্তন কবতে গেলেন তখন স্বভাবতই দর্শকবৃন্দেব কথা তাঁকে মনে বাখতে হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণী যেখানে মানসিক পক্ষাঘাতে পঙ্গু সেখানে শ্রমিকেব নাট্যশালাকে 'চমকেব' ওপব নির্ভব কবতে হবে, এ আব বিচিত্র কী? বিযোজিত, বিচ্ছিন্ন, ক্লান্ত মানুষগুলোব চেতনাব জগতে প্রবেশ কবতে গিযে আঙ্গিকগত বহু কৌশল প্রযোগ কবে ব্রেখ্‌ট্ এই শতকেব সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপবিচালকও হয়ে উঠলেন এক সময়ে। তিনি আঙ্গিকেব অন্বেষণে সাবা পৃথিবীব এবং সব যুগেব নাটক ও নাট্য প্রযোজনা বীতি অধ্যযন কবেছেন। তিনি লিখেছেন

> আমবা কযেকটি মাত্র সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ থেকে অনন্য কোনো বাস্তবতা-বীতি তুলে আনব না। আমবা সর্বপ্রকাব, নূতন ও পুবাতন-প্রযুক্ত ও এখনো অপ্রযুক্ত মাধ্যম ব্যবহাব কবব, শিল্প থেকেও নেব, অন্যান্য ভাণ্ডাব থেকেও নেব। আমবা জীবন্ত বাস্তবকে এমনভাবে জীবন্ত জনগণেব হাতে তুলে দেব যাতে তাবা বাস্তবকে আযত্ত কবতে পাবে। আমাদেব বাস্তবতাব ধাবণা হবে ব্যাপক ও বাজনৈতিক। কোনো নন্দনতত্ত্বেব বিধিনিষেধ মানব না, প্রচলিত বেওযাজ থেকে হব মুক্ত।
>
> *[Volkstumlichkeit und Realismus]*

পবীক্ষা-নিবীক্ষাব সঠিক মার্ক্স্‌বাদী মনোভাব এটাই। প্রচলিত বলেই সেটা মানতে হবে এমন নয, অথচ পুবাতন নাট্যবীতিকে গ্রহণ কবতে আপত্তিও নেই। কেননা ব্রেখটের থিযেটাব বাজনৈতিক থিযেটাব, বাজনীতি পৌঁছে দিতে হবে জনগণকে। এটাই সে থিযেটাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। নন্দনতত্ত্ব দিযে যাঁবা ব্রেখ্‌টেব থিযেটাব বীতিব বিচাব কবতে বসেন, তাঁবা যেন একটি পঁচিশ ইঞ্চি কামানেব গঠনে সৌন্দর্য কতটা তাব হিসেব কবছেন। নন্দনতত্ত্ব দিয়ে বাজনৈতিক থিযেটাবেব পবিমাপ হয না, যেমন হয না যুদ্ধাস্ত্রেব। বাজনৈতিক থিয়েটাবের একটিই শর্ত—বাজনীতিটা দর্শকেব কাছে সঠিকভাবে পৌঁছুচ্ছে কিনা। তাব জন্য যা প্রযোজন সবই কবতে হবে। ব্রেখ্‌টীয বীতি—দূবত্বস্থাপন ও চমক—এক বাজনৈতিক প্রযোজনে সৃষ্ট।

এখানেই স্মবণ হয আধুনিক ইযোবোপীয ও মার্কিন নাট্যশালাব কিছু পবীক্ষাবাদীব কথা, যাঁদেব মানসিকতা এক কথায মাস্তানেব মানসিকতা। আমেবিকাব জুলিযান বেক ও জুডিথ মালিনা চেযেছিলেন নাটক থেকে কথাকে বিতাড়িত কবতে , পবিবর্তে নানাবিধ গোঙানি ও চিৎকাবেই নাকি নাটক সৃষ্ট হবে। তাঁদেব মতে, আর্ট ইজ বুর্জোযা, আর্ট ইজ শিট। শিল্প নাকি বুর্জোযা, শিল্প নাকি বিষ্ঠা। বুঝতে অসুবিধে হয না, এসব গোযেবেল্‌স্-এব কাছে শেখা নাৎসি গুণ্ডাদেব কথা। বের্টোল্‌ট্ ব্রেখ্‌ট্ এবং তাঁব প্রথম গুরু পিসকাটব বিশ্বসাহিত্য মন্থন কবে খুঁজে এনেছেন হীবেমাণিক তাঁদেব দেশেব শ্রমিকদেব জন্য। তাঁবা যখন কোনো ধাবাকে নাকচ কবেন, সেটা মানুষেব বিশাল ঐতিহ্যকে ফুঁযে উড়িয়ে নয, ববং সেই ঐতিহ্যেবই আধুনিক অধ্যায

সৃষ্টি করার জন্য। আর ইওনেস্কো-বেক-মালিনার কালাপাহাড়ি-কাণ্ড মানুষকে তার ঐতিহ্য থেকে ছিন্ন করার জন্য। নাটক থেকে ভাষা বাদ দিয়ে ড্রাগ খেয়ে গোঙালে বুর্জোয়া সভ্যতার জারজ সন্তানের মতন আচরণ করা হয়, সফোক্লিস থেকে ব্রেখ্‌ট্ পর্যন্ত মানবজাতির কাব্যময় নাট্যসম্ভারকে বাতিল করা হয়। আলোহীন গহ্বরে নিজেদের নির্বাসিত করে ড্রাগ-খাওয়া নাট্যবিদরা নিজেদের শোচনীয় বিচ্ছিন্নতা ও অসহায়ত্বকেই স্থায়ী করেছেন মাত্র। বেকদেব বাঙালি শিষ্যও অতি দ্রুত নিজেকে রবিনসন ক্রুসোর মতন নিঃসঙ্গ করে ফেলেছেন, এটা আজ দিবালোকের মতন স্পষ্ট। চমকেরও রকমফের হয়। স্রেফ পয়সার জন্য চমক দেয় শস্তা চলচ্চিত্র, দিয়ে বোধশক্তিহীন মানুষকে জয় করে নেয়। চমক দিয়েছেন অনেকে ভাষাকে ভেঙেচুরে, ব্যাকরণের চমক সৃষ্টি করে—জয়েস থেকে আমাদের কমল মজুমদার—লাভ হয়নি, তাঁবা পাঠকের বিচ্ছিন্নতাব প্রাচীর ভাঙতে পারেননি। কদর্য যৌনলীলা ফেঁদে কিন্তু সহজেই বিচ্ছিন্ন মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য উদ্দীপ্ত কবা যায়, এ অভিজ্ঞতা অনেক লেখকেব। ডিটেকটিভ গল্পের ব্যাপকতা, ক্রিমিনালদেব জীবনচরিত নিয়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সাহিত্য ফাঁদা, এ সবই চমক দেওয়াবই নানা প্রয়াস, এবং এতে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সর্বব্যাপী এলিয়েনেশনই প্রমাণ হচ্ছে।

সংগীতে আমরা স্ত্রাভিন্‌স্কিব 'রাইট্‌স্ অফ স্প্রিং'-এ শুনি আদিমতার উগ্র এবং 'নিযম'-বিরুদ্ধ জয়গান, যাকে আডোর্নো বিনা দ্বিধায় 'ফ্যাশিবাদী' আখ্যা দিয়েছেন [T W Adorno *Philosophie der neuen Musik*, Frankfurt 1958, p 134]। শ্যোনবের্গও হার্মনিব যত নিয়ম ছিল সব গুঁড়ো কবে দিতে চেয়েছিলেন চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

ব্রেখ্‌টের চমকের পার্থক্য হচ্ছে তাঁর বাজনীতি। মার্ক্‌সীয় দর্শনের বিচারে সর্বাঙ্গসুন্দব আঙ্গিক, অর্থাৎ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকেব শৈল্পিক ঐক্য কখনোই হতে পারে না, যতক্ষণ না সমাজের সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়। সমাজ যতদিন শ্রেণীবিভক্ত এবং শোষণভিত্তিক থাকবে ততদিন কোনো শিল্পী কখনো তাঁর বিষয়বস্তুর নিখুঁত আঙ্গিক খুঁজে পেতে পারেন না, কেননা তাঁর নিজের মানস কমবেশি খণ্ডিত থাকতে বাধ্য, তিনি পক্ষপাতী হতে বাধ্য। উপরন্তু বিষয়বস্তুর নিজস্ব একটা গতিবেগ আছে, নিজস্ব চাহিদা আছে, যা কিনা একান্তভাবে সমাজনির্ভর, অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন। নাটক একটা কনসেপ্ট, একটা ধারণা, একটা আইডিয়া—চলমান ও পরিবর্তনশীল জগৎ সম্পর্কে একটা চিন্তা। সেহেতু সমাজের দ্বন্দ্বগুলি প্রতিফলিত হয় সেই আইডিয়ায়। আইডিয়ার অভ্যন্তবীণ দ্বন্দ্বের নিজস্ব ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ আছে। নাট্যনির্দেশক সেই ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। পূর্বোক্ত মাস্তানজাতীয় পরীক্ষাবাদীরা মনে করেছেন তাঁরা রাজনীতি-নিরপেক্ষ (মৃদুস্ববে একবার 'ভিয়েৎনাম' কথাটা উচ্চারণ কবা ছাড়া বেক ও মালিনা আর কিছু কোনোদিন বলেননি বরং তাঁরা নিয়মিত আফিম ও গাঁজা সেবনের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করে থাকেন, গোঙানিব ফাঁকে ফাঁকে)। আসলে জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতে হোক, নাটক, সাহিত্য ও সংগীতেব 'নিছক' পরীক্ষাবাদীরা সকলেই তাঁদের সৃষ্টির নিজস্ব দ্বন্দ্বের ক্রীড়নক। তাঁদের ঐতিহ্য-বিরোধিতা আসলে মানুষকে ছিন্নমূল করার একটা প্রয়াস, জঙ্গি মানুষকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন করে দেওযার একটা আইডিয়া। উপরন্তু

মানুষ গাঁজা-আফিম ধরলে যুদ্ধের দিকই কখনো মাড়াবে না। সুতরাং যে সমাজে ওই পরীক্ষাবাদীরা বাস করছেন, সেই সমাজের বাস্তব শ্রেণীদ্বন্দ্বে এই সব পরীক্ষাবাদীরা বুর্জোয়ার মতাদর্শ প্রচার করছেন। এবং সেই মতাদর্শের নিজস্ব ডায়ালেক্‌টিক্‌সে তাঁদের পরীক্ষামূলক আঙ্গিক বিকট, জন-বিরোধী গুণ্ডাগিরির চেহারা নিতে বাধ্য—নাটকে উলঙ্গ হয়ে জাপ্টাজাপ্টি, সাহিত্যে নতুন উদ্ভট শব্দ নির্মাণ, সংগীতকে অস্বীকার। 'নিছক' পরীক্ষা বলে কিছু নেই। দেউলিয়া পচা বুর্জোয়ার আর সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। তাই 'কুৎসিতই শিল্প' এই সিদ্ধান্তে আসতে তারা বাধ্য।

হেগেলও মনে করতেন নিখুঁত শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু তার কারণ হিশেবে তিনি বুঝতেন, শিল্প উন্নততর হতে হতে দর্শনে রূপান্তরিত হবে, চিন্তার রাজ্যে উন্নীত হয়ে যাবে। কার্ল মার্ক্‌স্-এর বক্তব্য ঠিক বিপরীত। তাঁর মতে দর্শনই যাবে লুপ্ত হয়ে, কেননা চিন্তা ক্রমশ কংক্রীট হবে, 'স্থূল' হবে, বস্তুভিত্তিক হবে। মার্ক্‌স্‌বাদের এটাই দৃঢ় প্রত্যয় যে শিল্পই থাকবে, দর্শন নয়, বিশুদ্ধ চিন্তা নয়। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের নিখুঁত ঐক্য বর্তমানে একটা চিন্তা মাত্র, ভবিষ্যতের একটা সম্ভাবনা মাত্র, সাম্যবাদী সমাজে হয়তো তা বাস্তব হবে।

ব্রেখ্‌টের আঙ্গিক-অন্বেষণের ফল—চমক, দূরত্ব স্থাপন, দর্শককে বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখানো, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সাহায্য করা। নিখুঁত অবশ্যই নয়, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে তাঁর নাট্যসৃষ্টি। এবং যেহেতু তাঁর নাটক শ্রমিকদের উদ্দেশে অভিনীত, সুতরাং সেটা অনেক সময়ে সরল উপকথার রূপ নিতে বাধ্য। উপকথা, রূপকথা, প্যারাব্‌ল, এপিক। তাঁর নাটকের নিজস্ব ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ তাঁকে নিয়ে গেছে ঋজুভাবে গল্প বলার রূপরীতিতে। তাঁকে একবার জিগ্যেস করেছিল 'ডী ডামে' পত্রিকা : কোন বইটি আপনার ওপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে? ব্রেখ্‌টের উত্তর : আপনি শুনে হাসবেন—বাইবেল [Sie werden lachen : die Bibel]। ব্রেখ্‌টের নাটকে বাইবেলের আঙ্গিকের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 'তিন পয়সার পালা' এবং 'হিটলার কোরাল'-এ খ্রিস্টীয় প্রার্থনা-সংগীতের কাঠামোয় বাঁধা হয়েছে গান। কুরাজ তিনবার পুত্রকে চিনতে অস্বীকার করেন, যেমন পিতর অস্বীকার করেছিলেন যীশুকে। গালিলেই ও বার্বেরিনি তর্ক করেন স্রেফ বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে। শ্‌লিংক (*Im Dickicht der Stadte* নাটকে এবং ম্যাকি, দুজনেই বিশ্বাসঘাতকের কার্যকলাপে বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা গ্রেপ্তার হয় যীশুর মতন। পরে পুলিশের বড়কর্তাকে কাঁদিয়ে দিয়ে ম্যাকি সোজা বলে : 'এই কৌশলটা নিয়েছি বাইবেল থেকে' [Den Trick habe ich aus der Bibel]। পুন্টিলা বলে সে ব্র্যান্ডির হ্রদের ওপর হাঁটতে পারে, যীশুর মতন। য়োহানা মুনাফাখোরদের তাড়িয়ে দেয় 'পিতার আবাস' থেকে। আজদককে সৈনিকরা আলখাল্লা পরিয়ে উপহাস করে ও মারে—অভাব থাকে শুধু একটি কাঁটার মুকুটের। 'Über reimlose Lyrik' [অমিত্রাক্ষর কাব্য] নামক প্রবন্ধে ব্রেখ্‌ট্ স্বীকার করেছেন তিনি সচেতনভাবে মার্টিন লুথারের বাইবেলের ভাষাকে অনুকরণ করেন, কারণ লুথারের ভাষা 'গেস্‌টিশ'—অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে সে ভাষার ঝংকার কথকের মনোভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পরে আমরা দেখব এই গেস্টুস্ ব্রেখ্‌ট্-এর আঙ্গিক-চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটমাট বাইবেলের কথা এবং ভঙ্গি ব্রেখ্‌টের নাটকে এমন ব্যাপক স্থান জুড়ে রয়েছে যে আমরা হান্‌স্ মাইয়ের-এর সঙ্গে একমত হতে বাধ্য যে, ব্রেখ্‌ট্ বাইবেলের ভাষাকে বাইবেলের বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে গেছেন সারা জীবন [Hans Mayer, 'Bertolt Brecht and the Tradition,' in *Steppenwolf and Everyman*, New York 1971]।

তার চেয়েও যেটা দরকারি কথা, সেটা হল নাটককে যীশুর প্যারাব্‌ল্ বা শিক্ষামূলক কাহিনীগুলির ঢঙে সাজানো। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌টের এপিক থিয়েটার যীশুর সরল এবং তীক্ষ্ণ প্যারাব্‌ল্-এর কাছে ঋণী, এটা ব্রেখ্‌টের নাটকগুলি পড়লে স্পষ্ট হয়। ব্রেখ্‌টের নাটকের যেটা কাহিনী অংশ (Fabel) সেটা আশ্চর্য রকমের সরল এবং তা সর্বসময়ে একটি বিশেষ নীতিকথার দিকে দর্শককে টেনে নিয়ে যায়। কখনো বা একই কাহিনীর দুই বিকল্প ভাষ্য উপস্থিত করে দর্শকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় বিচারের ভার *(Ja-Sager, Nein-Sager)*, কখনো বা ঘটনা উত্থাপিত করেই সজোরে ব্যক্ত হয় তার থেকে কী শিক্ষা নিতে হবে *(Die Massnahme)*। গল্পের মাধ্যমে লোক-শিক্ষার সফল দৃষ্টান্ত ছিলেন যীশু ; তাঁকে পৌঁছুতে হয়েছিল অশিক্ষিত মানুষের কাছে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা ভেদ করে। সুতরাং তাঁর নীতিকথার কৌশল ব্রেখ্‌ট্‌কে প্রভাবিত করবে এ আর আশ্চর্য কী?

ঐতিহ্যের প্রতি বুর্জোয়া পরীক্ষাবাদী থিয়েটারের অবজ্ঞা ও ঘৃণা। তার পাশে মার্ক্‌স্‌বাদী ব্রেখ্‌টের ইয়োরোপীয় জনগণের প্রাচীনতম স্মৃতিকেও শ্রদ্ধা ও সমালোচনামূলক গ্রহণ। এই হচ্ছে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও সর্বহারার শিল্পচিন্তার পার্থক্য। ব্রেখ্‌ট্ তাঁর এলিয়েনেশন পদ্ধতির নজির খুঁজেছেন সারা বিশ্বের সাহিত্যে, ক্যান্টন অপেরা থেকে শুরু করে, শেক্‌স্‌পিয়ারে, গ্যোয়টে-শিলারের পত্রাবলিতে, গ্যোয়টের 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অঙ্কে [যখন মেফিস্তোফিলিস সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে কথা শুরু করে দেয়—গ্যোয়টের মঞ্চনির্দেশ . Mephistopheles, der mit seinem Rollstuhle immer näher ins Prozsenium rückt, zum Parterre]। জন উইলেটের মতে 'ভেরফ্রেমডুং' কথাটি রুশ শব্দ 'অস্ত্রানেনিয়ে' থেকে অনূদিত ; 'অস্ত্রানেনিয়ে' কথাটা রুশ আঙ্গিকবাদী আন্দোলনের নেতা ভিক্‌তর শ্‌ক্লভ্‌স্কি ব্যবহার করতেন [John Willett, *The Theatre of Bertolt Brecht*, London 1959, p.208]। কিন্তু হুল্ট্‌বের্গ এবং ফ্রাদকিন দুজনেই দেখিয়েছেন যে সাদৃশ্যটা আপাত মাত্র, কারণ ব্রেখ্‌টের দূরত্বস্থাপনটা শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র। ব্রেখ্‌টের মতে 'দূরত্বস্থাপনরীতিটা' একটা 'সামাজিক কৌশল' ['মেসিংকাউফের' সংযোজন] এবং 'প্রকৃত দূরত্বস্থাপনরীতিটা জঙ্গি' ['শর্ট অর্গানুমে' ১৯৫৪ সালে প্রক্ষিপ্ত]। [Hultberg, *Die aesthetischen Anschauungen Bertolt Brecht*, Copenhagen 1962, p. 136 ; I. Fradkin, *Bertolt Brecht*. tr. into German by Dieter Wilhelm, Berlin 1970, p 132]

ব্রেখ্‌ট্‌কে শ্‌ক্লভ্‌স্কির কাছে হাত পাততে যে হয়নি, তার প্রমাণ হেগেল এবং মার্ক্‌সেই শিল্পে দূরত্বস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রয়েছে। হেগেল বলেছেন :

> য়া কিছু অতি-পরিচিত (bekannt) তা অতিপরিচিত বলেই আর চেনা যায় না।
>
> [*Phenomenologie*, Vorwort, vi, Berlin Cerkanut 1920]

আর মার্ক্স্ লিখেছিলেন :

অতীতের সব ঐতিহ্য আলপ্স্ পাহাড়ের মতন জীবন্ত মানুষের মগজের ওপর চেপে থাকে। [Marx-Engels, *Works*, viii, p 115]

তা থেকেই তো ব্রেখ্টের উপলব্ধি :

যার পরিবর্তন হয়নি, লোকে ভাবে তা অপরিবর্তনীয়। আধুনিক দূরত্বস্থাপন রীতির কাজ হল, সামাজিক ঘটনাবলি থেকে তার পরিচিতির ছাপটা সরিয়ে ফেলা। কেননা এই চেনা-জানার ফলেই ঘটনাগুলিকে মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত।

[Dialektik auf dem Theater]

ব্রেখ্টীয় এলিয়েনেশনের সবচেয়ে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা রয়েছে 'বিধি ও ব্যতিক্রম' নাটকের শেষ নীতিকথায় :

এইভাবে শেষ হচ্ছে
একটি ভ্রমণ-কাহিনী।
আপনারা শুনেছেন এবং দেখেছেন।
আপনারা দেখেছেন যা পরিচিত, যা সর্বদা ঘটে।
কিন্তু আমাদের অনুরোধ :
যা অপরিচিত নয়, তাকে অপরিচয়ের স্রষ্টা ভাবুন।
যা দৈনন্দিন [üblich] তা যেন আপনাদের চমকে দেয়।
যা বিধি তাকে চিনুন অন্যায় [Missbrauch] হিসেবে,
এবং যেখানে অন্যায় চিনেছেন,
সেখানে প্রতিকার করুন।

[Und wo ihr den Missbrauch erkannt habt da schafft Abhilfe!]

যেন যীশুর পাহাড়ের ওপর উপদেশের আধুনিক প্রোলেতারীয় রূপ। এলিয়েনেশনের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রতিকারে চালিত করা। তাই এলিয়েনেশন জঙ্গি শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার।

৩

ব্রেখ্টের নায়করা প্রায় সবাই কেন শূকরের মতন আচরণ করে, কেন যে তারা কর্মবিমুখ, বিদ্রোহের পরিবর্তে তারা নানা আপোশ, চুরিজোচ্চুরি, অসাধুতা করে জীবন কাটায়, এ-নিয়ে বাদানুবাদের আর শেষ নেই। মার্ক্স্বাদী যোদ্ধা ও দার্শনিক ভাল্টের বেন্জামিনই বোধ করি সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন প্রশ্নটাকে। মার্ক্সবাদী ব্রেখ্ট্ তাঁর দেশের বিশাল সাহিত্যসম্ভারের উত্তরাধিকারী, এবং জর্মন নাট্য ঐতিহ্যে মহাগুণাবলিমণ্ডিত ট্র্যাজিক নায়কের পরিবর্তে আপোশপন্থী, অবয়বহীন, মৃদুকণ্ঠ, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, ছোটো-মাপের নায়করাই চিরদিন আধিপত্য করে এসেছেন। মধ্যযুগের ধর্মীয় নাট্য, পরে গ্রিফিউস, লেন্ৎস্ এবং গ্রাবে, সর্বোপরি গোয়টে [বিশেষ করে 'ফাউস্ট', দ্বিতীয় খণ্ডে] গ্রীক অতিমানবদের সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন,

ট্র্যাজিক নায়কের ধার ধারেননি কেউ। বেন্‌জামিন বলছেন, 'অ-ট্র্যাজিক নায়ক হচ্ছে জর্মন ঐতিহ্যের অংশ।' [Walter Benjamin, *Understanding Brecht*, Old Working, 1977, p.6]। প্লেটো বহু পূর্বেই জানতেন যে জ্ঞানবান মানুষরা হয় অনাটকীয় এবং সেইজন্যই তাঁর 'ডায়ালোগ্‌স্‌' গ্রন্থে [যেটা প্রায় নাটক] সর্বজ্ঞ ঋষিকে বিনয়ী, ধীর, স্থির, শান্ত সমাহিত চেহারায় ধরেছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে জর্মন সাহিত্যধারার মধ্যেই দেখতে হবে ব্রেখ্‌ট্‌কে। তিনি ভুঁইফোড় মাস্তান নন, ইওনেস্কো, বেকেট, পিন্টারদের মতন। তবু একথাও ভেবে দেখার মতন, ইদিপাস-হ্যামলেটদের বীরোচিত কার্যকলাপের সর্বব্যাপী প্রভাবের বিরুদ্ধে ব্রেখ্‌ট্‌কে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং নেতিবাচক নায়ক সে-সংগ্রামে একটা অস্ত্র। নেতিবাচক নায়ক যেন নিজেই একটা রঙ্গমঞ্চ যেখানে নানা সামাজিক শক্তির নাটকীয় সংগ্রাম ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে নায়ক নিজেই যদি নানা বীরত্ব প্রকাশ কবতে থাকত, তবে সামাজিক সংঘর্ষের মূল কথাটা যেত হারিয়ে। 'হ্যামলেট' নাটকে ডেনমার্কের উপস্থিতি অতি প্রবল , তবু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-ডেনমার্ককে ভুলে যান দর্শকরা হ্যামলেটের নিজস্ব দ্বন্দ্বের তীব্রতায়। আজ চারশো বছর ধরে পণ্ডিতরা প্রায় সবাই সেই জন্যই হ্যামলেটেব নানা আবেগ বিশ্লেষণ কবে আসছেন, ভুলেই গেছেন ডেনমার্ক এবং তার পচনকে ('Something is rotten in the state of Denmark' এবং 'Things rank and gross in nature possess it merely.')।

বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশ হেগেলের 'শিল্পের দর্শন' গ্রন্থ। তাঁরই ছিল ট্র্যাজিক নায়কের তত্ত্ব। তাঁব মতে নায়কেব আত্মার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে নাটক। এবং সে প্রকাশও খেয়ালখুশিমতন হতে পারবে না। স্বাধীনতা মানে যা খুশি করা নয় ; স্বাধীনতা মানে নৈতিক চেতনা। 'নাটকীয় ঘটনা বাইরের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হবে না, হবে নায়কের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও চরিত্র থেকে।' [Hegel, *The Philosophy of Fine Art*, tr Osmaston, London 1920, vol. iv, p. 251]।

মার্ক্‌সীয় নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে এই উলট-পুরাণের কোনো মিল নেই, থাকতে পারে না। হেগেলের দর্শন বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের দর্শন। এর প্রয়োজন ছিল যখন বিপ্লবী বুর্জোয়া ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের আঁধার থেকে ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় দাঁড় করাচ্ছিল। সে ব্যক্তিবাদ পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের যুগে এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। এই ব্যক্তিবাদের মূল কথা হল 'সমাজ বনাম ব্যক্তি'। সমাজকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক শক্তি হিসেবে ধরে নিয়ে হেগেলের গবেষণা—যেন কথাটা স্বতঃসিদ্ধ, যেন মানবজাতির জন্ম থেকেই চলছে এই বিরোধ!

কার্ল মার্ক্‌স্‌ তাঁর '১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে' দেখিয়েছেন এটা অনৈতিহাসিক ও মিথ্যা। মার্ক্‌স্‌-এর মতে :

> মানুষের জীবন প্রকৃতিনির্ভর, প্রকৃতিই মানুষের দেহ, যার সঙ্গে মানুষকে সংযোগ রেখে চলতে হয় বাঁচার জন্য। মানুষের শারীরিক ও আত্মিক (spiritual) জীবন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, একথার অর্থ শুধু এই—প্রকৃতি নিজের সঙ্গে যুক্ত, কারণ মানুষ

প্রকৃতিরই অংশ। মানুষকে (১) প্রকৃতি এবং (২) তার নিজসত্তা থেকে, অর্থাৎ তার কর্মজীবন, তার জীবনপ্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে (পুঁজিবাদী) শ্রমব্যবস্থা মানুষকে তার প্রজাতিসত্তা (species being) থেকেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, মানুষ নামক প্রজাতির জীবনধারাকে একেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনযাপনের উপায়ে পরিণত করে। প্রথমত প্রজাতির জীবন এবং ব্যক্তির জীবনকে আলাদা করে দেয়, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন ও বিমূর্ত জীবনকে প্রজাতি-জীবনের উদ্দেশ্য বলে চালিয়ে দেয়।

[Marx-Engels, *Works*, vol. 3, p. 276]

অর্থাৎ ব্যক্তি বনাম প্রজাতির যে সংঘর্ষ বুর্জোয়া দার্শনিকরা দেখেন সেটা বুর্জোয়া সভ্যতারই সৃষ্টি। যেহেতু মানুষ জীব হিসেবেই প্রকৃতি তথা অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু 'সমাজ বনাম ব্যক্তি' ধারণাটি মিথ্যা। ইতিহাসে ব্যক্তি মানেই সামাজিক ব্যক্তি।

সুতরাং বুর্জোয়া-দর্শনের যেটা ছিল নাট্যরূপ—মহানায়কের আস্ফালন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নানা বিয়োগান্ত ঘটনা সংঘটিত করা—মার্ক্‌স্‌বাদী ব্রেখ্‌ট্‌ তার বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন প্রজাতির প্রতিনিধি, খাটো মাপের সাধারণ মানুষ, নানা ভাবে মাথা খাটিয়ে কোনোমতে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতে যে বাধ্য হচ্ছে (চ্যাপলিনের 'ছোটো মানুষ' যাদের পূর্বসূরী)। ব্রেখ্‌ট্‌ বাস্তববাদী বলেই তাঁর নায়করা নেতিবাচক। বুর্জোয়া সমাজে ইতিবাচক নায়ক একটা নির্জলা মিথ্যা।

কিছু গোঁড়া, যান্ত্রিক 'মার্ক্‌স্‌বাদী', যাঁদের সঙ্গে বারংবার ব্রেখ্‌টের ঘোর তর্কও বেধেছিল, যাঁরা ব্রেখ্‌টের নাটকের বিন্যাস এবং নেতিবাচক নায়কের কাপুরুষোচিত ক্রিয়াকলাপকে বুঝতে পারেন না, তাঁদের আদর্শ এখনো বালজাক ও শেক্‌স্‌পিয়ার। যেহেতু কার্ল মার্ক্‌স্‌ শেক্‌স্‌পিয়ার ও বালজাকের ভক্ত ছিলেন, সুতরাং এই 'পণ্ডিতরা' এখনো শেক্‌স্‌পিয়ার ও বালজাককেই রচনার আদর্শ হিশেবে প্রচার করে থাকেন। মার্ক্‌স্‌বাদ এঁদের কাছে মার্ক্‌সের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চল হয়ে গেছে, স্থাণু হয়ে গেছে। মার্ক্‌স্‌বাদ যে প্রতি মুহূর্তে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, লেনিন-স্তালিন-মাও যে এসেছেন এবং লিখেছেন, সাম্রাজ্যবাদ এসেছে এবং চূর্ণ হচ্ছে, কারখানা-সভ্যতায় যে ইলেকট্রনিক্‌সের আবিষ্কারে মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, হিরোশিমা যে ঘটে গেছে, এসব যেন এই 'পণ্ডিতদের' চেতনাতেই প্রতিফলিত নয়।

সুতরাং ভিশনেভ্‌স্কির নাটকের বীর নাবিকরা, ফ্রিডরিশ ভোল্‌ফ্‌-এর প্রোফেসর মামলকের বীরোচিত আত্মহত্যা এবং গোর্কির পাভেলের বীরোচিত বৈপ্লবিক ক্রিয়া—এসবকে অচল, অটল, শুভ্রবেশধারী, মৃত কতকগুলি মডেলে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—আড়ষ্ট, ছকবাঁধা আধুনিক 'বিপ্লবী' কিছু নাট্যকর্ম হেগেলের নন্দনতত্ত্বের আওতা ছাড়াতে পারেনি। হেগেলই বলেছিলেন : 'নায়কের মৃত্যু দেখানো যেতে পারে, যদি নায়ক যে-সত্যের ধারক সেই সত্য ওই মৃত্যুর ফলে আরো ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়।' মনে পড়ে কলকাতায় আমাদের অনেকের নাটকের ছিল এই চরিত্র—প্রবল বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়ে যোদ্ধার মৃত্যু এবং বিপ্লবের অজেয়তা ঘোষণা।

সেই সঙ্গে মনে পড়ে বহু প্রগতিশীল নাটকের প্রবল বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের মধ্যে মাথা-উঁচু-

রাখা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মহৎ নায়ককে। সেটা দেখতে অতি সুন্দর মনে হলেও, সেটাও বুর্জোয়া হেগেলীয় তত্ত্ব। সকলের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ঘোষণা করে হেগেল বলেছিলেন, সব মানুষের মূল্য এক, দারিদ্র্যের মধ্যেও এই মানবিক মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে নাটক। অহো, মানুষ কী মহান! সে খেতে না পেলেও তার আত্মা থাকে নিষ্কলুষ ও মহান। কাজে কাজেই না হিন্দি চলচ্চিত্রে দেখি চোরের মহত্ত্ব, বাংলা সাহিত্যে উদারহৃদয় বেশ্যাদেব। আর দেখি বঞ্চিত কেরানির উচ্চ ভাব।

সত্যদ্রষ্টা মার্ক্স্‌বাদী ব্রেখ্‌টের পক্ষে এরকম মিথ্যাচার সম্ভব হয়নি। বিমূর্ত মহত্ত্ব, বিশুদ্ধ ভালোবাসা, অপরিবর্তনীয়, মানবিক মূল্য—এসব ব্রেখ্‌ট্‌-এর কাছে অস্তিত্বহীন।

মার্ক্স্‌বাদ মানুষকে অমন স্থিতিশীল ভাবে না। কোনো মানবিক গুণাবলিকে সমাজের ক্লেদের ঊর্ধ্বে মনে করে না। মার্ক্স্‌বাদী ইতিহাসবাদের (মার্ক্স্‌-এর ভাষায় Historismus) পরিপ্রেক্ষিতে দেখে সব কিছুকে। ইতিহাসবাদের সার কথা কী? মান্ডেলবাউমের ভাষায় :

> ইতিহাসবাদ হল পরিবর্তনের ঘটনাটিকে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখা। প্রতি ঘটনার পেছনে সে দেখে শেষ পর্যন্ত একটিই ঘটনা বিরাজ করছে—সেটা হল পরিবর্তন। প্রতি বিশেষ ঘটনা বা বস্তুকে সে পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে, এবং সে প্রক্রিয়াকে সে বস্তুর মধ্যেই নিহিত [immanent] বলে মনে করে।
>
> [Maurice Mandelbaum, *The Problem of Historical Knowledge*. NY 1967, p 88]

সুতবাং মানবিক গুণাবলি কোনো ঈশ্বরদত্ত বর নয়, তারও পরিবর্তন আছে, তার অতীত ও ভবিষ্যৎ আছে, তার ইতিহাস আছে।

প্লেটোর 'আর্কেটাইপ'-তত্ত্বের মূল কথাই ছিল নানা মানবিক গুণাবলির একেকটি আদর্শ মানসপ্রতিমা—ন্যায়বোধ, জ্ঞান, সাহস, সংযম ইত্যাদি। সেই কলুষহীন প্রতিমাগুলো অনড়, গতিহীন। তারা হল মানুষের আদর্শ, মানুষের কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। সেইসব আর্কেটাইপের পাশে বিচার করতে হবে জীবন্ত মানুষের চরিত্র। মার্ক্স্‌বাদ এর বিপরীত। মার্ক্স্‌বাদে পরিবর্তনই চূড়ান্ত। আদর্শ বলে কিছু নেই। আদর্শও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। তাই ব্রেখ্‌ট্‌ বলেন :

> (এলিয়েনেশনের) কৌশল নাট্যশালাকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নামক নূতন সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়। সমাজের গতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করার জন্য এই পদ্ধতি সব সামাজিক ঘটনাকে প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে এবং তার নানা স্ববিরোধকে খুঁজে বার করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যার পরিবর্তন নেই, তার অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ সব কিছু নিজের সঙ্গেই বিরোধে লিপ্ত। মানুষের অনুভূতি, মতামত এবং মনোভাব সম্পর্কেও একই কথা খাটে।
>
> ['শর্ট অর্গানুম.' অনুচ্ছেদ ৪৫]

অর্থাৎ ব্রেখ্‌টের নাট্যরীতি কার্ল মার্ক্সের ইতিহাসবাদের প্রথম এবং বিস্ময়কর প্রয়োগ নাট্যশালায়।

মার্ক্স্‌বাদ মানুষকে দেখে সম্ভাবনাসমষ্টি হিশেবে। মানবসত্তার মধ্যে রয়েছে মহত্ত্ব, ভালোবাসা, ঔদার্য, সাহস, মহান গুণের সম্ভাবনা। মানুষের অস্তিত্ব ও সত্তার মধ্যে রয়েছে বিরোধ। প্রকৃতি থেকে, প্রজাতি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ভয়ংকর অস্তিত্বের ভার চাপিয়ে দিয়েছে পুঁজিবাদ। সুতরাং পীড়িত মানবসত্তা আত্মপ্রকাশে বর্তমানে অক্ষম। এই বিরোধের অবসানের, সত্তা ও অস্তিত্বের মধ্যে সংগতি স্থাপনের একমাত্র পথ বিপ্লব। তবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে **অস্তিত্ব যত দ্রুত বদলায় সত্তা কখনোই তত দ্রুত বদলাতে পারে না।** সুতরাং 'মানবচরিত্র' বলে কিছু আছে, যাকে মার্ক্স্ পরিণত বয়সে শুধু 'প্রজাতি-সত্তা' বলে উল্লেখ করেছেন। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ সফোক্লিসের কাল থেকে ব্রেখ্‌টের কালে বদলেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সফোক্লিসের সমাজ থেকে ব্রেখ্‌টের সমাজ পর্যন্ত যে-পরিবর্তন তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তেমনি হয়তো পিতা-পুত্রের সম্পর্ক, বা প্রেমিক-প্রেমিকার। এসবকে বুর্জোয়া সভ্যতা স্রেফ টাকার সম্পর্কে পরিণত করতে চাইলেও, যেহেতু এগুলি প্রজাতি-সত্তার মূল ক্ষুধার সঙ্গে জড়িত, তাই সে-প্রয়োজন শুধু টাকা দিয়ে মেটে না অনেক সময়েই।

সত্তা ও অস্তিত্বের বিরোধ, এটাই ব্রেখ্‌টের সব নাটকের কাঠামো। কুরাজ কি তাঁর ছেলেমেয়েকে ভালোবাসেন না? তা কি কখনো হয় নাকি? কিন্তু তাঁর সত্তার মধ্যে যে মা লুকিয়ে আছে, যে স্নেহপ্রস্রবণ বইছে, অস্তিত্বের ভয়াবহ চাপে তা শুকিয়ে গেছে। নইলে কুরাজ না খেয়ে মরবেন যে। একটি আদিম ক্ষুধা আরেকটি আদিম ক্ষুধাকে নাকচ করে দিচ্ছে। নানা জৈবিক চাহিদা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে খণ্ডিত মানুষ কুরাজের মধ্যে। তার কারণ অস্তিত্বের বিরোধিতা। এ এমন অস্তিত্ব যে ক্ষুধাতুর মানুষ কুরাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মাতা কুরাজ থেকে। তাই ছেলের প্রাণ বাঁচাবার সময়েও শস্তায় কাজটা সারা যায় কিনা তার প্রয়াস চালান তিনি। গালিলেওর বৈজ্ঞানিক সত্তা মাথা নোয়ায় অন্ধ বধির অস্তিত্বের সামনে। গালি গে-র সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় অস্তিত্বে। একমাত্র গোর্কির 'মা'-এর নাট্যরূপের মা, সিমোন মাশার এবং পারি কমিউনের যোদ্ধারা ব্যতীত ব্রেখ্‌টের কোনো চরিত্রই অস্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে না। যারা পারল তারা শুধুমাত্র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে। মা জড়িয়ে পড়লেন পাভেলদের শ্রমিক-আন্দোলনে, সিমোন নাৎসিদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে নামল, কমিউনিস্টরা গড়ল ব্যারিকেড। এটাই সঠিক বস্তুতান্ত্রিক সমাজবিশ্লেষণ। নেতিবাচক মানুষই এ সমাজের বৃহত্তম সত্য। অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পাবে শুধু বিপ্লবীরা।

মার্ক্সের মতে প্রথমে মানুষের সত্তা, তারপর অস্তিত্ব। মানুষ প্রথমে প্রকৃতির অংশ, মানবজাতির অংশ। অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ প্রকৃতির অংশ বলেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে প্রকৃতির ওপর উৎপাদনী ক্রিয়া দ্বারা নানা বস্তু সৃষ্টি করে। এটা করে বলেই সে মানুষ। মার্ক্সের ভাষায় :

> বহির্জগতের ওপর ক্রিয়ার মধ্যেই মানুষ তার প্রজাতি-সত্তা প্রমাণ করে। এই উৎপাদনই তার সক্রিয় প্রজাতি-জীবন। এই উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকৃতি তার কাছে প্রতিভাত হয় তার নিজের কর্ম এবং বাস্তব হিশেবে। সুতরাং শ্রমের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রজাতি-জীবনের বাস্তবায়ন।
>
> [মার্ক্স্-এংগেল্স্, *Works*. vol. 3 p 277]

বর্তমানে একদল মানুষ সর্বোচ্চ মুনাফার লোভে এই সম্পর্কগুলিকে বিকৃত এবং ছিন্ন করে দিলেও, অন্তর্নিহিত সত্য সত্যই থাকে। শ্রম যেখানে মানুষের নিজেকে পরিপূর্ণ করার চরম আনন্দ হবার কথা, সেখানে সেই শ্রমের ফলেই বর্তমানে মানুষ বিচ্ছিন্ন, একাকী, অসুখী। তবু মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে শ্রমদ্বারা নিজেকে মুক্ত করার, বাস্তবায়িত করার আগ্রহ। তাই প্রথমে সত্তা, পরে অস্তিত্ব। মানুষ মানুষ বলেই বিচ্ছিন্নতা ভেঙে বেরুবে।

পণ্ডিতপ্রবর জন প্লামেনাৎস প্রশ্ন তুলেছিলেন : বিচ্ছিন্নতা যে চূর্ণ হবেই তার প্রমাণ কী? [*German Marxism and Russian Communism*. NY 1965, p 21]। একটু মার্ক্স্ ঘাঁটলেই প্লামেনাৎস উত্তর পেয়ে যেতেন। বিচ্ছিন্নতা যে অনাদি অনন্ত কোনো অভিশাপ নয়, সেটা মার্ক্স্ দেখিয়েছেন তাঁর 'হোলি ফ্যামিলি' গ্রন্থে :

> সম্পত্তির মালিক শ্রেণী এবং সর্বহারা শ্রেণী, দুটিই নিজ সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণী এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শান্তি পায়, শক্তি পায়। সে বিচ্ছিন্নতাকে দেখে নিজের শক্তির প্রকাশ হিসেবে, এবং বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মধ্যে ওই শ্রেণী মানবিক অস্তিত্বের একটা বহিঃসাদৃশ্য খুঁজে পায়। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী বিচ্ছিন্নতায় দেখে শুধু সর্বাত্মক ধ্বংস [annihilation], দেখে নিজের শক্তিহীনতা এবং অমানুষিক অস্তিত্ব। সে অনুভব করে অপমান, লাঞ্ছনার অপমান, ক্রোধ—মানবসত্তা ও অস্তিত্বের দ্বন্দ্বই এই ক্রোধের দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে যায়, কেননা এই অস্তিত্ব হচ্ছে মানবসত্তার সরাসরি দৃঢ় ও সামগ্রিক নেতিকরণ [negation]।
>
> [মার্ক্স্-এংগেল্স্, *Works*. vol. 4, p. 36]

কার্ল মার্ক্স্ এই জনাই সর্বহারার প্রবক্তা। বিপ্লবের অনিবার্যতা এইখানেই যে সর্বহারার মানবসত্তা, প্রজাতি-সত্তা অস্তিত্বের জ্বালাকে অতিক্রম করবেই।

এই তত্ত্বের সরাসরি বিরোধী জ্যঁ-পোল সার্ত্রদের অস্তিত্ববাদ, যার মতে আগে অস্তিত্ব তারপর সত্তা :

> অস্তিত্ব সত্তার পূর্ববর্তী, এ কথার অর্থ কী? অর্থ এই—সর্বপ্রথমে মানুষের অস্তি, মানুষ এসে হাজির হয় (turns up), মঞ্চে প্রবেশ করে, এবং তার পরে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। অস্তিত্ববাদীর মতে মানুষের সংজ্ঞা হয় না, কেননা মানুষ কিছুই নয় (nothing)। পরে সে কিছু হবে, এবং সেটা সে নিজেই করবে। মানবপ্রকৃতি বলে কিছু নেই।
> [Jean Paul Sartre, *Existentialism*. NY 1947, p. 18]

সার্ত্ররা নিজেরাই যে বিচ্ছিন্ন মানুষ এবং তাঁদের 'দর্শন' যে নিজেদের নিঃসঙ্গতার প্রকাশ সেটা এই হতাশাবাদে স্পষ্ট। মানবসত্তা নামে কিছু নেই বললে যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্ন আর উঠবে না, বিপ্লব অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। তখন ধীরে, অতি ধীরে মানুষ নিজের প্রকৃতি গঠন করবে, নিজের মধ্যেই, বোধ হয় মনোবিকলনের সাহায্যে!

মানবসত্তার প্রাথমিকতা স্বীকার করলে তবে প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্কের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়, নচেৎ নয়। মানবসত্তা, কর্মের মধ্যে মানুষের পরিপূর্ণতা অর্জন, এটা স্বীকার না করার অর্থ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতা অস্বীকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রেখ্‌টের প্রকৃতিচেতনা

একান্তভাবে মার্ক্সীয়, যা তাঁর দু-একটি কবিতার উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হবে :

হ্রদের ধারে গাছগুলির নীচে ছোটো কুটির,
ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠছে।
ওটি না থাকলে
কী আনন্দহীন হত
গৃহ, গাছ, হ্রদ।

[Das kleine Haus unter Bäumen am See/Vom Dach steigt Rauch/Fehlte er/ Wie trostlos dann wären/Haus, Bäume und See]

মানুষের কর্মে, মানবজীবনের নিদর্শন ওই চুল্লির ধোঁয়ায় প্রকৃতি সুন্দর। মানুষ প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতির ওপব ক্রিয়ায়ই মানুষ পরিপূর্ণ। মার্ক্সেব ভাষায় : মানুষ প্রাকৃতিক, প্রকৃতি মানবিক।

এ কীরকম সময়
যখন গাছ নিয়ে কথা কওয়া প্রায় অপরাধ,
যেহেতু তার অর্থ দাঁড়ায় বহু বীভৎসা সম্পর্কে নীরবতা!

[Was sind das für Zeiten, wo/Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschliesst]

সমাজেব শোষকদের অত্যাচাবেব তালিকা এত বৃহৎ যে কবি সময় পাচ্ছেন না প্রকৃতি-অবলোকনের। একালে প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে বসলে মানুষের অপরাধ সম্পর্কে অমার্জনীয় নীরবতা অবলম্বন কবতে হয। ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ আব নেই। মানুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হযেছে মানবসৃষ্ট বীভৎসার ফলে।

একটি নদীকে নিয়ন্ত্রিত কবা,
একটি ফলগাছে অন্য গাছের বীজ বপন,
একটি মানুষকে শিক্ষিত করা,
একটি রাষ্ট্রকে পরিবর্তিত করা,
এই হচ্ছে ফলপ্রসূ সমালোচনার উদাহরণ।

[Die Regulierung eines Flusses/Die Veredelung eines Obstbaumes/Die Erziehung eines Menschen/ Der Umbau eines Staates/Das sind Beispiele fruchtbarer Kritik]

মানুষের সত্তার মধ্যে রযেছে প্রকৃতির ওপব ক্রিয়ার আগ্রহ এবং ওই-পথেই মানবজীবনের পূর্ণতা। রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চুরমাব করার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তাব স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবতে পারে। 'চক-সার্ক্‌ল্' নাটকের প্রস্তাবনাদৃশ্যে সোভিয়েত যৌথ খামারের উপস্থাপনা এই কথা বলার জন্যই। তবু একথাও হয়তো অস্বীকার করাব উপায নেই, ব্রেখ্‌টেব নাটকে বিচ্ছিন্ন মানুষের ওপব জোর পড়ে গেছে কিছুটা বেশি, চতুব নেতিবাচক নায়কবাই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশি। বিচ্ছিন্নতাই যে আবার বিপ্লবেব চালিকাশক্তি এটা হযতো থেকে গেছে কতকটা উহ্য, কতকটা ধবে নেওযা। মার্ক্সবাদী গবেষকরা যে অনেক সময়ে ব্রেখ্‌টের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তার কাবণ এইখানে। বাস্তবতাবাদী ব্রেখ্‌ট্ মানুষেব যন্ত্রণাকে

যেভাবে ধরেছেন, তা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনায় তেমন উদ্দীপ্ত হননি, এটাই তো তাঁদের অভিযোগ। রূলে যেমন 'কমিউনের দিনগুলি' নাটককে বলেছেন 'পরাজয়বাদী', এবং 'শুধুই ঘটনা সমষ্টি, ঘটনার নায়কদের বিপ্লবী আবেগ অবহেলিত,' তার কিছু যুক্তি আছে [J Rühle, *Theater und Revolution*, Munich 1963, p.186]। শুমাখেরের মতন স্থিতধী মার্ক্স্‌বাদী পণ্ডিতও সহ্য করতে পারেননি 'গালিলেও' নাটকের সরাসরি বিজ্ঞান বনাম ধর্ম সংঘাতটা। শুমাখের দেখিয়েছেন গালিলেও নিজেই ছিলেন প্রাক্তন জেসুইট পাদ্রি এবং তিনি চেয়েছিলেন গির্জা সত্যবাদী হোক। তাঁর অতি প্রিয় গির্জাই যখন মিথ্যাকে বরণ করল তখন গালিলেওর যে মানসিক যন্ত্রণা, এই ব্যাপারটাকে নাটক থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ব্রেখ্‌ট্‌ যে শুধু নাটকটাকে একপেশে করেছেন তাই নয়, গালিলেওকে নেতিবাচক করার উৎসাহে তিনি ব্যক্তি গালিলেওর অমর্যাদা করেছেন। গালিলেওর ট্র্যাজিডি ছিল এই যে, তাঁর সংঘর্ষ ছিল তাঁর সবচেয়ে শ্রদ্ধার্হ মানুষদেব সঙ্গে, এটাই শুমাখেরের বক্তব্য। [E. Schumacher, *Drama Und Geschichte*, Berlin 1968, p 66]

তবে ব্রেখ্‌টের নেতিবাচক নায়কদের আরেকটি দিক আছে যা একজন মার্ক্স্‌বাদী নাট্যকারের কাছে ছিল প্রত্যাশিত এবং তাঁর ডায়ালেক্‌টিকাল চিন্তার সঙ্গে সুসমঞ্জস। ডায়ালেক্‌টিকাল চিন্তা শুধু বস্তুর চিন্তা নয়, চিন্তারও চিন্তা। দর্শনে যাকে বলে 'থট টু দ্য সেকেন্ড পাওয়ার' বা 'thought[2]।' ব্রেখ্‌ট যখন মানুষ সম্পর্কে চিন্তা করেন, তখন তাঁর নিজেব চিন্তাপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করেন, কোন চিন্তাপদ্ধতি তাঁব বক্তব্য-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক সে সমস্যাও প্রতি মুহূর্তে তাঁর চিন্তায় বিবাজমান। নায়ক তার বিপ্লবী আবেগ প্রকাশ করলেই যে দর্শক মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞান বুঝবে এমন তো নয়। নাটকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপ্লবের প্রস্তুতি, দর্শকের বৈপ্লবিক চেতনা সৃষ্টি। মার্ক্স্‌বাদ নানা তত্ত্বের মধ্যে একটি তত্ত্বমাত্র নয়। ইতিহাস-তত্ত্ব হিসেবে মার্ক্স্‌বাদ হচ্ছে নানা ইতিহাস-গবেষণার অন্তিম চিন্তা। চিন্তাবিদকে নিজ চিন্তা সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখিয়ে, সব চিন্তাকে চিন্তার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে, মার্ক্স্‌বাদ একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। সেই মার্ক্স্‌বাদী চিন্তায় দর্শককে অভ্যস্ত করে তুলতে ব্রেখ্‌ট্‌ যে-কাঠামোর আশ্রয় নিয়েছেন তা নিজেই নির্মমভাবে বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক। ব্রেখ্‌ট্‌-এর এলিয়েনেশন-পদ্ধতি গোড়াতেই ধরে নেয় না যে মানুষ মহান। সে শুরু করে উলটো থেকে, নেতি থেকে। যেটা মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব সেটা ব্রেখ্‌টের আরম্ভবিন্দু। এইবার মানুষের পরিবর্তনের কাহিনী বিশ্লেষণ করে করে এগুবার সময়ে নায়ককেও যে এগুতে হবে এমন তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দর্শককে পরিবর্তিত করা হচ্ছে ব্রেখ্‌টের উদ্দেশ্য। অন্যথায় ব্রেখ্‌ট্‌ মনে করতেন স্তোকবাক্য দেওয়া হবে দর্শককে। রঙিন ভবিষ্যতের ইউটোপিয়া সৃষ্টি একটা বুর্জোয়া অভ্যাস, বর্তমানকে চেনার পরিবর্তে ভুলবার উপায়। তেমনি ঐতিহাসিক নাটকে অতীতের জয়গান করলে ফ্যাশিস্ত অতীতমুখীনতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এখানে স্মর্তব্য ভাল্টের বেন্‌জামিনের তত্ত্ব। অতীতের কোনো প্রাচুর্যের স্মৃতিচারণ করলে বর্তমান অস্তিত্বের যন্ত্রণা আরো স্পষ্টই হয়, সুতরাং অতীতমুখীনতাও বিপ্লবী হতে পারে [Gershom Scholem, *Über Walter Benjamin*, Frankfurt 1968,p.162]

কিন্তু ব্রেখটের কাঠামোয় এর স্থান নেই। মার্কস্‌বাদী চিন্তায় যদি দর্শককে অভ্যস্ত করতে হয়, তবে ব্রেখ্‌ট্‌ মনে করতেন নেতিকে বৃহৎ, স্পষ্ট এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য করে উপস্থিত করতে হবে, অ্যানটিথিসিসকে নিয়ে আসতে হবে দর্শকের চেতনায়। ইতি বা থিসিসের প্রভাবে নাট্যশালা ইতিমধ্যেই আচ্ছন্ন। মানুষ কত মহান সে-গান গেয়েছেন সবাই, সফোক্লিস থেকে ইবসেন সবাই। এখন প্রয়োজন অস্তিত্বের বন্দী মানুষেব নীচতা, ক্রূরতা ও স্বার্থপরতাকে প্রবল শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার।

নিজ চিন্তাকে চিন্তার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ব্রেখ্‌ট্‌। নাটকের ইতিহাসের ডায়ালেক্‌টিক্‌সে ব্রেখ্‌ট্‌ নিজেই অ্যানটিথিসিস। অতীতের সব নাটকের ইতির বিরুদ্ধে ব্রেখ্‌ট্‌ নেতি। ফলে পুরো নাট্যচিন্তা সিনথেসিসের দিকে অগ্রসর হল।

মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তাব কোনো ধার যিনি ধারেননি, সেই টি এস. এলিয়টও লিখেছেন :

> মানুষের বর্তমান [সাহিত্যেব] সৃষ্টিগুলি পবস্পবেব সঙ্গে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিকারের নূতন সৃষ্টি এই শৃঙ্খলাতে পরিবর্তন ঘটায়। বর্তমান শৃঙ্খলা থাকে সম্পূর্ণ যতক্ষণ না নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। এই নূতনত্বের অনাহূত প্রবেশের পরে, পুরো সাহিত্যেব সৌধটা যত সামান্যই হোক, বদলাতে বাধ্য। তখন প্রতিটি শিল্পকর্মের সম্পর্ক, অনুপাত ও মূল্যের পরিবর্তন ঘটে, সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে।
>
> [T S Eliot, *Selected Essays*, London 1949, p.5]

ব্রেখ্‌টের নাটকও বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মসন্তুষ্ট শৃঙ্খলায় এমনি এক ব্যাঘাত, এক অনাহূত প্রবেশ, যার ফলে সব নাটকেরই পুনর্মূল্যায়ন ঘটতে বাধ্য। নেতিবাচক নায়ক এই প্রবেশের বর্শাগ্র। প্রকৃত যেটা নূতন সেটা পুরো সৃষ্টিজগতের অ্যানটিথিসিস হিসেবে প্রবেশ করে সৃষ্টিসৌধে এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। তা থেকে পুরো সৃষ্টিজগৎ উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরিত হয়। নাট্যমাস্তানদের উল্লম্ফনের এ-ক্ষমতা থাকে না কারণ তারা ওই সৌধকে অস্বীকার করে 'পরীক্ষা' শুরু করে (Art is shit!)। অথবা অন্যের চিন্তা চুরি করে জীবন কাটায়।

অর্থাৎ ব্রেখ্‌টের নাটক শুধু মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে নাটক নয়, নাটক সম্পর্কেও নাটক, পূর্ববর্তী সব নাটক সম্পর্কে মন্তব্য। সচেতনভাবে নাট্য সম্পর্কেই একটি দৃষ্টিভঙ্গি। অতীতের সব মহা ঐতিহ্যের একটি মূল্যায়ন, সমালোচনা, শ্লেষ। মহানায়কদের বীরোচিত ক্রিয়াকলাপকে উপহাস করছে ব্রেখ্‌টের একেকজন ক্ষুদ্রাকৃতি সুবিধাবাদী। সেইজন্য য়োহানা স্পষ্টতই জোন অফ আর্কের সঙ্গে যুক্ত। সেইজন্যই আর্টুরো উই তৃতীয় রিচার্ডের মতন দুঃস্বপ্ন দেখে এবং নিহত ডলফুসের পত্নীর হৃদয় জয় করে। মার্ক্‌সের ভাষায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, প্রথমবার ছিল ট্র্যাজিডির রূপে, এবার প্রহসনের চেহারায়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে ব্যঙ্গ করছে আজকের চোরভোগ্যা পৃথিবী, হ্যামলেটকে ক্রাগলের, ডেসডেমোনাকে শেন-তে, লিয়ারকে কুরাজ। ব্রেখ্‌টের নাটক এক চ্যাপলিনীয় উচ্চহাস্য। নাটক নিয়ে এ-পর্যন্ত কী স্বেচ্ছাচার হয়েছে তার তীক্ষ্ণতম সমালোচনা যেমন চ্যাপলিনের ভবঘুরে তেমনি ব্রেখ্‌টের নেতিবাচক নায়করা।

ব্রেখ্‌ট্‌ বলতেন, হেগেলের লেখা বুঝতে হলে চাই হাসবার ক্ষমতা, হাস্যরসবোধ। এবং নিজের বিকল্প ব্যক্তিত্ব হিশেবে সৃষ্টি করেছিলেন এক আজব চরিত্র যার নাম 'শ্রী কেউ না' [Herr

Keuner, Keiner কথাকে ব্রেখ্‌টের দেশ সোয়াবিয়ায় উচ্চারণ করে কয়নার], যার মুখ দিয়ে হাসির গল্প ফেঁদে ব্রেখ্‌ট্ পুঁজিবাদী সমাজের বহু অসংগতি এবং উদ্ভটতা মেলে ধরেছেন লোকচক্ষুর সামনে। তেমনি ব্রেখ্‌টের নাট্যসম্ভারকেও এক অর্থে কয়নারের উদ্ভট রসিকতা বলে ধরা যায়। এ-নাটক আগের কাহিনী-উপকাহিনীর জটিল গতিকে কেটেছিঁড়ে বাইবেলীয় উপকথায় পরিণত করেছে; আগেকার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার পরিবর্তে ইচ্ছে করে নাট্যপ্রবাহকে বারবার ব্যাহত করেছে, আগেকার মহাবীর নায়কের সিংহাসনে বসিয়েছে চোর-জোচ্চোর-মাতালদের! ব্রেখ্‌টের নাটক নাটকের সম্ভাবনা সম্পর্কেও নাটক। এই প্রথম নাটক নিজের সম্পর্কে সচেতন হল, নাটকের আত্মচেতনার আবেক নাম ব্রেখ্‌ট্।

ব্রেখ্‌টের রচনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে অতঃপর সফোক্লিস-শেক্‌স্‌পিয়ার-শ-ইবসেন-চেকভরা পর্যন্ত নাট্যজগতে তাঁদেব অবস্থানের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে বাধ্য হচ্ছেন, সব ক্ল্যাসিক্‌কে আবার নূতন করে সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কারণ ব্রেখ্‌ট্ নূতন মাপকাঠি অকস্মাৎ গুঁজে দিয়েছেন বিশ্বনাট্য-সমাজের হাতে।

বিপত্তি অবশ্যই ঘটেছে বারবার। দর্শক পুরাতন অভ্যাসে এমনই আচ্ছন্ন যে ব্রেখ্‌টের নেতিবাচক নায়কদের হিরো ভাববার চেষ্টা করেছে এবং বারবার হোঁচট খেয়েছে উপলব্ধির চৌকাঠে। গালিলেও যে নাটকের খলনায়ক এটা বোঝাতে ব্রেখ্‌ট্‌কে উপর্যুপরি নাটক সংশোধন করতে হয়েছে। নাট্যকার ফ্রীডরিশ ভোল্‌ফেব মতন বোদ্ধা মানুষও ব্রেখ্‌ট্‌কে প্রশ্ন করেছিলেন : তিন সন্তান হারিয়েও কুবাজের কোনো পবিবর্তন হয় না কেন? সে শেষকালে যুদ্ধকে অভিশাপ দেয় না কেন? ব্রেখ্‌ট্ বললেন ·

> আপনি ঠিকই ধরেছেন, আলোচ্য নাটকটা দেখাচ্ছে যে কুরাজ তার বিপর্যয় থেকে কিছুই শেখেনি। কিন্তু সে না শিখলেও, দর্শক তো শিখবে তাকে দেখে।
>
> [*Theaterarbeit*, Dresden 1952, p 253]

হাস্যকর উদাহরণও কম দেওযা যায় না। এক মার্কিন সমালোচকের বিলাপ · আর্টুরো উই-এর মতন খচ্চর লোককে ভালোবাসব কী করে? কলকাতার এক অধ্যাপক পরিচালকের মন্তব্য : ব্রেখ্‌ট্ও শৌখিন হতাশাবাদী, কাবণ তিনি বলেছেন, এ-জগৎ ঈশ্বরের বিষ্ঠা। কথাটা আসলে নেতিবাচক, বদমাইশ, ভোগবাদী বাল-এব। নেতিবাচক নায়কের কথাকে ব্রেখ্‌টের নিজস্ব মত ভাবা, বা উই-কে ভালোবাসতে চাওয়া—এসব অবশ্য ব্রেখ্‌ট্-আলোচনার সীমা-বহির্ভূত, কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষেব মুখ থেকে এসব বেরুতে পারে না।

'হের কয়নাবের' একটি গল্প ব্রেখ্‌টীয় দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। কয়নারের বাড়িউলিব মেয়ে একদিন কয়নাবকে প্রশ্ন করল : আচ্ছা, হাঙররা যদি মানুষ হত তবে কি তারা ছোটো ছোটো মাছদের প্রতি ভালো ব্যবহার করত? কয়নার অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'অবশ্য। হাঙবেবা তাহলে ছোটো মাছদেব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি দেবে কারণ দুঃখী মাছের চেয়ে সুখী মাছের স্বাদ অনেক ভালো। মাছেদের ইস্কুলে তখন ভূগোল পড়ানো হবে যাতে মাছেরা জানতে পারে হাঙর কোথায় থাকে, এবং ভবিষ্যতে তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে হাঙরের খাদ্য হতে পারে। ইস্কুলে নীতিকথাও পড়ানো হবে, যাতে মাছেবা বোঝে আত্মত্যাগের সৌন্দর্য ও মহিমা, বোঝে আদেশ-পালনই ধর্ম এবং হাঙরদের মাছ-খাওয়া অভিযানটা একটা

পবিত্র কর্তব্য। মাছেদের শিল্প তখন দেখাবে হাঙরের দাঁতের সৌন্দর্য এবং মাছেদের থিয়েটারে তখন বীরত্বের এমন সব রোমাঞ্চকর নাটক উপস্থিত হবে যে মাছেরা স্বর্গীয় আনন্দে হাঙরের মুখে ঢুকে যাবে। ধর্ম তখন শেখাবে মাছেদের প্রকৃত সুখ হাঙরের পেটে। হাঙরেরা অবশ্যই সমাজে খানিক উঁচু-নীচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করবে, কিছু কিছু ছোটো মাছকে তারা শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দেবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, হাঙরেরা মানুষ হলেই সমুদ্রের নীচে সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা হবে।'

কয়নারের এই ব্যাজস্তুতি ব্রেখ্‌টের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। নিন্দার স্থলে স্তুতি, স্তুতির আড়ালে নিন্দা—এই ডায়ালেক্‌টিকাল দৃষ্টিতে ব্রেখ্‌ট্‌ সমাজ ও মানুষকে দেখেছেন তাঁর পুরো নাট্যকর্মেও। বুর্জোয়া সভ্যতা ও কৃষ্টির স্বরূপ-উদ্ঘাটনে এক ধরনের সূক্ষ্ম হাস্যরসে জারিত উলটো-কথার ব্যবহারে ব্রেখ্‌ট্‌ নাট্যের ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, গ্যোয়টে-শিলারদের গুরুগম্ভীর দার্শনিকতাকে।

৪

ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাট্যরীতির আরেকটি বিশেষ অঙ্গ—গেস্টুস। যে কোনো চরিত্রসৃষ্টির জন্য ব্রেখ্‌ট্‌ মনে করতেন পার্টটাকে বহু অংশে বিভক্ত করে নিতে হবে চরিত্রটির নানা মনোভাব অনুযায়ী। এইখানে গালিলেও অন্যের আবিষ্কার চুরি করে দূরবিন বানিয়ে রাষ্ট্রকে ঠকাচ্ছেন—এইখানে গালিলেও শিশু আন্দ্রেয়াকে বিজ্ঞানের রহস্য বোঝাচ্ছেন—এইখানে গালিলেও তাঁর খাদ্যলোলুপতা প্রকাশ করছেন—এইখানে নিজকন্যার সুখে বাধ সাধছেন—ইত্যাদি। শুধু অভিনেতারই এটা কর্তব্য নয়, নাটকটা লেখাও সেই গঠনে। এবং অভিনেতা যখন এই নানা গেস্টুস-খণ্ডকে একত্র জুড়বেন তখন এক মনোভাব থেকে আরেক মনোভাবে যাওয়ার সময়ে বাস্তব-জীবনকে অনুকরণ করে দর্শকের অগোচরে পিছলে যাবেন না (যেটা ছিল স্তানিস্‌লাভ্‌স্কির পদ্ধতি)। বরং তিনি দর্শককে স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন, চরিত্রের মানসের একটা চেহারা দেখলেন, এবার দেখুন আরেকটি। দুয়ের মাঝখানে গিঁটটা যেন দেখা যায় স্পষ্ট। তাহলে দর্শক বিচার করতে পারবেন সদ্যদেখা বৈশিষ্ট্যটা। এখানে কুবাজ যুদ্ধব্যবসায়ী—এখানে তিনি মাতা—এভাবে কুবাজের চরিত্রের দুই বিপরীত দিককে আলাদাভাবে চিনলে তবে দুটির ডায়ালেক্‌টিকাল দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হবে দর্শকের চেতনায়। এভাবে তাঁরা চিনবেন মানুষকে, তার আবেগকে, তার পরিবর্তনকে। নতুবা এতকাল যাঁরা মঞ্চ অধিকার করে রেখেছিলেন সেই হ্যামলেট-দন কার্লোস-ফাউস্টের মতন দর্শককে আবেগে ভাসিয়ে বোকা বানানো হবে। মানবচরিত্র যে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, তাকে চেনার কোনো উপায়ই নেই—এই কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

ব্রেখ্‌ট্‌ থিয়েটারকে এমন এক ল্যাবোরেটরিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন যেখানে সমাজ ও মানুষকে ব্যবচ্ছেদ করতে শিখবে দর্শকরা, রহস্যের আলোআঁধারে ঘেরা অজ্ঞেয় মানুষে মার্ক্‌স্‌বাদ বিশ্বাস করে না, এরকমই ব্রেখ্‌টের বিশ্বাস।

গেওর্গ লুকাচ ঠিক এই বিষয়েই প্রবল আক্রমণে চমকে দিয়েছিলেন ব্রেখ্‌ট্‌কে। ১৯৩৮ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত জর্মন পত্রিকা 'ডাস ভোর্ট'-এ লুকাচ এক্‌স্‌প্রেশনিস্টদের আক্রমণ

করেন বালজাক-তলস্তয়দের সঙ্গে তুলনা করে। তাঁর মতে বালজাকদের কোনো সামগ্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন নেই। তাঁরা যেখানে ইতিহাস-সম্পর্কে, শ্রেণী-সম্পর্কে মারাত্মক পশ্চাৎপদ চিন্তার পরিচয় রেখেছেন সেটাও লুকাচের কাছে আপত্তিকর ঠেকেনি কারণ সেগুলো একটা বিশাল সামাজিক আলোড়নের প্রতিফলন মাত্র। লুকাচ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন বালজাক-গ্যোয়টে-তলস্তয়র বাস্তবতা-বোধকে, এক-একটা আস্ত সমাজের উত্থান-পতনের শৈল্পিক চিত্রায়ণকে। তাদের পাশে আধুনিক জর্মন এক্স্প্রেশনিস্টদের পরীক্ষামূলক সৃষ্টিগুলো লুকাচের কাছে নেহাতই বালখিল্য চাপল্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। এদের ক্ষেত্রে 'বাস্তবতাবোধের' মাপকাঠি লুকাচ প্রয়োগ করলেন না, বরং ফ্যাশিবিরোধী সংগ্রামে এঁদের কাছে রাজনৈতিক স্পষ্টতা দাবি করলেন—কারণ আজকের সমাজের যে ভাঙা-গড়া সেখানে আর ব্যাপক বাস্তবতা, ইতি-নেতির সহাবস্থান, তলস্তয়-এর আন্দ্রে ও পিয়েরের বিপরীত চিন্তাধারা, এসবের স্থান নেই। এখন শিল্পীদের যুদ্ধের সাজে সাজতে হবে। তিনি এক্স্প্রেশনিস্টদের সরাসরি ট্রট্স্কিবাদী ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোশালিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপাত্র আখ্যা দিলেন।

এদিকে ব্রেখ্টের শিল্পীজীবন শুরু হয়েছিল এক্স্প্রেশনিজ্ম্-এর জঠরে। কর্নফেল্ট্, ভেরফেল, পিসকাটরদের প্রভাবে ব্রেখ্টের নাট্যজীবনের বিকাশ। সুতরাং লুকাচের এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ—যার পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের চিন্তাবিদদের অনুমোদন ছিল—শেষমেষ যে ব্রেখ্টের প্রতিও আক্রমণ, এটা সকলেই বুঝলেন। ব্রেখ্ট্ লিখলেন :

> লুকাচের মতে তাহলে এখন প্রধান শত্রু ফ্যাশিবাদ নয়, বুর্জোয়া অবক্ষয়। তিনি শুধু সাহিত্য এবং কতিপয় আদর্শ সাহিত্যিক দৃষ্টান্তে বাঁধা পড়ে গেছেন। কিন্তু সাহিত্যের দৃষ্টান্ত খুঁজতে হবে বাস্তব জীবনে, নন্দনতত্ত্বের মধ্যে নয়, এমনকী বাস্তবতার নন্দনতত্ত্বেও নয়। সত্যকে গোপন করার এবং সত্যকে প্রকাশ করার বহু পন্থা আছে। আমরা আমাদের নন্দনতত্ত্ব এবং নীতিবোধ, দুটোই আহরণ করি সংগ্রামের নানা প্রয়োজন থেকে। [Klaus Volker, *Brecht*. tr. Nowell. London 1979. p.257]

'সত্যকে প্রকাশ করার অনেক পন্থা আছে'—ব্রেখ্টের এই কথার যৌক্তিকতা সকলেই মানবেন। তবে সে পন্থা কতটা মার্ক্স্বাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। লুকাচ যে ফ্যাশিবাদের মুখোমুখি হবার জন্য শিল্পীদের কাছে স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা ও বলিষ্ঠতা দাবি করেছিলেন, সেটারও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে আসন্ন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে হিটলারের খুনিদের আস্ফালনের গণ্ডগোলে মস্কোর চিন্তাধারায় হয়তো কিছুটা সংকীর্ণতা কিছুটা আড়ষ্টতা এসে পড়েছিল। কোন্টা বুর্জোয়া অবক্ষয় আর কোন্টা বিপ্লবী ফর্ম-অন্বেষণ, এই পার্থক্য কখনো কখনো লুকাচদের চোখের আড়াল হয়ে যেত। ফলে ক্ষতি হয়েছে অনেক। মায়ারহোল্ডের নাট্যপরীক্ষাকে হয়তো সেই কোলাহলময় জগতে আমরা বুঝতে পারিনি, বা সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনি মায়াকভ্স্কির কবিতার। পরে লুকাচও স্বীকার করেছিলেন, তাঁর ব্রেখ্ট্ মূল্যায়ন ছিল অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ।

তবে লুকাচের মূল সূত্রটা যে সাহিত্যবিচারে অকাট্য এ-বিষয়ে সন্দেহ কী? উনিশ শতকের সাহিত্য আর বিশ শতকের সাহিত্যের একই মাপকাঠি হতে পারে না, কারণ এ শতকে বিপ্লবের

সর্বব্যাপকতা শিল্পীর কাছে নূতন দাবি নিয়ে উপস্থিত। বঙ্কিম-সাহিত্যের বিচারে, ববীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে, এমনকী তারাশঙ্কর-বনফুলদের সৃষ্টির পর্যালোচনায় আমাদের সাম্প্রতিক বারংবার মহাপ্রমাদে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে লুকাচের বইগুলো আমাদের 'মার্ক্‌স্‌বাদী' 'পণ্ডিতরা' ছুঁয়েও দেখেন না।

মস্কোর চিন্তাবিদরা ব্রেখ্‌ট্‌কে সে-সময়ে একাধিকবার 'স্কিম্যাটিক' ভাবধারার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মতে ওই গেস্টুসের পদ্ধতিটা মানুষকে গিনিপিগে পরিণত করে তাকে কাটাছেঁড়া করে, তারপর ছক-বাঁধা এককেটি খণ্ডিত মানুষকে একেক দৃশ্যে উপস্থিত করে। তাঁদেব মতে এটা অবাস্তব, বাস্তবতাবিরোধী, জীবন্ত মানুষের ভুল চিত্র। মানুষকে ওভাবে বিশ্লেষণ করলে, তাঁদের মতে, সত্যিকাবের আবেগময়, স্নেহ-ভালোবাসা জড়িত, অবচেতনের ভারে পীড়িত, রহস্যময মানুষের লাঞ্ছনা হয। সেটা মার্ক্‌স্‌বাদবিরোধী।

তাহলে মূল প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই—মানুষ বা সমাজেব বিশ্লেষণে আমরা কোনো একটি অংশকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে আলাদা করে যদি তাব বিচার কবি, সেটা মার্ক্‌স্‌বাদের পদ্ধতিতে বৈধ হয় কিনা। ইয়োরোপীয় দর্শনে এই বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করার নাম অ্যাবস্ট্র্যাকশন। অ্যাবস্ট্র্যাকশনের পদ্ধতি মার্ক্‌স্‌বাদ-সম্মত কিনা সেটাই প্রশ্ন। লুকাচদের ধারণায় অ্যাবস্ট্রাকশনের অর্থ সামগ্রিককে বিস্মৃত হওয়া, একেক দৃশ্যে গেস্টুসকে ধরার অর্থ হচ্ছে সমগ্র ও অখণ্ড মানুষটাকে ভুলে যাওয়া।

কিন্তু আমাদেব বিনীত ধারণায় লুকাচদের কথাগুলো হেগেলের, মার্ক্‌স্‌-এর নয়। হেগেলের পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করে গবেষণার পথ রুদ্ধ। হেগেলের মতে, কোনো এক অংশে মনোনিবেশ করলে উপলব্ধি (Verstand) জন্মায় বটে, কিন্তু জ্ঞান (Vernunft) জন্মাতে পারে না। সমগ্রকে একত্রে অনুধাবন না করলে প্রতি অংশ যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে অন্য সব অংশের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ধাবিত, এ-সত্যই অপ্রকাশিত থেকে যাবে। [J N. Findlay. *Hegel, a Re-examination*. NY 1958 অথবা Duncan Forbes. *Lectures on the Philosophy of World History*. Cambridge 1975 দেখুন]

কার্ল মার্ক্‌স্‌ এ-পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেননি, কারণ এর মূলে রয়েছে হেগেলের ঈশ্বর-বিশ্বাস। প্রকৃতির সব অংশ এক পরমব্রহ্মে মিলিত হবার জন্য ধাবিত, এক প্রশ্নোর্ধ্ব Geist-এ বিলীন হবার জন্য গতিশীল, এই ভাববাদী চিন্তাই হেগেলকে অ্যাবস্ট্র্যাকশনেব বিবোধী কবে তুলেছে। মার্ক্‌স্‌ বলেন :

> অর্থনৈতিক বিন্যাসগুলির বিশ্লেষণে তো আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা রাসায়নিক বিকারক (re-agent) ব্যবহার করা যায় না। তাই দুটিরই বিকল্প হচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাকশনেব শক্তি। [Karl Marx, *Capital*. Chicago 1906. Part I, p 12]

অর্থাৎ মার্ক্‌স্‌-এর পদ্ধতিতে অ্যাবস্ট্র্যাকশনকে ব্যবহাব কবা হয় যেভাবে বৈজ্ঞানিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। সমাজের এক অংশকে কেটে এনে তাকে আতস কাচের নীচে বৃহৎ করে তোলা, অন্যান্য অংশকে সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে ওই অংশেব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, মার্ক্‌স্‌-এর চোখে একটি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। একটি শর্ত আছে মার্ক্‌স্‌-এর। খণ্ডিত অংশটিকে বিচারের পর সেটিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমগ্রের মধ্যে।

নতুবা যা একটি পদ্ধতিমাত্র, সেটিকেই সমগ্র সত্য বলে ভুল করবেন বৈজ্ঞানিক। মার্ক্‌স্-এর একটি উদাহরণ অতি প্রাঞ্জল :

> অবশ্য খাওয়া, পান করা, যৌনসংগম ইত্যাদি প্রকৃতই মানবিক ক্রিয়া। কিন্তু যদি এগুলোকে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, মানুষের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের জগৎ থেকে আলাদা করে দেখি, এগুলো যদি বিশ্লেষণের একক এবং চরম লক্ষ্য বলে মনে করি, তবে তো এগুলো পশুমাত্রেরই ক্রিয়াকর্ম। [Marx-Engels. *Works*. vol.3. p 275]

আবার বুর্জোয়া অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে মার্ক্‌স্ দেখালেন কীভাবে বুর্জোয়া পণ্ডিতরা অর্থনীতির একেকটি অংশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে এমন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন যাতে মানবসমাজের প্রতিটি ঘটনাকে মনে হত আকস্মিক, পরস্পর সংযোগরহিত, 'ইতিহাসের পাগলামি' মাত্র [ঐ, পৃ ২৭২]।

তাহলে মার্ক্‌স্-এর পদ্ধতিতে অ্যাবস্ট্র্যাকশন মোটেই বর্জনীয় নয়, যদি সমগ্রের মধ্যে আবার খণ্ডিত অংশটাকে সংযোজিত করে দেওয়া হয়। 'কাপিটাল' গ্রন্থটাই আগাগোড়া এই পদ্ধতির চমকপ্রদ উদাহরণ। শ্রমশক্তি, শ্রমমূল্য, বিনিময়-মূল্য, অতিরিক্ত মূল্য প্রভৃতিকে আলাদা আলাদা করে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ছিন্নভিন্ন করে পুনরায় তাদের পুঁজিবাদের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন মার্ক্‌স্।

তাহলে লুকাচরা ব্রেখ্‌টের বিশ্লেষণপদ্ধতির বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলেছিলেন সেটা ছিল অমার্ক্সীয়। তাঁদের প্রশ্নটা রাখা উচিত ছিল এইভাবে—ব্রেখ্‌ট্ যে মানুষ ও সমাজকে টুকরো টুকরো করে দেখেছেন তাতে মোটেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, টুকরোগুলো আবার সামগ্রিকে ঐক্যবদ্ধ হল কিনা, জগতের ব্যাপক চেহারাটা শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখে উদিত হল কিনা।

ব্রেখ্‌ট্-এর যে আস্ত মানুষ সে-মানুষকে তৎকালীন ইয়োরোপের অলিগলিতে খুঁজে বেড়িয়েছেন লুকাচরা, এবং খুঁজে পাননি বলেই এত অভিযোগ। তাঁরা বাস্তব ডক-এ খুঁজে পাননি গালি গে-কে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জর্মনিতে খুঁজেছেন কুরাজের প্রতিরূপকে, হয়তো বা চীনে খুঁজেছেন শেন-তেকে বা ভৌগোলিক ককেশিয় উপত্যকায় গ্রুশের সন্ধান করেছেন। বাস্তব জীবন থেকেই নাটকের চরিত্ররা সৃষ্ট হয় এই সত্য হয়তো লুকাচদের চিন্তায় অতি সরল, সুতরাং বিভ্রান্তিকর এক আত্মবঞ্চনায় পরিণত হয়েছিল। তার কারণও সহজেই অনুমেয়। বালজাক-তলস্তয়-এর উপন্যাসের জগতে সত্যিই অসাধারণ সব চরিত্রের মিছিল আমরা দেখেছি যারা আমাদের অতি-পরিচিত, যেখানে বুর্জোয়া বুর্জোয়াই, শ্রমিক শ্রমিকই। যেখানে জমিদারনন্দন তার উদ্দামতা ও সুরাশক্তি সমেত আমাদের চেতনায় আঘাত হানে তলস্তয়-এর 'যুদ্ধ ও শান্তি' গ্রন্থে। এই অভ্যাসের বশে লুকাচরা ব্রেখ্‌টের চরিত্রদের অখণ্ডতার বিশেষ চেহারাটা দেখতে পাননি। অভ্যস্ত চিন্তার প্রচলিত ও পুরাতন ঢঙে তাঁরা বিচার করতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ নূতনকে। নূতনকে শুধু নয়, আমরা বলব বিপরীতকে। আগেই বলেছি বিশ্বসাহিত্যের বিরাট ইতির বিরুদ্ধে ব্রেখ্‌ট্ হচ্ছেন নেতি।

মার্ক্‌বাদী দার্শনিক এর্নস্ট্ ব্লখ্ ব্রেখ্‌ট্‌কে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পাদপ্রদীপের লেনিনবাদী'। ব্লখের অত্যাধুনিক মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তার সঙ্গে ব্রেখ্‌টের চিন্তার প্রচুর মিল রয়েছে। ব্লখের মতে, বর্তমান বলে

কিছু থাকতে পারে না, কেননা 'এই মুহূর্ত' বলে কিছু নেই। সময় চলমান, সুতরাং একেকটি মুহূর্তকে কেউ কখনো চিনতে পারে না। কবি মালার্মে বহু পূর্বেই বলেছিলেন, 'বর্তমানের কোনো অস্তিত্বই নেই' (Il n'ya pas de present, non, le present n'existe pas)। ব্লখ মার্ক্স্-এর দর্শনকে সমাজজীবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখলেন যাকে আমরা কথ্য ভাষায় বলি 'এখন' সেটা একটা মায়ামাত্র, কারণ 'এখন' বলার পূর্বেই সেই ক্ষণটি অতীত হয়ে গেছে। জীবন অর্থ যদি হয় বর্তমানকে ভোগ করা তবে কেউ এখনো বাঁচেই নি। ব্লখ্ বলছেন:

> যা আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরে সেটা নয়, যা আমাদের সবচেয়ে কাছে (অর্থাৎ 'এই মুহূর্ত') সেটাই সবচেয়ে অন্ধকার রয়ে গেছে। কারণ বাঁচা মানে এই মুহূর্তে বাঁচা, শুধু অতীত জীবন নয়, শুধু ভবিষ্যৎ নয়, শুধুই স্মৃতি বা আশা নয়। বাঁচার অর্থ আজকের দিনটিকে মুষ্টিতে ধরা স্থূলভাবে (konkretisch) 'এখনকে' ধরা।
>
> কিন্তু যেহেতু এই নিকটতম, সবচেয়ে সত্য 'এইক্ষণে' উপস্থিত-থাকাটাই অসম্ভব, সুতরাং এই অর্থে কোনো মানুষ এখনো বাঁচেই নি। [Ernst Bloch, *Das Prinzip Hoffnung*, Frankfurt 1959, seite 341]।

নিয়তপরিবর্তনশীল জগতের মার্ক্সীয় তত্ত্বের সঙ্গে ব্লখের এই আবিষ্কার অবশ্যই সংগতিপূর্ণ। বর্তমানটাই সবচেয়ে আঁধারে ঘেরা বলে ব্রেখ্‌টের দূরত্বস্থাপনের কৌশল। চলমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো মুহূর্তকে স্থাণু হিসেবে ধরা যায় তবে সেটাই হয় বিকৃতি। এই বিচারে বিশ্বের সমস্ত অতীত সাহিত্য কোনো এক সমাজ বা কোনো কালকে চিত্রিত করতে গিয়ে অলীক 'বর্তমানের' মোহ সৃষ্টি করেছে মাত্র।

ব্রেখ্‌ট্-এর চরিত্ররা স্থাণু কালবিন্দুকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে বলেই লুকাচদের বিভ্রান্তি। তাঁরা যে দেশ ও কালের প্রতিরূপ খুঁজেছেন ব্রেখ্‌টের নাটকে, সে-অনুসন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেই সাবেক অর্থে ব্রেখ্‌ট্ বাস্তববাদী নন। তাঁর নাটকের জগৎ অস্তিত্বহীন কোনো 'এখনকে' ধরার চেষ্টাই করেনি। তিনি 'এখন' থেকে দূরে সরে গেছেন। দর্শককে 'এই মুহূর্ত' নামক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর এলিয়েনেশন রীতি। তথাকথিত 'বর্তমান' থেকে দূরে সরে না এলে ব্লখ্-বর্ণিত অন্ধকারেই থাকতে হবে। সেইজন্যই বর্তমানকে অতীত হিসেবে দেখার চেষ্টা এবং অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আরেক নাম এপিক, মহাকাব্য। 'এই মুহূর্তে'র যদি অস্তিত্বই না থাকে তবে মানুষ ও সমাজকে চিনবার কোনো উপায়ই থাকে না যদি না আমরা 'মুহূর্ত' থেকে মুক্ত হই। পরিবর্তনই যদি জগতের পরম সত্য হয়, তাহলে মানুষ ও সমাজকে বিশ্লেষণ করার একমাত্র পথ হচ্ছে কল্পনাশক্তির প্রয়োগে চারিপাশের জগৎকে অপরিচিত করে দেওয়া, দূরে ঠেলে দেয়া। যেহেতু সময় স্থিতিশীল নয় তাই ব্রেখ্‌টের কাছে রূপকথা, উপকথা, এপিক, প্যারাব্‌ল্, মহাকাব্য, এরাই সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। কারণ এরা বাস্তবতার ভান করে না। অলীক 'বর্তমানের' দিক না মাড়িয়ে এরা সোজাসুজি কালোর্ধ্ব এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে মানুষ ও সমাজকে বোঝার চেষ্টা করে। অর্জুনের প্রতিরূপ সমাজে কেউ খুঁজে পাবে না, পাবে না কৃষ্ণ নামক দেবতার মানবদেহে বিচরণের কোনো বাস্তব নজির। কিন্তু পাবে না বলেই এরা স্পষ্ট, সহজ, সোচ্চার এবং মানবমনের সত্য উদ্ঘাটন।

লুকাচরা পুরাতন অভ্যাসবশে ব্রেখ্‌টের নাটকে খুঁজছেন আমাদের চলতি পৃথিবীর প্রতিবিম্ব

যা নানা গেস্টুসে-বিভক্ত চরিত্রদের সমগ্রতা দেবে, পরিচিত সমাজে ফিরিয়ে দেবে। সেটা তাঁরা খুঁজে পেতে পারেন না। কারণ ব্রেখ্‌টের নাটকগুলির স্থান ও কাল এ-দুনিয়ার নয়। এক অর্থে তাঁব প্রায় সবগুলি নাটকই রূপকথা। তাঁর 'মান ইস্ট মান' নাটকেব ভারতবর্ষ ইতিহাসের ভারতবর্ষ নয়। তাঁব 'ককেশীয় খড়ির গণ্ডি'র জর্জিয়াকে ইতিহাসের কোনো জর্জিয়ার সঙ্গে মেলানো যাবে না। তাঁব মাদাব কাবেজ যে-ইয়োরোপে ঘুরে বেড়ায সেরকম ইযোবোপ ইতিহাসেব চৌহদ্দিতে পড়ে না। তাঁব 'ডী রুন্ড্‌কপ্‌ফে উন্ড্‌ ডী শ্‌পিট্‌স্‌কপ্‌ফে' সোচ্চারভাবে রূপক। এমনকী 'সেচুয়ান' নাটকের যে চীন তাকেও বিশেষ কোনো কালের চীন বলে ধবলে অরসিকতার পরিচয দেওয়া হবে। হিটলারকে পর্যন্ত ব্রেখ্‌ট্‌ মঞ্চে আনেন নতুন রূপকথার মোড়কে, মার্কিন চলচ্চিত্রেব যুগেব রূপকথাব আঙ্গিকে, শিকাগোর দস্যুদের সংঘর্ষেব বোমাঞ্চকব গাথাব ছদ্মবেশে—কাবণ গ্যাংস্টাবই পুঁজিবাদী দুনিয়াব নূতন রূপকথাব নায়ক। সে-শিকাগো অবশ্যই মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রের ভৌগোলিক শিকাগো নয। 'ইম ডিকিশ্‌ট্‌ ডেব স্টেটে'ব শিকাগোও নয় বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট শিকাগো শহব। ব্রেখ্‌টেব এই কাল্পনিক জগৎ সেই অর্থে বাস্তব যে-অর্থে মহাভাবত বাস্তব। এই জগৎ আমাদেবই জগৎ, কিন্তু আমাদের কালের পরিবেশ থেকে অপসৃত, দূবে স্থাপিত, এলিয়েনেটেড। আমাদেব অলীক বর্তমানকে ব্রেখ্‌ট্‌ অতীতেব চেহারা দিয়েছেন, চলমানকে স্থিতিব রূপ দিযেছেন, হারিযে যাওয়া 'মুহূর্তগুলিকে' শাশ্বতেব ভঙ্গি দিয়েছেন। নইলে না মানুষ না সমাজ, কোনোটারই বিশ্লেষণ সম্ভব নয, এটাই ব্রেখ্‌টেব [এবং ব্লখেব] মত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেক্‌স্‌পিযারেব নাটকেব জগৎ এই অর্থে কালেব গণ্ডিব বাইরে। দশম শতাব্দীর স্কটল্যান্ডকে 'ম্যাকবেথেব' পটভূমিকা ভাবা, বা কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কালেব ডেনমার্ককে হ্যামলেটের লীলাক্ষেত্র কল্পনা কবা বিষম মূঢ়তা। শেক্‌স্‌পিযার প্রখব বাস্তববাদী, কিন্তু সেটা কোনো বিশেষ যুগকে স্বীকার করে নয়, ববং মানুষ নামক প্রচণ্ড প্রাণীব আবেগকে দেশকাল-নিবপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখাব মধ্যেই শেক্‌স্‌পিযাবেব বাস্তবতাবোধ। 'মেসিংকাউফ কথোপকথন' গ্রন্থে ব্রেখ্‌ট্‌ দেখিযেছেন, কীভাবে শেক্‌স্‌পিযারের নিজেব যুগে তাঁব নাট্য প্রযোজনা ছিল মূলত এলিযেনেশন ভিত্তিক। সে-যুগের দর্শক এমপ্যাথিতে ভেসে যেতেই পাবত না, নায়কেব সঙ্গে একাত্ম হতে পাবত না, অসংখ্য বাধাব ফলে। দিনেব আলোয় অভিনয় হত, মঞ্চসজ্জা ছিল না, মেয়েদের পার্টগুলো করত ছেলেরা। উপবন্তু গুরুগম্ভীব পঞ্চপদী অমিত্রাক্ষব ছন্দের ব্যবহার এক ধাক্কায নাটককে নিয়ে যেত দৈনন্দিন থেকে অনেক দূবে। তাব ওপর ছিল স্বগতোক্তি, চরিত্রদের আত্মবিশ্লেষণ, যা ঘটনাপ্রবাহকে রুদ্ধ করে দর্শকের বিচাব-বিশ্লেষণকে আহ্বান জানাত। এ-ছাড়াও ছিল বহু নাটকীয় কৌশল যা তথাকথিত বাস্তবতাকে ভেঙে চুরমার করে দিত—যেমন 'তৃতীয রিচার্ড' নাটকে একই সঙ্গে রিচার্ড এবং রিচমন্ডের তাঁবু মঞ্চে উপস্থিত করা, 'ষষ্ঠ হেনবি' নাটকে 'পাহাড়ের' ওপর রাজাকে উপস্থিত বেখে নীচে একদিক থেকে এক পিতাব প্রবেশ যে নিজপুত্রকে যুদ্ধে হত্যা করেছে এবং অপর দিক থেকে এক পুত্রেব প্রবেশ যে নিজ পিতাকে হত্যা করেছে—গৃহযুদ্ধের স্বরূপ বোঝাবার জন্য বোধ করি এমন নিপুণ, এমন 'অবাস্তব', এমন সংক্ষিপ্ত প্রতীকি ব্যঞ্জনা আজ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে দেখা যায়নি।

এদিক থেকে ব্রেখ্‌টই শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রকৃত উত্তরসূরী। দুজনই বাস্তবকে আঁকবার জন্য বাস্তবোর্ধ্ব এক কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছেন, বাস্তবকে বুঝবার জনাই বাস্তব থেকে কয়েক কদম পিছু হঠে গিয়ে তাকে অবলোকন করেছেন।

তবে কালের গতিতে শেক্‌স্‌পিয়ারের পৃথিবী এবং ব্রেখ্‌টের পৃথিবীর মধ্যে এসে গেছে বিরাট তফাৎ। হেগেল দেখিয়েছিলেন প্রাচীন পৃথিবীতে মানুষ যত বস্তু ব্যবহার করত প্রত্যেকটিতে সে নিজেকে খুঁজে পেত, সেগুলো যে মানুষেরই হাতে সৃষ্টি এই চেতনা থেকে সে বস্তুগুলির 'মানবিকতা' অনুভব করত। তার তাঁবু, তার তরবারি, তার খাদ্য. তার নৌকো, এসবে সে একাত্ম হত [Hegel. *Aesthetik* Frankfurt 1955. II p 414]। শেক্‌স্‌পিয়ারের যুগেও উৎপাদন ছিল যথেষ্ট প্রত্যক্ষ, বস্তু ছিল স্পষ্টতই মানুষের হাতে তৈরি। হ্যামলেটের তরবারি, বা ডেসডেমোনার রুমাল, বা রোমিওর মুখোশ, এরা প্রায় জীবন্ত চরিত্র, নাটকে এদের অংশগ্রহণ সাবলীল ও বলিষ্ঠ। কিন্তু ব্রেখ্‌টের কালে কারখানা-সভ্যতার জটিল উৎপাদনী ব্যবস্থায় বস্তুর মানবিক দিকটা গেছে হারিয়ে। যেসব যন্ত্র মানুষ নিত্য ব্যবহার করছে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয় না। বস্তুর মানবিক দিকটা বুঝতে না পারার ফলেই আধুনিক সাহিত্যে প্রতীকের ব্যাপক প্রবেশ। যার সঙ্গে মানবিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তাকে রহস্যময় মনে হয়। টেলিভিশন, টেলিফোন, পিস্তল, মোটরগাড়ি, এগুলোকে স্বাধীন এককেটি শক্তি বলে মনে হয়। এই 'ব্যাখ্যাতীত', 'অজ্ঞাত' বস্তুগুলিকে কাজেই প্রতীক হিসেবে নিয়ে আসেন লেখকরা। বস্তু থেকে বিযোজিত মানুষ বস্তুকে দুর্জ্ঞেয় সব শক্তি ও তাৎপর্যের বাহক বলে মনে করে। ইওনেস্কোর প্রজননশীল কফির পেয়ালা ও জীবন্ত আসবাব, সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক', সুকান্তর 'সিগারেট' প্রভৃতি মনে আসে এই প্রসঙ্গে। অথবা বের্গমানের 'সাইলেন্‌স্‌' ছবিতে ট্যাংককে যৌন তাৎপর্য প্রদান। প্রতীকবাদ শিল্পীর বিচ্ছিন্নতারই প্রকাশ।

গেওর্গ লুকাচ দেখিয়েছেন প্রাচীন লোকগাথা ছিল এককেটি মানবগোষ্ঠীর সমবেত ইচ্ছার প্রকাশ। কিন্তু আজকের উপন্যাস বা নাটক একজন শিল্পীর সৃষ্টি, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। আবার তিনি যদি তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাপকতর তাৎপর্য দেওয়ার চেষ্টা করেন, সমষ্টির চেতনা প্রকাশের বাহন করার প্রয়াস পান, তবে সেটা বিমূর্ত শিল্প হতে বাধ্য। সেটা জোর করে ঘটানো, কেননা আজ শিল্পসৃষ্টির মূল শর্তই হচ্ছে সেটা এক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। সুতরাং প্রাচীন লোকগাথার যে সহজাত সমষ্টিগত সত্য ছিল তা চিরতরে হারিয়ে গেছে। [Georg Lukacs. *Theorie des Romans*. Neuwied 1962 দেখুন।]

কারখানা-উৎপাদনের যুগে নাটক বা উপন্যাস লিখতে গেলে আরো সমস্যা এসে হাজির হয়—চরিত্র-বিশ্লেষণ, চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা। বেহুলা-লখীন্দরের চরিত্র অঙ্কনের কোনো দায়িত্ব ছিল না প্রাচীন লোককবিদের। কর্ণের চরিত্র কী, এ প্রশ্ন অবাস্তব। কর্ণ কোন পর্বে কী করেছেন সেটাই ছিল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু বঙ্কিমকে ভাবতে হয়েছিল গোবিন্দলালের চরিত্র নিয়ে। সেই সঙ্গে ভাবতে হয় সে-চরিত্র কেন এবং কী করে গঠিত হল, কেন সে এপথে গেল, ও-পথে নয়, কেন সে ভ্রমরের প্রতি বিরূপ, রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট, কেনই বা সে পিস্তলের গুলিতে সমস্যার ইতি ঘটায়, কেন নিয়তিকে নত মস্তকে সে মেনে নেয় না। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উৎস বোঝাতে গিয়ে লেখককে কল্পনা করতে হয় নানা পরিবেশ, পারিবারিক

দ্বন্দ্ব (শরৎচন্দ্র), অতীত পাপের স্মৃতি ('কালিন্দী'), রাজনৈতিক সংঘর্ষ ('রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ') ইত্যাদি। কখনো বা দুর্বলতর লেখকের হাতে এই কল্পিত পরিবেশ নায়কের চরিত্র গঠনের পক্ষে যথেষ্ট হয় না। তখন নায়কের কার্যকলাপ আকস্মিক পাগলামির রূপ নেয় ('বিবব')। লুকাচের একটি কথা সাম্প্রতিককালে ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হচ্ছে : 'উপন্যাস হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সমাজের এপিক।' বস্তু, অন্য মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ আর গোষ্ঠীগত চেতনা প্রকাশ কবতে পারে না, যেটা ছিল এপিকের বৈশিষ্ট্য। তাই সে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপন্যাস রচনা করে।

বের্টোল্‌ট্ ব্রেখ্‌ট্ সুতরাং দুরূহ কর্তব্যপালনে ব্রতী। তিনি সর্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার যুগে এপিক সৃষ্টির প্রয়াসে বত। এপিক সৃষ্টির প্রাক্‌শর্তই ছিল পুবো এককেটি মানবগোষ্ঠীর চিন্তার ঐক্য, যখন দৈনন্দিন জীবন ছিল অর্থপূর্ণ, ব্যবহার্য সব বস্তু ছিল নিকট ও পরিচিত। ব্রেখ্‌ট্ খণ্ডিত সমাজে এসে আর পুরো মানবগোষ্ঠীব প্রতিনিধিত্ব কবতে পারেন না, কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অন্তত বিপ্লবী শ্রেণীব ঐক্যবদ্ধ চেতনার প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে তাঁর সবব দাবি। এবং বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ চেতনাব আরেক নাম মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ। সারা পৃথিবীর সর্বহারা৷ চিন্তা একই খাতে বইছে মার্ক্‌স্‌বাদের স্রোতে , মার্ক্‌স্‌বাদ হচ্ছে বিশ্বমানবেব বৃহৎ অংশেব ঐক্যবদ্ধ চেতনা। সুতরাং এপিক এখনো সম্ভব, এটাই ব্রেখ্‌টেব ঘোষণা, সর্বহারাব এপিক সম্ভব, লুকাচ যাই বলুন না কেন।

সুতরাং ব্রেখ্‌টের চরিত্ররাও তথাকথিত 'যৌক্তিকতাব' ঊর্ধ্বে স্থাপিত। কেন কুবাজ তাঁর পুত্রকন্যাব প্রাণ নিযে পর্যন্ত ছিনিমিনি খেলেন, বা কেন পিয়ারপন্ট মলার নৈতিকতা ও ধর্মকে নিযে লোফালুফি কবেন, তাব পারিবারিক বা অবচেতন-গত কোনো কারণ দর্শাতে ব্রেখ্‌ট্ বাধ্য নন। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মতন তিনি পারিবাবিক পটভূমিকা এঁকে মানুষের ক্রিয়াকর্মের যুক্তি খোঁজেন না। সেটা এপিকের ধর্ম নয়। অর্জুন কেন বীব তা বোঝাতে কুন্তী-পাণ্ডুব দাম্পত্য জীবনের বেশ টানাব প্রয়োজন হয় না। জ্যাঁ-পোল সার্ত্র যেমন তাঁর 'আলটোনাব দণ্ডিত বন্দী' নাটকে নাৎসি ফ্রান্ট্‌স্-এর পাশবিক চবিত্রের উৎস খুঁজতে পিতার দোর্দণ্ড শাসন পর্যন্ত টেনে এনেছেন, ফ্রয়েডীয় যুক্তি দাঁড করিযেছেন নাৎসি অত্যাচারের, সেবকমটা এপিকে চলে না। ব্রেখ্‌টের চরিত্রদেব প্রধানত একটিই যুক্তি, যে-যুক্তি মার্ক্‌স্‌বাদেব মূল কথা—অর্থনৈতিক সম্পর্ক। কুরাজ এবং মলাব একই তাড়নায় চালিত—মুনাফা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে শেন-তের সম্পর্ক একান্তভাবে অথকরী, স্বার্থগত। পুন্টিলা যতক্ষণ মাতাল না হচ্ছেন, ততক্ষণ ভৃত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একান্তভাবে অর্থকরী। গালি গে সত্তাবিলোপে পর্যন্ত রাজি নিজস্বার্থে। সব সম্পর্ককে পুঁজিবাদ টাকার সম্পর্কে রূপান্তরিত করেছে, মার্ক্‌সবাদের এই অমোঘ সূত্রই হচ্ছে ব্রেখ্‌টেব সব চরিত্রদের চালিকাশক্তি। মানবসত্তা মুদ্রাশাসিত অস্তিত্বের চাপে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে, আজকের এপিকে সেটাই ব্যাখ্যাত হবে, এই হচ্ছে ব্রেখ্‌টের কথা।

এখন নূতন প্রশ্ন ওঠে—এটা সত্য কিনা। উৎপাদনী সম্পর্কই হচ্ছে ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে এককেটা বিশেষ কালের বিশেষ সমাজব্যবস্থার চিন্তাসৌধ, এই বেসিস ও সুপাবস্ট্রাকচারের তত্ত্ব মার্ক্‌স্‌বাদেব এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু শুধু অঙ্গই, সেটাই পুরো মার্ক্‌স্‌বাদ নয়। এংগেল্‌স্ বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন অতিসরলীকরণের বিরুদ্ধে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্ট্‌স্

মেহ্‌রিংকে লেখা পত্রে এংগেল্‌স্‌ বলেছেন :

> এই প্রসঙ্গেই মনে আসে পণ্ডিতদেব বুদ্ধিহীন সিদ্ধান্ত—যেহেতু আমরা কোনো মতাদর্শকে স্বাধীন বলে মনে করি না, সুতরাং আমরা যেন বলতে চাই ইতিহাসের ওপর চিন্তাব কোনো প্রভাবও পড়ে না! এটা ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌-বিরোধী চিন্তা। যেন কারণ ও ফলাফল দুটি বিরোধী মেরুতে অবস্থিত, তাদের যেন পবস্পরের ওপর প্রতিক্রিয়া নেই।

উৎপাদনী সম্পর্ক হচ্ছে ভিত্তি, কিন্তু চিন্তাসৌধের প্রভাবও পড়ে ভিত্তির ওপর, এটাই মার্ক্‌স্‌বাদ। বিকল্পটা যান্ত্রিক বস্তুবাদ। অথবা অর্থনৈতিক অদৃষ্টবাদ (economic determinism) যাব সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদের কোনো মিলই নেই। ট্রট্‌স্কির চিন্তা ছিল যান্ত্রিক ; তিনি এক কথায় অন্য সব প্রভাবকে নাকচ কবে লিখেছিলেন :

> সাবা ইতিহাসে মানবমন খুঁড়িয়ে চলে (limps) বাস্তবেব পেছনে। আর বাস্তব মানে অর্থনীতি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব। [Trotsky, *Literature and Revolution*, Michigan 1960,p 18]

আব যে স্তালিনকে সংশোধনবাদীবা বারবার 'যান্ত্রিক' বস্তুবাদের ব্যাখ্যাকাব বলেছে সেই স্তালিনই লিখেছিলেন :

> ভাষা (যেটা চিন্তাসৌধের এক বিশেষ অংশ) কোনো এক বিশেষ অর্থনৈতিক ভিত্তিব সৃষ্টি নয়, সে-ভিত্তি নতুন হোক বা পুরাতন। ভাষা সমাজের সমগ্র ইতিহাসেব ক্রমবিবর্তনের ফল, বহু শতাব্দীব বহু ভিত্তিব ফল। [Stalin, *Marxism in Linguistics* NY 1972, p 81]

ভাষাকে দৃষ্টান্ত ধরে স্তালিন মার্ক্‌সীয় বস্তুবাদেব মূল কথাটি এখানে উত্থাপন কবেছেন। চিন্তাসৌধেব বিশেষ অঙ্গ ভাষা কোনো একটি অর্থনৈতিক ভিত্তিব ওপর নির্ভবশীল নয়। নইলে প্রতি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা পালটে যেত। সুতবাং সমগ্র চিন্তাসৌধকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তিব ফল ভাবাটা অমার্ক্‌সীয।

তা ছাড়াও আজ বিজ্ঞানেব দিকে তাকিযে বোঝা যায় ট্রটস্কিব কথার অসারতা। আইনস্টাইন বা ফের্মিব গাণিতিক চিন্তা বাস্তবের পেছনে খুঁড়িযে চলছিল, একথা কোনো নির্বোধও বলবে না। অন্যপক্ষে বিজ্ঞানকে আজ চিন্তাসৌধেব অংশ বলব, না উৎপাদনী শক্তি হিসেবে গণ্য কবব? নাকি দুই-ই? আধুনিক মার্ক্‌স্‌বাদী তাত্ত্বিকবা একে বলেন মাল্‌টিপ্‌ল্‌ কাউন্টিং [দ্র Melvin Rader, *Marx's Interpretation of History*, NY 1979 p 30]। এঁবা দেখাচ্ছেন, মার্ক্‌স্‌ কখনোই 'এটা চিন্তাব অংশ, এটা উৎপাদনশক্তিব,' এভাবে লেবেল মাবতেন না। একই বস্তুর দ্বিবিধ প্রকৃতি থাকতে পারে। সে মানুষেব চিন্তাপ্রসূত হতে পাবে, একই সঙ্গে সে বাস্তব এক উৎপাদনী শক্তি হতে পারে। বিপ্লবেব চিন্তাই তো প্রবল বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয যখন জনগণ সে চিন্তাকে নিজেব করে নেয়।

অর্থনৈতিক ভিত্তিই যদি সর্বময় নিযন্ত্রক হত, তবে অর্থনৈতিক অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে চিন্তারও অনুরূপ অগ্রগতি ঘটত। কিন্তু তা হয় না অনেক সমযেই। পশ্চাৎপদ চীনেব বাজনৈতিক চেতনা অতি অগ্রসব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব চেতনার চেয়ে এগিয়ে গেছে কযেক যুগ।

অর্থনৈতিক সম্পর্কই যদি একমাত্র ও চরম নিযামক হয় তাহলে আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে শেক্‌স্‌পিয়ারের চেয়ে বড়ো নাট্যকার, রাফায়েলের চেয়ে বড়ো চিত্রশিল্পী, বেঠোফেনের চেয়ে বড়ো সংগীতকার সুলভ হওয়া উচিত ছিল। তা হয় না। আরো অনেক নিযামক শক্তি রয়েছে যেগুলোর উৎসও অবশ্যই অর্থনীতি, কিন্তু তারা মানবমনকে, সমাজকে, অর্থনীতিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে ইতিহাসের পূর্বপরিকল্পিত সব ছক ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। নইলে পশ্চাৎপদ রুশিযায কেন প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয, অগ্রসর জর্মনিতে নয? মার্ক্‌স্‌বাদী মহাপণ্ডিত লুই আলথুসের দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক শক্তি ছাড়াও আরো কত শক্তি সমাবিষ্ট হয়েছিল রুশ বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য, যাকে তিনি বলেন 'ওভারডিটার্মিনেশন' একপেশে কোনো তত্ত্বে লেনিনের সাফল্যের পরিমাপই হবে না। [Louis Althusser, *For Marx* tr Brewster, London 1979, p 89 f]

সেক্ষেত্রে মানুষ সম্পর্কে জটিল মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তা জটিলতর রূপ ধারণ করে। কোনো অতিসরলীকরণে মার্ক্‌স্‌বাদ বিশ্বাস করে না। এই প্রবন্ধে আমরা কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করেছি প্রকৃতির অংশ হিসেবে মানুষ, সামাজিক মানুষ, মানবসত্তা (অর্থাৎ প্রজাতিসত্তা), মানবের অস্তিত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌ কী ভেবেছিলেন। মানুষ সম্পর্কে মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সারাংশ বোধ করি দিয়ে গেছেন ইটালিয়ান কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশি

> মানুষে-মানুষ সম্পর্কগুলি সরল নয। কতকগুলি স্বেচ্ছাকৃত, কতকগুলি আবার ইচ্ছার অতীত। উপরন্তু মানুষ যেই এই সম্পর্কগুলি সম্পর্কে সচেতন হয, সেই চেতনা তখুনি সম্পর্কগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বে যেটাকে মনে হত অতি প্রয়োজনীয় সম্পর্ক, এখন সেটার চেহারা এবং গুরুত্ব বদলাতে শুরু করে। এই অর্থে চিনতে পারাটাই শক্তি। কিন্তু সমস্যাটা জটিল হয অন্য কারণে। একটি বিশেষ কালে বিশেষ ছকে বাঁধা সমগ্র মানব সম্পর্কগুলিকে জানলেই চলে না। আমাদের জানতে হবে এই সম্পর্কগুলির জন্মকথা, কী তাগিদে এগুলো সৃষ্ট হয়েছিল, কেননা প্রতিটি ব্যক্তি শুধু বর্তমান সম্পর্কগুলোর সমন্বযই নয়, সে **একই সঙ্গে এইসব সম্পর্কের ইতিহাসও, সে সব অতীত ইতিহাসের সারাংশ।**
> [Antonio Gramsci, 'What is Man?' in *The Modern Prince and Other Writings*, NY 1978, p 78]

প্রতিটি মানুষ মানবসমাজের ইতিহাস। সেইজন্যই মার্ক্‌স্‌বাদী পণ্ডিতরা পুরো ইতিহাসের প্রভাবকে, নানা চিন্তা ও ঐতিহ্যের প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে মানুষের বিশ্লেষণে বসেন। মাক্‌স্‌ ভেবার এবং আর. এইচ টনি ধর্মের প্রচণ্ড প্রভাব আলোচনা করেছেন, রুডল্‌ফ্‌ ষ্টামলার বিচার করেছেন আইনের পরম্পরা, জর্জ সোরেল প্রাচীন লোকগাথা এবং 'মিথ'-এর গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

সেক্ষেত্রে ব্রেখ্‌টের বিরুদ্ধে হয়তো অতিসরলীকরণের অভিযোগ উঠতে পারে। যাকে তর্কশাস্ত্রে বলে রিডাক্‌টিভিজম (সব কিছুকেই একই কারণের ফলে পরিণত করা) সেই অপবাদ হয়তো লুকাচরা দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা 'স্কিম্যাটিক', 'যান্ত্রিক' প্রভৃতি বিশেষণের ওদিকে আর পা বাড়াননি। কেন? কারণ নাটক দর্শনের প্রবন্ধ নয়। প্রতি ব্যক্তি যদি সমাজের ইতিহাস হয়, তবে আজ পর্যন্ত থিয়েটারে সে-ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। (কাছাকাছি এসেছিলেন হয়তো শেক্‌স্‌পিয়ার, যাঁর 'রাজা লিয়ারে' আমরা দেখি আস্ত ফিউদাল সমাজের যাবতীয় মূল্যবোধ

এবং সম্পর্কের প্রতিফলন—বাজা-প্রজা, পিতা-পুত্রী, রাজ্যচ্যুত দরিদ্র উন্মাদ লিয়াব এবং অন্যান্য উঞ্ছবৃত্ত মানুষ।) শুধু থিয়েটাব কেন, সাহিত্যেব কোনো কোণায় কেউ খুঁজে পাবেন না অখণ্ড, সম্পূর্ণ কোনো মানুষ, যে কিনা মানবজাতির ইতিহাস—তলস্তয়ও পারেননি, পারেননি ডিকেন্‌স্। ব্রেখ্‌ট্ সে ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কবে বিচাব কবেছেন—অর্থনৈতিক সম্পর্ক ('কুরাজ'), ধর্মের প্রভাব ('গালিলেও'), বিপ্লবী নৈতিকতা ('মাসনামে'), অপত্য স্নেহ ('ককেশিয় খড়িব গণ্ডি') ইত্যাদি। সব একত্রে সমাবিষ্ট কবে একটি বিরাট অখণ্ড মানুষ তিনি তৈরি কবেননি, কাবণ কবা যায না। উপায় যখন নেই তখন নানা গেস্টুসে মানুষকে বিভক্ত করে তাকে অধ্যযন করাই ভালো। জ্যঁ-পোল সার্ত্রব 'লুসিফাব এবং ঈশ্বব' নাটকেব গ্যোট্‌স্-এর মতন মেকি অখণ্ড মানুষ সৃষ্টি করে, মানবমনের তথাকথিত রহস্য সৃষ্টি কবে, ব্রেখ্‌ট্ দর্শককে ধোঁকা দেননি।

তবে মুশকিল থেকে যায 'এপিক থিয়েটাব' নাম গ্রহণে। প্রাচীন এপিকেব চবিত্ররা তো সত্যিই ছিল একেকটি ইতিহাস। তখন মানবগোষ্ঠীব সবল জীবনধারায কৃষ্ণ আস্ত এক ধর্মেব ইতিহাস, কুরুক্ষেত্রে বিহ্বল অর্জুন তো প্রকৃতই সব মানবিক সম্পর্কেব এক পুনরাবৃত্তি, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধটাই তো সব যুদ্ধেব একক রূপ। আজকেব জটিল, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন জীবনে সেবকম বিশালত্ব আব সম্ভব নয়, লুকাচেব এ তত্ত্ব অবশ্য সত্য। ব্রেখটের গেস্টুস-পদ্ধতি তাবই স্বীকাবোক্তি। আউগুস্তো বোযাল বোধ কবি ঠিকই বলেছিলেন। এপিক থিযেটাব নামটা ভুল।

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে চিবদিন এপিক-নাযক বলতে মানুষ যা বুঝেছে ব্রেখ্‌ট্ তাব উলটোটা তুলে ধবলেন সদর্পে। অর্জুন-কর্ণদেব বীরপদভাবে কম্পিত পৃথিবী ব্রেখ্‌টের সন্দেহেব বস্তু! বীবেব দবকাব হয় শুধু হতভাগ্য দেশে। কুবাজ এবং গালিলেও দুজনেই একথা বলেন। ব্রেখ্‌টেব নাযকবা সমাজজীবনে বামন। এপিকেব কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি কবে ব্রেখ্‌ট্ সেখানে ছেড়ে দিয়েছেন একদল পদাহত ক্ষুদ্র স্বার্থপব জীবকে যারা মাথা খাটিয়ে কোনোমতে লোক ঠকিয়ে বেঁচে থাকাকেই মহা বীরত্ব মনে করে। ব্রেখ্‌ট্-এর এপিক প্রাচীন এপিকেব প্রতি এক নির্মম পবিহাসও বটে। তাঁর নাটক এপিকেব ধর্ম পালন কবে এবং একই সঙ্গে দেখিয়ে দেয় এযুগে এপিক হাস্যকব।

সর্বশেযে ব্রেখ্‌টেব একটি কবিতা উদ্ধৃত কবে ব্রেখ্‌টেব অর্ধ-ট্র্যাজিক অর্ধ-পরিহাসময়, একাধারে ইতি এবং নেতিমূলক নান্দনিক দৃষ্টির উদাহবণ দেব ·

আমার দেওযালে ঝুলছে একটি কাঠেব জাপানি মুখোশ,
এক অতি বদ দৈত্যের মুখ, সোনালি রঙে উজ্জ্বল।
দবদ নিযে আমি দেখি
কপালেব শিরা কেমন ফুলে উঠেছে, বুঝি
বদ হওযা কী কষ্টকর।

ব্রেখ্‌টেব নেতিবাচক খাটো-মাপের নায়কবাও এই রকম পরিহাস। খুব কষ্ট করে তাদের বদমাইশি করতে হয়, কেননা ভালো হওয়াই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি।

শেক্‌স্‌পিয়ার ও ব্রেখ্‌ট্‌
১৯৮৮

[একটি উগ্র পরীক্ষাবাদী দল নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাদের মূক নাটক অভিনয় করছিল। তাদের দাড়িওয়ালা যুবকনেতা ওঁ ধ্বনিতে মঞ্চ মুখর করছিল। অন্যান্যরাও গোঙাচ্ছিল এবং দেহের নানা কসরতে হাঁপিয়ে উঠছিল। চুরুট হাতে ব্রেখ্‌ট্ প্রবেশ করে হতভম্ব হয়ে দেখছিলেন। যুবকনেতা অভিনয় থামিয়ে এগিয়ে আসেন।]

যুবক ১। গুটেন আবেন্ড, হের ব্রেখ্‌ট্। কতক্ষণ?

ব্রেখ্‌ট্। এই তো। আমি পথ ভুল করে এসে পড়েছি, কিছু মনে করবেন না। আমি একটা থিয়েটারে যাচ্ছিলাম, এখানে এসে পড়ে আপনাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম।

যুবক ১। না, না, এটাই থিয়েটার।

ব্রেখ্‌ট্। ও! আমি ভাবলাম কুস্তির আখড়া।

যুবক ১। কুস্তি! না, না, আমরা নাটক করছি।

ব্রেখ্‌ট্। এটা—এটা নাটক?

যুবক ১। এটা সর্বাধুনিক নাট্যপরীক্ষা। আমেরিকায় জুলিয়ান বেক ও জুডিথ মালিনা প্রবর্তিত নাট্যধারা—লিভিং থিয়েটার। এটাই আধুনিক থিয়েটার।

ব্রেখ্‌ট্। আপনারা কেউ প্রকৃতিস্থ নন মনে হচ্ছে। চোখগুলো অমন জ্বলছে কেন?

যুবক ১। আমরা সবাই ড্রাগ খেয়েছি, নানাবিধ ট্যাবলেট। আমাদের গুরু জুলিয়ান বেক বলেছেন ড্রাগ না খেয়ে নাটক করা যায় না। ড্রাগ খেলে মনের প্রকৃত মুক্তি ঘটে। বুর্জোয়া সমাজের কোনো বিধিনিষেধই তখন মানতে হয় না। ড্রাগের প্রভাবে আমরা কখনো কখনো মঞ্চে মল ও মূত্র ত্যাগ করে ফেলি।

ব্রেখ্‌ট্। ইশ্, দুর্গন্ধ তো প্রচুর হয় তা হলে!

যুবক ২। আমরা রমণও করি, সরাসরি। এর পরের দৃশ্যে আমরা সব কাপড় জামা খুলে ফেলে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব, মঞ্চে প্রেমের স্তূপ সৃষ্টি করব। তাকে আমরা বলি লাভ পাইল।

ব্রেখ্‌ট্। একেবারে উলঙ্গ হয়ে?

যুবক ২। নিশ্চয়ই আপনি চমকে গেলেন তো? দর্শককে চমকে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

ব্রেখ্‌ট্। শুধু চমকে দিলে সেটা শিল্প হয় কি? আর্ট হয় কি?

যুবক ২। আর্টের শাসন আমরা মানি না। আমাদের গুরু জুলিয়ান বেক বলেন—Art is bourgeois Art is shit! শিল্প হচ্ছে বুর্জোয়ার ভূষণ, শিল্প হচ্ছে বিষ্ঠা!

ব্রেখ্‌ট্। ঘন ঘন মল, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করে আপনারা যদি ভেবে থাকেন আমাকে চমকে দেবেন, তা পারবেন না। শিশুসুলভ shock-tactics আমার কাছে অত্যন্ত boring। আপনারা এতে শুধু নিজেদের মানসিকতা প্রকট করে তুলছেন। আপনাদের গুরু বলেছেন, Art is bourgeois। তিনি খানিক অজ্ঞ। বুর্জোয়ার জন্মের বহু বহু পূর্বে আর্টের সৃষ্টি। আর Art is shit—এ কথায় আমার মনে পড়ে গেল নাৎসিদের কথা, হিটলারের জর্মনির কথা, বই পোড়ানো উৎসবের কথা,

ইহুদিদেব নিশ্চিহ্ন করার জ্বলন্ত চুল্লির কথা. কারণ নাৎসি নেতা ডক্টর গোয়েবেল্‌স্‌ বলতেন, আর্ট কথাটা শুনলেই আমার পিস্তল টানতে ইচ্ছে হয়। আপনাদের গুরু নতুন কথা কিছুই বলছেন না। যাক, এই যে নাটক আপনারা অভিনয় করছেন, এব নাম কী?

যুবক ১। অয়দিপাউস।

ব্রেখ্‌ট্‌। এটা, এটা অয়দিপাউস?

যুবক ১। হ্যাঁ, এই দৃশ্যে অয়দিপাউসেব জন্ম দেখাচ্ছি—এবা সবাই মিলে য়োকাস্তাব যোনি—আর এই যে শিশু অয়দিপাউসের ভূমিষ্ঠ হওযা।

ব্রেখ্‌ট্‌। সফোক্লিসেব নাটকে সেরকম কোনো ঘটনা নেই।

যুবক ১। সফোক্লিসেব নাটক চুলোয় যাক। কোনো নাটক আজ পর্যন্ত লেখাই হয়নি। যা লেখা হয়েছে সব রাবিশ—শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে ব্রেখ্‌ট্‌, সব আবর্জনা, সবাই কথাব দাস, কথার ব্যবসাযী, কাব্যের কারিগব। বিশুদ্ধ থিযেটাবে কথাই থাকতে পাবে না।

ব্রেখ্‌ট্‌। কথা থাকবে না তো দর্শককে ব্যাপাবটা বোঝাব কী করে?

যুবক ১। এই যে দেখাচ্ছি।

[ওঁ-অ-ই ধ্বনিতে অভিনেতাবা আবার মুখর হন।]

ব্রেখ্‌ট্‌। ও, এই হচ্ছে সংলাপ! To be or not to be বা Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow-র স্থান নেবে এই আ-উ-ই।

যুবক ১। অবশ্য। থিয়েটাব কথার দাসত্ব করবে কেন?

ব্রেখ্‌ট্‌। এদিকে আমি তো সারাজীবন নাটক আর কাব্যকে একই ভেবে এসেছি। নাট্যকাব্য। স্বাধীন কাব্য যেমন যথেচ্ছগামী, নাট্যেব মধ্যে কাব্য তেমনি সংলাপের শর্তাধীন। অর্থাৎ যে চরিত্র কথা কইছে আর সেই মুহূর্তেব মনোভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাব গেস্টুস দ্বাবা সীমিত। আমি তো সারাজীবন ভিয়েনা এবং বাভারিযার গীতসমৃদ্ধ লোকনাট্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলাম, ফরাসি কবি ফ্রাঁসোযা ভিইয়োঁ, র‍্যাঁবো, ভের্লেন-এর কাব্যছন্দে ডুবে রইলাম, মার্টিন লুথাবেব কাব্যময় গদ্যের ধ্বনিটা ধরার চেষ্টা করে গেলাম। চীনা কবিতার অনুবাদ পড়ে চাইলাম আমার মাতৃভাষায় তার চলনটা ধরতে। আমি বার্লিনের শ্রমিক-অঞ্চলে-শোনা চকিত সুরেলা কথার বেশ আনতে চেষ্টা করলাম নাটকের সংলাপে। একবার ক্ষুধার্তের মিছিলে শুনেছিলাম স্লোগান : Wir haben Hunger! Wir haben Hunger! সেই সংগ্রামী ছন্দে সাজিয়েছি আমার নাটক। কেননা নাটক আমার কাছে কাব্য—দৃশ্যকাব্য, যেটা আপনাদের দেশ ভারতবর্ষের ঋষিদের দেওয়া নাম। সেটাই তো থিয়েটারের মূল কথা—দৃশ্যকাব্য। থিয়েটার মূলত কাব্য।

যুবক ১। আপনি সময় থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। থিয়েটারে কাব্যকে আমরা ঢুকতে দেব না। কথাকেই দুর করছি, আর কাব্য। থাকবে শুধু দেহের সঞ্চালন। অভিনেতাদের দেহই হচ্ছে থিয়েটারের একমাত্র উপাদান।

ব্রেখ্‌ট্ । কেন? কী হেতু এই সিদ্ধান্ত? দেহ হচ্ছে একমাত্র উপাদান, আর কথা নয় কেন?

যুবক ১ । একটা সামান্য তুলনা করলেই বুঝবেন কেন অভিনেতার দেহই হচ্ছে থিয়েটার। ধরুন চলচ্চিত্র। সেখানে কী দেখি? দেখি অভিনেতার ছায়া। আর থিয়েটারে সশরীরে উপস্থিত থাকেন অভিনেতা। সুতরাং ওই শরীরটাই থিয়েটার।

ব্রেখট । সব মাছ সাঁতাব কাটে, কোনো কোনো মানুষ সাঁতার জানে না। সুতরাং প্রমাণ হল—কোনো কোনো মানুষ মাছ নয়। আর কিছুই প্রমাণ হল না। এটাই তো লজিকের প্রাথমিক সূত্র। আপনি শুধু প্রমাণ করলেন থিয়েটার চলচ্চিত্র নয়, যেটা সবাই জানে। একথা প্রমাণ করলেন না, অভিনেতার দেহই হচ্ছে থিয়েটারের একমাত্র উপাদান।

যুবক ১ । না, বলছিলাম, চলচ্চিত্রে দেখি শুধু শিল্পীর ছায়া। শিল্পীকে সশরীরে দেখি শুধু থিয়েটারে।

ব্রেখ্‌ট্ । না, শুধু থিয়েটারে নয়, ব্যালেতেও দেখি, সার্কাসেও দেখি। তাহলে আপনার যুক্তি অনুসাবে ব্যালে ও থিয়েটারে কোনো পার্থক্য নেই, সার্কাস ও থিয়েটারেও কোনো পার্থক্য নেই।

যুবক ১ । না, তা তো হতে পারে না . . . মানে .

ব্রেখ্‌ট্ । ব্যালে ও থিয়েটারে কোথায় পার্থক্য? বলুন, কী সে লক্ষণ যা থিয়েটারকে তার স্বাতন্ত্র্য দান করবে?

যুবক ১ । মানে—ব্যালেতে শিল্পী নীরব।

ব্রেখ্‌ট্ । Das ıst wahr। সার্কাসেও শিল্পী নীরব। চলচ্চিত্রে সাম্প্রতিককালে শিল্পীরা কথা কইলেও, চলচ্চিত্র-শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল নির্বাক ছবি হিসেবে এবং এখনো কথা সেখানে গৌণ এবং কথা উড়ে এসে জুড়ে-বসা এক উৎপাত মাত্র। এখনো শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলিতে কথা গৌণ, ছবি দিয়েই প্রকাশ করতে হয় কাহিনী, চরিত্রের মনের ভাব, আবেগ, ক্রোধ, দুঃখ। থিযেটার এসব থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কেননা সেখানে সংলাপ প্রধান। একমাত্র নয়, কিন্তু প্রধান। কাহিনী, চবিত্রেব অলি-গলি, আচমকা মোড় ঘোরা. উল্লাস-অবসাদ, সারল্য-ক্রূরতা. এসব প্রকাশ করার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে কথা।

যুবক ১ । কথাই সব? তাহলে মঞ্চসজ্জা, আলো—এসবের কোনো ভূমিকা নেই?

ব্রেখ্‌ট্ । আমি বলেছি কথা প্রধান, কথা একমাত্র নয়। কিন্তু দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত একটা মুহূর্তের বা দেশকালের একটা ইঙ্গিত দিতে পারে মাত্র। এমনকী হ্যামলেটের দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের ভযংকর রূপটাও হয়তো ধরে দিতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই সে 'টু বি অর নট টু বি'-র দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারে না। সেটা পারে শুধু শেক্‌স্‌পিয়ারের কথা। আমার বার্লিনের থিয়েটারে আমি দৃশ্যসজ্জা নিয়ে কিছু পরীক্ষা করলেও. আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আমি উজ্জ্বল সোনালি আলোয় মঞ্চ ধুইয়ে দিতাম, যাতে অভিনেতাদের মুখ দেখা যায়। অনেক সময় যেখান থেকে আলোটা আসছে সেই স্পটলাইটগুলোকেও ফ্লাইজ থেকে ঝুলিয়ে দর্শকের

চোখে দৃশ্যমান করে রাখতাম। অদৃশ্য কোন উৎস থেকে কোন সবুজ আলো এসে মঞ্চকে স্বপ্নালু করে তুলছে এসব রহস্য ভেদের দায়িত্ব দর্শকের কাঁধে চাপিয়ে তাকে অধিক ভারাক্রান্ত করতে চাইনি।

[যুবকরা কোলাহল করে প্রতিবাদ করে।]

ব্রেখ্‌ট্‌। শুনুন! কথা যে প্রধান, মঞ্চসজ্জা ও আলো যে গৌণ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি যখন মঞ্চস্থ হয়েছিল, তখন মঞ্চসজ্জার কথাও কেউ ভাবেনি, বৈদ্যুতিক আলোরও জন্ম হয়নি। অর্থাৎ মঞ্চসজ্জা ও কৃত্রিম আলো ছাড়াই নাটক হতে পারে, কিন্তু কথা বাদ দিয়ে শুধু মঞ্চসজ্জা ও আলো দিয়ে নাটক হয় না। যদিও গর্ডন ক্রেগ এ ধরনের বিমূর্ত চিন্তা কিছু করেছিলেন, হাতে-কলমে করেননি।

যুবক ১। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটক বলতে কী নাটক বোঝাতে চাইছেন?

ব্রেখ্‌ট। সফোক্লিস, ইস্কাইলাস, শেক্‌স্‌পিযার। শেক্‌স্‌পিয়ারের স্টেজে দৃশ্যসজ্জার জায়গা ছিল না, ক্ষুদ্র এক-আধটা আঁকা পর্দা ছাড়া। আর অভিনয় হত সূর্যের আলোয়, সুতরাং আলোকসম্পাতেব প্রশ্ন ওঠে না।

যুবক ১। তাহলে শেক্‌স্‌পিযার কী কবে বোঝাতেন ঘটনাটা কোথায় ঘটছে?

ব্রেখ্‌ট্‌। কথা দিয়ে। দৃশ্য শুরু হতে না হতে কযেকটি লাইনে স্থান, কাল, প্রাকৃতিক অবস্থা সব বুঝিয়ে দিতেন। এটা কি দুর্গপ্রাকার, না বাজসভা, এখন রাত্রি না দিন, রাত্রি হলে অন্ধকার না চন্দ্রালোকিত, শীত কতটা তীব্র, বাতাস বইছে, না প্রকৃতি নিশ্চল, সবই প্রকাশিত অমর কাব্যছন্দে।

[শেক্‌স্‌পিয়ারেব প্রবেশ, এলিজাবেথীয পোশাকে।]

শেক্‌স্‌। God ye good den, my masters'

[পেছনে পেছনে আসেন বুর্জোযা সমালোচক, ক্ষীণ দৃষ্টি, অল্প কুঁজো, অনবরত সিগারেট খাচ্ছেন।]

যুবক ১। আসুন, আসুন, ইনি প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক, ইনি হেব ব্রেখ্‌ট্‌। [শেক্‌স্‌পিয়ারের দিকে নির্দেশ করে] এঁকে তো চিনতে পারলাম না। থিয়েটারের কস্টিউম পরে ইনি কে?

শেক্‌স্‌। আমি স্ট্র্যাটফোর্ডের উইল শেক্‌স্‌পিয়ার। আর এ পোশাক থিয়েটারের নয়, আমাব নিজের।

ব্রেখ্‌ট্‌। আমি আউগ্‌স্‌বুর্গের বের্টোল্‌ট্‌ ব্রেখ্‌ট্‌। মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার, এক্ষুনি আলোচনা হচ্ছিল আপনার থিয়েটারে তো মঞ্চসজ্জা ও আলো ব্যতিরেকেই স্রেফ কথার ঝংকারে দর্শককে টেনে নিয়ে যেতেন আপনার কল্পিত জগতে।

[শেক্‌স্‌পিয়ার হাসলেন।]

ব্রেখ্‌ট্‌। দর্শক সত্যই কথার সুষমায় সম্মোহিত হয়ে মঞ্চে অরণ্য, দুর্গ, শয়নকক্ষ এসব কল্পনা করে নিত?

শেক্‌স্‌ । সত্যিই করত কিনা কী করে বলব বলুন। তবে যখন ধীরে ধীরে অবশেষে সব দর্শক চুপ করে যেত তখন বুঝতাম এবার ওরা কথাগুলো শুনছে। মানে ১৬০০ সালের লন্ডনের থিয়েটারে বড়ো কোলাহল হত। প্রেন্টিসরা আসত তো দলে দলে, মানে আপনারা যাদের মজদুর বলেন। বেশির ভাগই লিখতে পড়তে জানত না। উপরন্তু তারা দাঁড়িয়ে নাটক দেখত তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে। তাদের পা ধরে যেত। আবার ওই ভিড়ের মধ্যে স্যাক, এইল, বিয়ার প্রভৃতি পানীয় ফিরি করত একদল মেয়েছেলে এবং দর্শকরা কিনে কিনে আকণ্ঠ পান করত। আপনি বলছেন—কথার সুষমায় তারা সম্মোহিত হত। সুষমা কথাটা ঠিক আমাদের গ্লোব থিয়েটারে প্রযোজ্য ছিল না। বলা যায় মনুষ্যকণ্ঠের কামান গর্জন। কী সব ষাঁড়ের মতো গলা, মেঘ-গর্জনের মতো আবৃত্তি। মনে রাখবেন আমাদের থিয়েটারে ছাদ ছিল না। আপনারা আজকের থিয়েটারে এমন ব্যবস্থা করে নিয়েছেন যাতে স্টেজে ফিসফিস করলেও পেছন থেকে শুনতে পায়! আমাদের অভিনেতারা স্রেফ গলার জোরে ওই মাতাল বিশৃঙ্খল দর্শককে চুপ করিয়ে রাখত। আমাদের প্রধান অভিনেতা রিচার্ড বারবেজ যখন তারস্বরে আমার লেখা সংলাপ বলতেন আমি দু-কানে তুলো গুঁজে সাজঘরে শুয়ে থাকতাম। এককালে বড়ো গর্ব করে লিখেছিলাম:

Not marble nor the gilded monuments
Of princes shall outlive this pow'rful rhyme—

রিচার্ড বারবেজের ভয়ংকর গর্জন শুনে মনে হত এসব কী হাবিজাবি লিখছি দিনরাত? এর নাম কাব্য?

ব্রেখ্‌ট্‌ । মানে থিয়েটারের আবহাওয়াটা ছিল একটা মেলার মতন, একটা উৎসবের মতন?

শেক্‌স্‌ । Alack the day!

ব্রেখ্‌ট্‌ । তাই সম্ভব হয়েছিল মানুষের গূঢ়তম কামনা জুগুপ্সা, অবৈধ চিন্তার অমন প্রবল নাট্যরূপ, তাই সৃষ্টি হয়েছিল হ্যামলেট ও লিয়ার। নাট্যশালার চৌহদ্দির মধ্যে সামাজিক বিধিনিষেধের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিয়ার খেয়ে হুল্লোড় করতে করতে দর্শক নাটক দেখতে এলে সেই অসংযম ও বিদ্রোহ নাটকের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তার করতে বাধ্য। জানেন, আজকাল থিয়েটারে ধূমপান পর্যন্ত নিষিদ্ধ? আজকাল থিয়েটার দেখতে যাওয়া মানে গির্জায় যাওয়ার মতন, শাদা শক্ত কলার ও কালো টাই-এ নিজের গলায় মরণফাঁস বেঁধে খাড়া হয়ে সীটে বসে থাকা। ফলে সেই রকমই খাড়া আড়ষ্ট নাটক হয় এবং তারই উপযোগী গলা টেপা অভিনয়। ধ্রুপদী জর্মন থিয়েটার সম্পর্কে আমি একবার লিখেছিলাম—ওই সব প্রেক্ষাগৃহে ধূমপানের অনুমতি দেওয়া হোক ; সামনে ধূমপানরত অর্ধশায়িত দর্শক দেখলে আর অমন মেকি অভিনয় সম্ভব হবে না।

[শেক্‌স্‌পিয়ার হাসলেন।]

থিয়েটারকে মন্দির বানিয়ে তুলেছে বুদ্ধিজীবীরা। দর্শকদের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে থিয়েটারে ঢুকতে হয়, ভক্তি আপ্লুত অন্তরে দেখতে হয় নাটক। মন্দিরে

ঢুকে তাবপর দেবতাদের সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা চলে না। যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে তাকে নীরবে শিরোধার্য করে বাড়ি ফিরে যাওয়া, এই হচ্ছে দর্শকদের ভূমিকা। আমার এমন ইচ্ছাও একবার ব্যক্ত করেছিলাম যে নাটকের অভিনয় হওয়া উচিত একটা ফুটবল ম্যাচের মতন, যেখানে সমস্ত দর্শকের অধিকাব থাকে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করার, ধিক্কার দেওয়ার বা চিৎকার করে গোল করার নানা ফন্দি বাতলানোর।

শেক্‌স্‌ । ফুটবল কী?

ব্রেখ্‌ট্‌ । ফুটবল হচ্ছে . . যাক্‌ মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার, সে কয়েক কথায় বোঝানো যাবে না। সে একটা ধর্মোন্মাদনার মতন বস্তু। ম্যাস হিস্টিরিয়া। তাহলে আপনি যে বিশ্বের শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নন, শ্রেষ্ঠ কবিদেরও একজন, আপনাব থিয়েটাব থেকে কবি হিসেবে কোনো তৃপ্তি কখনো পাননি?

শেক্‌স্‌ । না। দেখুন, আমি ছিলাম প্রথমে থিয়েটারে সহিস, বড়লোকেরা এলে তাঁদের ঘোড়া ধরতাম।

সমালোচক । ঘোড়া ধরতে হত কেন?

শেক্‌স্‌ । পাছে ঘোড়ারাও নাটক দেখতে ঢুকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আমি হযেছিলাম থিয়েটারেব চুক্তিবদ্ধ লেখক। অর্ডাবমাফিক নাটক লিখে নির্ধাবিত তাবিখে জমা দিতে হবে, ব্যস। এমনো তো হয়েছে, 'ম্যাকবেথ' নাটকেব মহলা চলাকালীন অভিনেতা নির্দেশক বারবেজ বায়না ধরলেন মরার আগে ম্যাকবেথের বক্তৃতা কোথায়? সেটাই রেওয়াজ ছিল অন্য সব থিয়েটাবে, অস্ত্রাঘাতে হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে যাবার পর ঝাড়া তিন পাতা কাব্য-উচ্চারণ। তো আমি বললাম, Prithee master Burbage, এ নায়ক অন্য নায়কের মতন নয়, এ নাযক ম্যাকবেথ, এ নেগেটিভ নায়ক, নেতিবাচক, এ কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও ভিলেন—a hell-kite, the fiend of Scotland-এর মৃত্যুতে কাব্য উচ্চারিত হতে পারে না। বাববেজ বললেন—ম্যাকবেথ কেমনধারা লোক আমি জানতে চাই না, কিন্তু পার্টটা করছি আমি বারবেজ, সুতরাং মৃত্যুকালীন ভাষণ চাই। দশ মিনিটের মধ্যে লিখে আনুন, নইলে ফবচুন বা অন্য যে কোনো থিযেটারে গিয়ে চাকবি খুঁজুন।

ব্রেখ্‌ট্‌ । আপনি দশ মিনিটের মধ্যে লিখে দিলেন?

শেক্‌স্‌ । বিদূষকের পার্ট যিনি করতেন সেই কনডেলের কাছ থেকে এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ টেনে নিয়ে মিনিট বারোর মধ্যে যা মাথায় এল হাবিজাবি লিখে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

সমালোচক । কোন্‌ লাইন সেগুলো? To-morrow, and to-morrow and to-morrow?

শেক্‌স্‌ । হ্যাঁ, তাই হবে। মনে কি থাকে নাকি?

যুবক ১ । To-morrow and to-morrow হচ্ছে হাবিজাবি! [সকলের হাসি]

ব্রেখ্‌ট্‌ । নেগেটিভ কেন্দ্রীয় চরিত্র। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, আমিও সারা জীবন সেটাই

সৃষ্টির চেষ্টা করে গেছি। ক্রাগলের, গালি গে, ম্যাকি মেসার, কুরাজ, গালিলেও গালিলাই, আর্টুরো উই, পুন্টিলা। এক্ষেত্রে আপনি হচ্ছেন আমার পথপ্রদর্শক। বিরাট বিরাট ক্রিমিনালকে নাটকের হিরো করলেন আপনিই। শাইলক, রাজা জন, দ্বিতীয় রিচার্ড, তৃতীয় রিচার্ড, জুলিয়াস সীজার, করিওলানুস, ম্যাকবেথ। কিন্তু যা বলছিলাম, শ্রুতিমধুর আবৃত্তি অভিনয় আপনি কখনোই পাননি?

শেক্‌স্। কী করে পাব বলুন। অভিনেতারা প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। লেডি ম্যাকবেথ এক জায়গায় তাঁব স্বামীর উদ্দেশে বলছেন : What my lord, a soldier and afeared? তুমি সৈনিক অথচ ভীত? যে ছেলেটা লেডি ম্যাকবেথ করত [যুবকদেব গুঞ্জন]—হ্যাঁ ছেলেরাই তো করত মেয়ের পার্ট—তা সে দিনের পর দিন বলত : What my lord, a soldier and a beard? তুমি সৈনিক অথচ দাড়ি গজিয়েছে? সংশোধন করতে গেলে তর্ক জুড়ে দিল, 'দাড়িই' নাকি ওখানে অর্থপূর্ণ হয়। তবে তখনো ইংলন্ডে সতেজ ছিল লোককবিদের ঐতিহ্য যাঁরা হাটে-বাজারের হট্টগোলের মধ্যেই গান করতেন ; লোকের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল মর‍্যালিটি ও মিরাকল প্লে যা অভিনীত হত শহরের রাস্তার ওপরে, সব হট্টগোলকে স্বীকার করে নিয়েই। আমরা কখনো এরকম ভাববার সুযোগ পাইনি যে থিয়েটার জনতার ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি থেকে দূরে স্থাপিত করতে হবে, বা থিয়েটারের মধ্যে প্রেন্টিসদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাই কোনো অসন্তোষ ছিল না আমাদের। বরং ওই গোলমাল করা, বিয়ার-মত্ত অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের খুশি করতেই হবে, এই ভেবে আমরা চমকবহুল, ঘটনাবহুল নাটক বাঁধতাম। এখন শুনছি তার কতকগুলিকে আপনারা ৪০০ বছর পরেও এখনো অভিনয় করেন, এখনো দেখেন।

সমা । আপনি এখনো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার। আপনার নাটক সবচেয়ে বেশি অভিনীত হয়।

শেক্‌স্ । (হেসে)। Ah, rest you merry, kind gentlemen!

ব্রেখ্‌ট্ । আপনি তো থিয়েটার সম্পর্কে, অভিনয় সম্পর্কে, আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে কিছু লিখে যাননি . . .

শেক্‌স্ । (হেসে)। ছাপত কে? বুঝছেন না কেন? নাট্যকার মাস্টার উইল শেক্‌স্‌পিয়ারের কথাবার্তার কি বিশেষ মূল্য ছিল তখন? কোনোমতে নিউ প্লেস নামে একটা বাড়ি কিনে বসে গিয়েছিলাম, অ্যান আর আমার কন্যা হ্যামনেটকে নিয়ে। তবে কীরকম থিয়েটার আমি মনে মনে চাইতাম, আর অভিনয়টা কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করতাম তা নানা নাটকের মধ্যে বলে দিয়েছি। থিয়েটার হবে এমন যা মানুষের কল্পনাশক্তিকে মুক্তি দেবে, প্রতি মুহূর্তে দর্শককে বাধ্য করবে কল্পনা প্রয়োগ করে কথার অসম্পূর্ণতাকে নিটোল ও সম্পূর্ণ করে নিতে।

'পঞ্চম হেনরি' নাটকে সূত্রধার বলছেন—

O for a Muse of fire, that would ascend
The brightest heaven of invention!
A kingdom for a stage, princes to act,
And monarchs to behold the swelling scene!
Then should the warlike Harry, like himself,
Assume the port of Mars, and his heels
Leash'd in, like hounds, should famine, sword and fire
Crouch for employment But, pardon, gentles all,
The flat unraised spirits that hath dar'd
On this unworthy scaffold, to bring forth
So great an object. Can this cockpit hold
The vasty fields of France? Or may we cram
Within this wooden O the very casques
That did affright the air at Agincourt? . .
Think, when we talk of horses, that you see them,
Printing their proud hoofs i' the receiving earth ,
For 'tis your thoughts that now must deck our kings,
Carry them here and there, jumping o'er times,
Turning th' accomplishment of many years
Into an hour-glass ; for the which supply,
Admit me Chorus to this history ,
Who, Prologue-like, your humble patience pray,
Gently to hear, kindly to judge, our play.

ব্রেখট। আর অভিনয়? অভিনয় কেমন হওয়া উচিত বলেছেন কোথাও?

শেক্‌স্‌। হ্যাঁ। হ্যামলেট, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য, ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদের রিহার্সাল নিচ্ছেন হ্যামলেট—

Speak the speech, I pray you as I pronounc'd it to you, trippingly on the tongue , but if you mouth it, as many of our players do, I had as lief the town-crier spoke my lines Nor do not saw the air too much with your hand, thus, but use all gently , for in the very torrent, tempest, and, as I may say, whirlwind of your passion, you must acquire and beget a temperance that may give it smoothness O, it offends me to the soul to hear a robustious periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to very rags, to split the ears of the groundlings, who, for the most part, are capable of nothing but inexplicable dumb shows and noise I would have such a fellow whipp'd for o'erdoing Termagant, it out-herods Herod. Pray you avoid it.

যুবক ২। I warrant your honour.

শেক্‌স্‌/হ্যামলেট। Be not too tame neither, but let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word, the word to the action, with this special observance, that you o'erstep not the modesty of nature ; for anything so o'erdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is to hold as 'twere, the mirror up to nature

সমা। থিয়েটার হবে প্রকৃতির দর্পণ। এটাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উক্তি। কিন্তু হুবহু বাস্তবের প্রতিচ্ছবি যা আয়নায় প্রতিফলিত হয় তাকে কি শিল্প

বলা যায়?

শেক্স্। হুবহু হবে কেন? আয়নার কাঁচটা এবড়ো-খেবড়ো থাকলেই বাস্তবের বিকৃত প্রতিচ্ছবি ফুটবে। যে অংশটাকে আমি বৃহৎ করে দেখাতে চাই সেটা বিশাল হয়ে উঠবে। পাশেই আরেকটা মুখ হবে বাঁকাচোরা, ভয়ংকর। কীরকম দর্পণ তুলে ধরতে হবে তা তো বলিনি।

সমা। আপনার সব চরিত্রই স্বাভাবিক থেকে চার পাঁচ গুণ বেশি আতিশয্য-দোষে দুষ্ট। আপনার নায়করা ঘন ঘন উন্মাদ হয়ে যান, প্রলাপ বকেন, মূর্ছিত হয়ে পড়েন, অশ্লীল কথার বন্যা ছুটিয়ে দেন। নায়কদের বিশাল করে আঁকতে গিয়ে আপনি তাদের এ ধরিত্রীর অধিবাসীই আর রাখেননি, এর কারণ কী?

শেক্স্। কারণ ওই যে বললাম, groundlingদের খুশি করতে হত। প্রেনটিস-রা টিকিট কিনত বলে থিয়েটার চলত, আর ভূত-প্রেত-ডাকিনী, যুদ্ধ, মূর্ছা, মৃত্যু, আত্মহত্যা, উন্মাদ হয়ে যাওয়া, এসব দেখলে তারা হাততালি দিত।

সমা। দূর, এ একেবারে বৈষয়িক কারণ দেখালেন। আপনার মতন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর কাছে দার্শনিক কারণটা জানতে চাইছিলাম।

শেক্স্। আমি দার্শনিক মোটেই নই। আমি থিয়েটারের দরজায় বড়লোকদের ঘোড়া ধরতাম। আপনি আমাকে আমার বন্ধু ও প্রতিদ্বন্দ্বী মাস্টার ক্রিস মার্লোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। আমি ল্যাটিন ভাষা পর্যন্ত শিখিনি কখনো।

সমা। হ্যাঁ, সেটা আমরা দেখেছি। আপনার নাটকে মারাত্মক সব ভুল থাকে—ভূগোলে, ইতিহাসে, সামান্য সাধারণ জ্ঞানে। 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট্' নাটকে আপনি দিব্যি লিখে গেলেন বোহেমিয়া দেশে সমুদ্রোপকূলে জাহাজ এসে ভিড়ল। অথচ বোহেমিয়ায় সমুদ্র নেই। 'জুলিয়াস সীজারে' ব্রুটাস বললেন, 'peace, count the clock'। ঘড়ি কোত্থেকে এল জুলিয়াস সীজারের রোমে?

শেক্স্। (সলজ্জ হেসে)। 'ঘড়ি' লিখেছি নাকি? I prithee, honest gentlemen, forbear! Thou hast riven my heart in twain!

সমা। এই তো বের্টোলট্ ব্রেখ্ট্ পর্যন্ত আপনার নায়কদের বাড়াবাড়ি সহ্য না করতে পেরে লিখেছিলেন—[পড়েন]—'শেক্স্‌পিয়ারের বিরাট বিরাট ব্যক্তিরা নিজেদের বিরাটত্ব প্রমাণ করতে এত ব্যস্ত যে তার জন্য ঘটনার বাস্তবতা পর্যন্ত চুরমার হয়ে যায়, বিরাটত্ব প্রমাণ করার জন্য রাজা লিয়ারকে যেতে হয় বনবাসে এবং শেষে কন্যার মৃতদেহ বুকে নিয়ে মহত্ত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।'

ব্রেখ্ট্। এসব অনেক আগের লেখা—১৯২৯ সালের—তখনো আমি এভনের কবিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি তো সেই সময়ে এও লিখেছিলাম—ট্র্যাজিডি হচ্ছে বুর্জোয়াদের সৃষ্টি এবং বুর্জোয়াদের জামানা শেষ হলে ট্র্যাজিডিরও শেষ হবে।

কে না জানে বুর্জোয়ারা মাতৃগর্ভে আসার অনেক পূর্বে সেই দাস-সমাজেই সৃষ্টি হয়েছিল ট্র্যাজিডি, গ্রীক ট্র্যাজিডি। এই সমালোচক মহোদয়ের ধারণা কেউ ১৯২৯ সালে কিছু লিখলে সেটা তার শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় বাণী হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যে পরিবর্তিত হয়, যার পরিবর্তন নেই তার যে অস্তিত্ব নেই, এটা ডায়ালেক্‌টিক্‌স্—অনভিজ্ঞ লোকেদের মাথায় ঢোকাই শক্ত।

শেক্‌স্। আপনি লিখেছিলেন রাজা লিয়ারকে অরণ্যে গিয়ে তাঁর মহত্ত্ব প্রমাণ করতে হয়। আমার নাটকে তা নেই। লিয়ার অরণ্যে গিয়ে রীতিমতন হাস্যকর, তিনি উন্মাদ। চুলে ফুল গুঁজে তিনি রাজাগিরির ভান বজায় রাখছেন, এবং বিদূষক, পাগলামির-ভান-করা এডগার প্রভৃতিকে নিয়ে তিনি রাজসভার একটা উদ্ভট সমান্তরাল-সংস্করণ খাড়া করছেন। 'চতুর্থ হেনরি' নাটকে ফলস্টাফও তাই করে মদের দোকানে। সে তার ইয়ারদের নিয়ে রাজদরবার বসায়। আসলে আপনি কেন লিয়ারকে জগৎ-বিচ্ছিন্ন একাধারে করুণ ও হাস্যকব এক চরিত্র হিসেবে দেখতে পাননি জানেন? কারণ আপনি তখনো ভাবতে শেখেননি যে ট্র্যাজিক নাটকের নায়ক ক্রমে কমিক হয়ে উঠতে পারে।

ব্রেখ্‌ট্। তার জন্য দায়ী আপনার কাব্য। এমন কাব্যের ঝবনায হাস্যরস তলিয়ে যায়।

শেক্‌স্। আবার এক ধরনের হাস্যকরতা আছে যা বিষাদে ভরা। যৌবনে আপনি এসব ভাবেননি। রাষ্ট্র, সমাজ, অন্য মানুষ, আত্মীয়, এমনকী নিজের মা, যেমন হ্যামলেট বা নিজের কন্যা যেমন লিয়ার সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তরবারি ঘুরিয়ে যুগপুরুষ সাজা—এ যেমন করুণ তেমনি মজার। হ্যামলেট নিজেকে ধর্মযোদ্ধার আসনে বসান :

The time is out of joint—O cursed spite.
That ever I was born to set it right!

লিয়ার বা হ্যামলেট হিসপানিয়ার কবি থেরভান্তেসের দন কিহোতে-এর মূলত সমগোত্রীয়। কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে লিয়ার কোনো মহত্ত্ব-ফহত্ব প্রকাশ করছেন না ; তিনি অবশেষে স্বীকার করছেন ওই ভীষণ, লোভী, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সমাজ তাঁর চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী। তাঁর রাজাসাজার পালা শেষ হচ্ছে। কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে, তিনি কী অসম্ভবের রাজ্যে এতকাল বাস করছিলেন। আপনার মাদার কারেজ শেষ দৃশ্যে কন্যার মৃতদেহ বুকে চেপে যা প্রকাশ করছেন আমার লিয়ার-ও ঠিক তাই করছেন।

ব্রেখ্‌ট্ (চমকে)। আপনি আমার নাটক পড়েছেন?

শেক্‌স্। তা আর পড়িনি? এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের নাটক পড়ব না? তা মাদার কারেজ ঠিক লিয়ারের মতনই বিচ্ছিন্ন, সমাজ থেকে, অন্য মানুষ থেকে, নিজের পুত্র-কন্যা থেকেও। যুদ্ধের পিছু পিছু ঘুরে উনি নিজের সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখার তপস্যায় রত। কিন্তু হল না, হয় না। যুদ্ধ যারা লাগায় তারা ঢের বেশি শক্তিশালী।

যুবক ১। দৃশ্য দুটো পর পর অভিনয় করলে দুই দিকপাল নাট্যকারের চিন্তার সাদৃশ্যটা

আমরা চট্ করে বুঝতে পারব। অনুমতি হলে—

শেক্‌স্ । হ্যাঁ, লাগাও। বহুদিন নিজের নাটক দেখিনি।

রাজা লিয়ার

পঞ্চম অঙ্ক / তৃতীয় দৃশ্য

[কর্ডেলিয়াব মৃতদেহ কোলে নিয়ে রাজা লিয়াবের প্রবেশ. পশ্চাতে সেনাধ্যক্ষ এবং অন্যান্যরা]

লিয়ার। হাহাকার করো, হাহাকার, হাহাকার, হাহাকার!
তোমরা পাষাণে গড়া মানুষ!
তোমাদের মতো জিহ্বা আর চক্ষু পেলে
এমন প্রয়োগ করি তার
যাতে বিদীর্ণ হয়ে যায় গগনমণ্ডল!
সে চলে গেছে জন্মেব মতো।
কেউ জীবিত না মৃত
আমি দেখে বুঝি।
ও আছে মবে পড়ে যেন
একদলা মাটি।
একটা দর্পণ আনো দেখি,
যদি তাতে বাষ্প লাগে, বা
তা ম্লান হয়ে যায়,
তবে সে জীবিত নিশ্চয়।

কেন্ট । এই হল পরিণাম?

এডগার । সেই ভয়ংকরের মূর্ত রূপ এই?

আলবেনি । মৃত্যু, আর সবকিছু শেষ।

লিয়ার । এই তো চোখের পাতা নড়ছে ,
ও বেঁচে আছে! যদি তাই হয়,
এ জীবনে পেয়েছি যত দুঃখ শোক
সব ঘুচে যাবে তাতে।

কেন্ট । সদাশয় প্রভু। (নতজানু হয়।)

লিয়ার । আমার মিনতি, চলে যাও।

এডগার । ইনি মহামান্য কেন্ট, আপনার সুহৃদ।

লিয়ার । ব্যাধিগ্রস্ত হও, খুনি বিশ্বাসঘাতকের দল!
আমি ওকে বাঁচাতে পারতাম।
হায়, ও চলে গেছে জন্মের মতো!
কর্ডেলিয়া! আর একটু থাকো! হায়!

কী বলছ তুমি? ওর কণ্ঠস্বর ছিল
মধুমাখা, কোমল, ধীর—
বমণীর ভূষণ যেগুলি।
যে নীচ তোমার গলায় টেনেছিল ফাঁস,
নিজ হাতে পাঠিয়েছি তাকে যমালয়ে।

সেনানায়ক। একথা সত্যি মহামান্যগণ,
উনি তাকে হত্যা করেছেন।

লিয়ার। বল তুমি, হত্যা করিনি নিজ হাতে?
একদিন ছিল আমার ক্ষুরধার অসির কামড়ে
ওরা শেষ হত ছটফট করে।
আজ বৃদ্ধ আমি, নিবন্তর দুঃখশোকে অথর্ব অক্ষম।
কে তুমি? আমার চোখের দৃষ্টি
প্রখর নয়। তবু বলছি এখনি।

কেন্ট। ভাগ্যদেবী গর্ব কবে বলে,
তার স্নেহ আর ঘৃণার পাত্র আছে
মাত্র দুজন। তবে বলি, তাব একজন দেখি
ওই চোখের সমুখে।

লিয়ার। আমার দৃষ্টি ক্ষীণ। তুমি কেন্ট নও?

কেন্ট। হ্যাঁ, প্রভু। অমি দাসানুদাস কেন্ট।
আপনার ভৃত্য কাইয়াস কোথায়?

লিযার। সে অতি সজ্জন, এটুকু বলতে পারি।
সে আঘাত হানবে, আর দেবি নেই।
সে মরে গেছে, পচে গেছে দেহ।

কেন্ট। না, মহামান্য প্রভু,
আমি সেই লোক।

লিয়ার। এখনি জানব সে কথা।

কেন্ট। আমি সেই লোক
যে আপনার বিবাদ আর দুর্ভাগ্যের সূচনা থেকে
আপনার শোচনীয় জীবনযাত্রার সহচর।

লিয়ার। এখানে স্বাগত জানাই।

কেন্ট। সে ছাড়া নয় অন্য কেউ।
সবকিছু অন্ধকাব, নিরানন্দ আব প্রাণঘাতী।
আত্মঘাতী আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা দুজন
সবকিছু করে পড়ে আছে শুধু শব হয়ে।

লিয়াব। হ্যাঁ আমার ধারণা তাই।

আলবেনি। উনি জানেন না কী বলছেন
এখন ওকে দেখা দেওয়া অর্থহীন।

এডগার। নিষ্ফল!

[সংবাদবাহকের প্রবেশ]

সংবাদবাহক। এডমন্ড মারা গেছে, প্রভু।

আলবেনি। এখানে তুচ্ছ এ সংবাদ,
মহামান্য, সদাশয় সহচরগণ,
আমার অভিপ্রায় শোনাই,
এই মহা বিপর্যয়ে যে সাহায্য পাব যেখানে
যথাযোগ্য সমাদর হবে তার।
এই বৃদ্ধ রাজার জীবৎকালে
সর্বময় কর্তৃত্ব রাখব তার অধিকারে।
[এডগার ও কেন্টকে] আপনারা ফিরে যান নিজ নিজ স্থানে,
সম্পদ আব নতুন সম্মানে ভূষিত হয়ে,
যা অর্জন করেছেন নিজ নিজ গুণে।
সুহৃদেবা পাবে সুকর্মের যোগ্য পুরস্কার,
শত্রুর যোগ্য উপহার
রেখেছি পেয়ালা ভরে। ওই দেখুন, দেখুন! হায়!

লিয়াব। আমাব বাছার গলায় ফাঁসির দড়ি।
নেই, নেই, প্রাণ নেই!
কুকুর, অশ্ব, ক্ষুদ্র মূষিক কেন বেঁচে আছে?
আর তোর প্রাণবায়ু নিঃশেষ?
তুই আর আসবি না ফিরে,
না, না, না, কোনোদিন নয়।
বোতামটা খুলে দাও দয়া করে।
ধন্যবাদ মহাশয়।
ওকে দেখছেন? ওকে দেখুন,
দেখুন, ওর ঠোঁট দুটো।
দেখুন, দেখুন!

এডগার। মূর্ছা গেছেন! প্রভু! প্রভু!

কেন্ট। ভাঙো বুক, ভেঙে যাও ;
মিনতি করি, ভেঙে খান খান হও!

এডগার। চোখ মেলে তাকান, প্রভু।

কেন্ট। বিরক্ত কোরো না ওঁর আত্মাকে।
ওকে যেতে দাও!
ওর ঘৃণার পাত্র হবে (।
কাঁটাভরা কঠিন ধরার 'কে
যে ওকে ধরে রাখতে ্াইবে আরো বেশিদিন।

এডগার। সত্যিই চলে গেছেন ্নি।

কেন্ট। এতদিন কী করে জী ন ছিল
সেটাই বিস্ময়!
প্রাণটা রেখেছিল জো।র করে ধরে।

আলবেনি। ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও।
আমাদের কর্তব্য সকলেরই দায়।
[কেন্ট ও এডগারকে]
সুহৃদগণ, আপনারা দুজনে নিন শাসনভার
ক্লেদমুক্ত করে এ রাজ্য করুন উদ্ধার।

কেন্ট। মহাশয়, অবিলম্বে হাতে নেব পালনীয় কাজ,
প্রভুর আহ্বানে না বলব না আজ।

এডগার। দুর্দিনের বোঝার ভার বইতেই হয়,
আজ মনের কথা বলব শুধু, উচিত কথা নয়।
বৃদ্ধেরা সয়েছে বেশি : আমরা যারা বয়সে নবীন
দেখব না অতকিছু, বাঁচব না অতদিন।

[লোকসংগীতের মধ্যে সকলের প্রস্থান]

দৃশ্য ১২

[উষাসমাগম। ফৌজেব যুদ্ধবাদ্য ক্রমশ ক্ষীণ হযে আসছে। গাডিব সামনে কাত্রীব দেহ নিযে বসে আছেন হিম্মৎবাই। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কাছে দাঁডিযে।]

বৃদ্ধা। এবার ওঠ বাছা, সেপাইরা যে প্রায় সব চলে গেল। একা গাড়ি টেনে যাবে কী করে?
হিম্মৎ। হয়তো ঘুমিয়ে আছে।

গান

আয় ঘুম আয় রে,
ওটা কী দেখা যায় রে?
সবাই গায়ে মাখে ছাই,
আমার যাদুর অভাব নাই,
পরনে তার সোনার শাড়ি
দিয়ে গেছে আকাশপরী।
কারুর ঘরে ভাত নাই,
আমার যাদুর অভাব নাই,
বেড়ে দিলাম ক্ষীরেব নাড়ু।
একটি ছেলে যুদ্ধে মোলো
আরেকটি সে কোথায় গেল?

শহরে যে বাচ্চাগুলো রয়েছে সে কথা একে বলা উচিত হযনি দাদা।

বৃদ্ধ। তা তুমি যদি সওদা করতে শহরে না যেতে, বাছা, তবে এ ঘটত না।
হিম্মৎ। ঘুমিয়ে পড়েছে।
বৃদ্ধা। না, ঘুমিয়ে পড়েনি। তোমায় বুঝতে হবে। ও চলে গেছে।
বৃদ্ধ। আর তোমাকেও চটপট চলে যেতে হবে, বাছা। বনে নেকড়ে আছে। আব তাব চেযেও হিংস্র হচ্ছে ডাকাত।
হিম্মৎ। হ্যাঁ।

[গাড়ি থেকে কাপড় আনেন মৃতদেহ ঢাকবার জন্যে।]

বৃদ্ধা। তোমার কি তিনকুলে কেউ নেই? যার কাছে যেতে পাবো?
হিম্মৎ। একজন আছে। আলিফ।
বৃদ্ধ (হিম্মৎ মৃতদেহ ঢাকছেন, তাই দেখতে দেখতে)। ওকে খুঁজে বাব কবো। তোমার মেয়ের সৎকারেব ভার নিচ্ছি আমবা। যদি আমরা মুসলমান বলে তোমার আপত্তি না থাকে, নইলে কোনো চিন্তা নেই।
হিম্মৎ। শবদাহের খরচ বাবদ এ টাকা কটা বেখে দিন।

(টাকা দেন।)

বৃদ্ধা। (হিম্মতের মাথায় হাত বুলিয়ে)। তাড়াতাড়ি যেও বাছা।

হিম্মৎ (জোয়াল কাঁধে নিয়ে)। একা টানতে পারব তো? হ্যাঁ, পাবব। গাড়িতে আছেটা কী? আবার ভালো করে ব্যবসা ফেঁদে বসতে হবে।

[আব এক দল সেপাই যুদ্ধবাদ্য সহকারে খুব কাছ দিয়ে যেতে থাকে। হিম্মৎ গাড়ি টেনে চলতে শুরু করেন।]

হিম্মৎ। শুনছ! আমায় ফেলে যেও না!

সমা। যে-কথা হচ্ছিল, তাতেই ফিরে যাই আবার। হের ব্রেখ্‌ট্‌ এখুনি দীর্ঘ তালিকা দিলেন তাঁব নেতিবাচক নায়কদের। মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার, আপনার বিরাট বিরাট নেতিবাচক চরিত্রের তালিকাও কম দীর্ঘ নয়—টিবল্‌ট্‌, রাজা জন, চতুর্থ হেনবি, দ্বিতীয় রিচার্ড, তৃতীয় বিচার্ড, অষ্টম হেনরি, ক্লডিয়াস, এডমন্ড, সীজার, করিওলানুস, ইয়াগো, ম্যাকবেথ। দুজনেরই দেখছি ক্রিমিনালদের প্রতি এক আকর্ষণ। এর কারণ কী?

শেক্‌স্‌। দর্শকদের ভালো লাগত বিশাল ক্রিমিনাল চরিত্র। স্বাভাবিক নর্মাল মানুষ নিয়ে ট্র্যাজেডি হয় না। যার মানস নানা আলোড়নে উদ্বেল নয়, সে নাটকের চবিত্র হতে পারে না। আমাদেব সময়ে লন্ডনে নতুন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ব্যাংক, টেম্‌স্‌ নদীব দক্ষিণ তীর ঘেঁষে। ওই ব্যাংকের কর্মচারীদের নিয়ে নাটক লিখতে আমাকে অনুবোধ করলেন আমাব মালিক দি আর্ল অফ সাদামপটন। দুদিন ওদের সঙ্গে মিশে ঘাম মুছতে মুছতে পালিয়ে এলাম। লর্ড সাদামপটনকে বললাম, মাই লর্ড, অমন শান্তশিষ্ট গোবেচারাদেব জীবনে কিছু ঘটেই না, নাটক লিখব কী নিয়ে? একজন কেরানি যদি ব্যাংকের টাকা চুরি করেও পালাত, তবু না হয একটা কিছু ঘটত। চুরি করারও সাহস কারুব নেই, শুধু কর্মস্থলে আসছে, হিসেব কষছে আবার গৃহে যাচ্ছে। ওদের নাটকে স্থান দিলে দর্শকরা হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা স্টেজের ওপর বিয়াবের ক্যানেকিন ছুঁড়বে।

ব্রেখ্‌ট্‌। আমার নেতিবাচক বদমাশ চরিত্রদের সম্পর্কেও একই কথা বলতে চাই। বদমায়েশরা স্বভাবতই নাটকীয়। প্রায়শই সৎ মানুষের চেয়ে অসৎ মানুষই থিয়েটারে বেশি আকর্ষণীয। ওঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্রদের মধ্যে একটি হল ইয়াগো যে নির্বিবেক, নির্মোহ, নির্মম। তার ক্রিয়াকলাপের একমাত্র মাপকাঠি হল সাফল্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে মার্কি দ্য সাদ যে নৈতিকতাবর্জিত বিশুদ্ধ স্বার্থপরের চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন, অনেক পূর্বেই ইয়াগো তার সদর্প, সার্থক ও পূর্ণ প্রকাশ।

সমা। কিন্তু সমাজের ওপর এর প্রতিক্রিয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে না? ইয়াগোর জীবনরীতি অনুকরণ কবার একটা স্পৃহা জন্মাতে পারে না? বা আপনার গালিলেও গালিলাই-এব মতন অত্যাচারীর সঙ্গে আপোশ করে বেঁচে সমাজের আদর্শ হয়ে উঠতে পাবে না?

ব্রেখ্‌ট্‌। আপনাব কথা শুনে মনে হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের অধিবাসীরা সব দুধের শিশু, যা

মঞ্চে দেখে তা-ই অনুকরণ করে। বাস্তবে এই সমাজের মানুষগুলো জীবনের প্রতিমুহূর্তে গালিলেওর মতন আপোশ করে পিঠ বাঁচায়, ইয়াগোর মতন নির্দয়ভাবে অন্যাকে মেরে নিজের স্বার্থ রক্ষা করে। মঞ্চে তারা নিজেদেরই চেহারা দেখে মাত্র। We hold as it were the mirror up to nature। কেন আমার নাটকে বদ লোকেদের দৌরাত্ম্য বেশি, এ-প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্য একটি প্রশ্ন যেটা আপনি নিজে বুর্জোয়া সমালোচক বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আমার নাটকে অসৎ, সুবিধাবাদী লোকের ভিড় বেশি কেননা বুর্জোয়া সমাজে ওই সব লোকের ভিড় বেশি। সুন্দর নিষ্পাপ মানুষ গড়বে যে সমাজ সে সমাজ এখনো বিপ্লবের অপেক্ষায় বয়েছে। বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তি হল হিংসা, হিংস্রতা। এ সমাজের হিংস্রতা সর্বব্যাপী। মুনাফা-ভিত্তিক সমাজবাবস্থা ক্রিমিনালদের বসিয়েছে শাসকের আসনে! ক্রাইম, অপবাধ-খুন-জখম, রাহাজানি ধর্ষণ হচ্ছে এ-সমাজে সবচেয়ে স্বাভাবিক সহজ ঘটনা। অপরাধ এখানে ব্যতিক্রম নয়, নিয়ম। যে অপরাধ না কবে নিজেকে নিষ্কলুষ রাখতে চেষ্টা করবে সে হয় বেকার শ্রমিক হয়ে অনাহারে দিন কাটাবে, অথবা তাকে উর্দি পরিয়ে রাইফেল হাতে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেবে ওই ক্রিমিনাল সমাজকেই রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জন দিতে। Crime thriller-এ কেন ছেয়ে যাচ্ছে পুঁজিবাদী দুনিয়া, একবারও ভেবেছেন? হিংস্রতা আশ্রয়ী চলচ্চিত্র, উপন্যাস, নাটক? শেক্‌স্‌পিয়ারের চেয়ে কেন আজ বেশি জনপ্রিয় জেমস বন্ড-স্রষ্টা ইয়ান ফ্লেমিং? এটাই তো স্বাভাবিক। অবশেষে পুঁজিবাদী দুনিয়া নিজেকে চিনতে পেরেছে, রক্তারক্তি আর খুনোখুনি ছাড়া তার ভাঁড়ারে আর কিছু নেই, থাকতেও পারে না। মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার বুর্জোয়াকে দেখেছিলেন তার অভ্যুত্থানের সময়ে, তাই এডমন্ড ও ইয়াগো সৃষ্টি হল। আমি বুর্জোয়াকে দেখেছি তার মৃত্যুশয্যায়, তাই আমার আর্টুবো উই জন্ম নিল। এডমন্ড ও ইয়াগো ক্রিমিনাল হলেও বিশাল, অপ্রতিরোধ্য। আমার আর্টুবো উই একটা খুদে মাস্তান মাত্র।

শেক্‌স্‌। Evil is also true! It avails thee nothing to bruit about from church-towers that it existeth not, or if it doth, it is merely the Devil's temptation। আমাদের সময়ে গির্জার পাদ্রিবা অনবরত বলতেন, অপরাধপ্রবণতা মানেই শযতানের হাতছানি। কষে একটু প্রার্থনা কর আর ওসব কুচিন্তা মাথায় আসবে না। এ জগৎ নাকি ঈশ্বরের সৃষ্টি। ক্রুশের পাদদেশে হাঁটু গেড়ে দুবার Our Father, Thou art in Heaven, Hallowed be thy Name বললেই শয়তান পালাবে এবং অপরাধ করার সব প্রবণতা অন্তর্হিত হবে। কিন্তু evil রয়েছে মানুষের মনে। ইয়াগো বাস করে প্রত্যেকের অন্তরে। তাই আমি সেটা দেখাতে বাধ্য , গির্জা যাই বলুক না কেন। এবং অপরাধীর প্রবল ও আপোশহীন হিংস্রতা, তার হত্যাকাণ্ড, রক্ত, পিপাসা, মিথ্যাচার—এসব দেখলে দর্শক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কেননা এসব পাপচিন্তা তাকেও পীড়িত করে রাতের অন্ধকারে। সে আর ধরে নেয় না প্রার্থনা করলেই এসব চিন্তা

থেকে সে মুক্ত হয়ে পড়বে। সে বোঝে একটা মুহূর্ত আসতে পারে যখন সে নিজেই তার পত্নীর গলা টিপে খুন করতে পারে, বা তৃতীয় রিচার্ডের মতন বালিশ দিয়ে দুটি নিষ্পাপ শিশুব দম বন্ধ করে হত্যা করতে পারে। সে মানবচরিত্র বুঝতে শুরু করে। যত তার অস্বস্তি হতে থাকে তত সে নিজেকে চিনতে পারে। খল নায়ক এবং তার হিংস্রতা এইজন্য জরুরি। শুধুই উদারহৃদয় নায়ককে দেখালে মানবচরিত্র খণ্ডিতভাবে দেখানো হত যা ঐ গির্জার ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতেব মেকি আশ্বাসের মতন বিপজ্জনক। হ্যামলেট ও ক্লডিয়াস দুযে মিলে মানুষ, ওথেলো ও ইয়াগো পরস্পরের পরিপূরক।

ব্রেখ্ট্। না, ডায়ালেকটিক্স্ উনি বুঝবেন বলে মনে হয় না।

সমা। কিন্তু মিস্টার শেক্স্পিয়ার, আপনাব চবিত্রদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যের বড়ো অভাব, সবাই প্রায় পাগল। দেখুন না—হ্যামলেট হঠাৎ উন্মাদের মতন আক্রমণ করেন ওফিলিয়াকে। ম্যাকবেথ্, নাটকের শেষে এসে, আদৌ সুস্থ কিনা সন্দেহ জাগে। রাজা লিয়ার উন্মাদই হয়ে যান। ক্লিওপাট্রার প্রতি অ্যান্টনিব প্রেমটাকে কী বলব? অবসেশন, প্যাবানইয়া? পাগলরাই কি এ পৃথিবীর প্রতিনিধি?

শেক্স্। যাদের নাম করলেন তারা কেউ আক্ষরিক অর্থে পাগল নয়। তারা পাগল এবং পাগল নয়। হ্যামলেট পাগলামির ভান করতে কবতে হয়তো নিজেব অজান্তেই মানসিক সুস্থতার সীমারেখার ওপারে পদক্ষেপ করেছে। লিয়ার শোকে মুহ্যমান মাত্র, এবং state of shock-এব মধ্যে রয়েছেন। ম্যাকবেথ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পেছনে ছুটতে ছুটতে বিহ্বল অবস্থায এসে দাঁড়িযেছেন। অ্যান্টনি ক্লিওপাট্রাকে ভালোবেসে আর সব ত্যাগ করেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতা, বাষ্ট্রীয সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শেষে প্রাণও। অনেক প্রেমিকই সর্বত্যাগী, ইতিহাস তাব সাক্ষী। ডাক্তারি অর্থে যারা পাগল তাদের নিয়ে নাটক হয় না। এই সব চরিত্র যাদেব নাম কবলেন তারা নিজেদের লক্ষ্যপথে ছুটে চলেছে যথেষ্ট ধূর্ততা ও বিচক্ষণতা সমেত। তারা সমাজের ভিড়ে সহজেই মিশে যেতে পারে আর দশটা মানুষের মতনই। তারা মানবমনেব আলো-আঁধারে ঘেরা কতকগুলি গোপন প্রকোষ্ঠে আলোকপাত করছে। মানুষের ভয়ংকর কিছু সম্ভাবনাকে ওবা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে মঞ্চের ওপর। ওদের প্যারানইয়াটা সব মানুষের সম্ভাব্য প্যারানইয়া। তাই কখনই আপনি নাটকেব কোথাও আঙুল রেখে বলতে পারবেন না—এখানে হ্যামলেট পাগল আর এখানে হ্যামলেট পাগল নয়। প্রতি মুহূর্তে বিকৃতমস্তিষ্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হ্যামলেট একই সঙ্গে বিরাজ করছেন, যেমন সব মানুষ করছে। অবশ্য ওরা বদ্ধ পাগল হলে আপনাদের খুব সুবিধে হত। 'আমি তো আব বদ্ধ পাগল নই' বলে আপনারা ওই চরিত্র মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে নিশ্চিন্তে ঘরকন্না করতেন। গর্ব করে বলতে পারি, সে-পথ আমার নাটকে বন্ধ। ওসব চবিত্রের হিংস্রতা দেখে আপনাদের ভয় করে, কারণ আপনাদের মন বলতে থাকে, আমিও মূলত ওই রকমই।

সমা। আপনি তাহলে ওইসব ভীষণ নেতিবাচক চরিত্রের সঙ্গেও দর্শককে একাত্ম হতে বলছেন?

শেক্‌স্‌। নিশ্চয়ই। জগতে শুধু ভালোটাই সত্য, আব বদটা নয়, এরকম মিথ্যা স্তোকবাক্য আমি দর্শকদের দিইনি। যা কিছু মানবিক তাই আমার কাছে বড়ো সুন্দর। মানুষ যখন পাপ কবে তখনো সে সুন্দব।

ব্রেখ্‌ট্‌। এই ছিল ওঁর যুগের কথা—রেনেসাঁসের কথা। মানুষ। মানুষকে নিয়ে এল সব শিল্পের কেন্দ্রস্থলে। ফিউদাল যুগে গির্জা মানুষকে করে রেখেছিল ঈশ্বর ও শয়তানের পদতলে পিষ্ট কীট। রেনেসাঁস ফিবিয়ে দিল মানুষের আত্মসম্মান। ইতালি থেকে উঠল সেই ঝড, মাকিযাভেলিব গদ্যে আর পেত্রার্কাব কাব্যে আব গালিলেও গালিলাইদেব জ্যোতির্বিজ্ঞানে। শেক্‌স্‌পিয়াবেব নাটক রেনেসাঁসেব বিষাণধ্বনি।

সমা। (ব্রেখ্‌টকে)। কিন্তু আপনি তো কখনই দর্শককে চবিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে আহ্বান জানান না, এমনকী ইতিবাচক নায়কের সঙ্গে নয়।

ব্রেখ্‌ট্‌। না, আমাব কৌশল অন্য, কারণ আমরা ১৬০০ সালের লন্ডনে বাস করছি না। আমি নাটকের ঘটনা ও চবিত্রকে দর্শক থেকে দূবত্বে স্থাপন করতে চাই। যাতে দর্শক বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিচার কবতে পাবে। আমাব থিয়েটাব ডাইড্যাকটিক্‌। নাটক দেখে দর্শককে ঠাণ্ডা মাথায় হিশেব কবতে হবে—অমুক চরিত্র এই পথে গেল বলে তার সর্বনাশ হল ; পাশাপাশি অন্য পথ ছিল, সেটা ধরলে সে সফল হত। নইলে যা সম্পূর্ণ সমাজবিরোধী তাকেও তো মঞ্চে খুব চিত্তাকর্ষক কবে তোলা যায়। মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার একটু আগে বলেছেন, ক্রিমিনালরা সৎলোকদের চেয়ে থিয়েটারে ঢের বেশি আকর্ষণীয়। আমি একমত। শুধু এইটুকু জুড়তে চাই, থিয়েটারে আমরা সমাজবিবোধীকে অবশ্যই দেখাব যখন সমাজ সেই সমাজবিরোধীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে। সমাজবিরোধীকে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিশেবে থিযেটারে আনবার অধিকাব আমাদের আর নেই। এখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিশ্ব জুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব পালা চলছে। এখন সমাজবিরোধীব জন্ম কোত্থেকে হয়, কী তাব কুষ্ঠি-ঠিকুজি, কী তার ক্রিয়াকাণ্ড সবই আমবা জানি। সেসব সুদ্ধু সমাজবিবোধীকে মঞ্চে তুলতে হবে, যাতে তাকে নিয়ন্ত্রিত কবাব, প্রয়োজনবোধে তাকে হত্যা করাব পথটাও দর্শক দেখতে পায়। অভিনেতাকে শ্রেণীসংগ্রামে অংশ নিতে হবে। যুধ্যমান দুই শ্রেণীর ঊর্ধ্বে কেউ দাঁড়াতে পাবে না। কাবণ মানবজাতির ঊর্ধ্বে কেউ দাঁড়াতে পারে না। একমাত্র দর্শক ও নাটকের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন দ্বারা নাটকেব পেছনে যে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় আছে আমি তা দর্শকদের নজরে আনতে পারি। নইলে আমার নাটক সমাজবিরোধীকে বা বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমর্থন কবে বসবে।

শেক্‌স্‌। আমি আপনার কথা বুঝতে পাবছি না। আমার তো মনে হয় ঠিক উলটোটাই সত্যি। ক্রিমিনাল চরিত্রের মধ্যে দর্শককে সাময়িকভাবে ডুবিয়ে না দিলে ওবা কোনোদিনই

ক্রিমিনালকে বিশ্লেষণ করতে পারবে না। লোকে বলে আমার এডমন্ড ও ম্যাকবেথ চরিত্র মানুষের কুটিলতা ও ক্ষমতা-লোলুপতাকে সূর্যের আলোয় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয় প্রথমে এসব চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হলে তবে দর্শক বুঝতে পাবে এরা কী ভীষণ। প্রথমে আবেগে আপ্লুত হলে তবে খোলে বিশ্লেষণী দৃষ্টি।

যুবক ১। এ কথার যাথার্থ্য আছে। শুনতে পাই ইয়োরোপে আবার হিটলারকে হিরো বানাবার চেষ্টা চলছে। খুনি এস্-এস্ বাহিনীর অনুকরণে কালো উর্দি পরছে একদল যুবক ; বাহুতে ঘৃণিত স্বস্তিকা চিহ্ন আঁটতেও ভুলছে না। কেন? কারণ হিটলার ও ফ্যাশিবাদকে নিয়ে গভীর অধ্যয়ন হয়নি। মানুষের বিবেক অবশ্যই জাগ্রত হয়েছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের চলচ্চিত্র দেখে, কিন্তু সে-বিবেক আবার ঘুমিযে পড়েছে। হিটলারেব অভ্যুত্থানকে ভূমিকম্প বা বন্যার মতন একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-গোছের কিছু ভেবে নিয়ে লোক নিশ্চিন্ত হচ্ছে। মানুষের মানসিক স্থৈর্য ছিন্নভিন্ন করে দেওয়াব মতন নাটক-চলচ্চিত্র-উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি।

ব্রেখ্ট্। তা ছাড়াও রয়েছে মার্কিনদের সোভিয়েত-বিবোধী চক্রান্ত—নাৎসিবাদকে উস্কে দিচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই।

যুবক ২। একটা চলচ্চিত্র দেখেছিলাম, নাম 'দা প্রোডিউসার্স'। দুই মার্কিন কোটিপতি একটা নাটক করতে চাইছে যেটাতে লোকসান হবেই। আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য তাদেব দরকার একটা শিওর ফ্লপ। অনেক ভেবেচিন্তে তারা ঠিক করল হিটলারকে নায়ক করে একটা মিউজিকাল করলে বক্স্ অফিস খাঁ খাঁ করবে। হল উলটো। পুরো নিউ ইয়র্ক ভেঙে পড়ল। সুপারহিট নাটক। আয়কবেব অঙ্কটা আরো বেড়ে গেল।

যুবক১। শুধু নাৎসিদের কথাই বা বলি কেন? দুশো বছর ব্রিটিশ রাজত্ব করে গেল ভারতে। ভীষণ সব উৎপীড়করা এল ইংলন্ড থেকে। রাজবন্দীদের ওপর দৈহিক নির্যাতনের কত কৌশল প্রয়োগ কবল। লুণ্ঠন করে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশকে দরিদ্রতম দেশে পরিণত করে গেল—ওয়াবেন হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, ওয়েলেস্লি, ডালহৌসি, কার্জন—টেগার্ট, গোল্ডি, এলিসন, প্রেডি, উডকক। কজনের ভীষণ মানসিক জগৎ দেখেছি আমরা উপন্যাসে, গল্পে নাটকে? কাজে কাজেই না চট করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বলে ফেলেন—স্বাধীন ভারতের চেয়ে ব্রিটিশ জমানা ভালো ছিল।

যুবক ২। যারা ওই বৃটিশের হুকুমে দেশকে দু-টুকরো কবল, সেই ১৯৪৭ সালেব অগস্ট ক্রিমিনালদেরই বা বিশ্লেষণ হল কই? হলে আজ তাদের বংশধররা দেশের সিংহাসনে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসতে পারে?

সমা। হের ব্রেখ্ট্ হিটলারকে নেতিবাচক নায়ক করে নাটক লিখেছিলেন—'আর্টুরো উই-এর নিবার্য উত্থান।'

ব্রেখ্ট্। হ্যাঁ, সেখানে হিটলার বা উই হচ্ছে শিকাগোর এক দস্যু সর্দার। এইভাবে হিটলারকে জর্মন দর্শক থেকে দূরে স্থাপন করেছিলাম, নইলে হিটলার বলতে জর্মন জনগণের

চোখে এত মৃতদেহ, এত থেঁতলানো মুখ, এত যুদ্ধের বিভীষিকা ভেসে ওঠে যে স্থির মস্তিষ্কে হিটলারের বিচার তারা করতে পারত না। শিকাগোর গুণ্ডা আর্টুরো উই-এর রূপে তাকে দেখলে তারা বুঝতে পারবে হিটলার আসলে কী। সে আসলে বুর্জোয়ার অতি শস্তা, অতি ভীরু এক ভাড়াটে মাস্তান। 'আর্টুরো উই' নাটকের একটি দৃশ্য দেখলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারব।

আর্টুরো উই

দৃশ্য ১১

[গ্যাবেজ। বাত্রি। বৃষ্টিব শব্দ। এর্নেস্টো রোমা এবং যুবক ইনা, পশ্চাতে বন্দুকধাবী দুর্বৃত্তেব দল।]

ইনা। একটা বাজে।

রোমা। নিশ্চয়ই কোনো বাধা পড়েছে।

ইনা। ও শেষে দ্বিধায় পড়েনি তো?

রোমা। বিচিত্র নয।
সাগরেদদের জন্য আর্টুরোর বড়ো পেয়ার।
নিজেব জান দিতে পারে তাদের বাঁচাতে।
গিভোলা আব গিবি-ব মতো ছুঁচোর জন্যেও
ওর মনে দ্বিধা। তাই অযথা কালক্ষয় ;
নিজের মনে লড়াই। দুটো বেজে যাবে,
তিনটেও হতে পারে ওর কাজ সাঙ্গ হতে।
তাই ভেবো না। সে আসবেই। নিশ্চয় আসবে সে।
আমি ওকে চিনি, ইনা। যখন দেখব
গিরির লাশটা কার্পেটে গড়াচ্ছে, নাড়িভুঁড়ি ঝুলছে
পেট থেকে, তখন মানব জবর গর্ত দেখা গেল একটা।
আর বেশি দেরি নেই।

ইনা। বৃষ্টির বাতে স্নায়ুতে বড়ো চাপ পড়ে।

রোমা। এবকম রাত আমাব বড়ো প্রিয়।
রাত্রির মধ্যে যা কৃষ্ণতম
গাড়ির মধ্যে যা দ্রুততম
আব বন্ধুর মধ্যে যে সব চেয়ে দৃঢ়।

ইনা। ওকে কতদিন চেনো?

রোমা। আঠেরো বছর।

ইনা। বহুদিন।

এক বন্দুকধারী (এগিয়ে আসে)। ছেলেরা হুইস্কি চাইছে।

রোমা। না, না, নেশা নয়, শান্ত চাই ওদের আজ রাতে। [দেহরক্ষীরা ক্ষুদ্রকায় এক ব্যক্তিকে ভেতরে নিয়ে আসে।]

ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি (হাঁফাতে হাঁফাতে।) চৌমাথায় ব্যাপার সন্দেহজনক!
পুলিস হেড-কোয়ার্টারের সামনে দুটো সাঁজোয়া গাড়ি,
পুলিসে পুলিসে ঠাসা।

রোমা। ঠিক আছে! বুলেট-প্রুফ দরজা
নামিয়ে দাও। যদিও ওই পুলিসেব অন্য ব্যাপার
তবু পরে চোখ খোলার চেয়ে
দূরদৃষ্টি থাকা ভালো।
(ধীরে ধীরে একটা লোহার দরজা গ্যারেজের প্রবেশপথ ঢেকে নেমে আসে।)

ইনা (মাথা নাড়ে)। তামাক একটা মজাব জিনিস।
যখন কেউ সিগারেট টানে
তাকে শান্ত দেখায। আর যদি
কোনো শান্ত দেখতে লোকেব অনুকবণ করে।
সিগাবেট ধরাও, নিজেকে শান্ত হতে হবে।

রোমা। (হেসে)। তোমাব হাতটা বাড়াও।

ইনা। (তথাকরণ)। এ হাত কোনো কম্মের নয়।
আমার হাতটা কাঁপছে।

রোমা। এটা দোষের কিছু নয়।
আমার মুষ্টিযোদ্ধা লাগবে না।
ওদের কোনো অনুভূতি নেই।
ওরা ব্যথা পায় না, পারে না ব্যথা দিতেও।
গুরুতব ভাবে নয়। তাই কাঁপো যত খুশি।
স্টিলেব কম্পাসের কাঁটা দেখেছ,
মেরুতে পৌঁছোবাব পথে কেঁপে কেঁপে চলে
তোমার হাতও খুঁজছে মেরুর পথ।

চিৎকার (একদিক থেকে)। পুলিসের গাড়ি চার্চ স্ট্রীট ধরে চলে আসছে সোজা।

রোমা। (উৎসুক ভাবে)। থামেনি কোথাও?

কণ্ঠস্বর। না।

জনৈক বন্দুকধারী (ভিতরে আসে)। আলো নেবানো দুটো গাড়ি মোড় ঘুরছে।

রোমা। ওরা আর্টুরোর অপেক্ষায় আছে।
গিভোলা আর গিরি বসে আছে ওৎ পেতে।
সে সোজা গিয়ে পড়বে ওদের খপ্পরে।
ওকে বাঁচাতে হবে যেমন করে হোক।

চলো।

জনৈক বন্দুকধারী। সেটা আত্মহত্যা হবে।

বোমা। আত্মহত্যা বলো যদি আত্মহত্যাই সই।
নরক! নরক! আঠেরো বছরের দোস্তি।

ইনা (দৃঢ়কণ্ঠে চেঁচিয়ে)। দরজা হঠাও! মেশিনগান রেডি?

জনৈক বন্দুকধাবী। রেডি।

ইনা। দরজা উঠে যাচ্ছে।
[বুলেটপ্রুফ দবজা ধীবে ধীবে ওপরে উঠে যায। উই-আর গিভোলা ঝটপট প্রবেশ কবে, তাদেব পিছনে দেহরক্ষীরা।]

বোমা। আর্টুরো!

ইনা। (চাপা কণ্ঠে)। হুঁ, সঙ্গে গিভোলা।

বোমা। কী ব্যাপার?
আর্টুবো, দোস্ত, তুমি চিন্তায ফেলেছিলে!
(উচ্চহাস্য কবে) নবক! নবক! যাক সব ঠিক আছে।

উই (কর্কশকণ্ঠে)। ঠিক থাকবে না কেন?

ইনা। আমরা ভেবেছি কোনো ঝামেলা বেধেছে।
আমি কিন্তু তুমি হলে, গুরু,
জড়িয়ে ধরতাম বন্ধুর হাত।
জান কবুল করে বোমা আমাদেব নিযে যাচ্ছিল
তোমাকে বাঁচাতে। বলো বোমা?
[উই নিজের হাত বাড়িয়ে বোমাব দিকে এগিয়ে যায। রোমা সহাস্যে সে হাত জড়িয়ে ধরে। সেই মুহূর্তে, রোমা যখন নিজের হাতে পিস্তলে হাত পৌঁছতে অসমর্থ, গিভোলা তাব কোমবেব কাছে থেকে বোমার দিকে গুলি চালায়।]

উই। সবাইকে নিয়ে যাও ওই কোণে।
[রোমাব সাঙ্গপাঙ্গরা বিমূঢ হয়ে দাঁড়িযে থাকে। ইনাকে সামনে রেখে তাদের সবাইকে ঘবের কোণে ঠেলে নিয়ে যাওযা হয়। গিভোলা রোমাব উপব ঝুঁকে পড়ে। বোমা মেঝেতে পড়ে আছে।]

গিভোলা। এখনো বইছে নিঃশ্বাস।

উই। শেষ কবে দাও।

(দেওয়ালে সাবিবদ্ধ লোকগুলিব প্রতি)
আমার বিরুদ্ধে তোদেব জঘন্য চক্রান্ত ফাঁস হযে গেছে।
ডগস্‌বোবোকে খতম করবি সে মতলবও ফাঁস।
তোদের ঠিক সময়মতো কব্জা কবেছি।
বাধা দেবাব চেষ্টা বৃথা।

আমার বিরুদ্ধে মাথা তোলাব
মজা দেখতে পাবি। বেজম্মার দল!

গিভোলা। সবাই সশস্ত্র।
(রোমাকে দেখিয়ে)
ওর হুঁশ ফিরছে। এখুনি বুঝবে
বেহুঁশ থাকাই ছিল ভালো।

উই। আমি আজ রাতে থাকব
ডগ্‌স্‌বোরোর গ্রামের বাড়িতে।
(সে দ্রুতপদে প্রস্থান করে।)

ইনা। বেইমানেব দল! বেজম্মা ছুঁচোর দল!

গিভোলা। (উত্তেজিত ভাবে)। ওদের পাওনা চুকিয়ে দাও।
[মেশিনগানের গুলিতে দেওয়ালে সারিবদ্ধ লোকেরা ধরাশায়ী হয়।]

রোমা (চেতনা ফিরে পেয়ে)। গিভোলা! হা ভগবান।
(চিৎ হয়, তার মুখ খড়ির মতো শাদা) ওখানে কী হয়েছে?

গিভোলা। কিছু না। কটা বেইমানের শাস্তি হল।

রোমা। কুত্তার বাচ্চা! ওরা আমার লোক।
কী করেছিস ওদেব?
(গিভোলা নিরুত্তর।)
আর্টুরো কোথায়? খুন করেছিস তাকে?
আমি জানতাম! (তাকে মেঝেতে খোঁজে।)

গিভোলো। একটু আগে চলে গেছে সে।

রোমা (তাকে দেওয়ালের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়)। ঘেয়ো কুত্তার দল!

গিভোলা। (শান্ত কণ্ঠে)।
তুমি বলো আমার পা দুটো ছোটো, আমি বলি তুমি বুদ্ধিতে খাটো।
তোমাব সুন্দর পা দুটো নিয়ে এখন দেওয়ালের দিকে হাঁটো।

ব্রেখ্‌ট্‌। এ নাটক আমাদের দেখাচ্ছে হিটলাবের অভ্যুত্থান রোধ করা সম্ভব ছিল যদি জর্মন জনতা রুখে দাঁড়াত। হিটলারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল জর্মন জনতাই। গুণ্ডামিকে অহেতুক গুরুত্ব দিয়েছিল তারা। মাস্তানকে ভয় পেলে মাস্তানই হয়ে ওঠে দেশের একচ্ছত্র নায়ক।

শেক্‌স্‌। আপনার নাটকে আর্টুরো উই-এর মানস জগৎটা ধরতে চেষ্টা করেননি?

ব্রেখ্‌ট্‌। সেটা তো আমার নাটকের বিষয় নয়।

শেক্‌স্‌। আমার মনে হয় তার ক্ষমতালোলুপতা অবশ্যই আপনার নাটকের বিষয়, সেটা তার মনস্তাত্ত্বিক জগতের অঙ্গ। আমার মনে হয় আর্টুরো উই-এর একনিষ্ঠ শক্তি উপাসনাকে বুঝতে হলে তার মানসের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে। আমি

চেষ্টা করেছিলাম ম্যাকবেথের ক্ষমতালিপ্সার পেছনে তার যে বিদীর্ণ বিক্ষুব্ধ মনোজগৎ সেটা ধরার। এখানে কেউ আছেন লেডি ম্যাকবেথের পার্টটা জানেন?

যুবতী। হ্যাঁ।

[মূল ইংরেজিতে 'ম্যাকবেথ'-এর টেম্প্টেশন দৃশ্য, ছোরার দৃশ্য ও ডাংকান-এর হত্যাদৃশ্য অভিনীত হয়।]

ব্রেখ্ট্ (হাততালি দিয়ে)। কী অসাধারণ কাব্য। কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি! কিন্তু মিস্টার শেক্স্পিয়ার, আমরা ব্যক্তি ম্যাকবেথকে চিনতে পারলাম, বুঝলাম যে ক্রিমিনালরাও দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়, দ্বিধাগ্রস্ত হয়, যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু এটা বুঝলাম না ক্রাইমের জন্ম কোথায়। আপনার নাটক দেখে মনে হল অপরাধ জন্ম নেয় মানুষের মনে। অপরাধ বা মহৎ কাজ সব মানুষের সৃষ্টি।

শেক্স্। হ্যাঁ, তাই তো বলে এসেছি সব নাটকে।

যুবক ২। কিন্তু সেটা আপনাদের কালের একটা ধারণা, সেটা আমাদের কালে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। অপরাধের জন্ম সমাজব্যবস্থায়। মানুষের মনের ওপর সমাজব্যবস্থার প্রভাবে। মানুষের মনকে বিকৃত ও অপরাধপ্রবণ করে দেয় তার পারিপার্শ্বিক বুর্জোয়া সমাজ। মিস্টার ব্রেখ্টের নাটকে অবশ্যই আমরা আর্টুরো উই-এর মানসিক যন্ত্রণা দেখিনি। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজব্যস্থাকে দেখতে পেয়েছি। নিজেদের বাঁচাতে গুণ্ডার দল পরস্পরকে মেশিনগান চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করছে। এটাই বুর্জোয়া সমাজের আসল উলঙ্গ চেহারা। ভদ্রতা ও নানা নীতিবাক্যের ছদ্মবেশ খুলে ফেললে এটাই হচ্ছে নির্ভেজাল পুঁজিবাদ।

ব্রেখ্ট্ (যুবক ২কে)। তুমি যে বললে অপরাধের জন্ম সমাজব্যবস্থায়, মানুষের মনকে বিকৃত ও অপরাধপ্রবণ করে তোলে সমাজব্যবস্থাব প্রভাব—এটা কিন্তু পুরোপুরি মার্কসবাদ-সম্মত হল না। তোমাব কথা শুনে মনে হচ্ছে মানুষের মনের কোনো প্রভাবই নেই পাবিপার্শ্বিকের ওপর। মানুষের মন যেন নিষ্ক্রিয় আর পারিপার্শ্বিকই শুধু ক্রিয়াশীল। মার্ক্স্ এংগেল্স্ একথা বলেননি। এ হচ্ছে যান্ত্রিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে মন এবং পারিপার্শ্বিক পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল, পরস্পরের ওপর প্রভাবশীল। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুই-ই ঘটতে থাকে। সুতরাং শেক্স্পিয়াররা যে মানুষের মনকে সব ঘটনার স্রষ্টা করেছিলেন সেটাকে মিথ্যা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না কিছুতেই। বলা যায় সেটা আংশিক সত্য, খণ্ডিত সত্য। সে সত্য রেনেসাঁসের চাহিদা মিটিয়েছিল, কিন্তু আজকে সর্বহারার যুগের থিয়েটারে সেই দর্শনের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে যায়। কারণ আজকের থিয়েটার যাদের জন্যে হচ্ছে তারা শ্রমিকশ্রেণী। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে নিযুক্ত থেকে তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছে।

শেক্স্। কি জানি বাবা!

ব্রেখ্ট্। কবিদের এককালে মনে করা হত আধপাগলা, আপনভোলা দৈবজ্ঞ বিশেষ। তাঁরা

নাকি এক ঝলক দৃষ্টিপাত করেই মানুষ ও সমাজেব অন্তর্নিহিত সত্যটা উপলব্ধি করে ফেলেন। তাঁরা নাকি গান করেন যেমন পাখি গান কবে মনের আনন্দে। কিন্তু প্রোলেতাবীয় যুগে কবিকে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি জানতে হবে। পাখির অকারণ গানের আর চাহিদা নেই। আমি একথা বলছি না যে মাছভাজাব স্বাদ নিয়ে কোনো কবি সুন্দব কিছু লিখলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব, ভিটামিন সম্পর্কে পড়াশোনা কবেছেন কী? বা নৌকো বেয়ে যাওয়ার আনন্দটা যদি কোনো কবি তাঁর কবিতায় ধরেন আমি তাঁকে শুধোব না তিনি নৌবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন কিনা। কিন্তু থিয়েটারে প্রচণ্ড সব আবেগকে রূপ দিতে হবে, এমন সব ঘটনাকে উপস্থিত করতে হয যা বহু দেশেব ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়েছে। ধরুন ক্ষমতালোলুপতা। কবি আজকেব দুনিয়ার ক্ষমতাব দ্বন্দ্বকে তার জটিলতা-সমেত কী করে ধববেন? নায়ক যদি বাজনীতিক হয়, তবে কবিকে বুঝতে হবে রাজনীতি কীভাবে চলে। একথা বলে লাভ নেই নাট্যকারকে সব পর্যবেক্ষণ করে শিখতে হবে। বছরেব পব বছর চোখ বিস্ফারিত কবে ঘুরে বেড়ালেও কিছুই চোখে পডবে না, কেননা রাজনীতি ও ব্যবসার সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি কাজ করে গোপনে, লোকচক্ষুব অন্তরালে। নাৎসিদেব সংবাদপত্র ফোল্‌কিশের বেওবাখ্‌টেব কী করে প্রতিষ্ঠিত হল বা স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি কী করে গড়ে উঠল এসব অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। তেমনি একজন লোক খুন কবল। বলা হয়ে থাকে তার মানসজগতেব অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত কবলেই খুনেব উদ্দেশ্যটা বোঝা যাবে। আমি একথায় আস্থা বাখতে পারছি না। আধুনিক মনস্তত্ত্ব এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন সূত্র আমাব হাতে গুঁজে দেয় মানুষ সচেতনভাবে যা চিন্তা করে আব তার অবচেতনে যা চলে দুয়ের মধ্যে অনেক সময়েই কোনো সামঞ্জস্য নেই। তার ওপর যদি সমাজবিজ্ঞানের অপরাধতত্ত্ব পড়ি, বা অর্থনীতি, বা ইতিহাস, তখন বুঝি একজন খুনির মানসিকতা বুঝতে আমাকে আবো আরো গভীরে যেতে হবে।

যুবক ২। ফবাসি চলচ্চিত্রকার জাঁ-লুক গোদার চেয়েছিলেন নাৎসি বন্দীশিবির নিয়ে একটা ছবি করবেন যেখানে উনি শিবিরটাকে দেখাবেন পুঁজিবাদী সংগঠনের একটি চূড়ান্ত নিদর্শন হিশেবে। খটখট করে টাইপরাইটার চলছে, কেরানিরা মাথা গুঁজে লেজার লিখছে। হিশেব হচ্ছে আজকে কত হাজার শবদেহকে চুল্লিতে পোড়ানো হয়েছে, তাদের মুখ থেকে কত শো সোনার দাঁত বেরিয়েছে, তাদেব চুল বেচে কত মুনাফা হবে, তাদের চামড়া দিয়ে কত বই বাঁধিয়ে কত লাভ হবে, তাদের চর্বি থেকে কত ডজন সাবান হবে। বুর্জোয়া সাংগঠনিক দক্ষতা!

ব্রেখ্‌ট্‌। বাঃ চমৎকার আইডিয়া! ছবিটা হয়নি?

যুবক২। না। প্রযোজক পাওয়া যায়নি।

সমা। কিন্তু একটা কথা বলুন। আপনারা দুজনেই সারা জীবন ধরে এত হিংস্র ঘটনা দেখিয়ে গেলেন কেন? অন্যভাবে কি মানুষকে মানুষ বা সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করা যেত না?

শেক্স্‌। না, যেত না। মঞ্চের হিংস্র বক্তাক্ত ঘটনা মানুষেব সরল বিশ্বাসগুলিকে টলিয়ে দেয়। মানুষ বিশ্বাস করতে ভালোবাসে যে ক্রিমিনাল নির্মমতাব সীমা আছে। সে বিশ্বাস করতে চায ঈশ্বর আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে এত পাপ সইবে না। মঞ্চে রক্তাক্ত ঘটনা দেখতে দেখতে সে বোঝে এ সব মিথ্যা স্তোকবাক্য। সে মানসিক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। সে সংসারেব সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়।

সমা। তাহলে আজকেব বাজে ডিটেকটিভ নভেল এবং শেক্স্‌পিয়ারের নাটকের মধ্যে পার্থক্য কী?

ব্রেখ্‌ট্‌। ডিটেকটিভ নভেলকে 'বাজে' বলায আমি মনে বড ব্যথা পেলাম। আমি বোজ একটা কবে আস্ত থ্রিলার বা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে থাকি। তা ওসবেব সঙ্গে মহান শিল্পেব পার্থক্যটা বুঝতে পাবছেন না? ওসব বই পাঠকের মনে ঘা মারে ঠিকই, কিন্তু বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে অক্ষত বেখে। শেষ পর্যন্ত ডিটেকটিভ জিতবেই। খুনিকে সে ধবে ফেলবেই। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আপনি ধবে নিতে পাবেন অন্যাযেব পরাজয হবেই, ন্যায়েব জয় হবেই। বুর্জোযা শাসনব্যবস্থায অপবাধী কখনই পালাতে পারে না। সুতরাং এই সমাজব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ, পাঠক নাবালক থেকে একেবারে শিশুব পর্যাযে নেমে যায, ওখানে কখনো এমনটা ঘটতে পারে না যে বদ লোকেবা চক্রান্ত কবে বিষ মাখানো তলোয়াব দিযে হ্যামলেটকে মেরে ফেলবে। বা উদ্ধত ইয়াগোব চক্রান্ত সর্বতোভাবে সফল হবাব পরে সে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করবে 'What you know, you know, from this time forth, I ne'er will speak Word ' শেক্স্‌পিযাবেব violence সমাজকে ধসিয়ে দেয, এ সমাজে মানুষের যে আস্থা তার মূলে কুঠাবাঘাত কবে। এই অর্থে শেক্স্‌পিযারের নাটক এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন কবে আসছে আজ ৪০০ বছব ধরে।

শেক্স। তাছাড়া আবো একটা পার্থক্য মনে হয চোখে পড়ে। আমাদেব কালে বহু নাটকই লেখা হচ্ছিল ইংলন্ডে যার মধ্যে গুপ্ত হত্যা, বিষপ্রয়োগ, রক্তাক্ত সংঘর্ষেব ছড়াছড়ি। যেমন টমাস কিড, ক্রিস মার্লো, গ্রীন, ওযেবস্টাব—সবাই লিখছিলেন ক্রাইম নিয়ে। কিন্তু বোধ হয় শুধু তখনই ক্রাইমভিত্তিক নাটক মহৎ শিল্প হয়ে ওঠে, শুধু দর্শক নয়, শুধু নধরকান্তি নিশ্চিন্ত বড়লোকেরা নয, শুধু গির্জাব সবজান্তা পাদ্রিবা নয়—স্রষ্টা নিজেও সেই ক্রাইমের ভয়াবহতায় শিহরিত হন। নাট্যকাব নিজেও মানুষেব নির্মমতার সীমাহীনতা দেখে বিহ্বল হযে পড়েন। সেটা নাটকের মধ্যে স্পষ্ট অনুভূত হয, মানুষেব প্রতি ভালোবাসা থাকলে মানুষেব নীচতায় নাট্যকার পীড়িত হতে বাধ্য। ইস, What a piece of work is man! আব সে এমন জঘন্য কাণ্ড করতে পারে? ডজন ডজন হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে গেলেই তো হল না।

সমা। আপনার সমসাময়িক অন্য নাট্যকারের তুলনায় আপনাব নাটকে খুনেব সংখ্যা অনেক কম।

শেক্‌স্‌। সংখ্যা দিয়ে কী হবে? আসলে ধরতে হবে খুনের ভীষণতা, তার ধ্বংসাত্মক স্বরূপটা!

ব্রেখ্‌ট্‌। অনেক সময়ে আপনারা বুর্জোয়া সমালোচকরা যেটা বুঝতে পারেন না, সেটা হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর ডিটেকটিভ-উপন্যাসে ঘটনাটাই বড় কথা। যে-ক্রিমিনাল সেটা ঘটাচ্ছে তাকে আমরা প্রায় দেখিই না। তার কী বক্তব্য, তার সমাজবীক্ষা কী, সমাজ-পরিবার-আত্মীয় সম্পর্কে সে কী ভাবছে, এসবের লেশমাত্র ডিটেকটিভ উপন্যাসে পাই না। ব্যতিক্রম হয়তো স্যার আর্থার কোনান ডয়েল যাঁর 'স্টাডি ইন স্কারলেটে' দেখি প্রতিশোধ-বাসনা ক্রমে জমাট বেঁধে ভয়ংকর হত্যালিপ্সায় পরিণত হচ্ছে। তবে কোনান ডয়েল তো বাজারি ডিটেকটিভ লেখক নন। শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকেও দেখি ক্রিমিনালদের চিন্তার প্রক্রিয়াটা, স্বগতোক্তির মাধ্যমে অথবা সহযোগীর সঙ্গে নিভৃত আলোচনায়। সেই চিন্তাই অবশেষে ফেটে পড়ে রক্তাক্ত ঘটনায়। নাটকের স্বল্প পরিসরে এই প্রক্রিয়াটাকে ধরতে গিয়ে নাট্যকারকে সব কিছু দ্রুত ঘটাতে হয়। বাস্তব জীবনে চিন্তা থেকে ভায়োলেন্‌সে যেতে যে সময় লাগে তার চাইতে অনেক কম সময়ের মধ্যে নাটকে সে প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। তাই সে দর্শকমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ারে ক্রিমিনালের চিন্তাটাই মুখ্য। কতরকম চমকপ্রদ যুক্তি অজুহাত বিশ্লেষণ দিয়ে এ সমাজের নৈতিক ভিত্তি খণ্ডন করে সে নিজের সমাজবিরোধিতাটাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তারপর ঘটে ক্রাইম। এখানেই মহৎ শিল্পের স্বাতন্ত্র্য।

শেক্‌স্‌। আমাদের সময়ে সেটাই মনে হয়েছিল—আমাদের সবচেয়ে দরকারি কাজ—মানুষকে নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া। গির্জা অনবরত চোখ রাঙিয়ে মানুষকে সঙ্কুচিত বিড়ম্বিত করে রেখেছিল—এটা পাপ, ওটা উচিত নয়। উচিত-অনুচিতের বোঝা বয়ে বয়ে মানুষের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। আমরা বলতে চেষ্টা করছিলাম, উচিত-অনুচিত সব মানুষই সৃষ্টি করেছে, সুতরাং মানুষই পারে তা লঙ্ঘন করতে। পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই।

ব্রেখ্‌ট্‌। যে নৈতিকতার বন্ধন আপনারা ছিন্ন করেছিলেন সেগুলি ছিল ফিউদাল নৈতিকতা। রেনেসাঁস ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম জয়। তার প্রয়োজন ছিল ফিউদাল নৈতিকতাকে চূর্ণ করা। রেনেসাঁসের প্রথম মহান তাত্ত্বিক মাকিয়াভেলি প্রথমেই আহ্বান জানিয়েছিলেন—উচিত-অনুচিতের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি অস্বীকার কর, তারা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। শেক্‌স্‌পিয়ারদের অনৈতিকতার ঝড় বিশ্ব জুড়ে এমন মানসিক পালাবদল শুরু করে দিল যে পরে বুর্জোয়ারাই ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং হেগেলের নাট্যশাস্ত্র মারফৎ নৈতিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগল। এবার অবশ্য বুর্জোয়া নৈতিকতা। আমার 'মেসিংকাউফ সংলাপ' বইয়ে আমি লিখেছিলাম রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সর্ব ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নতুন চেতনার উন্মেষে মানবপ্রতিভা নানা পরীক্ষা চালাচ্ছিল

সর্বক্ষেত্রে—রাজনীতিতে মাকিয়াভেলি, জ্যোতির্বিজ্ঞানে গালিলেও, ছবি আঁকার নতুন নতুন রং উদ্ভাবনে মিকেলাঞ্জেলো, এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নাটক উদ্ভাবনে শেক্‌স্‌পিয়ার। শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক পড়ে মাঝে মাঝে মনে হয় একাধিক বিকল্প শেষাঙ্ক যেন পাশাপাশি লিখে গেছেন মহাকবি যা থেকে যে কোনো একটি বেছে নেবেন অভিনেতারা। সবগুলি পাশাপাশি ছেপে দেবার অভিলাষ হয়তো তাঁর ছিলই না। হ্যামলেটের শেষ হবে কি হ্যামলেটের মৃত্যুতে, না ফর্টিনব্রাসের প্রবেশে? 'কিং লিয়ার' নাটক মুদ্রিত নাটক অনুযায়ী অন্তত তিনবার তিনভাবে শেষ হতে পারে। বর্তমানে যেখানে শেষ যবনিকা তার আগেই তিনবার চরম অনিবার্যতার মাঝে নাটকে সমাপ্তি অনুভূত হয়। 'ম্যাকবেথ' নাটকে বড়ো বড়ো দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে এ বোঝা যায় স্পষ্ট; যথা লেডি ম্যাকবেথের সন্তান থাকার প্রশ্নের উত্তর নেই নাটকে; তৃতীয় হত্যাকারীর আচমকা উপস্থিতিব নেই কোনো যুক্তি। কখন বাদ গেছে এসব দৃশ্য? স্পষ্টতই রিহার্সালে। নানাভাবে রিহার্সাল দিয়ে শেক্‌স্‌পিয়ার হাতে-কলমে দেখছিলেন কোন পথে নাটকটাকে এগিয়ে নিলে ভালো হয়। থিয়েটার ছিল শেক্‌স্‌পিয়ারদের লেবরেটরি।

সমা। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে শেক্‌স্‌পিয়ার রোজ একটা নতুন দৃশ্য লিখে এনে রিহার্সালে ফেলতেন।

ব্রেখ্‌ট্‌। ঠিক তাই। অকাতরে ওঁরা তখন পুবোনো থিয়েটারকে ভাঙছেন, নতুনকে গড়ছেন, বহুবার ব্যর্থ হচ্ছেন, এক-আধবার পাচ্ছেন অভাবনীয় সাফল্য। কিন্তু কখনোই ওঁদের থিয়েটারে কোনো বাঁধা ফর্মুলা ছিল না। ছিল না অমোঘ কোনো নিয়ম। সবটাই ছিল বাজিয়ে দেখা, এবং ভালো না লাগলে অকাতরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। বিজ্ঞানসাধনায় যেমন প্রমাণোর্ধ্ব কোনো সূত্র থাকে না, তেমনি ছিল না শেক্‌স্‌পিয়ারের থিয়েটারে। কোনো তত্ত্ব, কোনো পূর্বস্বীকৃত থিওরি অনুযায়ী ওঁরা নাটক করেননি। ওঁবা নাটক নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করেছেন যেমন বসায়নবিদ করে থাকেন টেস্ট-টিউব থেকে টেস্ট-টিউবে ঢালাঢালি করে। শেক্‌স্‌পিযার ও গালিলেও শুধু সমসাময়িক নন, সমধর্মী। মিস্টার শেক্‌স্‌পিযার বলবেন আমাব অনুমান সত্য কিনা।

শেক্‌স্‌। ব্যাপারটা কতকটা তাই বটে। আজকাল দেখছি তত্ত্বকথার বড়ো ছড়াছড়ি—দু-চারটে নাটক লিখেই একটা আস্ত নতুন নাট্যশাস্ত্র রচনা করে ফেলা হয়। এবং অন্য সব তত্ত্ব ভুল এই কথাটা প্রমাণ করতে বসেন নির্দেশকরা। আমাদেব সময়ে একটাই তত্ত্ব ছিল—লোকে টিকিট কাটছে কিনা। না কাটলেই আমাদের চাকরি যেত।

ব্রেখ্‌ট্‌। অথচ ওই বকম সব জটিল নাটক লেখার হিম্মৎ তো ধরতেন আপনাবা—এবং তাও ওই রকম কবিতায় বাঁধা। আপনার নাটক পড়লে তো মনে হয় এর স্রষ্টা বেপরোয়া। কার ভালো লাগল না লাগল, কে বুঝল না বুঝল তাতে তাঁর বয়ে গেল।

শেক্‌স্‌। এটা ঠিক নয়। প্রতিটি লাইন দর্শকের কথা মাথায় রেখে লেখা। ওরা না বুঝলে আমার রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যেত।

ব্রেখ্‌ট্‌। সেটাই তো আমার বক্তব্য। দর্শক কতটা বুঝতে পারে তা নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন আপনারা। একটা নাটকে মুহূর্মুহু ঘটনা ঘটিয়ে হাততালি পেয়েছিলেন বলে সে পথেই সারা জীবন হাঁটেননি। দর্শকের চেতনার ওপর আপনাদের গভীব আস্থা ছিল। জটিল থেকে জটিলতর জিনিস পরিবেশন করতে করতে আপনারা শেষ পর্যন্ত দর্শককে এনে পৌঁছে দিয়েছিলেন গভীবতম দার্শনিক উপলব্ধিতে। কালানুক্রম-অনুসারে শেক্‌স্‌পিযারের নাটকগুলি সাজালেই দেখা যায় এই চমকপ্রদ বিস্ময়কর পরিবর্তন—'ষষ্ঠ হেনবি' বা 'রোমিও জুলিযেতেব' সারল্য থেকে 'টেমপেস্ট' নাটকেব অতলস্পর্শী গভীরতা।

সমা। তবে একটা কথা বলি মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার, আপনার নাটকে শুধু রাজা-রাজকুমার-বাজকুমারীদের আনাগোনা, বড়োলোকদেব কাববার। গবিবদেব দুনিযায় ওরা কেমন যেন খাপ খায না। আজকের দিনে ওদেব নিয়ে মাতামাতি আমাদের ভালো লাগবে কেন?

শেক্‌স্‌। ভালো না লাগলে পড়বেন না, আর কী বলতে পারি?

ব্রেখ্‌ট্‌। এটা একটা নিবেট মুখ্যুর মতন প্রশ্ন তুললেন আপনি। জানি এবকম কথা এখনো পাণ্ডিত্যেব বডাই কবা কিছু লোক বলে থাকেন। কিন্তু কথাটা কী? শেক্‌স্‌পিয়াবের চবিত্ররা রাজা না প্রজা, এ প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্ন হচ্ছে, তাবা পূর্ণ মানুষ কিনা। তাবা কী চাকরি করে একথা ওঠে কেন? প্রতি কালে নাট্যকাব তাঁব নিজেব কালের সবচেয়ে অগ্রসর মানুষদেব নিয়ে আসেন তাঁব নাটকে। শেক্‌স্‌পিয়ারের কালে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিন্তার বলিষ্ঠতায, কুসংস্কার-বিবোধিতায সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শিক্ষিত অভিজাতদেরই, ওই রাজা বাজকুমারদেবই, বিশেষত ইংলন্ডে। শেকস্‌পিয়ারের নাটকে সুতবাং তারাই ফিবে ফিরে আসবে এটাই তো স্বাভাবিক। বিপ্লবী শ্রমিক তো আর দেখেননি শেকস্‌পিযাব। তাই কোন জাদুবলে সৃষ্টি করবেন মহৎ সর্বহারা চরিত্র? আপনি তো মশাই আমার 'গালিলেও' নাটক সম্পর্কেও বলে বসবেন, ওতে শুধু রাজা পোপ পাদ্রিদেব ভিড়! বলবেন, গালিলেওকে শ্রমিক চরিত্র কবা হযনি কেন?

সমা। না, না, সেখানে তো আপনি ইতিহাসেব হাতে বন্দী।

ব্রেখ্‌ট্‌। আব শেক্‌স্‌পিয়ার ইতিহাসের হাতে বন্দী নন? যে বিপ্লবী শ্রেণীর তখনো জন্মই হয়নি, ইতিহাসকে কলা দেখিয়ে তাকে কী কবে নিয়ে আসবেন নাটকের প্রাঙ্গণে?

সমা। তবু বিদ্রোহ কি হয়নি শেক্‌স্‌পিযারের কালে? তাব ছবি কি ফুটে ওঠা উচিত ছিল না তাঁর নাটকে?

ব্রেখ্‌ট্‌। শেক্‌স্‌পিযাবেব নাটকে যত গণবিদ্রোহেব দৃশ্য এসেছে তেমনটি বোধ করি আজ পর্যন্ত আর কোনো নাট্যকারের রচনায আসেনি। ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহ, জন

কেড-এর বিদ্রোহ, 'হ্যামলেট' নাটকে লেআর্টিসের নেতৃত্বে সশস্ত্র জনতার প্রাসাদ আক্রমণ, 'টিমন অফ এথেন্স' নাটকে আলসিবিয়াদিস-এর নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। 'করিও লানুস' নাটক শুরুই হয় রোমের ক্ষুধার্ত জনতার বিদ্রোহ দিয়ে। আর সে দৃশ্যের সমকক্ষ কোনো গণঅভ্যুত্থানের দৃশ্য আজ পর্যন্তও কেউ লিখতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। সমালোচক মহাশয় একটু আগে শেক্স্‌পিয়াব সম্পর্কে আমার ১৯২৯ সালের উক্তি উদ্ধৃত করে আমাকে শেক্স্‌পিয়ার-বিদ্বেষী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। সেটা ভোলতেয়ার বা তলস্তয় বা বার্নার্ড শ সম্পর্কে বলবেন মাইন হের। আমি যে শেক্স্‌পিয়ার-অনুরাগী তার প্রমাণ আমার নাট্যজীবনের প্রায় শেষে এসে শেক্স্‌পিয়ারের 'কবিওলানুস' জর্মন ভাষায় অনুবাদ ও প্রযোজনা। কেন করেছিলাম? কারণ 'করিওলানুস'-এর চেয়ে আধুনিক শক্তিশালী রাজনৈতিক নাটক আমি আর খুঁজে পাইনি। এটা শেক্স্‌পিয়ারের উদ্দেশে বের্টোল্‌ট্‌ ব্রেখ্‌ট্‌-এর অভিবাদন বলতে পারেন। প্রথম দৃশ্যটা—রোমের গণবিদ্রোহের দৃশ্যটা—আমরা দেখি এখন—

করিওলানুস

প্রথম অঙ্ক

(১)

[রোম। নগরীমধ্যস্থিত উন্মুক্ত চত্বর। একদল বিদ্রোহী নাগরিকের প্রবেশ। তাদের মধ্যে মুগুর, লাঠি, ছোরা এবং অন্যান্য অস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাদের সঙ্গে শিশু-সহ এক ব্যক্তি। লোকটির কাঁধে একটি বড় পুঁটুলি।]

নাগরিক ১। আর এগোবার আগে আমি কিছু বলতে চাই।

নাগরিক ২। বলো, কিন্তু সংক্ষেপে।

নাগরিক ১। ভুখা থাকার চেয়ে প্রাণ দেব, আপনাদের সবার এই সংকল্প?

নাগরিকগণ। এই সংকল্প! এই সংকল্প।

নাগরিক ১। যতদিন না সেনেট সম্মত হয় যে নাগরিকরাই রুটির দাম ঠিক করবে ততদিন আপনারা এককাট্টা হয়ে লড়তে রাজি?

নাগরিকগণ। রাজি। রাজি।

নাগরিক১। আর জলপাইয়ের দাম?

নাগরিকগণ। হ্যাঁ।

নাগরিক১। কাইয়ুস মার্সিয়ুস অস্ত্র নিয়ে বাধা দেবে। তখন আপনারা ভয় পেয়ে পালাবেন, না লড়াই করবেন?

নাগরিকগণ। আমরা তার লাশ ফেলে দেব। সে জনগণের পয়লা নম্বরের শত্রু। আমাদের এসব জিগ্যেস করতে হবে না।

নাগরিক১। আপনারা যদি এ লড়াইয়ের শেষ দেখতে না চান তবে আমি এর মধ্যে নেই।

আপনি ওই বস্তাটা এনেছেন কেন? আর ওই বাচ্চাটাকে—

শিশুসহ ব্যক্তি। আমি আপনাদের দৌড় দেখতে চাই। যদি আপনারা হেরে যান তাহলে আমি তৃতীয় এলাকার লোকদের সঙ্গে রোম ছেড়ে চলে যাব।

নাগরিক ১। তারা যেখানে বসত করতে যাচ্ছে সেটা অনুর্বর পতিত জায়গা—সে ব্যাপারটা তুচ্ছ করে?

শিশুসহ ব্যক্তি। হ্যাঁ, তুচ্ছ করে। আমরা জল পাব, বিশুদ্ধ বাতাস পাব আর গোর দেবার মাটি পাব। আমাদের মতো লোকের কপালে রোমে এর চেয়ে বেশি কী জুটবে? আমাদের অন্তত ধনীদের যুদ্ধে লড়াই করতে হবে না। (শিশুটিকে) তোমাব যদি ছাগলের দুধ না জোটে, তার্তিয়ুস, তবু তুমি ভালো ছেলে হয়ে থাকবে তো? (শিশুটি মাথা নাড়ে।)

নাগরিক ১। আপনারা দেখছেন তো কেমন সব মাল আছে আমাদের মধ্যে? আলেগি পর্বতের জনহীন ঊষর প্রান্তরের চেয়েও এ কাইয়ুস মার্সিয়ুসকে বেশি ভয পায়। তুমি রোমের নাগবিক নও?

শিশুসহ ব্যক্তি। হ্যাঁ, তবে নীচু নাগবিক। আমরা সাধারণ নাগরিক হলাম নীচু নাগরিক, আর অভিজাতরা হল মহৎ নাগরিক। এই মহৎ নাগরিকরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যে খাবার দিয়ে পেট ঠাসে সেটুকু পেলেও আমাদেব না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয় না। তাদেব ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার পেলেও আমাদের প্রাণ বাঁচত। কিন্তু আমাদের জন্য তাদের সেটুকু দরদও নেই। আমাদের উপোসি দেখলে তাদের খাদ্যের স্বাদ আরো বেড়ে যায়। (শিশুটিকে) তার্তিয়ুস, একে বলে দাও এবকম নাগরিক হবার বাসনা তোমার নেই। (শিশুটি মাথা নাড়ে।)

নাগরিক ১। তাহলে জলদি ভাগো, ভীরু কুত্তা কোথাকার। কিন্তু শিশুটিকে এখানে বেখে যাও। আমরা লড়াই কবে তার্তিয়ুসের জন্য একটা উন্নত রোম তৈবি করে দেব।

নাগরিকগণ। ও কীসের চিৎকার?—ষষ্ঠ এলাকা বিদ্রোহ করেছে। আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বিবাদ কবে সময় নষ্ট করছি। ক্যাপিটলে চল। কে আসছে?

(মেনেনিয়ুস আগ্রিপার প্রবেশ।)

নাগরিকগণ। এ তবু একটু পদের। জনগণের জন্য ওর তবু একটু মায়াদয়া আছে।

মেনেনিয়ুস। আমার প্রিয় সহনাগরিকবৃন্দ, এসব কী? কোথায় চলেছ মুগুর হাতে? কী হয়েছে, দয়া করে আমাকে বলো।

নাগরিক ১। কী হয়েছে সেটা সেনেটের অজানা নয়। পনেরো দিন ধরে অনেক গুজব তাদের কানে গেছে। আপনাদের কাইয়ুস মার্সিয়ুস বলে আমাদের গন্ধে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে বলে আমাদের গায়ে কড়া বোঁটকা গন্ধ। সে দেখতে পাবে আমাদের ঘুসিও খুব কড়া।

মেনেনিয়ুস। নাগরিকগণ, প্রিয় সুহৃদ আর প্রতিবেশীবৃন্দ, নিজেদের সর্বনাশ করবে এই কি

তোমাদের পণ?

নাগরিক১। মহাশয়, সেটা আর কবতে হবে না। আমাদের সর্বনাশ আগেই হয়ে গেছে।

মেনেনিয়ুস। আমার কথা শোনো, বন্ধুগণ,
তোমাদের কল্যাণে সেনেট অশেষ যত্নবান।
তোমাদেব অভিযোগ, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি—
যার জন্য হাতিয়াব তুলেছ সেনেটের বিরুদ্ধে
তা উদ্যত কর স্বর্গের দিকে।
ঊর্ধ্বগতি দামের কারণ মানুষ নয়
দেবতা।
তোমাদের দুর্দশা ঠেলে দিচ্ছে
ঘোরতব দুর্দশার দিকে।
তোমাদের দেখে মনে আসে
সেই শিশুর কথা, যে তাব মায়ের
শুষ্ক স্তন দংশনে বিক্ষত কবে।
তোমরাও শত্রুর মতো সেনেটকে অভিশাপ দাও
তবু তোমাদের জন্য তার অসীম দরদ।

নাগবিক ১। আমাদের জন্য দবদ। খাসা গল্প দাদা! আমাদের জন্য সেনেট কোনোদিন ভাবেনি। আপনাদের গুদামে যখন শস্য উপচে পড়ে, তখনো আমরা না খেয়ে মবি। আপনারা সুদের কারবাবেব বিরুদ্ধে কড়া আইন জাবি করেন, তাতে সুদখোর মহাজনেবই লাভ হয। ধনীদের বিরুদ্ধে যায় এমন আইন রোজ একটা কবে বাতিল করছেন, আব গরিবদেব আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার জন্য রোজ একটা কবে আইন চালু করছেন। যুদ্ধ যদি আমাদের গিলে না খায তো ওরাই গিলবে। এই হচ্ছে আমাদের জন্য সেনেটেব দরদ।

মেনেনিয়ুস। হয মেনে নাও
তোমরা আশ্চর্য রকম বিদ্বেষে ভরা,
নয়তো বলতে হয় তোমরা ঘোরতর নির্বোধ।
মজার গল্প শোনো একটা। হয়তো শুনেছ আগেই,
তবু এখনো উপযোগী। শুনবে তো বলো?

নাগরিক ১। এখন গল্প শোনারই সময় বটে। তবে আমার বহুদিন থেকে শেখার ইচ্ছে কেমন করে চমকদার বক্তৃতা দেওয়া যায়। এবং তা শেখানোব উপযুক্ত মানুষ হচ্ছেন আপনি, আগ্রিপা। নিন, শুরু করুন।

মেনেনিয়ুস। একদিন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
বিদ্রোহী হল উদরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে
চতুর্দিকে ঘেরা দেহের মধ্যস্থলে তার স্থান

উপসাগরেব মতো।
অলস, অকর্মণ্য, তবু সে মজুদ করে খাদ্যরাশি।
পরিশ্রম করে না অন্যদের মতো।
অন্য অঙ্গেরা দেখে আব শোনে,
বুদ্ধি করে, শিক্ষা দেয়, হাঁটে চলে, অনুভব করে,
আব নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজে মেটায়
সর্বাঙ্গেব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা।
উদব জবাবে বলে . . .

নাগবিক ১। বেশ, শুনি উদব কী জবাব দিল?

মেনেনিয়ুস। বলছি, শুনুন। বিচিত্র হাসি হেসে,
সে হাসি অন্তবের নয়, দেখানো সে হাসি—
দেখেছেন আমি উদবকে যেমন হাসাতে পাবি
তেমনি সে কথাও বলে—
তাই ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী অঙ্গ
যাবা ঈর্ষান্বিত তার সর্বগ্রাসী আচরণে
তাদের সে জবাব দিল উপহাস কবে—

নাগরিক ১। কী বলেছিল সে?
অলস উদর, মলের আধাব, দেহের নর্দমা
কী জবাব দিল?

মেনেনিয়ুস। কী? না, কেমন করে? সেখানেই জটিলতা।

নাগরিক ১। না। বলুন কী বলেছিল অতিভোজী
উদব? কী বলতে পারে সে?

মেনেনিয়ুস। এখুনি শুনবে সব।

নাগরিক ১। আপনাদেব 'এখুনি' মানে 'আগামীকাল'।

মেনেনিয়ুস। গম্ভীর উদর তাব ফবিয়াদিদের মতো
হঠকাবী নয় ;
তার সংযত উত্তর
'সমবেত বন্ধুগণ, একথা সত্যি
আমি প্রথম গ্রহণ করি সব খাদ্য
যে খাদ্যে নির্ভব করে তোমাদেব বাঁচা আব মবা।
তবে এর প্রযোজন আছে, কারণ
দেহের আমিই ভাণ্ডার, আমিই দোকান।
ভেবে দেখ, যে খাদ্য পাঠাই আমি
তোমাদের বক্তনালীপথে, দেহের পাকশালা আর

অলিগলি বেয়ে,
তাই দৃঢ় মাংসপেশী আর কোমল ধমনী
প্রাণবল পায় আমার মারফত।
যদিও বন্ধুগণ, হয়তো সকলে দেখে না তখনি'—
মানে উদর বলছে এসব .

নাগবিক ১। থামুন, মশাই!

মেনেনিয়ুস। 'হয়তো সকলে জানো না তখনি,
আমাব কাছে প্রত্যেকে কী পাও।
তবু আমাব হিশেবেব খাতায় দেখি—
তোমাদেব জোগাই আমি খাদ্যের সাব,
নিজেব ভাগে থাকে শুধু খোসা।' কী, তোমরা কী
বলো?

[মেনেনিয়ুস ব্যতীত সকলের অলক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনী পরিবৃত হযে কাইয়ুস মার্সিয়ুসের প্রবেশ।]

নাগরিক ১। দায়সাবা জবাব! গল্পের সাবমর্মটা কী?

মেনেনিয়ুস। বোমেব সেনেট এই সদয উদব,
তোমবা বিদ্রোহী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব।
ভাবো! তোমাদের ওইটুকুই কাজ।
ভাবো! ভাবো! ভাবো! ভাবো! ভাবো!
তবেই বুঝবে, সুযোগ্য নগবপিতারা কেমন সাদবে
সাধারণ সম্পত্তি বেঁটে দেয় প্রত্যেকের কাছে।
তোমরা পাও তো তাদেবই দান।
বেশ, এবার কী বলো?
তুমি? সমবেত জনতাব গোদা পা,
তুমি কী বলো?

নাগরিক ১। আমি গোদা পা? গোদা পা কেন?

মেনেনিয়ুস। কারণ, দীনতম হীনতম হযে তুই
এই উচ্ছৃঙ্খল জনতার নেতা, পালের গোদা,
বদমাশ, পচন ধরানো পচা ফল, স্বার্থান্বেষী, ঠগ!
মুগুর ঘুরিযে যা।
রোম তার ঘৃণ্য ছুঁচোদের দেখে নেবে।
শেষবারের মতো রোম . . সুস্বাগতম! মহান মার্সিয়ুস!

*মার্সিয়ুস। ধন্যবাদ। ব্যাপারটা কী? আবার চুলকানি?
পুরোনো খোস চুলকোচ্ছে আবার?*

নাগরিক১। আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা
আর একটু সদয় ব্যবহার।

মার্সিয়ুস। পথের কুকুর, তোদের শান্তিতে সুখ নেই, যুদ্ধেও বিরাগ।
যুদ্ধে ভয়ার্ত তোরা, শান্তি করে দুর্বিনীত।
কেউ যদি ভাবে তোরা সিংহের দল,
গিয়ে দেখবে তোরা ভেড়ার পাল।
শৃগাল খুঁজতে গিয়ে দেখবে তোরা হাঁস।
তোরা শ্রেষ্ঠকে ঘৃণা করিস তারা শ্রেষ্ঠ বলে।
তোদের উপর ভরসা করার অর্থ
লোহার পাখনা মেলে নদীতে সাঁতার
আর ঘাসের ডগা দিয়ে ওক গাছ কাটা।
তোদের ফাঁসিতে ঝোলালে শান্তি।
তোরা পেটরোগা লোকের মতো
যা পাস তাই গিয়ে খাস,
ফলে আরো বাড়ে রোগ।
তোরা সেনেটকে অভিশাপ দিস
যারা দেবতা সহায় করে
রাখে শান্তি শৃঙ্খলা বজায়।
তারা হাল ছেড়ে দিলে
নিজেদের মাংস খাবি কামড়াকামড়ি করে।

মেনেনিয়ুস। ওদের দাবি
শস্যের দাম ঠিক করার ক্ষমতা
থাকবে ওদের অধিকারে।
ওরা বলে, শস্যে ঠাসা আছে আমাদের গোলা।

মার্সিয়ুস। ওরা বলে বুঝি! ওরা জাহান্নামে যাক!
আগুন পোহাতে বসে ঘরে
ওরা জেনে গেল কী ঘটছে ক্যাপিটলে,
কী আছে সেখানে, আর কীই বা নেই!
ওদের পেটে দেওয়া মানে শস্যের অপচয়,
সেনেট শুধু মধ্যপন্থা বাদ দিত যদি
যে পন্থাকে আমি দিই অন্য নাম—
ওরা বলে খাদ্য আছে। ওদের জবাব দেবে
আমার তলোয়ার।
আর আমার বল্লমে মাপব

শস্য নয়, ওদের শবদেহ, বুশেল হিশেবে
রোমের পথে পথে।

মেনেনিয়ুস। যেতে দিন, নিয়েছি ওদের মন জয় করে,
থামিয়ে দিয়েছি রূপকথা বলে।
যদিও নিশ্চিত জানি
আমার কথার ধারে নয়
ওরা ধরাশায়ী আপনার ধারালো কথায়।
বাকি পল্টন কই?

মার্সিয়ুস। নেই। ভেঙে দিয়েছি। জাহান্নামে যাক সব,
নরক যন্ত্রণা!
ওরা চেঁচাচ্ছিল, খাদ্য চাই।
সগর্জনে আওয়াজ তুলছিল,
ক্ষুধা ভেঙে ফেলে লোহার প্রাচীর,
চেঁচাচ্ছিল, কুকুরেরও খেতে লাগে,
রুটির জন্ম পেটের জন্য।
ঈশ্বব ফল দেয় না শুধু ধনীরা গিলবে বলে।
আরো কত অর্থহীন প্রলাপ!
ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই
পিছু হটে গেল চিৎকার করে,
'চলে যাব রোম ছেড়ে।'
আমি বলেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।

[এক সংবাদবাহকের প্রবেশ]

সংবাদবাহক। কাইয়ুস মার্সিয়ুস কোথায়?

মার্সিয়ুস। এখানে। কী সংবাদ?

[সংবাদবাহক তার কানে ফিস-ফিস করে।]

মার্সিয়ুস। মেনেনিয়ুস, ফোরামে জনতা টুপি ছুড়ছে আকাশে
যেন ঝুলিয়ে দেবে চাঁদের গায়ে!
সেনেট তাদের দাবি মেনে নিয়েছে।

মেনেনিয়ুস। কী দাবি মেনেছে?

মার্সিয়ুস। জনতার প্রতিভূ দুজন গণপ্রতিনিধি।
একজন জুনিয়াস ব্রুটাস, অন্যজন সিসিনিয়ুস।
আব কে বা কারা জানেন ঈশ্বর।
জনতা যদি ধসিয়ে দিত নগরের ছাদ
তবু আমি দিতাম না সম্মতি!

ওরা আরো উদ্ধত হবে,
অচিরে প্রতি পাড়ায় জলপাই নিয়ে
দেখাবে বিদ্রোহের ভয়।

মেনেনিয়ুস। বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার!

[একজন নাগরিক দৌড়িয়ে প্রবেশ করে।]

নাগরিক ২। জুনিয়াস ব্রুটাস জিন্দাবাদ! সেনেট আমাদের সব দাবি মেনে নিয়েছে। দুজন গণপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে। তাবা সমস্ত অধিবেশনে যোগ দিতে এবং ভোট দিতে পাববে।

নাগরিকগণ। জুনিযাস ব্রুটাস জিন্দাবাদ!

নাগবিক ২। সিসিনিয়ুস ভেলুটাস জিন্দাবাদ।

মার্সিয়ুস। ঘরে চলে যা, ছন্নছাড়ার দল।

মেনেনিয়ুস। সুযোগ্য নগরপিতারা আসছেন!

মার্সিয়ুস। টাটকা ভাজা গণপ্রতিনিধিবাও।
তাদের মুখেব চেহাবা দেখে মনে হয
যেন এই মাত্র নামানো হযেছে ফাঁসিকাঠ থেকে।
[কোমিনিয়ুস, টাইটাস লার্টিয়ুস, অন্য সেনেটরগণ, ব্রুটাস ও সিসিনিয়ুসের প্রবেশ]

নাগরিকগণ। সিসিনিয়ুস দীর্ঘজীবী হোন!
জুনিয়াস ব্রুটাস দীর্ঘজীবী হোন!

মার্সিয়ুস। সুযোগ্য নগরপিতাগণ,
বিশ্রী সংবাদ কানে এসেছিল।
এখন চোখে দেখছি বিশ্রী দৃশ্য।

সেনেটর ১। মহামান্য মার্সিয়ুস,
এখানে খাদ্যাভাব আব বিদ্রোহের খবব পেয়ে
ভলশিয়া যুদ্ধের ফিকিরে আছে।

কোমিনিয়ুস। যুদ্ধ!

মার্সিয়ুস। আনন্দ সংবাদ।
তাতে সাহায্য হবে
রোমের উদ্বৃত্ত পচা শস্য বন্টনের কাজে।

সেনেটর ১। তুলুস আউফিদিউস তাদের নেতৃত্ব দেবে।

মার্সিয়ুস। আমি চিনি তাকে।

কোমিনিয়ুস। আপনাবা এক সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

মার্সিয়ুস। তার মতো শত্রু পেলে
যুদ্ধটা লড়াইয়ের যোগ্য মনে হয়।

সেনেটর ১। আপনি যুদ্ধে যাবেন কোমিনিয়ুসেব অধীনে।

কোমিনিয়ুস। এ আপনার পুর্ব প্রতিশ্রুতি।

মার্সিয়ুস। আমি রাজি। টাইটাস, তুমি কী কববে?
আড়ষ্ট দেহসন্ধি? থাকবে ঘরে বসে?

লার্টিয়ুস। কখনো নয়, মার্সিয়ুস।
আমি একটা লাঠিতে ভব দিয়ে
অন্যটা দিয়ে লড়ব,
তবু হারাব না এমন সুযোগ।

সেনেটব ১। ক্যাপিটল চল।

লার্টিয়ুস। কোমিনিয়ুস আগে যান।

কোমিনিয়ুস। আপনার পরে।

লার্টিয়ুস। আপনি আগে।

মার্সিয়ুস। আপনি আগে।

ব্রেখ্‌ট্‌। এবার বলুন, নাটকটা শুরু হল কী ভাবে?

যুবক ১। একদল সর্বহাবা অস্ত্র হাতে নিয়েছে অভিজাতদের নেতা কাইয়ুস মার্সিয়ুসকে হত্যা করাব জন্য। তাঁকে ওরা আখ্যা দিচ্ছে জনগণের শত্রু। কাবণ তিনি খাদ্যশস্যেব দাম কমাতে বাজি নন। তাবা বলছে দরিদ্রেব যন্ত্রণাই হচ্ছে ধনীর মুনাফা।

ব্রেখ্‌ট্‌। ব্যস?

যুবক ১। কিছু ছেড়ে গেছি?

ব্রেখ্‌ট্‌। মার্সিয়ুসেব দেশসেবার উল্লেখ নেই?

যুবক ১। আছে। এবং দৃশ্যেব মধ্যে তার প্রতিবাদও হয়।

ব্রেখ্‌ট্‌। তাহলে যে জনতাকে আমবা এক্ষুনি দেখলাম তারা যে খুব একটা ঐক্যবদ্ধ এমনটা আপনাব মনে হযনি? যদিও তারা উচ্চকণ্ঠে তাদেব বিপ্লবী প্রতিজ্ঞা ঘোষণা কবে চলেছে।

যুবক ১। বড়ো বেশি উচ্চকণ্ঠ তাদেব। তা থেকেই সন্দেহ হয় তারা তেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়।

যুবক ২। সাধাবণ বুর্জোয়া থিয়েটারে জনতার এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণার দৃশ্যটি কেমন হাস্যকর হয়ে ওঠে। বিশেষত তাদেব হাতে যখন কিছু লাঠি, বল্লম ছাড়া আর কিছু নেই। তাবপব অভিজাত আগ্রিপা এসে একটা সুন্দর বক্তৃতা করেন। এবং জনতা রণে ভঙ্গ দেয়।

ব্রেখ্‌ট্‌। তেমনটা শেক্‌স্‌পিয়ারে কিন্তু নেই।

যুবক ২। বুর্জোয়া থিযেটারের কথা বলছি।

ব্রেখ্‌ট্‌। ঠিকই বলেছেন।

সমা। এ তো মুশকিলের কথা। আপনারা স্বীকার করছেন এই দৃশ্যে জনতার তর্জনগর্জন অনেকটাই ফাঁকা আওয়াজ। অথচ দৃশ্যটাকে হাস্যরসাত্মক করতে দেবেন না। তাহলে কি বলছেন অভিজাতদের বক্তৃতায় জনতা শেষ পর্যন্ত টলবে না, পাছে তারা হাস্যকর হয়ে ওঠে?

ব্রেখ্‌ট্‌। জনতা যদি শাসকদের বাগাড়ম্বরে প্রভাবান্বিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, সেটা আমার কাছে হাস্যকর হয় না, হয় হৃদয়বিদারক। আপনি বোধ হয় জানেন না অত্যাচারিত জনতার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কী কঠিন ব্যাপার। যখন তারা জানতে পারে কে তাদের যন্ত্রণার জন্য দায়ী, তখন তাদের যন্ত্রণাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করে। যেমন শেক্‌স্‌পিয়ার জনতার মুখে সংলাপ দিয়েছেন—দরিদ্রের যন্ত্রণাই হচ্ছে ধনীর মুনাফা। কিন্তু এই উপলব্ধি না আসা পর্যন্ত ওই যন্ত্রণাই তাদের দ্বিধাবিভক্ত করে রাখে, কেননা তারা পরস্পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে বাধ্য হয়। ভেবে দেখুন বিদ্রোহ করতে মানুষের কত অনিচ্ছা। সে এক দুঃসাহসিক অভিযান ; অনভ্যস্ত নূতন পথে চলা। উপরন্তু শাসকদের রাজনৈতিক শাসনের সঙ্গে মিশে থাকে তাদের ধ্যানধারণার আধিপত্য। জনতার কাছে বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায় এক অস্বাভাবিক ঘটনা। যে দুদর্শাই তাদের বর্তমানে থাকুক না কেন, বিদ্রোহ করে তা থেকে মুক্ত হওয়া তাদের কাছে আরো কষ্টকর। যেমন যে কোনো বৈজ্ঞানিকের কাছে নূতন কোনো বিশ্ববীক্ষা গ্রহণ করা কঠিন হয়, সেই জন্যই দেখা যায় জনতার মধ্যে যারা সবচেয়ে চালাক তারাই ঐক্যের বিরোধী আর সবচেয়ে যারা বুদ্ধিমান শুধুমাত্র সে কজন ঐক্যের পক্ষে।

সমা। তাহলে আপনি বলছেন ওই দৃশ্যে দরিদ্র জনতা মোটেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি?

ব্রেখ্‌ট্‌। একেবারেই না। শেক্‌স্‌পিয়ার এত বড় বাস্তববাদী যে তিনি জনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি ভোলেন না, আমাদের ভুলতে দেন না, বরং দেখিয়ে দেন দ্বন্দ্বগুলি চাপা পড়ে গেছে মাত্র। ক্ষুধার জ্বালায় অভিজাতদের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হচ্ছে দরিদ্ররা। তাদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি সাময়িকভাবে তারা বিস্মৃত হয়েছে।

সমা। এটা কি ঠিক অক্ষরে অক্ষরে শেক্‌স্‌পিয়ারের লেখায় রয়েছে?

ব্রেখ্‌ট্‌। পুরো নাটকটা পড়লেই দেখবেন পরে দরিদ্র জনতার ঐক্য ভেঙে চুরমার হচ্ছে। তাই নাটকের প্রথম দৃশ্যে সেই ঐক্যকে কোনো চূড়ান্ত বা চরম রূপ দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। এইটুকুই বুঝতে হবে নানা কার্যকারণে সাময়িক একটা ঐক্য গড়ে উঠেছে। তারপর কী ঘটে?

যুবক ১। তারপর অভিজাত নেতা আগ্রিপা প্রবেশ করেন এবং একটি রূপকথার সাহায্যে 'প্রমাণ' করে দেন যে অভিজাতদের ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারে না।

সমা। আপনি অবজ্ঞাভরে 'প্রমাণ' কথাটা উচ্চারণ করলেন!

যুবক ১। হ্যাঁ, আমার ওই কাহিনীকে একেবারেই প্রামাণ্য মনে হয় না।

ব্রেখ্‌ট্‌। গল্পটি পৃথিবীবিখ্যাত। একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করুন।

যুবক ২। আগ্রিপা শুরু করে এই বলে যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছেন দেবতারা, ধনীরা নয়।

সমা। সেটা তৎকালীন রোমে একটি অতি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি ছিল। এটা তো আপনারা মানবেন শেক্‌স্‌পিয়ার 'করিওলানুস' রচনার সময়ে তৎকালীন ও তৎস্থানীয় মতাদর্শ-অনুযায়ীই সংলাপ সাজাতে বাধ্য।

ব্রেখ্‌ট্‌। এ নিয়ে আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। পর মুহূর্তে শেক্‌স্‌পিয়ার তৎকালীন জনতার মুখে জোরালো পালটা যুক্তি উপস্থিত করেছেন। সেটা তৎকালীন মতাদর্শে খাপ খেল কিনা রেয়াৎ করেননি। বস্তুত তারা আগ্রিপার রূপকথা-ভিত্তিক পুরো বক্তব্যটি নাকচ করে দেয়।

যুবক ১। দরিদ্ররা খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করে। এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার যে তাদের ওপরই এসে চাপে এর প্রতিবাদ করে।

ব্রেখ্‌ট্‌। ওটা কিন্তু নাটকে নেই।

সমা। যুদ্ধেব বিরুদ্ধে কোনো কথা 'করিওলানুস' নাটকে নেই?

ব্রেখ্‌ট্‌। না নেই।

যুবক ১। এরপর নাটকের নায়ক মার্সিয়ুস প্রবেশ করেন এবং জনতাকে প্রচণ্ড গালাগাল দেন। তিনি জানিয়ে দেন, কথার পরিবর্তে তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবিলা করতে পাবলেই তিনি বরং খুশি হতেন। আগ্রিপা এখন মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে চেষ্টা করেন। বলেন, জনতা সুলভে খাদ্য চায় মাত্র। এতে মার্সিয়ুস জনতাকে উপহাস করে বলেন, তারা মূর্খ, কী করে জানবে উচ্চতম সরকারি মহলে কী হচ্ছে না হচ্ছে।

যুবক ২। কিন্তু এব পরই ভলশিদের সঙ্গে রোমেব যুদ্ধ শুরু হতে মার্সিয়ুস জনতাকে উত্তেজিত করার জন্য বলেন, ভলশিদের গোলা ভর্তি রয়েছে শস্য, সে সব কেড়ে নাও, চল! ক্রোধে মার্সিয়ুস এমন উন্মত্ত যে রোমের সেনেট যে মাত্র কিছুদিন পূর্বে শ্রমজীবী মানুষের দুজন গণপ্রতিনিধিকে আইনসভায় যোগদান করতে অনুমতি দিয়েছে সেটাও তিনি অস্বীকার করেন। এতে আগ্রিপাও স্তম্ভিত হন। এরপর যুদ্ধ ঘোষণা। ভলশিদের সেনাপতি আউফিদিউসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে শুনে মার্সিয়ুসের উল্লাস।

ব্রেখ্‌ট্‌। লক্ষ করেছেন সবাই? নিজের দেশের শ্রমজীবীদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, কিন্তু দেশের শত্রু আউফিদিউসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। মার্সিয়ুসের কাছে শ্রেণী দেশের চেয়ে বড়ো। কী হল? কিছু ছেড়ে গেছেন?

যুবক ১। হ্যাঁ। সিসিনিউস ও ব্রুটাস। দুই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি, তাঁরা স্টেজে ঢুকেছেন বেশ কিছুক্ষণ আগে।

ব্রেখ্‌ট্‌। ওদের আপনাবা ভুলে গেছেন কারণ না অভিজাত না দরিদ্র কেউ ওদের স্বাগত জানায়নি। এবং যুদ্ধ ঘোষণার একটু পরে জনতারও দেখছি চুপি চুপি প্রস্থান।

অর্থাৎ গণবিদ্রোহটা ঘটেছিল একটি অশুভ মুহূর্তে যখন যুদ্ধ বাধাবার সব প্রস্তুতি গোপনে সম্পূর্ণ। 'দেশ বিপন্ন' রব তুলে তখন অভিজাতরা পুনরায় রোমে তাদের একাধিপত্য স্থাপন করতে প্রস্তুত।

ব্রেখ্‌ট্। এবং দুই গণপ্রতিনিধিকে সেনেটে গ্রহণ করাটা?

যুবক ২। ওটাব বাস্তবিকই প্রয়োজন ছিল না।

যুবক ১। গণপ্রতিনিধিরা দৃশ্যের শেষে আশা পোষণ করে যে যুদ্ধ থেকে মার্সিয়ুস আরো গৌরব জয় করে ফিরবে না, সে মরবে, অথবা সেনেটের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধবে।

ব্রেখ্‌ট্। তাহলে শেক্‌স্‌পিয়ার মনে কবতেন যুদ্ধেব ফলে দেশের অভ্যন্তবে শ্রমজীবী মানুষেব শক্তিহানি হয়। যেটা অপূর্বভাবে বাস্তব। অসাধাবণ বাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি।

যুবক ২। প্রথম দৃশ্যেই কত কিছুর সমাবেশ। তুলনা করুন আজকেব দিনের নাটকের সঙ্গে যেখানে বিষয়বস্তুব দৈন্য দর্শককে ক্লান্তই করে শুধু।

যুবক ১। পুরো বাজনৈতিক পবিস্থিতিটাও আঁকা হয়ে গেল। মুখ্যচবিত্রের চেহারাটাও ভেসে উঠল। আবাব পুবো নাটকটার ঘটনাব গতিটাও যেন ছাড়া পেযে গেল প্রথম দৃশ্যেই।

যুবক ২। আবার ভাষাটাও দেখুন। আগ্রিপা যেভাবে রূপকথাটা বলছেন তাব বস, তাব হাস্যময়তা।

যুবক ১। অথচ জনতাব ওপর তাব কোনো প্রভাব যে পডছে না, তাব চমক।

যুবক ২। আবাব জনতাব স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিযতা। যেমন এই সংলাপে, আগ্রিপা বলছেন তোমবা কি নিজেদেব সর্বনাশ করতে চাও? এক নাগবিক উত্তর দিচ্ছে, সেটা আব কী করে করব, সর্বনাশ তো আমাদের হয়েই গেছে।

যুবক ১। এবং মার্সিয়ুসের বাক্যবিস্ফোরণের তীব্রতা ও প্রাঞ্জলতা। কী বিশাল মানুষ। এ রকম একটা ঘৃণ্য চরিত্রকে এমন আকর্ষণীয় কবে আঁকা যায়, এটা সর্বকালের নাট্যকারদের সামনে এক দৃষ্টান্ত।

ব্রেখ্‌ট্। নানা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব ছডিযে আছে দৃশ্যটিতে। ক্ষুধিত দবিদ্রের ক্রোধ, প্রতিবেশী বাষ্ট্রেব সঙ্গে যুদ্ধ, মার্সিয়ুসের প্রতি শ্রমজীবী জনতাব ঘৃণা, আবার যে জনতাব শত্রু, দেখা যায় সে শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। গণপ্রতিনিধিদের সেনেটে প্রবেশ জনতার জয়, তারপরেই যুদ্ধের সেনাপতি হিশেবে মার্সিয়ুসের কার্যভার গ্রহণ, অর্থাৎ জনতার পবাজয়। 'করিওলানুস' নাটক পর্যালোচনা করলে তার পরতে পবতে এইসব গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ উদ্‌ঘাটিত হয়। এ নাটক বুর্জোয়া থিয়েটারে যখন মঞ্চস্থ হয় তখন এর কতটুকু বেরিয়ে আসে?

যুবক ১। ওখানে এই পুরো প্রথম দৃশ্যটি ব্যবহৃত হয় শুধু নায়কের চরিত্র প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। মার্সিয়ুস দেশপ্রেমিক ও মহাবীর। তাঁকে বাধা দিচ্ছে স্বার্থপর জনতা এবং কাপুরুষ সেনেট।

ব্রেখ্‌ট্। কারণ বুর্জোয়া থিয়েটার নাটকের অভিজাতদের পক্ষ নেয়। জনতার নয়।

জনতাকে তারা কমিক চরিত্র হিশেবে দেখাতে অভ্যস্ত। আগ্রিপা এসে যখন বক্তৃতা করে বলেন অভিজাতরা হচ্ছে পেট, শ্রমজীবীরা সমাজের হাত-পা, পেটের বিরুদ্ধে হাত-পার ধর্মঘট আত্মহত্যাস্বরূপ, তখন আজকের বুর্জোয়া এবং বুর্জোযা থিয়েটার সে কাহিনীকে আজকের সর্বহারাব বিরুদ্ধে খুব কার্যকরী একটা যুক্তি মনে করে এবং 'জনতার চুপি চুপি প্রস্থানটাকে' রাজনৈতিক অস্ত্র হিশেবে ব্যবহাব করে। শেক্স্পিয়ার যে আবো বহু দ্বন্দ্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন ওই দৃশ্যে, সেটা তারা চেপে দেয। শেক্স্পিযারকে নিযমিত বিকৃত ও খণ্ডিত করে ব্যাখ্যা করে আসছে বুর্জোয়া থিয়েটার।

যুবক ১। তবে এ ব্যাপাবে শেক্স্পিয়ারও বুর্জোয়া থিয়েটাবকে সাহায্য করেছেন। জনতা ও গণপ্রতিনিধিদেব তিনি কোনো বিশেষ গুরুত্ব দিতে বাজি নন। ফলে বুর্জোযা থিযেটাব তাদের শুধুমাত্র নায়কেব সঙ্গে যুদ্ধজযেব পথে এক বিবক্তিকব বাধা হিশেবে উপস্থিত কবার সুযোগ পায। ওবা প্রথম দৃশ্যে মার্সিযুসেব দেশপ্রেমিক যুদ্ধযাত্রায যত ফ্যাকড়া উপস্থিত কববে, পবে মার্সিযুসের গগনচুম্বী দম্ভ ও আস্ফালনকে এত বিশ্বাসযোগ্য কবে তোলা যাবে—এই তো বুর্জোয়া থিযেটারের যুক্তি।

ব্রেখ্ট্। কিন্তু নেগেটিভ নেগেটিভই। মার্সিযুস নেতিবাচক নাযক, বোধ করি শেক্সপিযাবেব শ্রেষ্ঠ নেতিবাচক নাযক। নাযক বলেই তাকে সমর্থন কবতে হবে, তাকে ইতিবাচক করে তুলতে হবে, এই বালখিল্য খেলা শেক্স্পিযার-ব্যাখ্যাব সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। মার্সিয়ুসেব হিংস্রতা, তাব আত্মসর্বস্বতা, এগুলো শেক্স্পিযাব নাযকোচিত গুণ হিশেবে তুলে ধবেননি। মার্সিযুস শেষ পর্যন্ত ভলশিদের সঙ্গে হাত মিলিযে বোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবে এবং তাব পবম শ্রদ্ধেয় আউফিদিউসের আদেশে নৃশংসভাবে নিহত হয। আত্মসর্বস্ব ডিকটেটরদেব জীবনে এটাই হযেছে বার বাব। প্রথম দৃশ্যে তেমনি শেক্স্পিয়াব স্পষ্টই খাদ্যশস্য নিযে অভিজাতদের ফাটকাবাজির প্রসঙ্গ এনেছেন, এবং যুদ্ধ বাধতেই ক্ষুধার্ত জনতাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি কবে নেওযাব কথা বলছেন, সেগুলিকে বুর্জোযা থিয়েটার চেপে যাওয়ার চেষ্টা কবে। তাই বলছিলাম বাজনৈতিক নাটকও শেক্স্পিয়ারের কাছেই শিখতে হবে এখনো। 'জুলিয়াস সীজার' ধরুন। স্বৈরতন্ত্রের অভ্যুত্থান ও প্রজাতন্ত্রেব ঘনিযে-আসা অন্তিমেব অমন ভীষণ ছবি আমরা যাবা হিটলারের অভ্যুত্থান দেখেছি আমবাও আঁকতে পারতাম না। বা ধরুন 'তৃতীয় বিচার্ড'। একে একে বাজনৈতিক বিবোধীদের হত্যা কবে সিংহাসন নিবঙ্কুশ কবাব রক্তাক্ত কাহিনী। সেটা হিটলাবেরও কাহিনী, মুসোলিনিবও। তবে বেনেসাঁসের মানুষ উইলিযম শেক্স্পিয়ার মানুষকে এত ভালোবাসতেন যে তৃতীয় রিচার্ডও যে রাতের গভীবে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার কবে জেগে ওঠে এ সত্য তাঁর সুপরিজ্ঞাত। আমি ওই দৃশ্যটির অনুকবণে 'আর্টুরো উই'-এব দুঃস্বপ্নেব দৃশ্য লিখেছিলাম। শেক্স্পিয়ারেব

দৃশ্যটি ট্র্যাজিক, আমারটা কমিক। মার্কস বলেছিলেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, প্রথমবার ট্র্যাজিডি হিশেবে, দ্বিতীয়বার প্রহসনরূপে। রাজা তৃতীয় রিচার্ড বিশাল ছিলেন চরিত্র। যাঁদের তিনি হত্যা করেছেন তাঁরাও সব মহা মহা ফিউদাল অধিপতি। তাই মধ্যরাত্রির আঁধারে তাঁদের ছায়ামূর্তির আবির্ভাবে রাজা রিচার্ডের শিবির হয়ে ওঠে দলিত ইংলন্ডের প্রতিচ্ছবি। আর্টুরো উই শিকাগোর খুদে মাস্তান মাত্র। শস্তা হোটেলের ঘরে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় তার হাতে নিহত অন্য খুদে মাস্তানের ছায়ামূর্তি। প্রথমে আসুন দেখি—শেক্স্পিয়রের 'তৃতীয় রিচার্ডের' দৃশ্যটি

রাজা তৃতীয় রিচার্ড

পঞ্চম অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য

[রাজা রিচার্ড, নরফোক, ব্যাটক্লিফ এবং কেট্স্‌বি রিচার্ডের তাঁবুতে প্রবেশ করে।]

রাজা রিচার্ড। কটা বাজে?

কেট্স্‌বি। নৈশাহারের সময় হয়েছে, প্রভু,
এখন নটা বাজে।

রিচার্ড। আজ রাত্রে খাব না কিছু।
কাগজ আর কালি আনো।
আমার মুখের নিম্নাংশ-ঢাকা বর্ম কি
ঢিলে করেছ আগের চেয়ে?
সব অস্ত্র আর বর্ম সাজানো আছে তো তাঁবুর ভিতরে?

কেট্স্‌বি। হ্যাঁ, প্রভু।
সব কিছু প্রস্তুত।

রিচার্ড। সদাশয় নরফোক,
দ্রুত যাও কর্মস্থলে,
সতর্ক প্রহরা রেখ, বেছে নিও
বিশ্বাসী প্রহরী।

নরফোক। যাচ্ছি প্রভু।

রিচার্ড। কাল জাগবে পাখি-ডাকা ভোরে,
ভদ্র নরফোক।

নরফোক। তাই হবে, প্রভু। (প্রস্থান)

রিচার্ড। কেট্স্‌বি?

কেট। প্রভু?

রিচার্ড। একজন সশস্ত্র অনুচর পাঠাও

স্ট্যানলির বাহিনীতে।
তাকে আদেশ পাঠাও, সর্বশক্তি নিয়ে
আসে যেন সূর্যোদয়ের আগে,
নচেৎ তার পুত্র জর্জ চলে যাবে
চিররাত্রি ঘেরা অন্ধ গুহার জঠরে।
(কেটস্‌বির প্রস্থান)

রিচার্ড। আমাকে এক পাত্র মদ দাও, আর
আমার এখানে প্রহরা বসাও।
কাল যুদ্ধের জন্য শ্বেত অশ্ব সারেকে সাজিয়ে রাখ,
আর খেয়াল রেখ আমার দণ্ডগুলো
যেন মজবুত আর লঘুভার হয়।
র‍্যাটক্লিফ?

ব্যাটক্লিফ। আদেশ করুন প্রভু?

বিচার্ড। বিষণ্ণ লর্ড নর্দাম্বারল্যান্ডকে দেখেছ?

ব্যাটক্লিফ। সে নিজে আর সারের আর্ল টমাস
দুজনে মিলে সূর্যাস্তের কিছু আগে
টহল দিয়ে ফিরছিল পল্টনে পল্টনে
সেনাদের উৎসাহ দিয়ে।

বিচার্ড। শুনে সুখী হলাম।
আমাকে একপাত্র মদ দাও।
এখন সে তৎপরতা আর উদ্দীপনা নেই
যা আমার মজ্জাগত ছিল।
ওইখানে রাখ। কালি আর কাগজ দিয়েছ?

ব্যাটক্লিফ। হ্যাঁ, প্রভু।

বিচার্ড। আমাব রক্ষীকে সতর্ক থাকতে বল।
এবার যাও। র‍্যাটক্লিফ,
রাত্রির মাঝামাঝি আমার তাঁবুতে এস,
আমার অস্ত্রসজ্জায় সাহায্য করবে।
এখন যাও!
(র‍্যাটক্লিফের প্রস্থান। রিচার্ড নিদ্রিত হয়।)

[ডার্বি বিচমন্ডের তাঁবুতে প্রবেশ করে তার কাছে আসে,
সঙ্গে সামন্ত প্রভুগণ]
ডার্বি। তোমার শিরস্ত্রাণে অধিষ্ঠিত হোক
সৌভাগ্য আর বিজয়।

বিচমন্ড। মহামান্য শ্বশুর মহাশয, নিশুতি রাতের
অন্ধকার বুক থেকে যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আসে
ভোগ করুন তাই। আমাদের প্রিয় মাতা
কেমন আছেন, বলুন।

ডার্বি। তোমাব শ্বশ্রুমাতাব পক্ষ থেকে
আমি জানাই আশীর্বাদ। তাঁর রিচমন্ডেব কল্যাণে
তিনি নিশিদিন প্রার্থনাবতা।
এসব কথা এই পর্যন্ত। নীবব সময়
ধীব পাযে আগুয়ান, পুবেব আকাশে
ভাঙছে স্তূপীকৃত অন্ধকাব।
সার কথা, কালেব নির্দেশ
বণযাত্রা শুরু কব ঊষালগ্নে,
সৌভাগ্যমুকুট জয কব রক্তলোভী ভযাল আক্রমণে
আব প্রাণঘাতী ভীষণ যুদ্ধেব
অটল সংকল্পে।
আমি যেমন পাবি—যতটা সাধ
তত সাধ্য নেই—থাকব সুযোগেব সন্ধানে
সময়কে ফাঁকি দিযে।
তোমাব পাশে দাঁড়াব অনিশ্চিত এই বাহু নিযে।
তবে তোমার পক্ষে আমি এগুব না বেশি দূব।
কাবণ দৃষ্টিগোচব হলে
তোমাব ভাই সুকুমার জর্জের গর্দান যাবে
তাব পিতাব দৃষ্টির সম্মুখে।
এবাবে বিদায। এখনই সুযোগ অথচ ভযংকব সময
ভেঙে ফেলে আনুষ্ঠানিক প্রীতির শপথ,
আর দীর্ঘ বিচ্ছেদেব পব মিলিত বন্ধুদের কাম্য
অফুবন্ত মধুব বাক্যবিনিময়।
ঈশ্বর করুন যেন প্রীতিসম্ভাষণ বিনিমযে
অবসব জোটে।
আবার বিদায জানাই। পবাক্রান্ত হও,
কাজে হোক ক্ষিপ্র গতি।

রিচমন্ড। সদাশয় প্রভুগণ, এঁকে পৌঁছে দিন
নিজেব বাহিনীতে।
আমি চিন্তাজাল ছিন্ন করে

একটু চোখ বুজে নিই, নচেৎ
অসার নিদ্রার ভারে পড়ে থাকব কাল
যখন উড্ডীন হবার কথা বিজয়ের পাখা মেলে।
শুভরাত্রি জানাই আবার, সদাশয় লর্ড
আর ভদ্রমহোদয়গণ।
(রিচমন্ড ব্যতীত সকলের প্রস্থান)
হে সর্বশক্তিমান, তোমার সেনাপতি আমি,
আমার বাহিনীকে দেখ কৃপাদৃষ্টি মেলে,
তাদেব হাতে দাও তোমাব নির্মম প্রহরণ
যার প্রবল প্রহারে তারা চূর্ণ করে দেবে
পরস্বহবণে বত শত্রুর শিরস্ত্রাণ।
তোমাব শাসনেব যন্ত্র কব আমায
যেন বিজয়ী হযে তোমাব যশোগান কবি।
আমার দুচোখেব দ্বার বন্ধ কবাব আগে
তোমাকে অর্পণ কবি আমার সজাগ আত্মার ভার।
নিদ্রায় আর জাগরণে বক্ষা কর প্রভু।
(নিদ্রিত হয।)

[বিচার্ডেব শিবিবে ষষ্ঠ হেনবির পুত্র যুবরাজ এডওয়ার্ডের প্রেতাত্মাব প্রবেশ]

প্রেতাত্মা (রিচার্ডকে)। আমার পাষাণভারে যেন
তোর আত্মা পিষ্ট হয কাল।
স্মরণ কর্, টিউক্স্বেরিতে কেমন করে
আমাব যৌবনে নিহত হযেছি তোব ছুরির আঘাতে।
তাই নৈবাশ্য আসুক, তারপব মব্!
(বিচমন্ডকে) উৎফুল্ল হও বিচমন্ড,
যত নিহত রাজপুত্রের পীড়িত আত্মা
তোমাব সপক্ষে যুযুধান। বিচমন্ড,
তোমাকে অভয় দিচ্ছে রাজা হেনরির সন্তান।

[ষষ্ঠ হেনরিব প্রেতাত্মার প্রবেশ।]

প্রেতাত্মা (বিচার্ডকে)। যখন জীবিত ছিলাম
প্রাণঘাতী ছিদ্রে ভরে দিয়েছিলি আমার এ বাজদেহ।
টাওয়ারে বন্দী আমাকে স্মবণ কর।
নৈরাশ্য আসুক, তারপর মর্।
ষষ্ঠ হ্যারির কামনা, নৈরাশ্য আসুক, তারপর মর।
(রিচমন্ডকে) ধার্মিক ও পবিত্র আত্মা,

তোমাব জয় হোক্।
হ্যারি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল, তুমি রাজা হবে।
সে এখন তোমার নিদ্রায় অভয় দিচ্ছে।
দীর্ঘজীবী হও, তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।
[ক্ল্যারেন্সের প্রেতাত্মার প্রবেশ।]

প্রেতাত্মা (রিচার্ডকে)। আমার পাষাণভারে যেন
তোব আত্মা পিষ্ট হয় কাল।
আমি মরে গেছি মাত্রাহীন মদের স্রোতে ভেসে গিয়ে।
তোব ছলনায় ভুলে বেচারি ক্ল্যারেন্স,
পড়েছে মৃত্যুর ফাঁদে।
আমাকে স্মবণ কর কাল যুদ্ধকালে।
তোব তলোয়াব ভোঁতা হয়ে খসে যাক্।
নৈরাশ্য আসুক, তারপর মর্!
(রিচমন্ডকে) ল্যাংকাস্টার বংশেব সন্তান,
ইয়র্কেব নিপীড়িত বংশধররা
তোমার জন্য প্রার্থনা জানায়।
দয়ালু দেবদূতেরা তোমার যুদ্ধ রক্ষা করুন!
দীর্ঘজীবী হও, তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক!
[রিভার্স, গ্রে এবং ভন-এর প্রেতাত্মা প্রবেশ করে।]

রিভার্স (রিচার্ডকে)। আমার পাষাণভারে তোর আত্মা
যেন পিষ্ট হয় কাল। আমি রিভার্স,
যে মরেছে পমফ্রেটে। নৈরাশ্য আসুক,
তারপর মর্।

গ্রে (রিচার্ডকে)। গ্রের কথা স্মরণ কর্, আর
তোর আত্মা নৈরাশ্যে ডুবুক!

ভন (রিচার্ডকে)। ভন্-এর স্মরণ কর্,
আর তোর পাপীমন ত্রাসে
অস্ত্র ফেলে দিক। নৈরাশ্য আসুক,
তারপর মর্!

সকলে (রিচমন্ডকে)। জাগো, জেনে রাখো
আমাদের জন্য রিচার্ডের অন্তরে জমা পাপে
তার পরাজয় হবে। জাগো, আর জয় করে নাও।
[হেস্টিংসের প্রেতাত্মার প্রবেশ।]

প্রেতাত্মা (রিচার্ডকে)। রক্তলোলুপ দুরাত্মা,

পাপমনে জাগ্। আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে
সাঙ্গ কর্ ভবলীলা!
লর্ড হেস্টিংসকে স্মরণ কর্। নৈরাশ্য আসুক,
তারপর মর্!

প্রেতাত্মা (রিচমন্ডকে)। জাগো, জাগো,
শান্ত নিরুদ্বেগ আত্মা,
অস্ত্র ধর, যুদ্ধে যাও, জয় কব,
সুন্দরী ইংলন্ডের দোহাই।

[দুজন যুবক রাজপুত্রের প্রেতাত্মার প্রবেশ।]

প্রেতাত্মাদ্বয় (রিচার্ডকে)। স্বপ্ন দেখ, শ্বাসরুদ্ধ-হয়ে-মরা
দুর্গে বন্দী জ্ঞাতিদের। রিচার্ড, আমরা লৌহভাব হয়ে ঠাঁই নেব তোমাব বুকে, যাতে
তুমি বিনষ্ট হবে,
যাবে ধন, মান আর জীবন।
তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের আত্মা কামনা করে, তোমার
নৈরাশ্য আসুক, তারপর মরো!
(রিচমন্ডকে) ঘুমাও, রিচমন্ড, শান্তিতে ঘুমাও,
আর প্রফুল্ল মনে জাগো,
তোমাকে দযালু দেবদূতেরা বক্ষা করুন
নির্দয়েব উৎপীড়ন থেকে!
দীর্ঘজীবী হও, সুখী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করো!
এডওযার্ডেব অসুখী পুত্রদের একান্ত কামনা
তোমার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক।

[রিচার্ডের পত্নী লেডি অ্যানের প্রেতাত্মার প্রবেশ।]

প্রেতাত্মা (রিচার্ডকে)। রিচার্ড, তোমার পত্নী আমি,
সেই ভাগ্যহীনা অ্যান, তোমার পত্নী,
যে এক শয্যায় নিদ্রা যেতে
পায়নি এক দণ্ড সুখ, আজ তোমার নিদ্রা করে সে
দুঃস্বপ্ন ভরা।
আমাকে স্মরণ করো কাল যুদ্ধকালে,
তোমার তলোয়ার ভোঁতা হয়ে খসে যাক!
নৈরাশ্য আসুক, তারপর মরো!
(রিচমন্ডকে) শান্ত আত্মা, শান্তিতে ঘুমাও,
স্বপ্নে দেখ সাফল্য আর সুখের বিজয়,
তোমার শত্রুর ভার্যা প্রার্থনা জানায়।

[বাকিংহামের প্রেতাত্মার প্রবেশ।]

প্রেতাত্মা (রিচার্ডকে)। আমিই প্রথম যার সাহায্যে করেছিলে
সিংহাসনে আরোহণ। তোমার স্বৈরাচারী শাসনে দলিত
আমিই শেষ জন।
বাকিংহামকে স্মরণ কোরো কাল যুদ্ধকালে,
আর নিজেব পাপেব বিভীষিকা দেখে মরো।
স্বপ্ন দেখ, স্বপ্ন দেখ, করেছ কত পৈশাচিক কাজ,
নিয়েছ কত আয়ু।
চেতনা হাবিয়ে তোমার নৈবাশ্য আসুক,
নৈবাশ্যে যাক প্রাণবায়ু।
(রিচমন্ডকে) তোমাকে সাহায্য দেবাব আগে
আমি মবেছি আশা করে করেই,
কিন্তু প্রফুল্ল কব মন, আর শঙ্কা নেই।
রিচমন্ডের পাশে যুদ্ধ করে ঈশ্বর আব দয়ালু দেবদূত যত,
গগনচুম্বী দর্পে এবার রিচার্ড হবে হত।

[প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হয। বিচার্ড চমকিত হয়ে স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠে]।

রিচার্ড। আমাকে আব একটা অশ্ব দাও।
আমাব ক্ষত বাঁধো ভালো করে।
ভীরু বিবেক, কী নিদারুণ যন্ত্রণা
দিচ্ছ আমাকে!
মশাল জ্বলছে নীল হযে ; স্তব্ধ নিশীথ।
আমার কম্পিত দেহে জাগছে
শীতল ভয়ার্ত জলবিন্দু।
আমার কাকে ভয? নিজেকে?
অন্য কেউ তো নেই ধারে কাছে।
রিচার্ড ভালোবাসে রিচার্ডকে,
তাব মানে, আমি হচ্ছি আমি।
এখানে আছে কোনো হত্যাকাবী?
না।—হ্যাঁ, আমি আছি।
তাহলে পালাই, কী, নিজেব কাছ থেকে?
বিচার কব কেন—
পাছে প্রতিশোধ নিই। কী, নিজের ওপর নিজে?
হায়, আমি নিজেকে ভালোবাসি।
কী কারণে?
নিজের ভালোর জন্যে নিজে কবেছি কোন কাজ?

না! হায়, আমার জঘন্য দুষ্কর্ম দেখে
আমি বরং ঘৃণা করি নিজেকে।
আমি দুরাত্মা ; তবু মিথ্যা বলি,
আমি তা নই।
মূর্খ, নিজের প্রশংসা কর।
খোশামুদি কোরো না, মূর্খ!
আমার জিহ্বা সহস্র জিহ্বাধারী,
আর প্রতি জিহ্বা বলে পৃথক কাহিনী,
প্রত্যেক কাহিনী রায় দেয় আমি দুরাত্মা!
চুক্তিভঙ্গ, চুক্তিভঙ্গ চূড়ান্তকরণ,
হত্যা, নির্মম হত্যা, ভীষণ রকম,
প্রত্যেক পাপ মিলে
একটি একটি ধাপের প্রত্যেক রকম
ভিড় করে বিচারশালায়।
চিৎকার করে, 'দোষী! দোষী!'
আমি নৈরাশ্যে ডুবে যাব। কোনো প্রাণী নেই
ভালোবাসা দেয়, আমি মরে গেলে
কেউ নেই কাঁদে, করুণা করে।
কেন করবে তারা, যখন দেখি
নিজের জন্য করুণা নেই আমার নিজের অন্তরে?
মনে হল যেন দেখলাম, যাদের হত্যা করেছি
তাদের আত্মাদের ভিড় তাঁবুর ভিতরে।
প্রত্যেকে দেখাল ভয়,
কাল যুদ্ধে তাদের প্রতিহিংসার আগুনে
জ্বলবে রিচার্ড।

[র‍্যাটক্লিফের প্রবেশ।]

র‍্যাটক্লিফ। প্রভু!

রিচার্ড। জ্বালাতন! কে ওখানে?

র‍্যাটক্লিফ। আমি র‍্যাটক্লিফ, প্রভু।
গ্রাম্য মোরগ জেগে উঠে দুবার ডেকেছে
ঊষাকে স্বাগত করে।
আর শয্যা ত্যাগ করে বর্ম পরে নিচ্ছে
আপনার বন্ধুগণ।

রিচার্ড। র‍্যাটক্লিফ, আমি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি।

তোমার ধারণা কি—
আমার বন্ধুরা বিশ্বস্ত সবাই?

র‍্যাটক্লিফ। নিঃসন্দেহে, প্রভু।

রিচার্ড। আমার ভয় কবছে, আমাব ভয় করছে,
র‍্যাটক্লিফ!

র‍্যাটক্লিফ। মহামান্য প্রভু, ভয় পাবেন না
ছায়া দেখে।

রিচার্ড। খ্রিস্টের দূত পলের দোহাই.
আজ বাত্রে ছাযা দেখে জাগে বিষম ত্রাস
বিচার্ডেব বুকে, যে ত্রাসে কম্পিত হত না সে
অপটু রিচমন্ড চালিত
অভেদ্য অস্ত্রসজ্জিত দশ হাজার জীবন্ত সেনা দেখে।
এখনো ভোর হতে বাকি। এসো,
আমার সঙ্গে চল,
তাঁবুতে তাঁবুতে আজ আড়ি পেতে শুনি
আমাব সংস্রব এড়াতে চায কোন্ কোন্ জন।
ব্রেখ্‌ট্।
এবাবে আর্টুরো উই-এব দুঃস্বপ্ন

আর্টুরো উই

১৪

[ম্যামথ হোটেলে উই-এব শযনকক্ষ। দুঃস্বপ্নতাডিত হযে উই বিছানায এপাশ ওপাশ কবছে। তাব দেহরক্ষীর চেযাবে উপবিষ্ট, তাদেব কোলেব উপব রিভলভাব।]

উই (ঘুমের ঘোরে)। দূব হও, রক্তাক্ত ছায়া! দযা কর! চলে যাও!

[তাব পশ্চাতেব দেওয়াল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এর্নেস্টো রোমার অশরীরী প্রে আবির্ভূত হয, তাব কপালে বুলেটেব গর্ত।]

রোমা। এ সবই নিষ্ফল। তোমার এই সব খুন,
এই নৃশংস হত্যা, সন্ত্রাস আর খোশামোদ
এ সবই নিরর্থক, আর্টুরো, কারণ
তোমার দুষ্কর্মের মূলে ধরেছে পচন।
এ থেকে ফুটবে না ফুল। বেইমানি হল
দূষিত সার। হত্যা কর, মিথ্যে বল,
ক্লার্ক পরিবারকে ঠকাও, ডালফিটদের জবাই কর,

কিন্তু নিজের দরজায় এসে থামো।
ফন্দি আঁটো দুনিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু সঙ্গী কুচক্রীদের
রেহাই দাও। শতপায়ে শহরটাকে দলো,
কিন্তু অকৃতজ্ঞ কুকুর, পিষ্ট কোরো সেই পা।
সবাইকে ছলনা কর। কিন্তু ঠকাতে যেও না তাকে
দর্পণে দেখ যার মুখ।
আমাকে আঘাত দিয়ে, আর্টুরো, আঘাত করেছ নিজেকে।
শুঁড়িখানার মেঝেতে যখন তুমি শুধু ছায়ার ফালি
তখনই তোমার ভাগ্যে আমার ভাগ্য দিয়েছি জুড়ে
এখন আমি অনাদি অনন্তে লীন,
বিষণ্ণ অশরীরী, আর তুমি বৈঠকে বসো
চটকদার ধনগর্বী ব্যবসাদার নিয়ে।
কৃতঘ্নতায় জন্ম তোমার, কৃতঘ্নতায় সাঙ্গ হবে খেলা।
প্রতারণা করেছ যেমন তোমার বন্ধু আর সহকারী
এর্নেস্টো রোমাকে, প্রতারিত হবে যেমন
আরো কত লোক,
আর্টুরো, তাদের সবার প্রতারণা তেমনি
তোমার ভাগ্যে আছে শেষে।
সবুজ ঘাসে ঢাকা আছে এর্নেস্টো রোমা,
কিন্তু তোমার কৃতঘ্ন আত্মা ঘোরে বাতাসে
কবরের পাথরে পাথরে মাথা ঠুকে
সবার সমুখে, কবরখনকরাও চোখে দেখে।
সেদিন আসবে, আর্টুরো, যেদিন
হত্যা করেছ যাদের, আর
এখনো ঝরাবে যাদের খুন
তারা উঠবে জেগে।
তারা রক্তঝরা দুর্বল দেহধারী, তবু
প্রবল ঘৃণার তেজে তোমার বিরুদ্ধে
তুলে নেবে হাতিয়ার।
চতুর্দিকে তাকাবে সাহায্য চেয়ে
যেমন চেয়েছি আমি। তারপর
প্রলোভন, হুমকি আর অনুনয়বিনয় শেষে।
তবু সহায় হবে না কেউ।
আমার বিষাদে কেউ কি দাঁড়াল এসে?

উই (চমকে লাফিয়ে উঠে)। গুলি করো! মারো ওকে! বেইমান!

ফিরে যা মৃতের জগতে!

[দেহরক্ষীরা উই-নির্দিষ্ট স্থানে দেওয়ালে গুলি ছোঁড়ে।]

রোমা (মিলিয়ে যেতে যেতে)। আমার যেটুকু অবশেষ ভয় নেই আর গোলাগুলি হতে।

উপসংহার

অতএব শুধু চেয়ে থাকা নয়, শেখো কেমন করে দেখে।
সারাদিন আর শুধু কথা নয়, কাজে নামো আজ পথে
জগৎটাকে দিয়েছিল প্রায় এক ধাড়ি বাঁদরে হেঁকে
সবজাতি মিলে ভাগিয়ে তাকে কেল্লা করেছে ফতে
আনন্দের দিন আসেনি, যদিও এবার প্রাণটা গিয়েছে রেখে
যে গর্ভে জন্মেছে সে তা পারে এখনো সজীব হতে।

সমা। দৃষ্টিভঙ্গিতে এত পার্থক্য? মানুষ সম্পর্কে আপনারা কে কী ভাবেন আমার জানতে ইচ্ছে করছে। মিস্টার শেক্‌স্‌পিয়ার, মানুষ কী?

শেক্‌স্‌। আশ্চর্য সুন্দর এক রহস্য।

সমা। একটু বিশদ করে বলুন।

শেকস্‌। আগেই তো বলেছি, মানুষ পাপ করলেও আমার কাছে সে সুন্দর। একটা কুকুর তো পাপ করতে পারে না। পারে মানুষই। আমরা মানুষের দিকে তাকিয়েছিলাম স্বপ্নালু চোখে, তার সম্ভাবনা যে অনন্ত একথা ধ্যান করতে করতে। হ্যামলেটের ভাষায়—What a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculties! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god!

সমা। হের ব্রেখ্‌ট্‌, মানুষ সম্পর্কে আপনি কী ভেবেছেন?

ব্রেখ্‌ট্‌। দেখুন, শেক্‌সপিয়ারের মতন নিষ্পাপ সরল চোখে মানুষের দিকে চাইতে পারলে বড়ো খুশি হতাম। কিন্তু পারছি না। ওঁদের সময়ে ফিউদাল সমাজ ধসে যাচ্ছিল, ঈশ্বরের স্থানে মানুষের উপাসনা ছিল এক বৈপ্লবিক প্রবর্তন। কিন্তু চারশো বছর পরে আমরা দেখছি রেনেসাঁসের সেইসব মহান স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে যে রোম্যান্টিক সব আশা ইয়োরোপে জেগে উঠেছিল, একে একে আমরা সাক্ষী থেকেছি তাদের চরম বিপর্যয়ের। আমরা দেখেছি বৈপ্লবিক পুঁজিবাদ কদর্য মুনাফা-সর্বস্বতায় পরিণত হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে, বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর-সদৃশ মানুষকে নতুন নতুন দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে পুঁজিবাদ আজ সারা পৃথিবীকে—হ্যামলেটের ভাষায় this goodly frame, this earth, this most excellent canopy the air, look you, this brave o'erhanging firmament—একে স্রেফ বিকিকিনির বাজার করে

ছেড়ে দিয়েছে। এখন পুঁজিবাদের মৃত্যুর মুহূর্তে আর মোহগ্রস্ত চোখে মানুষের দিকে তাকাবার কোনো অবকাশ নেই। এখন আমাদের হাতে এসেছে মার্কসীয় ক্ল্যাসিক্স্-এর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যার দ্বারা আমরা মানুষকে বিশ্লেষণ করতে পাবি। স্বপ্ন দেখার আর প্রয়োজন নেই, তাই স্বপ্নভঙ্গের হতাশাও আর আসবে না কখনো।

সমা। মার্কসীয় ক্ল্যাসিক্স্-এব বিচারে মানুষের সংজ্ঞা কী?

ব্রেখ্ট্। মার্কসবাদ একথা ধবে নেয় না কোনো মানুষ ভালো বা খারাপ—সে in apprehension how like a god কিনা এ-প্রশ্নই অবান্তব। বিচার্য বিষয় হচ্ছে তার ক্রিয়াকাণ্ড কী, এবং সে-ক্রিয়াকেও দেখতে হবে তার শ্রেণীগত ও সামাজিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে যুক্ত করে। এ-সমাজে যে কাজটা গর্হিত, অন্য এক সমাজে সেটা গর্হিত বলে বিবেচিত নাও হতে পারে , এক শ্রেণীর কাছে যে কার্যকলাপ প্রশংসনীয় অন্য শ্রেণীর কাছে তা ধিকৃত হতে পারে। আসলে মার্কসবাদ মানুষকে দেখে বহু সম্পর্কের একটি জটিল ও পরিবর্তনশীল সমন্বয় হিশেবে। একজন মানুষের জীবন তার নানা সম্পর্কদ্বাবা নিয়ন্ত্রিত। প্রথমত তার পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে সম্পর্ক। তারপর অবশ্যই সে তার শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত। তারপর বয়েছে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক। এবং রয়েছে সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক। এবং মনে রাখতে হবে এই সম্পর্কগুলি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। সুতরাং মানুষ শুধু এই সম্পর্কগুলির যোগফলই নয়। সে এই সব সম্পর্কের এক চলমান ইতিহাস। পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে করতে আমরা সহজেই হাজির হয়ে যেতে পারি সমাজে পরিবার-প্রথার উদ্ভবের কালে। রাষ্ট্রের সঙ্গে তার ক্রমপরিবর্তনশীল সম্পর্ক অধ্যয়ন করলে আমরা মানবসমাজে রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, রাজতন্ত্রের উদ্ভব এবং তৎপূর্ববর্তী আদিম সাম্যবাদী সমাজে উপনীত হতে পারি। উপরন্তু এই সম্পর্কগুলি প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, কেননা জগতে পরিবর্তন ছাড়া কিছুর অস্তিত্ব নেই।

সমা। বেশ জটিল ব্যাপার।

ব্রেখ্ট্। জটিলতার এখানেই শেষ নয়। যেই মুহূর্তে মানুষ এই সব সম্পর্কগুলির কোনোটি সম্বন্ধে সচেতন হয় সেই মুহূর্তে ওই সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

সমা। কী রকম? কী রকম? উদাহরণ?

ব্রেখ্ট্। ধরুন, রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। নাগবিক হিশেবে কী কী অধিকার তার থাকার কথা এসব যেদিন মানুষ জানতে পারে সেদিনই সে বোঝে রাষ্ট্র তাকে প্রতারিত করছে। সেই মুহূর্ত থেকে অনুগত নাগরিক পরিণত হয় বিদ্রোহী নাগরিকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক এতদিন ছিল সেটা সম্পূর্ণ পালটে গেল। এই অর্থে জানতে পারাটাই প্রাথমিক বৈপ্লবিক ক্রিয়া হয়ে ওঠে। মানুষের এই মার্ক্স্বাদী সংজ্ঞা দিয়েছেন কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক আনতোনিও গ্রামশি।

সমা। মানুষ যদি এত জটিল হয় তাহলে তাকে নাটকে আনবেন কী কবে?

ব্রেখ্ট্। আনা যায় না তো। একমাত্র যিনি কাছাকাছি এসেছেন, যাঁর নাটকে আমরা মানুষকে দেখি তার সব সম্পর্ক সুদ্ধু মঞ্চে উঠতে, এবং সেই সম্পর্কগুলির পিছনে স্পষ্ট অনুভব কবি পেছনে দীর্ঘ ইতিহাসের-ঐতিহ্যের উপস্থিতি, অথচ নাটকেব পবিসবের মধ্যেই প্রবলভাবে সম্পর্কগুলি ভেঙেচুরে যায়, অন্য রূপ নেয়—তাঁর নাম উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়ার। নাটকের নাম 'কিং লিয়ার।'

[সকলেব কবতালি। শেক্‌স্‌পিযার কুর্নিশ করলেন।]

শেক্‌স্। I thank thee, kind sir!

ব্রেখ্ট্। লিয়াব ও তাঁর কন্যাত্রয়ের সম্পর্কের মধ্যে আমরা স্পষ্ট অনুভব করি প্রাচীন ইংলন্ডেব পবিবাব-ব্যবস্থাব বিকাশ, যখন বৃদ্ধ দলপতি বা পাট্রিয়ার্ক ছিলেন যৌমজীবনের একচ্ছত্র অধিকর্তা—যেজন্য নাটকটা শুরুতে প্রাচীন উপকথাব আকাব নেয। তাবপবই দেখি লিয়ার-স্রষ্টার সম্পর্কেব মধ্যে বাজানুগত্যের প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ, যাব মধ্যে যৌমজীবন থেকে উত্তরিত সমাজে ফিউদাল বাজতন্ত্রেব অভ্যুদযের ইতিহাস। এই আনুগত্যের পবীক্ষা চলে সাবা নাটকে, মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হয় সব সম্পর্ক। যে ছিল সবচেয়ে অনুগত সে হয় বিদ্রোহী, আর বিদ্রোহী তরবারি হাতে ছুটে আসে বাজাকে রক্ষা কবতে। মানুষেব এমন চিত্রণ বিশ্বনাট্যসাহিত্যে আব হয়নি।

যুবক১। আপনি পারেননি?

ব্রেখ্ট্। না। এবং চেষ্টাও কবিনি। আমি অন্য পথে সমস্যাটা সমাধানেব চেষ্টা করেছি। আমি সব সম্পর্কগুলিকে একত্রে না ধবে একেক দৃশ্যে মানুষেব একেকটি ভাব, একেকটি মানসিক অবস্থা ধরার চেষ্টা কবেছি। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিযেছি, সামগ্রিক নয।

যুবক২। কী হেতু?

ব্রেখ্ট্। কারণ রাজপথে নাটক কবে আমাব নাট্যজীবন শুরু। আমাব কাজ ছিল বাস্তাব শ্রমিককে বোঝানো মানুষ কী, জগৎ কী, জীবন কী। তাই সহজ বিশ্লেষণী পদ্ধতি। আমার একটা কবিতা বলি

সেদিন ধূলিধূসর এক রাস্তায়
আমাব দর্শকের সঙ্গে দেখা।
তাব হাতে ছিল একটা কযলাখনির ড্রিল।
মুহূর্তেকেব তরে
সে মুখ তুলল। ওইখানে ঘববাড়ির ফাঁকে
আমি আমার থিয়েটার সাজালাম।
তার মুখে ফুটল আশা।

মদের দোকানে
আবার দেখা, তার মুখ ঘর্মাক্ত, কালি মাখা,

অন্য হাতে পুরু স্যান্ডুইচ।
মদ খাচ্ছিল,
আমি থিয়েটার সাজালাম।
সে একেবারে অবাক।

আজকে আবার দেখা—
স্টেশনেব বাইরে দেখি ব্যান্ড বাজছে
বন্দুক কাঁধে সে চলেছে যুদ্ধে।
ভিড়েব মধ্যেই আমি থিয়েটাব সাজালাম,
সে ঘাড় ফিবিয়ে তাকাল,
মাথা ঝোঁকাল সামান্য।
পথচলতি ওই ঘর্মাক্ত শ্রমিকেব অনুমোদন ছিল আমার সাবা জীবনের লক্ষ্য, কমবেড্‌স্। তাব প্রযোজনে আমাব যত পরীক্ষা-নিরীক্ষা—নাট্যবচনায, প্রযোজনায়।

[শেক্‌স্‌পিযাব উঠে এসে কবমর্দন কবেন।]

শেক্‌স্। For ever and forever farewell, Cassius
If we do meet again, why, we shall smile .
If not, why then this parting was well made

ব্রেখ্‌ট্। একটা কথাই শুধু বলতে পাবি,
Meister, we ask and ask,
Thou art still, outtopping knowledge

সংযোজন

নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু

নাট্য আন্দোলন বলতে কী বোঝায় সে নিয়ে যাঁরা কৃত্রিম অজ্ঞতাব ভান করে বৈদগ্ধ্য প্রচার কবেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। মোটামুটি সকলেই আজ বুঝে নিয়েছেন, কোন নাটক, কোন সম্প্রদায় নাট্য-আন্দোলনে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত—আর কোন থিয়েটারগুলি নিছক অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে নাটক করেন—আব কোন দলগুলি বছবে একদিন আমোদ-আহ্লাদের জন্যে নিছক নাটক করেন।

আজ আলোচনা সীমাবদ্ধ বাখব ওই নাট্য-আন্দোলনে আব তার বিষয়বস্তুতে।

বর্তমানে অধিকাংশ হলের পুবোহিতরা নাটকের অভাবেব দোহাই পাড়েন। সেইজনাই নাকি যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। বাংলায় নাটক নেই কি? পুরোনো নাটক—প্রায় বিস্মৃত, অবজ্ঞাত, ঔদাসীন্যে ক্লিষ্ট—বহু রয়েছে, এটা সকলেই জানেন। এবং তার মধ্যে অনেকগুলিই নূতন আলোয় পুনরভিনীত হওয়ার যোগ্য এও পরোক্ষে অনেকেই স্বীকার করেন। তবু সেগুলির অভিনয় হয় না। এলিয়ট শেক্সপিয়ারেব সমসাময়িকদের প্রায় শেক্স্পিযারের পর্যায়ে তুলে ছেড়েছেন। অথচ এখানে কাগজে হঠাৎ একদিন দীনবন্ধু মিত্রকে নাট্যরসহীন আখ্যা দিয়ে ছেড়ে দেওযা হয, ছাপা অক্ষবে এক 'কবি' মাইকেলকে অকবি সংজ্ঞা দিয়ে আমাদেরকে কুসংস্কাবমুক্ত কবাব চেষ্টা কবেন। এ ধরনের নিধিরামের সর্দাবিতে ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয, মূল্যায়ন হয না, গালাগালি হয।

একটা অভিযোগেব হয়তো কিছুটা ভিত্তি আছে—ভালো সমসাময়িক নাটক বড়ো একটা দেখা যাচ্ছে না। এর জন্যেই বা দোষ দেওযা হবে কাকে? নাট্যসংস্থাগুলি নিজেদেব নাট্যকাব সৃষ্টি কবছেন না কেন? নাটক যা লেখা হচ্ছে তার এমন দুর্দশা কেন?

একটু লক্ষ কবলে দেখা যায, সব নাটকই জীবনকে প্রতিফলন কবাব নাম করে আসলে জীবনকে অনুকবণ করছে। ওই যে ডেভিড হিল ফোটো তুলতে শুরু কবলেন ১৮৪০ নাগাদ—সেইসঙ্গে দগ্ধ করলেন আমাদেরকেও। পৃথিবী জুড়ে প্রায একশো বৎসব ধরে চলল ফোটোগ্রাফির দৌরাত্ম্য—উপন্যাসে, কাব্যে, ছবিতে, থিয়েটাবে।

তবে অন্যেরা কাটিযে উঠলেন এক সময়ে ; থিয়েটারে এখনও কাটেনি। কাটাতে গিয়ে পর্যুদস্ত হলেন অনেকে—গর্ডন ক্রেগ থিয়েটার ছেড়ে দিলেন, মায়ারহোল্ড্ মরেই গেলেন, টলার করলেন আত্মহত্যা, ভাখ্তানগভ অকালমৃত্যু বরণ কবে মুছে গেলেন। একমাত্র ব্রেখ্ট্ অগ্নিপবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরুলেন। কিন্তু ব্রেখ্ট্ ব্যতিক্রমমাত্র। সব দেশের শ্রেষ্ঠ থিয়েটারে আজও ফোটোবাদীদের রাজত্ব। বিপ্লবীবা শহরের কোণে পবিত্যক্ত গুদামঘর ভাড়া নিয়ে টিমটিম করছেন।

বাংলাব নাট্যকারদেরও ওই রোগে পেযেছে। নাটক খাটো হয়ে গেছে, নির্জীব ক্লান্ত হয়ে

গেছে। প্লট জিনিসটাকে পরিণত করা হয়েছে কিছু ঠাণ্ডা-গরম কথার মারপ্যাঁচে। নাটকে এসেছে মধ্যবিত্ত ভাব। ঝগড়াটে বাপ, অনূঢ়া কন্যা, ছিটগ্রস্তা ভার্যা, বেকার যুবকের অন্তর্দ্বন্দ্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে নাটক। অন্যথায় ছাঁটাই যুবক, আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে ওই পূর্বোক্ত পারিবারিক কলহই পাঁচমিশেলি করে যাই-কিছু গরম বক্তৃতা দিয়ে আসর গরম করা হচ্ছে।

আমবা একথা কখনও বলছি না যে অত্যন্ত সাধাবণ জীবনের সাধারণ কথাবার্তা থেকে মহৎ নাটক সৃষ্ট হতে পাবে না। আমবা বলছি—এ-ই সব নয়। এটাই জীবনের চেহারা ধরাব একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। আমরা বলছি—জীবনকে অনুকরণ করতে গেলে শুধু জীবনসদৃশ সংলাপ বসিয়ে যেতে হয়, আর তাহলে মানুষেব চিন্তার যে বিশাল জগৎটা, সেটা থেকে যায় বাদ। বলাব সত্যটা ধবা পড়ে, না-বলার বৃহত্তর সত্যটা থাকে অপ্রকাশিত।

আর মানুষ যা করে যা বলে, তার চেয়ে ভাবে ঢের বেশি। একটি যুবক বাববাব আঘাত পেয়ে আত্মহত্যা কবল। সত্যিকারের জীবনে সে কী করে? পায়চাবি কবে, রাত্রে ঘুমোয না, প্রিযজনের সঙ্গে কথা বলে না—বড়োজোব চুলগুলি অবিন্যস্ত হয়, চোখে নামে এক উন্মাদ স্বপ্ন। তাবপর একদিন এক টুকরো কাগজে লিখে যায়—আমার মৃত্যুব জন্যে কেউ দায়ী নয়। লোকে এসে দেখে চোখ বিস্ফারিত কবে সে উদ্‌বন্ধনে শেষে মূক প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এটুকু তাব কার্যকলাপ—এটুকু তুলে ধরলে নাটক হয়তো হতে পারে।

কিন্তু এব পেছনে যে চিন্তার জাল বুনে গেছে সে, মানবসত্তাব ইতিহাস আউড়ে গেছে তা কি বৃহত্তব সত্য নয়? তা কি নাটকের উপজীব্য হবে না? এই অনুক্তকে ধ্বনিত করলেই শোনা যায় 'টু বী অর নট্‌ টু বী'-র মতন মৃত্যু-বিপ্লবের অথবা 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' ধরনের এক দীর্ঘশ্বাস।

মানুষের সুপ্ত কবিত্ব, অব্যক্ত প্রতিবাদ, নিভৃত কামনারাশি—সবই নাটকে স্থান পাওয়া উচিত। তাহলে অবশ্যই নাটককে আর ফোটোগ্রাফ করে রাখা চলে না , অবশ্যই চরিত্রগুলিকে চেনাজানা সাধাবণ মানুষ কবে রাখা চলে না ; নাই বা রাখা গেল। ফোটোগ্রাফ না হয়ে সে হয়তো যামিনী রায়ের ছবি হয়ে উঠবে।

উজিয়ে দেওয়া যাক রং, চড়িযে দেওয়া যাক সুর ; ঘটুক ঘটনাব পর ঘটনা—জীবনে যতটুকু ঘটে তার চেয়ে ঢের বেশি। ট্র্যাজিডি পর পর এসে দলিত মথিত করে দিক যোগেশের সাজানো বাগানকে। ফাইল-ঘাঁটা মিহি কেরানির ক্ষুদ্র জীবনকে বিশাল কুরুক্ষেত্রের রূপ দেওয়া যাক। টাইপরাইটারে খটখট করতে করতে একদিন সিংহনাদ করে উঠুক নয়া অর্জুন।

কিন্তু তার ধারে-কাছেও যাচ্ছে না আজকের নাটক। এমন একাগ্রচিত্তে চলেছে ফোটোগ্রাফির সাধনা যে কখন একটু বাস্তবতার ভান কেটে যায় সেই আশঙ্কায কুঁজো বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন নাট্যকার ; ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করছেন মানুষকে ; ফিকে থেকে আরো ফিকে করছেন রং, ঘটনাহীন, বর্ণহীন স্বাদহীন করে তুলছেন থিয়েটারকে, ঠিক জীবনে যেমনটি ঘটে।

অতিশয়োক্তি, ইচ্ছাকৃত বাঁকানো-চোরানো—সব আধুনিক শিল্পের মূল কথা। যাব নাম জানি নাকো বাস্টিলের প্রাচীরে তার পদাঘাত দেখেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। হাজার বছর ধরে পথ হাঁটেন জীবনানন্দ বনলতার মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য দেখতে। এলিয়ট দেখেন ফাঁপা মানুষ

মাথায় ঠাসা খড়। ব্যাঁবো দিব্যচক্ষে দেখতে পান খুনেদের যুগ আসন্ন—

ও! তু'লে ভিস্, কলের, লুক্সুর
মার্যানিফীক্, লা লুক্সুর
সুর্‌তু মঁসোঁজ এ পাবেস্।

গানের আশ্চর্য শক্তিটা কোথায়? মালকোশের সা পা মা ধা নি সা বারবার আওড়ালেই কি মালকোশ? না মধ্যমে বাববাব দাঁড়ালেই মালকোশ? স্ববগুলি নিযে খেলতে খেলতে এক বিশাল ৰূপ সৃষ্টি হবে—তবেই না মালকোশ। মালকোশে বাস্তবতা কতটুকু? প্রশ্ন শুনলে হাসি পায় না? মল্‌হারে বৃষ্টির শব্দ নকল কবা হয কি? বড়ো ওস্তাদ গাইলে বৃষ্টি বজ্র সবই শোনা যায় বটে —তবে তা ছাড়াও আরো অনেক কিছুই শোনা যায়, অন্তরে অনেক কথাই প্রতিধ্বনিত হযে ওঠে। বসন্ত রাগে কি বসন্তকালীন প্রাকৃতিক বর্ণনাব চৌহদ্দিও আটকে বাখা যায়? বাধাকৃষ্ণেব হোলিখেলাব ধাবাবিববণীতেই কি বাহাবেব বৈশিষ্ট্য?

যতই চেষ্টা হয়েছে সংগীতকেও একটা বাস্তবতাব চেহাবা দেওযাব ততই সে ফসকে গেছে, মেলে ধবেছে ডানা, আকাশবিহঙ্গীর মতন কল্পনাব অন্তরীক্ষে উধাও হযেছে। কত বাগৰূপ দিযে গেছেন ঋষিবা , সংগীত কিন্তু বাঁধা পডল না। টমাস মুব-এব মিন্‌স্ট্রেল্-এব মতন সংগীত চিবস্বাধীন।

পশ্চিমে সংগীতেব উপব আবো বেশি জববদস্তি হযেছে। অব্‌জেকটিভ্ মিউজিক, ভিভিড্ মিউজিক প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ কবে এক শ্রেণীব সংগীত সৃষ্টিব চেষ্টা হয়েছে বাস্তবেব সঙ্গে যার যোগ থাকবে প্রত্যক্ষ। ব্যর্থ হয়েছে চেষ্টা। চাইকোভ্‌স্কিব '১৮১২' ওভাবচাব-এ মুহূর্তেব জন্য শোনা গেছে তুষাবঝডেব হাহাকাব, পরমুহূর্তে হাবিযে গেছে, জেগে উঠেছে আবেগেব ঝড। বেঠোফেন ষষ্ঠ সিমফনিতে শুনিয়েছেন ঝডেব গর্জন , পরেব অংশেই এসেছে শেপার্ড্‌স হিম্--কোন এক অনির্বচনীয আনন্দে হেসে উঠেছে সুরকার।

চিত্রকলাব কথা নাই বা বললাম। চিত্রকলায ফোটোগ্রাফির হাঁড়ি তো বহুদিন ফেটেছে। উপবন্তু থুলেস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকবা বলেছেন চিত্রকববা বিকৃত কবে যা আঁকছেন তা আসলে বিকৃত নয, চোখ নাকি সত্যি তাই দেখে। তাকে যাঁবা ফোটোগ্রাফেব মতন নিখুঁত কবে তোলেন তাঁবা সত্যেব অপলাপ কবেন।

চলচ্চিত্রে আইজেনস্টাইন বাস্তবোত্তব যে স্তবে গিয়ে পৌঁছেছেন তাকে কি আর্ট বলে মানা হবে না? 'ইভান দা টেরিব্‌ল্'-এর রহস্যময় দাডি নিয়ে আধা-ভৌতিক আবহাওযা সৃষ্টি হয়েছে তাও সত্য—বাহ্যিক সত্য না হলেও আন্তবিক সত্য।

অপেবাব কাহিনী এত ঘটনাসংকুল কেন হয? কেন বিগোলেত্তোকে উত্যক্ত করে মাবে দুর্দৈব? কেন নিজেব কন্যাকে প্রমাদবশে দিয়ে আসে সে বাজাব অঙ্কশাযিনী হতে? কেন তেমনি নিজেব প্রমাদবশে নিজের কন্যার বুকে কবে ছুরিকাঘাত? কেন কন্যার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে দুজনেব দীর্ঘ দ্বৈত কণ্ঠসংগীত? স্পাবাফুচিলে চবিত্রটাই বা কেন এত ভীষণ? ঘটনার সম্ভাব্যতার বিচাবে 'বিগোলেত্তো' অবাস্তব, মিথ্যা। জীবনসত্যেব বিচারে 'বিগোলেত্তো' অমর সৃষ্টি।

শেক্‌স্‌পিয়াব কেন কবেন এত ঘটনা সংস্থাপন? 'হ্যামলেট'-এ কী নেই? গুপ্তহত্যা,

বিষপ্রয়োগ, তলোয়ার-খেলা, ভূত, শবেব ছড়াছড়ি। তাই বলে কি অবাস্তব?

রবীন্দ্রনাথ কেন কাব্যের রঙে সিঞ্চিত করেন 'রক্তকরবী'কে? 'রক্তকরবী' আধুনিক সমাজের মূল জিজ্ঞাসায় পৌঁছে গেছে। বর্তমান জীবনের ভিত্তিকে ধরে নাড়া দিচ্ছেন বিশ্বকবি। অথচ যেখানেই বর্তমান জীবনের সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজতে গেছি সেখানেই দেখেছি 'রক্তকরবী' বর্তমানকে ছাড়িয়ে উচ্চতর এক কাব্যলোকে উঠে গেছে। সে বর্তমানের হয়েও সর্বকালের। সবই বলা হচ্ছে, তারপরও আরো কিছু বলা হচ্ছে। এমনকী যেখানে চরিত্রের নাম নেই, বরং সমাজের এক অতিপরিচিত শ্রেণীর নামে ভূষিত হয়েছে চরিত্র—যেমন অধ্যাপক—সেখানেও অধ্যাপকসুলভ কথাবার্তা শুনতে পাব না। কোনো কোনো অতি-রাবীন্দ্রিক আছেন যাঁরা এটুকু শুনেই খেপে গিয়ে 'হ্যামলেট' পর্যন্ত টান মাবেন, রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করেও। দোহাই আপনাদের, ববীন্দ্রনাথকে বক্ষা করাব প্রয়োজন নেই—শেষটুকু শুনুন। বক্তব্য হচ্ছে—অধ্যাপক বলতেই যে চশমা-আঁটা তার্কিকের চেহারা মানসপটে উদিত হয় সে অধ্যাপক 'রক্তকরবী'তে নেই। বাস্তব অধ্যাপকেব বাস্তব লেকচাবকে কাব্যগুণে মণ্ডিত করে বিশ্বকবি ইচ্ছে করেই বাস্তবতাব ভানকে ছিন্নভিন্ন করছেন—-পরিবর্তে দিয়েছেন তাকে বাস্তবোত্তর কল্পলোকেব চেহারা। বাস্তব পরিহাব করে ববীন্দ্রনাথ শেক্স্পিয়াবের মতনই সত্যে গিয়ে উপনীত হয়েছেন।

বাংলার বর্তমান নাট্যকাববা এই সত্যেব দিকে যেতে পাবছেন না, তাঁবা বাস্তবেই আবদ্ধ। বাস্তবে লোকে যা বলে যা কবে তার ক্ষীণ অনুকবণেই তাঁবা শৃঙ্খলাবদ্ধ।

মানুষ সম্ভাবনাব সমষ্টি। গোটা মানুষটাকে ধরতে হবে। তার বহিঃপ্রকাশ স্বল্প—নাটকের ওইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা চলবে না।

অঙ্গারে আঙ্গিক

আমরা লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ, মিনার্ভা নিয়েছি এক বছর হতে চলল। বাধা এসেছে অজস্র ; আইনের বাধা, দুষ্ট লোকের কারসাজি, অর্থাভাব, হতাশা, শত্রুপক্ষের 'গেল গেল' ধ্বনি এবং সেই সঙ্গে উল্লাসের হাসি, পোস্টার-যুদ্ধ, পেশাদার নাট্যশালাব একতাবদ্ধ প্রতিরোধ, অপেশাদার কারো কাবো অবিমিশ্র ঈর্ষা।

তবু আমবা মবিনি। যাজ্ঞসেনার মতন 'নীচেব মহল'-এর ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমরা এনেছি 'অঙ্গাব'।

আর 'অঙ্গাব' বহু সহস্র দর্শকের আশীর্বাদ কুড়িয়েছে, শত্তুবেব মুখে ছাই দিয়েছে।

'অঙ্গার'কে এখন আব অস্বীকার করার উপায় নেই। ভালো হোক, খারাপ হোক—একটা কিছু বলতেই হবে। সুধীমণ্ডলীর অচলায়তনিক নীরবতা ভেঙেছে।

এই ভালো ও খারাপ—দুইই আমরা শুনেছি। অধিকাংশেব মতে 'অঙ্গাব' ভালো—এটাই আমাদেব পুবস্কাব, আমাদের শ্রমেব সুদসুদ্ধ মূল্য, আর কিছুই আমবা চাই না। রোজ সকালে টেবিলে দেখি চিঠিব স্তূপ, দর্শকদেব লেখা চিঠি, সাধুবাদ, সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান উপদেশ, সমালোচনা, কখনো বা নির্মম আক্রমণ। এ সবই আমাদেব গলায় ঝুলানো মেডেল, বা বিদ্যাসাগরের চটি।

এই চিঠিগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে আমাদের যা সামান্য দান। ধানবাদ, আসানসোলেব খনি মজুবদের লেখা চিঠি—তাঁরা বলেছেন 'অঙ্গার' তাঁদেব মনের কথাটা বলতে পেরেছে, তাঁদের অন্তরেব নীরব প্রতিবাদকে প্রকাশ কবতে পেরেছে। আর কী চাই ? চুরুট ধরিয়ে দাঁড়াই সকালে প্রাচীন মিনার্ভাব বাবান্দায়—মনে হয় কোথায় যেন জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি।

আর কতগুলি চিঠিতে ধন্যবাদ পেয়েছি এই প্রথম শ্রমিকশ্রেণীব বক্তব্যকে পেশাদার মঞ্চে উপস্থিত কবাব জন্যে। 'অঙ্গার' কোনো সমঝোতা করেনি, কোনো আপোশ কবেনি। লিট্‌ল্ থিয়েটাব গ্রুপ যে নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী সে-আদর্শকে পুবোপুবি বজায় রেখেই 'অঙ্গারের' অভিযান।

ধন্যবাদ পেযেছি আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জার জন্য। ধন্যবাদ ববিশঙ্করের সংগীতের জন্য। এ সবই (বলছেন দর্শকরা) বাংলা পেশাদার নাট্যশালায় বিপ্লব-স্বরূপ।

অজস্র ভুলও 'অঙ্গাবে' দেখিয়ে দিয়েছেন দর্শকবা, চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোথায় সরে গেছি বাস্তব থেকে। চিন্তা করেছি আমরা এগুলি নিয়ে, সংশোধন করেছি নিজেদের।

কিন্তু বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কিছু লোক অধুনা একটি বিষয নিযে আদাজল খেয়ে লেগেছেন—'অঙ্গারে' আঙ্গিকের স্থান। বহুদিন থেকেই শুনছি এটা, পডছি কাগজে। প্রতিবাদ

গর্জে উঠেছে মনে, নিজেকে চাবুক মেরে স্তব্ধ করে রেখেছি। ভেবেছি—জবাব দেব মঞ্চে, জবাব দিচ্ছেন কলকাতার নাট্যদর্শকেরা। কিন্তু আজ নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি—সাধ্যমতো আলোচনা করব বিষয়টি নিয়ে। দেখব অভিযোগটি কতটা যুক্তিযুক্ত।

'অঙ্গার' নাটকে নাকি আঙ্গিক প্রধান হয়ে উঠেছে, চেপে দিয়েছে নাটককে ; আঙ্গিক নাকি সব সময়ে ইঙ্গিতধর্মী হওয়া উচিত যাতে সে নাটককে ডুবিয়ে না দিতে পারে। যন্ত্রের ব্যবহার নাকি নাটককে পঙ্গু করে দিয়েছে।

এ অভিযোগের মূল কথাটা কী? নাটক এবং আঙ্গিক—দুয়ের মধ্যে যেন সতীনের সম্পর্ক ; এক হেঁসেলে যদি দুজনকে আসতেই হয় তাহলে বড়ো সতীনের কর্তৃত্বই বজায় থাকা উচিত। নাটক এবং আঙ্গিকের মধ্যে যেন একটা বিরোধ, একটা সংঘর্ষ ধরেই নেওয়া হয়েছে। নাটক যেন স্বর্গীয় তুরীয় একটা ব্যাপার। মঞ্চে যদি তাকে আসতেই হয় তবে যেন আঙ্গিকের পার্থিব কর্কশ ছোঁয়ায় তার অঙ্গহানি না হয়। বলা বাহুল্য এ ধরনের বিরোধ সমালোচকদের কল্পনা মাত্র। নাটক ও আঙ্গিক একই দেহের দুই অংশ, এরা সহজাত, এরা পরস্পরের পরিপূরক। এমন নাটক নিশ্চয়ই আছে যেখানে কথাটাই মুখ্য—সেখানে আঙ্গিককে চাপা থাকতে হবে, নাটকের প্রয়োজনেই সে কথার খিদমতগারি করবে। আবার এমন নাটকও আছে যেখানে নাট্যকার লেখার সময় থেকেই আঙ্গিকের কথা ভেবেছেন, আঙ্গিককে ডাক দিয়েছেন কথার সঙ্গে একাসনে বসতে। এমন নাটকে আঙ্গিক চাপা থাকবে না, সে চড়া হয়ে উঠবে, বড়ো, স্পষ্ট, প্রকট হয়ে উঠবে, নইলে কথা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ—নাট্যকার যে অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছেন আঙ্গিকের উপর! নাটকের প্রয়োজনে আঙ্গিকের তারতম্য। নাটকে আঙ্গিকে বিরোধ নেই, আছে গভীর সখ্য।

আবার আঙ্গিক শুধুমাত্র অলঙ্কার নয়, পোশাক নয় যে ইচ্ছামতো তাকে খুলে রেখে নাটকের নগ্নদেহের সৌষ্ঠব দেখানো যায়। আঙ্গিক পোশাক নয়, আঙ্গিক দেহেরই অংশ। তাকে বাদ দিলে নাটক খর্ব হয়, পঙ্গু হয়। যে নাট্যকার আঙ্গিককে কথার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে চাইছেন তাঁর মানস থেকেই দুয়েরই উৎপত্তি। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে কী করে দেখেছেন সমালোচকরা বুঝতে পারি না। 'অঙ্গারে' আঙ্গিক 'অঙ্গারের' বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই জন্মলাভ করেছে, বেড়ে উঠেছে, রূপ নিয়েছে। আমি 'অঙ্গারের' নাট্যকার। আমি বলছি 'অঙ্গার' নাটক আঙ্গিকে চাপা পড়েনি, আঙ্গিককে নির্ভর করে পাখা মেলেছে। আক্রমণ করতে হয় দুটির সম্মিলিত রূপকে করুন, বলুন বিসমিল্লায় গলদ। আমার সামান্য কালো-কুৎসিত সন্তানকে দয়া করে জ্যান্ত ব্যবচ্ছেদ করবেন না, তার চেয়ে বলুন ছেলে দেখতে ভালো হয়নি বা বাপের মুখ পেয়েছে।

কিন্তু মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বিরক্তিকরভাবে বেশি। এই দরদি মাসিরাই নাটককে বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছেন, আঙ্গিকের হাত থেকে।

মূলনীতিটা তবে দাঁড়াল কী? বিষয় এবং আঙ্গিককে আলাদা করা সম্ভব নয়।

যাঁরা বলেন ইঙ্গিতধর্মী সীমিত আঙ্গিক ছাড়া কিছুই ব্যবহার করা উচিত নয় তাঁরা নাটকের ভেদাভেদ মানেন না। তাঁরা ভাবেন রবীন্দ্রনাথ, শেক্‌স্‌পিয়ার, বিধায়ক, উৎপল দত্ত, দিগিন

বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সকলেই সমগোত্রীয়, সমশক্তিশালী। রবীন্দ্রনাট্যে কথার জাদু আছে, বলার স্বল্পপরিসর এলাকায় জেগে ওঠে না-বলার বিশাল জগৎ। পুরো পরিবেশটা গড়ে উঠছে কথার ঝঙ্কারে। সেখানে মঞ্চসজ্জা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক, অনেক ক্ষেত্রে বিরক্তিকর। কিন্তু—আমায় মাপ করবেন—যদি কেউ বলেন 'ছায়ানট' বা 'সেতু' বা 'তরঙ্গ' নাটকে কথাতেই ফুটে উঠেছে পরিবেশ, আমি বলব তাঁর দম্ভ গগন চুম্বন করেছে। আঙ্গিক এখানে নাটকের খাতিরেই যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করতে বাধ্য।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাট্যকার (আগেই বলেছি) আরো এক ধাপ এগোন। বিশেষ করে সেইসব নাট্যকার যাঁরা মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত, মঞ্চের কলাকৌশল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাঁরা নাটকের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিশেবেই ব্যবহার করেন আঙ্গিককে। এইভাবেই জন্ম নেয় আধুনিক শিল্প। টেক্নোলজিকে এইভাবেই ব্যবহার করেন শিল্পী। ক্যামেরা, শব্দগ্রাহক প্রভৃতি জটিল যন্ত্রকে ব্যবহার করেই তো সৃষ্টি হয়েছিল চলচ্চিত্র-শিল্প। চিত্রনাট্য যিনি লিখবেন ক্যামেরার ভাষা তিনি ভালো করে বুঝে তবেই তা লিখবেন। চলচ্চিত্রের কারিগরিকে ব্যবহার করব না অথচ চিত্রনাট্য লিখব—এ ধরনের আব্দার চলচ্চিত্র-জগতে চলে না। কোন্ যন্ত্রের কী ক্ষমতা, কী সম্ভাবনা—এ না দেখে চিত্রনাট্য লিখতে যাওয়া বাতুলতা।

থিয়েটারেও কিছুসংখ্যক নাট্যকার আছেন যাঁরা থিয়েটারের কারিগরিবিদ্যাকে নাটকেব কাজে লাগাতে চান। কোনো কোনো নাটকে আবার বিশেষভাবে এই কলাকৌশল ব্যবহার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বযুগে সর্বদেশে একথা সত্য।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' পড়লে দেখা যায় তৎকালীন মঞ্চকৌশলকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়েছে। 'এন্টিগোনে' পড়লে এথেন্সের থিয়েটারের যান্ত্রিক অগ্রগতি স্পষ্ট প্রতীত হয়। শেক্স্পিয়ারের শুধুমাত্র 'ম্যাকবেথ' বিশ্লেষণ করে তৎকালীন থিয়েটারের পুরো চেহারা এঁকেছেন মেইস্ফীল্ড্। ডাইনিদের অদৃশ্য হওয়া, বা ব্যাংকোর প্রেতাত্মার আবির্ভাব—এসব থেকে তৎকালীন কলাকৌশলের আঁচ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়—নাট্যকার সব কলাকৌশল ব্যবহার করে কী করে মহৎ নাটক সৃষ্টি করেন 'ম্যাকবেথ'-'হ্যামলেট' তার প্রমাণ।

তবে আমাদের যুগেব থিয়েটারের কলাকৌশল আমরা ব্যবহার করব না কেন?

তাতে নাটক চাপা পড়বে কেন?

এর্নস্ট টলার 'হোপ্লা ভির লেবেন' লিখেছিলেন আধুনিক মঞ্চকৌশলের পূর্ণ ব্যবহার করে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, ফিল্ম্ প্রোজেক্টর, দেকর সিমুলতানে, আলোকের আশ্চর্য ব্যবহার—সবকিছুকে জড়িয়ে সংলাপ। প্রতি মুহূর্তে সংলাপ ইচ্ছে করেই বলছে কম—বাকিটা বলছে আঙ্গিক। শিল্পসৃষ্টি হয়নি?

অতএব যাঁরা বলেন নীতি হিশেবেই কলাকৌশলকে একঘরে কর, তাঁরা আধুনিক থিয়েটারকে অস্বীকার করছেন। এটুক বলা যায়—কোনো কোনো নাটকে আঙ্গিক ইঙ্গিতধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যস! ওইটুকুই! তার বেশি যিনি এগোবেন, তিনি আধুনিক নাটকেব অগ্রগতি বন্ধ করতে চাইছেন।

এই পর্যন্ত বললেই সমালোচকরা লাইন পাল্টান। তাঁরা বলেন, যন্ত্রের ব্যবহার মানেই হল

নাটকের সর্বনাশ! পবিত্র নাটকের আত্মিকতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে যন্ত্রের নির্ঘোষে! প্রথম যখন রেলগাড়ি চলে বা আকাশে ওড়ে এরোপ্লেন তখনো শোনা গিয়েছিল এই 'গেল গেল' রব। মানুষের আত্মা নাকি কলুষিত হয়ে যাবে ধোঁয়ায়। সেযুগ আর নেই। ট্রেন-বিরোধী মানবতাবাদীর পৌত্রবা আজ ট্রেন ছাড়া জীবনটাকে ভাবতেই পারেন না। তেমনি আসছে মঞ্চেরও যন্ত্রপাতি রসসৃষ্টির ব্যাপাবটাকে সহজ করতে, ত্বরান্বিত করতে। চিৎকার উঠবে—উঠুক। এই যন্ত্র যদি শিল্পসৃষ্টি কবতে পারে (আমাব বিশ্বাস করছে) তবে ওই চিৎকারকাবীদেব পুত্রবাও মঞ্চে যন্ত্রকে স্বীকার করে নেবে। যবনিকাটাও তো যন্ত্রবিশেষ—সেটাকে স্বীকাব করে নিয়েছে, যদিও প্রাচীন কোনো থিয়েটারেই ওটা ছিল না। উইংগস্‌কে স্বীকাব কবেছে, মেনে নিযেছে বিদ্যুতেব ব্যবহার, শব্দপ্রক্ষেপণেব বৈজ্ঞানিক কায়দা। আবো মানবে। যুগের ধর্মই হল এই। সমালোচকরা তো ফাউনটেন পেন ব্যবহাব করছেন স্বচ্ছন্দে, যত দোষ বুঝি নাট্যপ্রযোজকদের!

সর্বশেষে কোণঠাসা হয়ে বিরুদ্ধবাদীরা একটিমাত্র যুক্তিতেই এসে দাঁড়ান। সেটি হল যন্ত্রেব ব্যবহার, আঙ্গিকের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সবই মানছি, আপত্তি হচ্ছে অপব্যবহারে, যন্ত্র যেখানে যন্ত্রীকে পরাস্ত করে সেখানে, আঙ্গিক যেখানে তার স্বস্থানে আবদ্ধ না থেকে দুর্বিনীত হযে ওঠে, আর সবাইকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়, সেখানেই আমাদেব আপত্তি। আর অম্লানবদনে এই আঙ্গিক উগ্রতার দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেন 'অঙ্গারেব' কথা—বলেন শেষদৃশ্যের জলপ্লাবনেব কথা।

'অঙ্গার' পুবো দু ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটেব নাটক , তাও আবার লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপেব স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত উচ্চারণে কথিত, নইলে তিন ঘণ্টা লাগত। এ হেন নাটকে জলপ্লাবনের অংশটুকু দেখাতে সময় লাগে ঘড়ি ধবে দু মিনিট। আশ্চর্য, ওই দু মিনিটের কাণ্ডকাবখানায় এমনই তাজ্জব হযে যাচ্ছেন সমালোচক যে দু ঘণ্টা আটত্রিশ মিনিটের সংলাপ-ঘটনা চরিত্রচিত্রণ সব মুছে যাচ্ছে? প্রথম রেলগাড়ি দেখতে ভিড় কবেছিল যে কৃষকেবা, তারাও এমনি তাজ্জব হয়েছিল রেলগাড়ির বাইরের চাকচিক্যে ; সম্যক্ বুঝতে পারেনি বেলগাডির উপকারিতা। তেমনি দেখছি 'অঙ্গার'-সমালোচকের অবস্থা। সাধারণ দর্শক যদি 'অঙ্গারেব' জলোচ্ছ্বাসেব দৃশ্যে হাততালি দেন, আমরা কিছুই মনে কবি না। কিন্তু দিকপালরাও যখন ওই জলের কথাই বলতে থাকেন ঘুরিয়ে ফিবিয়ে, তখন দিগ্‌ভ্রান্ত হতে হয়। তাঁদেরই তো কর্তব্য ছিল জলোচ্ছ্বাসের তাৎপর্য বোঝা। তাঁদেরই কাছে তো আশা করেছিলাম চতুর্থ দৃশ্যে (রেসকিউ কর্মকাণ্ডের দৃশ্যে) অপূর্ব আলোকসম্পাতের প্রশংসা। শিল্পী তাপস সেন এটুকু আশা করতে পারেন না কি যে অন্তত পণ্ডিত-বিদগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁর সূক্ষ্ম কাজগুলি তুলে ধরবেন দর্শকের সামনে? আলোকের দিক থেকে চতুর্থ দৃশ্য পঞ্চম থেকে বহুগুণ বেশি কবিত্বময়—কিন্তু কেউ সেটা বলেননি। শেষ দৃশ্যের দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করেছেন নির্মল গুহরায় ; কেউ একবার বললেন না যে একই সঙ্গে ভয়াবহ ও মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টিতে নির্মলবাবু আশ্চর্য পরীক্ষা চালিয়েছেন। না 'অঙ্গার' আলোচনায় শুধুই জল, আর জল আর জল—শুনে শুনে মন হয়েছে বিকল!

'অঙ্গার' নাটকে জল ঢোকার দৃশ্যটিতে কি আঙ্গিক তার সীমা অতিক্রম করেছে? কাহিনীকে চেপে দিয়েছে? চরিত্রগুলিকে মলিন করে দিয়েছে? আমাদের মনে হয়—না। কাহিনীর একান্ত

প্রযোজনেই আসছে জল। প্রথম থেকেই ইঙ্গিত রয়েছে মৃত্যুর—কয়লাখনি মজুরের অবশ্যম্ভাবী নিযতি, যাব হাত থেকে মুক্তি নেই। পুরো নাটক নির্মমভাবে এগুচ্ছে ওই শোচনীয় মৃত্যুর দিকে। বিনুব ছিল স্বপ্ন, ছিল আশা—ওই মৃত্যুতে তার স্বপ্নভঙ্গ। মা তাঁকে কোন এক মুহূর্তে অপমান করেছিলেন—ওই মৃত্যুতে তাঁর শাস্তি। রমজান আর আরিফের ছিল আপোশহীন দ্বন্দ্ব—ওই মৃত্যুতে তার অবসান। মহাবীর সিং-এর ছিল মানুষের প্রতি গভীর অবজ্ঞা—ওই মৃত্যুতে তাব আত্মোপলব্ধি। মুস্তাকের ছিল সবাইকে ঘোল খাওয়াবাব ক্ষমতা—ওই মৃত্যুতে তার নিজেরই ঘোল খাওয়া। সনাতনের ছিল জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াবার অভিযান—ওই মৃত্যুতে তার জীবনলাভ। এমনি সবাই—সব চরিত্র। ওই মৃত্যুই একাধারে ক্লাইম্যাক্স, সলিউশন, পরিণতি, নাটকে বক্তব্যের সম্পূর্ণতা—সেই মৃত্যুকেই বহন কবে আনছে জলোচ্ছ্বাস। তাই জলোচ্ছ্বাস আসছে নাটকেব প্রযোজনে।

ঠিক একই কারণে জলপ্লাবনটাকে ইঙ্গিতে ছেড়ে দেওয়া গেল না। এমন এক একটা মুহূর্ত আসে থিয়েটারে যখন স্বাভাবিক বা সংযত আঙ্গিকে আশ মেটে না, নাটকের প্রয়োজন মেটে না, কার্য-কারণের চাহিদা মেটে না। তখন অভিনেতাকে স্বর চড়াতে হয়—আবেগেব বঙে উজিয়ে দিতে হয় দৃশ্যটাকে। ঠিক তেমনি দৃশ্যসজ্জা বা আলোকসম্পাতও মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে গলা চড়ায়, হাত পা ছোঁড়ে—নইলে ক্লাইম্যাক্স্ ফিকে হয়ে যায়। আমাদেব 'অলীকবাবু' নাটকে আলো ও দৃশ্যসজ্জা দুই-ই সীমিত, সংযত। 'নীচেব মহলে' আলোকসম্পাত এত কঠিন নিগড়ে বাঁধা যে কখন বদলাচ্ছে টের পাওযা যায না। কিন্তু 'অঙ্গার'-এর বিশেষ প্রয়োজনেই আলো ও আঙ্গিকেব অন্যান্য মাধ্যমগুলি প্রকট, স্পষ্ট, চড়া সুরে বাঁধা। এই আঙ্গিকের চরম ক্লাইম্যাক্স্ জলপ্লাবনেব দৃশ্য—ইচ্ছে কবেই অসংযত, উদ্দাম। সে যে পুরো নাটকের আবেগ-ভয-আশা-স্বপ্ন সবকে ধূলিসাৎ কবতে সংহার মূর্তি ধরেছে—এ কি ইঙ্গিতে চলে?

এটুকুই দাবি রইল—'অঙ্গাব' আলোচনাব সময়ে আমাদের অন্যান্য নাটকের কথাও ভাবুন—দেখবেন ইঙ্গিতধর্মী আঙ্গিকে নিজেদেব সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছি কি না। 'অঙ্গারে' যখন সে সীমা লঙ্ঘন করেছি তখন বিশেষ কারণেই কবেছি। এটুকু আস্থা আজ দশ বৎসর নাটক কবাব পর নিশ্চযই দাবি কবতে পারি যে নিজেদের অজান্তে ছলাকলার কাছে আত্মসমর্পণ কবে বাংলা নাট্যশালার সর্বনাশ ডাকছি না।

বাংলা নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্য?

প্র তি বে দ ন

বাংলা দেশে প্রথম বাংলা নাটকেব মঞ্চাভিনয়েব উদ্যোক্তা ও প্রয়োগকর্তা লেবেডেফেব জন্মদিবস উপলক্ষে কিছুদিন আগে লিট্‌ল্ থিয়েটাব গ্রুপ মিনার্ভা বঙ্গমঞ্চে একটি বিতর্কসভাব আয়োজন কবেছিলেন। বিতর্কের বিষয় ছিল · এই সভাব মতে আঙ্গিকেব প্রাধান্য বাংলা নাটকেব ক্ষতি কবছে। কিছুদিন ধবে নবনাট্যের উদ্যোক্তাদেব বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহল থেকে আঙ্গিকেব আতিশয্যে নাটককে হত্যা কবা হচ্ছে এমন অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ যাঁবা কবেছেন তাঁবা সাধাবণ নন বলেই বিষযটি আলোচনাব যোগ্য। 'চলচ্চিত্র' পত্রিকার পাঠকেবা ইতিপূর্বে উৎপল দত্তেব 'অঙ্গাবে আঙ্গিক' প্রবন্ধে এবং 'মঞ্চ পবিক্রমা'য় নবনাট্যেব প্রগতিব ক্ষেত্রে আঙ্গিকেব ভূমিকা কতখানি সে সম্পর্কে নিজেদেব মত গডে তোলাব সুযোগ পেয়েছেন। আলোচ্য বিতর্কসভাব আলোচনাব বিবরণীব মধ্যে তাঁবা আবও অনেক চিন্তাব উপাদান পাবেন আশা কবা যায়।

দিগিন্দ্রবাবু প্রস্তাবেব সমর্থনে বক্তৃতা করতে এসে প্রথমেই বললেন আঙ্গিকের উন্নতি নবনাট্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে একথা সম্পূর্ণভাবে সত্য তা বলা চলে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে আঙ্গিক নাটক এবং নাট্যবর্ণিত জীবনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তিনি নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতেব উল্লেখ কবেন। রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক কলাকৌশল ও আঙ্গিকের বিরোধী ছিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা নিরাবরণ সহজ আবহাওয়ায় নাটক অভিনযের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে দর্শকেব কল্পনাশক্তিকে হীন মনে করা হয় বাস্তবের যথাযথ অনুকরণের দ্বারা আঙ্গিকপ্রাধান্য ঘটালে।

বক্তার মতে নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা তাব মাপকাঠি হওয়া উচিত দর্শকের মানসিক তৃপ্তি। আঙ্গিক যে বর্তমান যুগে নাটকের কত ক্ষতি কবছে তার প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি অনেক দর্শকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেন। প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিযে আসার পব অনেকেই তাপস সেনের আলোকসম্পাতের প্রশংসায় মুখব হয়ে ওঠেন। নাটকের বিষযবস্তু বা অভিনয় সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা কবেন না। বক্তার মতে আগেকার দিনে দর্শকর' অভিনয় ও নাটক সম্পর্কেই আলোচনা করতেন।

বর্তমান কালে নাটকে জীবনের সামগ্রিক উপলব্ধি ঘটছে না এটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা। যন্ত্র বা আঙ্গিক অনেকখানি বাধা সৃষ্টি করছে. একটি বিশেষ সিচুযেশান্ (situation) -এর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বা আঙ্গিকের কলাকৌশলের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

নাট্যকারদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—Temperamental Dramatist অর্থাৎ স্বভাবনাট্যকার ও Stage-conscious Dramatist অর্থাৎ মঞ্চসচেতন নাট্যকার। জীবনের গভীর উপলব্ধি প্রথমোক্ত নাট্যকারদের মধ্যে পূর্ণভাবে লক্ষ করা যায়। এঁদের মঞ্চচেতনা একেবারে নেই তা বলা চলে না। অপরপক্ষে মঞ্চসচেতন নাট্যকারদের বেলায় মঞ্চচেতনার আতিশয্যে জীবনের উপলব্ধি খণ্ডিত হয়। নবনাট্যের ক্ষেত্রে stage-conscious dramatist-দেরই যে

প্রাধান্য এপ্রসঙ্গে তিনি জোব দেন। এরেনবুর্গেব লেখা থেকে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দেন। একটি কারখানাকে একজন ইঞ্জিনীয়ার ও একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার মধ্যে তফাৎ কোথায়। ইঞ্জিনীয়ারের চোখে কারখানার নানাবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রের খুঁটিনাটি চোখে পড়বে। অপরপক্ষে সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে মানুষ। এর কারণ শিল্পীব কাছে যন্ত্র নয় মানুষই বড়ো। Art-এর মূলকথা হচ্ছে balance অর্থাৎ ভারসাম্য ; যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটলে দর্শকরা নাটক অপেক্ষা যন্ত্রের খেলাই চাইবে।

পরিশেষে নবনাট্যের উদ্যোক্তাদের আতিশয্য পরিহার কবতে, আঙ্গিককে সীমিত করতে তিনি অনুরোধ করেন।

দিগিনবাবুর বক্তব্যের উত্তরে শ্রীউৎপল দত্ত প্রথমেই আঙ্গিকের সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। নাটকের আঙ্গিক চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত—অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোক ও সংগীত। অভিনয়ই যখন আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত তখন আঙ্গিক বর্জন বা তার প্রাধান্যকে অস্বীকারের প্রশ্ন অর্থহীন। বাকি তিনটি উপাদানের মধ্যে দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাতেব উদ্দেশ্য পবিবেশকে ফুটিয়ে তোলা এবং বিশেষ mood বা মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলার কাজ সংগীতের।

দিগিনবাবু প্রস্তাবের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ ও শেক্‌স্‌পিয়ারের উল্লেখ করেছিলেন। উৎপলবাবু সেই প্রসঙ্গ টেনে বললেন সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ 'তপতী'র ভূমিকায় ও শেক্‌স্‌পিয়ার 'পঞ্চম হেনরিব' সূত্রধারের সংলাপেব মধ্য দিয়ে আঙ্গিকের বিরোধিতা করেছেন। নিজেদের নাটক সম্পর্কে এই মনীষীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছুই বলাব থাকতে পারে না। কিন্তু বর্তমান যুগেব নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়ারের নজিব টানার যৌক্তিকতা নেই মোটেই। ববীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পিয়ারেব মতো নাটক যদি আজ কেউ লিখতে পারেন, শব্দের মায়াজাল দিয়ে জীবনেব গভীর সত্যকে যদি কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাহলে তিনি আঙ্গিককে বিসর্জন দিতে বাজি আছেন। শেক্‌স্‌পিয়ারের মতো মহৎ স্রষ্টা নন কিন্তু এ যুগের একাধিক শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটক থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে উৎপলবাবু দেখান যে নাট্যকারেবা আঙ্গিকেব অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা কী তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছেন। শ-এর 'আর্মস অ্যান্ড দা ম্যান্' ও 'পিগমেলিয়ন' নাটকদ্বয়ের ভূমিকায় আঙ্গিক সম্পর্কে যে দীর্ঘ বর্ণনা আছে তিনি শ্রোতাদের তা পাঠ করে শোনান। 'পিগমেলিয়ন' নাটকে মঞ্চের ওপর বৃষ্টি নামানো হয়ে থাকে। নিশ্চযই দর্শকদের কুনাট্যে মজাবার উদ্দেশ্য ছিল না শ-এর। উইলিয়ম্ আর্চার একজন রক্ষণশীল নাট্যকার। তিনিও মঞ্চে এরোপ্লেন ভাঙার এবং বোমাবর্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। গোর্কির 'লোযার ডেপ্‌থস্'-এ রঙের খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। মার্কিন নাট্যকাব কিংসলিব একটি নাটকে মঞ্চের ওপর জাহাজ চালানো হয়ে থাকে। এ যুগের বাঙালি নাট্যকারেরা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, তাই তাঁদের নাটকে আঙ্গিকের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। উৎপলবাবু কয়েকজন তরুণ নাট্যকারের উল্লেখ করেন, এমনকী দিগিনবাবুব 'তরঙ্গ' নাটকে আঙ্গিক সম্পর্কে যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ বয়েছে তাও তিনি পাঠ করে শোনান।

দিগিনবাবু যে নিজস্ব বক্তব্যের সমর্থনে দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার নজির দেখিয়েছিলেন উৎপলবাবু তার উত্তরে বলেন সাধারণ দর্শকরা কোনোদিনই নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন

না। আজকাল যেমন দর্শকবা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আঙ্গিক সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন আগেকার দিনেও দর্শকরা আলোচনা করতেন শিশিরবাবু বা অহীনবাবুর অভিনয় নিয়ে। বস্তুত আধুনিক আঙ্গিককলা নতুন বলেই দর্শকরা কিছুটা বিমোহিত আর সংস্কারাচ্ছন্ন সমালোচকরা আতঙ্কগ্রস্ত। নতুনকে গ্রহণ করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব। রেলগাড়ি যখন প্রথম চলল, এঁবা বলেছিলেন ও সব শয়তানিব অবসান অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যখন আকাশে উড়ল, এঁরা বললেন ওসব নাস্তিকতার পরাজয় ঘটল বলে। এখন এঁরা স্বচ্ছন্দে সেই রেলগাড়ি চড়ে কাশীধাম ঘুরে আসছেন, প্লেনেও চড়ছেন অম্লানবদনে। তেমনি বনফুলের ভাষায় থিয়েটারের পদীপিসিবাও নতুন আঙ্গিকের অভ্যুত্থানে 'ধর্ম গেল, রব তুলেছেন। একদিন এঁবাই আবার আঙ্গিক মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের আঙ্গিককলাব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন। আঙ্গিকের আলোচনাকালে ঐতিহাসিক পবিপ্রেক্ষিত বিবেচনা কবা দরকার। আঙ্গিক আকাশ থেকে পড়ে না। প্রতি যুগে প্রতি দেশে থিযেটাবেব বিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিককলা গডে উঠেছে। নাট্যকার সে আঙ্গিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নেন।

উৎপলবাবু বেশ জোব দিয়ে বলেন আতিশয্যেব অভিযোগ যদি আনতে হয তবে তা পুরোনো থিযেটাবের বিরুদ্ধেই আনা উচিত, নবনাট্যের বিরুদ্ধে নয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি মিনার্ভা থিযেটারে রক্ষিত পুবোনো যুগের কযেকটি দ্বিমাত্রিক দৃশ্যপট দেখিয়ে প্রমাণ করলেন পুরোনো থিযেটাব মানুষেব স্বাভাবিক যুক্তিবোধকে কেমন উপেক্ষা কবত। কযেকজন প্রতিভাশালী অভিনেতা প্রচণ্ড অভিনয়ক্ষমতা দিয়ে দর্শকদেব ভুলিযে রাখতেন। সে যুগে আবহসংগীতেব কোনো স্থানই ছিল না। আবহসংগীতেব স্থান নিয়েছিল গান। গানগুলো সুগীত ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু নাট্যরসের পরিস্ফুটনে গান কোনো সাহায্য করত না। আগেকাব দিনের গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনালেন উৎপলবাবু। তুলনামূলকভাবে তিনি 'অঙ্গাব'-এব জলেব দৃশ্যের রবিশঙ্করসৃষ্ট আবহসংগীত বাজিয়ে প্রমাণ কবলেন নবনাট্যের আঙ্গিক নাট্যরসেব সঙ্গে কী নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

একক অভিনয়ের যুগ আব নেই। এ-কাল মহাশক্তিমান কয়েকজনেব নয। সমবেত অভিনয আব সমবেত প্রচেষ্টাই এ-যুগেব নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানেব সাহায্য নিয়ে নাট্যকলাকে শক্তিশালী করার সুযোগকে গ্রহণ না করলে যুগধর্মকেই অস্বীকার করা হবে।

প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে উঠে অধ্যাপক অজিত ঘোষ বললেন—নবনাট্যের আঙ্গিককলার প্রথম ব্যবহার হয়েছে 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ে। আঙ্গিকের ব্যবহার 'নবান্ন'কে সাফল্যমণ্ডিত করলেও পববর্তীকালের নাট্যকলাকে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে আঙ্গিকের ব্যবহার সার্থক এবং আঙ্গিক নাটকের সমগ্ররস থেকে বিচ্ছিন্ন নয় একথা তিনি স্বীকাব করলেন। কিন্তু 'সেতু' নাটকে ট্রেন চালানো, 'অঙ্গার' নাটকে জলেব দৃশ্য নাট্যরসকে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ কবেছে বলেই তাঁব ধারণা। এমনকী তাঁর মতে বহুরূপী প্রযোজিত বহুপ্রশংসিত 'রক্তকরবী'তেও রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবীর' spirit ক্ষুণ্ণ হয়েছে আলোকসম্পাতে মেঘেব খেলায়। তিনি নবনাট্যের উদ্যোক্তাদের সাবধান করে বলেন যে তাঁরা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে জাগিয়েছেন, আঙ্গিকের আতিশয্যে নাট্যরসকে বিলীন করার ব্যবস্থা কবছেন তাঁরা। উৎপলবাবু

কথিত সমবেত অভিনয়ের উল্লেখ করে তিনি স্তানিস্লাভ্স্কির মত উদ্ধৃত করলেন—'The lord and ruler of the stage is the actor'। অজিতবাবুর মতে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে দলগত অভিনয়ের সার্থকতা নেই। একক অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

বিতর্কের উপসংহার করেন অধ্যাপক সাধন ভট্টাচার্য। তিনি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলেন। তিনি অজিতবাবুর বক্তব্যের সার উদ্ধৃত করে দেখালেন, অজিতবাবু প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করলেও তিনি স্বীকার করেছেন, আঙ্গিক অনেক ক্ষেত্রে নাটককে সার্থক করেছে। তিনি ব্যর্থতার যে-সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বুঝতে হবে সে-সব ক্ষেত্রে নাটক দুর্বল। সুতরাং আঙ্গিক নাটকের ক্ষতি করছে একথা বলা চলে না।

সাধনবাবু ভবতেব নাট্যশাস্ত্রেব উল্লেখ করে বলেন, ভরত তাঁর গ্রন্থে যে-সব নির্দেশ রেখে গেছেন তাতেও আঙ্গিকের উল্লেখ রয়েছে। ভবতেব নাট্যশাস্ত্র অব্যাহত গতিতে এগোলে আমাদেব মঞ্চকলা পশ্চিমিদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যেত বলেই তাঁর ধারণা। বাংলা নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্য ঘটছে বলে যাঁরা আতঙ্কিত তাঁদের লক্ষ করে তিনি বলেন, এদেশে আঙ্গিকেব উন্নতি সামান্যই হয়েছে। পাশ্চাত্যে মঞ্চেব ওপর দিয়ে বারোখানা ওয়াগন চলে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত শুদ্ধ নাটক আর মঞ্চে অভিনীত নাটক এক নয় একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি বহুরূপীর 'রক্তকরবী'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং 'অঙ্গার'-এর জলস্রোতের দৃশ্যের প্রশংসা কবে বললেন, শ্বাসরোধকারী দৃশ্যটি আমাকে অভিভূত কবেছিল।

পরিশেষে তিনি বলেন নাট্যকারদের চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। নাটক বলিষ্ঠ হলে আঙ্গিক তাকে কখনোই হত্যা কবতে পারে না।

ঘুরে ফিরে

জপেনদাকে জপিয়ে নাটক দেখিয়ে তাবপর কেন যে বসে তাঁব মুখনাড়া শুনি এ-রহস্যের কিনারা নিজেই করতে পারি না। তাঁকে নাটক দেখাতে গেলে চারমিনার খাওয়াতে হয়, চা খাওয়াতে হয়, মিনিবাসের ভাড়া দিতে হয়, তারপর নাটক চলাকালীনই প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া তাঁর কটুকাটব্য শুনতে হয়, এবং অভিনয়ের পাট চুকলে তাঁর অশ্রাব্য গালিগালাজ হজম করতে হয়—এটাই বেওয়াজ। সেদিন যা ঘটল কহতব্য নয়। আমাদের নাটকটা ছিল 'এবং হৃৎপিণ্ডের হাততালি'। জপেনদা হাউসের মাঝামাঝি একটা সীটে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। হঠাৎ একবার বলে উঠলেন ঘুরে ফিরে, ঘুরে ফিরে! একবার বাজখাঁই গলায় সম্বোধন বেড়ে বিবিজান! (এতে আবার আমাদের অভিনেত্রীটি সাজঘরে এসে কেঁদে ফেললে)। চবম ক্লাইমেকস-এর মুখে জপেনদার সহর্ষ মন্তব্য দে, পাল চাপা দে! দর্শকবা হেসে উঠল, আমবা পাট ভুলে গেলাম, চমকিত এক কর্মীর গাফিলতিতে পর্দাটা খানিক পড়ে থতমত খেয়ে আবাব উঠে গেল এবং সাজঘরে আমাদেব মেয়েটি আবার কেঁদে ফেললে।

নাটকের শেষে আমরা গেলাম জপেনদাব কাছে। জপেনদা মনে হয অনেকক্ষণ থেকে মনের মধ্যে বহুবিধ রোষ পুষছিলেন ; আমাদের দেখেই বিশ্রী মুখভঙ্গি করে হেসে উঠলেন। বললেন—এটা কী হল? আপনারা এতক্ষণ ধবে যেটা দেখালেন সেটা কী?

আমি প্রমাদ গণেছি, কেননা দলেব অন্যান্যরা উপস্থিত আছে বলে জপেনদা 'আপনি' সম্বোধন করছেন এবং ভদ্র হচ্ছেন। এবং উনি ভদ্র হলে এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে, এটা আমার জানা।

আমি বললাম—এ নাটকটার সম্পর্কে বলতে গেলে—

জপেনদা বিগলিত হেসে হাত কচলে মেঝেতে পা ঘষে বারদুয়েক মাথা ঝুঁকিয়ে সৌজন্যের এক উৎকট অসহ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বললেন—আরো তো অনেক পেশা আছে, যথা, ফিটন গাড়ি চালানো বা ময়দানের ঘাস কেটে কলকাতার ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়াদের খাওয়ানো অথবা শেয়ার মার্কেটের দালালি কিংবা বড়বাজাবের ফোড়ের ফোড়েমি। আপনাদের মতন শিক্ষিত যুবক-যুবতীবা ওসব লাইনে আসছে না বলেই তো দেশেব আজ এই দুরবস্থা।

দলের সকলে হতবাক। সবাই আমার দিকে চেয়ে রইল একটা কোনো ব্যাখ্যার আশায়। জপেনদা এদিকে আরো বিগলিত হয়েছেন ; সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুঘলাই কায়দায় কুর্নিশ শুরু করেছেন। বলছেন—এ-নাটকের গল্প বান্দা বুঝতে পারেনি, এবং এব আঙ্গিক সম্পর্কে গোলাম শুধু জানতে চায় মালটা কী। ওই যে মাঝে মাঝেই বিদঘুটে রঙিন নানা ন্যাকড়া-পরা একদল লোক এসে কোমর দুলিয়ে চাপা এবং বেসুরো কণ্ঠে কীসব গান গাইছিল, ওটা কী?

আমাদের গাইয়ে ছেলেরা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলি—আমরা

তরজা-পাঁচালি প্রভৃতি ফর্মকে থিযেটাবে এনে খাঁটি এ-দেশীয় এক রূপরীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি, খাঁটি ভারতীয় এক থিয়েটার গড়বার চেষ্টা করছি।

জপেনদা এমন নত হলেন যে ভয় হল উনি আমার পাদস্পর্শ না করে বসেন, বললেন—আপনাব কথা শুনে আমি গলে গেলাম, দ্রব হলাম, তরলায়িত হলাম। যেসব সুর আপনারা আজ শোনালেন সবই তো খ্যামটা। নাচগুলোও খ্যামটা। তাহলে এ-দেশীয় রূপরীতি বলতে আপনি খ্যামটা বোঝেন। আর ভাষাটাও সর্বত্রই চটুল পরিহাসের। খ্যামটার সুরে সখিবেশী পুরুষদের নিতম্ব-হিন্দোলে কিছু ব্যঙ্গকৌতুক—এই হচ্ছে তাহলে খাঁটি ভারতীয় থিযেটার! ভারতের সর্বত্র একই চলছে—বোম্বাই, পুণা, দিল্লি, জয়পুর, কলকাতা। তামাশা বা নৌটংকি বা খ্যামটা। আপনি জানেন কি মহাশয় যে, সারা ভারতের সব থিয়েটার ক্রমশ একবকম হয়ে আসছে? সবাই খাঁটি ভারতীয় থিযেটার সৃষ্টির সৃষ্টিছাড়া নেশায় কৌতুকের গান গাইছে, কোমর দোলাচ্ছে, দুনিয়া-বহির্ভূত পোশাক পরে হঠাৎ-হঠাৎ নাটকের মাঝে ঢুকে পড়ে সবচেযে শস্তা সবচেযে অশ্লীল সবচেয়ে কুৎসিত কিছু লোকগীতি গেযে বসিকতা করছে? আপনাদেব মহান পরীক্ষা-গবেষণাগুলো পরীক্ষাই নয়, সবচেয়ে বস্তাপচা সবচেয়ে পুরোনো সবচেযে কীটদষ্ট।

সে কী?—আমাব জিজ্ঞাসা—আপনি লোকগীতিকে এমন অবজ্ঞা করছেন? গণশিল্পকে মঞ্চে আনব না?

জপেনদা বাবছয়েক আদাব কবে বললেন—গণশিল্প! খ্যামটা গণশিল্প! জনাবের বিপুল জ্ঞানগরিমাব পাশে আমি অবোধ শিশুমাত্র। তবে গণশিল্প দুই প্রকারের—এক, জনতার নিজস্ব সৃষ্টি ; দুই, লম্পট জমিদারদেব মনোবঞ্জনার্থে ওপর থেকে চাপানো। প্রথমটিকে ইংরেজিতে বলে ফোক-আর্ট বা পিপ্‌ল্‌স্ আর্ট। দ্বিতীযটিকে বলে ম্যাস্ আর্ট। প্রথমটি লোকসংস্কৃতির এক ঐতিহ্যপূর্ণ প্রকাশ। দ্বিতীয়টি জঘন্য অর্বাচীন এবং অশ্লীল। আপনারা কী এক অলৌকিক ক্ষমতাবলে প্রতিবাব বেছে বেছে ওই ম্যাস-আর্টকে আঁকড়ে ধরেন। দেখে আমরা তাজ্জব। আপনাদের নাটকেব গান শুনে ও নাচ দেখে দিব্যচক্ষে দেখতে পাই জমিদারবাবুর প্রাঙ্গণে সখিদের উদ্দাম দেহ-সঞ্চালন, মাতালবাবুদের কামাতুর কোলাহল এবং চিকের পেছনে গ্রামের পদী মযবানিদের ভ্রূভঙ্গি। সত্যি, আপনাদের জবাব নেই।

আমাদেব একজন বলে উঠল—না, শুধু খ্যামটা কেন? আমরা কীর্তনের সুবও বহু ব্যবহার করি।

জপেনদা তাব প্রতি হিন্দু নমস্কার জানিয়ে বললেন—এগ্যে কীর্তনের কথা বাদ দিলে কী থাকে? সব লোকগীতির তো একই ধর্ম। সুর তো একঘেয়ে, কথাই তো হৃদয়-নিঃসৃত। সেখানে জানতে পারি জমিদার কর্তৃক নিগৃহীতা কন্যার দুঃখে মেঘ কালো হয়ে আসে, অথবা রূপবতীর চোখের কাজল লেপটে গিয়ে কেমন দেখায়, এমনকী শূন্যের মাঝারে ঘর বাঁধা কেমন নির্বুদ্ধিতা। সেখানে পাই প্রেম, আবেগ, প্রকৃতি, ধর্ম, দর্শন আর অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের কৌতুকবোধ যার আশ্রয় মুহুর্মুহু দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যবহার এবং অন্যান্য অলংকার। আপনারা কী করেন? বিষযবস্তু শেখেন না একদম। লোকগীতি কী বলছে কখনো দেখেন না। শুধু সুরটুকুর

কান পাকড়ে তার ওপরে সওয়ার হন অকিঞ্চিৎকর শস্তা সব কটাক্ষ নিয়ে। কীর্তনের সুর নিয়ে তাতে যদি বলেন 'আমি বাবা নিকসন সাহেব হাউ মাউ খাউ', সেটা হয় কদর্য মুখভ্যাঙানি। ওতে রাজনৈতিক প্রচারও বাধা পায়, কারণ ফর্মটা কদর্য হলে বক্তব্য মার খাবেই। যে-ফর্মে প্রকাশিত হওয়া উচিত জনতার গভীর বেদনা ও গভীরতর বিদ্রোহচেতনা, যে-ফর্মে খুব সহজে বলা যেত আসন্ন বিপ্লবের গম্ভীর কথা—যেমন বলেছেন বিজন ভট্টাচার্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়েরা—সে-ফর্ম আপনাদের হাতে হয়ে উঠেছে ছ্যাবলামির বাহন। কারণটা অবশ্য এ-অধম বোঝে। লোকশিল্পের আঙ্গিক ব্যবহার করতে গেলে আগে কবি হতে হয়, লোককবির অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, লোককাব্যের ব্যাকরণে সিদ্ধ হতে হয়। কথাকে আগে ভাবগভীর করে সাজাতে না জানলে, বিজন ভট্টাচার্যের 'জীয়নকন্যাব' মতন কাব্য সৃষ্টি করতে না জানলে, গ্রামীণ সুর চির-দিনই বাঁদরের মুখ-খেঁচানির মতন শোনাবে। আপনারা কবি নন, তাই জমিদারের ভাড়া-করা বিদূষকেব মতন ছড়া লেখেন যা মিনিটে দু-লাইন কবে লেখা যায়। তারপর তাতে কীর্তনেব সুর বসিয়ে দিয়েই ভাবেন লোকশিল্পকে এনে ফেলেছি মঞ্চে। একদিক থেকে আপনারা ক্যাবারেওলা নাটকেব চেয়েও অশ্লীল। আপনারা জনতাব একটি মহান ঐতিহ্যেব মস্তক চিবিয়ে খাচ্ছেন। যে-নাটকেব নাম 'এবং হৃৎপিণ্ডের হাততালি' তাব কুশীলব মহাশয়েবা আর বাংলার লোককাব্য বুঝবেন কোথেকে? কোন ফর্মে কী পবিবেশন করতে হয় তা কোত্থেকে বুঝবেন? লোকগীতিব কনটেন্ট বাদ দিয়ে শুধু ফর্ম নিযে তাঁরাই তো মাতবেন এবং সে-মাতামাতির ফলেই এককালে হাপ-আখড়াই জন্ম নিয়েছিল, আব আজ পয়দা হয়েছেন আপনাবা।

আমাদের সেই মেয়েটি এই সময়ে আবাব কেঁদে ফেললে। জপেনদা বিনয়ী হাস্যে দৃশ্যটি উপভোগ কবতে লাগলেন। বাগে আমাব গা জ্বলে গেল। মেয়েটি খানিক প্রকৃতিস্থ হতে জপেনদা বললেন—রুমাল দেব?

এতে মেয়েটি আবাব কাঁদল। তখন জপেনদা হাই তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—আর ওই যে খাঁটি ভারতীয় থিয়েটাব বলছেন সে-মালটা কী?

আমি বললাম—থিয়েটার বস্তুটি ইযোরোপীয়। আমাদের খুঁজতে হবে এমন একটা থিযেটার যা ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হবে।

জপেনদা বললেন—কোন ভাষায়?

কী?—আমরা অনেকেই থতমত খেয়ে শুধোলাম।

কোন ভাষার থিয়েটার?—জপেনদার প্রশ্নবান—কোন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল? মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, বাঙালি, মালয়ালি বলুন।

আমবা সকলে বললাম—যার যার নিজের, যার যার নিজের!

তাহলে খাঁটি ভারতীয় থিয়েটার কথাটা গাধার মতন বলে চলেন কেন?

জপেনদার ভদ্রতাব মুখোশ খসে আর কি—থিয়েটার তো ভাষাব ওপব নির্ভরশীল। যে-দেশে এতগুলো ভাষা এতগুলো সংস্কৃতি সেদেশে একটি 'খাঁটি ভারতীয় থিয়েটার' কথাটা আকাট গর্দভের কথা।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম—না, শুনুন! স্তালিন বলেছিলেন শিল্পসাহিত্য হবে কনটেন্টের

ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু ফর্মের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল। যে-দেশে বহু নেশন সে-দেশে একাধিক ন্যাশনাল ফর্ম গড়ে উঠবে। তাই আমরা চেষ্টা করছি যাত্রার বৈশিষ্ট্যে বাংলার থিয়েটারকে ভূষিত করে—তাকে ইয়ে করে—

যাত্রার কোন বৈশিষ্ট্যে আপনারা বাংলার থিয়েটারকে ইয়ে করছেন? —জপেনদার সমাহিত প্রশ্ন।

প্রথমটা আমার মাথায় কিছুই খেলল না। পাশ থেকে আমাদের দলের গাবলু বলল—ধরা যাক গান। এই যে এত গান এ তো যাত্রারই ইযে। লোকসংগীতের সুর যে আমরা থিয়েটারে নিযে আসছি, সেটা তো যাত্রা থেকেই শিখছি।

জপেনদা সীট ছেড়ে মেঝেয় বসলেন, হাতজোড় করে বললেন—যাত্রায লোকসংগীত নেই, সব ক্ল্যাসিকাল। সব মালকেশ, দেশ, পুরিয়া, বাগেশ্রী, ভৈরোঁর খেলা।

গাবলু জীবনে যাত্রা দেখেনি, তাই আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়ল। আমি বললাম—যাত্রার অন্যান্য ইয়ে আমরা আনছি স্টেজে। যেমন বিবেক। আজ দেখলেন না?

জপেনদা বললেন—যাত্রায় বিবেক উঠে গেছে বললেই চলে। আপনাদের গাযকরা যাদের নকল করে আজ নাচলেন, সেই সখির দলও উঠে গেছে। ইদানীং বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা সর্বত্র আপনাদের মতন শিক্ষাগর্বী একদল সুবেশ ছেলেপুলে লোকনাট্য-লোকনাট্য করে ছাতারের নৃত্য শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁরা মঞ্চে যা আনছেন তা স্বপ্নে-দেখা লোকনাট্য, বইয়ে-পড়া লোকনাট্য। বাস্তবের—১৯৭৪-এর—লোকনাট্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা যেসব ঐতিহ্যের কথা বইয়ে পড়ে লম্ফঝম্প লাগিয়েছেন তার ধারক ও বাহকরা খেতে না পেয়ে একে একে মরে গেছেন গত দু দশকের মধ্যে। যা নেই তার জন্য এমন সাধনা সচরাচর দেখা যায না। নিরবলম্ব নেতির জন্য এই যোগসাধনা তান্ত্রিকদের হার মানায। আপনারা ডোডো পাখির খোঁজে বেরিয়েছেন।

আমি উষ্ণ স্বরে বললাম—যাত্রার সর্বনাশ করছে কিছু কালাপাহাড়। এরা কলকাতার থিয়েটার থেকে গিয়ে চড়াও হয়েছে যাত্রার ওপর, যাত্রাকে থিয়েটার বানাচ্ছে। এরা মাইক চালু করেছে, যাত্রায় আধুনিক বিষয়বস্তুর নামে যাত্রা-পালার সেই আদিম বলিষ্ঠতার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। সেই পুরাতনকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।

জপেনদা মাথাটা দুবার মেঝেতে ঠকাস ঠকাস করে ঠুকে বললেন—হুজুরের এজলাসে অধমের নিবেদন এই, বাপের জন্মে পুরাতনকে আর ফিরিযে আনতে পারবেন না ধর্মাবতার। ইতিহাসকে কান ধরে থামিয়ে রাখবেন এমন ক্ষমতা আপনার বাপেরই নেই, আপনি কোন হুলিদাস? যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়েছে সময়, মহাকাল, সমাজের বিবর্তন। আপনারা লাইব্রেরিতে বসে লোকনাট্য পড়েন হুজুর, গ্রামের ভাঙাগড়াটা বোধহয দেখতে পান না। পঞ্চাশের দশক থেকে চলছে বিষম ভাঙন, গ্রামীণ সভ্যতার ধ্বংস। যাত্রার দর্শকের রুচিতে ঘটে গেছে বিপ্লব। চা-বাগান আর কয়লাখনির মজদুর যারা যাত্রার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, গ্রামের আর মফঃস্বল শহরের অগণিত দর্শক, তারাই নলদময়ন্তীর কাহিনী থেকে যাত্রাকে নিয়ে এসেছে লেনিন আর মাও ৎসে-তুং-এ। তারাই বিবেকের গানকে বাহুল্য জ্ঞানে বর্জন করেছে, পুরাতন ঢং-এর গম্ভীর

অভিনয়কে প্যাক দিয়ে বন্ধ করে থিয়েটারি বাস্তববাদী অভিনয় দাবি করেছে। মাইক ছাড়া আজকাল কী করে অভিনয় হবে হুজুর বলতে পারেন? আগে জমিদারের ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় পাঁচশো লোক হলে মনে করা হত অসম্ভব ভিড়। এখন যে এককে বারে বিশ হাজার পর্যন্ত লোক হয়। পৃথিবীতে কোন বাপের বেটা আছে যে এই জনসমুদ্রকে খালি গলায় পালা শোনায়? 'যাত্রাব সব গেল' ক্রন্দন তুলে যারা নন্দ ঘোষ খুঁজছেন, স্কেপগেট খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা বোঝেন না ঔপনিবেশিক দেশে চাষির অর্থনৈতিক ধ্বংসের সঙ্গে তার সংস্কৃতি ধবংস হয়। কোনো উপায়ে তাকে রোধ কবা যায় না—একমাত্র শ্রমিক-বিপ্লব ছাড়া। শ্রমিক-বিপ্লবও অনেক ক্ষেত্রে পুরাতনকে আর ফিবিয়ে আনতে পারে না। চীনে খাঁটি সংগীতকে পুরোপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়নি , ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রবল ও ব্যাপক প্রভাবকে অস্বীকার না করে তাকে আলিঙ্গন করে নেওয়া হয়েছে। আর আপনি মশাই কোন নিধিবাম সর্দার এলেন যে ভাবতের সামাজিক অবক্ষয়কে ঠেকিয়ে যাত্রায় পুরাতনকে ফিবিয়ে আনবেন? যা চলে গেছে তার দুঃখে কাঁদতে বসাটা বড়োলোকেব ছেলেদের একটা বিলাসমাত্র। শিল্পকে যে সংগ্রামেব হাতিয়ার মনে করে সে মৃত অতীতের জন্য কাঁদে না। সে বর্তমানকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করে বর্তমানেব মুখোমুখি দাঁড়ায় বীবেব মতন। সে মূল্যায়ন করে দেখে যা আছে তার কতটা ইতিবাচক, কতটা ভালো কতটা কার্যকরী। সে দেখতে পায় যাত্রার এক মহৎ দিক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে সে এ-ও দেখতে পায়, আবেক মহৎ দিক খুলে গেছে। সে দেখে, যাত্রা এখন আর শান্ত পল্লীব শ্রমক্লান্ত মুষ্টিমেয় মানুষের ধর্মীয় সান্ত্বনা নেই। যাত্রা এখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষকেব রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মাও ৎসে-তুং-এর মতে বিপ্লবী নাটকের প্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত হল সে প্রকৃত মেহনতি মানুষের সামনে অভিনীত হচ্ছে কিনা। সে-শর্ত পূরণ করেছে আমাদের যাত্রা। আর সেটা দেখে কোথায় উদ্বুদ্ধ হবেন, না নাকে কান্না জুড়েছেন?

আমি কী যেন একটা বলতে গেছি, আর জপেনদা চিৎকার করে আমায় থামিয়ে দিয়েছেন—আগে শুনে নিন না। আপনার কথাবার্তা শুনেই মনে হয় অনেক কিছু আপনার জানা বাকি! নাটক যার কাছে প্রচারের অস্ত্র তার কাছে ফর্মটা গৌণ ব্যাপার। যেনতনপ্রকারেণ ছলে-বলে-কৌশলে কথাগুলো দর্শকের অন্তরে গেঁথে দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য। স্তালিন যখন বলেন ফর্ম হবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ভূষিত, সেটা হচ্ছে কৌশলগত প্রশ্ন। জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হলে সাধারণত ফর্ম সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও লোকগ্রাহ্য হয়। কিন্তু যে-বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে গেছে, সেটাকে আবার জোর করে ফিরিয়ে আনলে লোক মেনে নেবে কি? বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্য মানে বর্তমানের জীবন্ত বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্যটা কী আগে বুঝুন, তবে না সেটা ব্যবহার করতে পারবেন। যা নেই তার পেছনে ছোটে শুধু সে যে ফর্মের জন্য ফর্মের পূজারী। স্তালিন তা বলেননি ; বিষয়বস্তু ও প্রচার যার কাছে প্রধান, সে দেখে কী আছে এবং তাকে আমি কী করে আয়ত্তে আনব, ভাঙব-চুরব, ব্যবহার করব। যে মার্কসবাদী তার কাছে কোনো ফর্মই তো বিদেশি নয়। বিদেশ কথাটাই তো আমরা মানি না। এ-বিশ্বের সব ফর্মই তো আমার। নইলে আইজেনস্টাইন কেন জাপানের কাছে মন্টাজ শেখেন আর ব্রেখ্‌ট কেন পিকিং অপেরাব ফর্ম

নিয়ে আসেন জার্মানিতে। আমাদের কাছে ওসব 'ভারতীয়' আর 'বাঙালি' সম্পর্কে গুল মেরে কোনো লাভ নেই। যাত্রার ওপর থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের প্রভাব পড়েছে, কিছু ক্ষতি হয়েছে—ঠিক আছে! কিন্তু মহত্তর সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে সামনে। আপনি বলছেন, পুরাতন আদিম পালা ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি বলছি, সে-পালা আঁকড়ে থাকলে যাত্রা এতদিনে উঠে যেত। অন্যান্য বহু 'বিশুদ্ধ' লোকরীতির মতন যাত্রা আজ অতীতের স্মৃতি হয়ে যেত। আজকের জীবন্ত নাটক এসে যাত্রাকে বাঁচিয়েছে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সে এগুচ্ছে। বিদেশি টুরিস্টদের জন্য জাদুঘরে রক্ষিত কোনো নিদর্শন হয়ে সে থাকেনি। সে অগ্রসরমান, যুগের দর্পণ, একালের ব্যাখ্যাকার, সমসাময়িক ইতিহাসের সূত্রধার। হুজুরালি পিকিং অপেরার মতন সূক্ষ্ম ও প্রাচীন ফর্মকেও এগিয়ে এসে আজকেব বিপ্লবেব কাহিনী আশ্রয় করতে হয়েছে, নইলে তারও মৃত্যু ছিল অনিবার্য। স্তালিনের কথা আপনাদের মস্তিষ্কে ঢুকবে—এ আশা কবা অবশ্য আমাদের বাতুলতা। মাও ৎসে-তুং যে বলেছেন, জনতার আজকের স্তব থেকে নাট্যপ্রচার শুরু হবে এবং প্রতি মুহূর্তে জনতাকে সঙ্গে নিয়ে উচ্চতর স্তবে উঠতে হবে, এসব আপনারা বুঝবেন কেন? জনতার আজকের স্তরে যাত্রাব যে চেহারা সেটাই যে স্তালিনের মতে আজকেব জাতীয় বৈশিষ্ট্য, এটা বুঝতে গেলে আগে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ বুঝতে হয়। সে-সময় হুজুরদেব কোথায়? হুজুরদের সময় চলে যাচ্ছে বিংগো স্টাবের গান শুনতে শুনতে। স্তালিন-মাওরা সনাতনপন্থী বিশুদ্ধতাবাদী নন, নূতন সংস্কৃতির স্রষ্টা। তাঁরা চেয়েছিলেন আপনাবা জনতার বর্তমানে অবগাহন কবে পবীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন, জনতাকে উচ্চতর ভবিষ্যতেব দিকে নিযে যাবেন। কিন্তু 'বর্তমান চুলোয় যাক' বলে পুবাতত্ত্বে ফিরে যেতে কেউ বলেননি। আজকের বাস্তব অবস্থা দেখে 'গেল গেল' রব তোলে শুধু চণ্ডীমণ্ডপের জোতদাররা, ক্রন্দনে মুখব হয় শুধু কাপুরুষেরা—আর এমেচাব স্বপ্নবিলাসীরা।

কিছুক্ষণ আমাদের থমথমে মুখগুলো দেখে নিয়ে উপভোগের স্মিতহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে জপেনদা বলে চললেন—তাহলে যাত্রা থেকে যা শিখতে চাইছেন তা যখন যাত্রায আব নেই, তখন কী শিখবেন বলুন তো?

যাত্রা প্রায় থিযেটার হয়ে গেলে থিয়েটাব আব কী শিখবে?—বলল মাকলু, আমাদেব হিরো।

অহো অহো কি কথা!—জপেনদাব প্রশংসার দাপটে মাকলু চুপসে গেছে—ফর্ম না শিখতে পারলে আর কিছুই শেখার নেই! প্রমাণ হয়ে গেল আপনাবা ফর্মালিস্ট, নিছক ফর্মের অন্বেষক, শুদ্ধ আঙ্গিকেব উপাসক।

মাকলুর কাঁপা গলায় প্রশ্ন—কী শিখব বলে দিন না!

জপেনদাব বক্তৃতা শুরু হল—শিখবেন নাট্যরচনার কৌশল, লক্ষ নিবক্ষর মানুষকে শিক্ষাদানের কলা উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সাজাবার পদ্ধতি। শিখবেন মধ্যবিত্ত দর্শককে ছেড়ে অন্যান্য শ্রেণীর কাছে যাওয়া। শিখবেন দুর্বোধ্য সব বিচ্ছিন্নতাবাদী কিমিতিবাদী নাটককে জলাঞ্জলি দেওয়া। ও-নাটক নিয়ে প্রকৃত জনতার সামনে গেলে মাবধোব খেয়ে যাবেন জানেনই তো। কোমর বেঁধে যাত্রার কাছ থেকে শিখতে শুরু করুন সহজবোধ্য ভাষায় সহজগ্রাহ্য গল্পের

কাঠামোয় কী করে মহত্তম চিন্তা যোজনা করা যায়। চেষ্টাকৃত জটিলতা হচ্ছে দেউলিয়া মানসের বিকার। যার সত্যিই কিছু বলার আছে তাকে কসরৎ করতে হয় না। সে ইবসেন, চেকভ, গোর্কি, ব্রেখ্‌ট্ বা হোকুট-এর মতন সরল ও অনাড়ম্বর। এই সারল্য শিখুন এসে যাত্রার কাছে। কলকাতার নগ্ন নারীর বস্ত্রবিপ্লব আর একক নায়কের হতাশা শিকেয় তুলে যাত্রার কাছে শিখুন গল্পের গুরুত্ব ঘটনার মূল্য, সংঘাত-প্রতিঘাতের বিন্যাস। শিখুন বাংলার সত্যিকারের মানুষের জাতীয় নাট্য-বৈশিষ্ট্যটা কী, কী সে শুনতে ও দেখতে চায়। সেই প্যাটার্নটাকে প্রথমেই অবজ্ঞাভরে বাদ না দিয়ে, সেই প্যাটার্নে যদি আরোপ করতে পারেন দর্শন ও মহৎ চিন্তা, তবে বুঝি বাহাদুর। নাক সেঁটকানো ইনটেলেকচুয়াল সেজে যাত্রার পালাকারদের গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলে সেটা হবে আপনাদেরই সজ্ঞান আত্মহত্যা, যাত্রার কিছু এসে যাবে না। আপনারা এক বন্ধ্যা শ্রেণীর খিদমতে কালাতিপাত করে অকালে ঝরে যাবেন। ভবিষ্যতের স্রষ্টা যে মেহনতি মানুষ তার সংস্পর্শে না আসতে পারলে আপনাদের শৈল্পিক মৃত্যু অবধারিত।

জপেনদা আমারই দেওয়া একটি চারমিনার ধরিয়ে তারপর পুনরায় জ্ঞানোদ্গার করতে প্রস্তুত হলেন—তাহলে বাংলা থিয়েটারকে বাংলা করার দিকে ঝোঁক না দিয়ে থিয়েটার করার দিকে ঝোঁক দেওয়া হোক। আপনারা বললেন থিয়েটার ইয়োরোপীয়, তাই বদলাতে হবে, ভারতীয় করতে হবে। কোন বস্তুটা বদলাবেন দাদা? পর্দা, উইংস, আলো? মেক-আপ? কস্টিউম? কী বদলালে জিনিসটা হঠাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত হবে, তার ম্লেচ্ছভাব কাটবে?

ওভাবে লিস্ট ধরে ধরে এসব জিনিস হয় না—আমি বললাম—থিয়েটারকে দেশজ প্রভাবে আনতে হবে।

এসেছেই তো—বললেন জপেনদা—নইলে গিরিশবাবুরা অতদিন ধরে কী করলেন?

আমি থতমত খেতেই জপেনদা আক্রমণ তীব্র করে তুললেন—গিরিশ-ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ তো সে-কাজটা আগেই করে দিয়ে গেছেন। যতটুকু বাঙালি হওয়া উচিত ছিল ততটুকু অনেক আগেই হয়ে গেছে। অবশ্য আপনারা সেসব নাটক পড়েননি, সময় হয়নি পড়ার! যাত্রা থেকে মহাভারত-রামায়ণ থেকে বুদ্ধ-জাতক থেকে অনবরত কাহিনী নিয়ে সেটা বাঙালির ভাষায় তাঁরা বলে গেছেন। এখন কাজ ছিল সে-ঐতিহ্যটাকে আবার ধরা, কেননা একদল অর্থগৃধ্নু লোক এসে বাংলা থিয়েটারকে নাইট ক্লাব বানাচ্ছে, মাইকেল-গিরিশ-রবীন্দ্রনাথের মঞ্চে ক্যাবারে তুলেছে। মহাশয়দের কাজ হচ্ছে এইসব শিল্পবোধহীন ব্যক্তিদের বিদায় করে গিরিশ রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করা, থিয়েটারকে আবার থিয়েটার বানানো। গিরিশদের পথটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সে-পথে এগুনো। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নয়, বা গিরিশের বিকৃতি ঘটিয়ে চপল-চটুল খ্যামটার ন্যাকামি নয়। এসব যাঁরা করছেন তাঁরা গিরিশদের হেয় এবং তুচ্ছ প্রতিপন্ন করছেন। ফলে ক্যাবারেওলাদের পাটোয়ারি খেলার সুবিধা হচ্ছে। লোকে ভাবছে আমাদের ঐতিহ্য কিছু নেই আর ছিন্নমূল মানুষই ক্যাবারের ভক্ত হয়, যেমন হয় গাঁজা-ভাঙ-এল এস ডি-র। না, বাংলা থিয়েটারের গোড়াপত্তন আগেই করে গেছেন পূর্বসূরীরা, আপনারা তার ওপর ইমারত গড়ুন। ইয়োরোপীয় আবার কী? গিরিশ-ক্ষীরোদ-দ্বিজেন শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে নিতে দ্বিধাবোধ করেননি, সমসাময়িক অসংখ্য বিদেশি নাটকের

কাছে তাঁরা ঋণী, তৎকালীন ইয়োরোপীয় থিয়েটারের ফর্ম তাঁবা ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। হঠাৎ আপনাদের মতন যুবাপুরুষদের এই ছুৎমার্গ কবে থেকে হল? এরপর কি বিদেশি জ্ঞানে মোটবগাড়ি বর্জন করবেন? চলচ্চিত্র শিল্প বন্ধ কবে দেবেন? সার্জনকে বলবেন বিদেশি যন্ত্র বজর্ন করো? ফাউনটেন পেন ছেড়ে খাগের কলম ধরবেন? গেঁয়ো অশিক্ষিত জটাধারী বেকুবদের কথাগুলো হঠাৎ আপনাদের মুখে কেন?

আমি বললাম—উপমাটা ঠিক হল কি? যন্ত্র এক জিনিস আর—

জপেনদা বলে উঠলেন—ফর্ম একটা যন্ত্রই। একটা অস্ত্র। আসল হচ্ছে বিষয়বস্তু। সেটাকে প্রকাশ কবতে যা দবকাব আমি নেব। ইয়োরোপীয় থিয়েটাবের সর্বাধুনিক গবেষণাও আমার কাছে জরুরি। দরকাব হলে কাবুকি বা পিকিং অপেরা কিছুই আমার কাছে অচ্ছুৎ নয়। মার্কসবাদীবা আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁরা বিশ্বাস কবেন সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের অবসানেব পব মানুষ অতি দ্রুত পবস্পবের সংস্কৃতিকে আপন করে নেবে, পবস্পবের সংস্কৃতি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত কববে। কলকাতার মানুষ বেঠোফেনকে ভালোবাসবে, ভিয়েনা তন্ময় হয়ে শুনবে রাগ-দববাবি। আব সেখানে যে ইয়োরোপীয় থিয়েটার ইতিমধ্যেই আমাদেব খুব কাছেব জিনিস হয়ে গেছে তাকে বাদ দিতে চান? আপনাবা কি একেবারেই গবেট হুজুর? আপনারা এক কাজ করুন—ওলাইচণ্ডীব মন্দিরে গিয়ে পুজো দিন। আপনাদেব জাতীযতাবাদে বিদেশেব বিজ্ঞানের কোনো স্থান না থাকলে ওই মন্দিবই আপনাদের প্রকৃষ্ট স্থান, আধুনিক নানা যন্ত্রে নিযন্ত্রিত রঙ্গ মঞ্চ মাড়াবেন না—দোহাই আপনাদেব।

এই বলে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেবার ভাড়াটি হস্তগত করে জপেনদা প্রস্থান কবলেন।

চায়ের ধোঁয়ার আলো

তাপস সেন

কত বছর আগে 'চায়ের ধোঁয়া' পড়ে ভালো লেগেছিল. নাট্যবিষয়ে এমন সংলাপে ছবি তৈরি করেছিল উৎপল, আজো ভুলিনি।

বন্ধুবর উৎপল দত্ত আমার কাজে খুবই আগ্রহী ছিল—শুরুর থেকেই, প্রায় সেই ১৯৫২ সালে যখন 'সাংবাদিক' নাটকে বেডিয়োর ডায়ালের আলো কমিয়ে বাড়িয়ে রেডিয়ো বর্ণিত বিমান ক্র্যাশের টেনশনটা আনতে চেয়েছিলাম, ও বিনা বাক্যব্যয়ে সোৎসাহে রাজি হয়ে গিয়েছিল—এবং সেদিন আই টি এফ প্যাভিলিয়নের একটি মাত্র অভিনয়ে আমার সঙ্গে উৎপলের যুগলবন্দী ইতিহাস শুরু হয়ে গেল।

তেমনই 'অঙ্গার' নাটকে শেষ দৃশ্য জলপ্লাবনের, কিন্তু তার আগে রেসকিউ অপারেশনের দৃশ্যের অস্থিরতা উদ্বেগ আনতে ওই প্রায় রিয়্যালিস্টিক দৃশ্যকে অন্ধকার করে নিতে চেয়েছি, আর তার ফলে সার্চলাইট, এক্স্ক্যাভেটর ক্রেন ইত্যাদি আরো ভয়ানকভাবে নাটকীয় আলোকপাতে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্ভট চিন্তা আমার মাথায় আসে—একসার ছোটো ইলেকট্রিক বাল্ব্ ক্রমান্বয়ে জ্বলে নিভে যায় পুরো দৃশ্যের প্রায় সবটা জুড়ে—এগুলো পিটহেড-এর ফ্রেমের তলায় জট পাকিয়ে সাজানো ছিল। এসব আপাত অবাস্তব অকারণ এলিমেন্ট আমি যখনই বেপরোয়াভাবে এনেছি, উৎপল তখনই দারুণভাবে উৎসাহিত হয়েছে।

'চায়ের ধোঁয়ায়' যাকে উৎপল 'সচল কাট্-অফ্' বলেছে, তাকে আমরা যা বলি বা বলতাম তা হল 'কাট্-আউট্'। সেটা যেমন স্ট্যাটিক্ হতে পারে, তেমনই আবার তাকে কখনও সাধারণ বলবেয়ারিং-এর সাহায্যে ঘূর্ণায়মান (বা সচল) করেছি। পৃথিবীর ইতিহাসে যতদূর জানি এরকম অনেক কাজ হয়ে থাকবে। আমাদের দেশে সম্ভবত প্রথম এরকম কাজ হয়েছে 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'তিতাস'-এ। পরবর্তীকালে পি এল টি-তে উৎপলের 'টিনের তলোয়ার'-এ রিভল্ভিং স্টেজ-এর প্রয়োজন মেটাতে আরেক ভাবে মুভিং মডেল ব্যবহার করেছি—ঘূর্ণায়মান মঞ্চের বাইরে প্রথম কলামন্দিরে, পরে বাইরের অনেক মঞ্চেই।

লিনেবাখ ল্যানটার্ন-এর কথাও উৎপল তুলেছে। নামটা এসেছে জর্মন শিল্পী আডল্ফ্ লিনেবাখ্ (১৮৭৬-১৯৬৩)-এর নাম থেকে। তিনি ওই বিশেষ ধরনের আলোক-উৎস ব্যবহার করে নানা ছবি প্রজেক্ট করতেন। রঙিন জিলেটিন ও আঁকা দৃশ্যের কাট-আউট আলোর সামনে ধরা হত। এ-আলোতে কোনো লেন্স্ থাকে না ; সরাসরি ফিলামেন্ট (বা তারও আগে আর্ক ল্যাম্প)-এর আলো এক্ষেত্রে সোজা বড়ো হয়ে পর্দায়/সাইক্লোরামায় দেখা যায়। এই পদ্ধতির প্রবর্তনের সঠিক সাল ১৯১৬ ড্রেসডেন-এর কোর্ট থিয়েটারে।

গ্রন্থপরিচিতি

১

চায়ের ধোঁয়া

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৭০ : জানুয়ারি ১৯৬৪। মুদ্রণসংখ্যা এক হাজার।
প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২
প্রচ্ছদ : নিতাই মল্লিক
মুদ্রাকর : জি. বি. প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫ বি, ডা. সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা ১৪।

•

শক্ত মলাটের বই। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪২, মাপ ১৪×২২.৫ সে মি। এই সংস্করণে বইটির বিষয়বস্তু, রীতি এবং গ্রন্থকারের শিল্পীব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা এবং তাঁর নাট্য ও চলচ্চিত্র জীবনের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দুটি জ্ঞাপনই অস্বাক্ষরিত। 'উৎসর্গ' পত্রটিতে লেখা আছে : 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক-নাট্যকার/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়/মহাশয় সমীপেষু—'। মুখবন্ধ 'ভূমিকার পরিবর্তে' উৎপল লিখেছেন—

> 'যে ভাবে লেখার ইচ্ছে ছিল সেভাবে লিখতে পারিনি। অভিনেতারা বিচিত্র জীব, আবেগের ব্যবসায়ী। আবেগবশে অনেক কটূকথা বলেছি, অতিশয়োক্তিও করেছি। আবার এও ঠিক নাট্যযুদ্ধে যারা কাটা সৈনিক তাদের পক্ষে আবেগহীন হওয়াই বা কি করে সম্ভব? সাহিত্যসম্রাট তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রন্থের 'আলমগীর' বিষয়ক প্রবন্ধটা অমৃত পত্রিকায় পড়ে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সেই জোরেই আজ প্রবন্ধগুলো ছাপতে সাহসী হলাম। দুর্বিনয় ক্ষমা করবেন।
>
> উৎপল দত্ত'

সূচিপত্রে মোট ন-টি এবং পরিশিষ্টে একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। নিচের ছকে তার প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া হল।

সূচিপত্রে ক্রম	প্রবন্ধ	প্রথম প্রকাশ						
		পত্রিকা	প্রকাশকাল			তাবিখ		
			বর্ষ	খণ্ড	সংখ্যা	ইংবেজি	বাংলা	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	খুন-জখম	গন্ধর্ব				Sept -Oct 1961	শাবদীয ১৩৬৮	. ১০-১৪
২	শেক্‌স্‌পিয়াব ও ইবসেন	অমৃত	১	৩	২৭	10 11 1961	২৪ কার্তিক ১৩৬৮	১১৩-১৬
৩	জনপ্রিযতা ও আলমগীব	ঐ	১	৩	২৮	17 11 1961	১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	২০৪-০৯
		ঐ	১	৩	২৯	24 11,1961	৮ অগ্রহাযণ ১৩৬৮	২৮৩-৮৬
৪	হ্যামলেট ও জনপ্রিযতা	(?)						
৫	আঙ্গিক	অমৃত	১	৩	৩০	1 12 1961	১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	৩৭১-৭৪
৬	দৃশ্যসজ্জা	ঐ	১	৩	৩১	8 12 1961	২২ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	৪৫৬-৫৮
৭.	আলো	ঐ	১	৩	৩২	15 12 1961	২৯ অগ্রহাযণ ১৩৬৮	৫৩০-৩২
৮	সংগীত	ঐ	১	৩	৩৩	22 12 1961	৬ পৌষ ১৩৬৮	৬১৩-১৬
৯	বাস্তব ও বাস্তবোত্তর	ঐ	১	৩	৩৮	26 1 1962	১১ মাঘ ১৩৬৮	১০৩৩ ৩৫
১০	পবিশিষ্ট : থিয়েটাবেব ভাষা	চলচ্চিত্র					আশ্বিন ১৩৬৮	২৬-৩৩

'চায়ের ধোঁয়া' শিরোনামে 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির ক্রম নিচে দেওয়া হল। 'অভিনেতার শিক্ষা' প্রবন্ধটি গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। 'অভিনয়' প্রবন্ধটি আদি সংস্করণে 'সংগীত' প্রবন্ধে ও বর্তমান সংস্করণে 'সংগীত ও অভিনয়' প্রবন্ধের অন্তর্গত হয়ে গেছে।

প্রবন্ধ	ক্রম	বর্ষ	খণ্ড	সংখ্যা	ইংবেজি তারিখ	বাংলা তাবিখ	পৃষ্ঠা
১ শেক্স্পিয়াব ও ইবসেন	(১)	১	৩	২৭	10 11 1961	২৪ কার্তিক ১৩৬৮	১১৩-১৬
২ জনপ্রিযতা ও আলমগীব	(২)	১	৩	২৮	17 11 1961	১ অগ্রহাযণ ১৩৬৮	২০৪-০৯
৩. ঐ		১	৩	২৯	24 11,1961	৮ অগ্রহাযণ ১৩৬৮	. ২৮৩-৮৬
৪ আঙ্গিক	(৩)	১	৩	৩০	1 12 1961	১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	৩৭১-৭৪
৫. দৃশ্যসজ্জা	(৪)	১	৩	৩১	8 12 1961	২২ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮	৪৫৬-৫৮
৬ আলো	(৫)	১	৩	৩২	15 12 1961	২৯ অগ্রহাযণ ১৩৬৮	৫৩০-৩৩
৭ সংগীত	(৬)	১	৩	৩৩	22 12 1961	৬ পৌষ ১৩৬৮	৬১৩-১৬
৮. অভিনয	(৭)	১	৩	৩৪	29 12 1961	১৩ পৌষ ১৩৬৮	৬৯৪-৭০০
৯. অভিনেতাব শিক্ষা	(৮)	১	৩	৩৫	5 1 1962	২০ পৌষ ১৩৬৮	৭৯২-৯৩
১০. বাস্তব ও বাস্তবোত্তব	(৯)	১	৩	৩৮	26 1 1962	১২ মাঘ ১৩৬৮	১০৩৩-৩৫

'হ্যামলেট ও জনপ্রিয়তা' কবে কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল জানা যায়নি।

'চায়ের ধোঁয়া' বইটির 'জাতীয় সাহিত্য সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালের সেপটেম্বর মাসে। সংস্করণ না বলে একে পুনর্মুদ্রণ বলা উচিত। যাই হোক, প্রকাশক ছিলেন এস. দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন। মুদ্রাকর : হারাধন ঘোষ, বীণাপাণি প্রেস, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলকাতা ৬। দাম : বারো টাকা। বইটির মাপ ১৩.৫×২১ সে.মি.। শক্ত ও নরম মলাটে পাওয়া যেত। এতে প্রথম সংস্করণের গ্রন্থপরিচিতি ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত এবং অস্বাক্ষরিত জীবনপঞ্জি পরিত্যক্ত হয়েছে।

জপেন দা জপেন যা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯১/মে ১৯৮৪
প্রকাশক : 'নাট্যভাবনা'-র পক্ষে শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭/৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির। ৫৪/৫ এ, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০ ০০৩।
মুদ্রাকর : মৃণালকান্তি ঘোষ। ঘোষ প্রিন্টার্স। ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬।
প্রচ্ছদ : গৌতম রায়।
প্রুফ্ : গোপাল আদক।
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রাজা প্রিন্টার্স। কলকাতা ৭০০ ০০৯।
কপিরাইট : শোভা সেন।
পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
মূল্য : ১৬ টাকা।
উৎসর্গ : 'শ্রী সত্যজিৎ রায়ের করকমলে'।
ভূমিকা : শক্তি বিশ্বাস। কলকাতা। ১লা মে ১৯৮৪।

শক্ত মলাটের বই। নামপত্র, প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য, উৎসর্গপত্র, সূচিপত্র, ভূমিকা, বইয়ের বিজ্ঞাপন সমেত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। পৃষ্ঠার মাপ ১৩.৫×২১.৭ সি এম। এতে মোট ন-টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রথমটি খুব সম্ভব ১৯৭১ সালের ['ধর্মতলার হ্যামলেট', এপিক থিয়েটার (ত্রৈমাসিক), পঞ্চদশ ও ষোড়শ যুগ্ম সংখ্যা। তারিখ নেই।] এবং শেষতমটি ১৯৮৪ সালের ['রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', এপিক থিয়েটার, ৩/১৯৮৪]। 'থিয়েটারের ডায়ালেক্‌টিক্‌স' প্রবন্ধটি 'এপিক থিয়েটার' মাসিক বুলেটিনে মোট তিনটি সংখ্যায় [জুন-অগস্ট ১৯৭৬], তিনটি স্বতন্ত্র নামে ['ডায়ালেকটিক্‌স', 'ডায়ালেকটিকাল মন' ও 'চরিত্রের ডায়ালেকটিক্‌স'] প্রথমে ছাপা হয়েছিল। পরে 'থিয়েটারের ডায়ালেক্‌টিক্‌স' নামে 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় [বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮১] এটি মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রণে প্রবন্ধটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং পরিচ্ছেদগুলি যথাক্রমে 'প্রথম দিন', 'দ্বিতীয় দিন' এবং 'তৃতীয় দিন' নামে চিহ্নিত হল। মূল গ্রন্থে এই প্রবন্ধের পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে। নিচে ন-টি প্রবন্ধের কালানুক্রমিক প্রকাশ-সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হল।

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকার নাম	সংখ্যা	তারিখ	পৃষ্ঠা
ধর্মতলার হ্যামলেট	এপিক থিয়েটার [ত্রৈমাসিক]	15-16	1971(?)	৮৬-১০১
বাবুই আর পৌষ	ঐ	17	July 1971	১৬-২৪
আধখানা মানুষ	ঐ	—	Aug 1972	৫৪-৬৭
[থিয়েটারের ডায়ালেকটিকস]	[এপিক থিয়েটার]	[বিশেষ]	[1981]	২৯-৮০
ডায়ালেকটিক্‌স্	এপিক থিয়েটার, মাসিক বুলেটিন'	—	June 1976	২,৪
ডায়ালেকটিকাল মন	ঐ	—	July 1976	২,৪
চরিত্রের ডায়ালেকটিক্‌স	ঐ	—	Aug 1976	২,৩,৭
ক্যাবারে নাট্য	দেশ [শারদীয় ১৩৭৩]	—	Sept-Oct 1976	৩৮৩-৮৬
রবি ঠাকুরের মূর্তি	এপিক থিয়েটার	—	Apr -May 1978	৭-১৯
শিকড়	ঐ	—	Oct-Nov 1978	৫-১৫
কবরখানা	ঐ	—	Dec '78-Jan 79	২৫-৩৬
রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ	ঐ	3	1984	৭-১৩

এইবার 'জপেন দা জপেন যা' গ্রন্থের ক্রম অনুসরণ করে তথ্যগুলিকে নিচের ছকে বিন্যস্ত করছি।

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকাব নাম	সংখ্যা	তারিখ	পৃষ্ঠা	
ধর্মতলার হ্যামলেট	এপিক থিয়েটার [ত্রৈমাসিক]	15-16	1971(?)	৮৬-১০১	
বাবুই আব পৌষ	ঐ	17	July 1971	১৬-২৪	
ববি ঠাকুরেব মূর্তি	এপিক থিয়েটাব	—	Apr -May 1978	৭-১৯	
আধখানা মানুষ	ঐ (ত্রৈমাসিক)	—	Aug 1972	৫-১৩	
শিকড	এপিক থিয়েটব	—	Oct -Nov 1978	৫৪-৬৭	
কববখানা থিয়েটাবেব ডাযালেক্‌টিক্‌স্	ঐ	—	Dec 78-Jan 79	২৫-৩৬	
	ঐ	বিশেষ	1981	২৯-৪০	
প্রথম দিন	এপিক থিযেটাব, মাসিক বুলেটিন	—	June 1976	২,৪	ডায়ালেক্‌টিক্‌স্
দ্বিতীয় দিন	ঐ	—	July 1976	২,৪	ডায়ালেকটিকাল মন
তৃতীয় দিন	ঐ	—	Aug 1976	২,৩,৭	চরিত্রের ডায়ালেকটিক্‌স
ক্যাবাবে নাট্য	দেশ	[শাবদীয ১৩৭৩]	Sept -Oct 1976	৩৮৩-৮৬	
বাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ	ঐ	3	1984	৭-১৩	

'জপেন দা জপেন যা' বইটির দুটি সমালোচনা চোখে পড়েছে। 'বর্তমান' [16. 12. 1985] পত্রিকায় রথীন চক্রবর্তী 'এতদিন এই প্রহসন কেন উৎপলবাবু?' নামে এবং 'আজকাল' পত্রিকায় 'ঐতিহ্যের অধিকার' [7.9.1993] নামে সামান্য আলোচনা করেছেন। জপেন দা এর আগেও বিতর্কের বিষয় হয়েছেন। 'রবি ঠাকুরের মুর্তি' প্রসঙ্গে *Frontier*-এ (Jan. 1972) একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেটা এখনো দেখে উঠতে পারিনি। তবে সেই প্রবন্ধকারের একটি চিঠি 'এপিক থিয়েটার' (বিংশ সংখ্যা ১৯৭২) পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। চিঠিটি 'টিপিক্যাল বুর্জোয়া পণ্ডিত মূর্খ' ছদ্মনামে ছাপা হয়েছিল।

আর একটা কথা। শঙ্খ ঘোষ 'বিতর্কিকা' [প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংকলন। বসন্ত, ১৩৮৮] পত্রিকায় শম্ভু মিত্রের 'প্রসঙ্গ : নাট্য' [সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার , ১৯৭১] এবং উৎপল দত্তের 'চায়ের ধোঁয়া' [জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৯] বই দুটির তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। এছাড়াও অসিত বসু 'বাঙালীর সম্পন্ন সংগ্রহ' [আজকাল, ৩১ অগস্ট ১৯৯৩] নামে কিছু আলোচনা করেন।

স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯/অকটোবর ১৯৮২
প্রকাশক : নাট্যভাবনা'-র পক্ষে শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭/৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭
পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির। ৫৪/৫ এ, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০০০৩।
মুদ্রাকর : আশীষ চৌধুরী। জয়দুর্গা প্রেস। ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৬।
প্রচ্ছদ : গৌতম রায়।
ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রাজা প্রিন্টার্স। কলকাতা ৭০০ ০০৯।
কপিরাইট : শোভা সেন।
পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
মূল্য : (বর্ধিত) ২৫ টাকা।
উৎসর্গ : 'সহযোদ্ধা শক্তি বিশ্বাসকে/উৎপল দত্ত'।

শক্ত মলাটের বই। পৃষ্ঠার মাপ ১৩.৫×২১.৪ সি এম নামপত্র, প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য, উৎসর্গপত্র, সূচিপত্র সমেত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৬। এতে তিনটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে— 'স্তানিস্লাভস্কির পথ', 'এপিকের সারকথা' এবং 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্কসবাদ'। প্রথম প্রবন্ধের ছ-টি পরিচ্ছেদ 'এপিক থিয়েটার, মাসিক বুলেটিন'-এর প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (অকটোবর ১৯৭৩) থেকে প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা (জুন ১৯৭৪) অবধি ছ-টি কিস্তিতে এবং সপ্তম পরিচ্ছেদটি 'এপিক থিয়েটার' (নভেম্বর ১৯৭৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পরিচ্ছেদ 'একজন পরিচালকের জবানবন্দী' নামে, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'স্তানিসলাভস্কির পথ/পরিচালকের জবানবন্দী' নামে এবং শেষ পরিচ্ছেদ 'স্তানিসলাভ্‌স্কি—একটি মূল্যায়ন' নামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি 'স্তানিসলাভ্‌স্কির পথ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচে দেওয়া হল।
প্রকাশক : এপিক প্রকাশনীর পক্ষে রজত ঘোষ ও নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঠিকানা : নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৩, সতীশ মুখার্জী রোড, কলকাতা ২৬।
১ম সংস্করণ। ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫।
'প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।'
মুদ্রক : নীরদ চৌধুরী। জাগরণী প্রেস, ৪১/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ১২।
প্রচ্ছদ : পার্থ ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ব্লক : টাইপোগ্রাফিক আর্ট। ৫৪/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : প্রিন্টিং আর্ট। ৩২/১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯।
দাম : দুই টাকা।
নামপত্র, প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য সমেত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১।
নরম মলাটের বই। পৃষ্ঠার মাপ ১২.৫×১৮ সি এম। লক্ষ করবার বিষয় এই যে 'স্তানিসলাভ্‌স্কির পথ' গ্রন্থটি কাউকেই উৎসর্গ করা হয়নি। প্রথম পরিচ্ছেদটিকে 'ভূমিকা', দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ নামবর্জিত এবং 'এক', 'দুই' সংখ্যায় চিহ্নিত হয়েছে, চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদ আগের মতোই 'অভিনেতার কল্পনাশক্তি' এবং 'মনোযোগ' নামে চিহ্নিত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম ছিল 'মাংসপেশী বিভক্তিকরণ', এই গ্রন্থে তা 'মাংসপেশী' নামাঙ্কিত। সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম ছিল

'স্তানিসলাভ্স্কি—একটি মূল্যায়ন', বর্তমানে তা হয়েছে 'মূল্যায়নের প্রয়াস'। 'স্তানিস্লাভ্স্কি থেকে ব্রেখ্ট্' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটিতে 'স্তানিসলাভ্স্কির পথ' গ্রন্থের নাম ও ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

'এপিকের সারকথা' প্রবন্ধটি আসলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার' গ্রন্থের (আশা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ : ৮ মে ১৯৭৭/২৫শে বৈশাখ ১৩৮৪। পৃ. সাত-আঠারো) 'ভূমিকা'।

'ব্রেখ্ট্ ও মার্ক্স্বাদ' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'এপিক থিয়েটার' (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. ৬৫-৯৬) পত্রিকায়। পরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। প্রাসঙ্গিক তথ্য এইরকম :

প্রথম প্রকাশ : ব্রেখটের জন্মদিন, ১০ ফেবরুয়ারি, ১৯৮১।

প্রকাশক . পিপ্স্ লিট্ল্ থিয়েটার ও বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত। ১৪০/২৪, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৪০।

মূল্য : দুটাকা।

মুদ্রক . সমীর দাশগুপ্ত। গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রা. লিমিটেড। ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা ১৬।

পৃষ্ঠার মাপ ১৮.৫×২৪.৫ সি এম। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-২৪। নরম মলাটের বই। কোনো উৎসর্গপত্র নেই।
উপরের তথ্যগুলি ছকের আকারে সাজালে এইরকম দাঁড়াবে—

'স্তানিস্লাভ্স্কি থেকে ব্রেখ্ট্'	পৃ	পত্র-পত্রিকা/গ্রন্থে যেমন প্রকাশিত হয়েছিল	বর্ষ	সংখ্যা	তারিখ	পত্র-পত্রিকা গ্রন্থ/প্রকাশক
১. স্তানিস্লাভ্স্কিব পথ	৫-৬৭					
ভূমিকা	৫-১১	একজন পরিচালকের জবানবন্দী	১	৩	Oct 73	এপিক থিয়েটাব, মাসিক বুলেটিন
এক	১২-২০	স্তানিসলাভ্স্কিব পথ/ পবিচালকের জবানবন্দী	১	৫	Dec 73	ঐ
দুই	২১-২৭	ঐ (৩)	১	৬	Jan 74	ঐ
তিন অভিনেতাব কল্পনাশক্তি	১৮-৩৩	ঐ (৪) অভিনেতাব কল্পনাশক্তি	১	৮	Mar 74	ঐ
চার মনোযোগ	৩৪-৪১	ঐ (৫) মনোযোগ	১	৯	Apr 74	ঐ
পাঁচ মাংসপেশী	৪২-৪৭	ঐ (৬) মাংসপেশী বিভক্তিকরণ	১	১১	June 74	ঐ
মূল্যাযনের প্রয়াস	৪৮-৬৭	স্তানিসলাভ্স্কি—একটি মূল্যায়ন			Nov 74	এপিক থিয়েটাব (পৃ ১-১০)
		'স্তানিসলাভ্স্কিব পথ'			26 4 75	এপিক প্রকাশনী,
২ এপিকেব সারকথা	৬৮-৮২	'ভূমিকা'			৮ ৫.১৯৯৭	'ব্রেখ্ট ও তাঁব থিয়েটাব' আশা প্রকাশনী
৩. ব্রেখ্ট্ ও মার্ক্স্বাদ	৮৩-১৬	ব্রেখ্ট ও মার্কসবাদ			1981	এপিক থিয়েটার পৃ ৬৫-৯৬ (বিশেষ সংখ্যা),
		'ব্রেখ্ট্ ও মার্ক্স্বাদ'			10 2 81	পিপ্ল্স্ লিট্ল্ থিয়েটাব ও বিষ্ণুপ্রিযা দত্ত। (পৃ.১-২৪)

সৌমেন চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থপরিচিতি

২

শেক্‌স্‌পিয়ার ও ব্রেখ্‌ট্‌

প্রথম প্রকাশ : 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকার ১৯৮৮ সালের দ্বাদশ সংখ্যায়। প্রচ্ছদে ও পত্রিকার মধ্যে বিশেষ আখ্যাপত্র বা flyleafএ এটি 'বিতর্ক-নাট্য' বলে বর্ণিত। ওই আখ্যাপত্রেই স্বীকৃতি আছে: 'হিম্মৎবাই নাট্যাংশের অনুবাদ : উৎপল দত্ত। অন্য নাট্যাংশগুলির অনুবাদ : শক্তি বিশ্বাস।'

সংযোজন

এই অংশে গ্রন্থমধ্যে বা গ্রন্থাকারে অসংকলিত, পত্রপত্রিকায় ছড়ানো-ছিটোনো যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হল, তা এই গ্রন্থে সংকলিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে চিন্তার সাযুজ্য বা সম্পূরকতা সূত্রে সম্পর্কিত। একই বিষয় বা তর্ক এই রচনাগুলিতে ফিরে ফিরে এসেছে। যে দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকাগুলির পাতায় এই প্রবন্ধগুলি ছড়িয়ে ছিল, সেইগুলির এক অসাধারণ সংগ্রহ আমাকে উপহার দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ও মুগ্ধ করে রেখেছেন প্রবীণ বন্ধু একনিষ্ঠ নাট্যরসগ্রাহী শ্রীত্রিদিব দত্ত। তাঁর কাছে আমারই মতো এই প্রবন্ধ সংগ্রহের সমস্ত পাঠকই ঋণী হয়ে রইলেন। প্রবন্ধগুলিব উৎসসূত্র :

নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু। 'বিংশ শতাব্দী'। পঞ্চম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৮৮২ শক (অকটোবর ১৯৬০), পৃ ৬৮৯-৯৩। অঙ্গারে আঙ্গিক। 'চলচ্চিত্র'। আশ্বিন ১৩৬৭ (অকটোবর ১৯৬০), পৃ. ৭১-৭৫। বাংলা নাটকে আঙ্গিকের প্রাধান্য। 'চলচ্চিত্র'। পৌষ ১৩৬৮ (ডিসেম্বর ১৯৬১), পৃ. ২২-২৬।

জপেনদা পর্যায়ের আরো একটি অসংকলিত প্রবন্ধ 'ঘুরে ফিরে' সংগ্রহ করে দিয়েছেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক শ্রীবিষ্ণু বসু। এই লেখাটির প্রথম প্রকাশ 'অমৃত' পত্রিকার ১৯৭৪ সালের ২৭ ডিসেম্বব তারিখের বিশেষ ক্রীড়া ও বিনোদন সংখ্যায়।

এই অংশের শেষ লেখাটি উৎপল দত্তের নয়, তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও দীর্ঘদিনের সহকর্মী শ্রীতাপস সেনের—এই প্রবন্ধ সংগ্রহের 'সংযোজন' অংশের জন্যই বিশেষ ভাবে লিখিত। 'চায়ের ধোঁয়া' গ্রন্থে 'আলো' বিষয়ক প্রবন্ধটির মধ্যে পরিচালকের জবানিতে লেখক এক জায়গায় বলেন: 'আবো একটি জিনিসকে প্রচলন করেছেন তাপসবাবু : কাট্‌-অফ্‌ বা আলোর মুখোশ। . . . তাপসবাবু এই কাট্‌-অফ-এর কায়দাকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কীভাবে সচল কাট-অফ-এর ব্যবহাব শুরু করেছেন তা বোধ হয় পৃথিবীর নাট্যশালার ইতিহাসে লিখিত হওয়ার যোগ্য।' নাট্যকার প্রশ্ন করেন : 'সচল কাট্‌-অফ্‌ মানে?' পরিচালক জবাবে বলেন : 'তাপসবাবুর অনুমতি ছাড়া বলতে পারলাম না এর বেশি। উনি নিজেই বিস্তারিত বলবেন এই আশায় এটুকু বলেই ক্ষান্ত হলাম।' এই প্রবন্ধ সংগ্রহ সম্পাদনাকালে এই অংশটি তাপসবাবুকে দেখালে তিনি এই ছোটো প্রবন্ধটি লিখে দেন, লিখে দিয়ে প্রয়াত লেখকের 'আশা' পূরণ করেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশিকা

নাম ও বিষয় সূচি

নাট্যবিশ্লেষণ

তথ্যকোষ

অখলপকভ, নিকোলাই পাভলোভিচ্। (১৯০০-৬৭)। রুশদেশের সোভিয়েত পর্বে অভিনেতা ও পরিচালক। ১৯২১-এ জন্মনগরী ইরকুট্স্ক্-এ মে দিবসে শহরের কেন্দ্রস্থ চৌমাথায় 'স্পেক্‌টেক্‌ল্' বা সাড়ম্বর জমকালো প্রযোজনার নির্দেশক রূপেই নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভাব। ১৯২৩-২৭ মায়ারহোল্ড্-এর সাহচর্য ও প্রভাবেই থিয়েটারকে বাস্তববাদী পরম্পরার চৌহদ্দি থেকে মুক্ত করার আমৃত্যু প্রকল্প গ্রহণ করেন। ১৯৩০-এ মস্কোর রিয়্যালিস্টিক থিয়েটারের পরিচালক রূপেই এই প্রকল্প রূপায়ণের সুযোগ পান। ছবির ফ্রেম-এ আবদ্ধ মঞ্চকে পরিহার করে দর্শকদের আসনবিন্যাসের মধ্যেই নাট্যঘটনাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তাঁদের কখনও যৌথ খামারের দৈনন্দিন জীবননির্বাহ, কখনও বা এক সৈন্যবাহিনীর চলমান জীবনের মধ্যে স্থাপন করেন ; আবার রস্তাঁ-র 'সিরানো' প্রযোজনায় নায়িকার অতিকায় মূর্তির মধ্যেই এক ফোকরে নায়িকা-অভিনেত্রীকে স্থাপন করেন। নাটকের অঙ্কবিভাগ ভেঙে ছোটো ছোটো খণ্ডদৃশ্য, গান, কাব্যছন্দোময় নাট্যক্রিয়ায়, দর্শকদের আসনবিন্যাসেরও বৈভিন্ন্যে, আলো ও আবহসংগীতের দ্যোতনায় একই দৃশ্যে বিভিন্ন দেশ বা জাতির উপস্থিতি তথা পরিবেশ রচনায় দুঃসাহসিক কল্পনাবিলাস ভাখতানগভ থিয়েটার বা মায়াকোভস্কি থিয়েটারের নির্দেশক রূপে তাঁর ক্রিয়াকর্মেও অব্যাহত থাকে। গোর্কির 'মা' (১৯৩৩), শেক্‌স্‌পিয়ারের 'হ্যামলেট' (১৯৫৪), এ পি শটাইন-এর 'হোটেল অ্যাস্টরিয়া' (১৯৫৬), আরবুজভের 'অনন্ত দূরত্ব' (১৯৫৮) ও পোগোদিনের 'বালক ছাত্র' (১৯৫৯) নাটকের প্রযোজনা উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

অলিভিয়ের, লরেন্‌স্ ক্যর। (১৯০৭—১১ জুলাই ১৯৮৯)। ইংরেজ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক। ১৯২৬-২৮ বার্মিংহাম রেপর্টরি কম্পানিতে বিচিত্র ভূমিকায় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ১৯৩৫-এ নিউ থিয়েটারে গীলগুড-এর সঙ্গে 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকে রোমিও ও মেরকিউশিও-র ভূমিকায় পালটাপালটি অভিনয় করে শেক্‌স্‌পিয়ারীয় অভিনয়ে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ত্রিশের দশকের মধ্য থেকে প্রায় মৃত্যু অবধি ধ্রুপদী ও আধুনিক বা সমকালীন, ট্র্যাজিক ও কমিক, এবং শেক্‌স্‌পিয়ার, চেকভ, শ, স্ট্রিন্ডবার্গ, অসবোর্ন, ইওনেস্কো, আনুই প্রমুখ নাট্যকারদের রচনায় বহুধরনের চরিত্রায়নে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতার বলে চরিত্রের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছেন।

সংযত, খানিকটা চাপা, আত্মগত, অথচ সূক্ষ্ম ভাবান্তর ও কথার তাৎপর্য নির্দেশে প্রখর বিচারবুদ্ধির আলোকে উদ্‌ভাসিত অভিনয়ই তাঁর সহজাত। উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের দৃষ্টান্ত রাল্‌ফ্ রিচার্ডসনের ওথেলোর বিপরীতে ইয়াগোর ভূমিকায়, 'ওথেলো' নাটকে (১৯৩৮) ; 'ইডিপাস' (১৯৪৫) ; 'কিং লিয়ার' (১৯৪৬) ; 'তৃতীয় রিচার্ড' (১৯৪৯) ; 'টিটাস অ্যানড্রনিকাস' (১৯৫৫) ; 'দি এন্টারটেনার' (১৯৫৭) ; 'রাইনসেরাস' (১৯৬০), 'ওথেলো' (১৯৬১) ; 'আংক্‌ল্ ভানিয়া' (১৯৬২), 'দ্য ডান্‌স্ অভ্ ডেথ্' (১৯৬৭) ; 'লং ডেজ জার্নি

ইনটু নাইট' (১৯৭১)। ১৯৬৩-৭২ ব্রিটেনের ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পরিচালক। চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন 'উওদরিং হাইট্‌স্' (১৯৩৯), 'রেবেকা' (১৯৪০), 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস' (১৯৪০), 'হেনরি দ্য ফিফ্‌থ্' (১৯৪৫), 'হ্যামলেট' (১৯৪৮), 'রিচার্ড দ্য থার্ড' (১৯৫৬), 'দি এন্টারটেনার' (১৯৬০), 'থ্রি সিসটার্জ' (১৯৭০), 'স্লুথ' (১৯৭২), 'এ ব্রিজ টু ফার' (১৯৭৭) ছবিতে। তার মধ্যে 'হেনরি দ্য ফিফ্‌থ', 'হ্যামলেট' ও 'রিচার্ড দ্য থার্ড' ছবি পরিচালনা করেছেন। অনারোগ্য ক্লেশকর রোগভোগের মধ্যেও 'কিং লিয়ার' নাটকের টিভি ভাষ্যে অভিনয় করে অভিনয়নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ১৯৪৭-এ নাইটহুড, ১৯৭০-এ ব্যারন-এর সম্মান ও ১৯৮১-তে কম্প্যানিয়ন অভ্ অনার-এর বহুমান রাজকীয় তথা জাতীয় সম্মান লাভ করেন।

অলবি, এডওয়র্ড। (জন্ম ১৯২৮)। মার্কিন নাট্যকার। প্রথম নাটক একাঙ্ক 'জু স্টোরি' (প্রথম অভিনয়, বার্লিন ১৯৫৯)—নাগরিক নিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তিমনে নিহিত আত্মবিনাশস্পৃহার তীব্র ও ভয়াবহ রূপক। ১৯৬২ সালে 'হুজ অ্যাফ্রেড অভ্ ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্' নিউ ইয়র্কের পেশাদার রঙ্গালয়ে চাঞ্চল্যকর জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরিবারমধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে নাটকীয়তায় তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক : 'দ্য ডেথ অভ্ বেসি স্মিথ' (১৯৬১), 'দি অ্যামেরিকান ড্রীম' (১৯৬১), 'বক্‌স্', 'কোটেশন্‌জ্ ফ্রম চেয়ারম্যান মাও ট্সে-টুং' (১৯৬৮), 'এ ডেলিকেট ব্যালান্‌স্' (১৯৬৯), 'সীস্কেপ' (১৯৭৫)। ১৯৮১ সালে তিনি ভ্লাদিমির নাবোকভ-এর উপন্যাস 'লোলিটা'-র নাট্যরূপ দেন।

অসবোর্ন, জন। (১৯২৯-৯৪)। ইংরেজ নাট্যকার। লন্ডনে রয়াল কোর্ট থিয়েটারে ১৯৫৬ সালে তাঁর 'লুক্ ব্যাক্ ইন্ অ্যাংগার' নাটক মঞ্চস্থ হলে ইংরেজি নাটকে এক নবযুগের সূচনা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইংলন্ডে অর্থনৈতিক সংকটে মধ্যবিত্ত সমাজে পুরনো মূল্যবোধে যে চিড় খায়, তারই প্রকাশে এক নব বাস্তবতার জন্ম হয়। 'দি এন্টারটেনার' (১৯৫৭), 'লুথার' (১৯৬১), 'ইন্যাডমিসিব্‌ল্ এভিডেন্‌স্' (১৯৬৪), 'দি ওয়েস্ট অভ্ সুয়েজ' (১৯৭১), পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে অবশ্য সেই স্বাতন্ত্র্যের তেমন পরিচয় ছিল না। তবে নাট্যরচনার কারিগরি, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও অলিভিয়ের, গীলগুড, নিকল উইলিয়মসন, অ্যালবার্ট ফিনি প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতাদের অংশগ্রহণে প্রত্যেকটিই মঞ্চসাফল্য লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত উপন্যাস 'টম জোন্‌স্' অবলম্বনে ১৯৬৩ সালে টোনি রিচার্ডসন চিত্র নির্মাণ করলে অসবোর্ন তার চিত্রনাট্য রচনা করেন। তাঁর আত্মজীবনী 'এ বেটার ক্লাস অভ্ পার্সন' ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

আর্ডেন, জন। (জন্ম ১৯৩০)। ইংরেজ নাট্যকার। ১৯৫৭ সালে রয়াল কোর্ট থিয়েটারে 'দি ওয়াটার্জ অভ্ ব্যাবিলন' নাটক প্রযোজিত হলে নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। 'লিভ্ লাইক্ পিগ্‌স্' (১৯৫৮) নাটকে একটি আবাসনে সামাজিক সংঘাত ও দ্বন্দ্ববিক্ষোভের বাস্তববাদী চিত্রণ থেকে অচিরেই ১৯৫৯-এর 'সার্জেন্ট মাসগ্রেভ্‌স্ ডান্‌স্'-এ তিনি কাব্য, লোকগাথা ও প্রাচীন গদ্যের সম্পদে সমৃদ্ধ এক অন্য নাট্যরূপে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৫ সালেই তাঁর মার্গারেটা ডারসির সঙ্গে পরিচয় ও যৌথভাবে নাটকরচনার সূত্রপাত। আর্য়ল্যান্ড-এর স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত মার্গারেটার সঙ্গে একত্রে আর্ডেন যে-নাটকগুলি লিখেছেন তাতে ইংলন্ড ও আয়ার্ল্যান্ড-এর ইতিহাস, বিশেষত ইংলন্ড-এর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণের বৈপ্লবিক আবেগ ও চেতনা এক 'এপিক' মাত্রায় মূর্ত হয়েছে 'দ্য ব্যালিগম্বীন বিক্‌ওয়েস্ট' (১৯৭২), 'দি আইল্যান্ড অফ দ্য

মাইটি' (১৯৭৪) প্রভৃতি নাটকে। সমকালীন বাজনীতিব বোধ ও ব্রেখ্‌ট্‌-এব নাটক (যা তাঁব নিজেবই স্বীকৃতি মতে তাঁব 'সংলাপ ও মঞ্চভাবনাকে' প্রাণবন্ত কবে তোলে) আর্ডেন-এব নাট্যকৃতিকে পবিপুষ্ট কবেছে। আর্ডেন ও মার্গাবেটা ডার্সি সত্তবেব দশকে ভাবতে এসে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবেন। দুজনেই বর্তমানে আয়ার্ল্যান্ড নিবাসী, নানা প্রগতিশীল আন্দোলনে ও প্রতিবাদী অভিযানে সক্রিয় ও কর্মব্যস্ত। তাঁদেব প্রতিবাদী বাজনৈতিক অবস্থানেব কাবণেই তাঁদেব নাটক ইংলন্ড-এব পেশাদাব বঙ্গমঞ্চে বর্তমানে সমাদৃত নয়। কলকাতাব 'এপিক থিয়েটাব' পত্রিকায় সম্প্রতি বেইজিং নাবী মহাসম্মেলনে মার্গাবেটা ডার্সিব অভিজ্ঞতাব বিবৰণ প্রকাশিত হযেছে।

আর্ভিং, হেনবি। (১৮৩৮-১৯০৫)। ইংবেজ অভিনেতা, অ্যাকটব-ম্যানেজাব, অর্থাৎ নাট্যদলেব মালিকও বটে। পেশাদাব মঞ্চে আবির্ভাব ১৮৫৬ সালেব ২৯ সেপ্টেম্বব। ১৮৭২ সালে 'দ্য বেল্‌স্‌' ও 'চার্ল্‌স দ্য ফার্স্ট' নাটকে অভিনযগুণে সমাদবেব সুযোগ নিযে ১৮৭৮ সালেব ৩০ ডিসেম্বব লাইসিযম থিযেটাবেব মালিকানা গ্রহণ কবে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত এই বঙ্গ ালযেব কর্তৃত্বে আসীন থাকেন। বাজা প্রথম চার্ল্‌স্‌, বিশলিউ, উলসি, বেকেট প্রভৃতি ঐতিহাসিক চবিত্রে তাঁব জমকালো অভিনয যথেষ্ট জনপ্রিযতা লাভ কবলেও তাঁব অভিনযেব আতিশয্য, এমনকী অঙ্গপ্রক্ষেপণেব বাহুল্য, শেক্‌স্‌পিযাবেব নাটকে কাব্যসম্পদেব ব্যঞ্জনা অবহেলা কবে অভিনযদক্ষতা প্রদর্শনেব প্রবণতা বার্নাড শ প্রমুখ তরুণ সমালোচকদেব বিবক্তি ও কঠোব সমালোচনাব কাবণ হয। ১৮৯০ সালে ববীন্দ্রনাথ লাইসিযম থিযেটাবে আর্ভিং-এব অভিনয দেখে মন্তব্য কবেন 'তাঁব নিতান্ত অস্পষ্ট উচ্চাবণ এবং অদ্‌ভুত অঙ্গভঙ্গি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কী-এক নাট্যকৌশলে ক্রমশ অলক্ষে দর্শকদেব হৃদযে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন কবতে পাবেন।' ['য়ুবোপ-যাত্রীব ডাযবি', বিশ্বভাবতী, কলকাতা ১৯৬১]। ১৯০৫ সালে আর্ভিং নাইটহুড লাভ কবেন। ওয়েস্টমিন্‌স্টাব অ্যাবে-ব সমাধিক্ষেত্রে বিশিষ্ট কবিদেব জন্য নির্দিষ্ট অংশে তিনিই প্রথম অভিনেতা যিনি স্থান পান।

ইওনেস্কো, ইউজীন। (জন্ম ১৯১২)। বোমানীয বংশোদ্‌ভূত ফবাসি নাট্যকাব। পঞ্চাশেব ও ষাটেব দশকে তাঁব 'দ্য বল্‌ড্‌ প্রিমা ডনা' (১৯৫০), 'দ্য লেসন্‌' (১৯৫১), 'দ্য চেযার্জ' (১৯৫২), 'আমেদে' (১৯৫৪), 'দ্য বাইনসেবাস' (১৯৬০) প্রভৃতি নাটকে মানুষেব অন্তবে লালিত ভয, আশঙ্কা, অবিশ্বাস, অনাস্থাকে অবাস্তব প্রতীক ও ভযাবহ পবিস্থিতিব মধ্য দিযে প্রকাশেব যে চেষ্টা কবেন, ও সেই চেষ্টায মানুষেব প্রতিদৈনিক কথোপকথন যেভাবে অন্তঃসাবশূন্য রূপে প্রতিভাত হয, তাতে মার্টিন এসলিন এই নাট্যভাষাকে 'থিযেটাব অভ দি অ্যাবসার্ড'বা 'উদ্‌ভটেব নাট্যক্ষেত্র' অভিধায অভিহিত কবেন (১৯৬২)। বাংলায ইওনেস্কোব একাধিক নাটক অনুবাদ বা রূপান্তবে প্রযোজিত হযেছে তাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নীলিমা' (নান্দীকাব, ১৯৬৮) ও 'গণ্ডাব' (বহুরূপী, ১৯৭২)।

'ইডিপাস'। গ্রীক ধ্রুপদী নাটক। বচযিতা সোফোক্লেস (আনু খ্রি পূ ৪৯৭ ৪০৬)। নাটকেব সূচনায থেবাই বাজ্যেব প্রবীণেবা বাজা ইডিপাস (বা অয়দিপাউস বা অয়দিপৌস)-এব কাছে আবেদন জানান, ভযংকব প্লেগেব মডকে বিপর্যস্ত বাজ্যকে বাঁচাবাব পথ তাঁকে বাব কবতে হবে। ইডিপাস জনগণেব কাছে তাঁব বাজকীয দাযিত্ব রূপে এই ভাব গ্রহণ কবেন। ক্রমে প্রকাশ পায, পূর্ব বাজাব হত্যাকাবীব কোনো শাস্তি না হওযায সেই সঞ্চিত পাপেই এই মহামাবীব প্রাদুর্ভাব। প্রায ডিটেকটিভ কাহিনীব সূত্র থেকে সূত্রান্তবে বহস্যোদঘাটনেব কাঠামোয নাটক আবর্তিত হয। ইডিপাস-এব অবিচল একনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পায ইডিপাস

একদা যে অপরিচিত উদ্ধত শকটযাত্রীকে তাঁর অভদ্র ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করেছিলেন, তিনিই ছিলেন থেবাই-এর রাজা লাইউস, এবং তিনি ছিলেন ইডিপাসেরই পিতা। পরে লাইউস-এর বিধবা পত্নী তথা নিজজননী ইয়োকাস্তে-কে বিবাহ করে তিনি সন্তানের জনক হয়েছেন। এই ভয়ংকর সত্যোদ্‌ঘাটনের অভিঘাতে ইয়োকাস্তে আত্মঘাতিনী হন, ইডিপাস নিজেকে অন্ধ করে দেন ও দেশ থেকে নির্বাসিত হন। শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী সংক্ষেপিত ভাষ্যে ১৯৬৪ সালে 'রাজা অয়দিপাউস' নাটক মঞ্চস্থ করে।

'ইন্ দ্য জাঙ্গল অভ্ দ্য সিটিজ্'। ১৯২২-২৭ সালের মধ্যে রচিত বের্টোল্‌ট্-ব্রেখ্‌ট্-এর প্রথম পর্বের এই নাটকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা কারণ ব্যতিরেকেই শিকাগো শহরের এক মালয়ী কাঠের ব্যবসায়ী শ্লিংক জর্জ গার্গা নামে এক লেন্‌ডিং লাইব্রেরির সাধারণ কর্মচারীর সঙ্গে 'এক ব্যাখ্যাতীত দ্বন্দ্বযুদ্ধ' তথা ক্ষমতার লড়াইয়ে শামিল হয়। দুজনেই দুজনকে বশ বা পরাভূত করার চেষ্টায় ব্যবসা, কর্ম, পরিবার, প্রেম-ভালোবাসা, সব-কিছুকেই ব্যাহত করে, নষ্ট করে, বিনাশ করে। এই নাটক সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় পরবর্তী মন্তব্যে ব্রেখ্‌ট্ জোর দিয়েছেন এই নাটকের অন্তর্নিহিত সেই 'শুদ্ধ খেলা' বা 'দ্বন্দ্বের' উপর যাতে 'দুজন মানুষ এমন ঐকান্তিকভাবে লড়াই কবে যেতেই পারে যাতে তারা ক্রমে ক্রমে নিজেরাও যেমন পালটে যায় তেমনই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানও প্রায় যেন আর চেনা যায় না।' ব্রেখ্‌ট্ তখনও মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় এসে পৌঁছননি : 'তখন আমার মাথায় একটা অদ্‌ভুত ঐতিহাসিক ধারণা দানা বেঁধেছিল। মানবজাতির ইতিহাস বলতে আমার মনে যেন ব্যাপকভাবে এক একটি ঘটনা ঘটতে ঘটতে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য পেয়ে যাচ্ছে ; এই ইতিহাস যেন ক্রমাগতই নতুন ও ভিন্ন মানবাচরণের এক সমাহার যা আমাদের এই গ্রহে এখানে ওখানে ধরা পড়ছে।' এই নাটক লিখতে লিখতেই তাঁর মনে হয় যে উদ্দেশ্যবিহীন এমন একটা শুদ্ধ লড়াই শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে সত্য হয়ে ওঠে না : 'অসচেতনভাবেই আমি খুবই কাছে এসে পড়ছিলাম শ্রেণী সংগ্রামের, সেই আসল সংগ্রামেব যা তখন চলছে, যদিও আমি তাকে একটু নির্বস্তুক রূপেই লক্ষ করছিলাম। তাই নাটকের শেষে দ্বন্দ্বযোদ্ধারাই উপলব্ধি করে যে তাদের লড়াই নিতান্তই ছায়ার সঙ্গে লড়াই। শত্রুরূপেও তারা পরস্পরকে ছুঁতেই পারে না। একটা অস্পষ্ট বোধ জেগে ওঠে—পুঁজিবাদের অগ্রগমন ঘটে গেলে যাকে শুদ্ধ লড়াই বলে মনে হয় তা আসলে শুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বতারই এক উদ্‌ভ্রান্ত বিকার মাত্র। এই নাটকের দ্বান্দ্বিকতা তাই শুদ্ধ ভাববাদী।'

ইবসেন, হেনরিক। (১৮২৮-১৯০৬)। নরওয়ে-র বিশিষ্ট নাট্যকার। স্বাভাবিকবাদী ('ন্যাচরালিস্ট') নাটকের জনক রূপে কীর্তিত। সমাজ, পরম্পরা ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ ও দ্বন্দ্বসংঘাত, সমাজের অন্যায় কর্তৃত্ব ও শক্তির কাছে ব্যক্তিমানুষের পরাভব 'পিলার্জ অভ্ সোসাইটি' (১৮৭৭), 'এ ডল্‌স্ হাউস' (১৮৭৯), 'গোস্ট্‌স্' (১৮৮২), 'অ্যান এনিমি অফ দ্য পীপ্‌ল্' (১৮৮২), 'হেডা গ্যাবলার' (১৮৯০) প্রভৃতি নাটকের উপজীব্য হলেও এই বাস্তবানুগ নাট্যধারা থেকে ইবসেন ক্রমেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। ব্যক্তিমানুষের জটিলতা, শিল্প ও জীবনের দ্বন্দ্ব, এমনকী স্ক্যানডিনেভিয়ার অতীত পুরাণ-মহাকাব্যের মহাকায় চরিত্রদের বিশাল আবেগও তাঁর নাটকের বিষয় হয়েছে—'দি ওয়াইল্‌ড্ ডাক্' (১৮৮৪), 'রজমার্জহোল্‌ম্' (১৮৮৫-৬), 'হেডা গ্যাবলার' (১৮৯০), 'দ্য মাস্টার বিলডার' (১৮৯২), 'হোয়েন উই ডেড আওয়েকেন' (১৯০০) ; এবং প্রথম দিকের 'লেডি ইংগের অফ অস্ট্রাট' (১৮৫৫), 'দ্য ভাইকিংস্ অ্যাট হেলগেলন্ড্' (১৮৫৭), 'ব্রান্ড্' (১৮৬৬), 'পিয়ার গিন্ট্' (১৮৬৭), 'এমপেরর অ্যান্ড গ্যালিলিয়ান' (১৮৭৩) প্রভৃতি নাটকে। ১৮৫১-৫৭ বিভিন্ন থিয়েটার সম্প্রদায়ের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে থিয়েটারের কলাবিদ্যা রপ্ত করেন। ১৮৬৪-৯১ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী জীবন যাপন করে ১৮৯১ সালেই নরওয়েতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯০ সালে পারী শহরে আঁদ্রে আঁতোয়ান-এর 'গোস্ট্স' প্রযোজনা থেকেই স্বাভাবিকবাদী বা ন্যাচরালিস্ট্ থিয়েটারের জন্ম ধরা হয়। বাংলায় পঞ্চাশের দশকে নতুন থিয়েটারের অভ্যুদয়ে ইবসেন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থানবিন্দু রূপে বিবেচিত হন। শম্ভু মিত্র ('দশচক্র', ১৯৫২, 'পুতুলখেলা,' ১৯৫৮), উৎপল দত্ত ('গোস্ট্স্', ১৯৫০, 'এ ডল্স্ হাউস,' ১৯৫৩), ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ('বিদেহী', ১৯৬০), তিনজনই তাঁদের পরিচালকজীবনের শুরুতে ইবসেনের নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর মঞ্চস্থ করে স্বাভাবিকবাদী পরম্পরার সঙ্গে তাঁদের যোগ চিহ্নিত করেছেন।

উগো, ভিক্তর। (১৮০২-৮৫)। ফরাসি কবি, কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার। ফরাসি সাহিত্যে রোম্যানটিক আন্দোলনের এই প্রাণপুরুষ তাঁর কবিতা ও উপন্যাসের ('লে মিজেরাব্‌ল্', ১৮৬২, 'লে ত্রাভাইয়ে দে লা মের,' ১৮৬৬, 'ল্যোম কি রিত,' ১৮৬৯) সার্থকতায় জনমানসে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাকেই ভিত্তি করে ১৮৪৫ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে মানবতাবাদ ও গণতন্ত্রকে বিপ্লবী চেতনার মধ্যে স্থাপন করতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁর এই রাজনৈতিক ভূমিকার কারণেই তিনি যেমন একাধিকবার ফরাসি জাতীয় সংসদে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, তেমনই আবার ১৮৫১-৭০ দেশত্যাগ করে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮২৭ সালে তাঁর 'ক্রমওয়েল' নাটকের ভূমিকায় তিনি নাট্যকাব্যের যে মুক্তি, শেক্‌স্‌পিয়ার অনুসরণে ট্র্যাজেডি-কমেডির যৌগপত্যের যে প্রয়াস প্রস্তাব করেন, তা রক্ষণশীল ফরাসি নাট্যসমালোচকদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ১৮৩০ সালে (২৫ ফেবরুয়ারি) 'এরনানি' নাটকের সফল প্রথম অভিনয়ে ফরাসি নাট্যপরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। 'এরনানি' নাটকে গোপন প্রেম, ঈর্ষা, প্রতিশোধ, বিষপানে আত্মহত্যা ইত্যাদি মেলোড্র্যাম্যাটিক উপাদানের ভার সত্ত্বেও সমাজে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে সমাজ ও আইনের চৌহদ্দি থেকে নির্বাসিত নায়ক এরনানির সবল প্রতিবাদের শক্তিমত্তাও যেমন অনস্বীকার্য, তেমনই দীপ্যমান উগোর সংলাপের কাব্যগুণ। তাঁর 'লে রোয়াসামুজ' (১৮৩২) থেকেই জিউসেপ্পি ভের্দি (১৮১৩-১৯০১) 'রিগোলেত্তো' (১৮৫১) অপেরানাট্যের কাহিনী আহরণ করেন। একাধিক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেও উগোর নাটকাবলির মধ্যে কেবলমাত্র 'রুই ব্লা'-ই (১৮৩৮) বহুবার মঞ্চে ফিরে এসেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেনের পটভূমিকায় স্থাপিত এই নাটকেও মেলোড্রামার অতিরেকের মধ্যেও রানীর সঙ্গে এক সৎ সাধারণ মানুষের প্রেমের গণতান্ত্রিক বিলাসের আবেদন থেকেই গেছে।

এলিজাবেথীয় থিয়েটার। মহারানী প্রথম এজিাবেথের (১৫৩৩-১৬০৩) রাজত্বকালে (১৫৫৮-১৬০৩) ইংলন্ড-এ ইয়োরোপীয় নবজাগৃতি বা রেনেসাঁস-এর অভিঘাত প্রবলভাবে অনুভূত হয়। ক্রিস্টফার মার্লো (১৫৬৪-৯৩), টমাস কিড (১৫৫৮-৯৪), উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) প্রমুখ নাট্যকারদের রচনা অবলম্বন করে লন্ডনে গ্লোব, ফরচুন, ও ব্ল্যাকফ্রায়ার্জ প্রভৃতি থিয়েটারে যে নাট্যপরম্পরার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে তার নাটকাবলিতে বিয়োগান্তক ট্র্যাজেডি ও মিলনান্তক কমেডি, এই দুই নাট্যধর্মের সমান্তরাল প্রকাশ ও এই দুয়ের নানারকম মিলন ও মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় ; জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত ব্যক্তিসত্তা ও ঐতিহাসিক প্রবণতার নানাবিধ টানাপোড়েন, রাজশক্তি ও রাজসত্তার বিচার-বিশ্লেষ ও নানা রাজনৈতিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও সমস্যা এই নাটকগুলিকে তাৎপর্যময় করে তোলে। বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পনগরী রূপে লন্ডন শহরের বাড়বাড়ন্ত এই সময়ে অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও কারিগর-

কারুশিল্পী শ্রেণীর মানুষকে থিয়েটারের দর্শকশ্রেণীর মধ্যে একাকার করে দেয়। ফলে বিভিন্ন মানসিকতা ও রুচিব এক বিচিত্র সমাবেশে নাটক পরিবেশনার দায় নাটককেও টান টান উত্তেজনা, খুন-জখম-হিংসা-দ্বেষের প্রাবল্য, হাস্যপরিহাসের স্বচ্ছন্দ বিহার, নানা দোষগুণের সমাহারে জটিল চরিত্রায়ন ও ব্যঞ্জনাগভীর নাট্যকাব্যের সম্পদে বলীয়ান করে। যবনিকাহীন, তিনদিক খোলা ও দর্শকদের মধ্যে এগিয়ে বার-হয়ে-আসা মঞ্চে খোলা আকাশের নিচে দুপুরবেলায় অভিনয়ের প্রথায় দৃশ্যসজ্জা বা মঞ্চমায়ার সুযোগের অপ্রতুলতায় অভিনয় ও নাট্যকাব্যের বর্ণনাগুণের উপরই প্রযোজনার সার্থকতা নির্ভর করত। এলিজাবেথের মৃত্যুতে রাজা প্রথম জেম্‌স্‌-এর রাজত্বকালে (১৬০৩-২৫) জেকোবীয় নাট্যরীতিতে নাট্যশালার রূপান্তরে যবনিকা, আলোকসম্পাত, মঞ্চমায়ার সুযোগ বাড়ে, ট্র্যাজেডি ও কমেডির সমন্বয়ে ট্র্যাজিকমেডির উন্মেষ হয়, ট্র্যাজেডিতেও অলৌকিক, ভীতিসঞ্চারী দুর্দৈবের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়, অস্বভাবী মানসিকতার জটিলতা নাটকে প্রাধান্য পেতে থাকে।

এলিয়ট, টি. এস. [টমাস স্টার্নস্‌]। (১৮৮৮-১৯৬৫)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির সেন্ট লুই-তে জন্মগ্রহণ করে হারভার্ড, সরবোন ও অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্টন কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে ইংলন্ড-এই বসবাস করতে থাকেন, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রুফরক অ্যান্ড আদার অবজার্ভেশন্‌জ্‌' (১৯১৭) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কবিখ্যাতি হয়। ১৯১৯-এ 'ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দি ইনডিভিজুয়ল ট্যালেন্ট' ও 'হ্যামলেট' প্রবন্ধদ্বয়ের প্রকাশ ও পবের বছরই প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধসংগ্রহ 'দ্য সেক্রেড উড' প্রকাশিত হলে সাহিত্যসমালোচকরূপেও নতুন ধারার কর্ণধার হয়ে ওঠেন। ১৯২২ সালে 'দ্য ক্রাইটেরিয়ন' নামে সাহিত্যিক ত্রৈমাসিক প্রকাশ করতে থাকেন। ওই পত্রিকাতেই প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সভ্যতাব সংকটের, যেন বা ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে বিশ্বাস ও সাহিত্যের পরম্পরার মধ্যে নতুন আশ্রয় তথা প্রস্থানবিন্দুর যে সন্ধান 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর প্রাণবস্তু ছিল, তা-ই ১৯২৭ সালে তাঁকে অ্যাংলিকান ধর্মসংঘে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদানে প্রবুদ্ধ করে। ইতোমধ্যে তিনি রচনা করে ফেলেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতাবলি—'গেরনশিয়ন' (১৯১৯), 'দ্য হলো মেন' (১৯২৫), 'জার্নি অফ দ্য ম্যাজাই' (১৯২৭)। খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘে সক্রিয় ভূমিকার দায়ই তাঁকে 'দ্য রক্‌' (১৯৩৪) ও 'মার্ডান ইন দ্য ক্যাথীড্রাল' (১৯২৫) নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করে। এই নাটকদ্বয় থেকে ও পরবর্তী 'দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' (১৯৩৯), 'দ্য ককটেল পার্টি' (১৯৪৯), 'দ্য কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক' (১৯৫৪) ও 'দি এলডাব স্টেট্‌স্‌ম্যান' (১৯৫৯) নাটকে আধুনিক কাব্যনাটকের এক নতুন ধারার পত্তন হয়। ১৯৪৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে এলিয়টের কবিতার উল্লেখযোগ্য অনুবাদ করেছেন।

'করিওলানুস।' আনু. ১৬০৮ সালে লিখিত শেক্‌স্‌পিয়ারের এই নাটকের ঘটনাক্ষেত্র খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর রোম। রোম-এ অভিজাতবর্গ ও মধ্যবর্গের মধ্যে সংঘাত খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র হয়ে উঠলে মধ্যবর্গের দুজন নেতাকে জনপ্রতিনিধির সম্মান তথা স্বীকৃতি দিয়ে অভিজাতবর্গ সাময়িক আপোসরফা করতে চাইলে প্রবল দম্ভী সেনানায়ক মার্শাস করিওলেনাস-এর উদ্ধত আচরণে তা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। করিওলেনাস-এর আচরণে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করলে তিনি প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য ভল্‌স্‌-এ চলে গিয়ে অফিডিয়াস-এর সঙ্গে যোগ দেন। অতীতে সম্মুখ সংঘাতে

বহুবার যে অফিডিয়াস-কে পরাজিত করে করিওলেনাস রোমকে রক্ষা করেছেন, তিনি অন্য পক্ষে যোগ দিয়ে রোম আক্রমণে উদ্যত হলে করিওলেনাস-এর স্ত্রী ও পুত্র তাঁকে অনুরোধে-উপরোধে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অফিডিয়াস করিওলেনাস-এর বিরুদ্ধে ভল্‌শিয়ানদের ক্রোধ উজ্জীবিত করে ষড়যন্ত্রীদের সাহায্যে করিওলেনাস-কে হত্যা করান। বার্নাড শ, টি এস্ এলিয়ট ও ব্রেখ্‌ট্, তিনজনেই এই নাটকটিকে শেক্‌স্‌পিয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে গণ্য করেন। ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ে দেশত্যাগ ও দীর্ঘ নির্বাসের পর ১৯৪৮ সালে পূর্ব জর্মনি তথা জর্মন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ফিরে এসে বের্লিনের অন্‌সম্ব্‌ল্ সম্প্রদায় গঠন করে নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন নাট্যাদর্শ বা নাট্যাবস্থানের সন্ধানে নিয়োজিত বের্টোল্ট্ ব্রেখ্‌ট্ নিজে নতুন নাটক লিখতে গিয়ে স্বভাবতই সংশয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে তিনি বেশ কয়েকটি পুরনো নাটকের রূপান্তরে মনোনিবেশ করেন। ১৯৫১ সাল নাগাদ তিনি শেক্‌স্‌পীয়ারের 'করিওলেনাস' নাটক নিয়ে নাড়াচাড়া ও সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দেন—এই আলাপ-আলোচনার কিছু অংশ নথিবদ্ধ হয় ও পরে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রেখ্‌ট্-এর রূপান্তরিত ভাষ্য অবশ্য মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৪ সালে, ব্রেখ্‌ট্-এর মৃত্যুর পর শেক্‌স্‌পিয়ারের জন্মের চতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে। ব্রেখ্‌ট্-এর রূপান্তরে স্থানে স্থানে সংক্ষেপন ও আপেক্ষিকভাবে আরেকটু আঁটসাঁট পুনর্বিন্যাস ছাড়া শেক্‌স্‌পিয়ারের মূল ভাষ্যের তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। যে শ্রেণীসংঘর্ষের আলেখ্য ও তাতে অভিজাতবর্গের দেশাত্মবোধহীন ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সার প্রকট রূপ ব্রেখ্‌ট্-কে এই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, তাকে পবিস্ফুট করতেই ব্রেখ্‌ট্-এর যা-কিছু পরিবর্তন ও নতুন রচনা।

'কিং লিয়ার।' ১৬০৫-৬ সালে রচিত শেক্‌স্‌পিয়ারের এই নাটকটির সমান্তরাল দুটি প্লট বা কাহিনীবৃত্তে প্রজন্মবিরোধে দুই বৃদ্ধ পিতা স্বার্থান্বেষী সন্তানদের হাতে লাঞ্ছিত হন, পরে তাঁদেরই অনুগত সন্তানেরা তাঁদের উদ্ধার করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেন না। রাজা লিয়ার-এর অনুগত কন্যা কর্ডেলিয়া নিজে নিহত হন, সেই শোকের আঘাতে লিয়ার-ও প্রাণত্যাগ করেন। তবে লিয়ার ও গ্লস্টার-এর দুষ্ট সন্তানেরাও শেষে নিহত হন বা আত্মঘাতিনী হন। আধুনিক কালে মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে 'কিং লিয়ার'-এর একাধিক প্রযোজনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পীটার ব্রুক (জন্ম ২১ মার্চ ১৯২৫)-এর ১৯৬২-র মঞ্চপ্রযোজনা ও ১৯৬৯-এর চলচ্চিত্ররূপ ; গ্রিগরি কোজিন্‌ৎসেভ্ (১৯০৫-৭৩)-এর চলচ্চিত্রভাষ্য (১৯৭১) , ও আকিরা কুরোসাওয়ার চলচ্চিত্রভাষ্য 'রান' (১৯৮৫)। শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকের তৃতীয় অঙ্কে লিয়ার উপলব্ধি করেন যে তিনি তাঁর রাজদায়িত্বপালনে অবহেলা করেছেন, তাঁর দরিদ্র প্রজাদের দারিদ্র্য মোচনে দৃষ্টি দেননি। এই সূত্রটিকে ছবির কেন্দ্রে নিয়ে এসে কোজিন্‌ৎসেভ লিয়ার-এর যন্ত্রণার জন্য তাঁকেই দায়ী করেন ও সেই দায়স্বীকারে তাঁর মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাবর্গ তথা জনসাধারণের প্রতি রাজা তথা দেশনেতার দায়পালনের গুরুত্বই শেক্‌স্‌পিয়ারের এই নাটকের মুখ্য বিষয়ক্ষেত্র প্রতিপন্ন হয়।

গদার, জঁ-লুক্। (জন্ম ৩ ডিসেম্বর ১৯৩০)। ফরাসি চলচ্চিত্রকার, সমালোচক ও অভিনেতা। গদার পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ব্রেথ্‌লেস্' (১৯৫২), 'দ্য লিট্‌ল্ সোলজার' (১৯৬০), 'ল্য কারাবিনিয়ের' (১৯৬৩), 'এ ম্যারিড্ উওমান' (১৯৬৪), 'পিয়েরো লে ফু' (১৯৬৫), 'আলফাভিল' (১৯৬৫), 'টু অর থ্রি থিংস আই নো অ্যাবাউট হার' (১৯৬৬), 'দ্য চাইনীজ' (১৯৬৭), 'উইকএন্ড্' (১৯৬৭), 'ভ্লাদিমির অ্যান্ড রোজা' (১৯৭০), 'লেটার

টু জেন' (১৯৭২), 'প্রেনোম কারমেন' (১৯৮৩), 'হেএল মেরি' (১৯৮৫), 'কিং লিয়র' (১৯৮৭)। চলচ্চিত্রের মোহবিস্তারী ক্ষমতায় আচ্ছন্ন দর্শকদের সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে কৃতসংকল্প গদার চলচ্চিত্রের নানা আঙ্গিককৌশলের জাদু লোকচক্ষে ধরিয়ে দিয়েছেন, টানা আনুপূর্বিক কাহিনীবিন্যাস ব্যাহত করে দর্শকের আত্মসমর্পণকেই যেন বা ব্যাহত করেছেন, ছবিকে সরাসবি 'প্রবন্ধে' রূপান্তরিত করতেও দ্বিধা কবেননি। মানবসম্পর্ক ও সমাজে পুঁজি ও পণ্য ও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রাধান্যেব বিশ্লেষণে, বিভিন্ন বৈপ্লবিক মতাদর্শের মূল্যায়নে তিনি যেমন নিরত থেকেছেন, তেমনই আবার ছবির মধ্যেই চলচ্চিত্রের ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা ও তার অন্তর্নিহিত বিপদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

গারথিয়া লোর্কা, ফেদেরিকো। (১৮৯৮-১৯৩৬)। স্পেনীয় কবি, নাট্যকার ও চিত্রশিল্পী। ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাশিস্তদের হাতে নিহত। লোরকার কবিতা ও নাটকে স্পেনের লোকজীবনেব ও লোককথার প্রবল আবেগ তাঁর একান্ত স্বকীয় চিত্রময় চিত্রকল্পে শানিত রূপ পায়। কোনো এক বুলফাইটার-এব মৃত্যুতে বচিত দীর্ঘ কবিতা 'ইগনাসিও বিলাপে' বুলফাইট-এর রিং-এ ইগনাসিও-র মৃত্যুর অণুপুঙ্খ বাস্তব বিববণে যার শুরু, তাব চূড়ান্ত পবিণতি স্পেনের লোকস্মৃতি তথা কল্পনার অন্তরে ইগনাসিও-র অন্তর্লীন হয়ে যাওযায়। তাঁর তিনটি নাটক 'ব্লাড ওয়েডিং' (১৯৩৩), 'ইয়েরমা' (১৯৩৪) ও 'দ্য হাউস অভ বার্নার্ডা আলবা' (তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত ও প্রযোজিত, ১৯৪৫) বহুল প্রযোজিত। শেষোক্তটিব চিত্রভাষ্য রচনা করেছেন গোবিন্দ নিহালনি, 'রুক্‌মাবাঈ কি হাভেলি' (১৯৯১) নামে।

গীলগুড়, জন। (জন্ম ১৯০৪)। ইংরেজ অভিনেতা ও পরিচালক। ১৯২১-এ প্রথম মঞ্চাবতরণ। শেক্‌স্‌পিয়ার ও চেকভ-এর নাটকেই তাঁর অভিনয়দক্ষতাব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটলেও শ্যাফার, অলবি, বন্ড প্রমুখ আধুনিক নাট্যকারদের রচনাতেও তিনি সমান স্বাচ্ছন্দ্যের প্রমাণ বেখেছেন। ১৯৩৫ সালে তাঁরই পরিচালনায় নির্মিত 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর একটি মঞ্চপ্রযোজনায় অলিভিয়ের ও গীলগুড পালটাপালটি কবে রোমিও ও মেরকিউশিয়োর ভূমিকায় অভিনয় করেন, ১৯৩৭ সালে 'মার্চেন্ট অভ ভেনিস'-এ তাঁর শাইলকের চরিত্রায়ন পরবর্তী নাট্যপাঠ প্রভাবিত করেছে। ১৯৬৪ সালে শেক্‌স্‌পিয়ারেব জন্মচতুঃশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর 'হ্যামলেট' প্রযোজনায় নামভূমিকায় অভিনয় করেন রিচার্ড বার্টন। চলচ্চিত্রেও গীলগুডকে দেখা গেছে হিচকক্-এর 'সীক্রেট এজেন্ট' (১৯৩৬), জন হাউসম্যান-এব 'জুলিয়াস সীজার' (১৯৫৩), লরেন্স্ অলিভিয়ের-এর 'রিচার্ড দ্য থার্ড' (১৯৫৫), অরসন ওয়েল্‌স্-এর 'চাইম্‌স্ অ্যাট মিডনাইট' (১৯৬৬), রিচার্ড অ্যাটেনবরা-র 'ও, হোয়াট এ লাভলি ওয়্যার' (১৯৬৯), অ্যালাঁ রেনে-র 'প্রভিডেন্‌স্' (১৯৭৭), আন্দ্রেই ভাইদার 'দ্য কনডাক্‌টর' (১৯৮০) প্রভৃতি ছবিতে। শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকের অভিনয়ে শেক্‌স্‌পিয়ারের কাব্যমূল্য তথা কাব্যগুণকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েও চরিত্রকে জীবনানুগ রাখার ভারসাম্য গীলগুড-এর আয়ত্ত। আবার চলচ্চিত্রের বাস্তবানুগত্যও তাঁর এমনই সহজসাধ্য যে আধুনিক চলচ্চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-নির্দেশকেরা বারবারই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। 'আর্লি স্টেজেস্' (১৯৩৮), 'স্টেজ ডিরেকশন্‌স্' (১৯৬৩), 'অ্যান অ্যাকটর অ্যান্ড হিজ টাইম' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর নিজ নাট্যকর্মের বিশ্লেষণে এক অন্তর্ভেদী সমালোচকের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

গ্যোয়টে, যোহান ভোল্‌ফ্‌গাং ভন। (১৭৪৯-১৮৩২)। জর্মন কথাসাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার ও মনস্বী। ১৭৭৩ সালে 'গ্যোয়েট্‌স্ ভন বের্লিখিংগেন' নাটক ও পরের বছরই 'তরুণ ভেরটের-এর বিষাদ' উপন্যাসে তিনি জর্মন 'স্টুর্ম উন্ড ড্রাং' ('ঝড় ও তাড়না') আন্দোলন ও

জর্মন রোম্যানটিক সাহিত্যের সূচনা করেন। ব্যক্তির অন্তর্জীবনে বিবাদী আবেগ তথা শক্তির দ্বন্দ্বে প্রবল যে তাড়না ব্যক্তিকে আত্মহননের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে, তার উদ্‌ঘাটনে গ্যোয়টের সাহিত্যকীর্তির প্রথম পর্ব নিয়োজিত হলেও ১৭৭৫-এ ভাইমার খণ্ডরাজ্যে থিতু হয়ে তিনি কিছু কাল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে, বিশেষত সেচ, সড়কনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক রূপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চায় অন্য এক মানসিকতায় উপনীত হন। ১৭৮৬-৮৮ ইতালিপ্রবাসে তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির নতুন ক্ষেত্র চিনে নিতে সমর্থ হন। ইতোমধ্যে অবশ্য ১৭৭৯ সালে কবি-নাট্যকার যোহান ক্রিস্‌টফ্ ফ্রীডরিখ্ শিলার (১৭৬৯-১৮০৩)-এর সঙ্গে পরিচয় ও আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা এবং ওই বছরেই ভাইমার-এ তাঁর পরিচালনায় তাঁর 'ইফিগীনিয়া ইন টাউরিস' নাটকের পরিবেশনা (ওরেস্ট-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন গ্যোয়টে) গ্যোয়টে-কে সাহিত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে শুরু করেছে। ১৭৯১ সালে গ্যোয়টে ভাইমার-এ সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোর্ট থিয়েটারের পরিচালক মনোনীত হন। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত এই রঙ্গালয়ে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি নাট্যপ্রযোজনায় নতুন রীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৮২৯ সালে প্রথম অভিনীত 'ফাউস্ট' নাটকের প্রথম পর্ব (ব্রুন্‌স্‌ভিক্-এর রঙ্গশালায় এ ক্লিংগেমান-এর পরিচালনায় প্রথম পরিবেশিত) গ্যোয়টের মহত্তম কীর্তি। জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞান শেষ পর্যন্ত যে-বলে মানুষকে বলীয়ান করে তা কেমন করে মানুষের মনে প্রেমের উন্মাদনা তথা যৌন আর্তি ও অপরের উপর ক্ষমতা খাটিয়ে নিজের শক্তিমত্তা অনুভব করার লোভ সৃষ্টি ও লালন করে, ও সেই তাড়নায় মানুষ কীভাবে তার নীতিবোধ হারায়, তার বিশ্লেষণে গ্যোয়টে যেন সর্বকালের বুদ্ধিজীবী বর্গের চারিত্র্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টফার মারলো (১৫৬৪-৯৩)-র 'ডক্টর ফস্টাস' থেকেই পণ্ডিতপ্রবর ফাউস্ট বা ফস্টাস-এর সঙ্গে শয়তানের প্রতিনিধি মেফিস-টোফিলিস-এর আঁতাঁতের কাহিনী পুরাণপ্রতিম হয়ে উঠলেও গ্যোয়টে-র ভাষ্যই তাকে গভীরতর অর্থময়তা ও বিস্তার দান করেছে।

চাইকিন, জোসেফ। (জন্ম ১৯৩৫)। মার্কিন নাট্যপরিচালক। জুলিয়ান বেক ও জুডিথ ম্যালিনার লিভিং থিয়েটারের মধ্যেই ১৯৫৯ সালে নাট্যকর্মের সূচনা ঘটলেও ১৯৬৩ সালে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দি ওপেন থিয়েটার সম্প্রদায়েই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। চরিত্রায়নের লক্ষ্য পরিহার করে, সুবিন্যস্ত কোনো নাটককে অবলম্বন না করে দর্শকসমাবেশের মধ্যে (ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে) অভিনেতার উপস্থিতির সার্বিক তাৎপর্যের উপরই নাট্যাভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠা করে অভিনেতৃসম্প্রদায়ের সমবেত (কর্মশালানির্ভর) প্রয়াসে নাট্যসৃষ্টির যে প্রকল্প চাইকিন গ্রহণ করেন, তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যকৃতি 'ভিয়েট্ রক্' (১৯৬৬) ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন শাসকশ্রেণী ও সামরিক বাহিনীর অন্যায়, অমানবিক ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও তরুণ মার্কিনিদের ভিয়েতনামে অহেতুক জীবনহানির নির্মম অর্থহীনতাকে প্রকট করে। প্রোসিনিয়াম মঞ্চ পরিহার করে, ব্যক্তি অভিনেতার ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রায়নের দায় অস্বীকার করে গোষ্ঠী অভিনয়ে প্রায় এক গণপিণ্ডকেই দর্শকসমাবেশের উপর যেন বা ছুঁড়ে দিয়েই 'দ্য সারপেন্ট' (১৯৬৭), 'টারমিনাল' (১৯৬৯), 'দ্য মিউটেশন শো' (১৯৭১) প্রভৃতি নাটকে আধুনিক জীবনে হিংসা, মৃত্যু, হত্যা, নানা চাপে মানুষকে পালটে দেবার প্রয়াসের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়।

চাইকভস্কি, পিয়ত্র ইলিচ্। (১৮৪০-৯৩)। রুশ সুরকার। আবেগ, বিশেষত কোমল বিষাদের প্রকাশের গুণে জনপ্রিয় এই সুরকারের সংগীতসৃষ্টিতে নাট্যগুণের চমৎকার প্রকাশ ঘটে রুশ ব্যালে নৃত্যপরম্পরার সম্পদ 'দ্য স্লীপিং বিউটি', 'সোয়ান লেক' ও 'নাটক্র্যাকার'-এ এবং অপেরা-নাট্য 'ইউজীন ওনেগিন' ও 'দ্য কুইন অভ স্পেড্‌স্'-এ। শেক্‌স্‌পিয়ারের

নাটকের ভাববস্তু আশ্রয় করে চাইকভস্কি রচনা করেছেন 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' ফ্যানট্যাসি ওভারচার (১৮৬৯), 'দ্য টেম্পেস্ট' সিম্ফনিক ফানটাসিয়া (১৮৭৩) ও 'হ্যামলেট' ফ্যানট্যাসি ওভারচার (১৮৮৮)। বায়রনের কাব্যনাট্য 'ম্যানফ্রেড' অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন তাঁর 'ম্যানফ্রেড সিমফনি' (১৮৮৬)।

চেকভ, আন্তন। (১৮৬০-১৯০৪)। রুশ নাট্যকার ও ছোটগল্প লেখক। ১৮৮৪ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি বিদ্যায় স্নাতক হয়ে মফঃসল শহরে ডাক্তারি সূত্রে খুবই কাছ থেকে বিচিত্র নরনারীর জীবনযাত্রা লক্ষ করার যে সুযোগ পান, তা থেকেই রসদ সংগ্রহ করে তিনি যে রচনাশৈলী নির্মাণ করেন, তাতে আবেগ যেমন সংবৃত, আখ্যান যেমন নিরুত্তাপ, বাস্তবের অণুপুঙ্খ চিত্রণ তেমনই নিশ্ছিদ্র। 'দ্য সীগাল' (১৮৯৫), 'আঙ্কল্ ভানিয়া' (১৮৯৯), 'থ্রি সিসটার্জ' (১৯০১), 'চেরি অর্চার্ড' (১৯০৪)—এই চারটি নাটকই স্তানিসলাভস্কির নির্দেশনায় মস্কো আর্ট থিয়েটার ও এই রঙ্গালয় তথা নাট্যসম্প্রদায়ের নাট্যরীতির আদর্শ বা উপমান প্রতিষ্ঠা করে। চেকভের এই ক্ল্যাসিকস্বরূপ নাট্যচতুষ্টয়ে রুশদেশের ইতিহাসের একটি বিবর্তনপর্ব, সামন্ততন্ত্র থেকে বুর্জোয়া সমাজের প্রাধান্যের উন্মেষ, এমন ভাবেই উন্মোচিত হয় যাতে চেকভের অবস্থান মানবিকবাদীর, অথচ নিরাবেগ, নিরপেক্ষ। চেকভের অনেকগুলি একাঙ্ক অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদে ('সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাংকে', শম্ভু মিত্র পরিচালিত বহুরূপী প্রযোজনা, ১৯৫৪, ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে-প্রযোজনায় অভিনয়ে-বাঙালি) পাঠক-দর্শকদেব কাছে সুপরিচিত। অজিতেশের রূপান্তরগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (১৯৬৪), 'প্রস্তাব', 'নানা রঙের দিন', 'শুভবিবাহ', 'তামাকু সেবনের অপকারিতা'।

জয়েস্, জেম্স। (১৮৮২-১৯৪১)। আইরিশ কথাসাহিত্যিক। ভাষাচর্চায় তন্নিষ্ঠ জয়েস তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'চেম্বার মিউজিক' (১৯০৭), প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ডাবলিনার্জ' (১৯১৪) ও প্রথম নাটক 'এক্জাইল্স্' (১৯১৮)-এ শব্দব্যবহারে কোনো ভাব বা পরিবেশের যাথার্থ্য ধারণে সতর্ক শব্দনির্বাচনে যে অণুপুঙ্খদৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা তাঁর 'ইউলিসিস' (প্রথম প্রকাশ ২ ফেবরুয়ারি ১৯২২) উপন্যাসে আরেক মাত্রা পরিগ্রহ করে। ইতঃপূর্বে 'দি ইগোইস্ট' পত্রিকায় (১৯১৪-১৫) ধারাবাহিক প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক কাহিনী 'দ্য পোরট্রেট অভ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান'-এর মধ্যেই 'ইউলিসিস'-এর সমকালীন আইরিশ মানসিকতা ও সংস্কৃতি বিচারের বীজ নিহিত থাকলেও ডাবলিনে চব্বিশ ঘণ্টার কালসীমার মধ্যে চারটি মানুষের চিন্তাপ্রবাহ তথা 'চেতনাপ্রবাহের' মধ্য দিয়ে ইতিহাস ও ব্যক্তিগত অন্তর্লোকের অবিরত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার যে পট জয়েস উদ্‌ঘাটন করেন, তাতে যুক্তির আধারে সুবিন্যস্ত সুসমঞ্জস জীবনবর্ণনার ছক ভেঙে দিয়ে তিনি কথাসাহিত্যে আধুনিকতার একটি নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটন করেন। শুধু সাহিত্যে নয়, জয়েস-এর বহুমাত্রিক মুক্ত রীতির প্রভাব থিয়েটারে, চারুকলায় ও বিশেষত নতুন চলচ্চিত্রকলার বিকাশে অনুভূত হয়। আইজেনস্টাইন 'ইউলিসিস' বইটি পড়তে শুরু করেই এটিকে 'আধুনিক চলচ্চিত্রের বাইবেল' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর পরবর্তী গদ্যকীর্তি 'ফিনিগান্স্ ওয়েক' (১৯৩৯)। ক্রমশই অন্ধতায় নিমজ্জমান জয়েস শেষ জীবনে তাঁর লেখার কাজে নিত্য সহায় রূপে পান (পরবর্তীকালে খ্যাতিমান নাট্যকার) স্যামুয়েল বেকেট-কে। মিউনিখ-এ ১৯১৮ সালে প্রথম প্রযোজনায় তাঁর 'এক্জাইল্স্' নাটক তেমন সফল না হলেও ১৯৭০ সালে নাট্যকার হ্যারল্ড্ পিন্টার তার নবপ্রযোজনা মঞ্চস্থ করেন।

জেনে, জাঁ। (১৯১০-৮৬)। ফরাসি নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক ও কবি। বেশ্যার সন্তান পিতৃপরিচয়হীন জেনে জন্মমুহূর্তেই মাতৃপরিত্যক্ত। চৌর্যবৃত্তিহেতু পনেরো বছর বয়সে তাঁর

প্রথম কারাবাস। মুক্তি পেয়ে কিছুদিন ফরাসি স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যবাহিনী ফরেন লীজিয়ন-এ নিয়োজিত থাকেন। তারপর বাহিনী থেকে পলাতক হয়ে ত্রিশের দশক জুড়ে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় শহরে পেশাদার চোর ও সমকামী যৌনকর্মীর জীবন যাপন করে আবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালে কারাগারে বসে লেখা তাঁর কবিতা ও প্রথম উপন্যাস 'আওয়ার লেডি অব দ্য ফ্লাওয়ার্জ'-এর পাণ্ডুলিপি গোপন পথে সার্ত্র্ ও কক্‌তো-র হাতে এসে পৌঁছয়। সার্ত্র্ ও অন্যান্য ফরাসি লেখকদের হস্তক্ষেপে ১৯৪৮ সালে তাঁর আজীবন কারাদণ্ড মকুব হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে তাঁর পাঁচটি উপন্যাস ও অন্যান্য লেখা নিয়ে তাঁর যে 'রচনাসংগ্রহ' প্রকাশিত হয় তারই প্রথম খণ্ড রূপে জঁ-পোল সার্ত্র্ 'সন্ত জেনে : অভিনেতা ও শহিদ' নামে একটি দীর্ঘ দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার আগেই 'ডেথওয়াচ' ও 'দ্য মেড্‌স্' নাটকদুটি প্রকাশিত হলেও দীর্ঘকাল কোনো-কিছু না লিখে ১৯৫৬ সালে 'দ্য ব্যালকনি' নাটক থেকে নাট্যকার রূপে নতুন সৃষ্টিপর্বের সূচনা করেন। 'দ্য ব্ল্যাক্‌স্' (১৯৫৮) ও 'দ্য স্ক্রীন্‌জ্' (১৯৬১) বচনা করে আবার তিনি দীর্ঘকালেব জন্য নীরব হয়ে যান, লোকচক্ষের অগোচরেই জীবন যাপন কবতে থাকেন। ইয়োরোপের রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটক বারবার অভিনীত হতে থাকলেও (রজাব ব্ল্যাঁ, পীটার ব্রুক-এর মতো বিশিষ্ট নির্দেশকেরা এইসব প্রযোজনা পবিচালনা করেছেন) তিনি সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারদানে বা সভাসমিতিতে বা নিজের কোনো নাটকের প্রথম অভিনয়সন্ধ্যায় উপস্থিত হতে প্রায় কখনোই রাজি হননি। ১৯৬৪ সালে তাঁর সমকামী প্রেমিক আবদাল্লা-র মৃত্যুর আঘাতে তিনি একবাব আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। কিন্তু ষাটের দশকের শেষ থেকেই তাঁকে আরেক ভূমিকায় দেখা যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ বিপ্লবী গোষ্ঠী ব্ল্যাক প্যানথার্স, জর্মনির বিপ্লবী লাল ফৌজ গোষ্ঠী ও প্যালেস্টাইন-এর মুক্তিবাহিনী পি এল্ ও-র সপক্ষে সরাসরি প্রচারে তিনি যতই সরব হয়ে ওঠেন, যাবতীয় প্রচারমাধ্যমেই তিনি ততই আপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮৪ সালে এক সাক্ষাৎকারে জেনে বলেন : 'আমি আগে যত বই লিখেছি—আমি গত ত্রিশ বছরেরও বেশি কাল কিছুই লিখিনি—তা সবই ছিল এক স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্নেব অন্তর্গত। এই স্বপ্ন, এই দিবাস্বপ্ন অতিক্রম করে এসে জীবনের সম্পূর্ণতার তাগিদেই আমাকে ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে হয়েছে।...স্বভাবতই আমি আকৃষ্ট হয়েছি বিপ্লবী জনগোষ্ঠীর প্রতি। আমার পক্ষে তো তা-ই স্বাভাবিক, কারণ সব সমাজকেই আমি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছি।' প্যালেসটিনীয় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ১৯৭০-৭১, ১৯৮২ ও ১৯৮৪-তে কালযাপনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জেনে শেষ অসুখের রোগযন্ত্রণার মধ্যে দু বছর ধরে লেখেন তাঁর শেষ রচনা 'প্রিজনার অভ লাভ' (মরণোত্তর প্রকাশ, ১৯৮৬)।

জ্দানভ, আন্দ্রেই। (১৮৯৬-১৯৪৮)। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪-এ নভগরোদ-এ ও ১৯৩৪-এ লেনিনগ্রাদে কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-৪৮ সালে সোভিয়েত সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলায় 'সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তি ও পার্টির' নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়, ভাববাদী চিন্তা, দর্শন ও কল্পনার সমস্ত রেশ পরিহার করে 'প্রগতিশীল' ও 'আশাবাদী' ও 'ভবিষ্যন্মুখী' শিল্পসৃষ্টির প্রকল্পে শিল্পীসমাজকে কঠোর খরবদারিতে নিয়োজিত করায় তাঁর ভূমিকা বহু লেখক-শিল্পীকে ক্ষুব্ধ করে, অনেককে নীরব করে দেয়, অনেককে নিজস্ব স্বাধীন পথ বর্জনে বাধ্য করে। 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'কে সাহিত্য ও শিল্প রচনায় একমাত্র নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি প্রায়

যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে 'বুর্জোয়া অবক্ষয়ের' লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেন। ১৯৪৭ সালে কমিনফর্ম প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ও তৎপরতা উল্লেখযোগ্য।

জর্মন এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌। ১৯১০-২৫ সালের মধ্যে জর্মনি ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে সাহিত্য, থিয়েটার, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রে এই শিল্প আন্দোলনের নামেই—এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌, বা বাংলায় অভিব্যক্তিবাদ বা প্রকাশবাদ—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের ফরাসি ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে তার সরাসরি বিরোধ চিহ্নিত। ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ দৃষ্ট বাস্তব বা দৃষ্ট প্রকৃতি ও শিল্পীব মধ্যে যে শুদ্ধ নিরপেক্ষ দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি করে দৃশ্যকে প্রায় যেন পবিত্রতা দান করে, এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ সেই নির্বিচার, নিরাবেগ দৃষ্টির মধ্যে পুঁজিবাদী শক্তির প্রাধান্যের প্রতি প্রশ্রয়ের বীজ লক্ষ করে। বাস্তবের আপাত রূপের গভীরে প্রবেশ করে তাকে অন্তরে বিদ্ধ করে তার অন্তর্নিহিত শক্তি, তাড়না ও আবেগের স্বরূপ প্রবল বিস্ফোরক, বিদারী রূপবিকারের মধ্যে উদ্‌ঘাটন কবতে গিয়ে এই শিল্পরীতি সুবিন্যস্ত যুক্তির জালে বোনা সুষম বিন্যাসকে নানাভাবে ভাঙাচোরা কবে বাস্তবের পরিচিত আদল সম্পর্কেই দর্শকের আস্থাকে নাড়িয়ে দেয। নরওয়েব শিল্পী এডভার্ড মুন্‌শ্‌ (১৮৬৩-১৯৪৪)-এর ছবি ও ইবসেন ও স্ট্রিন্ডবার্গ-এর শেষ পর্বের নাটকে এই শিল্প আন্দোলনের উৎস নির্দেশ করা যায়। তবে এই রীতির পরিণত রূপ লক্ষ কবা যায় এর্ন্‌স্ট্‌ বারলাখ (১৮৭০-১৯৩৮), মাক্‌স্‌ বেক্‌মান্‌ (১৮৮৪-১৯৫০), অটো ডিক্‌স্‌ (১৮৯১-১৯৬৯), এর্ন্‌স্ট্‌ লুড়্‌ভিগ্‌ কির্শ্‌নার (১৮৮০-১৯৩৮), অস্কার কোকোশ্‌চ্‌কা (১৮৮৬-১৯৮০), আউগুস্ট্‌ মাকে (১৮৮৭-১৯১৪), ফ্রান্‌ট্‌স্‌ মার্ক (১৮৮০-১৯১৬), পাউলা মোডারজন-বেকার (১৮৭৬-১৯০৭), অটো ম্যুয়েলার (১৮৭৪-১৯৩০), এমিল নোল্‌ডে (১৮৬৭-১৯৫৬), মাক্‌স্‌ পেখ্‌স্টাইন (১৮৮১-১৯৫৫) প্রমুখের চিত্রকর্মে ; কোকোশ্‌চ্‌কা, ভালটের হাসেনক্লেভার (১৮৯০-১৯৪০), গেঅর্গ কাইজার (১৮৭৮-১৯৪৫), পাউল কর্নফেল্‌ড্‌ (১৮৮৯-১৯৪২), রাইনহার্ড সোরগে (১৮৯২-১৯১৬), কার্ল স্টার্নহাইম (১৮৭৮-১৯৪২), এর্ন্‌স্ট্‌ টোলাব (১৮৯৩-১৯৩৯) প্রমুখের নাটকে ; 'দ্য ক্যাবিনেট অভ ডক্টর ক্যালিগারি' (১৯১৯), 'নিবেলুংগেনলীড' (১৯২৩), 'মেট্রপলিস' (১৯২৬) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রে ও থিয়েটারে বাস্তবানুকৃতি বা বাস্তবমোহ সচেতনভাবেই পরিহার করে শিল্পীদের 'নির্মিত' বা তৈবি স্থাপত্য, ছবি বা দৃশ্যসম্পদের ব্যঞ্জনা ব্যবহারে বাস্তবেব দৃশ্যরূপেব আড়ালে অন্য শক্তির খেলা দৃশ্য হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনেকের ক্ষেত্রেই আঘাত বা ক্ষতচিহ্নেব ভার ফ্যাশিবাদেব অভ্যুদয় ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় এই শিল্পীদের কাছে আরো ভয়াবহ হযে ওঠে। গেঅর্গ গ্রোস্‌ৎস্‌ (১৮৯৩-১৯৬৯), জন হার্টফিল্‌ড্‌ (১৮৯১-১৯৬৮) ও কেটে কোল্‌ভিট্‌স্‌ (১৮৬৭-১৯৪৫)-এর মতো কিছু শিল্পী এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর প্রাথমিক বিস্ফোরক বাস্তববিদারণের মাত্রা পেরিয়ে সমাজবাদী কল্পনা ও আবেগের প্রভাবে স্বতন্ত্র এক একটি ক্ষেত্র খুঁজে পান—গ্রোস্‌ৎস-এর কৃষ্ণকৌতুকব্যঙ্গাশ্রিত রেখাচিত্রে, হার্টফিল্‌ড্‌-এর ফোটোমন্টাজ-এ, কোল্‌ভিট্‌স্‌-এর ছাপাই, কাঠখোদাই ও ভাস্কর্যে সমূহেব প্রয়াসে শিশুর প্রাণরক্ষার রূপকে।

ডস প্যাসস্‌, জন রডেরিগো। (১৮৯৬-১৯৭০)। মার্কিন ঔপন্যাসিক। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকেই 'থ্রি সোলজার্জ' (১৯২১) সহ তাঁর প্রথম উপন্যাসগুলির উদ্‌ভব হলেও তাঁর 'ইউ এস এ' উপন্যাসত্রয়ীতেই—'দ্য ফর্টিসেকন্ড প্যারালেল' (১৯৩০), 'নাইনটীন নাইনটাইন' (১৯৩২) ও 'দ্য বিগ মানি' (১৯৩৬)—বিচিত্র আখ্যানরীতির যৌগপদ্যে ও সমাহারে, ঘটনা ও তথ্য ও সংবাদের সমাবেশে, বিজ্ঞাপন ও

জনপ্রিয় গানের উদ্ধৃতি সহযোগে, ও 'দ্য ক্যামেরা আই' রূপে লেখকের ভাষ্যসহ তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশকের মার্কিনি জীবনযাত্রা, রাজনীতি ও মানসিকতার এক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর রচনারীতির মধ্যে চলচ্চিত্রের স্বভাবোচিত অবচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত ক্রমান্বয়তার লক্ষণ প্রকট।

ৎসাভাতিনি, সেজারে। (১৯২০-১৯৮৯)। ইতালীয় চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্রতাত্ত্বিক। মার্কসবাদে আজীবন আস্থাবান ৎসাভাতিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই ও তার সমাপ্তির অব্যবহিত পরে ইতালিতে নেও-রিয়্যালিজম্ বা নব্যবাস্তববাদী ধারার চলচ্চিত্রচর্চার ভাবাদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর তাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলি, চিত্রনাট্য ও গল্পকাহিনী সমভাবেই হলিউডি ছবির উপমান ভেঙে-সাজানো গল্প, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাপুষ্ট চরিত্রায়ণ পরিহার করে— চলচ্চিত্রে সমাজবাস্তবতার নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করে। ওই চলচ্চিত্রধারার অন্যতম আদিপুরুষ পরিচালক ভিত্তোরিও দে সিকা (১৯০২-৭৪)-র 'শুশাইন' (১৯৪৬), 'বাইসিক্‌ল্ থীভ্স্' (১৯৪৮), 'মিরাক্‌ল্ ইন মিলান' (১৯৫০), 'উমবের্তো ডি' (১৯৫২), 'দ্য রুফ' (১৯৫৭) ও 'টু উইমেন' (১৯৬০) ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন ৎসাভাতিনি। রেনে ক্লেমঁ (১৯১৩-) ও লুচিনো ভিস্‌কন্তির (১৯০৬-৭৬) মতো খ্যাতিমান পরিচালকেরা তাঁর গল্প অবলম্বনে ছবি তৈরি করেছেন। আশি বছর বয়সে তিনি প্রথম স্বাধীনভাবে একটি ছবি পরিচালনা করেন—'দ্য ট্রুথ' (১৯৮২)।

নেমিরোভিচ্-দানচেংকো, ভ্লাদিমির। (১৮৫৯-১৯৪৩)। রুশ নাট্যকার ও পরিচালক। মস্কো ফিলহারমনিক সোসাইটিতে ১৮৯১-৯৭ নাট্যশিক্ষাদানকালে ওলগা নিপার, আইভান মস্কভিন, ভ্সেভোলোদ মায়ারহোল্‌দ্ প্রমুখ পরবর্তীকালে বিখ্যাত রুশ অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালকদের তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রী রূপে পান। তার আগেই ১৮৮২ সালে মস্কোর মালি থিয়েটারে তাঁর রচিত দুটি নাটক অভিনীত হয়ে গেছে। ১৮৯২ সালে তাঁর 'দ্য লাকি ম্যান' নাটকে স্তানিসলাভস্কি অভিনয় করলে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ হয়। ১৮৯৭ সালে স্তানিসলাভস্কি ও নেমিরোভিচ-দানচেংকোর মধ্যে স্লাভিয়ানস্কি বাজার রেস্টরেন্ট-এ এক আঠারো ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পরিণামেই ১৮৯৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আর্ট থিয়েটারে স্তানিসলাভস্কির সঙ্গে যৌথভাবে তিনি চেকভের 'থ্রি সিসটার্জ' (১৯০১), গোর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্স্' (১৯০২), চেকভের 'দ্য চেরি অর্চার্ড' (১৯০৪), তলস্তয়-এর 'দ্য লিভিং কর্প্স্' (১৯১১), এবং এককভাবে ইবসেন-এর 'হোয়েন উই ডেড আওয়েকেন' (১৯০০) ও 'পিলার্জ অব সোসাইটি' (১৯০৩), শেক্‌স্‌পিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' (১৯০৩), ইবসেন-এর 'রজমার্জহোল্‌ম্' (১৯০৮) 'পীয়র গিন্ট্' (১৯১২), আন্দ্রিয়েভ-এর 'অ্যানাথীমা' (১৯০৯) ও 'একাতেরিনা ইভানোভনা' (১৯১২) পরিচালনা করেন। তলস্তয়-এর মহোপন্যাস 'রেজারেকশন' (১৯৩১), 'আনা কারেনিনা' (১৯৩৭) ও দস্তয়েভস্কির 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ' (১৯১০)-এর নাট্যরূপদানে ও প্রযোজনায় তিনি চিরায়ত কথাসাহিত্যের নাট্যরূপান্তরের উপমান প্রতিষ্ঠা করেন। আবার ১৯১৮-২১ সালে মিউজিকাল স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে গীতিনাট্য বা লঘু অপেরার পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় হন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাট্যাদর্শ নির্ধারণে ও তার বিকাশে এবং চেকভ ও গোর্কির সঙ্গে তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে নেমিরোভিচ্-দানচেংকোর ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণীয়।

নাৎসি পার্টি, নাৎসিবাদ। ১৯১৯ সালে জর্মনিতে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জাতীয় গ্লানি ও অপমানবোধ ও বেকারিসহ ঘোর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত জর্মন শ্রমিক পার্টি

১৯২০ সালে নতুন নাম নাৎসিওনাল-সোৎশিয়ালিস্‌টিশ্‌ ডয়েট্‌শে আরবাইটারপার্টেই (সংক্ষেপে নাৎসি) বা জাতীয় সমাজবাদী শ্রমিক পার্টি গ্রহণ করে ১৯২১ সালে আডল্‌ফ্‌ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫)-এর নেতৃত্বে আগ্রাসী জঙ্গি জাতীয়তাবাদ, ইহুদিবিদ্বেষ, সামরিক পৌরুষমহিমার উত্তেজক আবেগ প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। অচিরেই ইতালিতে ফ্যাশিবাদের সমকালীন উন্মেষে নাৎসিবাদ তা থেকে তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণা লাভ করে। দুই দেশে দুই আন্দোলনই পরস্পরের কাছাকাছি চলে এলে ফ্যাশিবাদ একটি একক আন্তর্জাতিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। হিটলাব-এর 'মাইন কাম্প্‌ফ্‌' (১৯২৫) নাৎসিবাদের মতাদর্শ ও লক্ষ্য নির্দেশ করলে সারা জর্মনি জুড়ে আর্যজাতিব মাহাত্ম্য ও শুদ্ধতার নামে এক প্রবল জঙ্গি, বৈরিভাবাপন্ন জাতিদম্ভের মত্ত আবেশে দেশবাসীকে এমনভাবে আবিষ্ট ও উত্তেজিত করে তোলা হয় যে ইহুদিরা ও কমিউনিস্টরা হয আত্মগোপনে নয় দেশত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৩৩-এ চ্যানসেলর নিযুক্ত হযে হিটলার কার্যত একনায়ক হয়ে উঠে জর্মনিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে টেনে নিয়ে যান। নাৎসি ভাবাদর্শে পবিচালিত জর্মনি ১৯৩৯-৪৫ পূর্ব ইয়োরোপের বহু দেশ, ফ্রান্‌স্‌ ও অন্যত্রও নির্মম নিপীডন ও ব্যাপক নরহত্যা ঘটিয়ে তার শক্তিব প্রসার ঘটায়। ১৯৪৫ সালে নাৎসি পার্টি ভেঙে দিয়ে জর্মন ফেডেরাল প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও সত্তরের দশক থেকেই জর্মনিতে পুনরুত্থিত নব্য নাৎসিদের জাতিদ্বেষী মারদাঙ্গাব দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

পাব্‌স্ট, গেঅর্গ ভিল্‌হেল্‌ম্‌। (১৮৮৫-১৯৬৭)। জর্মন চলচ্চিত্র-পবিচালক। জর্মনি ও জর্মনির বাইবে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত চিত্রনির্মাণ করে গেলেও তাঁব প্রথম পর্বের ছবি 'দ্য জয়লেস্‌ স্ট্রীট' (১৯২৫—এই ছবিতেই গ্রেটা গার্বোব খ্যাতির সূচনা), 'সীক্রেট্‌স্‌ অভ এ সোল' (১৯২৬), 'দ্য লাভ অভ্‌ জীন নাই' (১৯২৭), 'প্যানডোবাজ্‌ বক্‌স্‌' (১৯২৮), 'ওয়েস্টফ্রন্ট ১৯১৮' (১৯৩০) ও 'কামেরাডশাফ্‌ট্‌' (১৯৩১)-এব জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। কখনও শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনেব বস্তুনিষ্ঠ আলো-আঁধাবি চিত্রায়ণ, কখনও স্বপ্ন ও অবচেতনেব জগতেব চিত্রকল্পসমাহাব, কখনও সম্পাদনায় দৃশ্য-দৃশ্যান্তরেব বিবর্তনকে সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন করে তিনি তাঁব পরিচালনপ্রতিভার প্রমাণ দিয়েছেন। ১৯৩১ সালে তিনি ব্রেখ্‌ট্‌-এর 'থ্রিপেনি অপেরাব' চিত্ররূপ দিতে গিয়ে নাট্যকাবের আপত্তি ও প্রতিরোধেব সম্মুখীন হন, পরে মামলায় জিতে নাট্যকারের অমতেই সেই ছবি সম্পূর্ণ করেন।

পিন্টার, হ্যারল্‌ড্‌। (জন্ম ১৯৩০)। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। ১৯৫৭ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'দ্য রুম'-এর মঞ্চসাফল্য থেকেই তাঁর নাট্যকার-প্রতিষ্ঠা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাটক : 'দ্য বার্থডে পার্টি' (১৯৫৮), 'দ্য কেয়ারটেকার' (১৯৬০), 'দ্য হোমক'মিং' (১৯৬৫), 'নো ম্যানস্‌ ল্যান্ড্‌' (১৯৭৫), 'দ্য বিট্রেয়াল' (১৯৭৮)। পিন্টাব-এর নাটকে নামহীন কোনো আতঙ্ক, যৌন আবেগ বা কামনাজাত মায়াস্বপ্ন, আত্যন্তিক কোনো আবেশ, ঈর্ষা বা সন্দেহ, পরিবারান্তর্গত বিদ্বেষ ও ঘৃণা, কোনো নির্মম শক্তির আস্ফালন ইত্যাদি তাঁর পাত্রপাত্রীদের অশক্ত বিবশ করে দেয, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে তাদের উৎখাত করে দিয়ে যে আচ্ছন্ন পরিবেশে তাদের স্থাপন করে সেখানে তারা অন্য মানুষের সঙ্গে কথা-সংলাপের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ করতে গিয়ে ক্রমাগতই ব্যর্থ হয়। পিন্টার নিজে নাটক পরিচালনা করেছেন, এবং ১৯৬৩ সাল থেকে প্রধানত চিত্রপরিচালক জোসেফ লোজি (১৯০৯-৮৪)-র জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। লোজির জন্য পিন্টার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন 'দ্য সারভান্ট' (১৯৬৩),

'অ্যাক্সিডেন্ট' (১৯৬৭) ও 'দ্য গো-বিট্উইন' (১৯৭১)-এর মতো বিখ্যাত ছবির। লোজি-র জন্যই তিনি মার্সেল প্রুস্ত-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'রিমেমব্রান্স্ অভ্ থিংস্ পাস্ট' (১৯৭৮)-এর চিত্রনাট্য রচনা কবলেও ছবিটি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। অন্যান্য পরিচালকদের মধ্যে তিনি জ্যাক্ ক্লেটন-এব ছবির জন্য চিত্রনাট্য রচনা করেছেন 'দ্য পাম্পকিন ঈটাব' (১৯৬৪), এলিয়া কাজান-এর জন্য 'দ্য লাস্ট টাইকুন' (১৯৭৭), কারেল রাইজ-এর জন্য 'দ ফ্রেন্চ্ লেফটেনান্ট্স্ উওমান'। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তেত্রিশতম জন্মদিন' নামে তাঁব 'বার্থডে পার্টি' নাটকের রূপান্তব ও পরিচালনা করেন।

পিস্কাটর, এরভিন ফ্রীডরিশ্ মাক্স্। (১৮৯৩-১৯৬৬)। জর্মন নাট্যপরিচালক। প্রথম মহাযুদ্ধের রণভূমিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আজীবন যুদ্ধবিবোধী ও মার্কসবাদী। ১৯১৮ সালে বার্লিনে গ্রোস্ৎস ও হার্টফিল্ড্ (দ্র তথ্যকোষ জর্মন এক্স্প্রেশনিজ্ম্)-এর সাহচর্য ও সূত্রেই শিল্পীমহলে প্রথম পরিচিতি ও স্পার্টাকুস ইউনিয়ন নামে কমিউনিস্ট সংগঠনে যোগদান। এই স্পার্টাকুস ইউনিয়নই অচিবেই জর্মন কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে ওঠে। ১৯২০-২১ সালে প্রলেটাবিয়ান থিযেটার গঠন কবে বার্লিনেব বিভিন্ন হল-এ—থিযেটাবগৃহে নয়—জঙ্গি বামপন্থী নাটক পরিবেশন করেন। ১৯২১-এর অকটোববে 'রুশিয়ায অনাহাবক্লিষ্টদেব জন্য শিল্পীদেব সাহায্য' নামে নবগঠিত সংগঠনের সম্পাদক রূপে তিনি জর্মনিতে প্রতিকূল বাজনৈতিক পবিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে জনমত গঠনে সক্রিয় হন। ১৯২৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী অভিযানের জন্য ফেলিক্স্ গাসবাবা-ব সঙ্গে যৌথভাবে তিনি 'রেভিউ বোটব রুম্মেল' প্রযোজনা করে বের্লিনেব চোদ্দটি জাযগায তা পরিবেশন কবে অ্যাজিটপ্রপ বা বিপ্লবী-প্রচাবমূলক নাটকের এক নতুন উপমান প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্ট গণসংগীতেব একটি প্রবাহেব সূত্রে আলগাভাবে বাঁধা বারোটি বিচ্ছিন্ন অণুনাটিকার মধ্য দিয়ে, কখনও বাস্তবের খণ্ডদৃশ্য, কখনও বা ব্যঙ্গনাটিকাব ঢঙে সমকালীন বাস্তবেব একটি বিশ্লেষণ ও সেই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের ভূমিকার নির্দেশ চিহ্নিত হয়। দুটি প্রোজেকটর-এর সাহায্যে পুলিশি নির্যাতন ও রাজনৈতিক নেতাদের ছবি, এবং গ্রোস্ৎস-এব ধারালো ব্যঙ্গচিত্রের স্লাইড প্রক্ষেপণ করে বাস্তবকে আরো দুটি মাত্রায় উপস্থাপিত করা হয়। ১৯২৫-এ কমিউনিস্ট পার্টিব বের্লিন সম্মেলনেব জন্য 'ট্রোট্স্ আল্লেডেম' ('সবকিছু সত্ত্বেও' নামটি লীব্ক্নেখ্ট্-এর বিখ্যাত এক প্রবন্ধেব নাম) প্রযোজনায় ১৯১৪-১৯১৯-এর ইতিহাসেব উপস্থাপনায একই ভাবে ২৪টি খণ্ডদৃশ্য তথা অণুনাটিকাকে চলচ্চিত্রখণ্ড ও লিখিত ঘোষণাসূত্র বা 'টাইট্ল্' সহযোগে বিন্যস্ত কবা হয়। তার আগেই অবশ্য ১৯২৪ সালেই পিসকাটব ফোল্কসব্যুয়েনে নাট্যসম্প্রদাযে অন্যতম নাট্যনির্দেশক রূপে যোগ দিয়েছেন। ১৯২৬-এ বের্লিনে পিসকাটব-এর উদ্যোগেই আইজেনস্টাইন-এর 'ব্যাট্ল্শিপ পোটেমকিন' প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৯২৭-এ ফোল্ক্স্ব্যুয়েনে ত্যাগ কবতে বাধ্য হয়ে ওই বছরই পিসকাটর নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কবেন। এই থিয়েটারেই তাঁর দুটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা প্রযোজিত হয়—এর্ন্স্ট্ টোলাব এর নাটক অবলম্বনে 'হোপ্লা, ভির লেবেন' (১৯২৭) ও ইযারোস্লাভ হাসেক-এর অসমাপ্ত উপন্যাস অবলম্বনে (নাট্যরূপ দেন গাস্বারা ও ব্রেখ্ট্) 'শ্ভোইক্' (১৯২৮)। দুটিতেই মঞ্চপ্রকরণ, স্লাইড্স্ (বিশেষত গ্রোস্ৎস-এর ছবির), সংগীত, চলচ্চিত্র, খণ্ডদৃশ্যের সমাহাবে, চলমান পাটাতন ইত্যাদির প্রয়োগে ও অনেকগুলি অভিনয়ক্ষেত্রেব বিন্যাসে পিসকাটর-এর 'থিয়েট্রিকাল' প্রয়োগপদ্ধতির বিপুল শক্তি প্রমাণ হয়। কিন্তু বাম ও দক্ষিণপন্থী দুই মহল থেকেই

তাঁর প্রথাবিরোধী রীতির কঠোর সমালোচনা আসতে থাকলে 'ডাস্ পোলিটিশ্ টিয়াটর' ('রাজনৈতিক থিয়েটার') নামে বইতে তিনি তাঁর অবস্থান যুক্তিসহ উপস্থাপন করেন। ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ে দেশত্যাগী পিসকাটব ১৯৩১-৩৬ সোভিয়েত ইউনিয়নে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সহায়' (ইন্টারন্যাশনল ওয়ার্কার্স এড, আই এ এ্যচ্) বা 'মেঝ্রাব্পম' নামে আন্তর্জাতিক বামপন্থী সংগঠনেব চলচ্চিত্রনির্মাণ প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। নানা জটিলতার মধ্যে ১৯৩৪ সালে তিনি 'রিভোল্ট্ অভ দ্য ফিশারমেন' ছবি সম্পূর্ণ করেন। ১৯৩৬-এ সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পীদের উপর রাষ্ট্রের সন্দেহদৃষ্টি নেমে এলে অনেকেই যখন বন্দী ও নিহত হতে থাকেন, তখন পিসকাটব প্রথমে ফ্রান্স্-এ চলে আসেন, পরে ১৯৩৯-৫১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাসকালে নিউইয়র্কে ড্রাম্যাটিক ওয়র্কশপ নামে নাট্যশিক্ষালয়ের অধ্যক্ষতা করেন। ১৯৫১ ফেডেরাল জর্মন প্রজাতন্ত্রে চলে এসে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে নাটক পরিচালনা করতে থাকেন। ১৯৫১-৬৬-র মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা : মিলার-এর 'দ্য ক্রুসিব্‌ল্' (১৯৫৪, ১৯৫৫), তলস্তয-এর 'ওযর অ্যান্ড পীস'-এর নাট্যরূপান্তর (১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭), ফক্‌নর-এব 'রিক্ওয়ায়েম ফব এ নান'-এব নাট্যরূপান্তর (১৯৫৫, ১৯৫৬), ব্যুখ্‌নার-এব 'ডান্টন্‌স্ ডেথ' (১৯৫৬), স্ট্রিন্ডবার্গ-এর 'ডান্‌স্ অভ ডেথ্' (১৯৫৭), ও'নীল-এর 'মোর্নিং বিকাম্‌স্ ইলেক্‌ট্রা' (১৯৫৮), গেঅর্গ কাইজাব-এর 'গ্যাস' (১৯৫৮), মাক্‌স্ ফ্রিশ্-এব 'বীডারমান্ উন্ড্ ডী ব্রান্ডস্টিফ্‌টার' বা 'ফায়াররেজার্স' (১৯৫৯), স্ট্রিন্ডবার্গ-এর 'ডান্‌স্ অভ্ ডেথ' (১৯৫৯), ব্রেখ্‌ট্-এর 'মাদার কারেজ' (১৯৬০), সার্ত্র্-এর 'নো এগ্‌জিট্' (১৯৬০), মিলাব-এব 'ডেথ অভ্ এ সেল্‌স্‌ম্যান' (১৯৬১), জেনেব 'ব্যালকনি' (১৯৬২), হোকুথ্-এব 'দ্য ডেপুটি' (১৯৬৯), রল্যাঁর 'রোব্‌স্‌পিয়ব' (১৯৬৩), হাইনাব কিপ্‌হার্ট-এর 'ইন দ্য ম্যাটার অভ বোবার্ট ওপেনহাইমার' (১৯৬৪, ১৯৬৫), ও পেটব ভাইস্-এর 'দি ইন্‌ভেসটিগেশন' (১৯৬৬)। ১৯৬২ সাল থেকে তাঁব মৃত্যু পর্যন্ত তাঁব অধ্যক্ষতা ও পরিচালনায় পশ্চিম বের্লিনের 'ফ্রাইযে ফোল্‌ক্‌স্‌ব্যুযেনে' নতুন প্রতিবাদী বাজনৈতিক নাট্যকারদের পীঠস্থান হযে ওঠে। মঞ্চবিন্যাসে নানা স্তরের ব্যবস্থায়, স্লাইড ও চলচ্চিত্রেব প্রক্ষেপণে ঐতিহাসিক তথ্যের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় হোকুথ্, ভাইস ও কিপহার্ট-এব নাটকেব অভিনব চরিত্র পিসকাটব চিহ্নিত করেন। তিনি লক্ষ করেন 'যে অব্যবহিত পূর্বেব অতীতের মূল্যায়নেই আধুনিক রাজনৈতিক থিয়েটারের লক্ষ্যবিন্দু নির্দিষ্ট।' হোকুথ, ভাইস ও কিপহার্ট-এর নাটকে সদ্য বিগত ফ্যাশিবাদী আমলের সত্যগোপন-প্রযাসকে বিদীর্ণ করে সত্যোদ্‌ঘাটন ও সাবধানী মানুষের মিথ্যাকে জেনেশুনে মেনে নেওয়াব প্রবণতাকে ধিক্কার পিস্‌কাটব-কে এক নতুন সৃষ্টিশীলতায় অনুপ্রাণিত করে।

প্রোলেটকুল্ট্। ১৯০৬ সালে প্রাক্‌বিপ্লব রুশিয়ায প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন—সম্পূর্ণ নাম 'অর্গানাইজেশন ফব প্রলেটেরিয়ান কালচার'—একটি আদি ইশতেহারে ঘোষণা করে : 'শিল্প সামাজিক পরিবেশ দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক উৎপাদন। শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার একটি উপায়রূপেও শিল্পের ভূমিকা আছে।. . .সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রামে তার শক্তিবর্গকে সংগঠিত করতে নির্বিত্ত শ্রেণীব আবশ্যক তার নিজস্ব "শ্রেণীগত" শিল্প।' ১৯১৭-র বিপ্লবের পর এই সংগঠন বোগ্‌দানভের নেতৃত্বে চিত্রকলা ও থিয়েটারে প্রলেতারিয় সংস্কৃতির যে আদর্শ পরীক্ষামূলক কর্মেব মধ্যে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করেন, তাতে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আনাতোলি লুনাচার্স্কির প্রশ্রয় ও সমর্থন থাকলেও লেনিন তার বিরোধিতা করেন। পার্টির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বাইরে শিল্পীদেব নিজস্ব স্বাধীন উদ্যোগে প্রলেতারীয় সংস্কৃতিব বিকাশের

সম্ভাবনায় লেনিনের আস্থা ছিল না। ১৯২০ সালে সর্বরুশীয় প্রোলেটকুল্ট্-এর কেন্দ্রীয় শ্রমিক থিয়েটারের মঞ্চসজ্জা বিভাগেব প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেরগেই আইজেনস্টাইন ১৯২৪ পর্যন্ত প্রোলেট্কুল্ট্-এর নাট্যপরিচালনায়, নাট্যশিক্ষাক্রম পরিচালনায়, প্রোলেট্কুল্ট্-এর অনুষ্ঠানবিচিত্রার দেশপরিক্রমা পবিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় থাকেন। প্রোলেট্কুল্ট্-এর সহযোগিতায় তিনি ১৯২৪ সালে তাঁর প্রথম চিত্র 'স্ট্রাইক' সম্পূর্ণ করেন। ১৯২৭ পর্যন্ত মে দিবস, অকটোবব বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপন ইত্যাদি উপলক্ষে জনসমাবেশে বা শোভাযাত্রায় ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বা কোনো লক্ষ্যধ্বনির নাট্যচিত্রময় উপস্থাপনায়, সংগীতে শ্রম, শ্রমিক ও যন্ত্রশিল্পের ধ্বনিকে বিশেষ মর্যাদায় অঙ্গীভূত করায়, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে যন্ত্র ও শ্রমকে স্থান করে দিতে গিয়ে ফ্রেমে বাঁধা ছবি বা প্রদর্শশালায় স্থাবব মূর্তিব সীমাবদ্ধতা ভাঙার পরীক্ষায় প্রোলেট্কুল্ট্-এর ঐতিহাসিক কীর্তি তথা দুঃসাহসিকতা রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিশেব দশকের শেষ দিকে স্তব্ধ হযে যায়। মস্কোব প্রোলেট্কুল্ট্ থিয়েটাবে আইজেনস্টাইনের পরিচালনায় আলেকজান্দার অস্ত্রোভস্কির 'ইনাফ্ সিমপ্লিসিটি ফব এভ্রি ম্যান' নাটকেব পবিবেশনা (এপ্রিল ১৯২৩) উপলক্ষে জুন-জুলাই মাসের 'লেফ' পত্রিকায় আইজেনস্টাইন 'দ্য মন্টাজ অফ অ্যাট্র্যাক্শন্স্' নামে তাঁব বিখ্যাত প্রবন্ধে লেখেন : 'অল্প কথায় বলতে গেলে প্রোলেট্কুল্ট্-এব থিয়েটাব কর্মসূচি "অতীতের সম্পদেব ব্যবহাব" বা "থিয়েটাবের নতুন নতুন রূপ আবিষ্কাবে" নিয়োজিত নয়। তার লক্ষ্য থিযেটারের প্রতিষ্ঠানকেই বিনাশ করে তার জায়গায় এমন এক প্রেক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা কবা যেখানে জনগণের প্রতিদিনের কর্মজীবনেব দক্ষতাব স্তবে তাদের কীর্তিকে তুলে ধরা যায়। থিযেটারেব ক্ষেত্রে এই স্তরকে উন্নত কবাব জন্য এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশাল ও কর্মশালা সংগঠনই প্রোলেটকুল্ট-এব বৈজ্ঞানিক বিভাগের আশু দায়িত্ব।'

ফয়েখ্ট্ভাঙ্গার, লিঅন। (১৮৮৪-১৯৫৮)। জর্মন নাট্যসমালোচক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। প্রথম দিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বচনায় ও পবে একাধিক উপন্যাসে জর্মনিতে ইহুদিদের দুর্গতি ও অবমাননাব চিত্রায়ণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও ব্রেখ্ট্-এব প্রথম পর্বেব নাটক 'ড্রাম্‌স্ ইন দ্য নাইট' (১৯১৮-২০) ও তাঁর 'এড্ওয়র্ড দ্য সেকন্ড' রূপান্তবে (১৯২৪) সহযোগী রূপে তিনি বেশি পবিচিত। তাঁর নাটক 'ওয়ারেন হেসটিংস, গুভের্নিয়র ফন ইনডিয়েন' (১৯১৫-এ বচিত, ১৯১৬-এ প্রকাশিত)-এর সংস্কাবে ও সংশোধনে ব্রেখ্ট্ও হাত লাগিয়েছেন। জর্মনিতে ফ্যাশিবাদের অভ্যুত্থানেব পব দেশত্যাগী হয়ে মস্কোতে তিনি ব্রেখ্ট্ ও ভিলি ব্রেডেল-এব সঙ্গে যৌথভাবে ফ্যাশিবিবোধী সাহিত্যপত্রিকা 'ডাস্ ভোর্ট' সম্পাদনা করেন। পরে তিনি মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে অরোরা প্রকাশনা সংস্থান প্রতিষ্ঠা কবে জর্মন ভাষায় নতুন জর্মন সাহিত্য প্রকাশে নিয়োজিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি জর্মন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পুবস্কাবে সম্মানিত হন।

ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। (আনু. ১৮৯৩-১৯৬৮)। যাত্রার নট, নির্দেশক ও যাত্রাপালাকাব। 'বড় ফণি' নামে পরিচিত। ইতিহাস, পুরাণ, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ফণিভূষণ তাঁর অভিনয়ে চিন্তাসমৃদ্ধ, মার্জিত ও সংবেদনশীল যে রীতি প্রয়োগ করতেন তা দর্শকদেব ভাবনাব খোবাক জোগাত, এক-একটি নাট্যমুহূর্তে চবিত্র ও পবিস্থিতির বহু মাত্রা ও স্তব যুগপৎ উন্মোচিত হত। 'বীর অভিমন্যু' পালায় শকুনি, 'রাজা দেবীদাস' পালায় নামভূমিকায়, 'বাঙালি' পালায় দাউদ খানের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় স্মরণীয় কীর্তি। ১৯৬৮ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সংগীত নাটক অকাদমির পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর প্রকাশিত স্মৃতিকথা, প্রবন্ধগ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য

'ভোলাদাদার নটজীবন' ও 'আধুনিক অভিনয়শিক্ষা' (১৯৫৭)।

মধু বসু। (১৯০০-৬৯)। নাট্যপ্রযোজক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা। শান্তিনিকেতন ও বিদ্যাসাগর কলেজে শিক্ষাসমাপনান্তে ১৯২৪ সালে চলচ্চিত্রজগতে প্রবেশ করলেও ১৯২৬ সালে বিদেশে গিয়ে ক্যামেরাব কাজ শিখে এসে 'আলিবাবা' (১৯৩৭) ছবি তৈরি করেই শুধু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাই নয়, বাংলা 'মিউজিকাল' ছবির এক উপমানই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন। ১৯২৮ থেকে ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স নাট্যসংস্থার পরিচালক রূপে তার আগেই অবশ্য 'দালিয়া', 'আলিবাবা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'ঘরে বাইরে' প্রযোজনা করেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশ নাটকে অভিনয়ও করেছেন। নৃত্যপটীয়সী সুঅভিনেত্রী স্ত্রী সাধনা বসুও তাঁর পরিচালিত নাটক ও চলচ্চিত্রের এক আকর্ষণ হয়ে ওঠেন। পববর্তী ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অভিনয়' (১৯৩৮), 'রাজনর্তকী' (১৯৪১), 'মাইকেল মধুসূদন' (১৯৫০), 'শেষের কবিতা' (১৯৫৬), 'মহাকবি গিবিশচন্দ্র' (১৯৫৬), 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৯৬৪)। শেষ জীবনে চলচ্চিত্রশিল্পের কর্মী ও কলাকুশলীদেব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন' ছবিব নামভূমিকায উৎপল দত্তেব চলচ্চিত্রাভিনযের সূচনা।

মস্কো আর্ট থিয়েটার। স্তানিসলাভস্কি ও নেমিবোভিচ্-দানচেংকোর (দ্র তথ্যকোষ—নেমিবোভিচ্-দানচেংকো) উদ্যোগে ও অধিনায়কত্বে ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্প্রদায। আলেক্‌সেই কনস্তানতিনোভিচ্ তলস্তয়-এর 'জাব ফিওদোব' প্রযোজনা দিযে দ্বারোদ্‌ঘাটন ঘটলেও মুখ্যত চেকভ ও গোর্কিব নাটকের স্বাভাবিকবাদী প্রযোজনাতেই এই সম্প্রদায় সুগভীব মানসবিশ্লেষণ ও পরিবেশাণুপুঙ্খেব যাথার্থ্যে স্বাভাবিকবাদী নাট্যবীতির যে পরাকাষ্ঠা ও অভিনযের যে বিজ্ঞানভিত্তিক 'স্বভাবধর্মেব' মাত্রা তুলে ধরেন, তা নাট্যানুশীলনে পৃথিবীব সর্বত্রই আজও অনুসবণীয দৃষ্টান্তবিশেষ। বিপ্লবেব অব্যবহিত পরেই বেশ কযেকজন বিশিষ্ট সদস্য দল ও দেশ ত্যাগ কবে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে আর্ট থিযেটাবেব অভিনযরীতিব শিক্ষাদান, চর্চা ও অনুশীলনেব এক পরম্পরাব পত্তন করেন। মার্কিন পেশাদার থিযেটার ও হলিউডেব ত্রিশের দশক থেকে পঞ্চাশ দশকেব বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীই এই ধারায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ কবেছিলেন। সোভিযেত ইউনিযনে মস্কো আর্ট থিযেটাবেব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। স্তানিসলাভস্কিব আমল থেকেই আর্ট থিযেটাবের মধ্যেই এক একটি স্টুডিও থিয়েটারে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ও কল্পনাঋদ্ধ তরুণ পরিচালকদেব স্বাধীনভাবে পবীক্ষানিরীক্ষা কববাব সুযোগ দেওয়াব পবম্পরা শুরু হয। এই সুযোগ ও চর্চা থেকেই রুশ থিয়েটারে স্বাভাবিকবাদের পরিপন্থী বা বিবাদী বহু ধারার সূচনা হয়েছে, সম্পূর্ণ বিপবীত কোটির পবিচালকদের উন্মেষ ঘটেছে। মস্কো আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায় বহুবার বিদেশ সফব করেছে। ১৯৭৩ সালে এই সম্প্রদায একটি নতুন নাট্যগৃহ লাভ করে।

'মান্ ইস্ট্ মান্'। বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট্ রচিত নাটক (১৯২৪-৬)। প্রথম প্রযোজনা ডার্মস্টাড্-এ (১৯২৬)। পরে এরিখ্ এঙ্গেল-এর পরিচালনায় হেলেনে ভাইগেল-এর অভিনয়সমৃদ্ধ প্রযোজনা, বের্লিন, ৫ জানুয়ারি ১৯২৮, ব্রেখ্‌ট্-এর নিজের পরিচালনায, বের্লিন, ৬ ফেবরুয়ারি ১৯৩১। ভারতে যুদ্ধরত চারজন ব্রিটিশ সৈনিক একটি মন্দির হানা দিতে গেলে তাদের মধ্যে একজন হারিয়ে গেলে তারা চটপট গালি গে-কে ওই চতুর্থ সৈন্যের সজ্জায় ভূষিত করে তাকে অচিরেই পাকা সৈনিকে রূপান্তবিত করে ফেলে। বিধবা বেগবিক-এর চরিত্রেই হেলেনে ভাইগেল-এর প্রথম ব্রেখ্‌ট্-এর নাটকে অভিনয়, এই চরিত্রে পরবর্তী মাদার কারেজ-এর চরিত্রের স্পষ্ট পূর্বাভাসও লক্ষণীয়। কলকাতায 'মান্ ইস্ট্ মান্' প্রযোজনা করেছে ওপেন থিয়েটার সম্প্রদায় 'মানুষ-মানুষ' নামে (৩ সেপটেম্বর ১৯৮৩), অঞ্জন দত্ত ও প্রদীপ সাহার

রূপান্তর ও নির্দেশনায়।

লুকাচ, গেঅর্গ। (১৮৮৫-১৯৭১)। হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী দার্শনিক ও সাহিত্যসমালোচক। ১৯১৮ সালে হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'দ্য থিওরি অভ দ্য নভেল' (১৯২০), 'হিস্টরি অ্যান্ড ক্লাস-কনশাস্‌নেস্' (১৯২৩), 'দ্য হিস্টরিকাল নভেল' (১৯৩৬-৭), 'দি ইয়ং হেগেল' (১৯৩৮), 'স্টাডিজ ইন ইয়োরোপিয়ান রিয়্যালিজ্‌ম্' (১৯৩৮), 'মীনিং অফ কনটেমপোরারি রিয়্যালিজ্‌ম্' (১৯৫৫), 'এসেজ অভ টোমাস মান' (১৯৬৩), 'সোলঝেনিৎসিন' (১৯৬৯)। নানা পক্ষের আক্রমণে লুকাচ বারবার বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ালেও মার্কসবাদী চিন্তার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের প্রতিফলন, সাহিত্যের বিশেষ কয়েকটি প্রদেশে ও ক্ষেত্রে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ও সাহিত্যের মার্কসবাদী বিচারে কিছু বীজভাবনার সম্পদে তাঁর সমগ্র রচনাবলি আজও অবশ্যপাঠ্য। ১৯৩৮ সালে লেখা (কিন্তু অপ্রকাশিত) ব্রেখ্‌ট্-এর কঠোর লুকাচবিরোধী কিছু প্রবন্ধ ১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'দ্য ম্যাজিক মাউনটেন' (১৯২৪) উপন্যাসে টোমাস মান তাঁর নাফ্‌টা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন লুকাচের আদলে।

লাং, ফ্রিট্‌স্। (১৮৯০-১৯৭৬)। জর্মন চিত্রপরিচালক, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা। নির্বাক যুগে 'ডক্টর মাবুসে দ্য গ্যাম্‌ব্‌লার' (১৯২২), 'ডী নিবেলুংগেন' (১৯২৪), 'মেট্রপলিস' (১৯২৭) ও সবাক যুগের শুরুতেই 'এম্' (১৯৩১)-এর মতো ধ্রুপদী চিত্রকীর্তি রচনা করে প্রতিষ্ঠার তুঙ্গেই নাৎসিদের নির্দেশে ছবি করতে অস্বীকার করে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফ্রান্স্-এ 'লিলিয়ম' (১৯৩৪) ও হলিউডে 'হ্যাংমেন অলসো ডাই' (১৯৪৩), 'মিনিস্‌ট্রি অভ ফিয়ার' (১৯৪৪), 'দি উত্তমান ইন দি উইনডো' (১৯৪৪), 'স্কার্লেটি স্ট্রীট' (১৯৪৫), 'দ্য বিগ হীট' (১৯৫৩), 'হিউমান ডিজায়ার' (১৯৫৪), 'হোয়াইল দ্য সিটি স্লীপ্‌স্' (১৯৫৬) প্রভৃতি ছবি তৈরি করে শেষ জীবনে জর্মনিতে ডক্টর মাবুসে-কে নিয়ে আরো একটি ছবি ('দ্য থাউজান্ড আইজ অভ ডক্টর মাবুসে,' ১৯৬০) পরিচালনা করেন। গদার-এর ছবি 'কন্‌টেম্প্‌ট্' (১৯৬৩)-এ তিনি নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে—কখনও কখনও নিজের সংলাপ নিজেই সৃষ্টি করে—চলচ্চিত্রনির্মাণে তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য ও ব্যবসায়িকতার পাকেচক্রে তার অবরোধের যন্ত্রণাকেই যেন প্রকাশ করেছেন; গদাব ও লাং-এর এই ঐতিহাসিক সংযোগে ঐতিহাসিকতার নানা স্তর ও মাত্রার উদ্‌ঘাটন হয়। এই ছবির একটি দৃশ্যে লাং হলিউড বিষয়ে ব্রেখ্‌ট্-এর একটি বিখ্যাত কবিতা উচ্চারণ করেন।

লুনাচার্স্কি, আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ্। (১৮৭৫-১৯৩৩)। রুশ রাজনৈতিক নেতা। বলশেভিক পার্টির সদস্য। নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকার। ১৯১৭-২৯ নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রে শিক্ষা-সংস্কৃতির 'পীপ্‌ল্‌স্ কমিসার' তথা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে পরীক্ষামূলক শিল্পসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রশ্রয়ী সমর্থন বিশের দশক জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে থিয়েটারে ও চিত্রকলায় ও চলচ্চিত্রে নবযুগের সূচনা করে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯২৪ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেন : 'একটি ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের বুর্জোয়া শ্রেণীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে—যত দূর সম্ভব প্রকট একপেশে ছবি অর্থাৎ বড়ো মাপের ছবিতে কোনো এক তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের অতিপ্রকট প্রকাশ আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদের ছবিকে হতে হবে বুর্জোয়া ছবির মতোই আকর্ষক ও উপভোগ্য।'

বন্দারচুক, সেরগেই। (জন্ম ১৯২০)। রুশ চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা। সেরগেই গেরাসিমভের 'ইয়ং গার্ড' (১৯৪৮) ও সেরগেই ইউৎকেভিচ্-এর 'ওথেলো' (১৯৫৫) প্রভৃতি

ছবিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের পর 'ফেট অভ এ ম্যন' ছবি (১৯৫৯) পরিচালনা করেন ; ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পায়। ১৯৬৫-৬৭ সালে তিনি তিন খণ্ডে আট ঘণ্টা ব্যাপী 'ওয়র অ্যান্ড পীস' সম্পূর্ণ করে চিরায়ত সাহিত্যের চলচ্চিত্ররূপায়ণে এক কীর্তি স্থাপন করেন। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত চলচ্চিত্র বিষয়ে রচিত এক প্রবন্ধের উপসংহারে সত্যজিৎ রায় লেখেন : 'ভোলা যায় না চেরকাসভের ইভান, স্মোকতুনভস্কির হ্যামলেট, বন্দারচুকের ওথেলো, ভোলা যায় না. . .ওয়ার অ্যান্ড পীসে নাতাশার নাচের দৃশ্য।' তাঁর পরবর্তী ছবিব মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ওয়াটারলু' (১৯৭০) ও 'বোরিস গোদুনভ' (১৯৮৬)।

বেক, জুলিয়ান। (১৯২৫-৮৫)। মার্কিন নাট্যপরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৯৪৮ সালে স্ত্রী জুডিথ ম্যালিনা সহযোগে লিভিং থিয়েটার নাট্যসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে ষাটের দশকে মার্কিন পরীক্ষামূলক থিযেটারের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে তিনি বলেন, 'আমরা এমন এক পরীক্ষাপ্রবণতার উপর জোব দিযেছিলাম যা হবে পরিবর্তমান এক সমাজেরই প্রতিচ্ছায়া। কেউ যদি থিয়েটাবে পবীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারে, তবে সে জীবন নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা কবে যেতে পারে।' এই নীতিকে পুষ্ট করেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বেক-এর আজীবন ঘৃণা ও সমুদায় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বাষ্ট্রশক্তিতে তাঁব নৈরাজ্যবাদী অনাস্থা। গারথিয়া লোবকা, পিরানদেল্লো, কক্‌তো, ব্রেখ্‌ট্‌ প্রমুখের নাটক নিয়ে কাজ শুরু করে জ্যাক্‌ গেলবার-এর 'দ্য কানেক্‌শন্‌' (১৯৫৯), ব্রেখ্‌ট্‌-এর 'মান্‌ ইস্ট্‌ মান্‌' (দ্র. তথ্যকোষ—'মান্‌ ইস্ট্‌ মান্‌'), ও কেনেথ ব্রাউন-এর 'দ্য ব্রিগ' (১৯৬৩) প্রযোজনায় লিভিং থিয়েটার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির নির্মম মানবতাবিবোধী শাসননীতি তথা দমননীতির কঠোব সমালোচনায় এমন এক অবস্থান গ্রহণ করে যে অশ্লীলতার ছুতোয় মার্কিন সবকার নানা ভাবে এই সম্প্রদায়কে বাধা দিতে থাকে। লিভিং থিয়েটার অবশেষে দেশত্যাগে বাধ্য হযে ১৯৬৪-৬৮ কেবলমাত্র ইয়োরোপে অভিনয় করে বেড়ায়। তারপর মাঝে মাঝে দেশে ফিবে শ্রমিকদের সঙ্গে বা ছাত্রদের সঙ্গে কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনা করলেও মূলত ইযোরোপে ও লাতিন আমেরিকায় সক্রিয় থেকেছেন। ১৯৮৪ সালে বেক অনারোগ্য রোগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে লিভিং থিয়েটার মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে ফিরে এসে থেকে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর জুডিথ ম্যালিনা ও হ্যানন রেজনিকভের পরিচালনায এই গোষ্ঠী পথনাটিকা, কাব্যনাটিকা ও গৃহহীন মানুষেব সঙ্গে নাট্যানুশীলনে ব্যাপৃত।

বেঠোভেন, লুড্‌ভিগ্‌ ফান। (১৭৭০-১৮২৭)। জর্মন সুরকার। পাশ্চাত্য সংগীতে প্রবাদপ্রতিম এই প্রতিভাধর ধ্রুপদী পরম্পরার শেষ মহান সুরকার ও রোম্যানটিক ধারার প্রথম কীর্তিমান স্রষ্টা। দরিদ্র পরিবাবে জন্মলাভ করেও পিতার কাছেই প্রথম সংগীতশিক্ষা। তাঁর সংগীতরচনার মধ্যে 'এরোইকা', 'পাস্টোরল', 'কোরাল' সিম্‌ফনি হিসেবে বিখ্যাত। তাছাড়াও পিয়ানো ও ভায়োলিন-এর জন্য কনচের্তো, পিয়ানো সোনাটা ও চার তারযন্ত্রের জন্য তাঁর বহু রচনাই পাশ্চাত্য সংগীতের সম্পদ।

বেনিয়ামিন, ভালটার। (১৮৯২-১৯৪০)। জর্মন মার্কসবাদী মনস্বী। ১৯২৮-এ জর্মন ট্র্যাজিক নাটকের উন্মেষ বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করে লেখক জীবনের সূচনা করলেও নানা বিষয়ে সাংবাদিক প্রবন্ধ রচনা করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। ব্রেখ্‌ট্‌-এর বন্ধু রূপে তাঁর এপিক থিয়েটারের তত্ত্বধারণার সমর্থনে ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৩-এ জর্মনিতে ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হলে তিনি প্যারিসে চলে আসেন। 'দি অথার অ্যাজ প্রোডিউসার' (১৯৩৪) ও 'দি ওয়র্ক অভ আর্ট ইন দি এজ অভ মেক্যানিকাল রিপ্রোডাক্‌শন' (১৯৩৬) নামে দুটি প্রবন্ধে ও ফরাসি কবি বদল্যার সম্পর্কে তাঁর

অসমাপ্ত বিশ্লেষাত্মক রচনায় (মরণোত্তর প্রকাশ, ১৯৬৯) সাহিত্য রচনার পশ্চাতে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকার যে সূত্রাবলি আবিষ্কার করেন তা পরবর্তী শিল্পসংস্কৃতি বিচারে বারবারই ফিরে আসে। জর্মনরা ফ্রান্স্ অধিকার করলে বেনিয়ামিন স্পেন সীমান্তে পালিয়ে যান, সীমান্ত পেবোবার অনুমতি না পেয়ে আত্মহত্যা করেন।

বালজাক, অনরে দ্য। (১৭৯৯-১৮৫০)। ফরাসি কথাসাহিত্যিক। 'হিউমান কমেডি' নামে পরিকল্পিত ১৩৭টি উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি ফবাসি সমাজের রূপান্তবের একটি সামাজিক আলেখ্য রচনার প্রকল্পে ১৮২৭-৪৭-এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত ৯১টি উপন্যাস সম্পূর্ণ করেন। উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার অন্যতম আদিপুরুষ বিবেচিত বালজাক ব্যক্তিগত জীবনে অনাদর, অভাব, দারিদ্র্য, সাফল্যসাধ ও সাফল্যস্বপ্ন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দেউলিয়া দশা ইত্যাদির টানাপোডেনের মধ্যে যে জীবনধারা কাছ থেকে দেখেছেন ও চিনেছেন তাতে মফঃস্বল জীবনই বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে, মহানগরীব চারিত্র্যও যেন মফঃস্বল থেকে আগত বহিবাগতের দৃষ্টিপ্রসূত। বালজাকের রচনায চবিত্রেব গভীরে বা জটিলতায় যাবাব কোনো প্রয়াস নেই, কড়া শাদা-কালো বা ভালো-মন্দেই তাঁর চরিত্রায়ণ। ১৮৩১-৩৫-এর মধ্যে লেখা কয়েকটি উপন্যাসে অতীন্দ্রিয় কল্পনাজারিত প্রতীকতার উদ্ভাসে বাস্তব ও অলৌকিকের মধ্যে দ্বিধাতাডিত তাঁর কুশীলবেরা সুখ বা জ্ঞানের অসম্ভব এক একটি লক্ষ্যের সন্ধানে ছোটে, ছুটে ব্যর্থতায় মুখ থুবড়ে পড়ে।

সার্ত্র্, জঁ-পোল। (১৯০৫-৮০)। ফরাসি দার্শনিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকাব ও রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৩১-৪৪ মূলত দর্শনের অধ্যাপনা কবে, অধ্যাপনা ত্যাগ করে সর্বসময়ের লেখকেব পেশা অবলম্বন কবেন। ১৯৩৮ সালে প্রথম উপন্যাস 'লা নোজে' ('বিবমিষা')-ব প্রকাশ। ১৯৪০ সালে ফ্রান্স্ জর্মন অধিকারাধীন হলে বন্দী হন। কারাশিবিরেই তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'বারিওনা' লেখেন ও বড়দিনেব আগের রাত্রে মঞ্চস্থ করেন। তাঁর যে ডান চোখটি কানা ছিল তাই দেখিয়ে মিথ্যা চক্ষুরোগের ভান করে এবং সামবিক পরিচযপত্রে কারচুপি করে বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়েই মের্লো-পঁতি, সিমন দ্য বোভোয়া, জঁ পুইয়ঁ প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে 'সমাজতন্ত্র ও যুক্তি' নামে সংগঠন গঠন করে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় হন। ১৯৪৩ সালে তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'লে মুশ' ('মাছি') মঞ্চস্থ হয়। সিমন দ্য বোভোয়া লিখেছেন, 'এই সময়ে সার্ত্র্ মনে করতেন, থিয়েটারের যথার্থ ভূমিকা হল, যে-দর্শকেরা নাট্যকারের সঙ্গে একই সংকটের বোধে পীড়িত, তাঁদেবই কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা। একই সংকট বলতে তখন যা সব ফরাসি মানুষই অনুভব করেছিলেন, জর্মন ও ভিশি প্রচারের সেই নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ যা ফরাসি জনসাধাবণকে বলে যাচ্ছে অনুতাপ প্রকাশ করে আত্মসমর্পণ কবতে। থিয়েটার এই পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক বাহন হয়ে উঠতে পারে যা তাদের প্রতিবোধ ও স্বাধীনতার আদর্শে আবার বিশ্বাসী করে তুলতে পারে।' নাটক লিখতে লিখতে তিনি সিমন দ্য বোভোয়াকে বলেন, পুরাণকাহিনীকে 'তিনি এমন এক অস্ত্রে পরিণত কববেন যা দিয়ে তিনি সরকারি নীতিবোধকে আহত করতে পারবেন, যে অপরাধবোধে ভিশি ও জর্মনরা আমাদেব বিষিয়ে তুলছে, সেই অপরাধবোধ নির্মূল করে স্বাধীনতার পুনরোচ্চারণ ঘটাবেন।' এই নাটকেই সার্ত্র্-এর নাটকের ধরনটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। একটি স্তরে তিনি ঐতিহাসিক এবং সমকালীন একটি মাত্রায় দাঁড়িয়ে ; অন্য এক স্তরে তিনি সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা বিষয়ে তাঁর দার্শনিক অন্বেষায় ভাবিত। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই তাঁর কুশীলবেরা স্থানকালসীমিত একটি খাঁচার মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীত্ব থেকে স্বাধীনতার সত্য আবিষ্কারে রত। সার্ত্র্ তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন, 'প্রত্যেক পরিস্থিতিই এক

একটি ফাঁদ, সর্বত্র চতুর্দিকে দেয়াল।' ১৯৪৩-এই সার্ত্র্-এর দার্শনিক মহাগ্রন্থ 'লেত্র এ ল্য নেআঁ' ('অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব') প্রকাশিত হলে অস্তিত্ববাদী দর্শনের একটি অন্যতম স্তম্ভ বলে তা স্বীকৃত হয়। ১৯৪৪-এ তাঁর 'যুই ক্লো' ('রুদ্ধদ্বার') নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরের বছরই 'লে শর্ম্যাঁ দ্য লা লিবের্তে' ('মুক্তির পথ') উপন্যাসমালার প্রথম দুটি পর্ব প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইন্দোচীন থেকে ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের অবলোপের দাবিতে, ১৯৫৩ সালে ভিয়েতনামে ফরাসি ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, ১৯৫৫-৬২ আলজিরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশিক শাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে 'সোভিয়েত আগ্রাসনের' নিন্দায় তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা বিংশ শতাব্দীতে নির্দল বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকার এক উপমান প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৬০ সালে দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ফ্রাঁসিস জাঁসঁ-র বিচারে সার্ত্র্ লিখিত বিবৃতি পেশ করে আলজিরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সপক্ষে জাঁসঁ-র গোপন ক্রিয়াকলাপকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন ও '১২১ জনের ঘোষণায়' স্বাক্ষর করে সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আলজিরীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে অস্বীকার করার অধিকার ও আলজিরীয় মুক্তিসংগ্রামে ফরাসিদের সক্রিয় সহযোগিতা করার অধিকাব ঘোষণা করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ও প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি 'জাতিবিনাশের' সংজ্ঞা রচনা করে জাতিবিনাশের দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি মে-জুনের ছাত্র-যুব 'বিদ্রোহ'কে স্বাগত জানান, ১৯৭১ সালে 'লা কোজ দ্যু প্যপ্‌ল্' ('জনগণের লক্ষ্য') নামে মাওবাদী পত্রিকার প্রধান পরিচালক হিসেবে নিজের নাম দেন, রাস্তায় পত্রিকা ফেরি করে কারাবরণ করেন। ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জর্মনিতে বাডের-মাইনহফ গোষ্ঠীর বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে স্টুটগার্টে এর সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন। উল্লেখযোগ্য নাটক : 'লে ম্যাঁ সাল' ('নোংরা হাত'), ১৯৪৮, 'ল্য দিয়াব্‌ল্ এ ল্য বঁ দিয়্যো' ('শয়তান ও ঈশ্বর'), ১৯৫১, 'কীন', ১৯৫৪, 'নেক্রাসভ', ১৯৫৫, 'লে সেকেস্‌ত্রে দালতোনা' ('আলতোনার বন্ধ গৃহবাসীরা'), ১৯৫৯। শেষ জীবনে প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়ে আরো বহু রচনার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।
